পূজাবার্ষিকী ১৩৮৯
আনন্দমেলা

সুরভি সুরভিত,
স্পর্শ পুলকিত,
বস্ত্র সুশোভিত...

অতুলনীয় এ বস্ত্র এমন যার হ'ল একটিই নাম!

এইসব চাঞ্চল্যকর নতুন ফ্যাশন আপনার ন্যই তৈরী

স্যুটিং	শার্টিং	শাড়ী	রু
গোল্ডেন ঈগল	শারমন	সীমা	
অ্যাভন	ইন্টিমেট	শিরাঞ্জিনী	

স্বরাট
কটন মিলস

স্যুটিং • শার্টিং • শাড়ী • ড্রেস মেটিরিয়াল

বিশেষ রচনা

উপন্যাস

বড়গল্প

চিত্রে কাহিনী

গল্প

কবিতা ও ছড়া

ছবি : সুনীল শীল

ঘন, কালো চুলের বাহারের জন্য
বিশেষভাবে তৈরী লিঙ্গার লাক্সারি শ্যাম্পু ।
খুস্‌কি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে ।
অথচ চুল ও ত্বকের একটুও ক্ষতি
করে না ! তাই শিশুদের জন্যও
নিরাপদ । ল্যানোলিনে ভরপুর লিঙ্গার
চুলের পুষ্টি যোগায়, চুলকে
করে রেশম কোমল ।
LINGER®
LUXURY SHAMPOO
CARE COSMETICS. CALCUTTA

দুর্গাপুজার আনন্দঘন দিনগুলি আবার এল।
অমঙ্গলের হোক চির অবসান। আজকের এই শুভক্ষণে
আপনার ত্বকের সম্পূর্ণ পরিচর্যার দায়িত্ব নিতে আবার এল...
বোরো ক্যালেনডুলা
অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম • প্রিক্লিহিট পাউডার
বোরো ক্যালেন্ডুলা-ই একমাত্র অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম যাতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান ক্যালেন্ডুলা ভেষজের নির্যাস। ক্যালেনডুলা আপনার ত্বকের সর্ব্বাঙ্গীণ যত্ন নেয়। আপনার ত্বককে রোদ, শুষ্ক হাওয়া, সাবান বা প্রসাধন সামগ্রীর অনিষ্টকর রুক্ষ প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা করে।
বোরো ক্যালেন্ডুলা অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক ক্রীম
মাখুন, আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখুন
Borocalendula
PRICKLY HEAT POWDER
Borocalendula
Borocalendula
NET CONTENTS 21 GRAMS
(KEEP IN A DARK COOL PLACE)
HL হ্যানিম্যান ল্যাবোরেটরী, কলিকাতা-১২

খেলাধুলো

জ্ঞান-বিজ্ঞান

পরীক্ষার্থীদের জন্য

ধাঁধা, ম্যাজিক, শব্দসন্ধান

প্রচ্ছদ : অলোক ধর
সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত ইংরেজি একাঙ্কী অবলম্বনে

রামরাজত্ব

রচনা-পরিচয় । সেকালে, ১৯০৬-০৮ সালে, শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের শৈশবে, ছাত্রদের মধ্যে আত্মশাসনতন্ত্রের প্রচলন হয় । প্রাক্তন ছাত্রদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, সে-যুগে দিনান্তের সমবেত উপাসনার শেষে বিনোদনপর্ব কিংবা সাহিত্যসভার অধিবেশন হত । রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছাত্রাবাসে এসে গল্প বলতেন, ইন্দ্রিয়চর্চার তালিম দিতেন । হেঁয়ালি নাটক, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন । কখনো বা 'আশ্রম সম্মিলনী' অর্থাৎ ছাত্রদের আত্মশাসন প্রতিষ্ঠানের বিচারসভা বসত । এই বিচারসভা যাতে গুরুগাম্ভীর্য থেকে মুক্ত থাকে এবং সেইসঙ্গে যাতে নূতন শিক্ষার্থীদের ইংরেজিশিক্ষা সরস ও চিত্তাকর্ষক হয় সেই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি নাটিকা রচনা করেন । সেই সময়ের ছাত্রপরিচালক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহে এই ধরনের নাটিকা পাণ্ডুলিপি আকারে অথবা টাইপ-কপি রূপে একাধিক রক্ষিত ছিল । এইরকম একটি টাইপ-কপি অবলম্বনে বর্তমান নাটিকা 'রামরাজত্ব' । মূল নাটিকা ইংরেজিতে লিখিত । এবং অদ্যাবধি অপ্রকাশিত । বাংলায় ভাবানুবাদ করেছেন শ্রী ক্ষিতীশ রায় ।

ছবি : প্রণবেশ মাইতি

মহারাজের বিচারসভা। মহারাজ হবুচন্দ্র সিংহাসনে সমাসীন। কিঙ্কর ব্যজন করিতেছে। পার্শ্বে, ঠিক সিংহাসনের নীচেই শ্বেতশ্মশ্রু মন্ত্রিমহোদয় গবুশর্মা উপবিষ্ট আছেন। বিচারসভার দক্ষিণদিকে সাক্ষীর কাঠগড়া এবং বামে আসামির। দণ্ডধারী নগরপাল গুম্ফে তা দিতেছে। অধিবেশনের সূচনায় বন্দিগণ গান গাহিল। সভাসদগণ সিংহাসনের পিছনে আসীন।

জয় রাজেন্দ্র হবুচন্দ্র প্রবল প্রজাপাল হে
চক্ষুযুগল লাল হে।
জয় কৃষ্ণনগরপতি রাজধর্মে নিয়তমতি,
দখিন করে তরোয়াল
বামে ধৃত ঢাল হে।

সভাসদগণ একযোগে বলিল, "সাধু সাধু!"

হবুচন্দ্র। সভাসদবৃন্দ, এই বিশাল কৃষ্ণনগর রাজ্যের মহারাজাধিরাজ আমি হবুচন্দ্র। এই সভায় উপস্থিত সকলকে—ফরিয়াদি আসামি বাদী বিবাদীকে আমি অভয় দিচ্ছি। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হল রাজধর্ম। আমি এই ধর্মপালনে নিয়ত যত্নবান। আমার এই রাজসভার একমাত্র বিচার সুবিচার। মন্ত্রিমহোদয় গবুশর্মা, আজকের সভার কি কোনো আবেদন-নিবেদন আছে? যদি থাকে তো সত্বর উপস্থিত করুন, কারণ আজ আমার ন-রানীর অন্তঃপুরে চড়িভাতির একটি নিমন্ত্রণ আছে।
গবু। মহারাজ! আজ কেবল দুটি মোকদ্দমা, একটিতে আবেদনকারী ভোলা, অন্যটিতে আসামি গোপেন। প্রহরী, ফরিয়াদিকে যথাস্থানে দাঁড়াতে বলো।
প্রহরী। ফরিয়াদি ভোলা হাজির—
(প্রহরীর হাঁক শুনে ভোলা ফরিয়াদির কাঠগড়ায় দাঁড়াল।)
হবুচন্দ্র। এই যে ভোলা, কী তোমার নালিশ? উকিল কোথায়?
ভোলা (করজোড়ে)। আমিই আমার হয়ে ওকালতি করছি হুজুর। গাফিলতি মাপ করবেন। আমার নালিশ এই যে (কাঁদো-কাঁদো হয়ে রাজার দিকে একটি গাল বাড়িয়ে দিয়ে), রণজিৎ আমার গালে এমনি এক চড় মেরেছে, দেখুন মহারাজ,

এখনো কালশিটের দাগ রয়েছে। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে একেবারে, এই একবার দেখে নিন, হুজুর !

হবুচন্দ্র। তাই তো, তাই তো বটে। পাঁচ আঙুলের দাগ এখনো তো মিলিয়ে যায়নি। কোথায় রণজিৎটা ! প্রহরী, ওকে পিছমোড়া করে বেঁধে এনেছ তো ?

(পিছমোড়া রণজিৎকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল প্রহরী।)

প্রহরী। আজ্ঞে, এই যে হুজুর। আসামি হাজির।

হবুচন্দ্র। রণজিৎ, তোমার কিছু কি বলবার আছে ?

রণজিৎ (ঢোক গিলে)। আজ্ঞে মহারাজ, ও ব্যাটা—থুড়ি—ওই ভোলাটা আমার ভাগের রসগোল্লাটা খেয়ে ফেলেছে। টিফিনের সময় আমি রসগোল্লা খেতে পাইনি, মহারাজ সবাইকে শুধিয়ে দেখুন।

হবুচন্দ্র। শুধোতে হবে না। আমিই জেরা করে বের করে নেব'খন। ব্যাটা ভোলা, সাধুবেশে একটি পাকা চোর ! খেয়েছ তুমি রণজিতের ভাগের রসগোল্লা ? না না না, অ্যাঁ-উঁ চলবে না। খেয়েছ কি খাওনি ? হ্যাঁ কি না ?

ভোলা। আজ্ঞে মহারাজ, সত্যি কথা বলতে কী, ওর রসগোল্লাটা আমি খেয়েছি। ঘাট হয়েছে, আমি স্বীকার করছি। মহারাজ, মাপ করবেন। রসগোল্লা দেখে অবধি জিবে আমার এমনি জল সরতে লাগল, আমি কিছুতেই লোভ সামলাতে পারলাম না হুজুর।

হবুচন্দ্র। কেন, নিজের ভাগের রসগোল্লা পাওনি বুঝি ?

ভোলা। তা পেয়েছিলাম মহারাজ, মিথ্যে কথা বলব না।

হবুচন্দ্র। তবে ?

ভোলা। রাজন্, তাইতেই তো লোভ বেড়ে গেল। আহা, কী মিষ্টি ! এখনো যেন জিবে লেগে আছে। এইরকম অবস্থায়—মহারাজ, ধৃষ্টতা মাপ করবেন, আপনিও ঠিক এমনিই করতেন সে আমি হলপ করে বলতে পারি।

হবুচন্দ্র। সে কথা বিচারের ভার তোমার নয়। বে-আদব ! (ভেঙচি কেটে) ধৃষ্টতা মাপ করবেন ! আদালতের অপমান ! মন্ত্রী… !

গবুচন্দ্র। আজ্ঞে হুজুর, নিশ্চয় ! অপমান বই কী…

হবুচন্দ্র। এর শাস্তি ?

গবুচন্দ্র। ওর গর্দান নিতে হবে মহারাজ। ওর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতে হবে। কাঁকরের উপর ওকে নিল ডাউন থাকতে হবে …।

হবুচন্দ্র। থাক্ থাক্ থাক্। যথেষ্ট হয়েছে। শ্রীমান ভোলা, তোমার প্রতি আমার মায়া হচ্ছে। কিন্তু বিচারকক্ষে সুবিচার করতে হয়, মায়াদয়ায় গলে গেলে তো চলে না। সুতরাং আদালতের এই আদেশ যে, আজ বিকেলে তোমার জলখাবার বাজেয়াপ্ত, আর সন্ধের গল্পের মজলিসে তোমার যাওয়া চলবে না। তোমার কচি বয়েস বিবেচনা করে এই দু-দফা শাস্তি একসঙ্গে একই দিনে হবে—এই হুকুম। (রণজিৎকে লক্ষ করে) রণজিৎ, আইন অমান্য করো কী সাহসে ? আমার রাজ্যে কিনা তুমি বিনা হুকুমে চড় মারো ! এত বড় দুঃসাহস তোমার !

রণজিৎ। মহারাজ, আমি নাচার। কী করব বলুন। রাগের মাথায় মেরেছি, তখন কি আর খেয়াল ছিল !

হবুচন্দ্র। তা বটে। আর ঐ ভোলাটার দোষও ছিল অস্বীকার করা যায় না। এ অবস্থায় আমিও
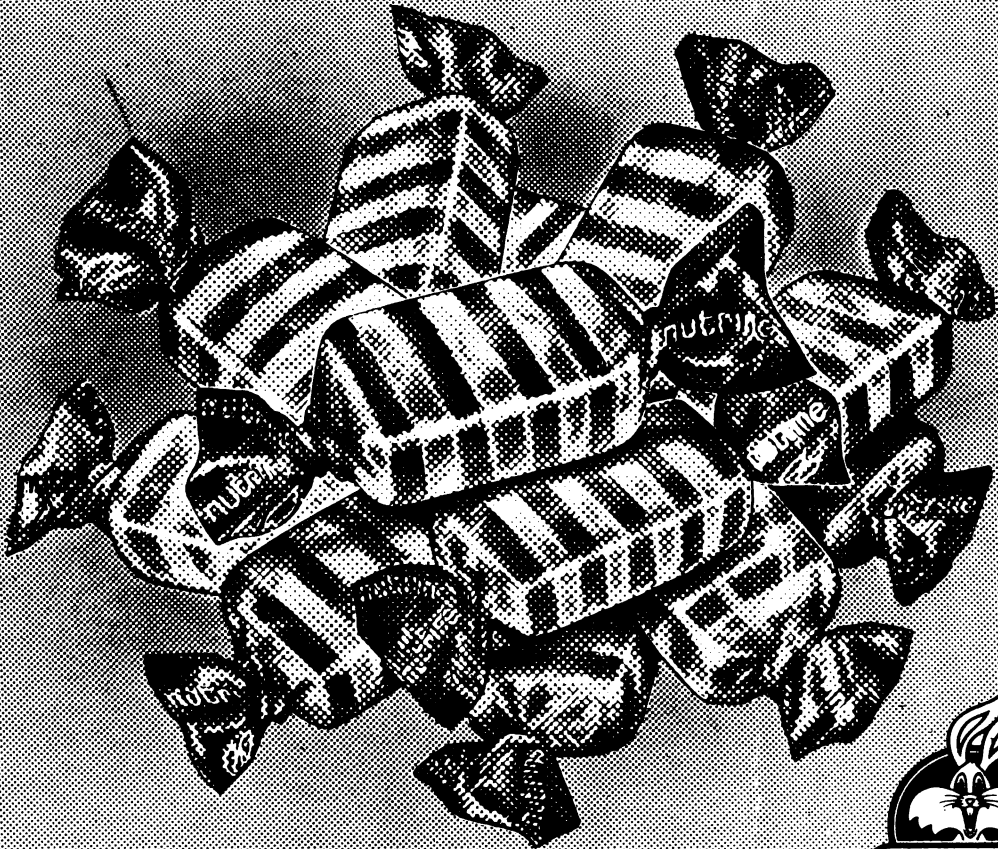
হয়তো রণজিতের মতো কষে চড় বসাতাম। প্রহরী ! রণজিতের বাঁধন খুলে দাও, ও বেকসুর খালাস। (প্রহরীর তথাকরণ) মন্ত্রী, আরো একটা মোকদ্দমা আছে বুঝি ? কে আসামি কে ফরিয়াদি ?

গবুচন্দ্র। আমিই ফরিয়াদি, রাজন ! এ মোকদ্দমায় এক পক্ষ মহারাজ স্বয়ং, অপর পক্ষ গোপেন।

হবুচন্দ্র। বটে ! প্রহরী, তাহলে গোপেনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাও, মামলা শুরু হোক তাহলে।
গবুচন্দ্র। মামলা উপস্থিত করবেন সরকারি উকিল।

উকিল। যেহেতু মহারাজ হবুচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজপথে প্রাতর্ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইলে পথিপার্শ্বে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও গোপেন দুই দুই বার তুমুল শব্দে হাঁচিয়াছে, সেই কারণ আদালত এক্ষণে তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে যে তাহার উপরিউক্ত আচরণ কেন রাজদ্রোহ ও মানহানি বলিয়া পরিগণিত হইবে না !
হবুচন্দ্র। আস্পর্ধা তো কম নয় ! হ্যাঁ...চ্চোঃ ! (হাঁচিয়া) আমার যাত্রাকালে গোপেন হেঁচেছে ? এ তো অসহ্য বে-আদবি !
উকিল। বে-আদবি বৈ কী মহারাজ। এ যে হরিশের বাড়া ! মহারাজের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে গত বৎসর বৈশাখ মাসে হরিশকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। করুণাপরবশ মহারাজ তার প্রাণদণ্ড মকুব করে তাকে এক মাসের জন্য নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। সে একটা মাস আশ্রম সম্মিলনীর ত্রিসীমানায় হরিশকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। গোপেনের অপরাধ হরিশের চাইতে বেশি বই কম নয়।
হবুচন্দ্র (একান্তে)। মন্ত্রিমশাই, হরিশ কী করেছিল ? স্মরণ আছে ?
গবুচন্দ্র। মনে আবার নেই ? সে যে ভয়ঙ্কর বে-আদবি ! মহারাজ যখন হাই তুলেছিলেন লোকটা তুড়ি দিতে ভুলে গিয়েছিল।
হবুচন্দ্র (প্রকাণ্ড হাই তুললেন। সভাস্থ সকলের তুড়ি)। বটে ! এ-রকম আস্পর্ধা ! আচ্ছা গোপেন, তোমার কী বক্তব্য বলো। মনে রেখো, এ অপরাধের ক্ষমা নেই।
গোপেন (করজোড়ে)। মহারাজাধিরাজ, আমি সম্পূর্ণ দোষী, । কিন্তু আমার আর কোনো উপায় ছিল না। মাঘ মাসের শীতে যাত্রা দেখতে গিয়ে এমন ঠাণ্ডা লেগেছিল যে—হ্যাঁ-চ্চোঃ—এই দেখুন, এখনো হাঁচি রয়েছে—হ্যাঁ-চ্চোঃ—প্রতি মুহূর্তে হাঁচি আসছিল। কী করব বলুন। মহারাজ আসছেন শুনেই আমি চৌমাথা ঘুরে বাড়ি ফিরছিলাম। এমনি কপাল, সেই মুহূর্তেই মহারাজের চৌদোলার সামনে পড়ে গেলুম। হুজুর মা-বাপ, এবারটার মতো মাপ করুন, আর কখনো হাঁচে কোন্ হতভাগা ! হ্যাঁ-চ্চোঃ ! হুজুর, হাঁচিও ভগবানের দান—হাই তোলার মতোই। ভেবে দেখুন মহারাজ—প্রাণে মারবেন না...।
হবুচন্দ্র (প্রকাণ্ড হাই তুললেন। সভাস্থ সকলের তুড়ি)। হ্যাঁ, গোপেন তো মন্দ বলেনি। হাইও যা হাঁচিও তাই—একটাতে শব্দ নেই অন্যটাতে আছে। হাই হল নিঃশব্দ হাঁচি আর হাঁচি সশব্দ হাই। হ্যাঁ-চ্চোঃ ! ঠাণ্ডা লাগলে হাঁচবে বৈ কী। মাঘমাসের শীতে রাত জেগে যাত্রা দেখা কি চাট্টিখানি কথা ! প্রহরী, গোপেনের বাঁধন খুলে দাও। আসামি বে-কসুর খালাস। (নেপথ্যে ঘণ্টার শব্দ) ঐ ন-রানীর ঘরে চড়িভাতির ঘণ্টা পড়ল। আজকের মতো আদালত এখানেই মুলতুবি রইল। আমি চললুম...
বন্দিগণের সমবেত সঙ্গীত : জয় রাজেন্দ্র হবুচন্দ্র ইত্যাদি
উপস্থিত সকলে একযোগে : সাধু, সাধু, সাধু !

সঙ্গীসাথীর সঙ্গে জমে হাসিরঙ্গে
ক্লোজ-আপ
আরো তাজা নিঃশ্বাস
আরো সাদা দাঁতের জন্যে
সারা বেলা....হাসি খেলা....
দেখলেই বোঝা যায় ক্লোজ-আপের
আত্মবিশ্বাসে ভরপুর!
ক্লোজ-আপের আসল মাউথওয়াশ
দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয়
সবচেয়ে তাজা। আর অতি-সাদা
করার দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে
আপনার দাঁত হয় সবচেয়ে সাদা!
কাছে, আরো কাছে পেতে — ক্লোজ-আপ
Close-up
Close-up
Super Whitening Toothpaste and Mouthwash in One
একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

আওয়াজি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আওয়াজি কাচ ছাদের কানাচে চৌকস মস্ত—
নিঃসাড়ায় রং বদলায়,
রাতে থাকে নীল, হয় আবার সাদা
সকালে।
ঘুম ভাঙ্গানো আওয়াজি ঘড়ি তাকিয়ে আছেই তাকের উপর—
গোল কাচে ওর রং পড়লেই
গোল বেধে যায়
খট্‌কা লাগে কাঁটায় কাঁটায়,
করে টিক্‌টিক্‌ কলের চাকা,
বলে— কিন্তু কিন্তু ঘোর কাটেনি রাত আছে ঠিক
ঘরবার্‌ চার্‌দিক্‌।
সূর্যোদয়ের ছবির কাচ
রঙ্গীন আছে দিনে রাতে
উল্টোপিঠে ঝুল খেয়ে বলে টিকটিকিটা
কৃটিক
রাত্‌ই ঠিক—সত্যি ঠিক!
টবের গাছ রোদের রং ফুল ফোটায়
ঝিঁজি পোকাটা তলাতে থাকে
জোরে বলে যায়
রাত্তির যায় নিরাত্তির পাহাড়ে।
বাবুর্চিখানায় মুর্গির ছা ঘুমের ঘোরে
দেয়ালা করে ভোরে ভোরে
কিন্তু কিন্তু যাচ্চি যাচ্চি যাচ্চি ঠিক মিছিমিছি।

ছবি : সমীর মণ্ডল

রণ-পা

অন্নদাশঙ্কর রায়

হাইলে হুপি ! হাইলে হুপি !
বলছি শোনো চুপি চুপি ।

মন লাগে না লেখাপড়ায়
মন উড়ে যায় রণ-পা চড়ায় ।

রণ-পা চড়ি খেলার মাঠে
রণ-পা চড়ি পথে ঘাটে ।

রণ-পা চড়ি দিনের আলোয়
রণ-পা চড়ি রাতের কালোয় ।

তাকায় লোকে ডাকাত নাকি !
চেঁচিয়ে করে ডাকাডাকি ।

দৌড়ে কি কেউ ধরতে পারে
ছাড়িয়ে যাই মোটরকারে ।

সেই যে আমার রণ-পা জোড়া
সেই তো আমার রেসের ঘোড়া ।

শোবার আগে খাটের তলে
অশ্ব রাখি আস্তাবলে ।

সকালবেলা জেগে দেখি
অশ্ব কই ! ব্যাপার এ কী !

ধমক লাগান ছোটকাকা
চলবে নাকো রণ-পা রাখা

পুলিশ এসে নিত্য শুধায়
চোরাই মাল আছে কোথায় ?

চোর নাকি রে ! ডাকাত নাকি !
পড়বে হাতে হাতকড়া কি ?

হাইলে হুপি ! হাইলে হুপি !
বলছি শোনো চুপি চুপি ।

ক্ষান্ত হয়ে রণ-পা চড়ায়
মন দিয়েছি লেখাপড়ায় ।

ছবি : সুনীল শীল

আষাঢ়ান্ত ছড়া

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঝমঝমাঝম্ কই বৃষ্টি ?
কই সে বাজের ডাক ?
আকাশে মেঘ জমছে কোথায়
থাকের পরে থাক ?

খাঁ খাঁ করে সারা দিনটা
যেন তপ্ত তাওয়া।
গাছের একটা পাতাও রাতে
নড়ে নাকো হাওয়া।

আকাশ কালো করে যারা
আসরে ঝাঁকে ঝাঁকে
কোথায় তারা হারিয়ে গেল
কেউ কি খবর রাখে ?

কেউ কি তাদের নিয়ে গেছে
চুপিচুপি পথ ভুলিয়ে
ঠগি হাওয়ার ঠক্‌বাজিতে
মিথ্যে আশায় বুক দুলিয়ে ?

শুনিয়েছে কি নতুন এমন
দেশের কথা,
স্বর্গে যেমন, তেমনি যেথায়
মানুষ এবং তরুলতা ?

নেই দুঃখ, নেইকো অভাব
সবাই সুখী সারাটি ক্ষণ !
নেইকো রোগের শোকের বালাই—
জানে না কেউ কান্না কেমন ?

ও মেঘেরা শোনো, শোনো,
বলার কথা শুধুই এই
কোন্ দুঃখে যাবে সেথায়
দুঃখ কোনো যেখানে নেই ?

সবার যেথা সবই আছে
আরো কিছু কেউ-ই না চায়
তোমরা সেথায় যাও বা না যাও
কার কী তাতে আসে বা যায় !

সাগর কি চায় নুনের যোগান ?
মরু কি চায় বালি ?
সুখের স্বর্গে গিয়ে তোমরা
ফালতু হবে খালি !

অনেক দুঃখী আমরা সবাই,
নেই অভাবের অন্ত,
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়
সব কিছু বাড়ন্ত!

এসো আকাশ কালো করে,
সবুজ করে মাঠ,
ঝরোঝরো ধারায় করো
ধন্য মাঠ ও বাট !

আমরা তারই গাঁথি ছড়া
গাই তো তারই গান।
দুঃখী দেশের সবার বড়
তোমরাই মেহ্‌মান।

ছবি : দেবাশিস দেব

প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও.
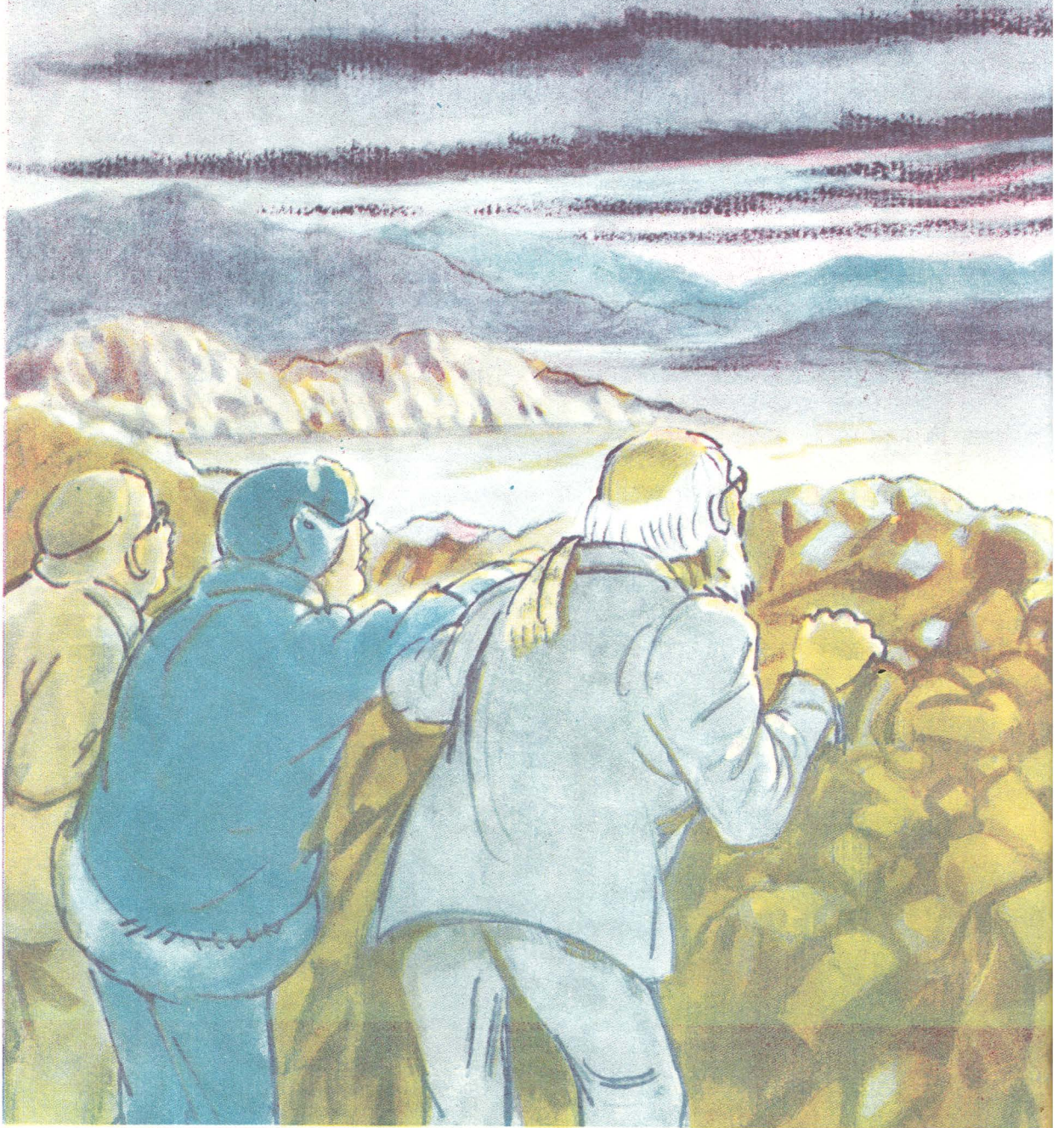
সত্যজিৎ রায়
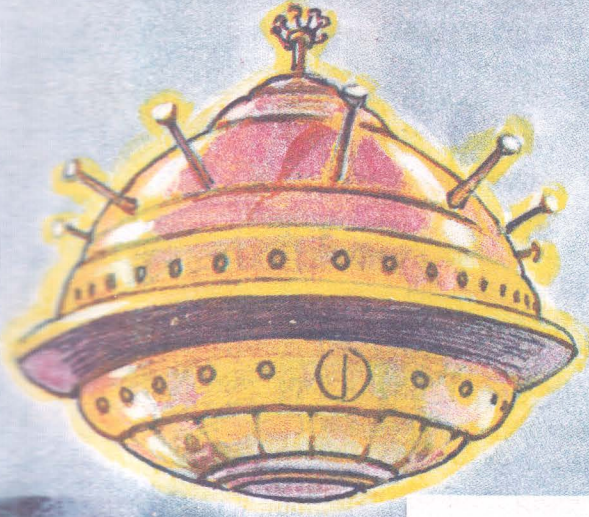
১২ সেপ্টেম্বর

ইউ· এফ· ও· অর্থাৎ আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট অর্থাৎ অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু। এই ইউ· এফ· ও· নিয়ে যে কী মাতামাতি চলেছে গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে! সারা বিশ্বে বহু সমিতি গড়ে উঠেছে যাদের কাজই হল এই ইউ· এফ· ও·-র চর্চা। কতরকম ছবি যে সংগ্রহ হয়েছে এবং কাগজে ছাপানো হয়েছে এই উড়ন্ত বস্তুর, তার হিসেব নেই। এই সব সমিতির সভ্যরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, ভিন্‌গ্রহের প্রাণীরা হরদম রকেটে করে উড়ে এসে পৃথিবীতে হানা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ছবি যা বেরোয় তার শতকরা নব্বই ভাগে দেখা যায় এই রকেটের চেহারা হল একটা উলটোনো মালসার মতো—যার জন্য এর নাম হয়েছে ফ্লাইং সসার। এই একটা কারণেই আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা বুজরুকি বলে মনে হয়। এত রকম গড়ন থাকতে বারবার ওই একই রকম গড়ন হবে কেন?

পৃথিবী থেকে মহাকাশে যে-সব যান পাঠানো হয়েছে, তার একটার চেহারাও ত এরকম নয়! আমি নিজে একবার মিশরে একটা ইউ· এফ· ও·-র সামনে পড়েছিলাম, সে ঘটনা আমি আগেই বলেছি। সেটার আকার ছিল পিরামিডের মতো। তাই উড়ন্ত পিরিচের কথা শুনলেই আমার হাসি পায়।

এত কথা বলার কারণ এই যে, সম্প্রতি দুটি ইউ· এফ· ও·-র ছবি কাগজে বেরিয়েছে—একটি সুইডেনের অসটারমণ্ড শহর থেকে তোলা, আর আরেকটি তোলা খাস লেনিনগ্রাড থেকে। বোঝাই যায় দুটি একই রকেটের ছবি (যদি সেটা রকেট হয়ে থাকে), এবং কোনোটাই দেখতে মালসার মতো নয়। এই বিশেষ বস্তুটির আকৃতি মোটেই সরল নয়, কাজেই তাদের বর্ণনা দেওয়াও সহজ নয়। সেই কারণেই এটাকে মহাকাশযান বলে বিশ্বাস করা কঠিন নয়। সুইডেনের আকাশে বস্তুটি দেখা যায় দোসরা সেপ্টেম্বর, আর লেনিনগ্রাডে তেসরা। ইউরোপের অন্য জায়গা থেকেও দেখা গেছে বলে খবর এসেছে, তবে আর কোথাও থেকে এর ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। বলা বাহুল্য, এই দুটি ছবি বেরোবার ফলে যারা ইউ· এফ· ও·-য় বিশ্বাসী তাদের মধ্যে গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আমি বছর দশেক আগে পর্যন্ত রেডিও-তরঙ্গের সাহায্যে অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে যোগস্থাপনের একটা চেষ্টা চালিয়েছিলাম, এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলাম। একটা বিশেষ কারণে এই কাজ আমাকে বন্ধ করতে হয়। সেই কারণটা বলি।

দশ বছর আগে জিনিভাতে একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হয় যেখানে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল অন্য গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে যোগস্থাপন। আমি সেখানে আমার গবেষণার কথাটা একটা লিখিত বক্তৃতায় প্রকাশ করি। জ্ঞানী-গুণী যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই আমার লেখাটার খুব প্রশংসা করেন। গিরিডিতে বসে আমার সামান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আমি যে এই দুরূহ কাজে এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি এতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। বক্তৃতার পরের দিন সম্মেলনের অতিথিদের জন্য জিনিভা হ্রদে নৌবিহারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। স্টিমারের ডেকে লাঞ্চের জন্য টেবিল পাতা হয়েছে, আমার টেবিলে আমার অনুমতি নিয়ে বসলেন এক ভদ্রলোক। বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন, লম্বা একহারা চেহারা, শীর্ণ বিবর্ণ মুখের সঙ্গে মাথার একরাশ মিশকালো চুলের বৈসাদৃশ্যটা বিশেষ করে চোখে পড়ার মতো। জিগ্যেস করাতে বললেন তাঁর নাম রোডোল্‌ফো কারবোনি, তিনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী, বাড়ি ইটালির মিলান শহরে। পরিচয় দিয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে এক তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ বার করে তিনি বেশ দাপটের সঙ্গে আমার সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। "কী ব্যাপার?" আমি একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করলাম।

"প্রথম পাতায় শিরোনামাটা পড়লেই বুঝতে পারবে," বললেন ডঃ কারবোনি।

পড়ে তাজ্জব বনে গেলাম। আমার বক্তৃতার যা শিরোনামা, এনারও ঠিক তাই।

"আপনিও এই একই কাজ করছেন?" বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। একই কাজ," বললেন ডঃ কারবোনি। "আল্‌ফা সেণ্টরিকে ঘিরে যে সৌরজগৎ, তারই একটি গ্রহের সঙ্গে রেডিও তরঙ্গ মারফত আমি যোগস্থাপন করেছি। তোমার ও আমার সাফল্যে কোনো তফাত নেই। এই লেখা আমার পড়ার কথা ছিল। তুমি আগে পড়লে, দেখলাম আমি পড়লে তোমার কথারই পুনরাবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। তাই আর পড়িনি।"

"কিন্তু কেন? তাতে কি তোমার কৃতিত্ব কিছু কম বলে প্রতিপন্ন হত? বরং আমাদের বক্তব্য আরো জোরদার হত। অন্যগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আরো দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হত।"

"না। তা হত না। লোকে বলত আমি অসদুপায়ে তোমার কৃতিত্বে ভাগ বসানোর চেষ্টা করছি। তোমার বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তোমার কপালের জোর আছে, তাছাড়া তোমার দেশ বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছে, তাই সে-দেশের মানুষ হয়ে তোমার কৃতিত্ব পশ্চিমে আরো বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাকে ত বিশেষ কেউ চেনে না। আমার কথা লোকে শুনবে কেন?"

কথাগুলো বলে তার কাগজ নিয়ে কারবোনি উঠে চলে গেল। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, আমার আগে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেলে কারবোনির আর অভিযোগের কোনো কারণ থাকত না। আমি জানি এই ধরনের ঈর্ষায় মানুষের শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় না; অথচ দুঃখের কথা এই যে, অনেক বাঘা-বাঘা বৈজ্ঞানিকও এই রিপুর বশবর্তী হয়ে অনেক রকম দুষ্কর্ম করে ফেলেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতাতেই আমি অন্তত চারজনের নাম করতে পারি, যাঁদের মাৎসর্যের ঠেলা আমাকে ভোগ করতে হয়েছে।

কারবোনি সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম

না। সেদিনই সন্ধ্যায় আমার বন্ধু জেরেমি সণ্ডার্সের কাছে তার কথা শুনলাম, এবং সেটা শোনার পরেই স্থির করলাম যে, অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে যোগস্থাপনের চেষ্টা আমি বন্ধ করব।

রোডোল্‌ফো কারবোনি যুবাবয়সে ছিল আর্কিটেক্ট। টুরিন শহরে ইটালিয়ান সরকার একবার একটি স্টেডিয়াম তৈরি করার পরিকল্পনা নেন। দেশের সেরা আর্কিটেক্টদের কাছ থেকে নকশা চাওয়া হয়। কারবোনিও একটি নকশা তৈরি করে। তার এক কাকা ছিলেন সরকারের মন্ত্রী-মন্ডলীর একজন। এই খুঁটির জোরে কারবোনি কাজটা পেয়ে যায়। তার নকশা অনুযায়ী স্টেডিয়ামের কাজ খানিকদূর অগ্রসর হবার পরই তাতে ফাটল ধরে। তখন কারবোনিকে বাতিল করে অন্য একজন আর্কিটেক্টকে সে কাজে লাগানো হয়। এর ফলে কারবোনির হয় চরম বদনাম। তাকে স্থাপত্যের পেশা ছাড়তে হয়। দুবার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয়নি। তারপর বছর আষ্টেক তার আর কোনো খবর পাওয়া যায় না। অবশেষে একদিন সে পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সব শুনেটুনে ভদ্রলোকের প্রতি আমার

"আপনিও এই একই কাজ করছেন?" (পৃষ্ঠা ১৮)

কোনো বিষয় পাবেন না, যার বই নেই ওঁর সংগ্রহে (পৃষ্ঠা ২২)

একটা অনুকম্পার ভাব জেগে ওঠে। গবেষণার বিষয়ের অভাব নেই। ওই একটি বিষয় বাদ দিলে আমি দেউলে হয়ে যাব না। আমি কারবোনিকে চিঠি লিখে আমার এই বিশেষ গবেষণাটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই। তার কাজ সে চালিয়ে যেতে পারে, এবং আমাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাববার আর কোনো কারণ নেই।

এই চিঠির কোনো জবাব কারবোনি দেয়নি। স্বভাবতই এই ইউ· এফ· ও·-র আবির্ভাবের পর তার কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল। সে কি এখনো তার গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে? এই রকেটটির সঙ্গে কি সে যোগস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে?

১৭ সেপ্টেম্বর

আজ এক পুরনো বন্ধু এসে হাজির। শ্রীমান নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। এঁর অকস্মাৎ-লব্ধ আশ্চর্য ক্ষমতার কথা আগেই বলেছি। ইনি মাকড়দায় থাকেন, মাস তিনেক অন্তর অন্তর একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করে যান। টেলিপ্যাথি, থটরিডিং, ক্লেয়ারভয়েন্স, অতীতদর্শন, ভবিষ্যৎদর্শন ইত্যাদি অনেক গুণ আছে এঁর। এমন কী, মন-গড়া ঘটনাও ইনি অনেক সময় চোখের সামনে দেখতে পান, এবং মনের জোরে অন্য লোককে দেখিয়ে দিতে পারেন। দুর্লভ ক্ষমতা, বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা এখনও সম্ভব হয়নি, যদিও ভবিষ্যতে হবে বলেই আমার বিশ্বাস। ব্রেজিলে আমাদের চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন নকুড়বাবু, তাই এঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাছাড়া বয়স আমার অর্ধেক হলেও এমন ক্ষমতার জন্য এঁকে সমীহ না করে পারি না। অত্যন্ত অমায়িক মানুষ, দেখে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না, তবে আসলে যে

যথেষ্ট উপস্থিতবুদ্ধি রাখেন তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

সকাল সাড়ে সাতটায় এসে পরম ভক্তিভরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ভদ্রলোক বসলেন আমার সামনের সোফাতে। প্রহ্লাদকে আরেক পেয়ালা কফি আনতে দিয়ে হাত থেকে খবরের কাগজটা রেখে বললাম, "কেমন আছেন বলুন।"

ভদ্রলোক জিভ কেটে বললেন, "আমাকে তুমি করে বললে কিন্তু আমি অনেক বেশি খুশি হব স্যার। আপনি আমার বাপের বয়সী!"

"বেশ ত, তাই হবে'খন। কেমন আছ বলো। কী করছ আজকাল?"

"আছি ভালই স্যার। আজকাল একটু পড়াশুনো করার চেষ্টা করছি। বই যে কিনে পড়ব, সে সামর্থ্য ত নেই, তবে উকিল চিন্তাহরণ ঘোষাল মশাই অনুগ্রহ করে তাঁর লাইব্রেরিটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। বাবা হোমিওপ্যাথি করেন ত? —চিন্তাহরণবাবুর গেঁটেবাত বাবার ওষুধে সেরে গেসল। তাই ভদ্রলোক খুশি হয়ে আমাকে দুপুরবেলাটা ওঁর বাড়িতে গিয়ে বসে বই পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। সাত হাজার বই, স্যার। এমন কোনো বিষয় পাবেন না যার বই নেই ওঁর সংগ্রহে।"

"কী বিষয় পড়ছ?"

"ইতিহাস, ভূগোল, ভ্রমণকাহিনী— এই সবই মেইনলি। হয় কী, মাঝে মাঝে সব ঘটনা দেখতে পাই চোখের সামনে, বুঝতে পারি পুরনো যুগের ঘটনা। ইতিহাস পড়া থাকলে, বা দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে জানা থাকলে হয়ত ঘটনাগুলো চিনতে পারতুম। তাই একটু ওই সব পড়ার চেষ্টা করছি। অবিশ্যি আপনার কাছে এসে বললে হয়ত আপনিও বলে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি ত ব্যস্ত মানুষ, তাই আপনাকে এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে ত্যক্ত করতে মন চায় না।"

"বই পড়ে সুবিধে হচ্ছে?"

"আজ্ঞে খানিকটা হচ্ছে স্যার। দু মাস আগে ৪ঠা শ্রাবণ একটা দৃশ্য দেখলুম। বীভৎস দৃশ্য; একজন দাড়িওয়ালা জোব্বা পরা লোক বসে আছে, তার গায়ে অনেক গয়নাগাটি, তার সামনে এনে রাখা হল একটা থালা। থালার উপর একটা নকশা-করা কাপড়ের ছাউনি, সেটা তুলে দেখানো হল তাতে রাখা আছে একটা মানুষের মুণ্ডু— এই সবেমাত্র কোপ মেরে ধড় থেকে আলগা করা হয়েছে সেটাকে।"

"আওরঙ্গজেবের ঘটনা কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। বই পড়ে তাই ত মনে হয়। আর মুণ্ডুটা তার দাদা দারা শিকোর।"

"হুঁ, আমিও জানি ঘটনাটা।"

"কিন্তু স্যার, সব ঘটনা ত চিনতে পারি না। পরশু যেমন দেখলুম একটা ঘড়ি।"

"ঘড়ি?"

"হ্যাঁ স্যার। তবে যেমন তেমন ঘড়ি নয়। এমন ঘড়ির কোনো ছবিও দেখিনি কোনো বইয়ে।"

আমি বললাম, "আমাকে একবার দেখাতে পারবে দৃশ্যটা?"

"কেন পারব না স্যার? তবে মিনিট তিনেক সময় দিতে হবে।"

"তা বেশ ত, নাও না সময়।"

"আপনি ওই ফুলের টবটার দিকে চেয়ে থাকুন। আমাকে অবিশ্যি একটু চোখ বন্ধ করতে হবে।"

তিন মিনিটও লাগল না। ঘর জুড়ে চোখের সামনে মসলিনের পর্দার ভিতর দিয়ে দেখার মতো ফুটে উঠল যে ছবি, সেটা একাদশ শতাব্দীর চীনের কাইফেং শহরে সু সুং-এর তৈরি ওয়টর ক্লক বা জল-ঘড়ি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সম্রাট শেন জুং-এর স্মৃতির উদ্দেশে এই আশ্চর্য ঘড়ি তৈরি করেছিল সু সুং।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দৃশ্য আবার মিলিয়ে গেল। নকুড়বাবুকে বলাতে ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। —"দেখুন! আপনার কাছে কি সাধে আসি? আপনার এত জ্ঞান, এত ইয়ে!"

এসব কথা অন্যের মুখে আদিখ্যেতা মনে হলেও নকুড়বাবুর মুখে মনে হত না।

এবার কৌতূহলবশত ভদ্রলোককে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। বললাম, "তুমি কাগজ পড়ো?"

নকুড়বাবু জিভ কেটে সলজ্জ হেসে মাথা নেড়ে 'না' বোঝালেন। আমি বললাম, "তাহলে ত ইউ· এফ· ও·-র ব্যাপারটা জানবে না তুমি।"

"কিসের ব্যাপার স্যার?"

আমি ঘরের কোণে টেবিলের উপর রাখা কাগজের স্তূপ থেকে ৩রা সেপ্টেম্বরের কাগজটা বার করে ভদ্রলোককে ইউ· এফ· ও·-র ছবিটা দেখালাম। তাতে প্রতিক্রিয়া হল অদ্ভুত। ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, "আরে, ঠিক এই জিনিসই যে দেখলুম সেদিন!"

"কোথায় দেখলে?"

"দুপুরে ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে একটু

জিরোচ্ছি, সামনে একটা সজনে গাছের ডালে একটা কাঠবিড়ালির দিকে চোখ গেছে, এমন সময় সব কেমন ধোঁয়াটে হয়ে এল। দৃশ্য বদলে গেছে কিনা বুঝতে পারছি না। তারপর ক্রমে বুঝতে পারলুম যে, বালিতে ছেয়ে গেছে চারদিক। তাই ওরকম ধোঁয়াটে ভাব। ক্রমে বালি সরে গেলে পর দেখলুম ওই জিনিসটাকে— পেল্লায় বড়— বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, দুপুরের রোদে ধাতুর তৈরি দেহ থেকে ঝিলিক বেরুচ্ছে।"

"লোকজন কাউকে দেখলে?"

"আজ্ঞে না, কাউকে না। দেখে মনে হল না কেউ যেন আছে তাতে। অবিশ্যি থাকতেও পারে। আর জায়গাটা মরুভূমি বলে মনে হল। পিছনে পাহাড়, তার চুড়োয় বরফ। এ আমার পষ্ট দেখা।"

নকুড়বাবু আরো মিনিট দশেক ছিলেন। যাবার সময় বললেন তাঁর মন বলছে তাঁকে আবার আসতে হবে। —"কিছু মনে করবেন না তিলুবাবু, আপনার বিপদের আশঙ্কা দেখলেই আমার মনটা উতলা হয়ে ওঠে।"

"সেরকম আশঙ্কা দেখছ নাকি এখন?"

"এখন না—তবে ঘরে ঢুকেই আপনাকে দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠেছিল। এক পলকের জন্য যেন দেখলুম আপনি একটা ঘরে বন্দি হয়ে আছেন।"

"তোমার নিজের শরীরের যত্ন নিচ্ছ ত? আমার মতো বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু তোমার যে বিশেষ ক্ষমতা সেটা খুব কম লোকের মধ্যেই থাকে। এই ক্ষমতাটাকে কোনোমতেই নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়।"

"আজ্ঞে সে ত আমিও বুঝতে পারি। তাই নিয়মিত ব্রাহ্মী শাকটা খেয়ে যাচ্ছি।"

"বেশ, কিন্তু যদি কখনো মনে হয় কোনো কারণে ক্ষমতা কমে আসছে, তাহলে আমাকে জানিও। আমার একটা ওষুধে তোমার কাজ দিতে পারে।"

"কী ওষুধ?"

"নাম সেরিব্রিলান্ট্। মাথাটা পরিষ্কার ও অনুভূতিগুলোকে সজাগ রাখে।"

নকুড়বাবু যাবার সময়ও বলে গেলেন যে, কোনো প্রয়োজনে তাঁকে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলেই তিনি চলে আসবেন।

২৫ সেপ্টেম্বর

এক হৃদয়বিদারক সংবাদ আমার মন থেকে ইউ· এফ· ও·-র সমস্ত চিন্তা দূর করে দিয়েছে।

গ্রীক সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পার্থেনন ধ্বংস হয়ে গেছে। কথাটা নিজেই লিখে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। পার্থেনন আর নেই? অ্যাথেনস শহরের মধ্যে অ্যাক্রোপোলিস পাহাড়ের উপর দু হাজার বছর আগের তৈরি এই মর্মরপ্রাসাদ, পুরাকালে যা ছিল দেবী অ্যাথিনার মন্দির, ফিডিয়াস, ইকটিনাস, ক্যালিক্রেটিস ইত্যাদি মহান গ্রীক ভাস্কর ও স্থপতির নাম যার সঙ্গে জড়িত, যার অতুল সৌন্দর্যের সামনে পড়ে মানুষের মন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় ভরে আসে, সেই পার্থেনন আর নেই এটা যেন মন কিছুতেই মানতে চায় না।

অথচ খবরটা সত্যি। রেডিও টেলিভিশন ও খবরের কাগজ মারফত খবরটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সবার মনে হাহাকার তুলেছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘটনাটা ঘটে মাঝরাত্রে। এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দে অ্যাথেন্সবাসীর ঘুম ভেঙে যায়। স্বভাবতই প্রায় সকলেই তাদের ঘরের বাইরে চলে আসে। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া। যারা অ্যাক্রোপোলিসের কাছে থাকে তারা চাঁদের আলোয় দেখে পাহাড়ের উপর তাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীকটি আর নেই। তার জায়গায় পড়ে আছে লক্ষ লক্ষ চূর্ণবিচূর্ণ শ্বেতপাথরের টুকরো। কোনো সন্ত্রাসবাদী দলের পক্ষে শক্তিশালী বিস্ফোরকের সাহায্যে কাজটা সম্ভব কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তবে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

আজ আর কলম সরছে না। লেখা শেষ করি।

২৭ সেপ্টেম্বর

আজ এক অদ্ভুত চিঠিতে মনটা আবার ইউ· এফ· ও·-র দিকে চলে গেছে।

আমার জার্মান বন্ধু উইলহেল্ম ক্রোল সম্প্রতি সরকারি আমন্ত্রণ পেয়ে চীন সফরে গিয়েছিল। সে-খবর সে আমাকে আগেই দিয়েছে। সিংকিয়াং অঞ্চলে বৌদ্ধসভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলো ঘুরে দেখা ছিল এই সফরের একটা প্রধান উদ্দেশ্য। পিকিং থেকে ক্রোল একটি চীন প্রত্নতাত্ত্বিক দলের সঙ্গে চলে যায় সিংকিয়াং। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিখ্যাত পর্যটক স্যর অরেল স্টাইন-ও গিয়েছিলেন সিংকিয়াং-এ। তখন এই অঞ্চলকে বলা হত চীন তুর্কিস্তান। তাকলা-মাকান মরুভূমির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে টুন-হুয়াং শহরের কাছে মাটি খুঁড়ে অরেল

স্টাইন এক আশ্চর্য বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি একটা প্রাচীন পুঁথি থেকে চীন প্রত্নতাত্ত্বিকরা অষ্টম শতাব্দীর আরেকটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের কথা জেনেছেন, যেটা সম্ভবত এই তাকলা-মাকানের মধ্যেই বালির তলায় কোথাও লুকিয়ে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক দল সিংকিয়াং-এর খোটান শহরকে কেন্দ্র করে তাকলা-মাকানে খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্রোল আছে এই দলের সঙ্গে। ক্রোলের এই চিঠিতে অবিশ্যি প্রত্নতত্ত্বের কোনো উল্লেখ নেই। সে লিখেছে—

প্রিয় শঙ্কু,

সম্প্রতি একটি ইউ· এফ· ও·-র কথা তুমি হয়ত কাগজে পড়েছ। এই বিশেষ মহাকাশযানটি এখন আমি যে-অঞ্চলে রয়েছি তারই কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছে বলে আমার বিশ্বাস। গত তিন দিনে দুবার আমি এটিকে আকাশে দেখেছি। শুধু আমি নয়, আমার দলের সকলেই দেখেছে। প্রথমবার পশ্চিম দিকে উড়ে যেতে দেখি। তার পরের দিন পশ্চিম থেকে এসে পুবে তিয়েন শান পাহাড়ের দিকে গিয়ে নীচে নেমে অদৃশ্য হয়ে যায়। আমার মনে হয় এটার অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য। চীন সরকার আমাদের হেলিকপ্টারের বন্দোবস্ত করে দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু আমি একা যেতে চাই না। এই ধরনের অভিযানে আমাদের তিনজনেরই একসঙ্গে থাকা দরকার, যেমন আগেও থেকেছি। তুমি যদি কোনো বিশেষ কাজে ব্যস্ত না থাকো, তাহলে আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাও। আমি সণ্ডার্সকে লিখছি। যত শীঘ্র সম্ভব যাওয়া যায় ততই ভাল। এখানে তোমার নাম শিক্ষিত মহলে অনেকেই জানে। সণ্ডার্সের নাম হয়ত জানে না, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।

তোমার টেলিগ্রামের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি উইলহেল্‌ম ক্রোল

নকুড়বাবুর বর্ণনার কথা মনে পড়ছে। মরুভূমির মধ্যে রকেট, তার পিছনে তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণী। মরুভূমি যদি তাকলা-মাকান হয়, তাহলে তার উত্তরে তিয়েন শান পাহাড়ের মাথায় বরফ থাকা স্বাভাবিক।

অভিযানের সম্ভাবনায় নাড়ী চঞ্চল হয়ে উঠেছে এর মধ্যেই। নকুড়বাবু বলেছিলেন তাঁকে খবর দিতে। আমার মন বলছে তাঁকে আমাদের প্রয়োজন। ক্রোল ব্রেজিলে নকুড়বাবুর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিল, সুতরাং তার আপত্তির কোনো কারণ নেই। সণ্ডার্সকে একটা টেলিগ্রাম ও নকুড় বিশ্বাসকে একখানা পোস্টকার্ড আজই ছেড়ে দেওয়া দরকার।

১ অক্টোবর

সণ্ডার্স যেতে রাজি হয়েছে। সে সোজা লণ্ডন থেকেই যাবার ব্যবস্থা করবে। নকুড়বাবুও অবশ্যই যেতে রাজি, কিন্তু আমার উত্তরে তার চিঠিটা একটু বিশেষ রকমের বলে সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি। সে লিখছে—

শ্রীত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু মহাশয়ের শ্রীচরণে সহস্র প্রণামান্তে নিবেদন—

চীন সফরের প্রাক্কালে আপনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম। অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুটি যে-উদ্দেশ্যে আমাদের পৃথিবীর আকাশে বিচরণ করিতেছে, জানিবেন তাহা আদৌ শুভ নহে। বিশেষত আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তির মনে উহা সবিশেষ পীড়ার উদ্রেক করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি আপনাদের কী ভাবে সাহায্য করিতে পারি তাহা এখনো জানি না। তবে গতবারের ন্যায় এইবারও যদি সহযাত্রীরূপে আপনাদের সঙ্গলাভ করিতে পারি, তবে নিজেকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিব। আপনার আহ্বানে সাড়া না দিবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কবে গিরিডি পঁহুছিতে হইবে জানাইলে সেইরূপ ব্যবস্থা করিব। ইতি

সেবক

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

পৃথিবীর অনেক জায়গাই দেখার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু চীন তুর্কিস্তানে যাওয়া হয়নি। অরেল স্টাইন ও স্বেন হেদিনের বর্ণনা পড়া অবধি জায়গাটা সম্বন্ধে একটা গভীর কৌতূহল রয়েছে। মার্কো পোলোর ভ্রমণকাহিনীতেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর চীন তুর্কিস্তানের বর্ণনা রয়েছে। তখন সেখানে চেঙ্গিস খাঁর ছেলে কুবলা খাঁর রাজত্ব। তাকলা-মাকানের মরুভূমির যে বর্ণনা মার্কো পোলোর লেখায় পাওয়া যায় সে বড় সাংঘাতিক। ইউ· এফ· ও·-র অধিবাসীদের যদি গা ঢাকা দেওয়ার মতলব থেকে থাকে, তাহলে এই মরুভূমির চেয়ে ভাল জায়গা আর তারা পাবে না।

নকুড়বাবুকে বলতে হবে ভালরকম গরম কাপড় সঙ্গে নিতে, কারণ অক্টোবরে ওই অঞ্চলে দারুণ শীত।

৯ অক্টোবর, খোটান

এখানে পৌঁছনোমাত্র সণ্ডার্সের কাছ থেকে শোনা দুটো খবর আমাকে একেবারে মুহ্যমান করে দিয়েছে। সব সময়েই দেখেছি নতুন জায়গায় এলে আমার দেহমন দ্বিগুণ তাজা হয়ে যায়। এবারে এই খবরের জন্য আমার মন ভেঙে গেছে, হাত-পা অবশ হয়ে গেছে।

গত চারদিনের মধ্যে মানুষের আরো দুটি কীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। এক হল প্যারিসের এইফেল টাওয়ার, আর আরেক হল ক্যামবোডিয়ায় অবস্থিত আংকোর ভাটের সুবিশাল বৌদ্ধস্তূপ। আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে এই বৌদ্ধস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

প্যারিসের ঘটনাটা ঘটে অমাবস্যার মাঝরাত্রে। এইফেল টাওয়ার মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ার শব্দে সারা প্যারিস শহরের ঘুম ভেঙে যায়। টাওয়ারের আশেপাশে কোনো বসতি না থাকার ফলে লোক মারা গিয়েছিল শুধু তিনজন রাতজাগা মাতাল। কিন্তু তাদের প্রিয় লৌহস্তম্ভের এই দশা দেখে পরদিন সারা প্যারিস শহর নাকি কান্নায় ভেঙে পড়ে। যেখান থেকে টাওয়ারটি ভেঙেছে, সেই অংশের লোহার অবস্থা দেখে নাকি মনে হয় কোনো প্রচণ্ড শক্তিশালী রশ্মিই এই ধ্বংসের কারণ। অনেকেই অবিশ্যি এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করছে ওই অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তুটিকে, যদিও সেদিন আকাশে মেঘ থাকার ফলে ওই বস্তুটিকে দেখা যায়নি।

আংকোর ভাট ধ্বংস হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্তূপটি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। ঘটনা ঘটেছে বিকেলে। বিশদ বিবরণ এখনো পাওয়া যায়নি ; শুধু এইটুকু জানা গেছে যে, স্তূপ এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত। সমস্ত সৌধটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

চীন প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের ডঃ শেং অতি চমৎকার লোক। বয়স চল্লিশ, তবে দেখে আরো কম মনে হয়। খোটানে থাকার ব্যবস্থা তিনিই করে দিয়েছেন, এবং রকেট অনুসন্ধানের ব্যাপারে তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন বলেছেন। কিন্তু ক্রোল ও সণ্ডার্সকে দেখে মনে হচ্ছে দুজনেই যেন বেশ ভয় পেয়েছে। ডিনারের সময় সণ্ডার্স বলল, "এই ধ্বংসের জন্য যদি ওই রকেট দায়ী হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে অসাধারণ শক্তিশালী কোনো বিস্ফোরক-যন্ত্র রয়েছে ওদের হাতে। সেখানে আমরা কী করতে পারি বলো ? আমাদের দিক থেকে কোনো আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যবস্থা ত সহজ ব্যাপার নয় ! রকেটটা কোথায় রয়েছে সেটাই এখনো জানি না আমরা। অথচ আরো কত কী যে ক্ষতি করতে পারে এরা, তাও জানা নেই। সুতরাং ..."

ক্রোলও সায় দিচ্ছে দেখে আমি আমার মনের ভাবটা প্রকাশ না করে পারলাম না।

"যে সব জিনিস নিয়ে সভ্য মানুষ গর্ব করে, একটির পর একটি করে সে-জিনিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এটাই যদি তোমরা ভেবে থাকো তাহলে আমি তোমাদের দলে নই। আমি তাহলে একাই যাব তাকলা-মাকানে এই শয়তানদের সন্ধানে। আমি জানি না ডঃ শেং কী বলেন, কিন্তু—"

আশ্চর্য এই যে শেং আমার কথায় তাঁর ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, "ফিউড্যাল যুগে শ্রমিকদের খাটিয়ে এইসব সৌধের সৃষ্টি হয়েছে, তা আমি জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের মাহাত্ম্য আমরা অস্বীকার করি না। চীনের সমস্ত প্রাচীন শিল্পের নিদর্শন আমরা সযত্নে রক্ষা করেছি। প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান আমরা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে আরো প্রাচীন শিল্প আমরা আবিষ্কার করতে পারি। এই নৃশংস ধ্বংসকার্য প্রতিরোধ করা আমাদের কর্তব্য।"

গলায় কম্ফর্টার ও গায়ে তুলোর কোটে জবুথবু নকুড়বাবু এবার মুখ খুললেন।

"তিলুবাবু, আপনি কাইগুলি এঁদের ইংরিজি করে বলে দিন যে, আমার মন বলছে আমাদের জয় অনিবার্য। অতএব পিছিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না।"

মাকড়দা থেকে আসার পথে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এক কুলির মাথায় চাপানো স্টিল ট্রাঙ্কের ধাক্কা খেয়ে নকুড়বাবুর মাথার বাঁ দিকে একটা জখম হয়েছে। ক্ষতস্থানে এখন স্টিকিং প্লাস্টার। ভয় ছিল এতে ভদ্রলোকের বিশেষ ক্ষমতা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন তার জোর দিয়ে বলা কথাগুলো শুনে কিঞ্চিৎ ভরসা পেলাম। কিন্তু তার কথা ইংরিজি করে বলাতে দেখলাম ক্রোল ও সণ্ডার্স দুজনেই নকুড়বাবুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিল। বুঝলাম তারা মানতে চাইছে না ভদ্রলোকের কথা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটে হার হল দুই সাহেবের। ঠিক হল কাল সকালেই আমরা হেলিকপ্টারে রওনা দেব উত্তর মুখে তাকলা-মাকান পেরিয়ে তিয়েন শান পর্বতশ্রেণীর উদ্দেশে।

১০ অক্টোবর, সকাল সাড়ে আটটা

তাকলা-মাকানের অন্তহীন বালুতরঙ্গের উপর দিয়ে আমাদের ছয়জন-যাত্রিবাহী হেলিকপটার উড়ে চলেছে। আমি তারই মধ্যে বসে ডায়ারি লিখছি। মার্কো পোলো লিখেছিলেন লম্বালম্বি ভাবে এই মরুভূমি পেরোতে লাগে এক বছর ; আর যেখানে মরুভূমি সবচেয়ে অপ্রশস্ত, সেখানেও পেরোতে লাগে এক মাস। আড়াই হাজার ফুট উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে স্পেনীয় পর্যটক খুব ভুল বলেননি। এই মরুভূমিরই স্থানে স্থানে একেকটি ওয়েসিস বা জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সব শহর—খোটান, কাশগার, ইয়ারকন্দ, চেনচের, আক্‌সু। সিংকিয়াং-এর অধিবাসীরা অধিকাংশই উইগুর শ্রেণীর মুসলমান, তাদের ভাষা তুর্কি। সিংকিয়াং-এর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে হল কাশ্মীর, তারপর আরো পশ্চিমে আফগানিস্তান, তারপর সোভিয়েত রাশিয়া, আর তারপর একেবারে পুবে হল মোঙ্গোলিয়া।

ডঃ শেং আমাদের হেলিকপটারের জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন, আর সেই সঙ্গে চীন-তুর্কিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও তথ্য পরিবেশন করে চলেছেন।

ক্রোল আর সণ্ডার্স যেন আজ অনেকটা স্বাভাবিক। আমি জানতাম দিনের আলোতে এদের মনের সংশয় ও শঙ্কার ভাব অনেকটা কমে যাবে। এরা দুজনেই যে সাহসী ও অ্যাডভেনচার-প্রিয় সেটা ত আমি খুব ভাল করেই জানি। তবে বর্তমান অভিযানের একটা বিশেষ দিক আছে, যেটা মনে খানিকটা ভীতির সঞ্চার করতে পারে, এবং সেটার মূলে হল আমাদের জ্ঞানের অভাব। অন্য গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। এরা কেমন লোক, এদের আদৌ লোক বলা চলে কি না, সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলোর জন্য যদি এরাই দায়ী হয় তাহলে এদের আক্রোশের কারণ কী, মানুষের কীর্তির উপর আক্রোশ মানে কি মানবজাতির উপরেই আক্রোশ—এসব ত কিছুই জানা নেই! তাই একটা দুশ্চিন্তা যে আমার মনেও নেই তা বলব না। সংগ্রামটা কি সত্যিই একেবারে একপেশে হতে চলেছে? আমরা কি জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে পা বাড়ালাম?

নকুড়বাবুকে আজ কিঞ্চিৎ নিস্তেজ বলে মনে হচ্ছে। জিগ্যেস করাতে বললেন ভালই আছেন, মাথার জখমটাও আর কোনো কষ্ট দিচ্ছে না, কিন্তু আমার যেন পুরোপুরি বিশ্বাস হল না। সবচেয়ে চিন্তিত হলাম যখন ভদ্রলোক হঠাৎ একবার প্রশ্ন করলেন, "আমরা কোথায় চলেছি, তিলুবাবু?"

আমি ভদ্রলোকের দিকে অবাক হয়ে মিনিটখানেক চেয়ে থাকতে হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন, "ও হো হো—সেই অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু—তাই ত?"

ভদ্রলোককে এক ডোজ সেরিব্রিলান্ট খাইয়ে দিলে বোধহয় ভাল হবে।

উত্তরে পর্বতশ্রেণী দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার এদিকে দেখা যাচ্ছে একটা বিস্তীর্ণ জলাশয়। শেং বললেন ওটা বাঘশার নোল—অর্থাৎ বাঘশার লেক।

আমরা এই ফাঁকে কফি আর বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি। আমাদের পাইলটটি চৈনিক—নাম সু শি। সে ইংরাজি জানে না, তার হয়ে শেং-কে দোভাষীর কাজ করতে হয়। মাঝে-মাঝে উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া চীনা গান শুনতে পাচ্ছি পাইলটের গদি থেকে, হেলিকপটারের পাখার শব্দ ছাপিয়ে সে গান পৌঁছচ্ছে আমাদের কানে।

ক্রোল সবে পকেট থেকে একটি খুদে চেসবোর্ড বার করেছে সণ্ডার্সের সঙ্গে খেলার মতলবে, এমন সময় শেং উত্তেজিত হয়ে জানালার দিকে হাত বাড়াল।

বিকাল সাড়ে চারটা

আমরা মাটিতে নেমেছি। আমাদের তিনদিকে ঘিরে আছে অনুচ্চ পাথরের ঢিবি। উত্তরে ঢিবির উচ্চতা কোনোখানেই ৬০-৭০ ফুটের বেশি নয়। তারই পিছনে শেং-এর নির্দেশে হেলিকপটার থেকে মাটিতে চারটে গভীর গর্ত দেখতে পেয়ে আমরা নামার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাছ থেকে দেখে বুঝেছি এই চারটে গর্ত যে ইউ এফ ও-র চারটে পায়ার চাপে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পায়ার পরস্পর দূরত্ব থেকে রকেটটিকে বেশ বড় বলেই মনে হয়—একটা বেশ বড়সড় বাড়ির মতো। তবে সেটা যে এখন কোথায় সেটা জানার কোনো উপায় নেই। সু শি একাই হেলিকপটার নিয়ে গিয়েছিল আশপাশের অঞ্চলটা একটু ঘুরে দেখতে, কিন্তু আসা-যাওয়া নিয়ে প্রায় দুশো মাইল পরিক্রমা করেও কিছু দেখতে পায়নি।

আমরা এখন একটা ফুট-পঞ্চাশেক উঁচু পাথুরে ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিয়েছি। জমি এখানে মোটামুটি সমতল, এবং বালি থাকা

সত্ত্বেও বেশ শক্ত। চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে ছোটবড় পাথরের খণ্ড। প্লাস্টিকের তাঁবু রয়েছে আমাদের সঙ্গে; তিনটি তাঁবু হবে ছ'জনের বাসস্থান। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে জানি না, কিন্তু এটা জানি যে, ধৈর্যের প্রয়োজন হবে, আর এটাও জানি যে, সহজে হাল ছাড়া চলবে না।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল—যদি সেই রকেট এখানে এসে নামে, তাহলে তার বাসিন্দাদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করব আমরা, বা তাদের কাছ থেকে কীরকম ব্যবহার আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। ক্রোল বলল, "যারা পার্থেনন ধ্বংস করতে পারে তাদের সঙ্গে কথা বলার আগেই তোমার উচিত তাদের অ্যানাইহিলিন দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা।"

আমার অ্যানাইহিলিন অস্ত্রে যে-কোনো গ্রহের প্রাণীই যে নিমেষের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে এই ভিন্‌গ্রহবাসীরা মানুষের প্রতি কোনো বৈরিভাব পোষণ করে না, এবং এই ধ্বংসের কাজগুলো আসলে তারা করছে না, তার জন্য দায়ী অন্য কেউ। ভারী আশ্চর্য লাগে এই ধ্বংসের ব্যাপারটা। অন্য গ্রহ থেকে কোনো প্রাণী যে ঠিক এমন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসতে পারে, সেটা মন মানতে চায় না কিছুতেই।

সণ্ডার্সকে কথাটা বলতে সে বলল, "যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এসে থাকুক, তাদের সঙ্গে যখন কথা বলা সম্ভব নয় তখন তাদের উদ্দেশ্যটা যে কী সেটা আমরা জানতেও পারব না। সুতরাং রিস্ক নিয়ে কাজ কী? তারা কিছু বলার আগে তাদের শেষ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ ব্যাপারে আমি ক্রোলের সঙ্গে একমত।"

সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু সত্যি করেই যদি অন্য গ্রহের প্রাণী থেকে থাকে এই রকেটে, তাহলে তাদের দর্শন পাওয়ার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করাটা একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমার পক্ষে অসম্ভব। বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটা সুযোগ এসেছে; সেখানে

ধ্বংস যে ইউ· এফ· ও-র পায়ার চাপে হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই (পৃষ্ঠা ২৬)

প্রাণের ভয়ে পিছিয়ে যাব ? সে হতেই পারে না।

শেং-ও দেখলাম আমার সঙ্গে একমত। রকেট চীনের মাটিতে এসে নেমেছে বলে হয়ত তার আগ্রহটা একটু বেশি। সে-ও বলল যে, এরা যদি সত্যিই হিংসাত্মক ভাব নিয়ে আসত, তাহলে এরা মানুষের কীর্তি নষ্ট করার আগে মানুষের উপরেই আক্রমণ চালাত।

নকুড়বাবু এতক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে উঠলেন, "এরা ত নেই!"

"কারা নেই ?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

"অন্য গ্রহের প্রাণী," বললেন নকুড়বাবু।

"তারা নেই মানে ? তারা ছিল না কোনো সময়ই ?"

"ছিল। ইউ· এফ· ও·-তেই ছিল।"

"তাহলে গেল কোথায় ?"

নকুড়বাবু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ থেকে বললেন, "মাটির তলায়।"

"মাটির তলায় ?" ক্রোল ও সণ্ডার্স একসঙ্গে বলে উঠল।

"হ্যাঁ, মাটির তলায়।"

"তবে রকেটে কে আছে ? নাকি রকেটই নেই ?"

"না না—রকেট আছে বৈ কী," বললেন নকুড়বাবু। "তবে তাতে অন্য গ্রহের কোনো প্রাণী নেই।"

"তবে কী আছে ?"

"যন্ত্র আছে।"

"কম্পিউটার ?" শেং জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, কম্পিউটার। আর—"

"আর কী ?"

আমরা চারজনেই উদ্‌গ্রীব।

কিন্তু নকুড়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "হারিয়ে গেল।"

"কী হারিয়ে গেল ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। হারিয়ে গেল। মাথাটা এখনো ঠিক..."

আমি ভদ্রলোককে এক ডোজ সেরিব্রিলান্ট খাইয়েছি আজ দুপুরেই। বুঝলাম সেটা এখনো পুরোপুরি কাজ দেয়নি।

নকুড়বাবু চুপ করে গেলেন।

সূর্য ডুবে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শীতও বেড়েছে।

একটা শব্দ আসছে কোথা থেকে ?

সকলেই শুনেছে সেই শব্দ। আর লেখা চলবে না।

১১ অক্টোবর, রাত ন'টা

রকেটে বন্দী অবস্থা। আমরা পাঁচজনে। সুশি হেলিকপটারের ভিতরেই ঘুমোচ্ছিল ; সে বাইরেই রয়ে গেছে। তার পক্ষে আমাদের মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে কিনা জানি না। আমাদেরও কতক্ষণ এইভাবে থাকতে হবে জানি না। এখন একটা বোকা বনে যাওয়ার অবস্থা ; যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঘটনাটা খুলেই বলি।

কাল সন্ধ্যায় হাজার ভিমরুলের সমবেত গুঞ্জনের মতো শব্দটা পাবার মিনিটখানেকের মধ্যেই মেঘের ভিতর থেকে ইউ. এফ. ও.-র আবির্ভাব হল। যেমন ছবি দেখেছিলাম, আকারে ঠিক তেমনিই, তবে সর্বাঙ্গ থেকে যে স্নিগ্ধ কমলা আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেটা আর খবরের কাগজের সাদা-কালো ছবিতে কী করে ধরা পড়বে ? সামনে থেকে দেখে বুঝতে পারছি চেহারাটা একটা অতিকায় শিরস্ত্রাণের মতো। সর্বাঙ্গে গবাক্ষ বা পোর্টহোলের বুটি, এখান-সেখান থেকে শিং-এর মতো জিনিস বেরিয়ে আছে যেগুলোর নিশ্চয়ই কোনো ব্যবহার আছে। রকেটটা মনে হয় আমাদের দিকেই আসছে ; সম্ভবত যেখানে পায়ের ছাপ রয়েছে সেখানেই নামবে। আমরা জিনিসটাকে দেখছি পাথরের প্রাচীরের উপর দিয়ে সাবধানে মুখ বাড়িয়ে, যতটা সম্ভব নিজেদের অস্তিত্ব জানান না দিয়ে। তবে এটা জানি যে, রকেটের অধিবাসীরা আমাদের দেখতে না পেলেও, হেলিকপটারটা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। তার ফলে তারা কী করতে পারে সেটা জানা নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই রকেটটা যথাস্থানে নামল।

আমরা ক'জন নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রায় দশ মিনিট ধরে রকেটটার দিকে চেয়ে থেকেও ভিন্‌গ্রহের প্রাণীদের দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। এবার তাহলে কী করা ?

শেং-ই প্রথম প্রস্তাব করল রকেটটার দিকে এগিয়ে যাবার। কাঁহাতক অনন্তকাল ধরে এইভাবে চুপচাপ বসে থাকা যায় ? আমার পকেটে অ্যানাইহিলিন আছে, সণ্ডার্স ক্রোল দু'জনের কাছেই রিভলভার রয়েছে। কেবল নকুড়বাবু আর শেং-এর কাছে কোনো অস্ত্র নেই, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। দু'জন সাহেবই ইতিমধ্যে স্নায়ু মজবুত করার জন্য বড়ি খেয়ে নিয়েছে, তাই বোধহয় তারা

সিঁড়ি নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত (পৃষ্ঠা ৩০)
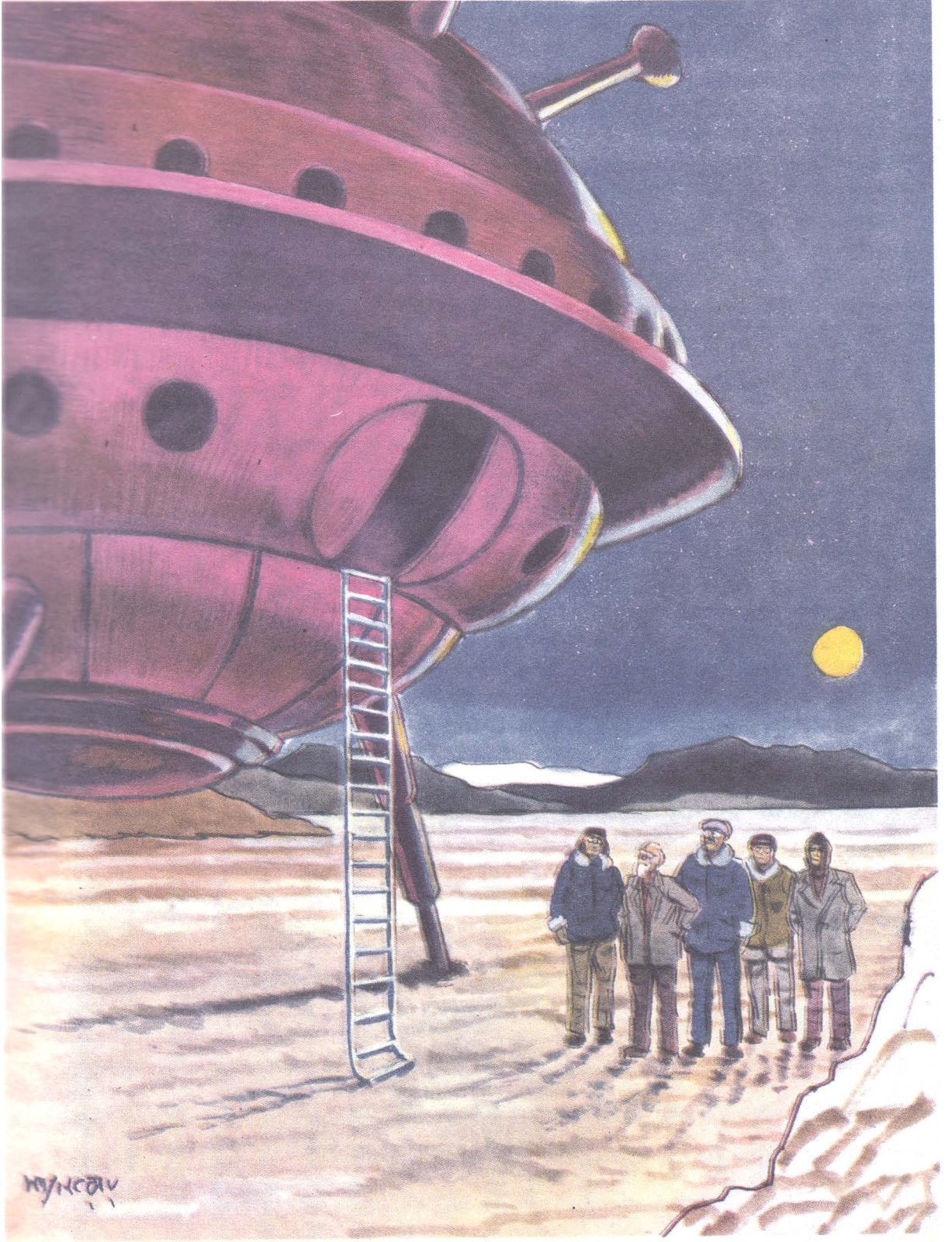
আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

আমরা পাঁচজনে পাথরের গা বেয়ে নেমে সমতল ভূমি দিয়ে চার-পায়ে দাঁড়ানো রকেটটার দিকে অগ্রসর হলাম। কারিগরিতে এই ছিমছাম সুদৃশ্য রকেটের তুলনা নেই, সেটা এখন ভাল করে দেখে বেশ বুঝতে পারছি। টেকনলজির সঙ্গে শিল্পবোধের সমন্বয় না হলে এমন মহাকাশযানের সৃষ্টি হতে পারে না।

নকুড়বাবু হঠাৎ বললেন, "অদ্ভুত জায়গা বেছেছে ইউ. এফ. ও.।"

আমি বললাম, "তা ত বটেই; তাকলা-মাকানের এক প্রান্তে তিয়েন শান পাহাড়ের ধারে—আত্মগোপন করার প্রশস্ত জায়গা।"

"আমি তার জন্য বলছিলাম না।"

"তবে?"

কিন্তু নকুড়বাবু আর কিছু বলার আগেই ক্রোল চাপা গলায় একটা মন্তব্য করল।

"দ্য ডোর ইজ ওপ্‌ন।"

সত্যিই ত! রকেটের এক পাশে একটা প্রবেশদ্বার খোলা রয়েছে, এবং তার থেকে অ্যালুমিনিয়াম জাতীয় কোনো ধাতুর তৈরি একটা সিঁড়ি নেমে এসেছে মাটি পর্যন্ত।

"চলুন, যাবেন না?"

এবার কথাটা বললেন নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। তার দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠা বা ভয় কোনোটারই লক্ষণ দেখলাম না।

"ভেতরে যাওয়া নিরাপদ কি?"

ভদ্রলোককে প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

"আপদ নিরাপদের কথা কি আসছে, স্যর?" পালটা প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। "আমাদের আসার কারণই ত হল ইউ. এফ. ও.-র অনুসন্ধান। সেই ইউ. এফ. ও.-র সামনে দাঁড়িয়ে দরজা খোলা পেয়েও ভেতরে ঢুকব না?"

এবার শেং বলল, "লেটস গো ইন।"

সণ্ডার্স ও ক্রোল মাথা নেড়ে সায় দেওয়াতে পাঁচজনে এগিয়ে গেলাম—আমার হাতে অ্যানাইহিলিন, দুই সাহেবের হাতে দুটি রিভলভার।

পথপ্রদর্শক হয়ে আমিই প্রথম সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম।

একে একে পাঁচজন সিঁড়ি দিয়ে উঠে রকেটের ভিতর একটা গোল কামরায় প্রবেশ করলাম।

ঘরের বাইরে রাত হয়ে এসেছে। কিন্তু ঘরের ভিতরে একটা মোলায়েম নীল আলো, যদিও সেটার উৎস কোথায় বুঝতে পারলাম না। যেদিক দিয়ে ঢুকেছি তার বিপরীত দিকে একটা গোল জানালা রয়েছে, যেটা কাচ বা প্লাস্টিক জাতীয় কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি। এ ছাড়া ঘরের বাঁয়ে ও ডাইনে দুটো গোল দরজা রয়েছে; দুটোই বন্ধ। আসবাব বলতে মেঝেতে খানদশেক টুল জাতীয় জিনিস, যেগুলো বেশ মজবুত অথচ স্বচ্ছ কোনো পদার্থের তৈরি। এ ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই। এ রকেটে কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী আছে কিনা সেটা এ ঘর থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই।

রকেট কি তাহলে রোবট বা কম্পিউটার দ্বারা চালিত? যন্ত্রপাতি নিশ্চয়ই দু-পাশের দুটো ঘরে রয়েছে, কারণ এ ঘরে কিছুই নেই।

আমরা অবাক হয়ে এদিক-ওদিক দেখছি, এমন সময় একটা শব্দ পেয়ে ঘুরে দেখি প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে।

ক্রোল তৎক্ষণাৎ এক লাফে দরজাটার কাছে গিয়ে সেটার হাতল ধরে প্রাণপণে টানাটানি করেও কোনো ফল হল না। ও দরজা ওইভাবে খোলা যাবে না। ওর জন্য নিশ্চয়ই একটা সুইচ বা বোতামের বন্দোবস্ত আছে, এবং সে জিনিস এ ঘরে নেই। যিনি টিপেছেন সে বোতাম, তিনি আমাদের বন্দি করার উদ্দেশ্যেই টিপেছেন।

"ওয়েলকাম, জেন্টলমেন!"

হঠাৎ মানুষের গলায় ইংরিজিভাষা শুনে আমরা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম। শেং বাঁ দিকের দেয়ালের উপর দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে।

সেখানে একটা গোল গর্ত, তার মধ্যে দিয়েই এসেছে কণ্ঠস্বর। আমার বুকের ভিতর হৃৎস্পন্দনের মাত্রা বেড়ে গেছে এক ধাক্কায় অনেকখানি।

হঠাৎ চেনা লাগল কেন গলার স্বরটা?

আবার কথা এল পাশের ঘর থেকে।

"অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। তোমরা একটু অপেক্ষা করো। তোমাদের ঘরে খোলা জানালা না থাকলেও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো কষ্ট হবে না, অক্সিজেনের অভাব ঘটবে না। তবে ধূমপান নিষিদ্ধ। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তোমরা অনুভব করবে না ওই ঘরে। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

কথা বন্ধ হল। কই, এঁকে ত শত্রু বলে মনে হচ্ছে না মোটেই! আর ইনি যদি মানুষ হন, তার মানে কি অন্য গ্রহ থেকে আসছে না এই রকেট?

আর ভাবতে পারলাম না। সণ্ডার্স ও ক্রোল টুলে বসে কপালের ঘাম মুছছে। তাদের

দেখাদেখি আমরা বাকি তিনজনও বসে পড়লাম।

আবার নৈঃশব্দ্য। আমরা যে যার পকেটে পুরে ফেলেছি আমাদের আগ্নেয়াস্ত্র।

আমি ডায়ারি লেখা শুরু করলাম।

কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এইভাবে ? কী আছে আমাদের কপালে ?

১২ অক্টোবর, সন্ধ্যা ৬টা

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র আলফা সেনটরির একটি গ্রহ থেকে আসা এই ইউ. এফ. ও.-কে (এখন আর আমাদের অজ্ঞাত নয়) ঘিরে আমাদের যে লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হল, সেটা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করি।

প্রায় দেড় ঘণ্টা গোল ঘরে বসে থাকার পর আবার শুনতে পেলাম পরিচিত কণ্ঠস্বর।

“লিস্‌ন, জেনটলমেন। তোমরা আমাকে না দেখতে পেলেও, আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। এই দৃষ্টি সাধারণ চোখের দৃষ্টি নয়। এই রকেটে বিশেষ বিশেষ পর্যবেক্ষণের জন্য বিশেষ বিশেষ যন্ত্র রয়েছে। সেই যন্ত্রের সাহায্যে দেখছি তোমাদের তিনজনের পকেটে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। সেই তিনটি অস্ত্র পকেট থেকে বার করে তোমাদের সামনের দেয়ালের উপরদিকে যে গোল গর্তটি রয়েছে তার মধ্যে ফেলে দাও। তারপর বাকি কথা হবে।”

আমি কথা শুনেই অ্যানাইহিলিনটা বার করেছি পকেট থেকে, কিন্তু ক্রোল ও সণ্ডার্স দেখছি চুপচাপ বসেই আছে। আমি আজ্ঞা

মনে হচ্ছে এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে এল (পৃষ্ঠা ৩৩)

কনট্রোল প্যানেলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল (পৃষ্ঠা ৩৭)

পালনের জন্য ইশারা করলাম তাদের দিকে, তবুও তারা নড়ে না।

"আই অ্যাম ওয়েটিং," বলে উঠল গম্‌গমে কণ্ঠস্বর।

আমি আবার ইশারা করলাম। তাতে সণ্ডার্স চাপা গলায় অসহিষ্ণুভাবে বলল, "একটা বুজরুককে অত ভয় পাবার কী আছে? দিস ইজ নো ইউ. এফ. ও.!"

ঘরের আবহাওয়ায় হঠাৎ একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে এল। এ রকম হল কেন? সণ্ডার্স ও ক্রোলের হাত চলে গেছে তাদের বুকের ওপর। কোমর থেকে দুমড়ে গেছে শরীর। নকুড়বাবু হাঁসফাঁস করছেন। শেং-এর জিভ বেরিয়ে গেছে, মুখ বেঁকে গেছে শ্বাসকষ্টে। সর্বনাশ! শেষে কি এইভাবে—?

"ফেলে দাও আগ্নেয়াস্ত্র! মূর্খের মতো জিদ কোরো না! তোমাদের মরণবাঁচন এখন আমার হাতে!"

"দিয়ে দিন! দিয়ে দিন!" রুদ্ধকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন নকুড়বাবু।

আমি আগেই উঠে অ্যানাইহিলিনটা পকেট থেকে বার করে এগিয়ে গেছি। এবার সাহেব দুটিও কোনো রকমে উঠে এগিয়ে গিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বার করে গর্তে ফেলে দিলেন। তারপর আমি ফেললাম আমার অ্যানাইহিলিন।

ঘরের আবহাওয়া তৎক্ষণাৎ আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

কিছুক্ষণ কথা নেই। আমরা আবার দম ফেলতে পারছি, আবার যে-যার জায়গায় এসে বসেছি।

এবার যেদিকে গোল গর্ত, সেদিকেরই গোল দরজাটা দু' ভাগ হয়ে দু'পাশে সরে গেল, আর তার ফলে যে গোল গহ্বরের সৃষ্টি হল তার মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখেছি দশ বছর আগে জিনিভার সেই স্টিমারে।

ইটালির পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ রোডোল্‌ফো কারবোনি।

সণ্ডার্স ও ক্রোল দু'জনেই এঁকে এককালে চিনত, দু'জনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিস্ময়সূচক শব্দ।

কারবোনি এখন আরো বিবর্ণ, আরো কৃশ। তার মিশকালো চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু তার দৃষ্টিতে তখন যে নৈরাশ্যের ভাব দেখেছিলাম, তার বদলে এখন দেখছি এক আশ্চর্য দীপ্তি—যেন সে এক অতুল শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী, কাউকে সে তোয়াক্কা করে না।

"ওয়েল, জেনটলমেন," দরজার মুখে দাঁড়িয়ে শুরু করল কারবোনি, "প্রথমেই বলে রাখি যে আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে, কাজেই আমার গায়ে হাত তুলতে এসো না।"

আমি সণ্ডার্সের দিকে দেখছিলাম, কারণ আমি জানি সে রগচটা মানুষ; এর আগে বার কয়েক তার মাথা গরম হতে দেখেছি। এখন সে দাঁতে দাঁত চেপে রয়েছে। হাত তোলার নিষেধটা মানতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

এবার আমি কারবোনিকে একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

"এই রকেটের মালিক কি তুমি?"

"আপাতত আমি।"

"আপাতত মানে? আগে কে ছিল?"

"যাদের সঙ্গে আমি আজ পনের বছর ধরে যোগাযোগ করে আসছি, তারা। এককালে তুমিও করেছিলে। আলফা সেনটরির একটি গ্রহের প্রাণী। তারা যে আসছে, সে-কথা তারা আমায় জানিয়েছিল। আমি তাদের জন্য প্রস্তুত ছিলাম।"

"কী ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছিল তোমাদের মধ্যে?"

"প্রথমে গাণিতিক ভাষায়, পরে মুদ্রার সাহায্যে। ইচ্ছা ছিল ইংরাজি অথবা ইটালিয়ানটা শিখিয়ে নেব, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না।"

"কেন?"

"এখানে আসার ক'দিন পরেই তারা অসুখে পড়ে।"

"অসুখ?"

"হ্যাঁ। ফ্লু। পৃথিবীর ভাইরাসের হাত থেকে তারা রেহাই পায়নি। তিনজন ছিল, তিনজনই মারা যায়। অবিশ্যি আমার কাছে ওষুধ ছিল, কিন্তু সে ওষুধ আমি কাজে লাগাইনি।"

"কেন?" আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"কারণ তাদের বাঁচতে দেবার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। তারা ছিল মূর্খ।"

"মূর্খ?"

"টেকনলজির দিক দিয়ে নয়। সেদিক দিয়ে তারা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর। কিন্তু তারা এসেছিল মানুষের বন্ধু হিসেবে, মানুষের উপকার করতে। আমি তাদের মনোভাবের সমর্থন করতে পারিনি। অবিশ্যি তারা কিছু করতে পারার আগেই তাদের মৃত্যু হয়। তাকলা-মাকানের বালির নীচে তিনজনেরই সমাধির ব্যবস্থা করি আমি। মৃত্যুর আগে এই রকেটটা চালানোর প্রক্রিয়া

তারা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। জলের মতো সোজা। সমস্তই কম্পিউটারের সাহায্যে চলে। শুধু বোতাম টেপার ব্যাপার। একটা রোবটও আছে, তবে সেটা এখন নিষ্ক্রিয়। তাকে কী করে চালাতে হয় জানি না, আর সেটার প্রয়োজনও নেই। কারণ আমিই এখন সর্বেসর্বা।"

"রকেটের যন্ত্রপাতিগুলো একবার দেখতে পারি কি?" আমি প্রশ্ন করলাম। "বুঝতেই পারছ বৈজ্ঞানিক হিসেবে আমাদের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল রয়েছে।"

"এসো আমার সঙ্গে।"

আমরা পাঁচজনেই গোল দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলাম।

ঘরটা প্রকাণ্ড। তালে তালে আঘাতের একটা শব্দ পাশের ঘর থেকেই পাচ্ছিলাম, এ-ঘরে এসে সেটা আরো স্পষ্ট হল। দূর থেকে জয়ঢাক পেটার শব্দ যে রকম শোনায়, কতকটা সেই রকম। যেদিক দিয়ে ঢুকলাম তার বিপরীত দিকে একটা বেশ বড় স্বচ্ছ জানালা রয়েছে; বুঝলাম এটাই সামনের দিক।

জানালার দুদিকে রয়েছে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল। তাতে সারি সারি সুইচ বা বোতাম রয়েছে, যার পাশে-পাশে বিভিন্ন রকম জ্যামিতিক নকশা থেকে বোঝা যায় কোনটার কী ব্যবহার। ঘরের ডান কোণে স্বচ্ছ উপাদানে তৈরি একটা মস্তকহীন মূর্তি রয়েছে, সেটাই যে রোবট তাতে সন্দেহ নেই। রোবটের দু-পাশে ঝোলা দুটি হাতে ছ'টা করে আঙুল, চোখের বদলে বুকের কাছে রয়েছে একটা হলুদ লেন্স। এছাড়া আর ঘরে বিশেষ কিছু নেই। সমস্ত রকেটটার মধ্যেই একটা অনাড়ম্বর সাদাসিধে ভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—এই রকেট কারবোনি কীভাবে ব্যবহার করতে চায়?

ঘরে ফিরে এসে প্রশ্নটা করলাম তাকে।

কারবোনি কথাটার উত্তর দিল একটা ক্রূর হাসি হেসে।

"আপাতত পৃথিবীতে কিছু কাজ আছে। সেগুলো সেরে পাড়ি দেব মহাকাশে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডি পেরিয়ে গেলে রকেট চলবে আলোক-তরঙ্গের গতিতে—অর্থাৎ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। যে গ্রহ থেকে এই রকেট এসেছে সেখানে পৌঁছাতে লাগবে দশ বছর।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী! পৃথিবীর উপর ত কোনো আকর্ষণ নেই আমার, মৃত্যুভয়ও নেই। দুবার এর আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি। পৃথিবীর মায়া অনেকদিন আগেই কাটিয়েছি। কাজেই যাত্রাপথেও যদি আমার মৃত্যু ঘটে, তাহলেও কোনো খেদ নেই।"

"পৃথিবীতে যে কাজের কথা বলছ সেটা কী?"

"তার একটা কাজ তোমাদের আজকেই করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা জায়গায় বোসো, আমি রকেটটাকে চালু করে দিই।"

আমরা বসলাম। কারবোনি পাশের ঘরে গিয়ে আবার গোল দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আধ মিনিটের মধ্যে আমরা শূন্যে উঠতে শুরু করলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম হুহু করে তাকলা-মাকান মরুভূমি ও তিয়েন শান পর্বতশ্রেণীর ব্যাপ্তি বেড়ে গেল, আর তারপর তাদের পিছনে ফেলে দিয়ে আমরা চললাম পশ্চিম দিকে।

রকেটের গতি আন্দাজ করা সহজ নয়, কিন্তু এত উপর থেকেও যখন দেখছি পৃথিবীর মাটি দ্রুত সরে যাচ্ছে নীচ দিয়ে, তখন গতি যে সাধারণ জেট প্লেনের চেয়ে অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই।

ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে ন'টা। পৌনে দশটার মধ্যে রকেট এত উঁচুতে উঠে পড়ল যে, পৃথিবীর কোন্ অংশ দিয়ে চলেছি আমরা, সেটা বোঝার আর কোনো উপায় রইল না।

অন্যদের কথা জানি না, একভাবে একটানা উড়ে চলার জন্য আমার একটা তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল; হঠাৎ কানে তালা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমরা নামতে শুরু করেছি।

মিনিটখানেকের মধ্যেই মেঘের আবরণ ভেদ করে দেখতে পেলাম আমরা বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। কোথাকার পর্বতশ্রেণী এটা?

আমার মনের প্রশ্নের জবাব এল দেয়ালের গোল গর্তটার ভিতর দিয়ে।

"নীচে যে বরফ দেখছ সেটা আল্‌পসের।"

"কোথায় যাচ্ছ আমাদের নিয়ে?" অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল ক্রোল।

উত্তর এল—"আমার দেশে"।

"ইটালি?"

আর কোনো কথা নেই।

পাহাড় পেরিয়ে রকেট ধীরে ধীরে নীচে নামতে শুরু করেছে। শহরের আলো দেখা যাচ্ছে নীচে। ইতস্তত ছড়িয়ে দেওয়া আলোকবিন্দুর সমষ্টিই জানিয়ে দিচ্ছে শহরের অবস্থিতি। একটা আলোর ঝাঁক মিলিয়ে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আরেকটা আলোর ঝাঁক এসে পড়ছে।

এবার রকেটের গতি কমল, আর সেই সঙ্গে মাটির দূরত্বও কমে এল। একটা প্রকাণ্ড শহরের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। শহরের পশ্চিমে জলাশয়। ভূমধ্যসাগর কি ?

"রোম !" চেঁচিয়ে উঠল সণ্ডার্স। "ওই যে কলিসিয়াম !"

হ্যাঁ। এখন স্পষ্টই চিনতে পারছি রোম শহরকে। আমরা পাঁচজনেই এখন জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

এবার শোনা গেল কারবোনির উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

"শোনো। পৃথিবীর তথাকথিত সভ্য মানুষ আমার কী সর্বনাশ করেছিল শোনো। আমার নকশায় তৈরি টুরিনের স্টেডিয়াম কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ আর্কিটেক্টের ষড়যন্ত্রের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। দোষটা পড়েছিল আমার ঘাড়ে। আমার মানসম্মান ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল তার ফলে। সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ আমাকে করে দিয়েছে এই ভিন্‌গ্রহের রকেট। কীভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছি সেটা তোমরা আজ চোখের সামনে দেখতে পাবে।"

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পার্থেনন, এইফেল টাওয়ার, আংকোর ভাট—এই সব ধ্বংসের জন্য তাহলে এই কারবোনই দায়ী ! কিন্তু আজ কী ধ্বংস করতে চলেছে সে ?

সেটার উত্তর পেয়ে গেলাম কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই।

রকেট এসে পড়েছে বিশ্ববিখ্যাত সেণ্ট পিটার্স গির্জার উপরে। এই গির্জার ভিতরে রয়েছে রেনেসাঁস যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

"মাই গড ! ডু সামথিং !" চেঁচিয়ে উঠল সণ্ডার্স। ক্রোল জার্মান ভাষায় গাল দিতে শুরু করেছে এই উন্মাদের উদ্দেশে। শেং মুহ্যমান। নকুড়বাবুর অলৌকিক ক্ষমতা আজ স্তব্ধ।

আমি শেষ চেষ্টায় চেঁচিয়ে প্রশ্ন করলাম—

"মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোকে সম্মান করতে জানো না তুমি ? তুমি এতই নীচ, এত হীন ?"

"কোন কীর্তির কথা বলছ তুমি ? বিজ্ঞানের কীর্তি ছাড়া আর কোনো কীর্তিতে বিশ্বাস করি না আমি।"

"কিন্তু তুমি যে বললে মানুষের বন্ধু হিসেবে এসেছিল এই ভিন্ গ্রহের প্রাণীরা—তবে তাদের রকেটে এমন ভয়ংকর অস্ত্র থাকবে কেন ?"

একটা অট্টহাস্য শোনা গেল পাশের ঘর থেকে।

"এরা কি আর সেই উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র লাগিয়েছিল রকেটে ? মহাকাশে অ্যাস্টারয়েডের সামনে পড়লে যাতে সেগুলিকে চূর্ণ করে রকেট পথ করে নিতে পারে তাই এই অস্ত্র। আমি শুধু এটাকে একটু অন্যভাবে কাজে লাগাচ্ছি !"

রকেটের মুখ ঘুরল সেণ্ট পিটার্স গির্জার দিকে। রশ্মি আমরা চোখেও দেখতে পেলাম না ; শুধু দেখলাম জ্যোৎস্নাধৌত গির্জা হঠাৎ শতসহস্র খণ্ডে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল সেণ্ট পিটার্সেরই চাতালের উপর।

ক্রোল রাগে কাঁপছে, তাই তার কথাগুলো বেরোল একটু অসংলগ্নভাবে।

"তু-তুমি কি জানো যে এই রকেটকে ঠিক ওইভাবেই চূর্ণ করার মতো অস্ত্র আছে মানুষের হাতে ?"

উত্তরে আবার সেই উন্মাদ হাসি।

"সে রকম অস্ত্র এই রকেটে প্রয়োগ করলে কী হবে তুমি জানো না ? তোমাদের কেন এখানে আসতে দিয়েছি জানো না ? তোমার সঙ্গের ওই চীন আর ভারতীয় ভদ্রলোকটির কথা জানি না। কিন্তু পৃথিবীর তিনজন সেরা বৈজ্ঞানিক এখানে আছে জানলে কি আর এই রকেট ধ্বংস করার কোনো প্রশ্ন ওঠে ? তাহলে যে তোমরাও শেষ হয়ে যাবে !"

কারবোনি যে মোক্ষম শয়তানি চাল চেলেছে সেটা স্বীকার না করে উপায় নেই। ক্রোল সণ্ডার্স দু'জনেরই যে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে কারবোনির কথা, সেটা তাদের দেখেই বুঝতে পারছি।

ইতিমধ্যে রকেট তার ধ্বংসের কাজ শেষ করে আবার উপরে উঠতে শুরু করেছে। তার মুখ ঘুরে গেছে উলটো দিকে।

"এবার শঙ্কুকে একটা কথা বলতে চাই," বলল কারবোনি। "এবারে তোমারই দেশের দিকে যাবে আমার রকেট। ভারতের সবচেয়ে গর্বের বস্তু কোনটি জিগ্যেস করলে তোমাদের শতকরা আশি ভাগ লোকই এক উত্তর দেবে। সেটা যে কী সেটা আশা করি তোমাকে বলে দিতে হবে না। প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার লোক সেই জিনিসটি দেখতে আসে তোমাদের দেশে।"

তাজমহল ? কারবোনি কি তাজমহলের কথা বলছে ? সে কি শাজাহানের অতুল কীর্তি ধ্বংস করতে চলেছে ?

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম

না। গলা তোলার অভ্যাস আমার নেই, কিন্তু এবারে তুলতেই হল।

"তোমার ধ্বংসের কি শেষ নেই, কারবোনি ? যে পৃথিবীর মাটিতে মানুষ হয়েছ, তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলোর প্রতি কি তোমার একটুও মমতা নেই ? শিল্পের কি কোনো মূল্য নেই তোমার কাছে ?"

"শুধু আমার কাছে কেন শঙ্কু ? শিল্পের কোনো মূল্যই নেই। কারুর কাছেই থাকার কথা নয়। মানুষের কোন উপকারে আসে শিল্প ? তাজমহল রইল কি গেল তাতে কার কী এসে যায় ? সেন্ট পিটার্সের কী মূল্য ? পার্থেননের কী মূল্য ? অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকার কী মূল্য ?"

এই অমানুষের সঙ্গে কী তর্ক করব ? অথচ লোকটা না বুঝলেও যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হতে চলেছে সে ত বুঝতে পারছি।"

"তিলুবাবু—"

নকুড়চন্দ্রের দিকে এতক্ষণ দৃষ্টি দিইনি, কারণ মনে সে অবস্থা ছিল না। এবার চেয়ে দেখি তাঁকে ভারী নিস্তেজ মনে হচ্ছে।

"কী হল ?" জিগ্যেস করলাম ভদ্রলোককে।

"ওই ওষুধটা আরেক ডোজ দেবেন কি ?"

"জ্বর জ্বর লাগছে নাকি ?"

"না।"

"তবে ?"

"মাথা খেলছে না।"

ওষুধ আমার সঙ্গেই ছিল। দিয়েছিলাম ভদ্রলোককে আরেক ডোজ সেরিব্রিলান্ট। কিন্তু এই অবস্থায় ইনি আর কী করতে পারেন ? ভদ্রলোক ঢোক গিলে একটা আঃ শব্দ করে চোখ বুজলেন।

রকেট চলেছে পুবে। দ্বাদশীর চাঁদ এখন ঠিক মাথার উপর। ঘড়িতে বলছে পৌনে একটা। ক্রোল ও সণ্ডার্স দু'জনেই নির্বাক। চোখের সামনে সেন্ট পিটার্স ধ্বংস হতে দেখে তাদের মনের যে কী অবস্থা হয়েছে সে ত বুঝতেই পারছি। শেং বিড়বিড় করে চলেছে—"পিকিং-এর ইম্পিরিয়াল প্যালেসকে আমরা এতদিন যত্ন করে জিইয়ে রেখেছি। তার মধ্যে যে চীনের কত শিল্পকীর্তি রয়েছে তার হিসেব নেই। সেটাও যদি যায়..."

আড়াইটে পর্যন্ত মাথা হেঁট করে বসে কেটে গেল। চোখের সামনে নৃশংস ব্যাপার ঘটে চলেছে, অথচ আমরা পাঁচজন পুরুষ শক্তিহীন ; মুখ বুজে সব সহ্য করতে হচ্ছে। এটা যে কত পীড়াদায়ক সেটা আমি লিখে বোঝাতে পারব না।

রকেট আবার নামতে শুরু করেছে।

ক্রমে চাঁদের আলোয় ভারতবর্ষের গাছপালা নদী পাহাড় চোখে এল জানালার মধ্যে দিয়ে। জানি এক মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হবে, তাও কেন জানি চোখ সরছে না। হয়ত তাজমহলকে শেষ দেখা দেখার ইচ্ছেতেই।

ওদিকের ঘর থেকে গুনগুন গানের শব্দ পাচ্ছি। কী অমানুষ ! কী অমানুষ !

এবার গান থেমে গিয়ে কথা এল।

"তাজমহল দেখিনি কখনো, জানো শঙ্কু। শুধু জানি আগ্রার ল্যাটিচিউড ও লঙ্গিচিউড। ওটুকু জানলেই হল। বাকি কাজ করবে কম্পিউটার। ঠিক জায়গায় এনে ফেলবে রকেটকে। বিজ্ঞানের কী মহিমা ভেবে দেখ !"

আবার গান।

এবার রকেট দ্রুত নামতে শুরু করেছে। নীচের দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে আসছে। ক্রোল সণ্ডার্স শেং সকলেই জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার বুকের ভিতর থেকে একটা আবেগ উঠে এসে গলার কাছটায় জমা হয়েছে। আমি জানি তাজমহলকে চোখের সামনে নিশ্চিহ্ন হতে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারব না। এর চেয়ে বোধহয় মৃত্যুই ভাল ছিল।

ওই যে শহরের আলো ; তবে ইটালির শহরের আলোর মতো অত উজ্জ্বল নয়।

ওই যে যমুনা—চাঁদের আলোয় খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো চিক্‌চিক্ করছে।

আর ওই যে তাজমহল। এখনো দূরে, তবে রকেট দ্রুত নেমে যাচ্ছে তার দিকে। শেং এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। সে অস্ফুটস্বরে দুবার বলল—'বিউটিফুল !' সে বইয়েই পড়েছে তাজের কথা, ছবি দেখেছে, সামনে থেকে দেখেনি কখনো।

কিন্তু কী রকম হল ?

পাশের ঘরে গান থেমে গেছে। আমাদের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে।

কোথায় গেল তাজমহল ? এই ছিল, এই নেই—এ কি ভেল্‌কি ?

আর কোথায়ই বা গেল শহরের আলো ?

একমাত্র যমুনাই ঠিক রয়েছে। চাঁদের আলোও আছে, আর সব বদলে গেছে চোখের সামনে। তাজমহলের জায়গায় দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার কম্পমান অগ্নিশিখা।

রকেট নেমে চলেছে সেইদিকে। এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—চাঁদের আলোয় আর মশালের আলোয় পিঁপড়ের মতো হাজার হাজার লোক কী যেন করছে, তাদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে অজস্র সাদা পাথরের খণ্ড।

এবার হঠাৎ গোল দরজাটা খুলে গেল। তার দৃষ্টি বিস্ফারিত করে হুমড়ি দিয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকল রোডোল্‌ফো কারবোনি।

"কী হল! কোথায় গেল তাজমহল! চোখের সামনে দেখলাম চাঁদের আলোয়, তারপর হঠাৎ কোথায় গেল?"

আমি আড়চোখে নকুড়চন্দ্রের দিকে দেখলাম। তিনি এখন ধ্যানস্থ। তারপর কারবোনির দিকে ফিরে বললাম, "তোমার আশ্চর্য রকেট আমাদের এক বিগত যুগে নিয়ে এসেছে, কারবোনি! তাজমহল থাকবে কোথায়? তাজমহল ত সবে তৈরি শুরু হয়েছে! দেখছ না হাজার হাজার লোক মশালের আলোয় শ্বেতপাথর নিয়ে কাজ করছে? যে জিনিস নেই, তাকে ধ্বংস কী করে করবে তুমি কারবোনি?"

"ননসেন্স!" চেঁচিয়ে উঠল কারবোনি। "ননসেন্স! নিশ্চয়ই আমার রকেটের যন্ত্রপাতিতে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে!"

সে পাগলের মতো আবার গিয়ে ঢুকল কনট্রোল রুমে। দেখলাম এবার তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হল না।

আমি এগিয়ে গেলাম খোলা দরজাটার দিকে। কারবোনিকে আর বিশ্বাস নেই। সে যে এই অবস্থায় কী করতে কী করে বসবে, তার ঠিক নেই।

আমার পিছন পিছন ক্রোল আর সণ্ডার্সও এসে ঘরে ঢুকল।

কারবোনি প্যানেলের বোতামগুলো একটার পর একটা টিপে চলেছে, আর সেই সঙ্গে রকেট অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে টলতে আরম্ভ করেছে।

আমি ক্রোল ও সণ্ডার্সের দিকে ইশারা করতেই তারা দুজনে একসঙ্গে কারবোনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুদিক থেকে তার দুহাত ধরে টেনে তাকে প্যানেল থেকে পিছিয়ে আনল।

আমি প্যানেলটা খুব মন দিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম সাংকেতিক ছবিগুলো চেনা মোটেই কঠিন নয়। আমরাও ওই জাতীয় জ্যামিতিক সংকেত ব্যবহার করে থাকি। একটা বোতামের পাশে উপর দিকে মুখ করা তীরচিহ্ন দেখে বুঝলাম ওটা টিপলে রকেট উপর দিকে উঠবে। সেটা টিপতেই রকেট এক ঝটকায় উপরে উঠতে শুরু করল।

এদিকে কারবোনি রোগা হলে কী হবে, উন্মাদ অবস্থা তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার করেছে। ক্রোল ও সণ্ডার্সকে এক মোক্ষম ঝটকায় দুদিকে সরিয়ে দিয়ে সে টাল সামলাতে না পেরে কনট্রোল প্যানেলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার ফলে তার ডান হাতটা গিয়ে পড়ল উপর দিকের একটি বিশেষ সুইচের উপর।

ক্রোল ও সণ্ডার্স মেঝে থেকে উঠে আবার এগিয়ে গিয়েছিল কারবোনির দিকে, কিন্তু আমি তাদের ইশারা করে বারণ করলাম।

কারণ হলদে সুইচে হাত পড়ার ফলে রোবট সক্রিয় হয়ে এগিয়ে গেছে কারবোনির দিকে, তার বুকের হলদে আলো জ্বলে ওঠায় সমস্ত ঘর এখন আলোকিত।

রোবটের দুটো হাত একসঙ্গে এগিয়ে গিয়ে জাপটে ধরে ফেলল কারবোনিকে। তারপর সেই আলিঙ্গন দেখতে দেখতে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে, কারবোনির অবস্থা ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে লৌহভীমের মতো।

আধ মিনিটের মধ্যেই কারবোনির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসা নিষ্প্রাণ দেহ আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে কনট্রোল রুমের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। বুঝলাম এই রোবটের শেখানো বিদ্যের মধ্যে একটা হল : রকেটকে যে বিপন্ন করে এমন প্রাণীর সংহারসাধন।

কারবোনিকে ছেড়ে রোবট এখন গেছে কনট্রোল প্যানেলের দিকে। তার স্বচ্ছ আঙুলগুলো এখন সে স্বচ্ছন্দে চালনা করছে বোতামগুলোর ওপর। রকেটের দোলানি থেমে গেছে, আমি নিজে সরে এসেছি প্যানেলের সামনে থেকে। জানালা দিয়ে দৃশ্য দেখে বুঝলাম রকেট এখন উড়ে চলেছে তুষারাবৃত হিমালয়ের উপর দিয়ে উত্তর দিকে।

আমরা তিনজনেই আমাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো মেঝে থেকে তুলে নিয়ে গোল ঘরে ফিরে এলাম। নকুড়চন্দ্র এখন প্রসন্নভাবে ও সুস্থ শরীরে টুলের উপর বসা। আমি তাকে জিগ্যেস করলাম, "কোথায় পেয়েছিলে তাজমহল তৈরির বর্ণনা? তাভেরনিয়েরের বইয়ে কি?"

"ঠিক বলেছেন স্যার। ঘোষালসাহেবের বাড়িতে ছিল ওই ফরাসি সাহেবের লেখা দু ভল্যুম বই।"

দু' ঘণ্টার মধ্যে আমরা হিমালয় অতিক্রম করে সিংকিয়াং-এ এসে পড়লাম।

তারপর ঠিক ভোর পাঁচটায় তাকলা-মাকানের উত্তর প্রান্তে যেখান থেকে উড়েছিল রকেট, ঠিক সেখানেই এসে নামল। নিখুঁতভাবে রকেট চালনার কাজ শেষ করে রোবট কনট্রোল রুম থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের গোল ঘরে। ততক্ষণে

সামনের দরজা খুলে গিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। রোবট দরজা থেকে কিছুটা পিছনে দাঁড়িয়ে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সেই দিকে। অর্থাৎ—তোমরা এবার এসো।

আমরা পাঁচজনে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরের ভোরের শীতে।

ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখলাম সিঁড়ি উপরে উঠে গিয়ে রকেটের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পুবের আকাশে তখন গোলাপির আভা দেখা দিয়েছে। রকেটের বাইরে থেকেও সেই দপ্ দপ্ শব্দটা কেন শুনতে পাচ্ছি সেটা বুঝতে পারছিলাম না। এবার সেই শব্দটা হঠাৎ বেড়ে গেল।

"চলে আসুন! চলে আসুন! রকেট উড়বে!"

নকুড়চন্দ্রের সতর্কবাণী শুনে আমরা সবাই দৌড়ে গিয়ে পাথরের ঢিবির পিছনে আশ্রয় নিলাম, আর সেখান থেকেই দেখলাম রকেট তার নীচের মাটি তছনছ করে দিয়ে ধুলোবালিতে সবেমাত্র ওঠা সূর্যকে ঢেকে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে উপর দিকে উঠে পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমরা ঢিবির পিছন থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলাম যেদিকে রকেট ছিল সেই দিকে। একটা জিনিস দেখে মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল, শেং-এর উল্লাসে সেটা বিশ্বাসে পরিণত হল।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, ইউ. এফ. ও.-র দাপটে তাকলা-মাকানের মাটিতে একটা প্রকাণ্ড গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, আর সেই গর্তের মধ্যে দেখা যাচ্ছে পাথরের গায়ে কারুকাজ করা এক সুপ্রাচীন সৌধের উপরের অংশ।

এটাই যে অষ্টম শতাব্দীর সেই বৌদ্ধ বিহার, সে সম্বন্ধে শেং-এরও মনে বোধহয় কোনো সন্দেহ নেই।

ভাগ্যদেবী ব্রাঞ্চ হোটেল

লীলা মজুমদার
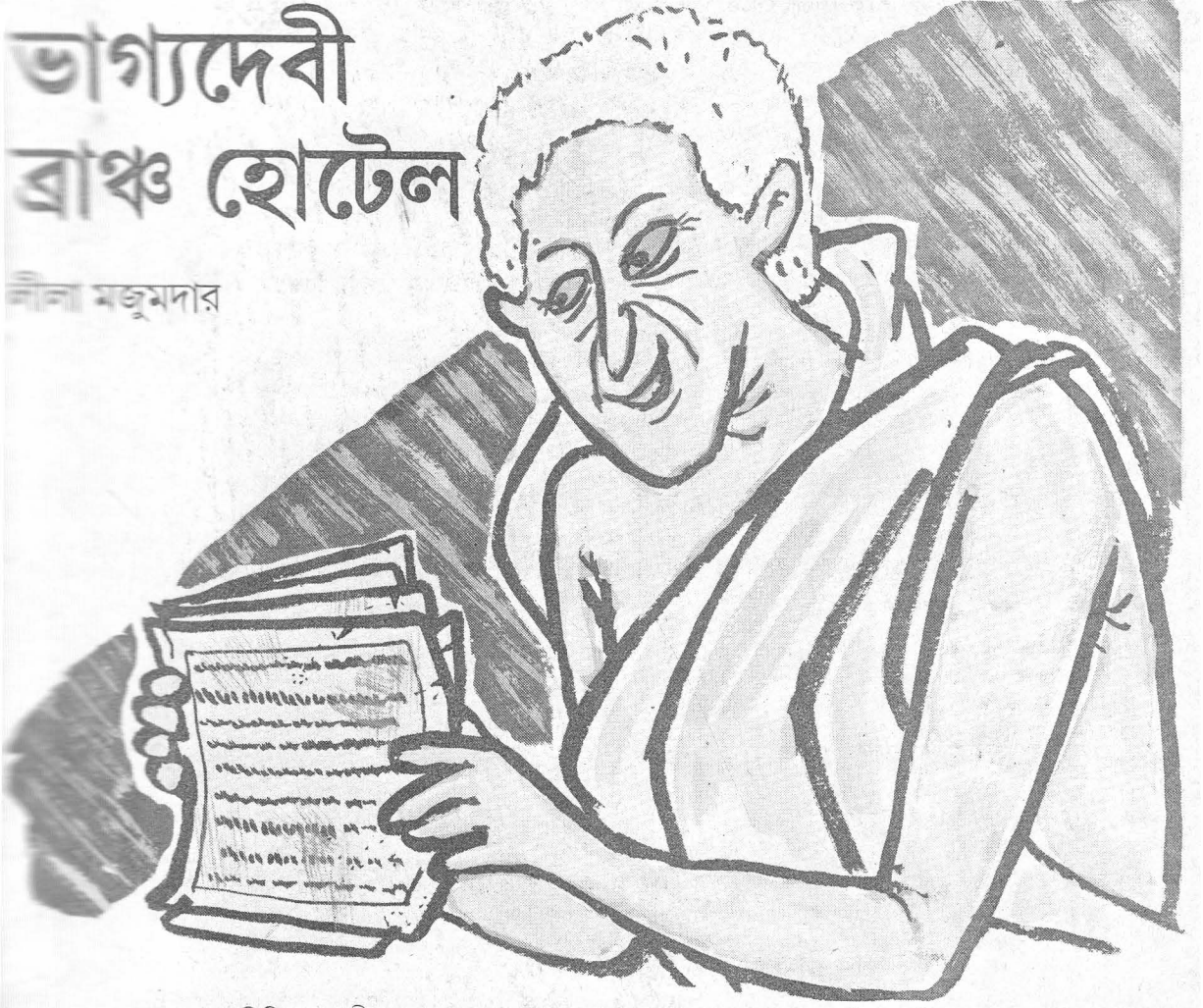
নগার বাবার আন্নাপিসি 'কাশীর গলি-জীবন' বলে একটা বই লিখে জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। সে নাকি অতি অভাবনীয় সব তথ্যে ভরা। একশো বছর আগেকার কাশীর সাধারণ একটা সরু গলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার এক রকম বলা যেতে পারে হুবহু আলোকচিত্র। এমন কী, জাতীয় চলচ্চিত্র সংস্থাও নাকি এর জন্য প্রথম পুরস্কার দিতে চাইছিলেন, নেহাত বিচারকরা চাক্ষুষ ভাবে ছবি না দেখে পুরস্কার দিতে রাজি নন বলে এখনকার মতো হল না। ছবি যদি হয়, তখন আর ভাবতে হবে না।

বলা বাহুল্য এ-সমস্তই নগার ছোড়দাদুর দিদির বাড়িতে স্বয়ং আন্নাপিসির মুখে শোনা। পুজোর ছুটিতে সেখানে নগা, বটু, বিভে, উটকো, এরা সব ঐ সময়ে গেছিল।

পিসির বয়স নব্বুই তো হবেই, কিছু বেশিও হতে পারে। খুনখুনে রোগা শরীর, ফরসা রং, চকচকে চোখ, মাথাভরা ছোট করে কাটা শাঁখের মতো সাদা কোঁকড়া চুল। দুরদুর করে সিঁড়ি ভাঙেন, থান পরেন, নিরামিষ খান, আর কোনো মানামানি নেই।

পিসি বললেন, "শীতকালে কাশী গিয়ে আমার ভাগ্যদেবী ব্রাঞ্চ হোটেলে উঠিস। চারজনে একটা ঘরে থাকলে খাওয়া-দাওয়ার পয়সা লাগবে না। ঘাটের ওপর দোতলা বাড়ি। একশো বছরের পুরনো। ৭৫ বছর আগে যখন প্রথম কাশী গেলাম, তখন আমার নিজের বলতে কিচ্ছু ছিল না। আমার বড়জেঠি কাশীবাসী হবেন, তাঁর একটা দেখাশুনো রান্নাবান্না করবার আর মুখঝামটা খাবার লোকের দরকার ছিল। আমি একটা পনেরো বছরের ফালতু বিধবা মেয়ে, সবাই মিলে আমাকে ঠেলে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিল। হাপ-ঝি, হাপ-পাপোশ বলতে পারিস। এখন জেঠির সেই পোড়ো বাড়িই আমার ভাগ্যদেবী ব্রাঞ্চ হোটেল! যদি কিছু ভাল জরদা এনে দিস তো সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী বলি।"

নগা তক্ষুনি উঠে গিয়ে ছোড়দিদিমার জরদার কৌটো থেকে অর্ধেকটা ঢেলে এনে দিল। তাই নিয়ে পরে ঝামেলা। দাঁতের পেছনে একটু জরদা গুঁজে আন্নাপিসি বললেন, "কাশীতে মলে সব্বাই সগ্গে যায়, ভালরাও যায়, খারাপরাও যায়। কাশীতে সব পাওয়া যায়, টাকা-কড়ি, সুখ-সৌভাগ্য, নাম-খ্যাতি, সব। কিন্তু খুঁজতে জানা চাই। পেয়েও যদি চিনতে না পেরে দূরে ফেলে দিস, তবেই তো হয়ে গেল!

"বছর ত্রিশ আগে ঘাটের মাথায় যে কথকঠাকুর বসতেন, তিনি একদিন এইসব বললেন। আসলে হরিশ্চন্দ্রের গল্প বলছিলেন, তারই মধ্যিখানে বললেন যে, সব্বাই নাকি একদিন না একদিন সৌভাগ্যের মুখ দেখে। কিন্তু নিজেরা যদি সেটা টের না পায়, তাহলে অন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাগ্যদেবী নাকি সকলকেই সমান সুযোগ পাইয়ে দেন।"

ঐ অবধি শুনেই আন্নাপিসি তেরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, "যা নয় তাই বললেই তো আর তা সত্যি হয়ে যায় না ঠাকুর। আমার উনষাট বছর বয়স হল, আজ পর্যন্ত ভাগ্যদেবী আমাকে পেট ভরে খাবার মতো কাঁচকলাও দেননি, এ আমি একশোবার বলব।"

কথকঠাকুর তো এত কথা শুনে একেবারে থ। সেই ফাঁকে রেগেমেগে আন্নাপিসি বাড়ি চলে এসেছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র বেচারা শেষ অবধি রাজ্য ফিরে পেল কি না, তা পর্যন্ত শোনা হল না। ঘণ্টাখানেক বাদে দূর-সম্পর্কের ভাইঝি উমাদিদি ফিরতেই পিসি বললেন, "রাজ্য ফিরে পেল আশা করি? দেবতাদের দিয়ে বিশ্বাস নেই।"

উমাদিদি বলল, "পেল বই কী। তা তুমি হঠাৎ চটেমটে গেলে কেন? মন্দ কথা তো বলেনি কথকঠাকুর। সত্যিই তো ভাগ্যদেবী সব্বাইকে দেন। আমার মতো আধামুখ্যু অনাথাকেও কেমন কর্পোরেশন ইস্কুলে মোটা মাইনার চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। মোটা মাইনাই বলব, দুশো টাকা কিছু ফেলনা নয়। তারপর 'কোথায় থাকি' 'কোথায় থাকি' কচ্ছি যখন, তোমার বাড়িতে জায়গা করে দিলেন। ভাগ্যদেবী ছাড়া কে দিয়েছে এসব বলো? কত লোকে তো তা-ও পায় না।"

আন্নাপিসি রাগের চোটে উঠে বসেছিলেন। "তাই বা তাদের দেন না কেন শুনি? তোকেই না হয় দিয়েছেন কিছু খুদকুঁড়ো, কই, আমাকে তো কিছু দেননি?"

উমাদিদি পিসির পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "দিয়েছেন বই কী। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার কাছে। যাতে তুমি যদ্দিন বাঁচো, তোমার যত্ন করতে পারি। জেঠির এই বাড়িটা আর ভাইপোর কাছ থেকে ত্রিশ টাকা মাসোয়ারা, তাও তো তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন। দেন সবাইকে, আমরাই চিনতে পারি না, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলি— নাও, এখন ওঠো, হাতমুখ ধোও। বামুনের দোকান থেকে গরম হাতরুটি, নরম চানা আর গুড়ের হালুয়া এনেছি। পরশু আমরা দলের সঙ্গে গঙ্গোত্রী যাচ্ছি, এখন শরীর খারাপ করলে চলবে কী করে?"

এ-কথা শুনে পিসির রাগ পড়ে গেলেও মেজাজটা খিচড়ে রইল। সন্ধ্যা-আহ্নিক আগেই সেরেছিলেন, খাওয়া-দাওয়ার পর উমাদিদি খাতা নিয়ে বসল আর পিসি বাড়ির সামনে গঙ্গা-ঘাটের সিঁড়িতে বসে মনে-মনে বলতে লাগলেন, 'বেশ, এখন থেকে তাই হবে। ভাগ্যদেবী যা দেবেন, তাই আঁকড়ে ধরব। দেন তো ছাই, দিলে কি আর চোখে পড়ত না! এবার থেকে আজেবাজে নোংরা-খ্যাংরা যা দেবেন মাথা পেতে নেব। ঠাকরুনের একটা পরীক্ষা হয়ে যাক—'

ঝপ করে একটা শব্দ হতেই তারার আলোয় চেয়ে দেখেন একটা টিকিওলা ন্যাড়ামাথা ঢ্যাঙা লোক কতকগুলো কী সব ফালতু জিনিস গঙ্গায় ফেলে দিয়ে একরকম ছুটে চলে গেল। কিছু ডুবে গেল, কিছু ভেসে গেল, একটা পেতলের হাঁড়ি ঘাটের শেষ ধাপে এসে লাগল। কে জানে কার এঁটো-ছোঁয়া অশুদ্ধ জিনিস। পিসি উঠেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ভাগ্যদেবীর কথা মনে পড়াতে, ক-ধাপ নেমে হাঁড়িটাকে তুলে আনলেন।

ঐ অবধি বলে আন্নাপিসি একটু থেমে ওদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। নগা, বেঁড়ে, বটু ইত্যাদি এত কাছে ঘেঁষে বসেছিল যে, পিসির পিঠে হাঁটুর খোঁচা লাগছিল। পিসি তাকাতেই ওরা আধ ইঞ্চি করে সরে বসে বলল, "হ্যাঁ, তারপর?"

"তারপর আবার কী? উমাকে হাঁড়ির কথা বলিনি। বেশ পরিষ্কার-ঝরিস্কার টুপটুপ করছে একটা আধসেরি পেতলের হাঁড়ি, পোড়-খাওয়া, টোল-খাওয়া, দেখলেই বোঝা যায় অনেক ব্যবহার দেখেছে। তীর্থে যাবার সময় সেটিকে ছেঁড়া গামছায় জড়িয়ে সঙ্গে নিলাম। বোঁচকাবুঁচকির মধ্যিখানে এতটুকু মালুম দিল না।

"এখন শুনি বাসে চেপে বদরীনাথ যায়। ছো ছো, আমরা পায়ে হেঁটে গঙ্গোত্রী গেলাম। সঙ্গে শক্ত শুকনো অখাদ্য সব জিনিস গেল। তাই চিবিয়ে পথ চলি। পাণ্ডা লোকটা ভাল হলেও, ঘটে বুদ্ধি ছিল না। মোট কথা ফেরার পথে ঝড় উঠল, ধস নামল, পথ হারাল। প্রাণও যে হারায়নি সেটা ভাগ্যদেবীর দয়া।

"ধুঁকতে ধুঁকতে একেবারে আঘাটায় একটা পরিত্যক্ত গুহায় গিয়ে উঠলাম আমরা সাতজন তীর্থযাত্রী। গুহাটা পাহাড়ের গা কেটে তৈরি। ঘরের কোণে কিছু শুকনো কাঠকুটো, কবেকার কোন্ তীর্থযাত্রীরা রেখে গেছে। ব্যস, আর কিছু না। পাথরের দেয়াল দিয়ে গুহাটা দু-ভাগ করা। উমা, আমি আর দুজন আধবুড়ি বিধবা, তিন দিন প্রায় উপোস করা শরীরগুলোকে কোনোমতে টেনে নিয়ে ভিতরের গুহায় ঢুকে পুঁটলি মাথায় দিয়ে হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর কিচ্ছু মনে নেই।

"ওরা পাশের গুহায় আগুন জ্বেলে থাকবে। তার মিষ্টি গরমে ঘুম ভেঙে দেখি খিদের চোটে পেটের এদিক-ওদিক একসঙ্গে সেঁটে গেছে। পুঁটলি খুলে হাতড়াতে লাগলাম, যদি এক-আধটা নারকোল-নাড়ু পাই। হাঁড়িটাতে হাত পড়ল। এই বুঝি ভাগ্যদেবীর দান, ছ্যা ছ্যা! তাও যদি ক্ষীরের নাড়ু আর মুড়কি ভরা থাকত। বলতে বলতে কী বলব ভাই তোদের, খুদে হাঁড়ি ভারী হয়ে উঠল। অন্ধকারে গামছাটার ওপর উপুড় করে ধরলাম, ঝরঝর কতে নাড়ু, মুড়কি পড়তে লাগল। হাঁড়ি সোজা করতেই থামল। গামছার ওপর নাড়ু মুড়কির ঢিপির দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় উমাকে ডাকলাম, 'ওরে, তোদের খিদে পায়নি?' হাঁড়িটাকে তাড়াতাড়ি ঝুলিতে পুরলাম।

"খাবার দেখে সবাই হাঁ! 'ও ঠাকুমা! এত খাবার সঙ্গে ছিল, তবু কিছু বলেননি! কেমনধারা মানুষ আপনি!' উমা ছাড়া কাউকে হাঁড়ির কথা বলিনি। আড়ালে রেখে, তীর্থের যোগ্য নানারকম শুকনো খাবার বের করে সবাইকে খাইয়েছিলাম।

"তিন দিন পর আবার পথ খুঁজে পেয়ে, নিরাপদে কাশী ফিরে এলাম। আর আমাকে ফিরে দেখতে হয়নি। ঘাটের ওপর ঐ পুরনো বাড়িতে প্রথমে মোয়া, মুড়কি, তালের সন্দেশ, সুজির নাড়ু, তিলের নাড়ু, এইসবের দোকান দিলাম। তারপর বাড়িঘর মেরামত করে পরোটা, আলুর দম, কালাকান্দ, মালাই। তারপর দো-তলা হল। হোটেল হল। ভাগ্যদেবী ব্রাঞ্চ হোটেল, যাস তোরা শীতকালে। তোদের উমাদিদি ম্যানেজারি করে। চারজনে একঘরে থাকবি, আমার খরচায় খাবি। কী বলিস নগা? তোর বাপ তো আমার কাছ থেকে খরচা নিচ্ছে না। তা চমৎকার হিসেব রাখে উমা, এক পয়সা ইদিক-উদিক হয় না। তা না হলে চলত কী করে, আমি তো আর লিখতে-পড়তে জানি না— এই রে!" এই বলে জিব কেটে আন্নাপিসি চুপ করলেন।

ওরা সবাই রহস্যের গন্ধ পেয়ে বুড়িকে ছেঁকে ধরল, "তা হবে না, দিদিমণি, বলতেই হবে, লিখতে পড়তে জানো না তো কাশীর গলি-জীবন লিখে লাখ টাকার সর্বভারতীয় পুরস্কার পেলে' কী করে?"

আন্নাপিসি একটু ঝাঁঝালো সুরে বললেন, "কী করে আবার পাব? ভাগ্যদেবী পাইয়ে দিলেন। যেমন করে হাঁড়ি পাইয়ে দিয়েছিলেন। তোদেরও নিশ্চয় কত কী দেন, চিনতে পারিস না বলে ফেলে দিস।"

নগা রেগে গেল, "অন্য কথা পাড়লে হবে না দিদিমণি, বলে রাখলাম। বাবাকে বলেটলে একাকার করব।"

পিসি বললেন, "ওরে, না রে! বলেছি কি বলব না? তা হাঁড়িটা খোয়া গেলেও হোটেল ভালই চলতে লাগল। কিছু ঠাকুর-বামনী রাখতে হল, এই যা। কী হল?"

"হাঁড়ি খোয়া গেল মানে? খোয়া গেল আবার কী? চুরি গেল? নাকি ভেঙে গেল? আরেকটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"

"না, না, ওরকম কিছু নয়। হল কী, দিনে-দিনে ছোকরা খদ্দেরদের খাঁই বাড়তে লাগল, চাঁপ চাই, কাটলিস চাই, মুরগি রোস চাই, পুটিন চাই, হেনা-তেনা সাত-সতেরো! শেষটা উমা বলল, 'চেয়েই দ্যাখো না পিসি, কী হয়।' হল আমার মাথা আর মুণ্ডু। হাঁড়িটা হাত থেকে ছিটকে সটাং গঙ্গার গর্ভে গেল। ডুবুরি লাগিয়েও তোলা গেল না! উমা কেঁদে কেঁদে চোখ জবা ফুল বানাল!

"মনটন খুব খারাপ, ভাগ্যদেবীর দেওয়া অমন জিনিস পেয়েও হারালাম। বারবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, মা, আর দয়া-টয়া করে কাজ নেই। উমা সব ভণ্ডুল করে দেবে। বুদ্ধি করে যদি আমাকে লিখতে-পড়তে শেখাতে, তাহলে আর আমার কিছু বলবার ছিল না। এইরকম আজেবাজে কথা বলতে লাগলাম, দুঃখী লোকে যেমন বলে থাকে।

"হঠাৎ ঝুপ করে একটা শব্দ হল। চমকে চেয়ে দেখি একটা টিকিওলা ন্যাড়ামাথা ঢ্যাঙা লোক, ঝুড়ি থেকে কতকগুলো হাবিজাবি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে, খড়ম পায়ে খটখট শব্দ তুলে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠে এমনি দৌড় দিল যে, সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"সিঁড়ির শেষ ধাপের দিকে তাকিয়ে দেখি ভাঙা ঝাঁটা ঝুড়ি ইত্যাদি ভেসে চলেছে আর কাগজের পুঁথি-পত্তরের মতো কী একটা ঘাটে এসে লেগেছে। আর এক মিনিটও অপেক্ষা করলাম না, ছোঁ মেরে সেটি তুলে বুকে করে ঘরে নিয়ে এলাম। জলে ভিজে চুপ্পুড় এক

ভেজা কাগজ, তার জল চুঁয়ে আমার কাপড়-চোপড়ও ভিজে গেল। তা যাক গে ভিজে, মা গঙ্গার জল তো কিছু খারাপ জিনিস নয়।

"ঘরে এসে উমাকে বললাম, 'দ্যাখ্ তো এবার ভাগ্যদেবী কী দিলেন।' উমা পুঁথিটা গামছা দিয়ে মুছে, কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ওমা, এ যে একটা পুরনো ডাইরি, না হিসাব খাতা, না কী যেন।'

"তারপর পুঁথিটা উমা আর ছাড়তে চায় না। বললাম 'তা পড়গে, পরে আমাকে বলিস।' সন্ধ্যাবেলায় উমা বলল, 'ও মাসি, প্রথম পাতাটা জলে ধুয়ে গেছে, নাম ঠিকানা তারিখ কিচ্ছু পড়া যাচ্ছে না, কিন্তু তারপর যে পাড়াসুদ্ধ সকলের হাঁড়ির খবর লিখে রেখেছে বুড়ো। খুব পুরনো হবে, ভাষাটা যেন কেমনধারা। কার বাড়িতে কে কী করছে না করছে, কত আয় কত ব্যয়, কী রান্না হয়, কত খরচ পড়ে, কে কী বলেছে না বলেছে, এইসব দিয়ে ঠাসা। এমন মজার জিনিস জন্মে দেখিনি।' আমি বললাম, 'কী করে দেখবে! স্বয়ং ভাগ্যদেবীর বাড়ির গলির গল্প। হয়তো ওঁর কেরানিবাবু নকল করে দিয়ে থাকবে। এটাকে কপি করে দে দিকিনি। খবরদার কারো কাছে গপ্প করবি না।' তা উমার সঙ্গে সকলের ঝগড়া, এই একটা সুবিধা।

"কপি হয়ে গেলে মৌলিক-মাস্টারকে দিয়ে পড়ালাম। উনি আমাদের বাঙালি বিদ্যালয়ের তখনকার হেডমাস্টার। বললাম, 'ভাগ্যদেবীর আশীর্বাদে লেখা হয়েছে, পড়ে দেখুন।' পড়ে মৌলিক মুচ্ছো যায় আর কী! সঙ্গে-সঙ্গে 'কাশী-কথা'য় ধারাবাহিক ছাপার ব্যবস্থা করল। প্রকাশকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। তারপর একদিন পুরস্কারটাও ঘোষণা হল। ভাগ্যদেবী যখন দেন, মচ্ছি ভেঙেই দেন। তোদেরও দেন নিশ্চয়, তোরা ছেঁড়া কাগজ মনে করে তাই দিয়ে ঘুড়িতে তাপ্পি লাগাস!"

নগারা বলতে লাগল, "কিন্তু তুমি তো লেখনি, তুমি কেন লাখ টাকার পুরস্কার পাবে? জগু রাত জেগে কত বই লেখে, কেউ ছাপেও না! তুমি লেখাপড়া পর্যন্ত জানো না!"

আন্নাপিসি বলল, "আহা, একেবারেই কি আর জানি না? চার ক্লাস অবধি পড়েছি তো! ঐ তো কেমন কাশীর গলি-জীবন, লেখিকা আন্নাকালী দেবী পেরাইজ পেয়ে গেল। তাছাড়া লেখাপড়া জানার কিচ্ছু দরকার নেই। লিখতে না পারলেও কিচ্ছু এসে যায় না। ভাগ্যদেবীর সুনজরে পড়লেই হল।"

নগা বলল, "দেখাও না একবার পুঁথিটা।"

আন্নাপিসি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "ওমা! বলিনি বুঝি? নকল দেখে যেমন বইটা ছাপা হতে লাগল, আমার সিন্দুকে রাখা আসল বইয়ের লেখাগুলোও উপে যেতে লাগল! শেষটা কাগজগুলোও আর খুঁজেই পেলাম না!"

ছবি : দেবাশিস দেব
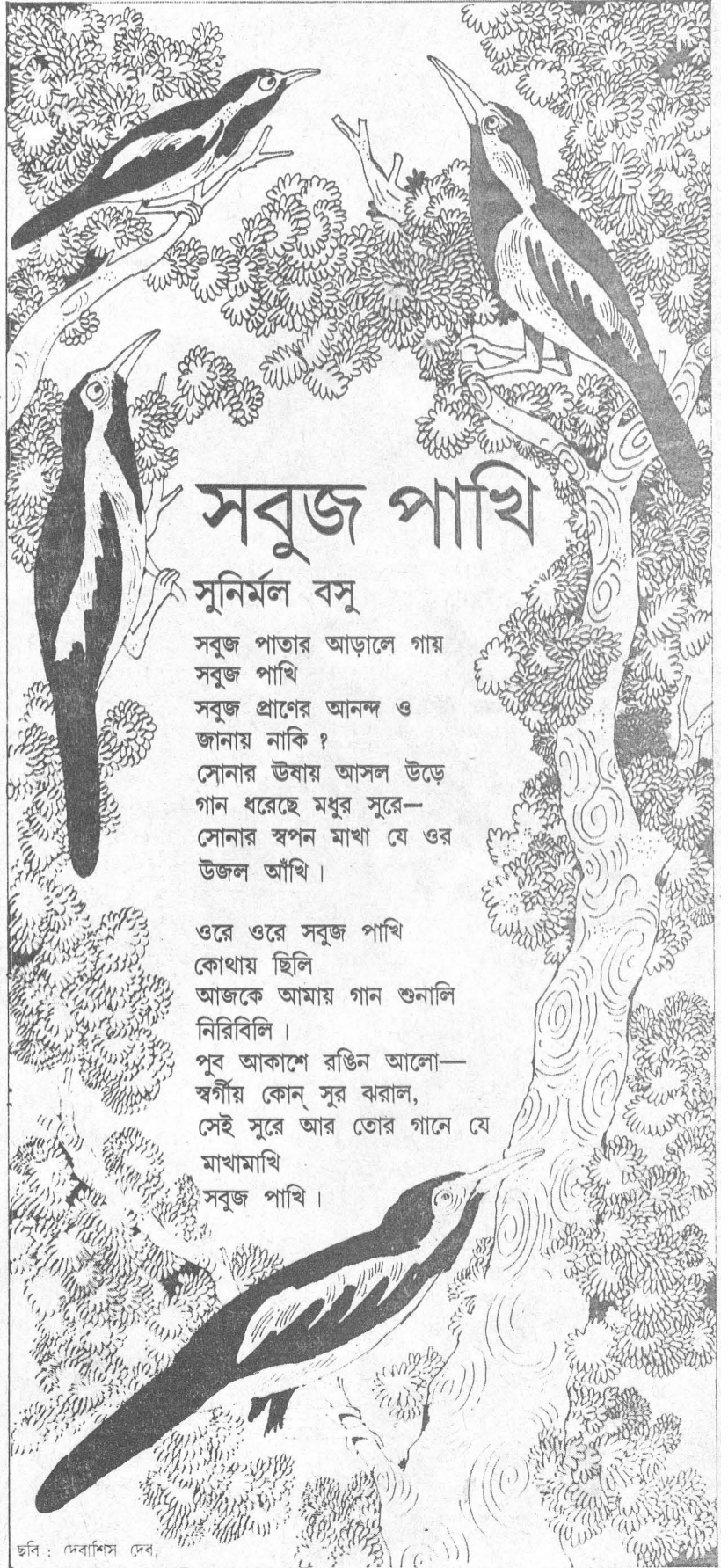
সবুজ পাখি

সুনির্মল বসু

সবুজ পাতার আড়ালে গায়
সবুজ পাখি
সবুজ প্রাণের আনন্দ ও
জানায় নাকি?
সোনার ঊষায় আসল উড়ে
গান ধরেছে মধুর সুরে—
সোনার স্বপন মাখা যে ওর
উজল আঁখি।

ওরে ওরে সবুজ পাখি
কোথায় ছিলি
আজকে আমায় গান শুনালি
নিরিবিলি।
পুব আকাশে রঙিন আলো—
স্বর্গীয় কোন্ সুর ঝরাল,
সেই সুরে আর তোর গানে যে
মাখামাখি
সবুজ পাখি।

ছবি : দেবাশিস দেব

ভয় ও ভূত

সুকুমার সেন

সত্য ঘটনা। নিজেদের অভিজ্ঞতা। সুতরাং নামধাম ঢাকবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি আর বিমলেন্দু ইস্কুলের ফিফথ ক্লাসে—এখনকার ক্লাস সিক্সথে তিন-চার দিন আগে-পিছে ভর্তি হয়েছিলুম। ও এসেছিল পাড়া-গাঁ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে শহরের ইস্কুলে পড়তে। আমি তো বর্ধমান শহরেই থাকতুম।

দু-চার মাসের মধ্যেই বিমলেন্দুর সঙ্গে আমার প্রগাঢ় ভাব হয়ে গেল। এ ভাব বরাবর অটুট ছিল। বর্ধমানে দুজনে একই ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করি, একই কলেজ থেকে আই.এ. পাস করি। তার পর কলকাতায় এসে আমাদের কলেজ ভিন্ন হয়। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হয় না।

আমি এম.এ.পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে থাকি। বিমলেন্দু এম.এ.পাস করে ভারত গভর্নমেন্টের হায়ার সার্ভিসের পরীক্ষা দেয় ও আয়কর বিভাগে কাজ পায়। প্রথমে কয়েক বছর ও কলকাতাতেই ছিল। যদিও ওর চাকরি বদলির। বিমলেন্দু চাকরি নিলে, আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলুম, উপযুক্ত কোনো চাকরির সন্ধান না পেয়ে। আমাদের দুজনের মেলামেশা আগেকার মতোই অক্ষুণ্ণ চলতে লাগল।

যেদিনের কথা বলতে যাচ্ছি তখন বিমলেন্দুর বিয়ে হয়েছে, তবে তখন ওর স্ত্রী বাপের বাড়িতে ছিল। কলকাতায় তখন তার বাসা ছিল বাগবাজার অঞ্চলে। সংসারে তখন বিমলেন্দু ও তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি থাকি গোয়াবাগানে মামার-বাড়িতে।

একদিন কথা হল শনিবার সন্ধ্যায় কর্নওয়ালিস থিয়েটারে সিনেমা দেখবার।

ছবি: প্রণবেশ মাইতি
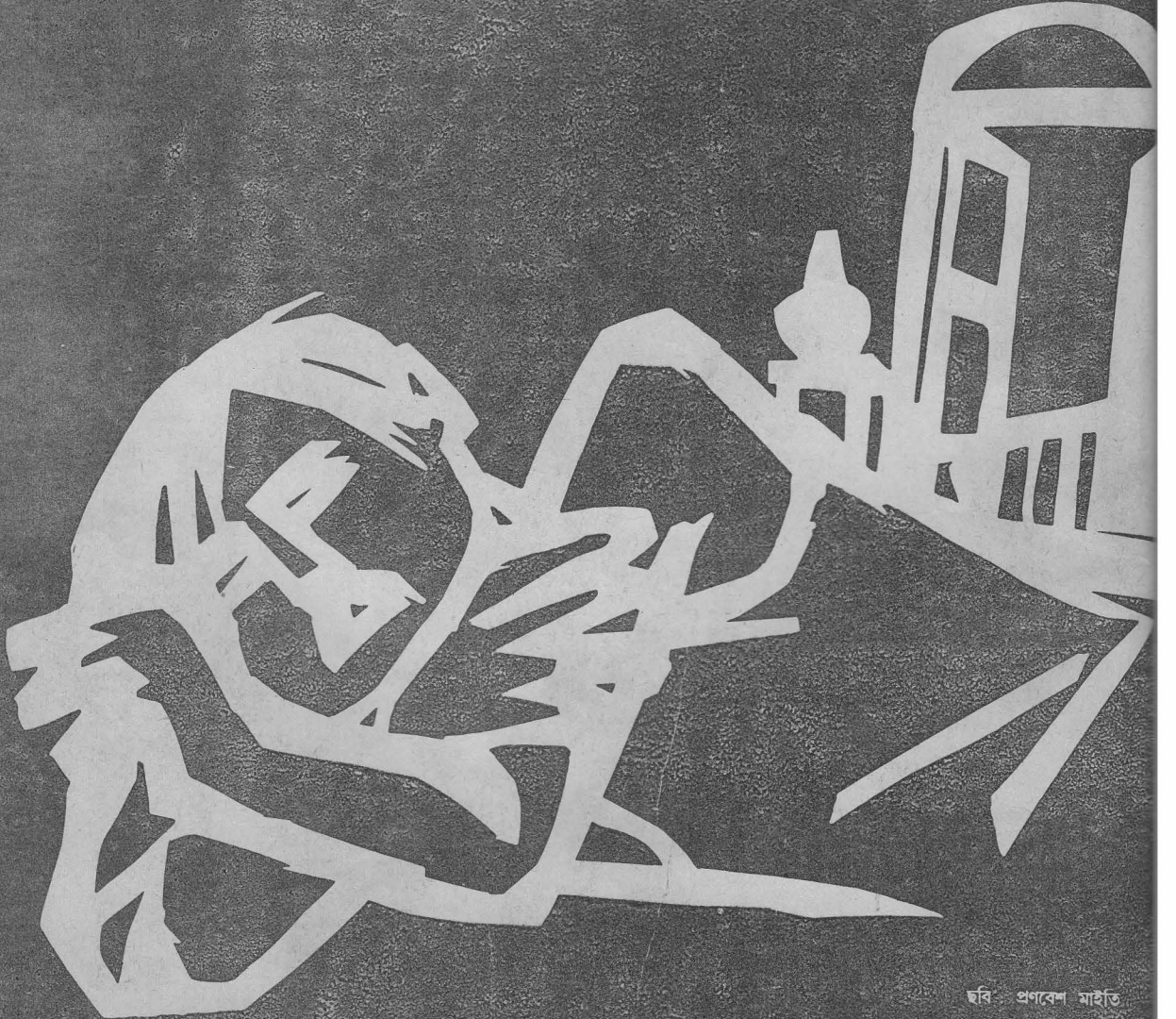
আমি বিকেলে বিমলেন্দুর বাড়ি যাব। সেখান থেকে ছটার শোয়ে ছবি দেখে বাসায় ফিরব। সেদিন বিকেলের আগেই বিমলেন্দু আমার কাছে এসে হাজির আপিস-ফেরতা। বললে, "সন্ধ্যার শোয়ের টিকিট পাইনি তাই রাত্রির শোর টিকিট কিনেছি। সেই কথা তোকে জানাতে এলুম।"

আমি বললুম, "এখানে সাপারের যে বন্দোবস্ত তাতে রাত্রির শোতে যেতে অসুবিধা হবে।"

বিমলেন্দু বললে, "তার ভাবনা কী? তুই আমার কাছে খাবি। তারপর ছবি দেখে বাড়ি ফিরবি। যা, ভিতরে গিয়ে বলে আয়।"

আমি মামিমাকে বলে এলুম রাত্রিতে বিমলেন্দুর বাড়িতে খাব। তার পর বিমলেন্দুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

ওর বাড়ির গলিতে ঢুকে মনে হল শনিবারের বিকেলের পক্ষে বড় নির্জন বোধ হচ্ছে। বিমলেন্দুকে জিজ্ঞাসা করলুম। ও বললে, "আমার বাসার সামনাসামনি যে ভদ্রলোক থাকতেন তিনি রাত্রিতে মারা গেছেন। তিনি পাড়ার একজন চাঁই ছিলেন।"

তারপর রাত্রি সাড়ে-আটটার সময় খাওয়াদাওয়া করে নটার শো দেখতে গেলুম কর্নওয়ালিস থিয়েটারে। শো ভাঙতে পৌনে বারোটা বেজে গেল।

রাস্তায় নেমে বিমলেন্দু বললে, "রাস্তা তো খুব ফাঁকা দেখছি। দুজনের তো একলা একলা যেতে হবে দুদিকে। তার চেয়ে চল আমার সঙ্গে। ওখানে রাত কাটিয়ে সকাল বেলায় গোয়াবাগানে ফিরবি। ওঁরা তো জানেন যে আমার কাছে এসেছিস। তাই ভাবনা-চিন্তা করবেন না।"

আমি সায় দিলুম। একটা রিকশ করে দুজনে বাগবাজারে ফিরে এলুম।

বিমলেন্দুর বাসায় ওপরে তিনটি ঘর ও ফালি বারাণ্ডা। একটি ঘর মায়ের, একটি ঘর বিমলেন্দুর বসবার আর একটি ঘর তার শোবার।

বিমলেন্দু এসেই বললে, "একটু চা খাওয়া যাক।" চা দুধ চিনি জল স্টোভ কেটলি কাপ ডিশ ছাঁকনি সবই ছিল তার শোবার ঘরে এক পাশে। প্রাইমাস স্টোভ জ্বালিয়ে সে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। চা হল, আমি আধ কাপ খেলুম। তারপর দুজনে শুয়ে পড়লুম। আমাকে ও শোয়ালে খাটের ওপর, আর নিজে সে শুল মেজেতে একটা মাদুর পেতে আর বালিশ, পাশ-বালিশ নিয়ে। এমনি করেই ও শুতে ভালবাসত।

শুয়ে শুয়ে কিছু কথাবার্তা হতে হতে বিমলেন্দু পড়ল ঘুমিয়ে, আর আমার চোখে ঘুম আসে না। এটা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমিই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি, বিমলেন্দু নয়। ভাবলুম নতুন জায়গা, 'ঠাঁই নাড়া' হয়েছে বলে ঘুম আসছে না। যাই হোক, অনেকক্ষণ পরে ছেঁড়া-ছেঁড়া রকম ঘুম

এল। কিন্তু হঠাৎ কিছু শব্দ শুনে তড়াক করে ছেঁড়া ঘুমের স্বপ্নতন্তু ছিঁড়ে গেল। আমি মুহূর্তমধ্যে সজাগ হলুম আর মনে পড়ল সামনের বাড়ির মৃত্যুর কথা। অমনি ভয়ের প্রস্রবণ আমাকে আচ্ছন্ন করলে। আমি অনড় হয়ে কান পেতে আছি সে অস্ফুট শব্দের জন্যে। শব্দ শুনলুম, একটুক্ষণ করে বাদ দিয়ে কয়েক বারই শুনলুম। মনে হল শব্দটা মেটালিক, কিন্তু বাসন মাজার শব্দ নয়, টিন কাটার শব্দ নয়, শান দেবার শব্দ নয়। কিসের শব্দ ?

ভয়ে অভিভূত হয়ে মনে হল বিমলেন্দুকে জাগিয়ে দিই। কিন্তু প্রচণ্ড ভয় পেলেও আমার সুবিবেচনা একেবারে লোপ পায়নি। একে ওর ঘুম কম, তাতে যদি কাঁচা ঘুমে উঠিয়ে দিই তবে আর তার ঘুম হবে না। তাছাড়া ও যদি আমাকে ভয়কাতুরে বলে উপহাস করে তা আমি সইতে পারব না।

তখন মনের রাশ জোর করে ধরে ভাবতে লাগলুম শব্দটা আসছে গলির দিক থেকে নয়, আসছে ভিতরের বারাণ্ডার দিক থেকে। এই সিদ্ধান্তে ভূতের ভয় এক ডিগরি কমে গেল। বারাণ্ডার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল, এই ঘরেরই কাছে বারাণ্ডার শেষে করোগেটের পার্টিশন আছে এবং সেই পার্টিশনের গায়ে জলের কল লাগানো আছে। এইটুকু মনে পড়তেই চড়াং করে ভয়ের সমাধান হয়ে গেল। দিনের বেলায় তাপে সিসের নল একটু বেড়ে ওঠে, শেষরাত্রিতে ঠাণ্ডা পড়ায় সে বাড়টুকু কমে যায় এবং সিসের নল সঙ্কুচিত হওয়ার দরুন করোগেট টিনে একটু ঘষড়ানি হয়। সেই শব্দই আমি শুনেছি। ঠিক হোক চাই নাই হোক এই ব্যাখ্যা আমার মনে ওঠায় ভয় জল হয়ে গেল। আমি দু-এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালের আগে আর ঘুম ভাঙেনি।

আমার এই অভিজ্ঞতার সারমর্ম হল, ভয় ঠেকালে ভূত ঠেকানো যায়।

তারপর বিমলেন্দুর যে অভিজ্ঞতার কথা বলছি তা ঘটেছিল বছর সাত-আট পরে। বিমলেন্দু তখন বর্ধমানে আয়কর অফিসার। তার উপর বীরভূম ও বাঁকড়ো জেলার ভারও আছে। এসব জেলায় কাজের জন্যে তাকে মাঝে মাঝে টুর করতে হয়। এইরকম এক টুরেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।

বিমলেন্দু বর্ধমানে আছে, আমি সপ্তাহান্তিকে বর্ধমানে যাই। শনি রবি সোম তিন দিন সেখানে থাকি, বিমলেন্দুর সঙ্গ পাই। দিন বেশ ভালই কাটে।

এক সপ্তাহে বর্ধমানে গিয়ে শুনলুম, বিমলেন্দু টুরে গেছে। সেবারে দেখা হল না। পরের সপ্তাহে দেখা হল। তার কাছে শুনলুম সেই টুরের এক আশ্চর্য কাহিনী। সে কথা আমি বিমলেন্দুর জবানিতেই লিখছি।

"গিয়েছিলুম বাঁকড়ো জেলায় গহনে এক গণ্ড গ্রামে। সে গ্রামে কিছু আড়তদার ব্যাবসাদার আছে। ডাকবাংলো আছে।

সুতরাং ওখানে গিয়ে তদন্ত করতে অফিসারদের কোনো অসুবিধা হয় না। এই সব বুঝে আমি গেলুম সেখানে এনকোয়ারিতে কাগজপত্র ও সেরেস্তাদারকে সঙ্গে নিয়ে।

"বেলা তিনটে নাগাদ ডাকবাংলোয় পৌঁছলুম। অভ্যর্থনা করতে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা এসেছিলেন। বাংলোটি মন্দ নয়। বেশ নির্জন, একটু যেন বেশি নির্জন বলে মনে হল। গ্রাম সেখান থেকে অন্তত আধ মাইল দূরে। গাঁ আর বাংলোর মধ্যিখানে কোনো বসতি নেই, জঙ্গল আর মাঠ।

"হাতমুখ ধুয়ে ডাকবাংলোর সর্দারকে চা করে আনতে বললুম। সে চা করে এনে দিল। চা খেতে খেতে তাকে নির্দেশ দিলুম রাত্তিরের খাবারের। সর্দার বিনীত ভাবে বললে, 'হুজুর,আপনার রাত্তিরের খাবার গাঁয়ে গিয়ে খাবেন। এখানে কেউ রাত্তিরে খাবার খান না। আমরা সবাই সন্ধের পর এখান থেকে গাঁয়ে চলে যাই। হুজুরও যাবেন।'

"আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী ব্যাপার, কী পাগলামি বকছ তুমি ?'

"ও বললে, 'হুজুর, সন্ধের পর এখানে ভূতের উপদ্রব হয়, কেউ তিষ্ঠুতে পারে না।' সর্দারের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে আমি সেরেস্তাদারকে ডাকলুম। তাঁকে সর্দারের কথা বললুম। সেরেস্তাদার ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'স্যার, সব কথা সত্যি। এখানকার ভদ্রলোকেরা এসেছেন আপনাকে রাত্রিবেলায় গাঁয়ে থাকবার ও খাবার জন্যে বলতে।' এই বলে সেরেস্তাদারবাবু জন তিনচার ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। তাঁরাও সকলে নির্বন্ধ করতে লাগলেন সন্ধের পর ডাকবাংলোতে না থাকবার জন্য। আমার রাগ হল। সে রাগ দমন করে আমি বললুম, 'এখান ছেড়ে রাত্রিতে আমি কোথাও যাব না।' সেরেস্তাদারবাবুকে বললুম, 'আপনি সর্দারকে বলুন আমার রাত্তিরের খাবার সন্ধের আগেই যেন তৈরি করে রেখে দিয়ে যায়। যখন ইচ্ছে হবে তখন খাব। আপনিও চলে যেতে পারেন। তবে সকালে যথাসময়ে আসবেন। ঠিক নটার সময় আপিসের কাজ করতে হবে।'

"খানিকক্ষণ গাঁইগুঁই করে আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে সকলে চলে গেলেন। সন্ধের সময় সর্দার আমার খাবার তৈরি করে ঢাকা দিয়ে রেখে চলে গেল। তারপর কেউ কোথাও নেই দেখে আমি বাংলোর দরজার খিল দিয়ে বই পড়তে বসলুম। সর্দার সব ঘরে আলো জেলে দিয়ে গিয়েছিল। যথাসম্ভব নিরুদ্বেগে রাত কাটল। সূর্য ওঠার আগে বাংলোর বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় পায়চারি করছি এমন সময় সর্দার এসে হাজির। আমাকে সুস্থশরীর দেখে তার যে আনন্দ হয়েছে তা তার মুখ দেখে বুঝতে পারলুম। কোনো কথা না বাড়িয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে পার্স বার করে তার থেকে একটা টাকা দিয়ে বললুম, 'দৌড়ে যাও, চায়ের দুধ আনোগে।'

"গাঁয়ের লোক সর্দারের মুখে আমার কিছু হয়নি জেনে খুশি হয়েছিল কি না বলতে পারি না। তবে সেদিন বিকেলেও আমাকে গাঁয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল।

"তিন দিন পুরোদমে সরকারি কাজ চালিয়ে শেষ করলুম। সন্ধেবেলায় সেরেস্তাদারকে বলে দিলুম কাগজপত্র সব ভাল করে গুছিয়ে নিতে। আমরা কাল সকালে নটার আগেই রওনা হব।

"সকালে আটটা নাগাদ গ্রামের লোক আমাকে বিদায় দিতে এসেছেন। কারো মুখে রা নেই। বুঝলুম আমার ওপর ওদের একটু বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মেছে ভূতের রোজা মনে করে।

"আমি কাউকে কোনো কথা না বলে যখন আমার ঘর থেকে বারাণ্ডায় বেরিয়ে আসছিলুম, তখন চৌকাট ডিঙোতে ডিঙোতে সামনে গাঁয়ের একজন চাঁইকে দেখে বললুম, 'এই তো চার রাত এখানে একলা কাটিয়ে গেলুম, কই, আপনাদের ভূতের টিকিটিও তো দেখা গেল না।'

"এই কথা বলতে বলতে দেখি চৌকাটের ওপর থেকে ঝুরঝুর করে বালি পড়ছে। আমি একবার ওপর পানে চেয়ে নিয়ে তারপর পা চালিয়ে বারাণ্ডা পেরিয়ে সটান গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। ও-বিষয়ে এই তোর কাছে প্রথম মুখ খুলছি। তুই কি বলিস ?"

আমি বললুম, "কেস দু' তরফেই সমান ভাবে লড়া যায়। ঝুরঝুর বালি-পড়া স্বাভাবিক ভাবে ঘটতে পারে, ভূতের কাজও হতে পারে। তবে বেনিফিট অব ডাউটের খাতিরে ভূতের পক্ষেই রায় দিই।"

আমার অভিজ্ঞতায়—ভয় তাড়িয়ে ভূত ঠেকানো যায়। আমার বন্ধুর অভিজ্ঞতায়—ভয় ঠেকালেও ভূত ঠেকানো যায় না।

সত্য হয়তো দুই অভিজ্ঞতার মাঝামাঝি কিছু। কে জানে !

বারোমেসে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বছরের গোড়ায় জানুয়ারি
গায়ে দাও লেপ, ঠাণ্ডা ভারী।

ফেব্রুয়ারির ঘোড়ায় জিন
রয় না পুরো তিরিশ দিন।

পড়ল যেই মার্চ মাস
গরমে করি হাঁসফাঁস।

এপ্রিল থেকে মে-জুন
মাথার ওপর আগুন।

জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর
টইটম্বুর চরাচর।

অক্টোবরে আকাশ নীল
উৎসবে হয় প্রাণের মিল।

নভেম্বরে ভরলে গোলা
চড়ব আমরা নাগরদোলা।

ডিসেম্বরটা হলে কাবার
নতুন বছর শুরু আবার ॥

ছবি : দেবাশিস দেব

টিয়া চাঁদ ময়না

সন্তোষকুমার ঘোষ

আয় রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা—উঁহু উঁহু
দেখতে পাস না হাওয়া হু-হু
সবুজ বইছে পাতায় ডালে
ভেসে যা স্রেফ যা-কপালে,
—গা বাঁচিয়ে।

টিয়ে, আজকে যে তোর বিয়ে!
বন থেকে বেরুলি ঠিক
মাথায় টোপর, টিপটপ্‌টি
বর-লটবর! বোস, বোস, বোস,
ভুলিসনে আজ টানা উপোস
খিদে পায় তো নামিয়ে মুখ
(ঠোঁটটি লাল? তো)
দে না আলতো
চোরা চুমুক
দোষো নাস্তি খাস দারজিলিং টি-এ!

২

অমানিশি তাড়া করে
রাহু ওই ধরে
সর্বদা তাই বুঝি বুকটায় টিপ্‌টিপ?
গ্যারানটি, সেরে যাবি,
গোলগাল আয়ু পাবি,
চাঁদের কপালে চাঁদ, যদি হয়ে যাস টিপ!

৩

আয় রে আমার ময়না,
বন্ধ খাঁচায় খাসা বাঁচা
যা মন চায়, মুখ ফুটে চা
শীত-গিরিশ্‌শি ভয়-ডরের নাম নেই
মাপা ছাতু ছোলার বাটি সামনেই,
আকাশ যে তোর সয় না!

গাঁয়ের শ্রাবণ

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

গাঁয়ের শ্রাবণ বর্ষাকাল
জিরোয় চাষির বলদ-হাল।
গাঁয়ের লোকের জিরেন নাই
হাজার কাজ—নেই কামাই।
রোওয়া সারা, সবুজ ধান,
আলো-ছায়া গাইছে গান।

আল-আলিতে উলুই ঘাস
ঘাস-আগাছায় পোকার বাস।
হাজার চাষি, ছিদেম দাস।
ছিটোয় ওষুধ, নিড়োয় ঘাস।
খালের জলে পচছে পাট
পাট শুকোলেই বাঁধবে গাঁট।

বাঁশের সাঁকো, নালায় জল
নালার জলে মাছের দল।
সাঁকোর ওপর ছেলের পাল
পাতছে ঘুনি, ফেলছে জাল।
বৌ-ঝিয়েরা ঘাঁটছে পাঁক
খুঁজছে গুগলি, তুলছে শাক।

বৌ-ঝিয়েরা ফিরল বাড়ি
কাঠের আগুন চাপল হাঁড়ি।
সুয্যি গেলেন মাথার 'পর
গাঁয়ের চাষি ফিরল ঘর।
বসল পেতে পদ্ম-পাত
পড়ল পাতে গরম ভাত

গরম ভাতে অড়র ডাল
পুঁই-মেচুড়ি পুঁটির ঝাল।
কচি তেঁতুল টকের ঝোল
তার মধ্যে বাচ্ছা শোল।
শাওন মাসের এমনি ভোজ
খাটলে মাঠে—জুটবে রোজ।

দোকলা

সুশীল রায়

জলের নাকি ময়লা কাটে
একটু দিলে ফিটকিরি
সেই কাজেতেই মন দিয়েছি,
দিচ্ছ কি তাই টিটকিরি ?
মনে তোমার ময়লা ভীষণ
স্বভাবখানাও বিচ্ছিরি
গান জানো না, গলায় তবু
বাজছে যেন গিটকিরি।

২

গড়গড়িয়ে গড়িয়ে এসে বলল বুনো ওল,
"একা না রে, ছাগুলোকে মাটি খুঁড়ে তোল।"
অমনি শুরু হয়ে গেল দুরন্ত শোরগোল—
পাশের গাছের থেকে ঝুলে বলল তেঁতুল বাঘা,
"ওটা কে রে ? কী চেহারা ! নেই গোড়া, নেই আগা,
তেড়িবেড়ি করলে ওটার পালটে দেব ভোল।"

ছবি : দেবাশিস দেব

মুনিয়ার আয়া

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এবার, এই চব্বিশ ফেব্রুয়ারি মুনিয়ার ছ' বছরের জন্মদিনে কালোর মা একঘর কুটকুটে বন্ধুর সামনে তাকে একেবারে ডুবিয়ে দিল। মুনিয়ার কাঁদো-কাঁদো মুখ, রাগে তার বুক খুব তাড়াতাড়ি ওঠা-নামা করছিল। সে ভাবল, কালোর মা'র গায়ে চিমটি কেটে কেটে ঘা করে দেয়।

মুনিয়াকে যখন তার ক্লাসের বন্ধুরা ঝকমকে উপহার দিয়ে 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ' বলছে আর তার মা হেসে হেসে এক-একজনের হাতে তুলে দিচ্ছে কেক কাটলেট সন্দেশ ডালপুরি ভরা রঙচঙে কাগজের সুন্দর সুন্দর প্লেট তখন হঠাৎ কালোর মা সেই বার্থ ডে পার্টির মধ্যে গুটিগুটি এসে হাজির। এসে কিছু না ভেবে, এত বড় একটা ব্যাপারকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে বেশ জোরে জোরে ফস করে বলে বসল, "ও মুন্নি, শুন শুন, তোমার প্যাটটা ভাল নাই কিন্তু। বুইঝা-সুইঝা খাইও, না হইলে খুব মুশকিল হইব।"

কালোর মা'র কথা শুনে মুনিয়ার বন্ধুরা বেশ দমে গেল। সোনিয়া রেশমি সোনাল—এইসব অবাঙালি বন্ধুরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝল না, কিন্তু যারা বুঝল তারা দুঃখী-দুঃখী মুখ করে মুনিয়াকে বলল, "পেট ব্যথা করছে? বমি পাচ্ছে?"

"না না, আরে আমার কিছু হয়নি—" মুখ হাসি-হাসি করে বন্ধুদের এই রকম বলে থামিয়ে দিলেও কালোর মা'র ওপর রাগে মুনিয়া মনে-মনে জ্বলে যাচ্ছিল। ভাবল, পার্টিটা হয়ে যাক না, সে কালোর মা'র সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেবে, তার কোনো কাজ তাকে আর করতে দেবে না। মুনিয়া আরও ভাবল, তার অন্য সব বন্ধুদের যেমন ইংরেজি-জানা ফিটফাট আয়া আছে সে-ও স্কুল থেকে তেমন একজনকে নিয়ে আসবে। মুনিয়ার ক্লাস-টীচার সিস্টার সিরিল অনেকের জন্যে এই রকম আয়া ঠিক করে দিয়েছেন। মুনিয়ার স্কুলের সিস্টাররা অনেক গরিব মেয়েদের নাকি মানুষ করেন। তাদেরই তাঁরা ভাল-ভাল বাড়িতে কাজ ঠিক করে দেন।

মুনিয়ার পার্টির পর তার বন্ধুরা একে-একে চলে গেল। প্রেজেন্টের ঝকমকে প্যাকেটগুলো পড়ে থাকল একদিকে, মুনিয়া একটাও খুলল না। সে হাঁ-হাঁ করে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালোর মা'র ওপর। তাকে মেরে-ধরে খামচে চিমটি কেটে একেবারে অস্থির করে তুলল।

মুনিয়ার মা ছুটে এল তার কাছে। তাকে ধরে কোনো রকমে সামলে নিয়ে বলল, "জন্মদিনের দিন এ কী মূর্তি তোমার মুনিয়া? কী হল?"

মুনিয়া ছটফট করতে করতে জোরে কেঁদে উঠল, "কালোর মাকে আমার কোনো কাজ আমি আর করতে দেব না। ও আমার টিফিন সাজাবে না, ইউনিফর্ম পরাবে না, মাথায় শ্যাম্পু ঘষবে না। সিস্টার সিরিলের কাছ থেকে কালকেই আমার জন্যে নতুন আয়া আনতে হবে—"

মুনিয়ার মা অনেক চেষ্টা-টেস্টা করে সব শুনল। শুনে হাসল। পরে কালোর মাকে এমন বিশ্রী কাণ্ড করেছে বলে বকেও দিল। কিন্তু মুনিয়াকে যতই ভোলাক তার মা, যতই বোঝাক তাকে, আর কালোর মাকে যতই বকাবকি করুক না কেন, মুনিয়ার মন একটুও ভিজল না। সত্যি সত্যি কালোর মাকে সে আর তার কাছে ঘেঁষতেও দিল না। নতুন আয়া না আনলে—মুনিয়া বলল, সে তার কোনো বন্ধুর জন্মদিনে কালোর মা'র সঙ্গে যাবেও না। তার মা জানে, এ মাসে মুনিয়ার পরপর বেশ কয়েকটা জন্মদিনের নেমন্তন্ন আছে।

সব শুনে মুনিয়ার বাবা হেসে বলল, "মুনিয়ার জেদ ওর মায়ের মতো তো। শেষে মেয়েটা অসুখে-বিসুখে না পড়ে। তোমার একটা রান্নার লোকের দরকার না? ও-ভারটা কালোর মা'র ওপরেই দাও না-হয়, আর মুনিয়া যেমন চায়, স্কুল থেকে ওর মনের মতো একটা আয়া আপাতত নিয়ে এসো।"

শেষ অবধি তাই করা হল। মুনিয়া খুব খুশি। কালোর মা'র এখন আর কারোর সামনে বেরোবার উপায় নেই। তার দিন কাটে ওই ছোট্ট রান্নাঘরে। আর মুনিয়ার জন্যে এসেছে আগাথা। তার রঙ কালো হলে হবে কী, বাংলা-টাংলা সে জানে না। সিস্টার সিরিল মুনিয়ার মাকে বলেই দিয়েছে, "আগাথা ইংলিশ স্পীকিং ভেরি স্মার্ট আয়া।" কালোর মা জব্দ একেবারে, আগাথার সঙ্গে একটি কথাও বলতে পারে না। বেশ ভয়ে-ভয়ে থাকে তার সামনে।

মুনিয়া তার নতুন আয়ার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে এখানে-ওখানে যায় বটে, কিন্তু আগাথাকে নিয়ে আর তার কথাবার্তা শুনে এবং ভাবভঙ্গি দেখে মুনিয়ার মা'র প্রাণ যায় আর কী! প্রথম দিন সকালবেলা—কালোর মা যেমন খায় সেই রকম একটা কাঁসার থালায় রুটি আর আলুর তরকারি বেশ ভাল করে সাজিয়ে ধরে দিল আগাথার সামনে।

আগাথা রাগ-রাগ মুখে থালা ঠেলে সরিয়ে দিল, "আই নট ইট দিস ইন মর্নিং—"

কালোর মা আগাথার কথা বুঝতে না পারলেও তার ভাবভঙ্গি দেখে ধরে নিল, সে এসব খাবে না। তো খাবেটা কী? কিছু ঠিক করতে না পেরে কালোর মা হন্তদন্ত হয়ে এল মুনিয়ার মা'র কাছে। বলল, "আগাথা বেজার মুখে থালা ঠেইলা দিয়া ইংরাজিতে নটিট-ফিট কয়, খাইতে চায় না—"

মুনিয়ার মা ব্যাপারটা জানবার জন্যে আগাথাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "খাবে না কেন?"

"না। আই নট ইট চাপাতি পোটেটো ইন মর্নিং।"

"কী খাও তবে ?"

"আই ইট সিক্স ব্রেড-বাটার, ওয়ান হাফ বয়েল এগ, টু কাপ টী।"

আগাথার ব্রেকফাস্টের ফিরিস্তি শুনে তো মুনিয়ার মা'র হয়ে গেল। যদিও তাকে কিছু জানতে দিল না। মুনিয়ার ক্লাস টীচারের লোক, তার খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কিছু বলাও চলবে না এই মুহূর্তে।

বেশ ভয়ে-ভয়ে খুব নিচু স্বরে মুনিয়ার মা আবার জিজ্ঞেস করল আগাথাকে, "দুপুরে আর রাত্তিরে কী কী খাও তুমি আগাথা ?"

খাওয়ার কথা শুনে ফিক করে আগাথা হাসল, "আই ইট লাঞ্চ—রাইস ফিশ মাটন ফোর ডেজ, টু ডেজ চিকেন অ্যাণ্ড সুইট। নাইট সেম। ওনলি নো রাইস, এইট চাপাতি—"

মুনিয়ার মা'র মুখ শুকিয়ে এতটুকু। আগাথাকে এইরকম খাইয়ে-দাইয়ে রাজ-অতিথির মতো রাখা তো ভীষণ ব্যাপার। কিন্তু উপায় কী, কিছুদিন চালাতেই হবে।

তবে আগাথাকে পেয়ে মুনিয়া খুব খুশি। সে খায় যেমন, কাজও করে তেমন পরিপাটি করে। খুব চটপটে মেয়ে আগাথা। মুনিয়ার বইপত্র সে গুছিয়ে রাখে সুন্দর করে। তার স্কুলের ইউনিফর্ম ঝকঝকে করে বোধহয় লন্ড্রির চেয়ে ভাল ইস্তিরি করে দেয়। ঠিক সময় মুনিয়াকে সাজিয়ে-গুজিয়ে গাড়িতে তুলে দেয়। একদিনও এক মিনিটের জন্যে দেরি হয় না। মুনিয়া বেশ গর্বের সঙ্গে আগাথাকে নিয়ে তার বন্ধুদের বাড়ি যায়।

তা তো যায়, কিন্তু যত দিন যায় ওই আগাথাকে নিয়েই মুনিয়ার মা পড়ে আরও মুশকিলে।, একদিন মুনিয়া স্কুলে বেরিয়ে যাবার পর-পর আগাথা তার মা'র সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, "আই ওয়ান্ট সোপ শ্যাম্পু ক্রীম ফেস-পাউডার।"

মুনিয়ার মা'র বুক ধক্ করে উঠল। একটু ইতস্তত করে সে মিনমিন করে উঠল, "সাবান তো আছে। শ্যাম্পু দরকারমতো আমি দেব—"

"নো নো—" আগাথা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আই লাইক মাই থিং। গিভ নাইনটিন রুপীজ, আই বাই ফ্রম নিউ মার্কেট।"

উনিশ টাকা তো গেলই। তার ওপর নিউ মার্কেটে যাওয়া-আসার মিনিবাসের ভাড়া। বাসে-ট্রামে চড়ার অভ্যেস নেই আগাথার। ভিড়ে তার নিশ্বাস নাকি বন্ধ হয়ে আসে। এই রকম খরচ প্রায়ই করতে হবে ভেবে মুনিয়ার মা বেশ কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকল। এর চেয়ে একটা হাতি-টাতি পোষা বোধহয় ভাল। মুনিয়ার মা ভাবল, একটা ফ্ল্যাট কিনব-কিনব করে কেনা হচ্ছে না শুধু খরচের কথা ভেবে। কিন্তু আগাথার পেছনে যা ঢালতে হচ্ছে তা জমিয়ে একটা ভাল ফ্ল্যাট বেশ কম সময়ের মধ্যেই হয়তো কেনা যায় এই কলকাতা শহরে।

মুনিয়ার মা একরকম ঠিক করেই রাখল আগাথাকে কিছুতেই আর বেশিদিন রাখা চলবে না। কায়দা-টায়দা করে তাকে বিদায় করে দিতেই হবে যত শিগগির হয়। কিন্তু বিদায় করা তো সোজা নয়। মুনিয়া খেপে যাবে। লজ্জায় সে হয়তো আর সিস্টার সিরিলের ক্লাসেই যেতে চাইবে না। উঃ, কী যে বিপদে পড়া গেছে!

মুনিয়ার বাবার সঙ্গে ফিসফাস শলা-পরামর্শ করে তার মা সুযোগ বুঝে ফাঁকে-ফাঁকে মুনিয়াকে প্রায়ই বোঝায়, "দ্যাখো মুনিয়া, ছ' বছর বয়েস হয়ে গেল তোমার, বড় হয়ে গেলে তো! এখন আর আয়া-টায়ার কী দরকার—"

মুনিয়া চোখ বড় করে ভেবে ভেবে বলে, "আভভার আয়া আছে। সোনালের আছে। সোনিয়ার আছে—"

"আরে, ওরা বোকা মেয়ে। তোমার মতো স্মার্ট তো নয়—"

এমন সময় একটু দূর থেকে মেমসাহেবের মতো টেনে টেনে মধুর করে আগাথা ডাকল, "মু-নি-য়া !"

"ইয়েস আগাথা—" পড়ি-কি-মরি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল মুনিয়া। আর তার মা আপনমনে গজগজ করতে লাগল একা-একা।

একটু পরেই মুনিয়া আবার হাঁফাতে-হাঁফাতে ছুটে এল তার মা'র কাছে। তার মুখ যেন খুশিতে জ্বলছে। সে বলল, "মা মা, ও-মা, শিগগির পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে কেকের অর্ডার দিয়ে এসো। বাইশটা ক্যাণ্ডেল আনতে হবে, আর রুপোর বালা—"

মুনিয়ার মা প্রথম-প্রথম কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মেয়ের মুখের দিকে।

তখন মুনিয়া তাকে ঠেলা মেরে আবার বলল, "পরশু আগাথার জন্মদিন। ওকে রুপোর বালা দিতে হবে, আমাকে বলেছে। জানো মা, আগাথার বয়েস বাইশ হবে। কী মজা! আবার পার্টি হবে!"

"তুই থাম তো—" বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই বলে উঠল মুনিয়ার মা।

তখন থামল বটে মুনিয়া। কিন্তু পরে তার বাবাকে ধরে কেক আর মোমবাতি আনিয়ে বেশ ঘটা করেই আগাথার বার্থ ডে পার্টি করল। রুপোর না হলেও চকচকে একজোড়া বালাও পেয়ে গেল আগাথা।

যাহোক, ওদিকে মুনিয়ার মা-ও আগাথাকে বিদায় করবার মস্ত একটা সুযোগ পেয়ে গেল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি ওকে সরিয়ে না দিলে আবার কখন কী জিনিস আদায় করবার ফন্দি-ফিকির করে ঠিক কী। এর মধ্যেই তো অতিষ্ঠ করে তুলেছে মুনিয়ার মাকে।

সুখবরটা হল এই যে, সিমলায় বদলি হয়ে গেছে সিস্টার সিরিল, কাজেই মুনিয়ার স্কুলে অপ্রস্তুত হওয়ার আর কোনো কারণ নেই।

একসময় মুনিয়ার মা আগাথাকে কাছে ডেকে গলার স্বর যতদূর সম্ভব মিষ্টি করার চেষ্টা করে থেমে থেমে আস্তে আস্তে তাকে বলল, "দ্যাখো আগাথা, মুনিয়া খুবই ভাল ছিল তোমার কাছে—"

"ইয়েস, আই নো—" যেন এমন কথা দু'বেলা শোনে, আগাথা মুখের এমন ভাব করে হাসল।

"তবে তোমাকে আর বোধহয় আমরা রাখতে পারব না।"

আগাথার কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল। সে ঢোক গিলে বলল, "হোয়াই ?"

একটু চুপ করে থেকে মনে-মনে কী ভেবে নিয়ে মুনিয়ার ,মা আগাথার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মুনিয়ার বাবার অফিসে খুব গোলমাল চলছে। মাইনে-টাইনে কবে আবার পাবে ঠিক নেই। এখান থেকে বদলিও হয়ে যাবে হয়তো। তাই পয়লা তারিখ থেকে তোমাকে আর রাখতে পারব না বলে আমি খুব দুঃখিত—" এ-কথা বলতে যেন বুক ভেঙে যাচ্ছে, মুখ এই রকম করুণ-করুণ করে আগাথার দিকে তাকাতেই তার চেহারা দেখে চমকে উঠল মুনিয়ার মা।

আগাথার মুখ থমথম করছে। চোখ কী-রকম যেন। পাগল-পাগল ভাব। সে থরথর করে কাঁপছে। এখুনি বোধহয় পড়ে যাবে।

পড়ে গেল না আগাথা, মাটিতে বসে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল, "এখন আমি যামু কই, খামু কী? সিস্টার সিরিল গেছে গিয়া—"

আগাথার মুখে বিশুদ্ধ পুববাংলা ভাষা শুনে মুনিয়ার মা'র চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে আর কী। কিন্তু কথা বলার আর সুযোগ হয় না।

হুড়মুড় করে সে-ঘরে ঢোকে কালোর মা। কিছুক্ষণ সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আগাথার দিকে। পরে তার গাল টিপে বলে, "অরে বুড়ি, এ যে আমাগো দ্যাশের মাইয়া।"

আগাথা ঘাড় নেড়ে বলে, "হ।"

একমুখ হেসে কালোর মা বলে, "কথাটা আগে কইলেই তো হইত। ইংরাজি ফটর-ফটর কইর‍্যা এমন ভোল ধরনের কী কাম ছিল? হ, বুঝছি। ভাল খাওন-দাওন আর সাজগোজ করনের লইগ্যা ?"

"কিছু চাই না আমার। আমি এখানে থাকবার চাই। আমার মা-বাপ নাই, কেউ নাই—" কাঁদতে কাঁদতে আগাথা মুনিয়ার মার পায়ে পড়তে যায় আর কী।

এরপর আগাথাকে ছাড়াবার কথা আর ওঠে না। সে থেকেই গেল। কিন্তু এবার মুনিয়া পড়ল ভাবনায়। তার ভয়, আসছে বছর তার জন্মদিনে কালোর মা'র মতো আগাথাও যদি বলে বসে, "ও মুন্নি, শুন শুন, তোমার প্যাটটা ভাল নাই কিন্তু। বুইঝা-সুইঝা খাইও, না হইলে খুব মুশকিল হইব—"

তখন কী করবে মুনিয়া ?

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বিমল কর

কিশোর ফিরে এসেছিল

পরপর তিনদিন একই ঘটনা ঘটার পর কৃপানাথ ব্যাপারটাকে আর তামাশা বলে উড়িয়ে দিতে পারল না। অফিসে, দুপুরের দিকে, কোনোদিন একটা নাগাদ, কোনোদিন দেড় কি দুটোর সময়, পরপর তিন দিনই ফোন এল। প্রথম দিন ফোন ধরে সাড়া দিতেই ওপাশ থেকে সামান্যক্ষণ কোনো জবাব নেই। একেবারে চুপচাপ। শুধু কেমন এক শব্দ হচ্ছিল,

ছবি : সুনীল শীল

যেন কেউ জোরে-জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। কৃপানাথ অপেক্ষা করে আবার সাড়া দিল। "হ্যালো?"

এবার ও-প্রান্তে গলা শোনা গেল। প্রথমে কাসির শব্দ। তারপর ভাঙা গলায় কে যেন বলল, "কৃপানাথ?"

"কথা বলছি।"

আবার একটু চুপচাপ। শেষে ও-প্রান্তের মানুষটি বলল, "আমি কিশোর।"

কিশোর? কৃপানাথ কেমন থতমত খেয়ে গেল। কিশোর! মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না।

"আমি কিশোর।" ও পাশ থেকে ভাঙা গলায় আবার কেউ বলল। "আমি বেঁচে আছি। আমি কিশোর।" তারপরই ফোনের লাইন কেটে গেল।

কৃপানাথ কয়েক মুহূর্ত ফোন হাতে দাঁড়িয়ে থাকল। ও পাশে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই, ফোন নামিয়ে রেখেছে।

হাতের ফোনটাকে কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখল কৃপানাথ, তারপর নামিয়ে রাখল। কেউ ঠাট্টা-তামাশা করল। কোনো বন্ধু। প্রফুল্ল হতে পারে। প্রফুল্ল মাঝে-মাঝে এইরকম তামাশা করে। একেবারে ছেলেমানুষি স্বভাব। বয়স যত বাড়ছে তত মাথায় বদ বুদ্ধি খেলছে। মানুষকে ভড়কে দেওয়া, হকচকিয়ে দেওয়া তার এক ধরনের মজার খেলা। বারণ করলে শোনে না। বলে, কেমন বোকা বানালুম বল্।

কৃপানাথের সন্দেহ হল, এটা প্রফুল্লরই কাজ। চার-পাঁচ রকম গলা এবং অভিনয়—দুইই সে করতে পারে। কোন্ এক গ্রুপ থিয়েটারে সে ছোটখাটো পার্টও তো করে। তারই ফাজলামি।

তা ফাজলামি হলেও কিশোরের নাম নিয়ে এ-রকম তামাশা করা উচিত হয়নি। সব জিনিসেরই মাত্রা আছে। আজ মাস চার-পাঁচ কিশোর বেপাত্তা। সে অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে বলে সবাই জানে। যে মারা গিয়েছে, তার নাম করে রঙ্গ করা ভব্যতা নয়। প্রফুল্লকে ধমকাতে হবে দেখা হলে।

কৃপানাথ সামান্য বিরক্ত হলেও ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিনে আবার। সেই একই রকম গলা। একই কথা: 'আমি কিশোর। কিশোর। আমি বেঁচে আছি।'

কৃপানাথ খানিকটা রাগ করেই বলেছিল, "কী হচ্ছে কী! তামাশা হচ্ছে?"

ওদিক থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ফোন রেখে দিল বোধহয়।

দ্বিতীয় দিনে সত্যিই বিরক্ত হয়েছিল কৃপানাথ। এ কোন্ ধরনের মজা? যে মানুষটা নেই, তাকে নিয়ে রসিকতা। ছি!

তৃতীয় দিনে আবার যখন ফোন এল, কৃপানাথের কেমন মনে হল, আবার সেই লোকটাই হবে। বিরক্ত এবং রুক্ষ হয়েই ফোন ধরল কৃপানাথ।

যা ভেবেছিল কৃপানাথ ঠিক তাই। সেই একই লোক, একই গলা।

কৃপানাথ রুক্ষভাবে বলল, "বড় বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়তে হবে।"

ও-পাশ থেকে জবাব এল, "আমি সত্যিই কিশোর।"

"কিশোর অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে আজ চার-পাঁচ মাস।"

"না। আমি বেঁচে আছি।"

"বেঁচে থাকলে আসছ না কেন?"

"পারছি না।"

"কোথায় আছ তুমি? তোমার বাড়িতে?"

"না না। অন্য জায়গায়।"

"কোথায়?"

"শুনে তোমার লাভ হবে না। একদিন তোমার সঙ্গে কোথাও দেখা করা যায় না?"

"তুমি আমার মেসে আসতে পারো।"

"না। অন্য কোথাও।"

"কোথায়?"

"দেখি।...পরে বলব।"

তৃতীয় দিনের পর কৃপানাথের কেমন ধোঁকা লেগে গেল। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় শুধু, একেবারেই অবিশ্বাস্য। একটা মরা লোক বেঁচে উঠতে পারে না। তা হলে কি কিশোর মারা যায়নি? তাই বা কেমন করে হবে। সবাই জানে কিশোর মারা গিয়েছে। কিশোরের আত্মীয়-স্বজনরা কি মিথ্যে কথা বলবে! অথচ একটা লোক রোজ ফোন করে কৃপানাথকে জানাচ্ছে, সে কিশোর, বেঁচে আছে সে। আশ্চর্য! লোকটাকে নিশ্চয় অবিশ্বাস করা যায়। কিন্তু অকারণে কেন একটা লোক এই তামাশা করবে!

ব্যাপারটা কৃপানাথের মাথায় আসছিল না। কিশোর বেঁচে আছে—এ-কথা সে বিশ্বাস করে না; আবার যে-লোকটা ফোন করছে রোজ—তাকে একেবারে উড়িয়ে দিতেও খটকা লাগছে। সবই রহস্যময়। না, এ-ভাবে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, অনন্তর সঙ্গে কথা বলা দরকার। অনন্ত চালাক চতুর, বুদ্ধিমান। কিশোরের আত্মীয়-স্বজনকে সে ভাল করে চেনে।

কৃপানাথ দেরি করল না। সন্ধের দিকেই অনন্তর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

বাড়িতেই ছিল অনন্ত।

অনন্ত খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ঘরে আসতেই কৃপানাথের নজরে পড়ল, তার বাঁ পায়ে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো।

"কী রে, পায়ে কী হল?"

"এম টি পি।"

"মানে?"

"গর্তে পড়েছি। দিন চারেক হয়ে গেল। মাথার ওপর লোড শেডিং; পায়ের নীচে মেট্রো রেলের গর্ত। জোর বেঁচে গিয়েছি। পা ভেঙে যেত। অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে। গোড়ালি মচকে গিয়েছে। তারপর তোর খবর কী? এক হপ্তা ধরে বেপাত্তা! আজকেও ভাবছিলাম, তুই আসবি।"

"খবর অনেক," কৃপানাথ হাসল।

"তা তো হবেই। তোরা খবরের কাগজের অফিসের লোক। ঝুড়ি-ভরতি খবর মাথায় করে ঘুরে বেড়াস।"

"না রে, না," কৃপানাথ হাসিমুখেই বলল, "আমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করি; ভাউচার লিখি। আমার হল টাকা-পয়সার ব্যাপার, খবরের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।...কিন্তু আজ তোকে একটা খবর দিতেই এসেছি। অদ্ভুত খবর।"

অনন্ত ততক্ষণে গদিঅলা সেকেলে চেয়ারে বসে পড়েছে। বসে পড়ে চোটলাগা পায়ে হাত বুলোল। "কী খবর?"

কৃপানাথ সরাসরি অনন্তর দিকে তাকিয়ে বলল, "আজ তিনদিন—পরপর তিনদিন—দুপুরে একজন আমায় ফোন করছে অফিসে। বলছে সে কিশোর।"

অনন্ত সোজা হয়ে বসল। তাকাল। "কিশোর! যাঃ!"

"তিন দিন পরপর ফোন করল। একই সময় প্রায়। প্রথম দিন আমি ভেবেছিলাম, কেউ ইয়ার্কি মারছে। প্রফুল্লর কাজ। তার পরেও দু দিন ফোন করল। আজ দু-চারটে কথাও হয়েছে।"

অনন্ত বিন্দুমাত্র কানে তুলল না কথাটা। "তোর মাথা খারাপ হয়েছে। কানের দোষ হয়েছে, কৃপা। কী শুনতে কী শুনেছিস! যা যা, কানটা দেখিয়ে আয়।"

কৃপানাথ এবার ঝুঁকে পড়ল, গলার জোর বাড়াল। "না রে, বিশ্বাস কর; আমি বাজে কথা বলছি না। বিলিভ মী!"

"বিলিভ? তোর কথা বিলিভ করার আছে কী! একজন মরা মানুষ তোর সঙ্গে ফোনে কথা বলবে! ভূতের গল্পকেও হার মানালি!"

কৃপানাথ মাথা নাড়তে লাগল। "সত্যিই ভূতের গল্পকে হার মানানোর মতন ব্যাপার। আমি নিজেও বিশ্বাস করছি না। কিন্তু...!"

"কিসের কিন্তু?"

"লোকটা যেই হোক, সে রোজ আমায় ফোন করবে কেন? কিসের স্বার্থ তার? আমি একেবারে সামান্য মানুষ, হেঁজি-পেঁজি

দ্রলোকের ; আমার কাছে ধন-দৌলত নেই, কিশোর আমাদের বন্ধু ছিল, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতাও ছিল না। কাজেই আমার কাছ থেকে কিশোরের নাম করে ভড়কি দিয়ে কারও কোনো লাভ হবে না, লোকসানও হবে না।"

এমন সময় চা এল। অনন্তর বউদি পাঠিয়েছেন। চায়ের সঙ্গে ডালপুরি। অনন্তর বউদিকে ওরা বন্ধুরা সকলেই ছোট বউদি বলে। এমন হাসিখুশি চমৎকার মানুষ শয়ে একজনও পাওয়া যায় না।

দাশরথি চা দিয়ে চলে গেল।

অনন্ত বলল, "নে, খা।"

"তুই ?"

"খাব। তুই নে।" বলে অনন্ত যেন কিছু ভাবল। তারপর বলল, "কেউ বদমাইসি করছে।"

ডালপুরি তুলে নিয়ে কৃপানাথ বলল, "আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু কে করবে ? কেন করবে ? আর সবাইকে ছেড়ে আমাকেই বা করল কেন ?"

অনন্ত এবার আর কথা বলল না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে কপাল ঘষতে লাগল। এটা ওর মুদ্রাদোষ, কিছু ভাবতে বসলেই কপাল রগড়ায়।

কৃপানাথ ডালপুরি মুখে দিল।

খানিকক্ষণ পরে অনন্ত বলল, "গলা শুনে কী মনে হল ? কিশোরের গলা ?"

"না। গলা কিশোরের মতন নয়। ভাঙা-ভাঙা গলা।"

"তা হলে ?"

"কথা বলার ঢঙ কিন্তু কিশোরের মতন। তুই লক্ষ করে থাকবি, কিশোর আমাকে কৃপানাথ বলত না, বলত কৃপা না-থ। মানে, টেনে-টেনে নাথ বলত। অবিকল সেইভাবে কৃপানাথ বলল।"

অনন্ত হাত বাড়িয়ে একটা ডালপুরি তুলে নিয়ে মুখের সামনে দোলাতে লাগল। "তুই বলছিস—লোকটা কিশোর হতে পারে।"

"আমি কিছুই বলছি না। ব্যাপারটা কেমন যেন। বুঝতে পারছি না। তাই তোকে বলতে এলাম।"

"আমিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"তোকেও তো ফোন করতে পারত। তোদের বাড়িতে ফোন আছে।"

"আমাদের ফোন খারাপ। দিন দশেক হল ডেড়। বলে-বলে হয়রান হয়ে গিয়েছি। কলকাতার টেলিফোন. ঘরে সাজিয়ে রাখা ছাড়া কাজে আসে না।" অনন্ত ডালপুরি মুখে পুরল। "হয়তো চেষ্টা করেছিল, পায়নি।"

"তাই হবে। আমায় কিন্তু কিছু বলেনি।...তোর সঙ্গে কিশোরের বন্ধুত্ব কম নয়। তুই ওদের বাড়ির ভেতরের খবর জানিস। আমিও তাই অবাক হয়ে ভাবছি, কেন তোকে ফোন করল না ?"

অনন্ত কোনো কথা বলল না।

দুজনেই চুপচাপ।

ঘরের পাখাটা জোরেই চলছিল। শব্দ হচ্ছে। অনন্তদের নীচের তলার বসার ঘরের একপাশে গলি, অন্যপাশে একফালি পোড়ো জমি। গলি দিয়ে অনবরত রিকশা যাচ্ছে। কুলপিমালাইঅলার হাঁক ভেসে এল। আষাঢ় মাস চলছে। সেই কবে দু পশলা বৃষ্টি হয়েছিল—তারপর আকাশ থেকে মেঘ উধাও। গরম চলছে খুব।

অনন্ত বলল, "মরা মানুষ ফোন করতে পারে না, কৃপা। সামথিং ইজ রং। অন্য কেউ ফোন করছে।"

"কেন ?"

"কী জানি !"

"কিশোরের মৃত্যু সম্পর্কে তুই শিওর ?"

অনন্ত সন্দেহের চোখে কৃপানাথের দিকে তাকাল। "কী বলতে চাস ?"

"কিশোর মারা গেছে আমরা জানি। কিন্তু তার ডেড়বডি আমরা দেখিনি।"

"তুই কি কিশোরের মারা যাওয়া নিয়ে সন্দেহ করছিস ?"

"না, আমি জানতে চাইছি।"

আর-একটা ডালপুরি শেষ করে কৃপানাথ চায়ের কাপ টেনে নিল।

অনন্ত বলল, "কিশোর মারা গিয়েছে এই খবরটা ওদের বাড়ির লোক জেনেছে দিন তিন-চার পর। জানার পর ওরা মতিহারির দিকে বালুয়াসরাই না কোথায় যেন ছুটে যায়। ফিরে আসে দিন দুই পরে। কিশোরের যে-রকম অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, তাতে কেউ বাঁচে না। তার চেহারার যা বর্ণনা শুনেছি—তুই জানিস—।"

"আমি তোর মুখেই শুনেছি।"

"আমি শুনেছি কিশোরের দাদার কাছে। ওর দাদা বলেছেন, দলা পাকানো একটা মাংসের তাল। চোখমুখ চেনা যায় না। হাত-পা আলাদা করে ধরার উপায় নেই। তার ওপর শেয়ালে শকুনিতে চারদিকে খাবলে রেখেছে। কিশোর যেখানে পড়ে ছিল সেখান থেকে ওকে সরানোর উপায় ছিল না। জঙ্গলের কাঠ আর কেরোসিন তেল ঢেলে সেখানেই সৎকার করা হয়েছে।"

সবই শুনেছে কৃপানাথ অনন্তর মুখে। কিশোরদের বাড়িতে সেই সময় তার যাওয়া হয়নি। কলকাতায় ছিল না। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে আসানসোল গিয়েছিল। পরে কলকাতায় ফিরে কিশোরের কথা শুনেছিল। তাদের বাড়িতেও গিয়েছিল। কিশোরের দাদা খুঁটিনাটি কিছু বলেননি কৃপানাথকে। দুঃখই করছিলেন। সবিস্তারে কিছু শুনতে চায়নি কৃপানাথ ; অনন্তর কাছে যা শুনেছে সেটাই যথেষ্ট, তাতেই তার গা শিউরে উঠেছিল ; আরও বেশি শুনে কী লাভ !

চা খেতে-খেতে অনন্ত বলল, "তুই তো ভাবিয়ে তুললি, কৃপা।...লোকটাকে একবার চোখে দেখতে পারলে হত।"

"আমারও তাই মনে হয়।...লোকটা নিজেই দেখা করতে চাইছে।"

অনন্ত অবাক চোখে তাকাল। "বলিস কী ?"

"আজ ও নিজেই প্রথমে দেখা করার কথা বলল।"

"কোথায় ?"

"সেটা বলল না। পরে জানাবে।"

"তোকে ঠিক-ঠিক কী বলেছে শুনি ?"

"আমি ওকে আমার মেসে এসে দেখা করতে বলেছিলাম। বলল, অন্য কোথাও দেখা করতে চায়। কোথায় তা বলেনি। পরে জানাবে বলেছে।"

অনন্ত কোনো কথা বলল না আর। চুপচাপ চা খেতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে অনন্ত বলল, "তোর কী মনে হচ্ছে ? দেখা করবি ?"

"কী করব তুই বল ? তোর কাছে জানতে এসেছি।"

"আমার তো মনে হয়, দেখা করা ভাল। লোকটাকে চোখে দেখলে তবু সত্যি-মিথ্যের একটা ধারণা করা যায় !"

"আমারও তাই ইচ্ছে। কোথাও একটা রহস্য রয়েছে, তাই না ?"

"রীতিমত রহস্য। মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে কথা বলছে এর চেয়ে বড় রহস্য আর কী থাকতে পারে রে," অনন্ত হাসল। একটু পরেই গম্ভীর হয়ে বলল, "দুটো জিনিস হতে পারে। এক কিশোরের নাম করে কোনো জোচ্চোর কিছু মতলব ফেঁদেছে, আর না হয়— কিশোর মারা যায়নি। তবে শেষেরটা বিশ্বাস করা যায় না। কারণ কিশোরের বাড়ির লোক যখন বলছে সে মারা গেছে, তাকে পুড়িয়ে আসা হয়েছে—তখন অন্য কথা ভাবাই যায় না। কোনো জোচ্চোর কিছু মতলব এঁটে ফোন করছে বলেই মনে হয়। কলকাতা শহরে চোর-জোচ্চোরের অভাব নেই। তুই দেখা কর।"

"আমি একা যাব না। তোকেও যেতে হবে।"

"আলবাত যাব। কিন্তু তোর কিশোর যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে না চায় ?"

"কিশোর হলে নিশ্চয় চাইবে। কিশোর না হলে চাইবে না।"

"বেশ। আমি রাজি।... দেখা করার দিন আমায় জানাবি।"

২

মেসে ফিরে কৃপানাথ শুনল, তার রুমমেট বনবিহারীদা তাঁর অফিসের কোন্ বন্ধুর সঙ্গে মুরশিদাবাদ গিয়েছেন। কেন গিয়েছেন বলে যাননি, শুধু জানিয়ে গিয়েছেন, পরশু দিন ফিরবেন। বনবিহারীদা খানিকটা পাগলা গোছের মানুষ। এল· আই· সি· অফিসে কাজ করেন। পেশা চাকরি। নেশা, কোষ্ঠী-বিচার আর মাছ-ধরা। চমৎকার

গল্প করতে পারেন। তবে মাঝে-মাঝে যখন ভাবাবেগে শ্যামাসঙ্গীত ধরেন তখন কানে তুলো গুঁজতে হয়। তাঁর গলাকে সবাই বলে ডিজেল ইঞ্জিন। বনবিহারীদা কারও কথার তোয়াক্কা করেন না।

বনবিহারীদা নেই। ঘরে কৃপানাথ একা।

স্নান সেরে এসে কৃপানাথ দেখল, সাড়ে আটটা বেজেছে। খাওয়া দাওয়ার দেরি রয়েছে এখনও। একবার মনে হল, ছাদে গিয়ে বসে, একটু হাওয়া খাওয়া যেতে পারে। পরে, মনে হল, ছাদে গিয়ে লাভ নেই। মেসের দশ আনা মানুষই এখন ছাদে; গুলতানি, গলাবাজি, রাজ্যের রাজনীতির খোশগল্প করছে। ভাল লাগে না তার ওসব।

বাতিটা নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল কৃপানাথ। দুটো ভাঙা-চোরা জানলা দিয়ে কখনও-সখনও এক-আধ ঝলক পথ-ভুল-করা হাওয়া আসছিল।

শুয়ে পড়ার পরই আবার তার কিশোরের কথা মনে পড়ল।

কিশোর তার বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনন্তর মতনই। কৃপানাথ, কিশোর, অনন্ত, জগন্নাথ সব একসঙ্গে কলেজে পড়াশুনা করত। আরও অনেক বন্ধু ছিল। তারা একে-একে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, কে কোথায় চলে গিয়েছে তার খোঁজও রাখতে পারেনি কৃপানাথ। তারা তিন-চারজনই শুধু কাছাকাছি ছিল। গত বছর জগন্নাথও দিল্লি চলে গেল চাকরি নিয়ে। পড়ে থাকল কৃপানাথ অনন্ত আর কিশোর। সেই কিশোরও গত চার-পাঁচ মাস আগে মারা গেল দুর্ঘটনায়।

দুঃখই হোক আর আঘাত হোক মানুষ ধীরে ধীরে সহ্য করে নেয়। কিশোর নেই এ-কথা জানার পর তাকে হারাবার দুঃখও সয়ে নিয়েছিল কৃপানাথরা আজ ক'মাসে। কিন্তু যে-কোনো একজনের— সে কে কৃপানাথ জানে না, তার ফোন পাবার পর মনটা আবার কেমন হয়ে গেল কৃপানাথের।

কিশোরের কথা এখানে কিছুটা বলতে হয়।

কিশোরদের বাড়ি বাদুড়বাগানে। পুরনো বাড়ি। তার ঠাকুরদার আমলের। এককালে বাড়িটা নাকি বিশাল ছিল। পাঁচ শরিকে ভাগাভাগি হতে হতে কিশোরদের ভাগে যেটুকু পড়েছিল, তাও একেবারে সামান্য নয়। পাঁচ-ছ'টা ঘর, বারান্দা, উঠোন— এসব মিলিয়ে ছোটখাটো দোতলা বাড়ির সমান। কিশোরের মা নেই। বাবা আগেই গিয়েছেন। তার দাদা এবং এক দিদি। ঠিক নিজের নয়, বৈমাত্র ভাইবোন। বড়মা আগেই মারা যান। কিশোরের মা মারা যান স্বামীর মৃত্যুর পর।

কিশোরের মা বেঁচে থাকার সময় সংসারের সব দায়-দায়িত্ব ছিল তাঁর। মা মারা যাবার পর দাদার কর্তৃত্ব শুরু হয়। দাদা এবং দিদির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ ছিল না কিশোরের। ভালও নয়। মোটামুটি। কিশোর বাড়ির কথা স্পষ্ট করে কখনও বলত না। মুখ ফশকে দু একবার অবশ্য বেরিয়ে যেত।

কিশোরের হয়তো মনে-মনে কোনো দুঃখ ছিল। সে দু'একবার দুঃখ করে বলেছে, 'বাইরে যদি একটা চাকরি পাই চলে যাব। এখানে আর ভাল লাগে না।'

কেন লাগে না তা বলত না।

কিশোর যখন বেকার, কাগজ ঘেঁটে, বাইরের চাকরির জন্যে দরখাস্ত পাঠাত।

শেষ পর্যন্ত সে একটা চাকরি পেয়ে গেল। কিন্তু পুরোপুরি বাইরের নয়। কলকাতায় থাকতে হত কিছুদিন, বাকিটা বাইরে ঘুরতে হত।

চাকরিটা ভাল। একটা আধা-বিদেশী কম্পানি দিল্লির দিকে রেডিয়ো তৈরির বড় কারখানা খুলেছিল। কলকাতায় তাদের ইস্টার্ন জোনের অফিস। কিশোরকে এই কলকাতার অফিসে চাকরি দেওয়া হল। তার কাজ ছিল, গাদাগুচ্ছের ছাপানো কাগজ, রঙচঙে ক্যাটালগ নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। সোজা কথা, রেডিয়ো বিক্রির এজেন্ট আর দোকান খুঁজে বেড়াত কিশোর।

কিশোর চাকরিটা পছন্দ করে নিয়েছিল। মাইনেপত্র, বাইরে ঘোরার খাই-খরচা ভাল ছিল। বেড়াতেও পারত নানান জায়গায়।

কিশোর কোনো কালেই চটপটে স্বভাবের নয়। খানিকটা লাজুক, নিরীহ স্বভাবের। কিন্তু তার চেহারা ছিল ছিমছাম। ভাল লাগত দেখতে। ধীরে-ধীরে কথা বলত। চোখ দুটো বড়-বড়। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বললে, কেমন একটা মায়া পড়ে যেত।

কৃপানাথরা প্রথমে ভেবেছিল কিশোর যা লাজুক, নিরীহ ছেলে, ওর দ্বারা রেডিয়ো বিক্রির দালালি হবে না। ধারণা পালটে গেল। কিশোর তার কাজকর্ম ভালই করছিল।

মাস চার-পাঁচ আগে— ঠিক-ঠিক হিসেবে সাড়ে পাঁচ মাস, মানে তখন বসন্তকাল হলেও পড়ন্ত শীত চলছে— ফেব্রুয়ারি প্রায় শেষ, কিশোর কলকাতা ছেড়ে তার কাজে বেরিয়ে গেল। এবার তার বিহারের দিকে যাবার কথা। প্রথমে পাটনা যাবে। সেখানে কাজ সেরে বেরিয়ে পড়বে অন্যঅন্য জায়গায়।

পাটনা থেকে কিশোর জানুয়ারির শেষ দিনে বেরিয়ে পড়ে। বাড়িতে সে শেষ চিঠি লেখে পাটনা থেকে। তারপর আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ফেব্রুয়ারির দশ-বারো তারিখে কিশোরের দাদার কাছে খবর আসে, কিশোর অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে। তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে বালুয়াসরাই বা ওই রকম এক জায়গায়।

কিশোরের দাদা কাকে যেন সঙ্গে করে সেই দিনই কলকাতা ছাড়েন।

ভাইকে দাহ করে ফিরে আসার পর কিশোরের দাদা যা বলেছেন, অনন্তই ভাল করে জানে। কৃপানাথ জানে না।

কৃপানাথ শুনেছে, একটা ভাড়া করা জীপে কিশোর আরও তিন-চার জনের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিল। মাইল দশ-বারোর রাস্তা। সন্ধের পর বেরিয়েছিল ; রাত হবার আগেই রেল স্টেশনে পৌঁছে যাবার কথা। সেদিন শীত ছিল বেশ ; কুয়াশাও। রাস্তাও ভাল নয়। মাঝে এক জায়গায় দু'জন যাত্রী নেমে যায়। জীপে ওরা তিনজন ছিল : কিশোর, এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক আর গাড়ির ড্রাইভার। মাইল দুই এগিয়ে জীপটা কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা মেরেছিল। কিসের সঙ্গে কেউ জানে না। রাস্তার পাশে কোনো বড় গাছ ছিল না। দু পাশে ফাঁকা মাঠ। ধাক্কা লাগার পর জীপটা মাঠে নেমে এসে একেবারে উলটে যায়। তিনজনের কে কোথায় ছিটকে পড়েছিল কে জানে! জীপে আগুন ধরে গিয়েছিল। কিন্তু রাস্তাটা এমনই নির্জন যে, আগুন লাগার ঘটনাটা কারুর নজরে পড়েনি।

পরের দিন আগুনে পোড়া জীপ আর ড্রাইভারকে মাঠে পাওয়া যায়। পাঞ্জাবি ভদ্রলোককেও পাওয়া গিয়েছিল। কিশোরকে কাছাকাছি পাওয়া যায়নি। কিশোরকে পাওয়া গিয়েছিল পরের দিন। মাঠের মধ্যে এক গর্তের মধ্যে পড়ে আছে।

কৃপানাথ মোটামুটি এই রকম শুনেছে। এর বেশি সে জানে না। শোনা কথা, নিজের চোখে দেখা নয়, কাজেই এর কতটা সত্যি কতটা সত্যি নয়— সে কেমন করে বলবে!

সব ঘটনারই বিবরণে কিছু হেরফের ঘটে যায় ; একজন যা বলে অন্যজনে তার থেকে উনিশ-বিশ আলাদা বলে। তবে যে যেমনই বলুক, কিশোর যে মারা গিয়েছে, তাকে দাহ করে আসা হয়েছে— এটা তো ঠিকই। কিশোরের দাদাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।

তা হলে কিশোর কোথা থেকে আসে ? তা ছাড়া এটাও খুব আশ্চর্যের যে, এই রকম লুকোচুরি করে কেন সে যোগাযোগ করছে ? কিশোর যদি বেঁচেই থাকে সে কেন নিজের বাড়িতে যায়নি ? কেন সে বলছে না, কোথায় আছে সে ?

কৃপানাথ কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর পাচ্ছিল না।

আচমকা কে যেন ডাকল কৃপানাথকে

চমকে উঠেছিল কৃপানাথ। "কে ?"

"আমি, দত্ত। অন্ধকারে শুয়ে কী করছেন ?"

"এই, শুয়ে আছি।"

"একটা কথা বলার ছিল। 'নিউ বোর্ডিং'-এ কথা বলেছি। মালিকের সঙ্গে। গোটা তিনেক ঘর রয়েছে তেতলায়। ঘরগুলো আমি দেখেছি। চলে যায়। বাথরুম একটা। খরচ-খরচা ধরুন এখানকার থেকে টাকা পঞ্চাশ বেশি। যাবেন নাকি ?"

কৃপানাথ উঠে বসতে-বসতে বলল, "আপনি যাচ্ছেন ?"

"যাব ভাবছি। এই মেসবাড়িটায় আর থাকা যায় না। থার্ড ক্লাস।"

"যান আপনি। আমার পক্ষে এখন সম্ভব হবে না।"

"খরচের কথা ভাবছেন ?"

"খানিকটা। তা ছাড়া পুরনো সঙ্গী তো! ছাড়তে মায়া লাগে।" কৃপানাথ হাসল।

দত্ত আর দাঁড়াল না, চলে গেল।

৩

দিন দুই চুপচাপ। আর কোনো ফোন আসছিল না।

কৃপানাথ আবার যেন বোকা হয়ে গেল। সে আশা করেছিল, ও-তরফ থেকে ফোন আসবে। দুপুরে, অফিসে, চঞ্চল হয়ে থাকত; ফোনের আশায়-আশায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত। দ্বিতীয় দিনেও যখন ফোন এল না, কৃপানাথের আবার সেই পুরনো সন্দেহ ফিরে এল। তা হলে কি তামাশা? কৃপানাথকে নিয়ে কেউ মজা করছে?

তিন দিনের দিন আবার ফোন।

সাড়া দিয়ে কৃপানাথ বলল, "দু দিন চুপ কেন?" এমন ভাবে বলল, যেন ঠাট্টা করছে। ও-পক্ষ যেমনই হোক, কিশোর অথবা অন্য কেউ— কৃপানাথের কৌতূহল, উৎকণ্ঠা বুঝতে না পারে।

"পারিনি," ও পাশ থেকে জবাব এল। "অসুবিধেয় পড়েছিলাম।"

"ও!...তা এখন কী করতে চাও?"

"দেখা করতে চাই তোমার সঙ্গে।"

কৃপানাথ দু'মুহূর্ত ভাবল। বলল, "তোমায় দুটো কথা বলতে চাই, খোলাখুলি।... তুমি যে কিশোর এ-কথা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। মরা মানুষ বেঁচে ওঠে না। যাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, সে কেমন করে বেঁচে উঠবে?"

ও-পাশের ফোন সামান্য সময় নিঃসাড় থাকল, তারপর গলা পরিষ্কারের শব্দ। "আমি বেঁচে আছি, কৃপানাথ। কেমন করে বেঁচে আছি, দেখা করে বলব।"

"তুমি নিজের বাড়িতে যাওনি কেন?"

"উপায় নেই।"

"বাড়িতে কিছু জানিয়েছ?"

"না।"

"কেন?"

"অ-নেক কথা, অনেক কথা। ফোনে বলা যাবে না। দেখা হলে বলব।"

"তুমি অনন্তকে ফোন করোনি?"

"করেছি। ফোন পাচ্ছি না। এক দিন একবারের জন্যে কে যেন হ্যালো বলেছিল। ছোট বউদির গলা বলে মনে হল।"

কৃপানাথ বলল, "করেছিলে তাহলে?" অনন্তদের ফোন যে অচল তা আর বলল না। "তা তুমি আছ কোথায়?"

"পরে বলব।"

"সত্যিই তুমি দেখা করতে চাও?"

"হ্যাঁ। না হলে তোমায় বলছি কেন!"

কৃপানাথ দু'মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, "আমি অনন্তকে তোমার কথা বলেছি। তুমি যদি দেখা করতে চাও, আমরা—আমি আর অনন্ত—একসঙ্গে যাব। আপত্তি আছে তোমার?"

"না। তোমাদের দু'জনকেই আমার দরকার। নন্তুকে আমি পাচ্ছিলাম না।"

অনন্তর ডাকনাম নন্তু। নামটা বন্ধুরা সকলেই জানে, কিন্তু কিশোর ছাড়া অন্য কোনো বন্ধু তাকে ডাকনামে ডাকে না। কৃপানাথ ফোনে কথা বলতে বলতে কয়েকটা জিনিস লক্ষ করছিল। কিশোর যে নকল কেউ নয়, সে তার প্রমাণ দিচ্ছে। প্রথমত অনন্তকে ফোন করার কথা। যদি কিশোর ফোন না করত, লাইন না-পাবার কথা বলত না। সে ছোট বউদির কথাও বলল। অনন্তদের বাড়ির কথা না জানলে ছোট বউদির কথা বলতে পারত না। তারপর এখন অনন্তর ডাকনাম, যে-নামে কিশোর ডাকত অনন্তকে, সেটাও বলল। একটা জিনিস শুধু মিলছে না। কিশোরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল তুইতোকারির। কিশোর একবারও 'তুই' বলল না। কেন?

"কোথায় দেখা হবে?" কৃপানাথ জিজ্ঞেস করল।

সঙ্গে-সঙ্গে কোনো জবাব দিল না কিশোর। সামান্য পরে বলল, "আউটরাম ঘাটে। না হয় আর-এক জায়গায় হতে পারে। মনুমেন্টের তলায়।"

কৃপানাথ ভাবল। "তোমার সুবিধে কোথায়?"

"গঙ্গার দিকটাই ভাল।"

"বেশ। কবে দেখা করতে চাও?"

"কাল, পরশু। পরশুই ভাল।"

"পরশু শনিবার।"

"পারবে না?"

"পারব মনে হচ্ছে। আমার অসুবিধে নেই, অনন্তকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।"

"কাল আমি ফোন করব?"

"কোরো।"

"তা হলে এখন ছাড়ছি।"

কৃপানাথও তার হাতের ফোন নামিয়ে রাখল।

সন্ধের মুখে আবার অনন্তর বাড়ি।

অনন্তর পা মোটামুটি সেরে গিয়েছে, তবু একটা ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে রেখেছে গোড়ালিতে।

"খবর বল্।" অনন্ত বলল প্রথমেই।

কৃপানাথ বলল, "খবর বলতেই এলাম। তোর পা অলরাইট?"

"হাঁটতে পারছি। ব্যথা আছে এখনও।"

"গোড়ালির চোট সহজে যায় না। ....যাক্, তোকে যা বলতে এলাম—।"

"বল।" অনন্ত বসল কাছাকাছি।

"সেই কিশোর আজ আবার ফোন করেছিল। দিন দুই বাদে।"

অনন্ত রীতিমত কৌতূহল বোধ করে ঝুঁকে পড়ল। "একই লোক? সেম্ ভয়েস?"

"হ্যাঁ। গলার স্বর এক। কথা বলার ধরন একই রকম।"

"কী বলল?"

"দেখা করতে চায়। ... আমি তোর কথা বললাম। বলল, চেষ্টা করেও তোকে ফোনে পায়নি। একবার ছোট বউদি ধরেছিল। লাইন কেটে যাওয়ায় কোনো কথাই বলতে পারেনি।"

মাথা নাড়ল অনন্ত। "ঠিকই বলেছে। আমাদের ফোন সারাদিনে হয়তো এক-আধবার ক্রিরিং..রিং করে উঠল, ফোন তুলতে-না-তুলতেই ডেড্। এ-পাড়ায় অনেক ফোন গোলমাল করছে। ....তা ও কী বলল? যেতে বলল আমাকেও?"

"হ্যাঁ। আমি বললাম, একলা আমি যাব না, সঙ্গে তুই থাকবি। বলল, নিশ্চয়, তোকে নিয়ে যেতে হবে।"

অনন্ত খুশি হল। "দারুণ! ...কবে যেতে হবে? কোথায়?"

"আউটরামে। পরশু, মানে শনিবার বিকেলে।"

অনন্ত ভাবল ক'মুহূর্ত; বলল, "শনিবার বিকেলে একবার ছোড়দির বাড়িতে যাবার কথা ছিল। সে ম্যানেজ করে নেব।"

কৃপানাথ বলল, "আমি একেবারে ফাইন্যাল করিনি। বলেছি তোর সঙ্গে কথা বলব। কাল ও আর একবার ফোন করে ব্যাপারটা পাকা করে নেবে।"

"ওইটেই পাকা। শনিবার বিকেলে।"

দু'জনেই অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকল। শেষে কৃপানাথ বলল, "তুই কিছু ভেবেছিলি?"

মাথা হেলাল অনন্ত। বলল, "না ভেবে উপায় আছে? তুই অ্যায়সা এক ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেলি। আজ ক'দিনই ভাবছি।"

"কী বুঝছিস?"

"কিচ্ছু না। সেদিন ছোট বউদিকে বলছিলাম। বউদি তো হেসে উড়িয়ে দিল। তারপর বলল, কোনো পাগলের কাজ। হয় পাগল, না হয় জোচ্চোর।"

কৃপানাথ দরজার দিকে তাকাল। ছোট বউদি শরবত পাঠিয়েছেন। একটা বাচ্চামতন ছেলে শরবত এনেছিল। দিয়ে চলে গেল। লস্যি ধরনের শরবত। চুমুক দিয়েই আরাম লাগল কৃপানাথের। গরমটা আর কিছুতেই যেন যাবে না। কোথায় যে পালাল বৃষ্টি!

অনন্ত বলল, "দেখ কৃপা, লোকটা যদি কিশোর হয়, মানে জাল না হয়ে রিয়েল কিশোর হয় তা হলে সে কয়েকটা ঘটনার কথা নিশ্চয় বলতে পারবে। তোর মনে আছে, একবার আমরা দিঘায় গিয়ে কিশোরকে নিয়ে নৌকোর ওপর বসে সবাই মিলে একটা ছবি

তুলেছিলাম। ফোটোটা আমার কাছে আছে। কে তুলেছিল ফোটোটা, মনে আছে তোর? ক্যামেরা আমাদের, কিন্তু কে তুলেছিল?"

কৃপানাথের সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল। বলল, "বিখ্যাত ফটোগ্রাফার, অবিনাশ চন্দ।"

"রাইট!" মাথা নাড়ল অনন্ত। "অবিনাশদা বেড়াতে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে ছেঁকে ধরলাম। তিনি আমাদের ক্যামেরায় একটা ছবি তুলে দিয়েছিলেন। আমরা বেজায় খুশি হয়েছিলাম।"

কৃপানাথের মনে হল, ঘটনাটা মনে থাকার মতন। কিশোরের নিশ্চয় মনে থাকবে, অবশ্য সে যদি বাস্তবিকই কিশোর হয়। "তোর কাছে কিশোরের আরও ফোটো আছে?"

"তিন-চারটে আছে।"

"বেশ। ভাল।"

"আরও একটা কথা ভেবেছি। একবার কিশোর আর আমি মেট্রো সিনেমায় গিয়েছিলাম। শো ভাঙার পর বেরিয়ে এসে দেখি, কলকাতা হাবুডুবু খাচ্ছে। আমরা একটা রিকশা জোটালাম কোনো রকমে। বৌবাজারের মোড়ের কাছে সেই রিকশা ভেঙে পড়ল। কিশোরের হাতে লেগেছিল। দারুণ চোট। কেটেকুটে যাচ্ছেতাই অবস্থা। ওকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে যেতে হল। কিশোরের এটাও নিশ্চয় মনে থাকার কথা।"

মাথা নাড়ল কৃপানাথ।

"কিশোরকে প্রমাণ দিতে হবে, সে জাল-ভেজাল নয়।"

কৃপানাথ বলল, "এখন পর্যন্ত যা শুনলাম ওর কাছে, তাতে তো জাল বলে মনে হচ্ছে না।"

"আরও বড় প্রমাণ দিতে হবে।"

ভাবল কৃপানাথ। "যদি দিতে পারে?"

অনন্ত বলল, "তা হলে ও রিয়েল কিশোর।"

"মরে যাবার পর আসল কিশোর কেমন করে আসে?"

"আমি ভেবেছি। ও যদি আমাদের কিশোর হয়—বুঝতে হবে ওর দাদা ভুল করেছেন। কিশোর মারা যায়নি।"

"মারা না গেলে কেউ বলতে পারে অমুক মারা গিয়েছে। মারা গিয়েছে জেনেই না পুড়িয়ে এসেছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু কার মড়াকে কিশোর বলে আইডেনটিফাই করে পোড়ানো হয়েছে—কে বলবে। এটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে।"

কৃপানাথ চমকে উঠল। "ইচ্ছাকৃত? বলিস কী!"

অনন্ত বলল, "তা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে! আগেরটা সত্যি হলে পরেরটাও সত্যি।"

কথাটা উড়িয়ে দিতে পারল না কৃপানাথ। তার মনের মধ্যে একই কাঁটা খচখচ করছে। মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে অল্পক্ষণ বসে থাকল সে। পরে বলল, "তুই যা বলছিস তেমন একটা সন্দেহ আমারও হয়। কিন্তু আমি কিশোরদের বাড়ির ব্যাপার ভাল জানি না। ওর দাদা কেন এমন কাজ করবেন? বাড়িতে কি ওর গণ্ডগোল হচ্ছিল?"

অনন্ত কোনো জবাব দিল না।

কৃপানাথ আবার বলল, "জমি জায়গা সম্পত্তি নিয়ে অনেক সময় ভাইয়ে-ভাইয়ে গণ্ডগোল হয়। এ আবার সৎ ভাই। তবু, এমন কিসের রাজা-রাজড়ার সম্পত্তি ছিল ওদের যে, ভাইয়ে-ভাইয়ে গণ্ডগোল হবে?"

অনন্ত বলল, "আমি জানি না। একটা জিনিস শুধু জানি, কিশোর বাড়িতে সুখী ছিল না।"

"কেন?"

"তা জানি না।"

"এইজন্যেই ও বাইরে-বাইরে চাকরি খুঁজে বেড়াত? দূরে গিয়ে থাকতে চাইত?"

"হ্যাঁ।"

"একটা জিনিস আমি লক্ষ করছি। ...কিশোর তাদের বাড়িতে ফিরতে চাইছে না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল—যাওয়া সম্ভব নয়। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়? কেউ যদি না মারা গিয়ে থাকে—অথচ গুজব রটে যায় মারা গিয়েছে, সে তো ফিরে এসে প্রথমেই তার বাড়িতে যাবে। তাই না?"

মাথা নাড়ল অনন্ত। হ্যাঁ।

কৃপানাথ বলল, "ও বাড়ি যেতে চাইছে না, বেশ না চাক। কিন্তু ও তো তোর বাড়িতে আসছে না, আমার মেসে যেতে রাজি হচ্ছে না। কেন? এ-সবও তো অদ্ভুত।"

অনন্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকল।

আরও খানিকটা বসে কৃপানাথ উঠল। "কাল তা হলে পরশু দিনের ব্যাপারটা ফাইন্যাল করে নিই?"

"হ্যাঁ, নে।"

"তুই কি আমার ওদিকে আসবি? তুই এলে দু'জনে বেরিয়ে পড়ব।"

"অফিসে তোর ছুটি হয়ে যাবে। আমি মোড়ের চায়ের দোকানে থাকব।"

"ঠিক আছে। চলি তা হলে ...!"

রাস্তায় এসে কৃপানাথের হঠাৎ মনে হল, তারা দু'জনে একেবারেই খালি হাতে কিশোর নামের লোকটার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? কলকাতা শহরে কত রকম ঠগ, জোচ্চোর, গুণ্ডা বদমাশ থাকে। যদি কোনো বিপদে পড়ে—কী করবে তখন?

কিছুই করার থাকবে না। শুধু চেঁচাতে পারবে। আউটরামের দিকে লোকজন কিছু থাকে—তারাই ভরসা।

৪

সময় ছিল সাড়ে পাঁচ। জায়গা নির্দিষ্ট করা ছিল ঝুরি-নামা বড় গাছটার কাছাকাছি। সামনেই গঙ্গা।

কৃপানাথরা একটু আগেই এসেছিল। আজ সারাদিন মেঘলা-মেঘলা গিয়েছে। বিকেলের দিকে ঝড়ের মতন হাওয়া উঠেছিল। এখনও তার দমকা রয়েছে। হয়তো আজ বৃষ্টি হবে। আকাশ দেখে সেই রকম মনে হচ্ছিল। মেঘ জমেছে। বাতাসটাও ঠাণ্ডা। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে।

আউট্রাম আজকাল আর ফাঁকা নিরিবিলি থাকে না। কত লোক যে বেড়াতে, হাওয়া খেতে আসে। গাড়িরও শেষ নেই।

তবু ওরই মধ্যে দক্ষিণের দিকে সরে যেতে পারলে খানিকটা ফাঁকা।

কৃপানাথরা সেই গাছ খুঁজে-খুঁজে যেখানে এসে দাঁড়াল সেদিকটা মোটামুটি নিরিবিলি। কাছাকাছি এক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। দু তিনটে নৌকো ঘাটের কাছে দুলছিল।

অন্যদিন এ-সময় আলো থাকে। সূর্যাস্ত হয়। আজ মেঘের কালোয় আলো ফুরিয়ে গিয়ে ঝাপসা হয়ে আসছিল চারপাশ। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে পাঁচ শেষ করে ছয়ের ঘরে ঢুকল। অনন্ত আর কৃপানাথ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। কিশোর নামের লোকটা বলে দিয়েছিল, সামান্য দেরি হতেও পারে, কৃপানাথরা যেন চলে না যায়।

ঘড়ি দেখল অনন্ত। ছ'টা বেজে গিয়েছে। বিরক্ত হয়ে বলল, "আর বসবি?"

কৃপানাথ আশপাশ লক্ষ করছিল। মানুষজন রয়েছে এ-দিকে। কেউ বেড়াচ্ছে, কেউ বা বসে আছে উদাস ভাবে। উঠে পড়ছে কেউ কেউ। আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

"আর একটু দেখি," কৃপানাথ বলল।

"দেখতে দেখতে বৃষ্টি চলে আসবে। দেখছিস না পালাচ্ছে সব। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।"

"আর দশ মিনিট।"

অনন্ত একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "ব্যাপারটা ব্লাফ। কেউ রগড় করেছে।"

কৃপানাথেরও সন্দেহ হচ্ছিল। কেউ তামাশাই করেছে।

আরও খানিকটা অন্ধকার হয়ে এল। গঙ্গার বাতাস বইতে লাগল হু-হু করে। লোকজন আরও কমে গেল, চলে যাচ্ছে সবাই।

অনন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠি-উঠি করছে, এমন সময় নজরে পড়ল, কে যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটাকে দেখতে দেখতে

অনন্ত কৃপানাথের হাত ধরে টানল। "দেখ।"

ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যেই লোকটা অনন্তদের সামনে এসে দাঁড়াল। কাঁপছে। অপলকে দেখছিল দু'জনকে।

হঠাৎ কৃপানাথ বলল, "কিশোর ?"

লোকটা কাঁপতে লাগল। তার হাত থরথর করে কাঁপছে। "হ্যাঁ।"

অনন্ত একদৃষ্টে দেখছিল। কথা বলল না।

কৃপানাথের গলা কেমন শুকিয়ে আসছিল। "চেনা যাচ্ছে না।"

ঘড়ঘড়ে গলায় লোকটা বলল, "আমি কিশোর। তুমি কৃপা, ও নন্তু।"

অনন্ত বলল, "আমি নন্তু কে বলল ?"

“তুমি নন্তু। তোমার ডান হাতের কনুই বেঁকা। ভেঙে গিয়েছিল। জোড়া হয়নি ভাল করে।”

অনন্ত নিজের অজান্তে ডান হাতের কনুইয়ে হাত দিল।

সামান্য চুপচাপ। লোকটা বলল, “তোমরা আমায় চিনতে পারছ না ?”

মাথা নাড়ল অনন্ত। “তোমার সমস্ত চুল সাদা। কপালে দাগের চিহ্ন দেখাচ্ছে। তোমার মুখের একটা পাশ বেঁকামতন। কিশোরের এ-সব ছিল না।”

লোকটা কেমন থতমত খেয়ে গেল। এগিয়ে এল আরও কাছে। বলল, “আমায় ভাল করে দ্যাখো। এখানে অন্ধকার। কোথাও যদি আলো থাকে একটু চলো। দ্যাখো আমাকে। আমি কিশোর। তোমার ছেলেবেলার বন্ধু নন্তু। আমরা একসঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়তাম।”

কৃপানাথ তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একটা আদল খুঁজে পাচ্ছিল পুরনো কিশোরের। মুখের ছাঁদটা ঠিকই রয়েছে। বলল, “তোমার মুখের একটা পাশ, চুল এ-সব এমন করে বদলাল কেমন করে ?”

“সে অনেক কথা।”

“কী কথা !”

অনন্ত বাধা দিল। বলল, “দাঁড়াও। তুমি যে কিশোর তার আরও প্রমাণ দিতে হবে। ...আচ্ছা, স্কুলে আমাদের ফার্স্ট-বয় কে ছিল ?”

“দশরথ।”

“অঙ্কের মাস্টারমশাই কে ছিলেন, ক্লাস নাইনে ?”

“পরিমলস্যার।”

“পেনু কেমন করে মারা গিয়েছিল ?”

“জলে ডুবে।”

অনন্ত থ’ হয়ে গেল। একেবারে ঠিক-ঠিক বলছে লোকটা। মাথা চুলকাতে লাগল অনন্ত। তারপর দিঘার কথা জিজ্ঞেস করল। ফোটো তোলার কথা। লোকটা ঠিকঠাক বলে দিল। অনন্ত বলল, “একদিন আমরা সিনেমায় গিয়ে শো ভাঙার পর বেরিয়ে এসে দেখি কলকাতা জলে ভাসছে। তখন আমরা কী করেছিলাম, কী হয়েছিল—তোমার মনে আছে ?”

“হ্যাঁ।...আমরা রিকশা করে ফিরছিলাম। রাস্তাঘাট জলে ভরতি। বউবাজারের মোড়ে রিকশা ভেঙে পড়ল। ট্রাম-লাইনের লোহায় লেগে আমার হাত কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল ভীষণ। তুমি আমাকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে। চার-পাঁচটা স্টিচ পড়ল।”

অনন্ত স্তম্ভিত। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে, তারপর কৃপানাথের দিকে মুখ ফেরাল। যেন এরপর তার আর কিছু বলার নেই।

বাতাসের দমক বাড়তে বাড়তে ঝড়ের মতন হয়ে উঠেছিল। আরও ঘোলাটে কালচে হয়ে গেল চতুর্দিক। গঙ্গার জল ছলছল শব্দ করছিল ; জোয়ার আসছে বোধ হয়। নৌকোগুলো দুলছিল।

আর বসে থাকা যায় না। বৃষ্টি আসতে পারে যে-কোনো সময়ে।

কৃপানাথ বলল, “বৃষ্টি আসছে। ভিজতে হবে।”

অনন্ত উঠে পড়ল। “শেল্টার দরকার। উঠে পড়।”

কৃপানাথ আর অনন্ত উঠে দাঁড়াতেই লোকটা বলল, “রাস্তায় একটা বাস খারাপ হয়ে পড়ে আছে। যাবে ?”

“চলো,” অনন্ত বলল।

বাসের ড্রাইভার কাছাকাছি কোথাও গিয়েছে। একজন কণ্ডাক্টার বাসের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল। ভেতরটা অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আচমকা জোর হয়ে উঠল।

কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞেস করেই ওরা তিনজন বাসের পেছন দিকে বসল। তেড়ে বৃষ্টি এলেও তার ঘটা নেই। বোধ হয় বেশিক্ষণ চলবে না। পরে আবার এলেও আসতে পারে, রাত্রে।

বসে থাকতে থাকতে কৃপানাথ বলল, “তুমি কোথায় আছ ?”

“খিদিরপুরে।”

“কোথায় ?”

“মাঝেরহাট ব্রিজের দিকে যেতে ডান দিকে।”

“সেখানে কে থাকে ?”

“জর্জ বলে একটা লোক। আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।”

“তুমি কবে কলকাতায় এসেছ ?” কৃপানাথই কথা বলছিল।

“প্রায় একমাস।”

“এতদিন কী করছিলে ?”

“কী করছিলাম !” লোকটা বলল, বলে চুপ করে গেল। সামান্য থেমে আবার বলল, “ভাবছিলাম কী করা যায়। সাহস হচ্ছিল না তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার। তোমরা হয়তো আমায় বিশ্বাস করবে না।...ভাল কথা, আমাকে তোমরা বিশ্বাস করেছ ?”

কৃপানাথ এবং অনন্ত চুপ। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর অনন্ত বলল, “আমার আর-একটা কথা আছে। তুমি যদি ঠিকঠাক জবাব দিতে পারো, আমি বিশ্বাস করে নেব।”

“বলো ?”

“তুমি কলকাতা ছাড়ার আগের দিন আমাদের বাড়িতে এসে কিছু কি ফেলে গিয়েছিলে ?”

“তোমার বাড়িতে ?...না, আমি মনে করতে পারছি না।...দাঁড়াও, আমার পেলিক্যান কলমটা আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে পাইনি। ভেবেছিলাম কোথাও হারিয়ে ফেলেছি। কালো রঙের কলম।”

অনন্ত কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, “তুমি ঠিকই বলেছ। কলম। কলমটা তুমি আমার ঘরে ফেলে গিয়েছিলে।” বলে অনন্ত থেমে গেল। আবার বলল হঠাৎ, “আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি যা যা বলেছ, সব ঠিক। একমাত্র কিশোর ছাড়া এত খুঁটিনাটি কথা কেউ জানতে পারে না। তুমি কি সত্যিই তাহলে কিশোর ?”

“হ্যাঁ। আমি কিশোর। তোমার ছেলেবেলার বন্ধু, নন্তু।” বলে লোকটা কৃপানাথের দিকে মুখ ফেরাল। “তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না, কৃপা ?”

কৃপানাথ বলল, “হচ্ছে, আবার সব কেমন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।”

“আমার কাছেও ব্যাপারটা হেঁয়ালি ! আমিও বুঝতে পারি না আমার কী হয়েছিল ? কে আমায় বাঁচিয়ে তুলল ? কেমন করে আমি বেঁচে গেলাম !”

তিনজনেই চুপ। জোর বৃষ্টি নেমে গিয়েছে। আকাশে মেঘ ডাকছিল। বাসের সামনের দিকে কণ্ডাক্টার ছেলেটি একটা বিড়ি ধরাল। কিছু বলল কৃপানাথদের।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর কৃপানাথ বলল, “আমরা তোমায় কিশোর বলেই মেনে নিলাম। কিন্তু এই ধাঁধার জবাব তোমায় দিতে হবে।”

কিশোর সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল না। পরে বলল, “সব জবাব আমি দিতে পারব না। কেননা আমি নিজেই জানি না, বুঝতেও পারি না।”

“যতটা পারো তার জবাব দাও।...অ্যাকসিডেন্টের কথা কি মিথ্যে ?”

“না,” মাথা নাড়ল কিশোর “সত্যি।”

“তা হলে ?”

“তুমি জানতে চাইছ, তারপর কী হয়েছিল ?” কিশোর তার ডান হাত তুলে নিজের গলার কাছে রাখল। কেন রাখল কে জানে। “কী হয়েছিল আমি জানি না।”

কৃপানাথরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অনন্ত বলল, “আমরা শুনেছি গাড়ি উলটে গিয়েছিল। আগুন ধরে গিয়েছিল জীপে। তোমরা সবাই মারা গিয়েছিলে।”

কিশোর আবার কাঁপতে লাগল। “আমি জানি না।”

“আশ্চর্য ! তুমি বলছ তুমি কিছু জানো না ? যদি তুমি না জানো, তা হলে কেন তুমি এখানে এসেছ ? কেন নিজের বাড়িতে যাওনি ? কেন বলছ, তুমি মরোনি, বেঁচে আছ !”

অসহায় হয়ে কিশোর অনন্তর মুখের দিকে তাকাল। বলল, “আমি তোমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলছি না। অ্যাকসিডেন্ট ঘটতে যাচ্ছে এই পর্যন্ত আমি জানি। তারপর জানি না।”

কিশোরের দিকে তাকিয়ে থাকল কৃপানাথ। বলল, “বাঃ, তারপর কিছু না জানলে তুমি যে কিশোর তাই বা কেমন করে জানলে ?”

অনন্ত বলল, “তোমার এই ধাঁধাটা আমাদের একটু গুছিয়ে বলো।

আমরা কিন্তু যে তিমিরে পড়ে ছিলাম সেই তিমিরেই পড়ে আছি।"
কিশোর হাত বাড়িয়ে বাইরের দিকটা দেখাল। বলল, "বৃষ্টি কমছে। ধরে যাক, রাস্তায় নেমে বলব। তবে কী জানো, সব কথা বলতেও পারব না, আমি নিজেই জানি না।"

বৃষ্টি ধরল আরও কিছুক্ষণ পরে।
রাস্তায় নামল তিন জনে। জোলো বাতাস বইছে। গঙ্গার হাওয়া। গা শিরশির করে। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি যেন এখনও বাতাসে ভেসে ভেসে গায়ে এসে পড়ছে।
কিশোর বলল, "তোমরা যা শুনেছ অ্যাকসিডেন্টের কথা, সেটা ঠিকই। কিন্তু ভুলও কিছু শুনে থাকতে পারো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমরা ছ'সাত জন একটা ভাড়াটে জীপে চাপি। জীপগাড়িটার চেহারা দেখলে তোমরা চড়তে সাহস পেতে না। কলকাতার মল্লিক-বাজারে ভাঙা-চোরা গাড়ির যেমন চেহারা দ্যাখো, সেই রকম। কিন্তু ও-সব দেহাতি জায়গায় ওইগুলোই চলে; দু-একটা বরাতজোরে জুটেও যায়। আমরা সন্ধের মুখে মেহেরো বলে একটা জায়গা থেকে গাড়িতে চেপেছিলাম। তখনও শীত চলছে। সেদিন কুয়াশাও জমেছিল খুব। জীপ ছাড়ার আগেই একজন গাড়ি থেকে নেমে গেল। তার উলটি আসছিল, মানে বমি পাচ্ছিল। মাইল তিন-চার এগিয়ে একটা গড় মতন জায়গায় আরও দু'জন নেমে গেল। আমরা চারজন ছিলাম। ড্রাইভার সমেত চারজন।"
কৃপানাথ বলল, "তিনজন না?"
"না, চারজন। ড্রাইভার, এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, আমারই বয়েসি একটি ছেলে, আর আমি। পাঞ্জাবি ভদ্রলোক কাপড়ের ব্যবসা করেন, আর আমার বয়েসি ছেলেটি দ্বারভাঙার দিকের লোক, ঠিক কোথায় তার ঘরবাড়ি জানি না। সে ছোটখাটো কন্ট্রাক্টারির কাজ করে। পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের সঙ্গেই কথাবার্তা তার বেশি হচ্ছিল। আমি চুপচাপ শুনছিলাম।"
"তোমরা কোন্ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে? মানে রাস্তার পাশে কি বড়-বড় গাছ ছিল?" অনন্ত জিজ্ঞেস করল।
"মাঝে-মাঝে ছিল; মাঝে-মাঝে ছিল না। তবে রাস্তাটা কাঁচা। উঁচু-নিচু। এত কুয়াশা যে, কিছুই দেখা যাচ্ছিল না একরকম। তার ওপর গাড়ির ধুলো। মাঠের মতন এক জায়গার ওপর দিয়ে যখন জীপ যাচ্ছে, আশেপাশে তাকালে ঘন অন্ধকারে আর কুয়াশায় মনে হচ্ছিল আমরা কোনো সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে আমাদের ড্রাইভার কেমন চিৎকার করে উঠল হঠাৎ। বিরাট চিৎকার। তারপর বুঝলাম গাড়িটা একেবারে ঘুরে গেল। কোন্ দিকে ঘুরল, কেন ঘুরল কিছুই বুঝলাম না। এরপর আমার আর কিছু মনে নেই।"
কিশোর চুপ করে গেল। অনন্তরাও চুপচাপ।
হাঁটতে হাঁটতে বাবুঘাটের কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। বৃষ্টি নেই। আকাশে মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। ভিজে রাস্তা দিয়ে বাস, গাড়ি, লরি যাচ্ছিল। শব্দ উঠছিল চাকার।
কিশোর নিজেই বলল, "অ্যাকসিডেন্টের পর আমার কী হয়েছিল আমি জানি না। পরে আমি যা শুনেছি তা আরও অদ্ভুত।"
অনন্তরা কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর পথ হাঁটতে লাগল।
কিশোর বলল, "আমি শুনেছি—আমাকে এক বড় গর্ত—মানে মাটির ফাটলের মধ্যে একদল সাধু দেখতে পায়। তারা ভেবেছিল আমি মারা গিয়েছি। পরে বুঝতে পারে আমি বেঁচে আছি। আমাকে ওরা গোরুর গাড়ি যোগাড় করে তাতে চাপিয়ে কাছাকাছি এক মহারাজের আখড়ায় রেখে চলে যায়। ভেবেছিল আমি সুস্থ হয়ে নিজের জায়গায় চলে যাব।"
অনন্ত ফস করে বলল, "আরে এ যে সেই ভাওয়াল মামলা....!"
কৃপানাথ বলল, "জাল প্রতাপচাঁদেরও ওই রকম ব্যাপার না?"
কিশোর বলল, "মহারাজের নাম মধু-মহারাজ। তাঁর ছোট্ট একটু আশ্রম। জনা দুই চেলা। মহারাজ সাধন-ভজন করেন। গাছগাছড়ার ওষুধপত্রও জানতেন। তিনি আমার চিকিৎসা করতেন, সেবা করতেন। আমি প্রথম দিকে কথা বলতেও পারতাম না। আমার নাম কী, কোথায় বাড়ি, কোথায় যাচ্ছিলাম—কিছুই খেয়াল করতে পারতাম না। এইভাবে মাস দুই কাটল। এমনিতে সুস্থ হলাম, কিন্তু নিজের পরিচয় কিছুতেই মনে আসত না।"
কৃপানাথ বলল, "স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল?"
"হ্যাঁ।...শেষে একদিন এক ঘটনা ঘটল। মহারাজের কাছে এক ভক্ত এল। মাঝবয়েসি। মহারাজের জন্যে ফল মিঠাই আর কাগজে মোড়া এক জোড়া গামছা এনেছিল। সেই কাগজের টুকরোটা কেমন করে যেন আমার চোখে পড়ে যায়। পাটনার কাগজ। ইংরিজি। তাতে একটা খবর ছিল। সেই খবর পড়ে বুঝলাম, অমুক দিন অমুক সময়ে বালুয়াসরাই বলে একটা জায়গায় এক জীপ-গাড়ি সম্ভবত এক পাগলা হাতির সামনে গিয়ে পড়ে। গাড়ি বাঁচাতে গেলে পুরো জীপটাই রাস্তা থেকে ছিটকে মাঠে গিয়ে পড়েছিল। আগুন ধরে যায় জীপে। আরোহীরা সবাই মারা যায়।"
অনন্ত একটা শব্দ করে উঠল আতঙ্কের।
কিশোর সামান্য চুপচাপ থাকার পর বলল, "ওই খবরটা পড়ার পর আমার সব মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল আমি কে, কী আমার পরিচয়। পাগলের মতন লাফালাফি শুরু করলাম। মধু-মহারাজ বললেন, ব্যাপারটা যদি সত্যি তেমনই হয়, তবে আমি যেন আগে খানিকটা খোঁজখবর করে নিই। যেখান থেকে জীপে চড়ে এসেছিলাম সেখানে পাত্তা লাগাই। তিনি নিজেই পাত্তা আনার ব্যবস্থা করতে পারেন। আমি নিজেই গেলাম পাত্তা করতে। আমায় কেউ চিনল না। বলল, যে বাঙালি ছোকরা তখন এসেছিল, সে মারা গিয়েছে। তাকে পোড়ানো হয়ে গিয়েছে। আমার অফিসে চিঠি লিখলাম, কেউ জবাব দিল না। কলকাতায় বাড়িতে চিঠি লিখলাম, মধু-মহারাজের নামে। মহারাজই পরামর্শ দিয়েছিলেন। জবাবই পাই না। শেষে দাদা দু লাইনের জবাব দিল। আমার ভাই মারা গিয়েছে। তাকে সৎকার করা হয়েছে যথাসময়ে। ব্যাস্, আর কিছু নয়।"
কৃপানাথ বলল, "বলো কী! অন্য কোনো খোঁজ নয়, কোনো...."
"কিচ্ছু নয়।...মহারাজ নিজেই আমার কথাবার্তায় কেমন সন্দেহ করতে লাগলেন। মানে, আমি যা বলছি তা আদপেই ঠিক কি না তা তিনি বুঝতে পারলেন না। শেষে আমায় বললেন, বেটা, তুম দুসরা আদমি।"
অনন্ত পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করল। রীতিমত উত্তেজিত। কৃপানাথকে সিগারেট দিল অনন্ত। কিশোরকেও।
সিগারেট ধরানো হয়ে গেলে কিশোর বলল, "শেষ পর্যন্ত আমি একদিন মহারাজকে ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। পকেটে পয়সা নেই, খাওয়া-দাওয়া জোটে না। চোরের মতন বিনি টিকিটে গাড়ি চেপে, এর-ওর পায়ে ধরে, গালমন্দ শুনতে-শুনতে শেষে কলকাতায়।"
"কবে?"
"বললাম না, মাসখানেক হতে চলল।"
"ও হ্যাঁ, বলেছ বটে। তা খিদিরপুরে গেলে কেমন করে?"
"কলকাতায় আসার পথে, একজনের সঙ্গে আলাপ হল। লোকটাকে মন্দ লাগল না। আগে বুঝিনি; পরে বুঝলাম লোকটা চোরাই ব্যবসা করে। নেপাল বর্ডার থেকে হরেক রকম মাল আসে তার কাছে। খিদিরপুর ডকেও তার আসা-যাওয়া আছে। লোকটার আবার ছোট-ছোট এজেন্ট আছে। তারা মাল নিয়ে গিয়ে চৌরঙ্গিতে দেয়। লোকটার নাম জর্জ। বাঙালি নয়। বেহারি ক্রিশ্চান। তবে বাঙলা বলতে পারে আমাদের মতন।"
"লোকটা তোমায় দিয়ে কোনো কাজ করায়?" কৃপানাথ বলল।
"এখনও করায়নি। তবে তার মতলব ভাল নয়।"
"কেন?"
"দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমাকেও হয়তো তার কাজে লাগাবে।"
"সর্বনাশ। না না, ওসব কাজে ফেঁসো না।"
"ফাঁসব না। কিন্তু আগে আমায় একটা থাকার জায়গা করে দাও। আমার ভাই পয়সাকড়ি নেই।"
অনন্ত আর কৃপানাথ চুপ। ভাবছিল।
হঠাৎ কৃপানাথ বলল, "তুমি আবার কবে আসতে পারবে?"
"কবে আসতে হবে?"

"পরশু ! না, তরশু এসো।....এখানে নয়। কার্জন পার্কে। পারবে ?"

"পারব।"

"তুমি এসো। দেখি আমরা কী করতে পারি।"

৫

এবার আর দেরি করল না কিশোর, ঠিক সময়ে হাজির হল।

অনন্ত বলল, "আয়।" বলে একটু হেসে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে, "ওল্ড ফ্রেন্ডস, নো তুমি-টুমি।"

কিশোর অনন্তর হাতে হাত রাখল। "সেদিন রাত্তিরে আমার ঘুম হয়নি।"

"কেন ?"

"এই প্রথম আমাকে কেউ বিশ্বাস করল।....সত্যি বলতে কী, আমি ভেবেছিলাম তোরাও আমাকে বিশ্বাস করবি না। না করলে আমাকে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হত। আর তা না হলে অন্য মানুষ হয়ে জর্জের শাকরেদি করতে হত।"

কৃপানাথ বলল, "চল, ওদিকে ফাঁকায় গিয়ে বসি।"

রাজভবনের দিকে এগিয়ে গিয়ে খানিকটা ফাঁকায় বসল তিন জনে। মাটি ভিজে। গতকাল জোর বৃষ্টি হয়েছে। যে যার পায়ের চটি খুলে যথাসম্ভব প্যান্ট বাঁচিয়ে বসল।

কৃপানাথ বলল, "তোর জন্যে একটা জায়গা ঠিক করেছি। আমার মেসের কাছাকাছি। একজন আমাকে একটা হোটেলের কথা বলেছিল। তাকেই ধরলাম।"

"হোটেল ? খরচার ব্যাপার হবে যে !"

"না, তেমন হোটেল নয় ; তোর পক্ষে ভালই হবে। আমি দেখে এসেছি। তেতলার শেষের দিকে একটা ছোট ঘর।"

কিশোর বলল, "আমি টাকা কোথায় পাব ?"

অনন্ত বলল, "টাকার ব্যাপারটা পরে হবে। আমরা ভাবছি। তোর টাকা পয়সা যা ছিল সামান্য—জমিয়েছিলি, তা তো আর পাবি না।"

"না," মাথা নাড়ল কিশোর, "মরা মানুষের আবার টাকা কী ! ব্যাংকে আমার হাজার আড়াই টাকা ছিল। জলে গেল।"

কৃপানাথ বলল, "টাকার কথা তোকে এই মুহূর্তে ভাবতে হবে না। আমরা কোনো রকমে এক-দু মাস ম্যানেজ করে দেব। কিন্তু তোকে একটা কিছু জুটিয়ে নিতে হবে। সে পরের ব্যাপার। তুই কবে আসতে পারবি ?"

"যে-কোনো দিন। কাল বললে কালই।"

"তোর জর্জ কিছু বলবে না ?"

"জানিয়ে আসব না।"

"ও যদি স্মাগলার হয়, তুই পালিয়ে এলে সন্দেহ করবে। ভাববে, পুলিশের কাছে গিয়েছিস।"

"ভাবতে পারে।" বলে কিশোর একটু চুপ করে থাকল, ভাবছিল। সামান্য পরে বলল, "আমি ওর ব্যাপার কিছুই ধরতে পারি না। লোকটা স্মাগলার, কিন্তু নানান ধরনের বুড়োবুড়ি ওর কাছে টাকাপয়সা চাইতে আসে। ও দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে দিয়েও দেয় দশ-বিশ টাকা।"

অনন্ত বলল, "আবার দেখবি এরাই ওর লোক। চোরাই মাল পৌঁছে দেয়। যাক গে, জর্জকে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তুই সেরেফ্ কেটে পড়বি। ও আর কী করবে। এতবড় কলকাতা শহরে তোকে খুঁজবে কোথায় ?"

কিশোর মাথা নাড়ল। পালিয়ে আসবে সে। বলল, "আমার সঙ্গে কিন্তু জিনিসপত্র কিছু নেই। একটা কিট্ ব্যাগ বড়জোর। প্যান্ট জামাও দু-তিনটে। তাও জর্জের কৃপায়।"

কৃপানাথ বলল, "ব্যবস্থা একটা করতে হবে। তুই ভাবিস না। এর ওর বাড়ি থেকে জুটিয়ে তোর বেডিং বেঁধে ফেলব।" বলে হাসল।

তিন জনে আরও কিছুক্ষণ হাল্কা ভাবে কথা বলার পর অনন্ত বলল, "এবার কাজের কথায় আসা যাক।" কৃপানাথের দিকেই তাকাল অনন্ত, "কিশোরকে এনে হোটেলে বসানো গেল। তারপর ?"

কৃপানাথ আগেই অনন্তর সঙ্গে কথা বলেছে। আলোচনা করেছে দু'জনে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে কৃপানাথ বলল, "তুই যে কিশোর, তুই বেঁচে আছিস, মারা যাসনি—এটা এস্টাব্লিশ করতে হবে। তাই না ?"

কিশোর চুপ করে থাকল। মুখ বিষণ্ণ।

অনন্ত বলল, "আমি কৃপাকে বলছিলাম ওদের কাগজে একটা খবর ছাপুক। পুরো ব্যাপারটা দিয়ে। দারুণ হবে। শোরগোল পড়ে যাবে। বিক্রি বেড়ে যাবে কাগজের। দলে দলে লোক আসবে, রিপোর্টার ছুটবে, ছবি উঠবে কিশোরের। কী বল কিশোর ?" অনন্ত বলল ঠাট্টার গলায়।

কৃপানাথ বলল, "কাজের কথা বল।"

অনন্ত বলল, "একেবারে অকাজের কথা বলিনি। তুই বল কিশোর, ব্যাপারটা যদি পাঁচজনকে জানতে না দেওয়া হয়—খোঁজ-খবর হবে কেমন করে ?"

কিশোর বলল, "খোঁজ-খবর করলেই কি যা সত্যি সেটা ধরা পড়বে। আমার মনে হয় না। আমার দাদা, আমার অফিস বলবে, আমি মারা গিয়েছি। আমাকে পোড়ানো হয়ে গিয়েছে। মধু-মহারাজ বলবেন, একটি লোককে তিনি নিজের কাছে রেখে সারিয়ে তুলেছেন—কিন্তু সে যে কে—তিনি জানেন না, মানে তার পরিচয় জানেন না। তখন ? লোকে আমাকে জাল কিশোর ভাববে...না, হুট করে কাগজে কিছু বার করা বোকামি হবে।"

অনন্ত বলল, "তা হলে ?"

কিশোর, কৃপানাথ—কেউই কথা বলল না ; চুপ করে থাকল।

"তুই একটা আলাদা মানুষ হয়ে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বেঁচে থাকতেও তো পারবি না, কিশোর," অনন্ত বলল। "তোর কিশোর নাম পালটে যদু মধু একটা নাম দিলে নামটা বাজারে চলে যাবে—কিন্তু তুই মানুষটা কেমন করে বাঁচবি। শুধু নাম, দু-বেলা দুটি খাওয়া-পরা কি মানুষকে বাঁচায় ? বল তুই ? যদি তাই হত— তুই এমন করে হন্যে হয়ে আমাদের খোঁজ করতিস না।"

কিশোর মাথা দুলিয়ে সায় জানাল।

"তুই যে কিশোর, তুই মরিসনি এটাই আমাদের প্রমাণ করতে হবে," অনন্ত বলল, বলে কৃপানাথের দিকে তাকাল। "ঠিক কি না, কৃপা ?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়ল কৃপানাথ।

অনন্ত বলল, "এটা প্রমাণ করার দুটো রাস্তা খোলা রয়েছে। এক, তোর বাড়ি। তোর দাদা দিদি আত্মীয়স্বজনকে বলতে হবে, তুই কিশোর। তারা ভুল শুনেছিল, ভুল করেছিল।"

কৃপানাথ বলল, "যে-অবস্থায় ভুল করেছিল সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অ্যাকসিডেন্ট হবার দিন দুই পরের খবর পেয়েছে তোর বাড়িতে। সেই খবর শুনে ছুটে গেছে অত দূরে। তারপর যে ডেড-বডি তারা পেয়েছে তা পচাগলা, মুখ নেই, পা নেই, ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শেয়াল-শকুনিতে খাবলানো। এই অবস্থায় ভুল হওয়া স্বাভাবিক।"

কিশোর নীরব থাকল।

অনন্ত বলল, "দু নম্বর রাস্তা হচ্ছে, যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে গিয়ে খুঁটিনাটি সব রকম খোঁজ করে, সাক্ষী-প্রমাণ যোগাড় করে দেখানো যে, তুই সেদিন মারা যাসনি। এটা কিন্তু ডিফিকাল্ট ব্যাপার। অসম্ভব। তুই না পাবি সাক্ষী, না প্রমাণ।"

কিশোর অন্যমনস্ক, অর্থহীন চোখে অনন্তর দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পরে বলল, "ওই তেপান্তরে কোথায় আর সাক্ষী পাওয়া যাবে ! যারা আমায় তুলে নিয়ে মধু-মহারাজের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল—তাদেরই বা কোথায় পাব !"

"তবে ?...তা ছাড়া আমাদের পক্ষে অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে অত রকম খোঁজ করা কী সম্ভব। বরং কলকাতায় তোদের বাড়ি গিয়ে কথা বলা যেতে পারে।"

কিশোর বলল, "তোরা যেতে পারিস, কিন্তু লাভ হবে না।"

"কেন ?"

"আমার চেহারা পালটে গিয়েছে।"

"চার-ছ আনা পালটেছে, ষোল আনা নয়," কৃপানাথ বলল।

"তোরাও আমাকে চিনতে পারিসনি।"

"না পারার প্রথম কারণ, আমরা জানতাম তুই মারা গিয়েছিস। কেউ মারা গিয়েছে জানলে তাকে আমরা একভাবে ভেবে নিই। কিন্তু যদি শুনতাম তোর বিরাট অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, ছ' মাস এক বছর হসপাতালে থেকে তুই ছাড়া পেয়েছিস, তা হলে তোর চেহারার পরিবর্তন দেখে তুই যে কিশোর নোস, এটা চট করে বলতে পারতাম না। তেমন-তেমন অ্যাকসিডেন্টে মানুষের চেহারা আরও পালটে যায়। যায় না ? অনিলদার কথা ভেবে দ্যাখ। আগুনে পুড়ে মরতে মরতে অনিলদা বেঁচে গেল। কিন্তু অনিলদার আগের চেহারা দেখে কে বলবে পরের চেহারাটাও অনিলদার ! আসলে বড় ধোঁকাটা ওইখানে। মারা যাবার খবর। ওটাই সব গোলমাল করে দেয়।"

কিশোর কোনো কথা বলল না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল।

বৃষ্টি-বাদলার দিন, তবু কার্জন পার্কে বিস্তর লোক। ভিজে মাঠেই বসে আছে কত জন, কেউ কেউ আবার কাগজপত্র বিছিয়ে আরাম করে শুয়ে আছে। গাড়িঘোড়ার শব্দ, ট্রামের শব্দ, সেই সঙ্গে শহিদ মিনারের দিক থেকে কোনো তেজালো বক্তার গলার স্বর মাইকের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছিল।

অনন্ত বলল, "আমার প্ল্যান, আমি তোদের বাড়িতে যাব, কিশোর। তোর দাদার সঙ্গে কথা বলব। প্রথমে একা যাব। তারপর কৃপাকে নিয়ে যাব।"

কিশোর বলল, "লাভ হবে না।"

"কেন ?"

"আমার মনে হচ্ছে।"

"মনে হলেই হবে না ; কেন হচ্ছে বল্ ?"

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব না দিয়ে কিশোর সামান্য অপেক্ষা করল, তারপর বলল, "তোরা একটা কথা ভেবে দ্যাখ। দাদা যখন মধু-মহারাজের চিঠি পেল—তখন ব্যাপারটা বিশ্বাস করুক আর না করুক, একটু খোঁজ তো করবে। না, আমি দাদাকে যেতে বলছি না, চিঠিপত্রেও তো জানতে চাইতে পারত—ব্যাপারটা কী হয়েছে ! কিচ্ছু জানতে চাইল না।"

কৃপানাথ বলল, "তুই নিজেই চিঠি লিখলে পারতিস। না হয় চলেই আসতিস কলকাতায়।"

"ভেবেছিলাম। আসতেও চেয়েছিলাম। মধু-মহারাজ বারণ করলেন। বললেন, আগে জানো তুমি যা বলছ তা ঠিক কিনা ! হুট করে তুমি সামনে গিয়ে পড়লে ওরা তোমায় জাল-জুয়াচোর ভাবতে পারে। তোমাকে তাড়িয়ে দিতেও পারে।" কিশোর থেমে গিয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল। চুল টানল মাথার। আবার বলল, "আমার মনে হয়, মধু-মহারাজ আমার কথা বিশ্বাস করেননি। ভেবেছিলেন, আমি পাগলামি করছি। ঝট্ করে একটা কিছু করার চেয়ে তিনি ভাবছিলেন, সত্যিমিথ্যে জেনে নিয়ে এগুনোই ভাল।"

কৃপানাথ বলল, "তবু, তুই নিজে চিঠি লিখলে পারতিস। তোর হাতের লেখা দেখলেও তো বাড়িতে চিনতে পারত।"

"চিঠিটা আমিই লিখেছিলাম। আমার ডান হাতের দুটো আঙুলেই জোর কমে গিয়েছে। বুড়ো আঙুল বেঁকাতে পারি না। পাশের আঙুলটারও একই অবস্থা। আমার হাতের লেখা বদলে গিয়েছে খানিকটা।....তবু সেটা হয়তো চেনা যেত। দাদা চিনতে চায়নি।"

অনন্ত আর কৃপানাথ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

"দাদার স্বার্থ কোথায় ?" অনন্ত বলল।

কিশোর কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। তারপর বলল, "দাদা জানে।"

"তুই জানিস না ?"

মাথা নাড়ল কিশোর। "আমি বুঝতে পারি না।....নে, ওঠ্। চা খেতে ইচ্ছে করছে।"

৬

অনন্ত ভেবেছিল, কিশোরদের বাড়িতে একলাই যাবে প্রথমে, তারপর অবস্থা বুঝে কৃপানাথকেও নিয়ে যাবে। পরে দুই বন্ধু আলোচনা করে দেখল, দু'জনেই যাওয়া ভাল। ক্ষতি কিসের দু'জনে একসঙ্গে গেলে।

কিশোরদের বাড়ি এমন কিছু দূরেও নয়। দুই বন্ধু বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় কিশোরদের বাড়িতে গিয়ে হাজির। একে বৃষ্টি, তায় আলো নেই, সদর-দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে দরজা খোলানো গেল।

"নগেনদা বাড়ি আছেন ?"

দরজা খুলতে এসেছিল পল্টু। কিশোরের ভাগ্নে। কিশোরের দিদি বোধহয় ভাইয়ের বাড়িতে এসেছেন। তিনি না এলেও পল্টু আসতে পারে, বড়সড় ছেলে সে।

পল্টু অনন্তদের চেনে। বলল, "বড়মামা রয়েছে। তোমরা ভেতরে এসো নন্তুমামা।"

ছাতা গুটিয়ে অনন্ত বলল, "তুই কি আছিস এখানে ? না, বেড়াতে এসেছিস ?"

"আমরা আজ এসেছি। কাল যাব।"

পল্টুর সঙ্গে ভেতরে ঢুকে ডান দিকে পা বাড়াল অনন্তরা।

পল্টু বলল, "দাঁড়াও, দরজা খুলে দি ভেতর থেকে।"

"তোদের এখানে কখন থেকে চলছে ? আমাদের সারা দুপুর পাখা চলেনি।"

"এখানেও বিকেল থেকে চলছে।"

পল্টু ভেতরে গিয়ে দরজা খুলে দিল। তার হাতে লণ্ঠন ছিল। রেখে দিয়ে বলল, "বোসো তোমরা, মামাকে ডেকে দিচ্ছি।"

অনন্তরা বসল। সাবেকি বৈঠকখানা। চেয়ার গোটা চারেক, একটা তক্তপোশের ওপর ফরাস পাতা। কোনার দিকে আর্মচেয়ার একটা। গোটা দুই কাঠের আলমারি।

কিশোরের দাদা নগেন্দ্রনাথ ব্যবসাপত্র করেন। জল তোলার পাম্প, মোটর, ডিজেল সেট—এই সবের কারবার। ওয়েলিংটনের কাছে দোকান। মোটামুটি বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। কিশোরের চেয়ে অনেকটাই বড়।

অনন্ত আর কৃপানাথ বসে-বসে নিচু গলায় কথা বলতে লাগল।

খানিকটা পরে নগেন এলেন। পরনে পাট-করা ধুতি লুঙ্গির মতন করে পরা, গায়ে গেঞ্জি। ডান হাতে এক তাবিজ। চোখে চশমা। গোলগাল নধর চেহারা। মাথার চুল ছোট-ছোট করে কাটা।

"কী খবর নন্তু ?...আরে কৃপা যে ! দু'জনেই একসঙ্গে ! বোসো বোসো। তোমাদের আজকাল আর দেখাই পাওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে আসতে পারো তো ! কিশোর নেই, আমরা তো আছি। তোমাদের দেখলে মনটা তবু ভাল লাগে।" নগেন একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার। "কী বিচ্ছিরি অবস্থা বলো তো ! একে এই প্যানপেনে বৃষ্টি, তার ওপর লোডশেডিং। কলকাতায় থাকা যায় না। বলো কী খবর ? হঠাৎ দু'জনে ?"

অনন্ত বলল, "না, এমনি। আমরা দু'জনে এদিকেই এসেছিলাম, ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।"

"ভালই করেছ।...আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। আজকেও তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি দোকান থেকে।...মনটন বড় ভেঙে গেছে, ভাই। কোথ্থেকে যে কী হয়ে গেল !"

অনন্ত একবার কৃপানাথের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল।

"তোমাদের বাড়ির খবর সব ভাল, নন্তু !"

"হ্যাঁ।"

"তোমার খবর কী কৃপা ? তুমি তো কাগজের অফিসে চাকরি করো। আচ্ছা, কী ব্যাপার বলো তো—তোমরা সবাই মিলে কাগজের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছ বছরে-বছরে....মানুষকে আর কাগজ পড়তে দেবে না হে ?"

কৃপানাথ হাসল। অমায়িক হাসি।

অনন্ত হঠাৎ কৃপানাথকে খোঁচা মারল। "দাদাকে বলো না ?"

কৃপানাথ হচককিয়ে গেল। অনন্তর দিকে তাকাল বোকার মতন।

নগেন কিছুই ধরতে পারলেন না। "কী ?"

"দাদাকে বলো না ব্যাপারটা," অনন্ত বলল। বলে নগেনের দিকে তাকাল। "একটা মজার খবর দাদা। কত রকম পাগলই যে জগতে

থাকে।”

কৃপানাথ এবার যেন অনুমান করতে পারল। অনন্ত কি সোজা পথ ধরল ? কিন্তু সে-রকম কথা ছিল না।

নগেন হাসলেন। “যা বলেছ, পাগলের শেষ নেই। সেদিন এক পাগল এসে বাড়িতে যা উৎপাত করে গেল। বলে কি না, তাকে কাজ দিয়ে রাখতেই হবে, না রাখলে সে সদরে বসে কুকুরের ডাক ডাকবে। বেটাকে তাড়াতে পারি না। ছিনে জোঁক। তা তোমাদের আবার কোন্ পাগলে ধরল ?”

ততক্ষণে অনন্ত একটা মতলব এঁটে ফেলেছে। বলল, “কৃপাদের কাগজের অফিসে একটা লোক মজার এক চিঠি লিখেছে। কোথ্থেকে রে কৃপা ? মতিহারী না মধুবনী থেকে ?”

“মধুবনী থেকে ?” নগেন অবাক। “কিসের চিঠি ?”

“লিখেছে, আমি এখানে একটি বাঙালি ছেলেকে....ইয়ে মানে—আমার বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর করে রেখেছি। তার বাড়ি কলকাতায়। নাম কিশোর মিত্র।....”

অনন্তকে কথা শেষ করতে দিলেন না নগেন, ব্যস্ত হয়ে বললেন, “কিশোর ! আমাদের ছোটকু ! কী বলছ তুমি ?”

কৃপানাথ এতক্ষণে অনন্তর চালটা ধরতে পারল। অনন্ত ভাল দাবা খেলে। সে যেন মোক্ষম এক দাবার চালের মতন একটা চাল চালছে। সামলাতে পারবে তো ?

অনন্ত বলল, “পাগলের কাণ্ড। লিখেছে, ছেলেটির নাম কিশোর মিত্র। সে বলছে, তার নাকি এক অ্যাকসিডেন্ট হয়। লোকে ভুল খবর দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। এমন কী, পাটনার কাগজেও ভুল খবর ছাপা হয়েছে। ছেলেটি নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখেছে, কেউ তাকে পাত্তা দিতে চাইছে না।” বলে অনন্ত এমন এক মুখের ভাব করল—যেন এই মজাদার গল্পটা শুনিয়ে সে নিজেও মজা পাচ্ছে।

এমন সময় ভেতর থেকে পল্টু চা নিয়ে এল। দু কাপ। কৃপানাথ আর অনন্তকে দিল।

নগেন তখনও অনন্তদের দিকে তাকিয়ে। খানিকটা অবাক তিনি। খানিকটা অবিশ্বাসের ভাব রয়েছে তাঁর মুখেচোখে। বোধ হয় মনোযোগ দিয়ে নজরও করছেন কৃপানাথদের।

পল্টুর সামনেই নগেন বললেন, “লোকটার নাম কী ?”

ঝট করে কোনো নাম অনন্তর মুখে এল না। নাম ভাবার সময় নিতে সে কথাটা এড়িয়ে গেল ; নগেনকে বলল, “আপনি চা খাবেন না ?”

“না। একটু আগেই খেলাম। তোমরা খাও।”

পল্টু দাঁড়িয়ে থাকল না, চলে গেল।

“নামটা মনে নেই তোমাদের ?” নগেনই আবার জিজ্ঞেস করলেন।

অনন্ত কৃপানাথের দিকে তাকাল। “কী নাম রে, কৃপা ?”

কৃপানাথ সামান্য থতমত খেয়ে গেল। সামলে নিয়ে বলল, “কী জানি ! নাম-টাম আমার মনে নেই। গোবিন্দদা—মানে যিনি আমাদের কাগজের চিঠিপত্র দেখেন—তিনি আমায় বলছিলেন।”

“তোকে তো বলবেনই,” অনন্ত ওপর-চালাকি করে বলল, “তুই কিশোরের বন্ধু। উনি নিশ্চয় জানেন। তাই বলছিলেন।”

কৃপানাথ আরও বেসামাল হয়ে যাচ্ছিল। অনন্ত তাকে আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলে দিচ্ছে তো ! চট্ করে একবার নগেনের মুখটা দেখে নিয়ে কৃপানাথ বলল, “কিশোর মাঝে-মাঝে আমাদের অফিসে আমাকে ডাকতে যেত। গোবিন্দদা ওকে দেখেছে।”

নগেন একটা সিগারেট ধরালেন। “তুমি কবেকার কথা বলছ, কৃপা ?....কবে এসেছে চিঠিটা ?”

“তা....তা ধরুন সপ্তাহ খানেক হবে। আগেও আসতে পারে। আমি দিন সাতেক আগে শুনেছি।

সিগারেটের ধোঁয়া গিললেন নগেন। অন্যমনস্ক। বললেন, “চিঠিটা কোত্থেকে এসেছে বললে ?”

“আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় মধুবনী থেকে। ওদিকে মতিহারী, মধুবনী, মুঙ্গের, মজাফফারপুর—এত ‘ম’-এর ছড়াছড়ি....”

“তা ঠিক। তবে মতিহারী আর মধুবনীর মধ্যে অনেকটা তফাত। কত মাইল তা বলতে পারব না, ওদিকে তো আসা-যাওয়া নেই। তবু

আমার মনে হয় একশো সওয়াশো কিলোমিটারের কম তো নয়ই। বেশি হতে পারে। মজফ্‌ফারপুর হয়ে মতিহারী; আর তোমার সমস্তিপুর দ্বারভাঙ্গা হয়ে বোধ হয় মধুবনী। মতিহারী প্রায় ইউ পি-র কাছাকাছি গিয়ে পড়ল।...তা যাক গে ও-সব কথা। ছোটকুর অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল মতিহারীর দিকে।"

কৃপানাথ আড়চোখে অনন্তর দিকে তাকাল। অর্থাৎ বলতে চাইল, নে—এবার সামলা!

অনন্ত চতুর ছেলে। সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "চিঠিটা দেখতে পারলে হত। তুই নিজের চোখে দেখেছিস, কৃপা?"

কৃপানাথ সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল। "না।"

অনন্ত বলল, "একবার দেখলেই পারতিস নিজের চোখে। পাগলামির বহরটা বুঝতিস। তবে—" বলে নগেনের দিকে তাকাল, "বুঝলেন দাদা, এমনি কথার কথা বলছি। অ্যাকসিডেন্ট যেখানেই হোক, কিশোর যদি বেঁচেই থাকে, ঘুরতে-ঘুরতে দু-চার শো মাইল তফাতে চলে যেতেও পারে।"

নগেন মাথা নাড়লেন। অবিশ্বাসের গলায় বললেন, "আরে দু-চার শো কেন—আরও বেশি চলে যেতে পারে। সেটা কোনো কথা নয়। ছোটকু বেঁচে থাকলে তার বাড়িতেই তো আসতে পারত। নয় কি?... ও-সব কাগজের গপ্প আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজে তার ডেডবডি পুড়িয়ে এসেছি।" বলে নগেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন। গা কাঁপিয়ে চোখ বন্ধ করে শিউরে ওঠার মতন ভাব করলেন, তারপর বললেন, "সে কী দৃশ্য, নন্তু! তাকানো যায় না। তোমার সারা গা গুলিয়ে উঠবে, বমি করবে, কাছে দাঁড়াতে পারবে না—এমন দুর্গন্ধ। পুরো বডি তালগোল পাকানো একটা মাংসের ডেলা। মাথা-মুখে বারো আনাই নেই। কোথায় যে হাত-পা বোঝা যায় না। তার ওপর শেয়ালে-শকুনিতে খুবলে ছিঁড়ে একাকার করেছে। এমন জঘন্য দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি।...সত্যি বলতে কী জানো, ছোটকুর ওই অবস্থা দেখে আসার পর—আমার খাওয়া ঘুম গেল। খেতে বসলে বমি আসত, ঘুমোতে পারতাম না। শরীরটা আমারও তখন থেকে ভেঙে গেল।" থামলেন নগেন। উদাস চোখে ছাদের দিকে তাকালেন। নিচু গলায় বললেন, "একেই কপাল বলে। কতবার ওকে বলেছি, তুই চাকরি-চাকরি করে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন? তোর খাওয়া-পরার অভাব! বেশ তো, দোকানে গিয়ে বোস। ফ্যামিলির ব্যবসা। শুনল না—চাকরি চাকরি করে নাচতে লাগল। কী বলব, বলো?"

কৃপানাথের মনে হল, নগেন যেন আফসোসই করছেন। চালাকি বলে মনে হচ্ছে না।

চা শেষ করে অনন্ত পায়ের কাছে কাপটা নামিয়ে রাখছে—এমন সময় আলো চলে এল।

আলো এলেই সবাই যেমন স্বস্তির ডাক ছাড়ে, সেইভাবে ভেতরে কারা ডাক ছাড়ল। নগেন নিজেই উঠলেন। বাতি জ্বালালেন, পাখা চালালেন। নিবিয়ে দিলেন লণ্ঠনটা।

"চিঠিটা একবার আমায় দেখাতে পারো?" নগেন বললেন।

কৃপানাথ চোরা চোখে অনন্তকে দেখে নিল। "খোঁজ করতে হবে। গোবিন্দদা চিঠিটা রেখে দিয়েছেন, না, ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়েছেন—জানি না।"

"একটু খোঁজ কোরো তো!"

"করব।"

"আমায় জানিয়ে দেবে কেমন করে? তোমার অফিসে ফোন করব? নাকি তোমাদের কাগজের অফিসে যাব আমি?"

"না না, আপনাকে যেতে হবে না। আমিই বরং এসে জানিয়ে যাব।"

"খুব ভাল হয়।...চিঠিটা কোথা থেকে এসেছে, কে লিখেছে, তার নাম ঠিকানা—সব জেনে আসবে? পারলে একবার চিঠিটাই নিয়ে এসো। দেখব।"

"অফিসের চিঠি বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না, দাদা।"

"ও! তাও তো ঠিক।...কপি-টপি করিয়ে নিতে পার?"

"দেখব।"

কী ভেবে নগেন বললেন, ছোটকুর বেঁচে থাকার কথাই ওঠ না।...কিন্তু হঠাৎ এ-কথা উঠবেই বা কেন? একটা খোঁজ নেওয়া দরকার।"

অনন্ত উঠে পড়ল। বলল, "ব্যাপারটা একেবারেই সিরিয়াস নয়, দাদা। কিসের খোঁজ নেবেন! পাগলের কাণ্ড। আর খবরের কাগজে কত অদ্ভুত চিঠি আসে।...আমরা আজকের মতন যাই। পরে একদিন আসব।"

"এসো। যখন খুশি এসো।...তা কৃপা, তুমি আমাকে একটা খবর দিচ্ছ!"

মাথা হেলিয়ে কৃপানাথ জানাল, খবর দেবে।

বাইরে এসে কৃপানাথ বলল, "তুই তো আচ্ছা ঝামেলা করলি?"

অনন্ত হাসল। বলল, "মাথায় একটা বুদ্ধির ঢেউ খেলে গেল। অন্ধকারে ঝোপে-ঝাড়ে একটা ঢিল ছুঁড়লাম, বুঝলি?"

"তা বুঝলাম। কিন্তু আমায় প্যাঁচে ফেললি। আমি এখন কোত্থেকে মধুবনীর চিঠি যোগাড় করি?"

"দূর! চিঠির আবার ভাবনা। লিখিয়ে দেব।...ফল্‌স ঠিকানা থাকবে। তুই তো আর চিঠি দেখাচ্ছিস না! ঘাবড়াও মাত্‌।"

কৃপানাথ ভরসা পেল না। "তুই যে কোথায় একটা ঝঞ্ঝাট পাকাবি, কে জানে!"

"কিস্যু হবে না। বরং প্যাঁচটা দারুণ হয়েছে, বুঝলি কৃপা!...একটা জিনিস তুই নজর করলি না? নগেনদা রীতিমতন ডিসটার্বড। মানে, ওষুধ একটু ধরেছে।...আরও একটা জিনিস তুই লক্ষ করিসনি। নগেনদা একবারও বললেন না যে, তিনি নিজেই আগে একবার একটা চিঠি পেয়েছিলেন, মধু-মহারাজের চিঠি। কেন বললেন না? চেপে গেলেন কেন?"

কৃপানাথ এ-ব্যাপারটা খেয়াল করেনি। অনন্তর কথায় সে অবাক হয়ে বলল, "সত্যি তো! সেই চিঠিটার কথা উনি চেপে গেলেন কেন?"

৭

কিশোরের জায়গা হয়েছিল নিউ বোর্ডিংয়ের তেতলার একটা ছোট ঘরে। ঘরের সামনে একফালি ফাঁকা জায়গা, তার একপাশে বোর্ডিংয়ের রাজ্যের ফেলে দেওয়া কাঠকুটো, প্যাকিং বাক্স, ঝুড়ি, ভাঙা শিশিবোতল স্তূপ করে রাখা আছে।

তেতলার তিনটে ঘরের মধ্যে দুটো ভরতি হয়েছে, ফাঁকা পড়ে আছে অন্যটা। কৃপানাথের মেসের দত্ত এখনও বোর্ডিংয়ে আসেনি; আসবে। সে এলে বাকি ঘরটাও আর খালি পড়ে থাকবে না।

কৃপানাথ আর অনন্ত কিশোরের জন্যে যতটা পারে জুটিয়ে এনে তাকে বোর্ডিংয়ে থিতু করে দিয়েছে। বিছানা জুটেছে, একটা পুরনো সুটকেস, খানকতক মোটা মোটা বইপত্রও। বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারকে বলা হয়েছে, কিশোর রীতিমতন পণ্ডিত ব্যক্তি, হুগলি নদীর তীরে কেমন করে জনবসতি গড়ে উঠল ধীরে-ধীরে তার গবেষণা করছে।

কিশোরের চেহারা আর মাথার চুল দেখে ম্যানেজারবাবুরও ধারণা হয়েছে, মিত্তিরবাবু বিদ্বান লোক, তাঁকে ঘাঁটানো উচিত নয়।

কিশোর একরকম ভালই আছে আজ দিন সাতেক। তাকে কেউ বিরক্ত করে না। পাশের ঘরের ভদ্রলোক যাত্রা থিয়েটারে ছোটখাটো পার্ট করেন, তাঁকে বড়-একটা দেখাই যায় না।

সেদিন সন্ধে নাগাদ কৃপানাথ এসে বলল, "তোর দাদা আজ আবার লোক পাঠিয়েছিলেন।"

কিশোর জানে, কৃপানাথরা কোন পথ দিয়ে এগোচ্ছে। সে সবই শুনেছে। তাছাড়া বিকেলের দিকে হয় অনন্ত আসে, নাহয় একটু দেরি করে আসে কৃপানাথ—তিন বন্ধু মিলে নানান রকম পরিকল্পনা হয়, কথা হয়। এখন পর্যন্ত অবশ্য কাজের কাজ কিছু হয়নি।

বাইরে ছাদে ভাঙাচোরা কাঠের চেয়ার টেনে দু বন্ধু বসল। আজ আবহাওয়া ভাল। গরমটাও কম। বাতাস রয়েছে।

কিশোর বলল, "তোরা বোধ হয় ধরাই পড়ে যাবি!"

কৃপানাথ মাথা নেড়ে বলল, "চান্স কম!...আমি গোবিন্দদাকে ম্যানেজ করেছি। গোবিন্দদা ছুতো করে পাশ কাটাচ্ছে। বলছে,

কাগজে যেসব চিঠিপত্র এডিটারের নামে আসে, সেগুলো কাউকে দেখানো যায় না। আইনবিরুদ্ধ কাজ। চিঠি ছাপা হলে লোক জানতে পারে, তার আগে কিছু জানানো সম্ভব নয়।"

কিশোর অন্যমনস্কভাবে বলল, "এভাবে কতদিন ধাপ্পা মারবি ?"

"দেখি। অনন্ত অন্য মতলবও করছে।"

"কী মতলব ?"

"ও আসুক, ওর মুখেই শুনবি।"

অনন্তর আসতে খানিকটা দেরিই হল। এসেই বলল, "ব্রাদারস্, আমি দারুণ একটা জায়গা থেকে আসছি। রাসেল স্ট্রীট। আমাকে আগে জল খাওয়াও। তারপর চা।" বলে কৃপানাথকে ঠেলে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দিল।

কিশোরের ঘরে জলের কুঁজো আছে। জল আনতে উঠল।

কৃপানাথ বলল, "ব্যাপারটা কী ? কোন্ গভর্নরের বাড়ি থেকে এলি তুই যে, অত মেজাজ দেখাচ্ছিস !"

অনন্ত হাঁটুতে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে মুরুব্বির ঢঙে বলল, "ওয়েট অ্যাণ্ড সি। বিগ সারপ্রাইজ এনেছি, ভাই, শুনলে নৃত্য করবে।"

কৃপানাথ ঠাট্টা করে বলল, "তোর সারপ্রাইজ মানে তো পকেটমারের গপ্প !"

মাথা নেড়ে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল অনন্ত।

কিশোর জল আনল।

জলের গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে এক চুমুকে জল শেষ করে স্বস্তির শ্বাস ফেলল অনন্ত। বলল, "তোদের বামাচরণকে চায়ের জন্যে হাঁক মেরে আয়। দারুণ খবর।"

কিশোর জলের গ্লাস তুলে নিয়ে ঘরে গেল। আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দোতলায় বামাচরণকে চায়ের কথা বলতে।

ফিরে এসে দেখল, অনন্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা-লম্বা টান মারছে।

কৃপানাথ বলল, "তোর সারপ্রাইজটা শুনি ? রাসেল স্ট্রীটে কেন গিয়েছিলি ?"

অনন্ত বলল, "রাসেল স্ট্রীটে এক ভদ্রলোক আছেন, নাম—ইন্দ্রমোহন ঠাকুর। লোকে তাঁকে ইন্দার মোহন বলে। একসময়ে পুলিশের নানান কাজে সাহায্য করতেন। ভদ্রলোক পুলিশে কাজ করেননি, তবে আর্মিতে ছিলেন। ইনটেলিজেন্স-এ। চোট পেয়ে একটা হাত গিয়েছে। রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন বেশ ক বছর। তাঁর নানা রকম এক্সপিরিয়ান্স আছে। জানেন শোনেন অনেক কিছু।"

বিরক্ত হয়ে কৃপানাথ বলল, "তাতে আমাদের কী ? মরছি নিজেদের জ্বালায়, তুই কোত্থেকে ইন্দার মোহন ধরে আনলি ! সত্যি অনন্ত..."

"তোরা এত অধৈর্য হোস কেন বল তো !" অনন্ত বলল, "বাচ্চাদেরও অধম। সব কথা না শুনে আগে থেকেই বাগড়া মারার অভ্যেসটা ছাড়। বলি বয়েস হচ্ছে, না খোকা হচ্ছিস ?"

কৃপানাথ বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেল।

অনন্ত বলল, "শোন, গোড়া থেকে বলি সব শোন। কিশোরের ব্যাপারটা নিয়ে রোজই কথা বলি আমরা, ভাবি, কিন্তু কাজের কাজ হচ্ছে না কিছু। সেদিন মেজদির বাড়িতে একটা কাজে গিয়েছিলাম, সেখানে মেজো জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে কিশোরের কথাটা বেরিয়ে গেল। মেজো জামাইবাবু উকিল মানুষ, ক্রিমিন্যাল কেস পেলে জিভ দিয়ে জল গড়ায়। কিন্তু ভাই অদ্ভুত ব্যাপার, ক্রিমিন্যাল কেসের প্র্যাকটিস করেও আখের গুছোতে পারেননি। এই নিয়ে সবাই কত ঠাট্টা করে।" বলে অনন্ত একটু দম নিল। "মেজো জামাইবাবু আমাকে বললেন, ইন্দার মোহনের সঙ্গে একবার দেখা করতে। দু জনে ভাবসাব আছে। তা আমি আজ রাসেল স্ট্রীটে মোহনসাহেবের বাড়ি চলে গেলাম।"

কৃপানাথ কাছাকাছি পাঁচিলে গিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

কিশোর বলল, "তুই ব্যাপারটা চাউর করে বেড়াচ্ছিস, নন্তু।"

"বেশ করছি। চাউর না করলে চলবে কেমন করে।...যাকগে, শোন। ইন্দার মোহনকে প্রায় সবই বললাম। মোহনসাহেব সঙ্গে-সঙ্গে একটা ম্যাপ জোগাড় করে ফেললেন। কোত্থেকে হাজির করলেন একটা বেয়াড়া বই। রেফারেন্স বই নিশ্চয়। তারপর বললেন, আমি খোঁজ নিচ্ছি।"

কৃপানাথ এতক্ষণ কৌতূহল নিয়ে শুনছিল। অনন্তর কথা শেষ হলে চটে গিয়ে বলল, "এই তোর সারপ্রাইজ ! কে এক মোহনসাহেবকে হাজির করলি ! একেই বলে পর্বতের মূষিক প্রসব। শাবাশ !"

অনন্ত বলল, "আজ্ঞে না, মূষিক নয়। তুমি কি জানো স্যার, মোহনসাহেব একটা ব্যাপার করছেন ? যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিল তার আশপাশে এমন কেউ যদি থাকে যে সেদিনের কথা শুনেছে কিংবা দেখেছে—তার খোঁজ লাগাচ্ছেন ?"

"কেমন করে ?"

"তাঁর লোক আছে ওদিকে।"

"বেশ, খোঁজ করছেন ভালই করছেন।...তারপর ?"

"তারপর বেঁকা রাস্তা।"

"সেটা আবার কী ?"

"কাগজে খবরটা ছাপানো।"

কৃপানাথ অবাক হয়ে গেল। "কাগজে ছাপানো ! কে ছাপবে ?"

"তোরা ছাপবি। ছাপা উচিত। এত বড় একটা খবর—।"

"তুই বললি আর কাগজে ছেপে দেবে ! মামার বাড়ি !"

"বেশ, তোরা না ছাপিস—পয়সা খরচ করে বিজ্ঞাপন করে ছাপা হবে। নজরে পড়বে লোকের। মেজো জামাইবাবু কিশোরের পক্ষে মামলা লড়বেন।"

কিশোর কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় হাতে কেটলি ঝুলিয়ে বামাচরণ হাজির।

ছোট-ছোট কাপে তিনজনকে চা দিয়ে বামাচরণ চলে যেতেই অনন্ত বলল, "শোনো হে কৃপানাথ, ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে—ঠিক সেখানে কী আছে মোহনসাহেব জানেন না ; তবে তিনি একটা অদ্ভুত কথা বলছেন।"

"কী কথা ?" কৃপানাথ বলল।

অনন্ত চায়ে চুমুক মেরে বলল, "মোহনসাহেব বলছেন নর্থ বিহারের দু চারটে জায়গা আছে যেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।"

কিশোর বা কৃপানাথ কেউ কিছু বুঝল না। অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অনন্ত বলল, "ঘটনাগুলো অদ্ভুত। শুনলে মনে হবে গাঁজাখুরি গল্প। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে মনে হতে পারে, কোথাও কিছু একটা রহস্য আছে।"

কৃপানাথ বলল, "কিসের রহস্য ? ভূতের ?" ঠাট্টা করেই বলল সে।

"হ্যাঁ ; ভূতেরই। আষাঢ়ে গল্প যেমন হয়।"

"শুনি।"

"মোহনসাহেবের ধারণা, তিনি যা শুনেছেন, নর্থ বিহারের দু চারটে জায়গার একটা ভৌতিক ব্যাপার আছে। তিনি বলছেন, জায়গাগুলোকে এক ধরনের শূন্য স্থান বলা যেতে পারে।"

কিশোর বলল, "শূন্য স্থান ? তার মানে ?"

"মানেটা ভাই আমিও ঠিক বুঝলাম না। মোটামুটি যা বুঝলাম তা হল, সব কিছুর মধ্যে কোথাও একটা শূন্যতা রয়েছে। গ্যাপ। সেখানে কোনো-কিছুই কাজ করে না, করতে পারে না, প্রকৃতি নয়, জীব নয়, কোনো প্রাণী নয়।"

কৃপানাথ বিরক্ত হয়ে বলল, "কিছুই কাজ করতে পারে না, শুধু তোর মোহনসাহেবের মাথা কাজ করে ! রাবিশ।"

অনন্ত একটু দমে গেল। বলল, "তুই আগে থেকেই চেঁচাচ্ছিস কেন ! সবটা শোন। হতে পারে মোহনসাহেব যা বলছেন তা আষাঢ়ে গপ্প। কিন্তু তিনি তো বলছেন না গল্পটা বিশ্বাস করতে। তাঁর কথাটা শুনতে আপত্তি কোথায় ?"

কৃপানাথ কোনো জবাব দিল না।

অনন্ত বলল, "কিশোরের যখন অ্যাকসিডেন্ট হয়—তখনকার

কথাটা ভেবে দেখতে হবে। কিশোর বলছে তার যখন অ্যাকসিডেন্ট হয় তখন ড্রাইভার সমেত তারা চারজন গাড়িতে ছিল। তাই না কিশোর?"

মাথা হেলাল কিশোর। বলল, "হ্যাঁ, চারজন! ড্রাইভার, এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক, একটি বিহারি ছেলে আমার বয়েসি, আর আমি।"

"ঠিক তো?"

"একেবারে ঠিক।"

"অ্যাকসিডেন্টের পর তিনজনকে পাওয়া গেল। মাঠে। তিনজনই মারা গিয়েছে, তাদের ডেড্‌-বডি—সে যেমন অবস্থাতেই হোক—এদিক-ওদিক ছড়ানো। কিন্তু কিশোরের বডি পাওয়া যায়নি। কোথায় গেল সে? হাওয়া হয়ে গেল? সেটা সম্ভব? নাও, বলো আমাকে?"

অনন্ত এমনভাবে বলল যেন কৃপানাথকেই চ্যালেঞ্জ করল।

কৃপানাথ সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "কিশোরকে খানিকটা তফাতে একটা গর্ত বা ফাটলের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। কিশোর নিজেই বলেছে।"

অনন্ত মুচকি হাসল। "পাওয়া গিয়েছে বললেই কি হয়! এবার আর যুক্তিতে এসো। একটা জীপ গাড়ি অ্যাকসিডেন্টের পর যদি ছিটকে যায়—গাড়ির প্যাসেঞ্জারদের বডি কতদূর ছিটকে যেতে পারে? পাঁচ হাত, দশ হাত। তোমার জন্যে আরও দশ হাত বাড়ালাম, তা হলে হল বিশ হাত। এবার বলো, অন্য বডিগুলো লোকের চোখে পড়ল, কিশোরেরটা পড়ল না কেন? তুমি ধরে নিতে পারো, পরে খবর পেয়ে যখন লোকজন পুলিশ আসে তখন নিশ্চয় তারা চারপাশ দেখেছিল। বিশ হাতের মধ্যে একটা গর্তে আরও একটা বডি পড়ে থাকলে তাদের চোখে পড়ত না? তারা অন্ধ?"

কৃপানাথ বলল, "অন্ধ ছাড়া আর কী! তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন।...তারা দায়সারা কাজ সেরে পালিয়েছে। আমার বিশ্বাস পুলিশও আসেনি। খোঁজখবর করেনি। বা এলেও রাস্তা থেকে জায়গাটা দেখে পালিয়ে গিয়েছে। নয়তো ডেডবডিগুলো মাঠে পড়ে থাকবে কেন?"

মাথা নেড়ে অনন্ত বলল, " মানছি তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন। তবে বডিগুলো কি নিয়ে যাবার উপায় ছিল? প্রথমত খবর পেয়েছে অনেক দেরিতে, তার ওপর হয় পোড়া, নাহয় কাটা-ছেঁড়া বডি। কোথায় নিয়ে যাবে তারা? এ-কি কলকাতা পেয়েছ? কলকাতার আশেপাশে মরা পচা ডেডবডি দু' তিন দিন পরে উদ্ধার করেছে পুলিশ—এ-খবর তুমি কাগজে পড়ো না?"

কিশোর দু জনের তর্কে বাধা দিয়ে বলল, "ওসব জায়গায় ঝট করে কিছু হয় না। খবর পৌঁছতেই মাস কাবার; কিছু করতে হলে বছর ফুরোবে। কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই। একেবারেই গাঁ-গ্রাম জায়গা, দেহাত।"

কৃপানাথ পকেট হাতড়ে সিগারেট বার করল। ধরাল। বলল, "বেশ। তা মোহনসাহেব কী বলছেন? তাঁর কথাটা শুনি?"

"তিনি জোর করে কিছু বলছেন না," অনন্ত বলল, "তাঁর একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

"কিসের সন্দেহ?"

"ওই যে বললাম, গ্যাপ। যদি ধরে নেওয়া যায় ওখানে কোথাও একটা গ্যাপ ছিল—কিশোর তার মধ্যে গিয়ে পড়েছিল..."

কৃপানাথ পুরোপুরি উপেক্ষা-অবজ্ঞার একটা শব্দ করল। মোহনসাহেবের মাথায় ছিট আছে। কালারফুল ছিট।"

অনন্ত চটে গেল। "আমি তা হলে চুপ করলাম।"

কৃপানাথ বলল, "তোকে চুপ করতে কেউ বলছে না। আমি বলছি, তোর মোহনসাহেব আলতুফালতু কথা বলছেন।"

"কেমন করে বুঝলি তুই? কথাটা তুই ভাল করে শুনলি না পর্যন্ত...!"

"যা শুনলাম তাতেই আমার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে। বেশ তো বল তুই—শুনব।"

"না, আমি বলব না। তুই একটা গাধা। তোর মাথায় এ-সব ঢুকবে না।"

এবার কৃপানাথ হোহো করে হেসে উঠল। বেজায় চটেছে অনন্ত। কৃপানাথকে গালমন্দ শুরু করবে: বাঁদর, ছাগল, ইডিয়েট—যা মুখে আসে বলবে।

কৃপানাথ বলল, হাসতে হাসতেই, "আমি গাধা বলেই তো বলছি। ব্যাপারটা তুই বুঝিয়ে দে। ধর, আমরা তিনজন একটা মাঠ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি—হঠাৎ কিছু একটা হল, ডাকাতে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল, বাঘ-সিংহ তেড়ে এল, নয়তো ঝড় উঠল সাংঘাতিক—, তিনজনে তিন দিকে ছুটলাম। সব যখন শান্ত হল, তিনজনকে আশেপাশে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। একজন হারিয়ে যাবে কেমন করে? কোন যুক্তিতে?"

অনন্ত বলল, "সাধারণ যুক্তির কথা বলছিস তুই। কিন্তু এমন অনেক যুক্তি আছে যা আমাদের জানা নেই।"

"সেটা কী?"

"প্রকৃতির খেয়ালিপনা।"

"তা এখানে প্রকৃতির খেয়ালিপনাটা কেমন? মানে কোন ধরনের?"

অনন্ত একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, "আমি সব গুছিয়ে বলতে পারব না। যা শুনেছি তার সামারি বলছি। আমাদের জন্মের অনেক আগে বিহারে একবার সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়। থারটিফোর না থারটিফাইভ—কোন একটা সালের কথা বললেন মোহনসাহেব। নর্থ বিহারের অনেক শহর নষ্ট হয়, অজস্র লোকজন মারা যায়, মাঠঘাটের চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। সোজা কথায় নর্থ বিহারকে তছনছ করে দিয়েছিল সেই ভূমিকম্প।" বলে অনন্ত থামল, দম নিল একটু, বলল, "এই ভূমিকম্পের পর এমন কিছু একটা ঘটেছে, যা সাধারণ ব্যাপার নয়। লোকে তা জানে না, বোঝে না। কিন্তু মোহনসাহেবদের ধারণা, একটা বিশেষ লাইন বরাবর কতকগুলো মিস্টিরিয়াস পয়েন্ট তৈরি হয়েছে, যেখানে অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। কিশোরের আগেও ঘটেছে। এই পয়েন্টগুলোতে কিছু একটা হয়, যাতে কোনো বস্তুই—প্রাণী হলেও—তা আর নজরে পড়ে না। নেচারস্ ম্যাজিক।"

"আবার ফিরে আসে না?"

"আসে। কিশোর যেমন এসেছে।...আসলে জায়গাটা তো উবে যাচ্ছে না, সেটা থাকছে, কিন্তু কী যেন আড়াল করে দেয় জায়গাটাকে। যেমন ধর, ঘন কুয়াশা হলে আমরা কাছের জিনিসও দেখি না— সেই রকম।"

কৃপানাথ হাসল না, অনন্ত চটে যাবে। বলল, "কুয়াশা আমরা দেখেছি। এই কলকাতাতেই এক একদিন শীতকালে এমন কুয়াশা হয় যে, দশ হাত দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না। কিন্তু এখানে কোন্ জিনিস আড়াল করবে?"

অনন্ত চুপ। সে কিছু যেন বোঝাতে চায়, বোঝাতে পারছে না। বলল, "আমিও সেটা বুঝতে পারলাম না। তবে মোহনসাহেব বলছিলেন, ওই মাঠঘাট, গাছপালা, ফাঁকা জায়গার কোথাও কোথাও একটা ভ্যাকুয়াম পয়েন্ট আছে, সেখানে কেমন করে যেন একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়ে যায়—নিজের থেকে। আবার চলে যায়।"

কিশোর বোকার মতন শুনছিল। বলল, "মাথায় ঢুকছে না।"

"আমার মাথাতেও ঢোকেনি," অনন্ত বলল, "গোলমেলে ব্যাপার। তবে ব্যাপারটা মোটামুটি কেমন হল জানিস? ধর, নদীতে জোয়ার এল। জোয়ার এলে কী হয়। পাড়ের দিকে কোনো কোনো জায়গা, হয়তো একটা নালার মতন হয়ে আছে, কিংবা ডোবার মতন, ভাটার সময় শুকনো, কিন্তু জোয়ার এলে জল ঢুকে পড়ে। আবার সরে যায় ভাটার সময়। সেই রকম একটা ব্যাপার। যদি ধরে নেওয়া যায়, কিশোর যেখানে ছিটকে পড়েছিল সেখানে একটা ভ্যাকুয়াম পয়েন্ট রয়েছে, আর লোকজন যখন ডেড্‌বডিগুলো খোঁজাখুঁজি করছিল তখন সামহাউ ওই বিশেষ জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করছিল—তা হলে এ-রকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড হতে পারে।"

কৃপানাথ মন্ দিয়ে সব শুনছিল। অনন্তর কথা শেষ হবার পর সে সোজা এগিয়ে এসে হাত ধরল বন্ধুর। বলল, "চল, যথেষ্ট হয়েছে।

নীচে চল্, পানের দোকান থেকে এক কিলো বরফ কিনে তোর মাথায় দিতে হবে। রাঁচির কেস।"

অনন্ত অপ্রস্তুত। কিশোর হেসে ফেলল।

কৃপানাথ অনন্তকে টানতে লাগল।

অনন্ত বলল, "কী, হচ্ছে কী?"

"তোর ব্রেনের কোথাও ভ্যাকুয়াম হয়েছে। নে, ওঠ। রাত হচ্ছে, মেসে ফিরব।"

বাধ্য হয়েই অনন্ত উঠল। কিশোরকে বলল, "তোরা আমাকে নিয়ে রগড় করছিস। কিন্তু ব্যাপারটা ওই রকম কিছু না হলে তুই কখনোই হারিয়ে যেতে পারতিস না। অন্যদের চোখে পড়তিস। ওখানে একটা চোরা কুঠরির মতন কিছু ছিল, চোরা জায়গা। তুই জানিস না।"

কৃপানাথ বলল, "হ্যাঁ ছিল। নে চল্। তোর মাথায় বরফ না চাপালে পাগলা হয়ে যাবি।"

অনন্ত কৃপানাথকে টানতে টানতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

৮

আট-দশটা দিন অনন্ত মোহনসাহেব মোহনসাহেব করে নেচে বেড়াল। তার কাজই হল, একবার করে মোহনসাহেবের বাড়ি যাওয়া আর কিশোরের হোটেলে এসে নানা রকম অদ্ভুত গল্প শোনানো। একদিন একটা বই নিয়ে এল হাতে করে মোহনসাহেবের বাড়ি থেকে, বলল—তোরা তো আমার কথা বিশ্বাস করিস না, ভাবিস গুলগাপ্পা ঝাড়ছি। রিড ইট্। হুঁহুঁ বাবা, এ একেবারে খাস আমেরিকান বই। বইয়ের মধ্যে চ্যালেঞ্জ আছে। নে, পড়ে দেখ।"

কিশোর বলল, "পড়ব। কিন্তু ওদিকে দাদা যে কৃপাকে অস্থির করে মারছে।"

"কৃপা আসবে না আজ?"

"ও এসেছে। এসে একবার বেরিয়েছে। একটা ফোন করতে গিয়েছে। এখুনি আসবে।"

কয়েক দিন ধরেই ভাল বৃষ্টি হচ্ছে কলকাতায়। গরম কমে গিয়েছে। আজ সকালেও বৃষ্টি হয়েছে কয়েক পশলা, তার মধ্যে ভোরের দিকে জোর বৃষ্টি হয়েছিল। বিকেলে আর বৃষ্টি নেই, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার।

ছাদে বসে কথা বলতে-বলতে অনন্ত বলল, "আচ্ছা কিশোর, তুই একটা কথা মনে করার চেষ্টা কর তো। অ্যাকসিডেন্ট যখন হতে যাচ্ছে, তখন কী কী হয়েছিল? ডিটেলে মনে কর।"

কিশোর বলল, "আমার যা মনে আছে সবই বলেছি তোদের। ক'বারই বলেছি। নতুন করে আর কী বলব?"

"তবু—বল্। মাঝে-মাঝে আমরা পয়েন্ট মিস্ করে যাই।...আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করছি—তুই জবাব দে।...ঘটনাটা ঠিক কখন ঘটেছিল? সময়?"

"ঘড়ি দেখিনি।"

"তবু আন্দাজে?"

"রাত আটটার পরেই হবে।" কিশোর একটু ভাবল। বলল, "আমরা মেহেরো বলে একটা জায়গা থেকে যখন জীপে উঠি তখন আর কত হবে—সাত বড় জোর।"

"আগাড়োগোড়া কুয়াশা ছিল পথে?"

"ছিল। তবে ওই বালুয়াসরাইয়ের দিকে খুব বেশি। কিছু চোখে পড়ছিল না।"

"অ্যাকসিডেন্টের আগে তুই কী করছিলি?"

"বসে ছিলাম চুপ করে। সেই পাঞ্জাবি ভদ্রলোক আর বেহারি ছোকরা কথা বলছিল।"

"তুই বলছিলি, অ্যাকসিডেন্টের আগে ড্রাইভার ভীষণ একটা চিৎকার করে উঠেছিল।"

"হ্যাঁ। বিরাট চিৎকার। সামনে কিছু দেখেছিল। কী দেখেছিল জানি না। পরে কাগজেপত্রে বেরিয়েছে পাগলা হাতি।"

"পাগলা হাতি ওখানে আসবে কেন?"

কিশোর হাসল। বলল, "বড় লোকদের যেমন গাড়ি, বিহারি জমিদারদের সেই রকম হল হাতি। খুদেদেরও এক-আধটা থাকে। নয়তো ঘোড়া। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়িতেও তো একটা স্ট্যাটাস থাকে। এই রকম হাতি ঘোড়া বিহারের ওসব দিকে দেখা যায়। তবে পকেটে টান পড়লে সবই কমে। হাতি ঘোড়া পোষার শখও কমে গেছে। দু একটা রয়েছে এখনও। সেই রকম কোনো হাতি হয়তো। পাগলা হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।"

অনন্ত বলল, "হাতির ডাক শুনেছিলি?"

"না।"

"তা হলে হাতি নাও হতে পারে।"

"তা—তা হতে পারে। তবে হাতি যে সব সময় ডাকবে, তেমন কথা নেই।"

অনন্ত পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল। কিশোরকে দিল, নিজেও নিল। সিগারেট ধরিয়ে অনন্ত বলল, "তুই অ্যাকসিডেন্টের পর যেখানেই পড়ে থাকিস—কত দিন ছিলি?"

"জানি না।"

"একেবারে মনে নেই?"

"না।"

"আমি এই কথাটাই ভাবি, কিশোর! দু'তিন দিন একটা মানুষের পক্ষে মাঠে পড়ে থাকা সম্ভব নয় ওই ভাবে। রোদ আছে, শীত আছে, খিদে তেষ্টা আছে। শরীরের পক্ষে..."

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, "সবই জানি। আমার একটা ব্যাপার সন্দেহ হয়। আমাকে যারা সেই মাটির ফাটলের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল—তারা হয়তো আগেই দেখেছিল। মানে সকালের দিকে। বেঁচে আছি দেখে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যরা মরে পড়ে আছে দেখে ছোঁয়নি।"

"অসম্ভব। সেই সাধুর দল তোকে তুলে নিয়ে গেল গোরুর গাড়ি যোগাড় করে—আর বাকি লোকগুলোর কথা আশেপাশের গাঁ-গ্রামে বলল না—তা কেমন করে হয়। অন্তত তোকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল সেই মহারাজের কাছে তো বলতই।"

অনন্তর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকল কিশোর। পরে বলল, "হয়তো বলেছে মধুমহারাজকে। আমি তখন অজ্ঞান। সেই জ্ঞান যখন ফিরেছে, ধীরে-ধীরে সুস্থ হচ্ছি—তখন আর মহারাজ আমায় কিছু বলেননি। সাধুর দলই বলতে পারে কী হয়েছিল। কিন্তু কে তাদের খুঁজে বার করবে?"

জোরে-জোরে বার কয়েক সিগারেটে টান দিয়ে অনন্ত বলল, "আমার থিওরি হল, তুই এমন এক জায়গায় পড়ে ছিলি ক'দিন, যেখানে কারও চোখ পড়ে না। কোনো একটা আড়ালের মধ্যে ছিলি। মানুষের চোখ সে-আড়াল ধরতে পারে না। তা ছাড়া ওই বিশেষ জায়গায় প্রকৃতির আইন-কানুন কাজ করেনি, করতে পারেনি। কোনো ধরনের অদ্ভুত একটা ফিল্ড তৈরি হয়েছিল পারটিকুলার জায়গাটায়। হয়তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরই কোনো ব্যাপার...।"

পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। কৃপানাথ আসছে।

অনন্ত বলল, "ওই যে-আসছে।"

ছাদে এসে অনন্তকে দেখামাত্রই কৃপানাথ যেন রাগে ফেটে পড়ল। "এই যে! শোন্, কাল থেকে তুই তোর বাড়িতে আমার জন্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবি। আমি আর মেসে থাকব না। চাকরিটাও ছাড়তে হবে। ওরাই আমায় ছাড়িয়ে দেবে।"

"কেন?" অনন্ত বলল।

"কেন মানে! তুই আমায় কী ফ্যাসাদে ফেলেছিস, তোর ক্ষমতা নেই বোঝার। নগেনদা নিজে এখন আমার অফিসে মেসে গিয়ে হাজির হচ্ছেন।"

অনন্ত ঘাবড়াল না। বলল, "কবে গিয়েছিলেন?"

"কাল রাত্তিরে মেসে ফিরে দেখি উনি বসে আছেন। কোনো রকমে কাটালাম। আজ অফিসে আবার।"

অনন্ত কিশোরের দিকে তাকাল একবার। "তোর দাদা জোর ঘাবড়ে গিয়েছে রে!"

কৃপানাথ বলল, "তুই নিজে মোহনসাহেব মোহনসাহেব করে নেচে বেড়াচ্ছিস, আর আমায় রোজ কিশোরের দাদার পাঠানো লোকজনকে সামলাতে হচ্ছে। এখন আবার নগেনদা নিজেই আসতে শুরু করেছেন। আমি আর ম্যানেজ করতে পারছি না। তুই উলটো-পালটা বলে কী অবস্থা করলি আমার, জানিস না।"

অনন্ত মাথা চুলকোল, মুখ মুছল রুমালে, তারপর বলল, "বোস আগে। সব শুনছি।"

বসার জায়গা ছিল না, মাটিতেই বসে পড়ল কৃপানাথ।

অনন্ত বলল, "নগেনদার মূল উদ্দেশ্যটা কী? উনি সেই মতিহারির চিঠি দেখতে চাইছেন, নাকি তোর কাছ থেকে জানতে চাইছেন—কিশোরের সঙ্গে আমাদের কোনো রকম একটা যোগাযোগ হয়েছে?"

"উদ্দেশ্য জানি না। সোজা কথা, চিঠি যদি এসেই থাকে, দেখাও চিঠি, নাম-ঠিকানা দাও লোকটার, যে চিঠি লিখেছে। আর, যদি চিঠির কথাটা মিথ্যে হয়, তোমরা কী মতলবে আমার বাড়ি বয়ে গিয়ে আমাকে মিথ্যে কথাটা বলে এলে?" কৃপানাথ একটু দম নিল। "অফিসে আমি ক'টা লোককে ম্যানেজ করব! গোবিন্দদা ছুটিতে রয়েছেন বলে তিন-চারটে দিন পার পেলাম। এরপর কী হবে? তা ছাড়া নগেনদা অন্য কাউকে ধরে কয়ে আসল ব্যাপারটা জেনে নিতে পারেন। তখন ভাই, আমার চাকরিটা যাবে।"

অনন্ত উপেক্ষার গলায় বলল, "অত শস্তা! চাকরি গেলেই হল।"

"আমার খুব বাজে লাগছে," কৃপানাথ বলল, "এ এক ফ্যাসাদে পড়া গেল।"

"কোনো ফ্যাসাদ নয়," অনন্ত বলল, "শিকার জালে পড়েছে, ভাই। এবার খেলিয়ে তুলে নিতে হবে।"

"তুমি তোলো, আমি পারব না।"

কিশোর বলল, "নন্তু, ব্যাপারটা সহজ নয়।"

অনন্ত বলল, "কঠিনই বা কেন হবে! নগেনদার ঘুম বন্ধ হয়ে যাবার কারণ কী? একটা উড়ো খবরে কারুর ঘুম বন্ধ হয়! তাও খবরটা তাঁর দিক থেকে বিশ্বাস করার কথাই নয়—যদি সত্যিই তিনি নিজের চোখে কিশোরের ডেড্‌বডি দেখে থাকেন, নিজের চোখের সামনে পুড়িয়ে এসে থাকেন। আমি বলছি, নগেনদা পাকা লোক, যা করেছেন জেনে-শুনে সুযোগ বুঝে করেছেন। তিনি আজ কাগজের অফিসে চিঠির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু একটা চিঠি তো নগেনদা মধুমহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সে-কথা আমাদের কাছে চেপে গেলেন কেন? তাঁর মতলব কী?"

কৃপানাথ কোনো জবাব দিল না। কিশোরও চুপ।

অনন্তই বলল, "খবরের কাগজেই এটা ছাপতে হবে।"

"কেমন করে?"

"আমরা কিশোরকে কাগজের অফিসে নিয়ে যাব। বলব সব। আমরা সাক্ষী হব। ফোটো তোলাব কিশোরের, তারপর যা হবার হবে।"

কিশোর মাথা নাড়ল। "না, না, নেভার।"

কৃপানাথ বলল, "কাগজে যদি না ছাপে?"

"ছাপবে!...আর তোরা না ছাপিস অন্য কাগজ আছে। সে ব্যবস্থা করা যাবে।"

"তারপর?"

"তারপর মামলা। কিশোর ভার্সাস নগেন। মেজোজামাইবাবু কিশোরের পক্ষে লড়বে। আমরা হব কিশোরের পক্ষে সাক্ষী। আরও বন্ধু-বান্ধব জোটাব। মধুমহারাজকে ধরে আনব। তোর সেই মেহেরো না কোথাকার যেন পুলিশ স্টেশনের বাবুদের বারোটা বাজাব।...দারুণ জমে যাবে। কাগজে-কাগজে খবর বেরুবে মামলার।"

কৃপানাথ বলল, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

"হ্যাঁ," অনন্ত বলল, "তাই। তবে যা বলছি ভাই, ঠিক সেই রকম হবে। শুধু ওই এক জায়গাতেই আমরা মার খাব।"

"কোন জায়গায়?"

"অ্যাকসিডেন্টের পর, মানে পরের দিন, কেন কিশোরের বডি খুঁজে পাওয়া যায়নি! কোথায় ছিল কিশোর? কী হয়েছিল তার? কত দিন সে পড়ে ছিল গর্তটায়। কেমন করে বেঁচে ছিল? আর কবেই বা মধুমহারাজের কাছে গিয়ে উঠল।...এইটেই হল আসল কথা। ও কোথায় ছিল, কেমন করে অদৃশ্য থাকল, বেঁচে থাকল কী ভাবে! একবার যদি এর আন্দাজ পাওয়া যায়, বাকিটা কিছু নয়, নাথিং।"

বাড়ি ফেরার সময় কৃপানাথ বলল, "তোকে একটা কথা বলি।"

অনন্ত বলল, "জানি, কী বলবি তুই।...কিশোরের দাদা তোকে শুধু বিরক্ত করছে না—পেছনে লোক লাগিয়েছে, এই তো?"

অবাক হল কৃপানাথ, "কী করে জানলি তুই?"

"জানি," অনন্ত হাসল। "আজ সকালে আমার বাড়িতে ফোন এসেছিল। নগেনদার ফোন। খানিকটা ধানাই-পানাই করে শেষে বললেন, তোমরা দুই বন্ধু আমার সঙ্গে মজা করবার চেষ্টা করছ, নন্তু। আমাকে আপসেট করার চেষ্টা করছ। কেন? আমিও খোঁজখবর করছি ছোটকুর। তোমরা আমাকে ধোঁকা দিয়ে পার পাবে না।"

কৃপানাথ চুপ। পাশাপাশি হাঁটছে দু'জনে।

গলিতে ঢুকে কৃপানাথ বলল, "আমার মেসে নগেনদা কাল যখন আসেন, সঙ্গে একটা লোক ছিল। অবশ্য কথা বলার সময় সে ছিল না। নগেনদা তাকে নীচে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লোকটাকে আমার ভাল লাগেনি।"

"বোধহয় সন্দেহ করছেন—কিশোরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে।"

"আমারও তাই মনে হয়।...আমি ভাবছি, নগেনদার লোক যদি আমাদের ফলো করে কিশোরকে ট্রেস করতে পারে, কিশোরের কী হবে?"

"ঠিক। আমিও সে-কথা ভেবেছি।"

"উপায়?"

"বুঝতে পারছি না। আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওঠাব যে, তার উপায় নেই। কিশোর যাবে না। তা ছাড়া আমার বাড়িতে একটা হইচই লেগে যাবে।"

অনন্তর কথা শেষ হল কি হল না—অন্ধকার হয়ে গেল সব। লোড্‌শেডিং।

অন্ধকারে হাঁটতে-হাঁটতে অনন্ত বলল, "শুধু একটা ব্যাপারে সব আটকে যাচ্ছে, কৃপা। অ্যাকসিডেন্টের পর কেন কিশোরকে পাওয়া যায়নি। সে কোথায় ছিল ? দু দিন হোক—তিন দিন হোক—কোথায় সে পড়ে থাকল ? কেমন করে বেঁচে থাকল ? এই একটা মাত্র প্রবলেম সল্‌ভ করতে পারলে বাকি সব কিছু নয়। পরের ব্যাপার তো জানাই যায়। মধুমহারাজ রয়েছেন।"

কৃপানাথ বলল, "তুই কি সত্যিই বিশ্বাস করিস মোহনসাহেব যা বলছেন, তা হয়, হতে পারে ?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অনন্ত বলল, "সত্যি বলতে কী, বিশ্বাস আমার হয় না। কেননা ব্যাপারটা জানি না, বুঝি না। তবে জগতে কী না হয় ভাই ! কতটুকু আমরা জানি ! মোহনসাহেবের ধারণা যদি সত্যি হয়, তবেই কিশোরের অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হওয়া, আবার তাকে খুঁজে পাওয়ার একটা অর্থ করা যায়, নয়তো যায় না।"

৯

বিকেলের দিকে কৃপানাথ হাতের কাজ সেরে আয়েস করে চা খাচ্ছিল, বেয়ারা এসে খবর দিল গোবিন্দবাবু ডাকছেন।

চা শেষ করে কৃপানাথ গোবিন্দবাবুর কাছে গেল। বড় একটা হলঘরের একেবারে কোনার দিকে গোবিন্দবাবুর টেবিল। মাথার দিকে জানলা। হলঘরের চারদিকে টেবিল চেয়ার ছড়ানো। কাজ করছে কেউ কেউ, কেউ বা গল্প করছে। সুযশ কোমরে হাত রেখে বেজায় তর্ক বাধিয়েছে নিত্যানন্দর সঙ্গে। এক দিকে রাখা টেলিপ্রিন্টার খটখট করে বেজে চলেছে।

"এই যে, এসো কৃপানাথ," গোবিন্দবাবু ডাকলেন।

"দু'তিন দিন অফিসে আসেননি। কী হয়েছিল গোবিন্দদা ?"

"জ্বর হয়েছিল। সর্দিজ্বর। বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিলাম একদিন। তার জের। বোসো।"

কৃপানাথ সামনের চেয়ারে বসল। "এখন ভাল আছেন ?"

"মোটামুটি।...যার জন্যে তোমায় ডাকলাম। হ্যাঁ হে, তোমার সেই বন্ধু—কী যেন নামটা—"

"কিশোর।"

"হ্যাঁ, কিশোর।...তার বাড়ি থেকে একজন আমার বাড়ি গিয়ে হাজির।"

কৃপানাথ অবাক হল না। তারও সন্দেহ ছিল, এমন ঘটনা ঘটতে পারে। বলল, "কে গিয়েছিল ? কিশোরের দাদা ?"

"না, দাদা তো বলল না। ফরসা মতন মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোক।"

কৃপানাথ বুঝতে পারল না কে হতে পারে। আপনার বাড়ির ঠিকানা পেল কোথায় ?"

"অফিস থেকে জেনেছে।"

"কী বলল ?"

"চিঠির কথা।...তুমি তো আমায় ফ্যাসাদে ফেললে। ছিনে জোঁকের মতন লেগে থাকল ভদ্রলোক, তাড়াতে পারি না।"

"আপনি কিছু বলেননি তো ?"

"মাথা খারাপ ? তুমি বলে রেখেছ, আর আমি ফাঁস করে দেব ? বলিনি কিছু। কিন্তু লোকটা বড় চালাক। বদ। আমায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলল, কিছু দিতে পারে, যদি..." গোবিন্দবাবু হাসলেন।

কৃপানাথ বুঝতে পারল। চিঠির জন্যে কিশোরের দাদা পাগল হয়ে গেছেন। অনন্ত এই চালটা ভাল চেলেছে।

গোবিন্দবাবু বললেন, "লোকে এত নির্বোধ হয়, তাও জানতাম না। আরে, খবরের কাগজের অফিস কি চিঠি জমিয়ে রেখে দেয় ! এতদিন ধরে ! হয় ছাপে, না হয় ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেয়।...তা ওদের বোকামি দেখে আমি আর-এক ওপর চাল দিলাম।" গোবিন্দবাবু হাসলেন।

কৃপানাথ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

গোবিন্দবাবু বললেন, "আমি কী বললাম জানো ?...বললাম, আমাদের পাটনার করেসপনডেন্টকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে। তাকে খোঁজখবর করতে বলেছি আমরা। তার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানলে তারপর যা করার করা হবে।"

কৃপানাথ হেসে ফেলল। "দারুণ দিয়েছেন গোবিন্দদা।"

টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলেন গোবিন্দবাবু। সিগারেট ধরালেন, "একটা কথা তোমায় বলি কৃপানাথ। ধোঁকা দিয়ে বেশিদিন চালানো যায় না। তোমরা যখন ওভারশিওর তোমাদের বন্ধু বেঁচে রয়েছে, মারা যায়নি, তখন কাগজে একটা নিউজ করে দাও না ! ভেরি ইন্টারেসটিং নিউজ হবে। সতীশবাবুকে বলো। ছেলেরা কেউ তোমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে ছবি-টবি দিয়ে একটা নিউজ করে দিক। পাবলিক নেবে।" শেষের কথাটা ঠাট্টার গলায় বললেন গোবিন্দবাবু।

কৃপানাথ সামান্য সময় চুপ করে থাকল। অন্যমনস্ক। তারপর বলল, "আমরাও তাই ভাবছিলাম গোবিন্দদা। কিন্তু কিশোর রাজি হচ্ছে না।"

"কেন ?"

"ও ভয় পাচ্ছে। এখন এক রকম লুকিয়ে আছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে তার বিপদ ঘটতে পারে। তা ছাড়া, বুঝতেই তো পারছেন, এ-সব নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হবে, কত দিন চলবে, তাও কেউ বলতে পারে না। তার ওপর আইনের চোখে কিশোরকে এস্টাব্লিশ করতে হবে, সত্যই কিশোর। সেটাও তো সহজ নয়।"

গোবিন্দবাবু চুপচাপ আধখানা সিগারেট শেষ করে ফেললেন। বললেন, "কিছু তো একটা করবে তোমরা। বসে থাকলে কী লাভ ?"

"দেখি।"

"কী দেখবে ?"

"কিশোরকে বুঝিয়ে বলি।"

"হ্যাঁ, বুঝিয়ে বলো।...তোমার বন্ধুর দাদার কোনো একটা কেরামতি আছে। নয়তো এত ছটফট করছে কেন ?"

কৃপানাথ অন্য দু'একটা কথা বলে উঠে পড়ল।

তার অন্য একটা কাজ আছে শোভাবাজারে। এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দেশের বাড়িতে মা আর থাকতে চাইছেন না। কিন্তু কলকাতায় এনে মা'কে রাখবে কোথায় ? থাকতেও পারবেন না মা।

রাস্তায় নেমে কৃপানাথ হাঁটতে লাগল। শোভাবাজার ঘুরে কিশোরের কাছে যাবে।

শোভাবাজার থেকে ঘুরে কিশোরের হোটেলে আসতে খানিকটা দেরিই হয়ে গেল কৃপানাথের। এসে দেখল, কিশোর নেই, দরজায় তালা ঝুলছে।

শুধু অবাক নয়, খানিকটা ভয়ও কৃপানাথ পেল। কিশোর তার হোটেলের ঘর ছেড়ে কোথাও বড় একটা যায় না। গেলেও কাছাকাছি পার্কে যায়, কিংবা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, হয়তো কোনো চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চা খায়। তাও সন্ধের পর সে কোথাও বেরোয় না।

অনন্তও নেই। এসে ফিরে গিয়েছে, নাকি এখনও আসেনি, বোঝা যাচ্ছে না। তবে সন্ধে হয়ে গিয়েছে, অনন্ত এতক্ষণে চলে আসে।

নীচে গিয়ে কৃপানাথ খোঁজ করল। যারা কাজকর্ম করে, তারা বিশেষ কিছু বলতে পারল না। একজন বলে, খানিকটা আগে দেখেছে কিশোরবাবুকে ; আর-একজন বলে, বিকেল থেকে দেখেনি।

শেষ পর্যন্ত তারক বলে একজনকে পাওয়া গেল। সে বলল, ঘন্টা দেড়েক আগে কিশোরবাবু বেরিয়ে গেছেন। যাবার সময় বলছিলেন, তাঁর মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। কিশোরবাবু চলে যাবার আধ-ঘন্টাখানেক পর সেই বাবু এসেছিলেন, ফরসামতন। তিনি রোজই আসেন। তিনি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছেন।

কিশোর বুঝতে পারল, অনন্ত এসেছিল। এসে চলে গিয়েছে।

অদ্ভুত ব্যাপার। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কিশোর ? অনন্তই বা কোথায় গেল ?

কী করবে কৃপানাথ বুঝতে পারল না। অপেক্ষা করবে, না চলে যাবে ?

হোটেলের নীচে এসে কৃপানাথ দাঁড়াল কিছুক্ষণ। রাস্তার দিকে

তাকিয়ে থাকল। কোথায় যেতে পারে কিশোর? যদি মাথাই ধরে থাকে, ওষুধ কিনে এনে খেয়ে ঘরে শুয়ে থাকবে—বাইরে কোথায় ঘুরবে সে! পার্কে গিয়ে বসে আছে? যা অবস্থা পার্কের, তাতে কেউ মাথা-ধরা ছাড়াতে পার্কে যায় না। বরং পার্কে গেলে মাথা আরও ধরে যাবে।

আচ্ছা, অনন্ত কি কিশোরকে হোটেলে না পেয়ে পার্কে খোঁজ করতে গিয়েছিল! সেখানে কিশোরকে পেয়ে গিয়ে দু'জনে বসে আড্ডা মারছে? বা রে বা, তা কেমন করে হয়? ওরা তো জানে কৃপানাথ আসবে। তা হলে?

ঘড়ি দেখল কৃপানাথ, পৌনে আট।

দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। একবার পার্কটা ঘুরে মেসেই ফিরে যাবে, করার তো কিছু নেই তার।

কৃপানাথ পার্কের দিকে এগিয়ে চলল, লোকজনের ওপর চোখ রেখে।

পার্কে পৌঁছবার আগেই বাতি চলে গেল। বাতি চলে যাবার সামান্য পরে বোঝা গেল, আলো রয়েছে চাঁদের।

কৃপানাথের ভয় হচ্ছিল। কিশোরকে কি কেউ ধরে নিয়ে গেল? তা-ই বা কেমন করে যাবে? হোটেলে এসে একজন সাবালককে কি কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে? তা ছাড়া, কিশোর তো একলাই বেরিয়ে গিয়েছিল হোটেল থেকে। সেই রকমই সে শুনল। তা হলে কি বুঝতে হবে, কিশোর যখন মাথা ধরার ওষুধ কিনে ফিরছে, তখন কেউ তাকে ধরেছে? সেটা অসম্ভব ব্যাপার। কলকাতার এই রাস্তায় হুট করে একজন এসে রাস্তা থেকে কিশোরকে ধরে নিয়ে যাবে, এমন হয় না। কিশোরের দাদার অত সাহস হবে না।

কৃপানাথের উদ্বেগ বাড়ছিল। পার্কেও কাউকে দেখা গেল না।

উদ্বেগ আর আতঙ্ক নিয়ে কৃপানাথ মেসে ফিরতেই অনন্তকে দেখতে পেল।

"কী রে, তুই এতক্ষণ কী করছিলি?...কিশোর কোথায়?" অনন্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল।

বুকের মধ্যের ভয়টা যেন গলার কাছে উঠে এল কৃপানাথের। "আমিও তো তোকে একই কথা জিজ্ঞেস করছি।"

অনন্ত অপলকে কৃপানাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "সে কী! আমি কিশোরের হোটেলে গিয়ে ওকে দেখতে পেলাম না। না পেয়ে একবার তুলসীর বাড়িতে গেলাম। সেখানে একটু দেরি হয়ে গেল। আবার হোটেলে গেলাম। শুনলাম তুই গিয়েছিলি। কিশোরকে পাসনি। আবার আমি হোটেল থেকে তোর মেসে আসছি।"

কৃপানাথ বসে পড়ল। ক্লান্তি লাগছিল তার। অনেক ঘুরেছে। বলল, "কিশোরকে আমি দেখিনি। পার্কেও গিয়েছিলাম।"

আতঙ্কের গলায় অনন্ত বলল, "কোথায় গেল ও?"

"কী জানি!"

"আশ্চর্য!"

দু'জনেই চুপচাপ। কৃপানাথের মনে হল গোবিন্দদার কথাটা বলে নেওয়া দরকার। বলল কথাটা।

অনন্ত মন দিয়ে শুনল সব। তারপর বলল, "কিশোরকে ট্রেস করে ধরে ফেলেছিল ওরা! তুলে নিয়ে গেছে বলছিস?"

"তা কেমন করে হবে! একটা জোয়ান ছেলেকে হোটেল থেকে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে!"

"তা হলে?"

"জানি না। ভাল লাগছে না।"

অনন্ত মাথার চুল ঘাঁটতে লাগল, যেন বুদ্ধিটা চুলের তলায় লুকিয়ে আছে। খানিকক্ষণ পরে আপন মনে বলার মতন করে বলল, "যাবে কোথায়? যাবার জায়গাও তো নেই।...আচ্ছা, কৃপা, কিশোর সেই জর্জ—খিদিরপুরে যার কাছে থাকত—স্মাগলার—তার কাছে চলে যায়নি তো?"

কৃপানাথ বলল, "জর্জের কাছে কেন যাবে?"

"যাবার কথা নয়। তবে ধর, জর্জের লোকজন কেউ যদি তাকে দেখে ফেলে থাকে—" অনন্ত বলল, তার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না এ-রকম হতে পারে। কোথায় খিদিরপুর আর জর্জ, আর কোথায় বা কিশোর।

কৃপানাথ হতাশ, বিভ্রান্ত। বলল, "জানি না। যদি গিয়ে থাকে যাক—আমরা তো আর জর্জকে খুঁজে পাব না। জানিও না সে কোন্ বাড়িতে থাকত, ঠিক কোন্ জায়গায়।"

অনন্ত চুপ করে থাকল।

সামান্য বসে থেকে কৃপানাথ বলল, "তুই একটু বসবি? সারাদিন টোটো করছি। টায়ার্ড। আমি একটু স্নান করে আসি।"

মাথা হেলাল অনন্ত। "আয়।"

কৃপানাথ আরও দু'দণ্ড বসে নীচে গেল স্নান করতে।

অনন্ত বসে থাকল। বসে-বসে সিগারেট শেষ করল। আকাশ পাতাল, সম্ভব অসম্ভব ভাবল। কোনো কিছুই ধরতে পারছিল না। কিশোরদের বাড়ি থেকে—মানে তার দাদার কোনো লোকজন এসে যদি কিশোরকে জোর করে ধরে নিয়ে না যায়, তাহলে ওর যাবার অন্য কোনো জায়গা নেই। কিন্তু নগেনদা এতটা করতে সাহস করবে? তা ছাড়া একটা ব্যাপার আছে। কিশোর যতদিন ছিল ততদিন নগেনদার কী অসুবিধে হচ্ছিল? আর কিশোর না থাকলে কী সুবিধে হবে নগেনদার, তাও তো অনন্তরা জানে না। কিশোরও বলেনি কিছু। নগেনদার উদ্দেশ্য কী?

কৃপানাথ ফিরে এল।

অনন্ত বলল, "আজ আর কিছু করার নেই। কাল একবার কিশোরদের বাড়ি গেলে হয়।"

"গিয়ে?"

"নগেনদাকে ধরব।"

"লাভ হবে?"

"আচ্ছা, থানায় একটা ডায়রি করিয়ে এলে হয় না?"

"করানো যায়।"

হঠাৎ অনন্তর কী যেন মনে পড়ে গেল, চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁরে কৃপা, কিশোর আবার কোনো অ্যাকসিডেন্ট করেনি তো? হাসপাতালে খোঁজ করা উচিত ছিল।"

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল অনন্ত।

কৃপানাথ কথাটা আগেই ভেবেছিল। বলল, "আজকের রাতটা যাক, কাল দেখা যাবে।"

১০

অফিসে ভাল লাগছিল না। কাজকর্মে মন পাচ্ছিল না কৃপানাথ। সকালে আবার একবার কিশোরের হোটেলে খোঁজ নিতে গিয়েছিল সে। না, ফেরেনি কিশোর। ম্যানেজারবাবু বলছিলেন, হাসপাতালে খোঁজ করতে। তিনিও ব্যস্ত হয়েছেন। একজন বোর্ডার বেপাত্তা! কী হল তার? আজকাল কিছুই বিশ্বাস করা চলে না।

কৃপানাথ পাশ কাটাল। হ্যাঁ, হাসপাতালে খোঁজ নেওয়া দরকার। সে খোঁজ নেবে।

খোঁজ যে অনন্ত করবে, কৃপানাথ জানত।

দুপুরের দিকে ফোন এল কৃপানাথের। নিশ্চয় অনন্ত। ফোন ধরতে উঠল কৃপানাথ।

"হ্যালো।"

"আমি কিশোর।"

চমকে উঠল কৃপানাথ। বুকের মধ্যে ধকধক করতে লাগল। "কী রে, তুই কোথায়? কাল কোথায় চলে গিয়েছিলি? কী হয়েছে তোর? আমরা ভেবে-ভেবে মরছি।"

দু মুহূর্ত কোনো জবাব নেই। একেবারে নিস্তব্ধ সব। তারপর কিশোর বলল, "তোদের বড় জ্বালালাম কৃপা। অনেক কষ্ট দিলাম। আমায় ক্ষমা করিস। আর-একবার কষ্ট দেব।"

কৃপানাথ কিছু বুঝতে পারল না। কিশোরের গলার স্বর কেমন যেন চাপা, বেদনাভরা শোনাচ্ছে।

"কী বলছিস তুই?" কৃপানাথ বলল।

কিশোর দু' মুহূর্ত চুপ। তারপর বলল, "আজ তুই বিকেলের পর

ইন্দ্রজাল কমিকস
আপনাকে নিয়ে যায়
উত্তেজনাময়
অ্যাডভেঞ্চারের
দুনিয়ায়—
প্রতি সপ্তাহে !

আয়। না, হোটেলে নয়, হোটেলে আমি ফিরিনি। ফিরতে পারব না। তুই আউটরামে আয়, সেদিন যেমন এসেছিলি!"

বিভ্রান্ত বোধ করল কৃপানাথ। "তার মানে? তোর হয়েছে কী?"

"সব বলব, ভাই। তুই আজ আয়। প্লিজ্। যদি না আসিস—পরে দুঃখ পাবি।"

"কিশোর!" কৃপানাথ এবার একটু শক্ত গলায় বলল, "পাগলামি করিস না। কোথায় আছিস তুই?"

"বললাম তো, বলব সব। তুই নিশ্চয় আসবি।...নন্তুকে আমি ফোন করেছি। কথা বলেছি। সে আসবে। তুই আসবি, ভাই।"

কৃপানাথ আর কিছু বলতে পারল না, লাইন কেটে গেল।

সারাটা দুপুর কেমন এক ভয়, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তায় কাটল কৃপানাথের। অনন্তও ফোন করেছিল। ফোন পেয়েছে কিশোরের। আসবে অনন্ত। কৃপানাথকে অপেক্ষা করতে বলেছে।

অনেক ভেবেও কৃপানাথ যখন কিছুই অনুমান করতে পারল না, হতাশ হয়ে অন্য-কিছুতে মন বসাবার চেষ্টা করল। পারল না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল কখন। কৃপানাথ উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। ভীষণ চোখ জ্বালা করছিল। জল দেবে চোখেমুখে।

বৃষ্টি আসার মতন লক্ষণ নেই, তবে আকাশে মেঘ জমছে। এই মেঘ জমতে জমতে সন্ধেও হয়ে যেতে পারে। গঙ্গার দিকে বাতাস বয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস। লোকজন ঘোরাফেরা করছিল। এক দল বাচ্চা ছুটোছুটি করছে।

অনন্ত আর কৃপানাথ সেই আগের জায়গায় গিয়ে বসল।

অনন্ত বলল, "দ্যাখ কৃপা, কিশোর বলুক আর না বলুক, আমার মনে হচ্ছে, ও নিজের বাড়িতে গিয়েছে। ইচ্ছেয় যাক আর অনিচ্ছেয় যাক—নিশ্চয় গিয়েছে।"

কৃপানাথ কোনো জবাব দিল না। কিশোর বৃথা তাদের ভোগাচ্ছে। এমন কী কথা তার, যা সে এতদিন বলতে পারল না? আর কেনই বা আজ ফোনে কথাগুলোর আভাস দিল না। আশ্চর্য!

অনন্ত নিজের মনেই কিছু বলছিল, থেমে যাচ্ছিল, আবার বলছিল। সে ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

আরও খানিকটা পরে কিশোরকে দেখা গেল। ততক্ষণে আরও কিছুটা মেঘ জমেছে আকাশে।

কিশোর ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল। হাসবার মতন মুখ করবার চেষ্টা করল, পারল না। তার মুখ শুকনো, ম্লান দেখাচ্ছিল।

"কতক্ষণ এসেছিস তোরা?" কিশোর বলল বসতে বসতে।

"অনেকক্ষণ।"

"আমার আসতে দেরি হয়ে গেল। জ্যামে পড়েছিলাম।"

কথাটায় কান দিল না অনন্ত। সরাসরি কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কাল কোথায় গিয়েছিলি? কেন গিয়েছিলি? কোথায় আছিস তুই?"

কিশোর জবাব দিল না কথার। প্রথমে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর চোখ তুলে গাছ আর আকাশ দেখল।

অনন্ত বলল, "কাল থেকে তুই আমাদের খাওয়া ঘুম বন্ধ করে দিয়েছিস। আজ সকালে আমি দুটো হাসপাতালে খোঁজ করেছি। তোর ব্যাপার কী? এত দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলে তুই!...যাক, ও-সব বাজে কথা থাক। তোর কী বলার আছে বল।"

কিশোর মুখ নিচু করল। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "কাল দুপুরে আমার শরীরটা খারাপ লাগছিল খুব। বিকেলে ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হতে শুরু করল। অসহ্য যন্ত্রণা। আমি দুটো ট্যাবলেট কেনার জন্যে নীচে নেমে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার কেমন যেন হল মাথার মধ্যে। তোদের বোঝাতে পারব না। কেমন একটা অজ্ঞান হয়ে যাবার ভাব। মনে হল, আমার মাথাটাই আর কাজ করবে না। আমি মারা যাব। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলাম।"

কিশোর চুপ করে থাকল। আবার বলল, "ট্রাম লাইনের কাছে যে ছোট দোকানটা রয়েছে ওষুধের, সেখানে একটা বুড়োমতন লোক বসে ছিল। তার কাছে দুটো ট্যাবলেট চাইলাম। বুড়ো আমায় দুটো ট্যাবলেট দিল। জল চাইলাম এক গ্লাস। জলও দিল। ওষুধ দুটো খেয়ে ফেললাম। বুড়ো বলল, একটু বসে যান, ওষুধ খেয়ে দু' দণ্ড জিরিয়ে নেওয়া ভাল। দোকানের এক পাশে চেয়ার ছিল। বসে পড়লাম। মাথা ফেটে যাচ্ছে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সমস্ত মাথাটা যেন কেউ ভেঙে দিচ্ছে টুকরো-টুকরো করে। কিসের এক ওলোট-পালট ঘটে যাচ্ছে। অথচ ওই যন্ত্রণার মধ্যে কেমন এক বেহুঁশ অবস্থা হচ্ছিল।...হঠাৎ আমার কী হল, ভীষণ অস্থির, হয়ে উঠলাম। কেন কে জানে! বুড়ো আমায় কিছু বলল। শুনতে পেলাম না। সোজা রাস্তায় নেমে একটা রিকশা নিলাম। বাড়ি যাব।"

কৃপানাথ আর অনন্ত বন্ধুর মুখ দেখছিল, কথা শুনছিল কান খাড়া করে। হু হু করে গঙ্গার দমকা বাতাস বয়ে গেল। শব্দ হল গাছের পাতায়।

"তুই তোর বাড়িতে গেলি?", অনন্ত বলল।

"হ্যাঁ, বাড়িতে," কিশোর বলল, "আমার বাড়িতে। কী অবস্থায় গিয়েছিলাম আমি জানি না। আমার মধ্যে আমি যেন আর ছিলাম না। অন্য মানুষ। রাগে, জ্বালায়, ঘৃণায়—কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল, আমি নিশ্চয় মারা যাব এবার। যদি মরতে হয় রাস্তায় কেন, এবার নিজের বাড়িতে মরব, আমার মা যেখানে মারা গিয়েছে, বাবা গিয়েছে। দাদার সঙ্গে আমার কথাও আছে। সে জানুক, আমি মরিনি, বেঁচে ছিলাম।"

কৃপানাথ লক্ষ করল, কিশোরের হাত উত্তেজনায় কাঁপছে, মুখ শক্ত হয়ে গিয়েছে, চোখের দৃষ্টি পাগলের মতন। সে আস্তে করে কিশোরের গায়ে হাত দিল। যেন বোঝাতে চাইল, অত উত্তেজনা ভাল নয়।

কিশোর বলল, "বাড়িতে দাদা ছিল না তখন। বউদি ছিল। আশু ছিল, গোপালের মা ছিল। মনু আর টুবলুও ছিল। কেউ আমায় চিনতে পারল না। আমি বারবার বললাম, আমি কিশোর। ওরা আমায় বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিল না। পাড়ার লোকজনকে ডাকতে লাগল। হয়তো আমায় থানায় দিত, মারধোর করত। এমন সময় দাদা এসে পড়ল।"

অনন্ত কেমন যেন আঁতকে ওঠার শব্দ করল।

কিশোর চুপ। মাথার চুল টানল দু হাতে। ছটফট করতে লাগল।

"সিগারেট খাবি?"

"দে।"

অনন্ত সিগারেট দিল।

হাত কাঁপছিল কিশোরের। কেসে উঠল জোরে।

"দাদা আমাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল।" কিশোর বলল। "আমি যে-ঘরে থাকতাম, সেই ঘরটা একেবারে জঞ্জাল করে রেখেছে। দাদা আমায় ঘরে বসিয়ে চলে গেল। বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। আমি বসেই থাকলাম। বুঝতে পারলাম না, দাদা পুলিশে ফোন করতে গেল কি না!"

কিশোর হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। বলল, "আমি বসেই থাকলাম। মাথা আর সোজা রাখতে পারছিলাম না। এমন সময় দাদা আবার এল। দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ির বুড়ো কুকুর বাঘা। কুকুরটা আমায় দেখে একেবারেই চিনল না, রাগে গরগর করতে লাগল। আমি অবাক হয়ে গেলুম। কুকুরটার তো চেনা উচিত ছিল। ওরা তো গন্ধে মানুষ চেনে লোকে বলে! তবে চিনল না কেন? আশ্চর্য! দাদা কুকুরটাকে বাইরে রেখে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।"

থামল কিশোর। মাথার চুল টানল দু হাতে। ঘাড় উঁচু করল। আকাশ দেখল দু পলক। তারপর বলল, "দাদাকে আমি সব বললাম। বললাম, আমি মরিনি, কোনো ভাবে বেঁচে গিয়েছি। আমি জাল কিশোর নই। দাদা বিশ্বাস করল না। তখন আমি দাদাকে একটা কথা বললাম, আগে যা কোনোদিন বলিনি। বললাম, এই ঘরে একটা জিনিস আছে লুকোনো, আমি ছাড়া কেউ জানে না। যদি সেটা বার করে দিতে পারি তা হলে কি দাদা বিশ্বাস করবে আমাকে?"

"কী জিনিস?" অনন্ত জিজ্ঞেস করল।

"আমার মা মারা যাবার আগে আমায় কিছু দামি পাথর দিয়েছিল। আমার দাদামশাই—মানে দাদুর ছিল জুয়েলারির ব্যবসা। দোকানে

কর্মচারীরা গোলমাল করত বলে দাদু মাঝে-মাঝে মায়ের কাছে দামি পাথর-টাথর রেখে যেত। দাদু হঠাৎ মারা যায়। মায়ের কাছে কিছু পাথর থেকে গিয়েছিল। তার দাম কম করেও আজকের দিনে লাখ টাকার বেশিই হবে।...মা মারা যাবার আগে আমাকে পাথরগুলো দিয়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল দুঃখকষ্টে পড়লে এগুলো আমার কাজে লাগবে। আমি মায়ের সামনে পাথরগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম।"

"কোথায় ?"

"বলছি।...আমার ঘরের মেঝে লাল। লাল সিমেন্টের। তোরা দেখেছিস। ঘরের পশ্চিম দিকের একটা কোনায় আমি নিজের হাতে সিমেন্ট-বালি খুঁড়ে একটা গর্তমতন করি। গর্তটা খানিকটা লম্বামতন। পাথরগুলো নেকড়া আর চামড়ায় মুড়ে গর্তে রেখে তার ওপর আবার বালি-সিমেন্ট রঙ দিয়ে ভরাট করে দিয়েছিলাম। চোখে পড়ার মতন নয়।"

কৃপানাথ বিস্ময়ের শব্দ করল।

কিশোর বলল, "দাদাকে একটা লোহার কিছু এনে দিতে বললাম, যাতে সিমেন্ট খোঁড়া যায়। দাদা এনে দিল। ছেনির মতন একটা লোহার জিনিস। জায়গাটা খুঁড়তে গিয়ে আমার কেমন সন্দেহ হল। নতুন-নতুন লাগল সিমেন্ট। তবু খুঁড়লাম। কিছু নেই। ফাঁকা। বুঝতে পারলাম—দাদা কথাটা জানত। কেমন করে জেনেছিল বলতে পারব না। পাথরগুলো সে বার করে নিয়েছে। রাগে দুঃখে ঘেন্নায় আমার কেমন যেন হয়ে গেল। মাথার ঠিক থাকল না। দাদাকে আমি ছেনি দিয়ে মেরে বসলাম। দাদা চিৎকার করে উঠল। লোকজন ছুটে এল। সবাই এখন হকচকিয়ে গিয়েছে। আমি আর দাঁড়ালাম না। পালালাম। আমার পেছনে তাড়া করবার আগেই আমি রাস্তায়।"

কৃপানাথ আর অনন্ত একসঙ্গে আঁতকে উঠল।

কিশোর দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সারা রাত আমি রাস্তার কুকুরের মতন ঘুরে বেড়িয়েছি, শেয়ালদা স্টেশনের বাইরে গিয়ে বসে ছিলাম সকাল পর্যন্ত। কী করব, কোথায় যাব, বুঝতে পারছিলাম না। দাদার কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত তাও জানি না। হয়তো দাদার তেমন কিছু হয়নি। কিন্তু পুলিশ তো আমায় ছাড়বে না। এ আমি কী করলাম, নন্তু! আমার পুরনো পরিচয় না হয় না থাকত, নতুন পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু সব গোলমাল হয়ে গেল।"

তিন জনেই চুপ। সন্ধে হয়ে গিয়েছে কখন। আকাশ আরও কালো হয়ে এসেছিল। এখন গঙ্গার দিক থেকে জোর বাতাস আসছে। স্টীমারের ভোঁ বাজল ঘন-ঘন।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর অনন্ত বলল, "তুই কেন বাড়িতে ঢুকতে গেলি ? আমরা যেভাবে এগোচ্ছিলাম, ধীরে-ধীরে সেইভাবেই এগুতাম। কাগজে বার করতাম, মামলা লড়তাম। যা হয় দেখা যেত পরে।"

কিশোর চোখ মুছল। বলল, "না নন্তু, কিছু হত না। আমি আর কিশোর হতে পারতাম না।"

"কেন ?"

"বলব ?"

"বল।"

"বিশ্বাস করবি ?"

"বল তুই।"

"সেই অ্যাকসিডেন্টের সময়, গাড়িটা যখন ছিটকে যাচ্ছিল আমি কেমন করে যেন লাফ মারি। আমার তখন কোথায় কোথায় জখম হয়েছিল, আমি জানি না। পায়ে অন্তত হয়নি। ভয়ে আমি ছুটতে শুরু করেছিলাম। আর জীপটায় যখন আগুন লেগে দাউদাউ করে পুড়ছে তখন আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম। ঠিক যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। মাটি ফাটছে, সব দুলছে, ঝড়ের মতন শব্দ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কেউ আমায় তাড়া করছে। ছুটতে-ছুটতে এক জায়গায় গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। মনে হয়, পরের দিন আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। আমি আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। সেখানেই পড়ে ছিলাম। সাধুর দল আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু জীপ অ্যাকসিডেন্ট যেখানে হয়, সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, মাইলটাক হতে পারে। আমি যে জীপে ছিলাম—কেউ তা আন্দাজ করতে পারেনি। আমার নিজেরও কিছু মনে পড়েনি।"

অনন্ত বলল, "তার মানে তুই এতটা দূরে চলে গিয়েছিলি অ্যাকসিডেন্টের জায়গা থেকে যে কেউ বুঝতে পারেনি তুই জীপের একজন প্যাসেঞ্জার ছিলি।"

"তাই মনে হয়।"

আবার তিনজনেই চুপ করে গেল।

অনেকক্ষণ পরে কিশোর বলল, "নন্তু, কৃপা! আমার পক্ষে আর পুরনো কিশোর হয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়। কেউ মানবে না, বিশ্বাস করবে না। আমি আইনের কাছেও যেতে পারব না। আমার অতীত শেষ হয়ে গিয়েছে।"

কিশোর উঠে দাঁড়াল। "তোরা আমার জন্যে অনেক করেছিস। আর নয়। কিছু হবে না, ভাই। আমি যদি বেঁচে থাকি—অন্য ভাবে বাঁচব।...নে, হাত মেলা...।"

কৃপানাথ আর অনন্ত চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিশোর হাত মেলাল বন্ধুদের সঙ্গে। বলল, "চলি।"

"কোথায় ?"

"জানি না।"

"কিশোর!"

"আর আমায় কিশোর বলিস না! আমি সত্যিই কিশোর কি না জানি না। চলি...।"

কিশোর আর দাঁড়াল না, হনহন করে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

ভয় পেয়ে কৃপানাথ বলল, "কী রে, ও কি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে ?"

অনন্ত ছুটল।

কৃপানাথ পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকল।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এল অনন্ত। হাঁপাচ্ছিল। বলল, "না, খুঁজে পেলাম না। বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য!"

কৃপানাথ কোনো কথা বলল না।

ব্রজ কবিরাজ ও সেই আরামকেদারাটি

আশাপূর্ণা দেবী
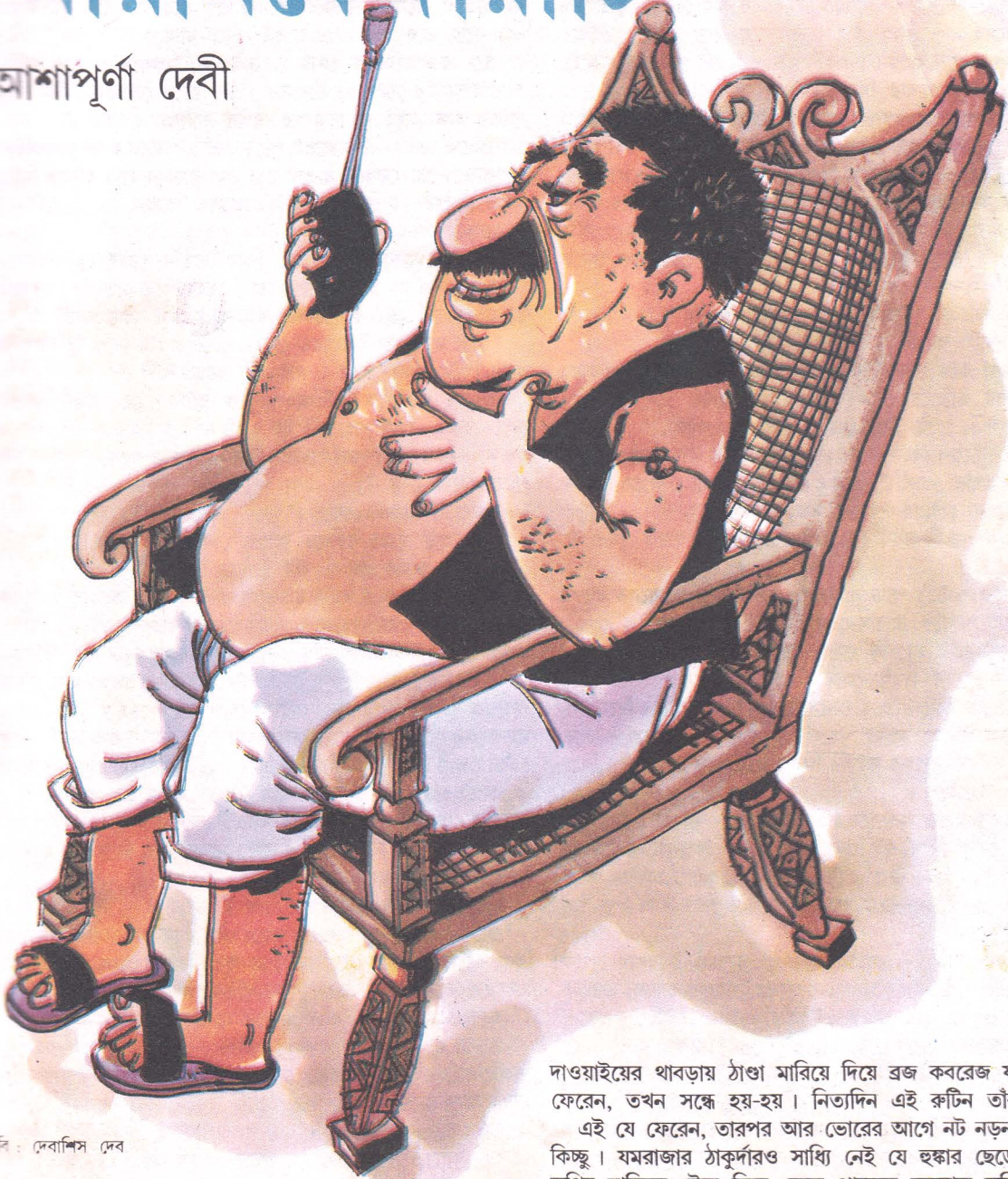
ছবি : দেবাশিস দেব

দিনমানের সকল কর্মের পাট চুকিয়ে—মানে দু-একটাকে যমের বাড়ির গলির মুখে ছেড়ে রেখে এসে, আর দু-পাঁচটাকে যমের বাড়ির গলির মুখ থেকে হিঁচড়ে টেনে এনে বড় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে, এবং দশ-বিশটার প্যানপ্যানানি ঘ্যানঘ্যানানিকে এক একখানা দাওয়াইয়ের থাবড়ায় ঠাণ্ডা মারিয়ে দিয়ে ব্রজ কবরেজ যখন বাড়ি ফেরেন, তখন সন্ধে হয়-হয়। নিত্যদিন এই রুটিন তাঁর।

এই যে ফেরেন, তারপর আর ভোরের আগে নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। যমরাজার ঠাকুর্দারও সাধ্যি নেই যে হুঙ্কার ছেড়ে, কোনো রুগির বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন ব্রজরাজ কবিরাজকে। রাতের রুগির জন্যে অভিলাষ আছে। ব্রজরাজের কমপাউণ্ড—না না, কবরেজের আবার কমপাউণ্ডার কী? ওই কথাটাতেই তো কেমন ডাক্তার-ডাক্তার গন্ধ। বরং বলা যায় খিদ্‌মদগার।

অভিলাষ গড়াই কবরেজের ডান হাত। তো রাত-বিরেতে ডাক এলে ব্রজ তাঁর ডান হাতখানাকেই পাঠিয়ে দেন। কী আর এমন অন্যায় সেটা? বয়েসটাও তো দেখতে হবে।

বাড়ি ফিরেই ব্রজরাজ উঠোনের ইঁদারা থেকে কপিকল ঘড়ঘড়িয়ে, ঘড়া তিন-চার জল তুলে হুশ হুশ করে পায়ের পাতা দুখানায় ঢেলে,

সামনের দড়িতে ঝোলানো দড়ি-পাকানো শুকনো গামছাখানা টেনে নিয়ে পা মুছতে মুছতে দাওয়ায় চলে আসেন।

সেখানেই আলনা, সেখানেই চৌকি।

বাইরের কাপড়জামা ছেড়ে ফ্রেশ ধুতি আর ফতুয়া পরে চৌকিতে এসে বসেন। বসামাত্রই কবরেজ-গিন্নি দু হাতে দুটো ইয়া পেল্লায় গেলাস নিয়ে এসে কর্তার দু হাতে ধরিয়ে দিয়ে জুত করে চৌকির ধারে বসেন। এইটা হচ্ছে তাঁর সংসারের যত জ্বালা-যন্ত্রন্নার ফিরিস্তি পেশ করবার সময়। কবরেজ অবশ্য সেসবে বিশেষ কান দেন না, দু হাতের দুটো গেলাসের মাল পালা করে চুমুক দিয়ে দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে গেলাস খালি করতে থাকেন। একটা কাঁচের একটা পাথরের। আহা, গেলাস বলে ভয় পাবার কিছু নেই।

কাঁচের গেলাসে চা, আর পাথরের গেলাসে বেলের শরবত। চুমুকের মাপ দুটোয় সমান। ব্রজ কবরেজের মতে অ-সম খাদ্য খেয়ে খেয়েই মানুষের এত সব বিষম বিপদ, সুষম খাদ্য খাওয়া দরকার। ঠাণ্ডার সঙ্গে গরম,ঝালের সঙ্গে মিষ্টি, টকের সঙ্গে নুন, এইভাবে ওজন করে খেলে, রোগের সাধ্যি আছে কাছে আসবার? কিন্তু শুনছে কে? বাড়ির লোকেই শোনে না। গিন্নি বলেন, না শোনাই তো মঙ্গল, শুনলে তো তোমার পসার ডকে উঠবে।

কবরেজ অতএব নিজেই নিজের কথা শোনেন।

গেলাস খালি করেই ডাক দেন, "পটলা।"

পটলা ফস করে কোন্ দিক থেকে একবার উঁকি মেরে গিন্নিমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই আবার কোন্‌দিকে চলে যায়।

কবরেজগিন্নি রেগে রেগে বলেন, "এক্ষুনি পটলা?"

কবরেজ গোঁফের ঝোড়ায় লেগে যাওয়া বেলের শরবতের চটচটানি পা-মোছা গামছার কোণটাই তুলে নিয়ে মুছতে মুছতে বলেন, "কেন, পটলাকে এখন তোমার কোনো দরকার আছে?"

"আমার আবার কী দরকার? আমার কোন্ কম্মে লাগে পটলা?"

"তবে?"

বলে কবরেজ উঠে পড়ে বাড়ির পিছনের দিকে বাগানের ধারের নিচু দাওয়ায় সাবেকি আরাম-কেদারাটায় গিয়ে বসেন।

আরাম-কেদারাটা সাবেকি কেন, বরং ঐতিহাসিকই বলা চলে। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় কোন্ সাহেব নাকি সেপাইদের ভয়ে সাজানো ঘরবাড়ি ফেলে রেখে মেমসাহেবকে নিয়ে পিটটান দিয়েছিল, সাহেবের খাসবেয়ারা মনের দুঃখে হাপুস-হুপুস কাঁদতে কাঁদতে সাহেবের সব জিনিসপত্তর জলের দরে বেচে দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে দেশে চলে গিয়েছিল।

তা সেই সময় ব্রজ কবরেজের ঠাকুর্দা কীভাবে কোথা থেকে যেন সাড়ে তিন সিকি দিয়ে ওই দেড় ফুট চওড়া হাতাওয়ালা দশাসই চেহারার আরাম-কেদারাখানা কিনে ফেলে গোরুরগাড়ি চাপিয়ে গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন। 'চ্যায়ারের' 'চ্যাহারা' দেখতে ভিড় জমে গিয়েছিল কবরেজ-বাড়িতে।

পালিশকরা মেহগিনি কাঠের হাত-পা বসবার জায়গায় দুপুরু বেতের ছাউনি। কী মজবুত! তিন পুরুষে ব্যবহার চলছে, এতটুকু টসকায়নি। শুধু যা, তার সর্বাঙ্গে ওই তিন পুরুষের তেলচিটের ছাপ।

ব্রজ কবরেজের ছেলে নেই, তাই চার পুরুষে ঠেকার কথা উঠবে না। থাকতে দুটো জামাই আছে, একটা পুঁইয়ে পাওয়া, একটা আরশোলায় খাওয়া। ভবিষ্যতে যদি দুজনে ওই ঐতিহাসিক সিংহাসনটির উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে দাবির লড়াই চালায়, কে জিততে পারবে বলা শক্ত। ওতে বসতে গেলে দুজনেই তো কুকুরকুণ্ডুলি হয়ে গর্তে শুঁজে যাবার মতো মাঝখানে শুঁজে যাবে। পাড়ার মধ্যে সব থেকে লম্বা ব্রজ কবরেজেরই তো পা দুটো কেদারার শেষ অবধি পৌঁছয় না। ওঠবার সময় পটলাকে ডাকতে হয় সাহায্য করতে।

তা সে যাক, ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে, ব্রজ কবরেজ এখনো বেওজরে দশ-পনেরো বছর বাঁচার আশা রাখেন। এই তো সবে আশি ছুঁয়েছে। কানের আর বুকের চুলগুলো বিলকুল সাদা হয়ে গেলেও মাথার চুল আর গোঁফের ঝোড়া এখনো নুন-মরিচ। লোকে বলে এটা কবিরাজি কলপের গুণ। দামি জিনিস, বেশি বাজে খরচ করবেন না বলে অদরকারিগুলোকে যথেচ্ছ পাকতে দিয়েছেন।

আরাম-কেদারাটিতে জুত করে বসার পর পটলা বাড়ির মধ্যে থেকে একটা জামবাটি ভর্তি মুড়ি-বাদাম, আর হুঁকোর ওপর একটি ছোট কলকে সাজিয়ে এনে হাজির করে।

দুটো জিনিস কর্তার দু হাতে ধরিয়ে দিয়ে, পটলা কর্তার চুল ধরে টানাটানি করতে শুরু করে। যেন এটি ব্রজ কবিরাজের একটি নেশা।

গুরুজনের চুলটানা নিশ্চয়ই মহাপাতক। অন্তত পটলার মতে তো বটেই। প্রথমটা পটলা হাত জোড় করেছিল; বলেছিল, "অ্যাতোখানি মহাপাতুকে অসৈজন্যির কাজ আমার দ্বারা হবে না কর্তা। এটা বরোং গিন্নিমাকে ভার দিন। তেনাকেই ভাল মানাবে।"

শুনে ব্রজ কবিরাজ হুঙ্কার ছেড়েছিলেন, "মানাবে? তোর গিন্নিমা আসবে আমার চুলে হাত ঠেকাতে? হুঁ। তাতে তো ওনার তিন দিনে হাতের গন্ধ যাবে না। মুখের ওপর বলেছে এ কথা!"

"আঁগ্যে, তা অবিশ্যি হতেই পারে কর্তা।" পটলা মাথা চুলকেছিল, "আপনি জম্মো জেবনে মাতায় তো জল ঠ্যাকান না। ইদিকে নিত্যি দিবস মাতায় বামনি শাক বাটা প্রেলেপ দিচ্ছেন।"

"বামনি শাক!"

"ওই হল আর-কি। না-হয় গিয়ে বাস্তুনি শাকই হল। চাঁদকে চন্দর বললেও যা, চাঁদ বললেও তা। তো জগতে এত সব খোশবাই তেল থাকতে, ওই বিটকেলটা মাথায় মাখেন কেন কর্তা?"

"কেন মাখি, তা বোঝাতে গেলে, তোর একটা জম্মে কুলোবে না ব্যাটা। নে, হাত লাগা। সাবানের খরচা পাবি।"

তদবধি পটলাকে এই মহাপাতুকে অসৈজন্যির কাজটা করেই চলতে হচ্ছে। কিন্তু সাহস কি হয়? হয় না। কবরেজের তাই পছন্দও হয় না। কেবলই বলেন, "জোরে টান-না। ভাত খাস না নাকি, তাই গায়ে জোর নেই।"

"আঁগ্যে, আরও জোরে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুঠো বাগিয়ে আরো জোরে।"

"কত্তা! চুলের গোছা যদি উপড়ে আসে?"

"উপড়ে আসবে? ব্যাটা হতভাগা বাঁদর। কেন, আমার চুলটা কি যাত্রা-দলের মতো পরচুল? ফাঁকিবাজের রাজা একেবারে।"

বাড়িতে টাটকা ভাজা মুড়ি-বাদাম, অভিলাষের নিজ হাতে বানানো 'গোটার' মসলা, আর গিন্নির তৈরি আমতেলের তেলমাখা মুড়ি-বাদাম কবরেজ দু-এক গালই খান, আরামে চোখ মুছে পড়েই থাকেন। মাঝে মাঝে শুধু খাড়া হয়ে বসে কলকেটায় টান দেন। এক সময় হঠাৎ চটকা ভেঙে বলেন, "যা ব্যাটা, হয়েছে। হাত ধুয়ে এটা খেয়ে নিগে।"

বলতে যা দেরি! সঙ্গে সঙ্গে চিলে ছোঁ মারার দৃশ্য!

হাত ধোওয়া বাবদ সাবানের খরচাটি আদায় করলেও পটলা ছোঁ মারা মাত্রই কর্তার মাথার হাত নিজের মাথায় মুছে নিয়ে মুড়ি-বাদামে থাবা বসাতে বসাতে চলে যায়।

কিন্তু চুল কেন টানান কবিরাজ?

সেটা একটা রহস্য। কারো কাছে ফাঁস করেন না। শুধু অভিলাষ বিনা ফাঁসেই জানে, ওই টানাটানির ফলে মাথার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত হয়ে একটা অলৌকিক শক্তির সঞ্চার ঘটায়।

আর, মাথায় কেন জল ঢালেন না 'জন্ম-জেবনে'?

ঢালেন না, মাথার ওপরকার ব্রাহ্মীশাক-বাটার প্রলেপের স্তর ধুয়ে যাবার ভয়ে। নিরীক্ষণ করে দেখলেই বোঝা যাবে স্রেফ আমসত্ত্বর মতো স্তরে-স্তরে পরতে-পরতে তার বিন্যাস।

তা তো বোঝা গেল। কিন্তু ব্রাহ্মীশাকটাই বা মাথায় মাখেন কেন?...আহা, সেটা পটলা না বুঝতে পারুক আর যে-কেউ ঠিকই বুঝতে পারবে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলেছে—ব্রাহ্মীশাকের মধ্যে উনপঞ্চাশ রকম গুণ বর্তমান, এবং সেই গুণগুলি একে একে উনপঞ্চাশটি বায়ুকে 'সমে' রাখতে সক্ষম। ব্রজ কবিরাজের তো ওই 'সম'টা নিয়েই কাজ-কারবার। তাছাড়া ওই শাকটার ডালে পাতায় হাড়ে শিরে মগজ বৃদ্ধির উপাদান ঠাসা নেই? স্মৃতিশক্তির জোরদার মসলা?

তবে? এসব অমনি ফাঁস করলেই হল?

গ্রামে মাঠে ঘাটে যত্রতত্র ওই বহুগুণা জিনিসটি গজায় না? গ্রামসুদ্ধ সব্বাই মগুজে হয়ে যাক আর কি! আর স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দোহাত্তা নামতা মুখস্থ করতে শিখুক! হুঁঃ, ওটি হচ্ছে না!

পটলা চলে গেলে ব্রজরাজ হুঁকো থেকে কলকেটাকে নামিয়ে নিয়ে সেটাকে দু'হাতে চেপে ধরে প্রাণপণে টান দিতে থাকেন গলার শির ফুলিয়ে, চোখের মণিকে গুলি পাকিয়ে, একেবারে মোক্ষম।

গোটাকতক এ-রকম মোক্ষমের পরই ব্রজর মাথার চারধারে আস্তে আস্তে একটা নীলচে বেগুনে আভা মিশোনো হলদেটে আলোর বলয় ফুটে ওঠে। যেমনটি দেখা যায় ঠাকুর-দেবতার বা মহাপুরুষ-টুরুষদের ছবিতে।

চোখ বুজে থাকলেও কবিরাজ এই আলোর আবির্ভাব অনুভব করেন, আর তখন মনের মধ্যে বেশ একখানা তূরীয় তূরীয় আহ্লাদ জেগে ওঠে। ব্রজ কবিরাজ যেন তখন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে দ্বাপরের সেই ব্রজভূমিতে পৌঁছে যান, কানে আসে মুরলীধ্বনি।

এই যে এমনটি হয়, এটি কিন্তু পটলার হাতের গুণ! কলকে সাজাবার সময় পটলা সিদ্ধির সঙ্গে ধুতরো আর ওই দুটোর সঙ্গে একটু চরস মিশিয়ে এমন একখানা জম্পেস জিনিস বানায়। কবরেজখানায় ওই জিনিসগুলোর তো অভাব নেই। অভিলাষের কাছে অভিলাষটা জানালেই হল। কর্তার জন্যে বলে কথা। অবিশ্যি পটলাও মাঝে মধ্যে—কিন্তু সে যাক।

ক'দিন আগে একদিন পটলার পেট ব্যথা করেছিল। ওর ছোটভাই উচ্ছে ওষুধ নিতে এসে কলকেটা সেজে দিয়ে গিয়েছিল। তা সেদিন আর মৌজই এল না। অথচ দাদার শিক্ষামতো দিয়েছিল সবই। হলে কী হবে, আসল কথা হাতের গুণ।

এই যে কবরেজি ওষুধপত্তর, সব কবরেজই দিয়ে থাকেন, সেই মকরধ্বজ, সাদা চটি, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, মৃত সঞ্জীবনী সুধা, অনন্তমূল, বাসক, গজদন্তভস্ম ইত্যাদি করে কম-সে-কম হাজার রকম। জানে তো সবাই, কিন্তু ব্রজরাজের ওষুধই কেন ডেকে কথা কয়? আর সকলের কেন—সে কথা থাক, পসার দেখেই মালুম। তিন গাঁয়ের লোক এসে ধর্না দেয়। ওই হাতের গুণ!

ব্রজ জানেন ওই আলোটির কী গুণ। মৌজের সময় স্বয়ং ধন্বন্তরি এসে দাঁড়ান, অশ্বিনীকুমাররা ঘুরঘুর করেন।

কিন্তু মৌজ করে দু'দণ্ড পড়ে থাকবার জো আছে?

যেই অনুভবে আসবে মাথার ধারে-পাশে জ্যোতি ফুটে উঠছে, এই আশি বছুরে শরীরটাতেও বেশ একটা পাখি-পাখি ভাব জাগছে—হয়তো ঠিক তেমনি সময়টিতেই বাগানের অন্ধকারের কোনখান থেকে যেন অন্ধকারে ঘষটে যাওয়া ছায়ার মতো নিঃশব্দে এসে চেয়ারের গা ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে বসে যাবে হারান বিশ্বাস।

হারান ব্রজ কবরেজের প্রাক্তন রুগি। সেই সুবাদে হারানের এই উৎপাতটি সইতে হয় কবরেজকে।

প্রথমটা অবশ্য কবরেজ গা করেন না, (আদর-আপ্যায়নের তো প্রশ্নই নেই) যেন টের পাননি এইভাবে মাঝে মাঝে নাক দিয়ে ফুড়ুত ফুড়ুত ধোঁয়া ছাড়েন। মোক্ষম-মোক্ষম টান দিয়ে দিয়ে মাথার খোলটা তো ধোঁয়া ভর্তি করে নিয়েছেন, এটি তারই ভগ্নাংশ।

কিন্তু হারান কি আর এই অবহেলায় রাগ অভিমান করে উঠে যাবে? হুঃ। সে ছেলেই নয় হারান। সে-রকম হলে কি আর সেই কোন্ জন্মের সম্পর্কের জের ধরে এখনো লেগে পড়ে থাকে?

হারানের অসুখটাকে অবিশ্যি কায়দা করে উঠতে পারেননি কবরেজ। অভিলাষ যে পুরিয়া বানাবার সময় ভুল করে হরিণাস্থিচূর্ণর বদলে মহিষাস্থিচূর্ণ দিয়ে বসেছিল, তা তো আর জানতেন না তিনি। তাতেই না গুবলেট হয়ে গেছল। সে খোঁটা সুবিধে পেলে এখনো দিতে ছাড়ে না হারান।

তো সেই লজ্জাতেই কবরেজ হারান বিশ্বাসকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে বসেছিলেন, তদবধি হারান এই সুযোগটি নিয়ে চলেছে। মৌজের সময়টিতেই এসে চেয়ার লেপটে বসে পড়ে নিজের সাতজন্মের সুখ-দুঃখের ফিরিস্তি শোনানো, আর যখন-তখন এক-একজনকে এনে হাজির করে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শোনানো। সুখ আর ছাই, সকলেরই দুঃখের গাথা।

কিপটে করালীর ছেলেরা যে বাপের চাবি হাতিয়ে, বাপের গায়ের রক্তুল্য টাকা-পয়সাগুলো জলের মতো খরচা করে বাবুয়ানি করছে সেই ঘ্যানঘ্যানানি শোনাতে একদিন করালীকে এনে হাজির করেছে হারান। করালী বুক চাপড়ে চাপড়ে নালিশ করেছে, "সহ্য হয় না কবরেজমশাই, সহ্য হয় না। ব্যাটাদের এখন রোজ পাতের আগায় মাছের মুড়ো, নিত্যি হাঁস-মুরগি-পাঁঠা। ... নাতিবাবুদের লুচি রাজভোগ মর্তমান কলা টিফিন। আর বৌমাদের তো—যাক—টাকাগুলো নয়-ছয় করছে কবরেজমশাই, নয়-ছয় করছে। আপনি বলে দেবেন ওসব চলবে না।

কবরেজ রেগে বলেছিলেন, "তো ওদের বাপের টাকা, ওরা খরচা করছে। আমি বলবার কে? আমার কথা কানে নেবে কেন?"

"নেবে, নেবে।" কিপটে করালী মিচকে হেসে বলেছিল, "আপনি যদি ভয় দেখান ওদের রোগব্যামোয় চিকিচ্ছে করবেন না তা হলে কানে নিতে পথ পাবে না।"

শুনে কবরেজ রেগে কাঁই। "এ তো তোমার ভারী অন্যায় কথা করালী। আমি অমন কথা বলতেই, বা যাব কেন?"

করালীও তখন খাপ্পা। "তবে কি বলতে চান, আমার ওই না খেয়ে না পরে জমানো টাকাগুলো ওরা ওইভাবে পায়রা-ওড়ানো করে উড়িয়ে দেবে? এক পয়সার জলখাবার খাইনি কখনো কবরেজমশাই, মাথায় তেল মাখিনি, গায়ে সাবান দিইনি। তালিমারা জুতো পরে জীবন কাটিয়েছি—"

"বড় মহৎ কর্ম করেছ—"

কবরেজ আরো রেগেছেন। "বলি শুধু কি নিজেই? বৌ ছেলে নাতি পুতিকেও তো আমসি করে করে প্রতিপালন করেছ, তারা এখন শোধ তুলছে। বেশ করছে।"

শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিল করালী। "এমন নিষ্ঠুরের মতন কথা বলবেন না কবরেজমশাই। এক-একটা পয়সা আমার এক-এক ফোঁটা রক্ত। অপচয় দেখতে দেখতে বুক ফেটে যাচ্ছে আমার। মরে যেতে ইচ্ছে করছে।"

এ কথায় কবরেজ হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন, "বুক ফেটে যাচ্ছে? হা হা হা! ... মরতে ইচ্ছে হচ্ছে? হা হা হা! হাসালে বটে করালী। ... বিয়ে বার বার হতে পারে, কিন্তু জন্ম মৃত্যু কিছুতেই একবার বৈ দুবার হয় না বাপু। ... হা হা হা! তো ও-টাকা এখন থাকলেই বা কী গেলেই বা কী? তুমি তো আর খাবেও না, পরবেও না—"

কিন্তু করালী তো কখনো খেতে পরতে চায়নি, চেয়েছিল টাকাগুলো তুলে রাখতে। ... "হঠাৎ একটা বেগড়বাঁই হয়ে গিয়ে চাবিটা ছেলে বেটাদের হাতে চলে গিয়ে এই বিপত্তি। তো বিহিত একটা করতেই হবে।"

"আমি কী বিহিত করব বাপু?"

"কিছু না হোক আপনি জম্পেস করে খানিকটা কড়া জোলাপ বানিয়ে দিন আমায়। অলক্ষ্যে গিয়ে ব্যাটা-বেটিদের খাবার জলের কলসিতে গুলে দিয়ে আসি। তবু দু-পাঁচদিন খাওয়ার বাড়াবাড়ি কমবে।"

জোলাপের জন্যে নাছোড়বান্দা, শেষ অবধি নিয়ে ছাড়ল।

আর সেই দায়ে কবরেজকে ছুটতে হল করালীর বাড়ি, তার ছেলেপুলে নাতি-নাতনি সক্কলের একযোগে কলেরা হয়েছে বলে। ...

মনে থাকবার মতো আর একবার ঝামেলা এনে হাজির করেছিল হারান।

ঝামেলা মুখুজ্যেবাড়ির সেজগিন্নি।

তাঁর চিরকালের সঙ্গী বোনার কাঁটা দুটো ফেলে এসে বুক ফেটে যাচ্ছে তাঁর। কাঁটা দুটো যেন বুকে এসেই বিঁধছে।

তাঁর হাত দুটো নাকি সর্বদা নিশপিশ করছে, আঙুলগুলো মটমট করছে, আর চোখের সামনে অবিরত পশমের গোলা গড়াচ্ছে।

"চেরটাকাল সব্বাইকে বলে এসেছি কবরেজ ঠাকুরজামাই, হুঁশ করে ওই কাঁটা দুটো আমার সঙ্গে দিস বাপু তোরা—তবু দিল না! ভাবুন আপনজনের ব্যাভার। ওদের জন্যে আমি প্রাণপাত করেছি। ... ভুল নয়, নির্ঘাত ওই ছোট নাতবৌটা গেঁটিয়েছে।"

"কী যে বলেন সেজঠাকরুন। সামান্য দুটো বোনার কাঁটা—"

"তাতে কী! ওর ধারণা ছেল, কাঁটা দুটো মন্তর পড়া। নচেৎ অমন ঝড়ের বেগে বুনন হয়? তোর যে আঙুল নড়ে না। তার কী?

... হেই কবরেজ ঠাকুরজামাই, আমার অবস্থা বুঝিয়ে কাঁটা দুটো আমায় দিয়ে দিতে বলুন।"

"যাঃ! কী করে?"

"তবে শুনুন, সামনের শনিবারের সন্ধেয় যেন একটা কলাগাছের গায়ে এক ঠোকায় পুঁতে রাখে। রাখলেই আমি পেয়ে যাব। আর যদি—অমান্যি করে দেখে নেব তা বলে রাখছি।"

ব্রজ তাচ্ছিল্যের গলায় বলেছিলেন, "শুধু কাঁটা হলেই হবে? উল কোথায়? সুতো কোথায়?"

সেজঠাকরুনের ফ্যাঁসফেসে গলা খ্যাঁকখেঁকিয়ে উঠল, "সে কথা আমি বুজব। গাছে পালায় লঁতায় পাতায় সুতোর আবার অভাব? মানুষের নিজস্ব বলতে কিছু আছে? সবই তো এই প্রকিতির কাছ থেকে আর যাবতীয় জীবজন্তু কীট পতঙ্গ থেকেই নেওয়া।"

"তাহলে বলি সেজ-বৌঠাকরুন, আপনার ওই বনে-বাদাড়ে কাঁটারই বা অভাব কী? শজারুর পিঠ থেকেও তো দুটো খুলে নিতে পারেন।"

শুনে সেজঠাকরুনের সে কী ফ্যাঁচফেঁচিয়ে কান্না। ... কাঁদতে কাঁদতে ফ্যাঁত ফ্যাঁত করে নাক ঝাড়া। ... "আমার আসল ইস্টিলের কাঁটাদের বদলে শজারুর কাঁটায় কাজ চালাব আমি? ...আপনার কবরেজখানায় অভিনব স্বর্ণভস্মর বদলে তাম্রভস্ম, বিশল্যকরণীর বদলে, বিছুটির পাতায় কাজ চালায় বলে আমিও—"

ব্যাস, আবার বাগানের ফুলগাছের ওপর, সেই ফ্যাত ফ্যাঁ নাক ঝাড়া। চিরকেলে অভ্যেস।

সাধে কি আর শাস্তরে বলেছে—স্বভাব যায় না মলে।

নিজের পয়সায় একজোড়া আসল স্টিলের উল বোনার কাঁটা কিনে শনিবারের সন্ধেয় ভোম্বলদের বাগানের একটা কলাগাছের গায়ে পুঁতে রেখে এসে সে-যাত্রা সেজঠাকরুনের হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছিলেন ব্রজরাজ। কিন্তু— ?

কিন্তু পেলে কী হবে? আর কেউ নেই? কুমির-খাওয়া বৈকুণ্ঠ সা নেই, গলায়-দড়ে কেষ্ট পাল? রেলে-কাটা ভব ঘোষ? এবং আরো অনেকে? ... আর তাদের সঙ্গে নেই মায়ায় গলে পড়া হারান বিশ্বাস?

অনবরত এক-একটা করে এনে হাজির করে চলেছে হারান।

"কী করব কবরেজমশাই, আমি আপনার কাছে ইচ্ছেমতন আসি যাই বলে, হিংসেয় বুক ফেটে যায় সব। আবার আমার ঠ্যাং ধরে ঝুলে পড়তেও ছাড়ে না। কী আকুলতা—আপনার কাছে একটিবার নিয়ে আসার জন্যে। মনপ্রাণের দুটো কথা বলে যাবার জন্যে। হুটক্কারি এদিকে চলে আসতে হয়েছে। কাউকে কিছু বলে কয়ে আসতে পারেনি। প্রাণের মধ্যে হুতোশের চাষ!"

কবরেজ কড়া করে বলেন, "তা আমি কি চোরদায়ে ধরা পড়েছি বাপু। যে যত উনচুটেদের আমার কাছেই মনপ্রাণের কথা কইতে আসতে ইচ্ছে হয়।"

"উরেব্বাস! কী বলেন কত্তা?"

হারানের যদি জিভ থাকত তো নির্ঘাত ক্যাঁচ করে তাতে দাঁত বসাত, কিন্তু জিভ তো নেই, শুধু ওই লম্বা লম্বা দাঁতই আছে। তাই হারান জিভকাটা স্বরে বলে ওঠে, "এ-তল্লাটে আর কার ক্ষ্যামতা আছে আমাদের ওদিককার বাসিন্দেদের কথা বুঝতে? ... আচমকা হুটক্কারি যাদেরকে এধার থেকে ওধারে চলে যেতে হল, তাদের প্রাণের মধ্যে কত কথার আকুলি-বিকুলি ভাবুন? কাকে বলবে? আর কার মাথা থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে?"

তবে আর কী করা!

মাথা থেকে জ্যোতি বেরোনোর অপরাধে ব্রজ কবরেজকে ঠিক সেই মৌজের সময়টুকুতেই যত রাজ্যের হতভাগাদের ঘ্যানঘ্যানানি প্যানপ্যানানি শুনতে হবে।

মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেই খারাপের বশে, হারান এসে বসলেও প্রথমটা না বোঝার ভান করে চোখ বুজে পড়েই থাকেন। অবশ্য হারানকে দেখতে হলে যে চোখ খুলতেই হবে তার কোনো মানে নেই। ওকে বা ওদের তো গায়ের লোমকূপ দিয়েই দেখে ফেলা যায়।

তা যাক, অবহেলায় দমবে এমন পাত্র হারান বিশ্বাস নয়। কোনোকালেই তা ছিল না।

কাজেই একটু অপেক্ষা করেই হারান আরো একটু ঘেঁষে এসে বলে ওঠে, "আমার সেই কেসটার কী হল কত্তা?"

"ও! হারানচন্দোর এসে গেছেন। তাই ভাবছি ফস্ করে একটা হিমেল হাওয়া বইল মনে হল। তা কেস কি তোর একটা হারান? কোন্‌টার কথা বলছিস?"

"আঁগ্যে, 'কারোন্টো' তো ওই একটাই কত্তা! রিচার্ট্ সায়েবের। সেদিনকে বললাম—"

শুনে চেয়ারে ডুবে যাওয়া শরীরটাকে টেনে তুলে সোজা হয়ে বলে ওঠেন ব্রজ, "তো আমিও তো সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছি হারান, ওসব সাহেব-টাহেব নিয়ে কারবার আমার দ্বারা হবে না।"

"বড্ড নাছোড় কবরেজমশাই, সর্বক্ষণ গায়ে আঠার মতো সেঁটে থাকতে চেষ্টা। বলে যে একটা ভীষণ দরকারি কথা বলবার আছে তার—"

"হুঁ! কত ঘুষ দিয়েছে?"

"হায় কপাল কত্তা! এখন আর ঘুষ! সময়কালে হলে—"

"তো সাহেবের সঙ্গে এত দহরম-মহরম হল কী করে রে? ইংরিজি

শিখলি কবে ?”

হারান একটু হেসে ওঠে।

অন্ধকারেও বোঝা যায়। কারণ হারানের দাঁত আছে, আর সেটা অন্ধকারে ঝলসে ওঠে।

"আমার ইংরিজি শিখতে দরকার লাগেনি কত্তা ! সায়েব দিব্যি বাংলা বলে।”

"হুঁ। তা আমার সঙ্গে দরকারটা কী ?”

"সেটা তো আঁগ্যে তিনি নিজেই বলবে। শুধু আপনি একবার অনুমতি করলেই—”

"ঝামেলা ! তা অনুমতি করলাম, আনিস কাল।”

হারানের মাড়িহীন দাঁতের পাটি আর একবার ঝলসে ওঠে, “কাল কী কত্তা, এই তো তিনি আমার ধারেকাছেই ঘুরঘুর করছেন। এই যে সায়েব আসেন !”

সঙ্গে সঙ্গে ভিজে ঢোলের বাদ্যির মতো একটা ঢ্যাবঢেবে শব্দ, "নোমোস্কার মিস্টার কোপিরাজ। আমি রিচার্ড জনসন বলছি !”

কোপিরাজ ! রাগে ব্রাহ্মীশাকবাটা-মাখা ব্রহ্মতালুও জ্বলে ওঠে। গম্ভীরভাবে উত্তর দেন কবিরাজ, “নমস্কার মিস্টার রিচার্ড ! আমার নাম ব্রজরাজ কবিরাজ !”

"ও ইয়েস ! ভ্রোজোরাজ ! ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা কহিতে চাই।”

ও বাবা, এ যে বঙ্কিমচন্দ্রের আমলের সাহেবের বাংলা বুলি 'তুমি' বলছে। মরুকগে। ওদের তো তুমি-আপনি নেই।

ব্রজ কবিরাজ গম্ভীরভাবে বলেন, “বলো।”

"কিছু বেশি গোপন আছে। আর কেহ শুনিবে না তো ?”

"হারান বিশ্বাস ছাড়া আর কেউ নয়।”

"বিশ্বাস থাকিবে। ও বিশ্বাসভাজন আছে। আমি বলিতে চাই, এই যে আর্মচেয়ারটা, যেটাতে তুমি বসিয়া আছ, ওটা আমার চাই ভোজরাজ।”

“কী ? হোয়াট ?” কবরেজ ঠিকরে ওঠেন, আর মাথার প্রলেপের শুকনো স্তর পাটে পাটে খুলে দু' ইঞ্চি উঁচু হয়ে ওঠে। “তোমার চাই ? মানে ?”

“মানে ওটা আমার সম্-সমপো, মানে আমার জিনিস !”

“মিস্টার রিচার্ড, আমার মনে হচ্ছে তুমি ঠিক প্রকৃতিস্থ নও।”

“কী বলিতেছেন মিস্টার কপিরাজ !”

“বলিতেছি তুমি একটি পাগল। বদ্ধ পাগল। এই চেয়ার আমার তিন জেনারেশান কালের সম্পত্তি। বুঝিলে ? আমার গ্র্যান্ড ফাদার এটি নগদ মূল্য দিয়া খরিদ করিয়াছিলেন। তদবধি এটি এখানেই আছে, এবং থাকিবে।”

সাহেবের সুবিধার্থেই হোক, বা রাগের চোটেই হোক কবিরাজও সাধুভাষাতেই কথা বলেন।

ঢ্যাবঢেবে স্বর আরো ভিজে-ভিজে লাগে, “জানি মিস্টার ভোজ কপিরাজ। তোমার গ্র্যান্ডফাদার মিস্টার খাশীরাজকে আমি চিনিতাম—”

"কী ? আমার গ্র্যাণ্ডফাদারের নাম কী বলিলে ?"

"খাঃ —খাশীরাজ—"

"নেভার। তাঁহার নাম ছিল কাশীরাজ !"

"উহাই বলিতেছি মিস্টার। খাশীর অর্থ বেনারস ! বেনারসে আমি দীর্ঘদিন থাকিয়াছি। থাউক সে কথা ! তোমার গ্র্যাণ্ডফাদারকে আমি চিনিতাম। ...আমার বেয়ারা শিবলাল—এই চেয়ারটি—"

"মিস্টার রিচার্ড, এ চেয়ার আমার গ্র্যাণ্ডফাদার খরিদ করিয়াছিলেন, এখন এটি আমার সম্পত্তি। এ বিষয়ে আর কোনো কথা কহিতে ইচ্ছা করি না। এখন তুমি চলিয়া যাইতে পারো।"

কিন্তু ব্রজরাজ ইচ্ছা না করলে কী হবে, রিচার্ডসাহেব যে এখন কথাই কইতে চান। চলে যাওয়ার ইচ্ছাই বিন্দুমাত্র নেই। অতএব তিনি কাতর বচনে বলেন, "দ্যাখহ কপিরাজ, তোমাকে এই আর্মচেয়ারের হিস্ট্রি বলিতেছি। ইহা আমার পিতা নিজে ডিজাইন করিয়া বানাইয়া লইয়াছিলেন, ইহার ওই হাতা দুইটির মধ্যে একটি করিয়া চেম্বার আছে—"

"অ্যাঁ ! তাই নাকি ? কই আমি তো কদাচ দেখি নাই। আমার ফাদারও না, গ্র্যাণ্ডফাদারও না।"

"সে অতি স্পেশাল মিস্ত্রি দ্বারা গঠিত মিস্টার ভোজ, দেখিতে পাওয়া কঠিন।তাহার মধ্যে—ওঃ ! না না, কী বলিতেছি। বলিতেছি যে—"

একবার থেমে যায়, তারপর সে কেঁদে ককিয়ে কাঁকর মেশানো খিচুড়ি ভাষায় যা বলে, তার সারমর্ম এই। সেই 'কাল' 'মিউটিনি'র সময় রিচার্ডকে তার অন্যান্য স্বজাতিদের সঙ্গে মাত্র দু ঘণ্টার নোটিসে জাহাজে চেপে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়েছিল খিদিরপুরের সাজানো বাসা ফেলে রেখে। আর কোনোদিন ভারতবর্ষে ফেরা হয় না।...

সে আজ কতদিনের কথা।

রিচার্ডের ভিজে ঢোলের বাদ্যির মতো গলার স্বরটা হঠাৎ একটু টান-টান হয়। "কিন্তু সেই বাসা, সেই বেয়ারার দল, পাঙ্খাপুলার, এখনো পর্যন্ত ভুলিতে পারি না। আর এই আমাদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশানযুক্ত আর্মচেয়ারটি। ইহার জন্য আমি ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছি, কপিরাজ, ইহা আমি আমার পুত্রের গ্র্যাণ্ডসানকে দিতে চাই। সেই বালকই এখন ইহার ঠিক মালিক।"

কবিরাজ হঠাৎ হা-হা করে হেসে ওঠেন, "চাই বলিলেই কি সব হইল সাহেব ? এখন ইহার ঠিক মালিক আমি। আমি দিব কেন ? বলিলাম তো তুমি এখন যাইতে পারো।"

"নো ! নেভার !"

হঠাৎ সেই ভিজে গলা কংক্রিটের চাঁইয়ের মতো হয়ে ওঠে। তারপর ফেটে পড়ে। "বহু অনুসন্ধানের ফলে এতদিনে ইহাকে পাইয়াছি, আর ছাড়িবার কথা উঠিতে পারে না ভোজরাজ !"

"কিন্তু সাহেব, আমার ঠাকুর্দার ক্রয় করা জিনিস, আমরা তিন জেনারেশন যাবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। আমারও তো ছাড়িবার কথা ওঠে না।" কবিরাজের গলার স্বরে বেশ একটা আমোদ-আমোদ ভাব।

কিন্তু রিচার্ড জনসনের কণ্ঠে আমোদ নেই, সাহেবের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ, "ছাড়িবার কথা ওঠে না ?"

"নিশ্চয়ই নয়। জিনিস বিক্রি হইয়া গেলে যে আর সেটা নিজের থাকে না, এটা বোধহয় তোমার জানা থাকা উচিত ছিল।... যাক, এখন তুমি যাইতে পারো।"

কিন্তু রিচার্ড জনসন কিপটে করালী বা সেজঠাকরুন নয় যে, বেগতিক দেখলে ফ্যাঁচফেঁচিয়ে কাঁদতে বসবে। সে তেমনি রাগ-রাগ গলায় বলে ওঠে, "যাইবার জন্য আসি নাই কপিরাজ ভোজো। এই চেয়ার আমি লইয়া যাইবই। যেদিন হইতে ইহার খবর জানিয়াছি, আমি এই মতলবে স্থির হইয়াছি। যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তোমাকে না বলিয়া ইহা উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম, কিন্তু সেটা হইত 'চোরি'। রিচার্ড চোর নহে। যদি উপায় থাকিত ইহার বিনিময়ে তোমাকে অনেক অর্থ দিতাম। কিন্তু এখন আর সে উপায় নাই। তবে আমি মনে করি না যে ইহাতে আমার দোষ হইবে। ইহা আমার প্রাপ্য। এবং আমার নাতি লোকেদের প্রাপ্য। ইহার জন্য আমি এতোকাল—"

কবিরাজ বলে ওঠেন, "এতোকাল শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। কিন্তু কেন বল তো সাহেব ? তুমি তো আরো বিস্তর জিনিস ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তবে ? তবে কেবলমাত্র এই একটি চেয়ারের জন্য একশত পঁচিশ বৎসর যাবৎ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ ? ইহার অর্থ কী ? রহস্যটা কী ? শুনিতে খুব উৎসুক হইতেছি।"

"ও হো হো। নো নো ! কী রহস্য বলা যাইবে না। বলিলে আর পাইবার আশা থাকিবে না।"

"আশ্চর্য ! কেন বল তো ?"

"বলিলাম তো বলা যাইবে না। তবে তোমার ব্যবহার দেখিয়া দুঃখ পাইতেছি মহাশয়। পূর্বে বেঙ্গলি লোকেরা কত ভদ্র ছিল। সাহেব লোক কিছু চাহিলে, নিজকে ধন্য মনে করিত। না চাহিলেও কোনো দ্রব্যের প্রশংসা করিলেও, তৎক্ষণাৎ প্যাক করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে তুলিয়া দিত। আর এখন ? খিদিরপুরে থাকিতে সাম ব্যানারজির নিকট একদিন ইহা প্রকাশ করিয়া ছিলাম 'বেঙ্গলি' শিখিব। ব্যস, ব্যানার্জিবাবু ডেইলি নিজে ঠিকাগাড়ি ভাড়া করিয়া আমার নিকট আসিয়া আমায় বেঙ্গলি শিখাইয়াছিলেন। মাহিয়ানা লওয়ার কথা হাসিয়া উড়াইয়াছে। কিন্তু এখন ? এখন তুমি আমারই একটি দ্রব্য লইয়া আমার সহিত বচসা করিতেছ। শেম !"

ব্রজরাজ হেসে ফেলে বলেন, "তা তুমি যতই 'শেম' বল আমি ভদ্রতা করিয়া চেয়ারটি তোমায় অফার করিব না।"

"আমি লইবই।"

"বটে নাকি ? কীরূপে লইবে শুনিতে পাই না ?"

"কেন ? উড়াইয়া লইয়া যাইব।"

"উড়াইয়া ?"

"হাঁ। অবশ্যই। তুমি ভারতবর্ষের লোক, কখনো শুন নাই ভূতলোকেরা ইচ্ছা করিলে সব কিছু উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে ?"

"কবিরাজ আবার জোরে হেসে ওঠেন, "শুনিয়াছি বটে, তবে কখনো দেখি নাই।"

"ওঃ ! আচ্ছা ! এখনি দেখাইতেছি।"

ব্রজ কবিরাজের কাঁধের ওপর হঠাৎ এক থাবা আইসক্রিম ! ...না মানে আসলে ঠিক আইসক্রিম নয়। এক থাবা আইসক্রিমের মতো একটি ঠাণ্ডা কনকনে হাতের থাবার স্পর্শ ! কাঁধটা শিউরে ওঠে। ...আর ঠিক সেই মুহূর্তে, হ্যাঁ একেবারে সেই মহামুহূর্তে কবরেজগিন্নির খ্যানখ্যানে ধারালো গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। "পটলা ! দ্যাখ তো তোদের কর্তার চৈতন্য ফিরল কিনা। বল্ গে যা, খেতে দেওয়া হয়েছে।"

আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই হারান বিশ্বাসের প্রবল আকর্ষণে কবরেজের কাঁধ থেকে আইসক্রিমের থাবা পিছলে নেমে গেল। শোনা গেল হারানের খ্যাঁসখেঁসে ফিসফিসে স্বর—"পালিয়ে এসো সায়েব, পালিয়ে এসো, এক্ষুনি আলো জ্বেলে বসবে।"

নিমিষে ছায়ামূর্তিরা ছায়ায় মিলিয়ে গেল।

পটলা এসে দাঁড়াল একটা জ্বলন্ত হ্যাজাক হাতে। চোখধাঁধানো আলোটা মনিবের মুখের সামনে তুলে ধরে বলল, "চলুন। গিন্নিমার তলব পড়েছে। তো অন্ধকারে কার সাথে এত হাসাহাসি করছিলেন কর্তা ?"

আলোটা মাটিতে বসিয়ে আরাম-চেয়ার থেকে উঠতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ধরে প্রশ্নটা করে পটলা।

ব্রজ কবিরাজ উঠে দাঁড়িয়ে গোঁফের আগায় একটা পাক দিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, "ভূতের সঙ্গে।"

"তা যা দেখছি, ভূতের সঙ্গেই।"

কবরেজগিন্নি কর্তার ঘন দুধের বড় বাটিটির মধ্যে দুটো হৃষ্টপুষ্ট মর্তমান কলা ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে বেজার গলায় বলে উঠলেন, "তোমার ওই ভূত নামানো এবার বন্ধ করবে ?"

"কেন ? বন্ধ করতে যাব কেন ?" হ্যাজাকের আলোয় মাছের মুড়োর কাঁটা ভাঙতে ভাঙতে কবরেজ বলেন, "তোমার কিছু ক্ষতি হচ্ছে ?"

"হচ্ছে না, হতে কতক্ষণ ? ভূতের কাজ-কারবারটাই তো হচ্ছে, ভাল করতে পারি না মন্দ করতে পারি । না না,আমার মন ভাল নিচ্ছে না । অভিলাষ বলছিল, ক'দিন থেকে নাকি একটা লক্ষ্মীছাড়া চেহারার সাহেব ভরদুপুরে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষ দেখলেই চট করে সরে গিয়ে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যায় । ...বলল কোন জন্মের সাতকেলে পুরনো কোট পেন্টুল পরা, দেখলে মনে হবে যেন কবর থেকে উঠে এসেছে । বলল ও রকম একটা সাহেবকে এ দিগরে কেউ কোনোদিন দেখেনি ।"

"বলেছে ? তা অভিলাষচন্দ্র আমায় না বলে তোমায় বলতে এলেন কেন ? পটলা, ডাক তো অভিলাষকে ।"

পটলা মাথা চুলকে বলে, "আগ্যে এখন কি আর ডাকলে পাওয়া যাবে ? আপনার দরুন কলকেটা থেকে কিছু মসলা বেঁচেছিল, সেটা হাতিয়ে নিয়ে—"

"ও হো হো !" জোরে জোরে হাসতে থাকেন কবরেজ, "তাই ব্যাটা ভরদুপুরে ভূত দেখছে । ...বারণ করে দিস পটলা, সহ্য হবে না, শেষে মাথা বিগড়ে যাবে । ...'সম'র নিয়ম তো মানবে না । কলকে হাতাতে পারলেই টান দেবে । বলি তার সঙ্গে এক সের দুধের ক্ষীর, পাকা মর্তমান কলা, ডাব, মিছরি-ভিজে, বেলের শরবত, পাতিলেবুর রস, পারবে খেতে ? হুঁ ! উজবুক !" মর্তমান কলা সমেত এক সেরি ঘন দুধের বাটিটা একটু ঠেলে দিয়ে বলেন, "পটলা, এটা দিয়ে আয় উজবুকটাকে ।"

পটলা ভয়ে ভয়ে বলে, "সবটা ?"

"তা সবটা নয়তো কি ব্রজ কবরেজ অভিলাষ গড়াইয়ের সঙ্গে হাফাহাফি শেয়ার করবে ? ব্যাটা এক নম্বরের বুদ্ধু ।" হেসে ছাদ ফাটান ।

তা ফাটান—

কিন্তু রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসে না । প্রধান চিন্তা কখন সকাল হবে । কখন সকালের আলোয় নিরীক্ষণ করে দেখবেন, স্পেশাল করে বানানো ওই চেয়ারটায় কোথাও কোনো কলকৌশল আছে কি না, যা এই তিনপুরুষ ধরেও তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে ।...

কিছু একটা রহস্য আছেই । না থাকলে ওই লক্ষ্মীছাড়া চেহারার সাহেবটা কবর থেকে উঠে এসে সওয়াশো বছর ধরে ওটার জন্যে ঘুরে মরছে কেন ?

ভোর হতে না-হতেই কবিরাজ চলে গেলেন বাড়ির পিছন বাগানের ধারে । ··জিনিসটাকে তো নড়ানো সম্ভব নয়, তাই আশপাশ থেকে দেখে দেখে অবশেষে মাটিতে শুয়ে পড়ে তার তলায় দৃষ্টিপাত করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়ল, ওই লম্বা চওড়া দু' ইঞ্চি উঁচু হাতা দুটোর তলার দিকের কাঠে ছোট ছোট দুটি স্ক্রু ঈষৎ উঁচু-উঁচু ।

নিশ্চয়, নিশ্চয় ! এইখানেই কোনো রহস্য বিদ্যমান । শুয়ে শুয়েই লোহার মতো শক্ত বুড়ো আঙুলটা দিয়ে প্রাণপণ একটা টিপ্ দিলেন, কিছুই হল না ।··ধুতির খুঁট আঙুলে জড়িয়ে আরো চাপ দিলেন, কই কিছুই তো না ।

দূর বাবা ! কিছুই না, ভূতের খামখেয়াল । আমিও যেমন পাগল !

চলে এলেন । এক বাটি পাতিলেবুর রস খেলেন, তার সঙ্গে একমুঠো আস্ত মুগ-ভিজে ।···ঠিকমতো কাজগুলো করে নিয়ে আবার গেলেন । এবার একটি হাতিয়ার নিয়ে । আর কিছু নয়, একটা নোকাটা পাতলা নরুন । আর একটা গোঁফছাঁটা সরু কাঁচি ।

যাক, হয়ে গেল কার্যসিদ্ধি ।

ওরাই স্ক্রু-ড্রাইভারের কাজ করল ।

স্ক্রুর খাঁজে চাপ দিয়ে পাক দিতেই ঢিলে হয়ে এল স্ক্রু দুটো । তারপর আস্তে আস্তে হাত দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে—

কিন্তু তারপর ?

তারপর যে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখা গেল, তা দেখলে যে-কেউ হার্টফেল করে বসত । নিদেন পক্ষে মূর্ছা । কিন্তু ব্রজ কবরেজ গরমের সঙ্গে ঠাণ্ডা, ঝালের সঙ্গে মিষ্টি, টকের সঙ্গে নুন, আর সিদ্ধির সঙ্গে চরস খান বলে, এবং ব্রাহ্মীশাক-বাটার প্রলেপের কোটিং দিয়ে মাথাটা রক্ষা করে চলেন বলে, তাঁর শুধু হাত-পা কাঁপল, বুক ধড়ফড় করল, আর পেটের মধ্যে মোচড় দিল ।

দিক মোচড়, উপায় কী ? এখন তো আর এই দু-দুটো সোনার বাক্স ভর্তি হিরে-জহরতের গাদা এখানে ফেলে রেখে উঠে যাওয়া যায় না ।

অবিশ্বাস্য, একেবারে দারুণ অবিশ্বাস্য হলেও, ব্যাপারটা সত্যি । চন্দ্রসূর্যের মতোই সত্যি । আরাম-কেদারার ওই চওড়া হাতাদুটোর মধ্যে ছিল দুটো গুপ্ত চেম্বার, স্ক্রু দুটো খুলে ফেলতেই যেটা বেরিয়ে পড়ল । চোখ-ঝলসানো হিরে মুক্তো চুনি পান্নায় ঠাসা ওই পাতলা প্লাস্টিকের টিফিন-কৌটোর ধরনের বাক্সদুটোও, সত্যি সোনারই । মাপসই করে বানানো । কী কাণ্ড !

অবশ্য আশ্চর্যেরই বা কী আছে ? একদা এদেশের সব সোনাদানা হিরে মুক্তো তো ওনাদের ঘরেই ঢুকে গেছে ।

আশ্চর্য, এই তিন পুরুষ ধরে ওইগুলোর ওপর শুয়ে বসে আসছেন কবরেজরা । ওই হাতাদুটোর ওপর আমি টান-টান করে পা ছড়িয়ে শুয়েছি, ওর ওপর হাত রেখে কাগজ পড়েছি, ওদের ওপর মুড়ি-বাদামের বাটি রেখে খেয়েছি, পটলা কলকে বসিয়ে রেখে গেছে এক টুকরো পেতলের চাকতি বসিয়ে । পুড়ে যাবার ভয়েই অবশ্য । সবথেকে বড় কথা,—বছরের পর বছর এটা বাগানের ধারে খোলা বারান্দায় পড়ে আছে ।

সাধে বলছি ব্রজ কবরেজ বলেই তাই হার্টফেল করলেন না ।

মনের জোরে পেটের মোচড় সামলে নিয়ে কবরেজ আবার নরুনের আগা দিয়ে স্ক্রু দুটোয় মোচড় দিয়ে বেমালুম যেমন ছিল করে রেখে এদিকে চলে এসে টইটুম্বুর এক গেলাস মিছরির জল, আর টইটুম্বুর এক গেলাস চা নিয়ে বসলেন ।

চেয়ার যেমন বাইরে পড়ে ছিল পড়ে রইল ।···

একটাই শুধু চিন্তা—আজ কি আর আসবে সাহেব ? আসবে নিশ্চয় । না এসে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না ।

কথাটা ঠিক ।···সন্ধ্যার পর সেই মৌজের মহামুহূর্তে যথাসময়েই হারানের আবির্ভাব ।

"কত্তা ! সায়েব আবার এসেছে ।"

ব্রজরাজ নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসেন । কৌতুক-চাপা গম্ভীর গলায় বলে ওঠেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর আমি অদ্য নিজেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছি সাহেব ।"

"অ্যাঁ ! কী বলিতেছ ভোজো ! কোন্ প্রশ্নের ?"

"বাঃ, একদিনেই ভুলিয়া গেলে ? এত দ্রব্য থাকিতে তুমি কেন এই কেদারাটির জন্য কবর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এতদিন শূন্যপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, এবং কেনই বা ইহা তোমার পুত্রের গ্রাণ্ডসনকে দিবার জন্য—"

আবার গতকালের মতো কাঁধে আইসক্রিমের থাবা ।

"খোঃ ! খোঃ-হো-খোবিরাজ ! তুমি কী বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিতেছি না ।"

"কেন রিচার্ড, না বুঝিবার তো কিছুই নাই । তোমার হিরা জহরতে ঠাসা গোল্ডেন বক্স দুইটি আমি আজ বাহির করিয়া দেখিয়াছি !"

"ও হো হো ! হায় গড় ! হায় ক্রাইস্ট ! হে মিস্টার ভোজোরাজ !"

মরার বাড়া গাল নেই । আবার মরার পরে আবার মরার নিয়মও নেই, তাই বোধকরি রিচার্ড এই আচমকা শক খেয়ে মারা গেল না । আর ছায়ামূর্তি পড়ে গেলে শব্দ হয় না বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল কিনা বোঝা গেল না । তবে কিছুক্ষণ নিঃসাড় নিস্তব্ধ ।···

হারান একসময় ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে, "সায়েবের চেয়ার-রহস্য আমি জানতাম কত্তা, বলতে মানা করে দিয়েছিল তাই ।···শক খেয়ে মারা গেল কি না কে জানে !"

"মারা গেল ? মারা গেল কী রে ? হা হা হা ।"

সেই ছাদ-ফাটানো হাসি ।

এ-শব্দে রিচার্ড-সাহেবের চৈতন্য ফেরে । তার কাতর গলায় বলে ওঠে, "কপি-কপিরাজ, আমি তোমাকে কিছু হিরা দিব । তুমি চেয়ারটি আমায় দিয়া দাও ।"

"হিরা দিয়া দিবে ?" আবার হেসে ওঠেন কবিরাজ । "হিরা লইয়া আমি কী করিব ?"

"তবে ? তবে কি গোল্ডেন বক্স দুইটি ?"

"সাহেব, তুমি কি পাগল ? সোনা হিরা এসবে আমার কী কাজ ?"

"তোমার পুত্রদিগকে দিবে।"

"পুত্র-টুত্র আমার নাই সাহেব, দুইটা জামাতা আছে। একটা উই ধরা, একটা আরশোলায় খাওয়া, কন্যারা 'সম' বোঝে না, সর্বদা বিষম কলহ করে। উহাদের জন্য আমার মাথাব্যথা নাই। তোমার বংশের হিরা জহরত তুমি লইয়া যাও।"

"অ্যাঁ! কী বলিতেছ মিস্টার ভোজোরাজ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?"

"স্বপ্নের কী আছে ? তোমার জিনিস তুমি লইয়া যাইবে, ইহাই তো ঠিক। গতকাল যদি তুমি রহস্য ফাঁস করিতে গতকালই দিয়া

দিতাম।...তবে—এতদিন ভোগ করিতেছি, সেই দাবিতে—"

"বলো। বলো ভোজো, তুমি ইহার বিনিময়ে কী চাহ ?"...সাহেবের অভিভূত স্বর, "তুমি যাহা বলিবে —"

ব্রজ কবিরাজ সোজা হয়ে বসে বলেন, "তুমি তো বলিলে এই বৃহৎ বস্তুটিকে তুমি উড়াইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম। তা সেইটি আমি নিজ চক্ষে দেখিতে চাই।"

"ওঃ। অলরাইট! ইহা আর কী এমন কথা। তো তুমি নামিয়া দাঁড়াও ভোজো—"

"উঁহু!" ব্রজ কবিরাজ মুচকি হেসে বলেন, "আমাকে লইয়াই উড়াইয়া লইয়া যাও!"

"অ্যাঁ! কী বলছেন কত্তা।"

হারান আর্তনাদ করে ওঠে।

ব্রজ হাস্যবদনে বলেন, "এত চমকাবার কী আছে রে হারান ?...চলো সাহেব, আমাকে তোমার পুত্রের গ্রাণ্ডসনের বাড়িটা দেখাইবে চলো।...আসল কথা কী জানো সাহেব, তোমাদের দেশটা একবার দেখিবার বড় শখ, কিন্তু এ-জীবনে তো আর হইবে না। এমন সুযোগটা ছাড়ি কেন ?...রোসো, দুই-চারিটা ভারী র‍্যাগ লইয়া আসি। শুনিয়াছি, তোমাদের দেশে বিস্তর শীত।"

কবরেজ আকাশে ওঠার তাল করছেন, এদিকে কবরেজগিন্নি আকাশ থেকে পড়লেন।

"এই গরমে কম্বল কী করবে ? অ্যাঁ ? মোটা কম্বল! তা-ও আবার দু-চারটে! অ পটলা, শিগগির অভিলাষকে ডাক, কর্তার মাথায় মধ্যমনারান তেল ঢালুক এসে।...হবে না, সাত জন্মে মাথায় জল ঠেকানো নেই। পটলা, যা—"

"এই পটলা, খবরদার! ইচ্ছে হয় মধ্যমনারান তেল তোদের গিন্নিমা মাথায় ঢালুক! তুই কম্বলগুলো নিয়ে বাগানে চল। ওখান থেকে বিলেত যাচ্ছি বুঝলি ? টা টা!"

পটলা আসে ভ্যাবাচাকা মুখে, কম্বল ঘাড়ে। গিন্নি আসেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে জলের কুঁজো হাতে। মাথায় জল ঢালতে হলে ঠাণ্ডা জলই বিধি। কর্তার কাছেই শেখা।

কিন্তু মাথাটার নাগাল পেলেন কই ?

দেখলেন কম্বলের বোঝা আরাম-কেদারায় চাপিয়ে কর্তা তার ওপর গ্যাঁট হয়ে বসলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ওই দিগ্‌গজ মানুষটা সমেত দিগ্‌গজ চেয়ারটা হুশ করে শূন্যে উঠে গেল। আর উঠে গিয়ে দেওয়ালির রাতের ফানুসের মতো দুলতে দুলতে ভাসতে ভাসতে উড়ে চলে গেল।

ব্রজরাজ কবিরাজের মাথার চারপাশের আলোর ছটায় দৃশ্যটা বেশ খানিকক্ষণ স্পষ্টই দেখা গেল। ক্রমশ আবছা হয়ে মিলিয়ে গেল। আর বহুদূর থেকে যে-শব্দটা শোনা যাচ্ছিল, 'টা টা বাই বাই'—ক্রমে সেটাও মিলিয়ে গেল। তবু দু' জোড়া চোখ ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। একজোড়া ভ্যাবাচাকা, একজোড়া উদ্—

হুঁকো-কাহিনী

মণীন্দ্র রায়

খোকার বয়স এগারো,
পড়াতে সে ভাল, তারো চেয়ে ভাল—
চোখ আছে তার দেখারও।

খোকার দাদুও মিশুকে।
যখন তখন গল্প বলেন
কচিকাঁচা আর শিশুকে।

চান না কিছুই লুকোতে
কুচকা লজেন্স সবই খান, তবু
মন পড়ে থাকে হুঁকোতে।

সেদিন বিকেলে বেরিয়ে
দাদু দেখলেন হুঁকোটি উধাও,
খোকা তাকাচ্ছে টেরিয়ে।

'খোকা রে ভাঙলি পাঁজর !'
দাদু বললেন, 'হুঁকোর জন্যে
প্রাণ যে এখন নাছোড় !'

খোকা বলে, 'দাদু ভীষণ
অন্যায় ওটা, হুঁকো ধোঁয়া ছাড়ে.
তাতে পরিবেশ-দূষণ।'

চলো যাই হবিবপুরে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

নদী এই পেরিয়ে নদী, ভরদুপুরে
চলো যাই যাই চলো যাই হবিবপুরে
যাব নয়, যাবই যাব, যাবই যাব,
যাবই যাব।

নয়কো তো দূর সাঁওতালডি,
তাই তো যাব চটজলদি,
স্ট্রবেরি নয়, স্ট্রবেরি নয়, বৈঁচি পেকেছে।
আশু কেন ? দাশু কেন ? সবাই দেখেছে।

নেই পকেটে খেয়ার কড়ি ?
তাই বলে কি 'কেয়ার' করি ?
ঐ দেখ না কারা কলার ভেলা ঢেঁকেছে।

সিংহিদের সেই বাগানবাড়ি
তাল-সুপুরি ঝাউয়ের সারি
পিচ-পেয়ারা পিছলে পাঁচিল ভুঁয়ে ঠেকেছে।
কলাইঘাটা যেতে বলাই সত্যি দেখেছে।
ফলসাবনে, সেঁয়াকুলে
শীতবুড়োটা এলোচুলে
হেলেদুলে রুমাল তুলে যেতে ডেকেছে।
কে বলেছে বনের পথ কাঁটায় ঢেকেছে ?

ছবি : দেবাশিস দেব

চাঁদ-সূর্য

কবিতা সিংহ

তোমরা ভাবো কুট্টি
এই তোমাদের তুট্টি
আসলে ও মস্ত
আকাশটা সমস্ত
দখল করার সাধ
তাই পেতেছে ফাঁদ
ওই তো আমার
পুটুকু নাতিন
মাঘ-পুনমের চাঁদ !

ওর যে যমজ ভাই
বাবালি সূর্যাই
তিন মিনিটের দাদা
দাদা বলে, বোনটি আমার
সোনার পায়রা চাঁদা

দিব্যি ওদের ভাব
কড়ে আঙুল দেখায় নাকো
কেবল বলে ডাব !

চাঁদ সূর্য জোড়া-জোড়া
মারে না চাবুক,
চড়ে না ঘোড়া।
বাঘমার্কা বাসে চড়ে
বেবি ক্রেশে যাই
পায়রা চাঁদা চাঁদমণি, আর
সূর্যমণি ভাই।

সূর্য গৌর চাঁদ গৌরী
দু'জন দারুণ কবি—
অন্ত্যমিলের হবি।
চাঁদ বলে 'ও মৌরী',
সূর্য মেলায় প্রশ্ন দিয়ে :
'কী দিয়ে তুই তৌরি ?'

ছবি : দেবাশিস দেব

টুপুর বড় হওয়া

সুনীলকুমার নন্দী

রাম-অবতার টুপাইসোনা
বায়না ধরে : মিনিদিদি
জয়-পরাজয় এখন রেখে
বলো-না সেই কাজলাদিঘি
রাঙিয়ে দিতে থোকা-থোকা
ফুল ফোটাতে নামত কে সে—
আচ্ছা, না-হয় হয়ো সীতা
সাজব যখন রাজার বেশে।

বাড়ির ভেতর লঙ্কাকাণ্ড !
না, না, কী যে বলছ যা-তা,
রাবণরাজার মতো নেই তো
মিনিদাদার দশটা মাথা।
জানি, এসব কথার কথা
জলের বুকে আঁকাজোকা—
আর আমি নেই, তুমিও জানো
ভাইয়ের মতো ছোট্ট খোকা।

বানরসেনা কোথায় পাব ?
পাড়ার ছেলে, এত চেনা—
দামাল বলে মিশতে নিষেধ,
ওরাই কিন্তু বানরসেনা ;
ওদের সঙ্গে আনব, দেখো
খেলার ট্রফি, স্বর্ণসীতা—
গল্প ফেঁদে, বাইরে যাবার
যতই-না ভয় দেখাও বৃথা।

সত্যি মিথ্যে

শঙ্খ ঘোষ

কোন্‌টা যে ওর সত্যি কথা
কোন্‌টা বলে মিথ্যে
সেটাই যদি জানতে তবে
অনেক কথাই শিখতে !

কপাল যখন শক্ত সটান
ভুরুর রেখাও পষ্ট,
তখন দূরে তফাত থেকো
নিদেন শতেক হস্ত ।

কারণ তখন রোখ চেপেছে
বলবে সবই সত্যি
রাখবে না আর এধার ওধার
কিছুই ঝরতি-পড়তি !

কিন্তু যখন ফুরফুরে ঠোঁট
ভুরুর কোণে ভাংচি—
দুহাত জুড়ে বোলো, সবই
মানছি বাবা মানছি ।

কারণ তখন চোখের তারায়
ঝিলিক দেবে মিথ্যে,
বুঝবে যে সে দাঁড়িয়ে আছে
সৃষ্টি করার তীর্থে !

ছবি : দেবাশিস দেব

অ্যালার্জি

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ডাক্তার ডি· ব্যানার্জি,
আমায় সেদিন বললেন, "ভাই,
আপনার কি অ্যালার্জি ?"

আমাদের এই ডাক্তার
দিক্‌জোড়া নাম-ডাক তাঁর
সব অসুখের আবদার
তাঁর মুখস্থ আকছার ।

তাঁকে শুধাই, "জ্ঞানশ্রী,
আমার উপসর্গ দেখেও
অসুখ ধরতে পারেননি ?"

তখন তিনি হকচকিয়ে
আমার তামাম রক্ত নিয়ে
ঈষৎ কেসে বলেন, "ইয়ে
অ্যালার্জি এ অ্যালার্জি এ—"

এ কী রকম ব্যাপার ছিঃ,
সেদিন থেকেই ঘটল আমার
আকাশপ্রমাণ অ্যালার্জি !
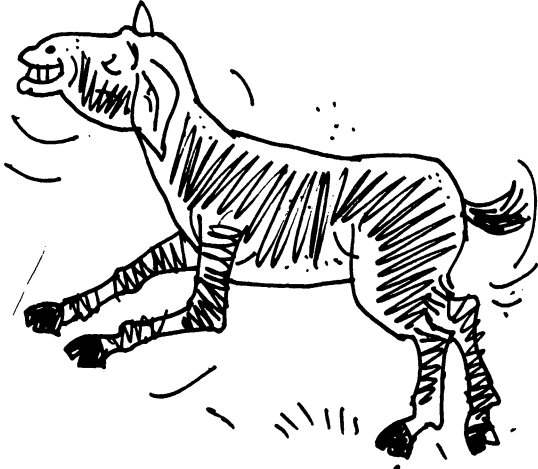
ছাগলছানা

সুনীল বসু

ছাগলছানা ছাগলছানা
ভাগলপুরে যাবি,
কাকের বাসায় বকের ডিম
হরিমটর খাবি।

তিড়িংবিড়িং লাফাস কেন
চিংড়িখালির বিলে,
ভয় পেয়েছিস বুঝি রে তুই
দেখে ওই হাড়গিলে।

আহা, তোকে পুষব আমি
তোশক দেব কিনে,
কচি ঘাসের মাংস খাবি
পাঠিয়ে দেব চিনে।

তাগড়া হবি জোয়ান হবি
আগল ভেঙে যাবি,
বাঘের মতো লাফ মারবি
ইঁদুর ধরে খাবি।

বাড়ি আমার চৌকি দিবি
গলায় দড়ি বাঁধা,
কিল মারব সেই ব্যাটাকে
যে-ই বলবে গাধা।

ছাগলছানা ছাগলছানা
পাগল বলুক লোকে
আমি তোকে বাঘ বানাব
ছড়া খোঁজার ঝোঁকে।

ছবি : দেবাশিস দেব

মূল সুর

শিবশম্ভু পাল

সেদিন ক্লাসে দীপিতাদি উদ্দীপিতা হয়ে
চড়িয়ে গলা 'কাবলিওলা'র তত্ত্ব দিলেন কয়ে ;
স্নেহের কোনো নেইকো জাতি ধর্ম এবং দেশ,
মিনির প্রতি রহমতের আদর অনিঃশেষ।
ছেলের কাছে মেয়ের কাছে সবাই সমান পিতা...
দীপিতাদি পড়াচ্ছিলেন দারুণ উদ্দীপিতা।

ক্লাস চুপচাপ, দীপিতাদির মুখের দিকে চেয়ে
বসে আছে নবম শ্রেণীর তেতাল্লিশটা মেয়ে।
মাঝে-মাঝে নিচ্ছে লিখে একটা দুটো কথা
তাঁরই মতন লিখতে হবে, শূন্য যে অন্যথা।
কেউবা শুধু চেয়েই আছে যেমন শ্রীলা মিঠু ;
টুঁ শব্দেই বাংলাদিদি যমের চেয়েও নিঠুর।

এমন সময় দীপিতাদি চুপ করলেন হঠাৎ,
কেমন যেন উঠল জেগে কুটিল সন্দেহটা।
তীক্ষ্ণ সরু গলায় ডাকেন, 'দাঁড়াও টোয়েনটি টু—'
হায় রে কিছু শুনিইনি তো, কাঁপছে ভয়ে মিঠু।
শক্ত ঘানি, খাটবে নাকো কোনোই চালাকি।
হাঁকেন দিদি, 'কাবলিওলার মূল সুরটা কী ?'

বাঁচা গেল। এই প্রশ্ন ! মিঠু দ্বিধাহীন
বলল, 'দিদি, মূল সুরটা — হিং চাই মা, হিং—'

স্মাগলার

সমরেশ মজুমদার

টয়লেট থেকে ফিরে এসে সুখেন বললেন, "এক ফোঁটা জল নেই।" সুরুচি আঁতকে উঠলেন, "সে কী! জল নেই? এতটা পথ যাব কী করে?"

শান্তু জানলার পাশে বসেছিল। এর মধ্যে ওর চোখে একবার কয়লার কুচি পড়েছে। সুরুচি সরে আসতে বলেছিলেন কিন্তু সে কিছুতেই জানলা ছাড়বে না। বাইরে তখন পা টিপিয়ে সন্ধে নামছে। মাঠের ওপর মন খারাপ করে দেওয়া ছায়া। দার্জিলিং ছেড়ে আসার পর থেকেই কিছু ভাল লাগছিল না ওর। সেই কলকাতার ফ্ল্যাট, ফের স্কুলে যাওয়া—মাঝে-মাঝেই কান্না পেয়ে যাচ্ছিল ওর। কেন কোথাও বেড়াতে এলে ফিরে যেতে হয়!

বাবা-মায়ের কথায় সে মুখ ফেরাল। বাবাকে কেমন হতাশ দেখাচ্ছে, মাকে বিরক্ত। বাবার পাশে এক টাকমাথা ভদ্রলোক বসেছিলেন। ভদ্রলোকের নাকের ওপর গোল ফ্রেমের স্টিলের চশমা। রুমালে টাকের ওপর ফুটে ওঠা ঘাম মুছে বললেন, "ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে উচ্ছন্নে গেছে। একটু বাদেই ওই জায়গাটা নরক হয়ে যাবে।"

সুখেন বললেন, "যা বলেছেন। এরা ভাড়া বাড়াবে অথচ—"

ভদ্রলোক বললেন, "কোনো আশা করবেন না, করলেই কষ্ট বাড়ে।"

থ্রি টিয়ারের কোচ, কিন্তু যত লোক বসেছে তার চেয়ে বেশি লোক প্যাসেজে নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনটা ছেড়েছে বিকেল তিনটে নাগাদ, শিয়ালদায় পৌঁছাবে আগামীকাল সকালে। এরা কি সারা রাত দাঁড়িয়ে যাবে? সুখেন গজগজ করছিলেন, "চেকারকে তো একবারও দেখলাম না।"

টেকো ভদ্রলোক বললেন, "কলকাতায় পৌঁছেই কাগজে চিঠি লিখতে হবে। পাবলিক জানুক।"

নতুন-নতুন স্টেশন যত আসছে কামরার ভিড় তত বাড়ছে। শান্তু অবশ্য লক্ষ করেছে কেউ তাদের বেঞ্চিতে জোর করে বসতে চাইছে না। দু-একজন অনুরোধ করেছিল কিন্তু সুখেন মুখের ওপর না বলে দিতে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

রাত হচ্ছে। একটু বাদেই মাঝখানের বাঙ্কটা শোওয়ার জন্যে তোলা হবে। ওইটের ওপর শুতে খুব মজা লাগে শান্তুর। উপুড় হয়ে শুলে জানলার কাঁচ দিয়ে বাইরেটা দেখা যায় জ্যোৎস্না থাকলে। সঙ্গে বিরাট বট্‌লে জল ছিল। সুখেন বড় স্টেশন এলেই সেটাকে ভরতি করে আনছিলেন। শান্তুর খুব ইচ্ছে করে ট্রেন থামলেই প্লাটফর্মে নামতে। অচেনা অজানা জায়গায় কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে আমি চলে এলাম—ভাবতেই কেমন লাগে। অথচ সুরুচি তাকে কিছুতেই নামতে দেবেন না। ট্রেনে উঠলেই যেন মায়ের শাসন বেড়ে যায়।

রাতের খাবারের আয়োজন করছেন সুরুচি টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে। শান্তু বলল, "আমি টয়লেটে যাব।"

সুখেন একটা ক্রাইম থ্রিলার পড়ছিলেন, বললেন, "যাও।"

সুরুচি বললেন, "সাবধানে যাবি। ওখানে তো আবার জল নেই।"

মায়ের কথা শুনলে রাগ ধরে যায়। টয়লেটে যেতে আবার সাবধান হবার কী আছে। দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর শরীরের ফাঁক গলে শান্তু এগিয়ে গেল। এর মধ্যেই যাদের রিজার্ভেশন আছে তাদের অনেকে শুয়ে পড়েছে। দরজার কাছে এসে দেখল ওখানে একদম ভিড় নেই। দু-তিনটি ছেলে মেঝেতে উবু হয়ে বসে কিছু করছে। টয়লেটের দুটো দরজাই হাট করে খোলা। ভেতরেও দু-তিনজন। তাদের পরনে খাটো প্যান্ট, খালি গা। ইতিমধ্যেই কাদা মাখামাখি হয়ে গেছে তারা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি লোক ওদের কাজ দেখছে। তার বাঁ হাতে একটা টর্চ, ডান হাতটা পকেটে ঢোকানো।

শান্তু ভাবল, রেলের লোকেরা বোধহয় টয়লেটের কল সারাই করছে। কিন্তু ঠিক সেই সময় নজরে এল মেঝের ওপর পাহাড় করে রাখা ছাতাগুলো। প্লাস্টিকের প্যাকেটে সুন্দর দেখতে ছাতাগুলোকে ওরা বাণ্ডিল করে বাঁধছে। তারপর সেই বাণ্ডিল চালান হয়ে যাচ্ছে টয়লেটের ভেতর। সেখানে যারা রয়েছে তারা কী করছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ততক্ষণে শান্তু বুঝে গেছে এরা কারা। মায়ের ঝোলায় এইরকম একটা ছাতা আছে। সেটা নাকি জাপানে তৈরি। বাবা বলেছিল মায়ের ছাতাটা নাকি প্রকাশ্যে বিক্রি করা নিষেধ। তাই কি এরা এ-রকম লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

স্মাগলার শব্দটার সঙ্গে এর মধ্যে শান্তুর পরিচয় হয়ে গেছে। কিন্তু বইয়ের স্মাগলাররা হিরে কিংবা সোনা নিয়ে কারবার করে, ছাতা স্মাগলিং করে যারা তারা বোধহয় খুব নিচু শ্রেণীর। শান্তু মুখ ঘুরিয়ে দেখল সামান্য দূরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখগুলোয় কেমন সন্ত্রস্তভাব। আড় চোখে

দেখছে তারা কিংবা না-দেখার ভান করছে। শান্তুর কিন্তু এদের দেখে একটুও ভয় করছিল না। পাড়ার রকে দেখা আর-পাঁচটা ছেলের সঙ্গে এদের চেহারার কোনো ফারাক নেই। টর্চ হাতে দাঁড়ানো লোকটা ওর সামনে এগিয়ে এল, "তুমি বাথরুমে যাবে ?"

নীরবে ঘাড় নাড়ল শান্তু।

"পাঁচ মিনিট বাদে ঘুরে এসো। ততক্ষণে এই বাথরুমটা হয়ে যাবে।"

শান্তুর এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে দেখতে পেল লোকগুলো স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে বাথরুমের কলকব্জা খুলছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল এদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। এরা সমাজের শত্রু। কথাটা মনে আসতেই অদ্ভুত শিহরন এল। নিঃশব্দে প্রায় পা টিপে সে ফিরে এল। সুরুচি জিজ্ঞাসা করলেন, "জল এসেছে ?"

ততক্ষণে উত্তেজনায় মুখ লাল শান্তুর। সুখেনের পাশে বসে ফিস ফিস করে সে ব্যাপারটা জানাল। শুনে সুখেন সোজা হয়ে বসলেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, "ওরা যা করছে করুক। আমাদের নাক গলানোর দরকার নেই।"

শান্তু জিজ্ঞাসা করল, "পুলিশে ধরিয়ে দেবে না ?" ওর মনে হল এ-রকম একটা কাজ করতে পারলে গোগোলকে টেক্কা দেওয়া যাবে।

সুরুচি জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হয়েছে ?"

সুখেন উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথাটা বললেন।

টেকো ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, "সমাজবিরোধী মশাই, ডেঞ্জারাস এলিমেণ্ট। চেকার পুলিশ সবার সঙ্গে ওদের প্যাক্ট আছে। আপনারা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, আমি শুয়ে পড়ব।"

সুরুচি চাপা গলায় বললেন, "তাই টয়লেটে জল নেই। শুনে আমার বুক হিম হয়ে যাচ্ছে। ওরা আবার ডাকাতি করবে না তো !"

কোনোরকমে শান্তু যখন খাওয়া শেষ করেছে তখনই লোকটাকে দেখতে পেল সে। টর্চ হাতে ওদের সামনে এসে বলল, "এই যে খোকা, এবার তুমি বাথরুমে যেতে পারো।"

সুরুচি ছেলের দিকে তাকালেন। সুখেন আড়চোখে দেখে বললেন, "থাক।"

লোকটা বলল, "থাকবে কী মশাই ! ছোট ছেলেকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন ? এসো তুমি !"

কেউ কিছু বলার আগেই শান্তু উঠে দাঁড়াল। ও সত্যি পারছিল না। লোকটা ভিড় সরিয়ে ওকে নিয়ে গেল টয়লেটে। এখন আর ছাতাগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। যারা কাজ করছিল তারা মেঝেতে বসে তাস খেলছে। টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করল শান্তু। আর পাঁচটা টয়লেটের মতনই দেখাচ্ছে। ওরা ছাতাগুলোকে লুকোল কোথায় ? তন্নতন্ন করে খুঁজল শান্তু, কিন্তু হদিস পেল না ম্যাজিকের মতো উড়ে গেছে ওগুলো ? বেশি দেরি করতে সাহস হল না। টয়লেট থেকে বেরিয়ে আসতেই নজরে এল, সুখেন ভীত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শান্তু বাবার কাছে আসতেই চিৎকারটা কানে এল। প্যাসেজের পাশের বাঙ্কে শুয়ে ছিল কেউ। যার বাঙ্ক তিনি উঠে যেতে বলছেন অনধিকারীকে। সে বোধহয় গড়িমসি করছিল, দু-একটা বেচাল কথাও বলতে পারে। টর্চ-হাতে লোকটা দ্রুত চলে গেল সেখানে। তার এক হাত নির্বিকার ভাবে পকেটে কিন্তু অন্য হাত হয়ে উঠল সক্রিয়। দু হাতে মুখ ঢেকেও অনধিকারী আঘাত সামলাতে পারছে না। দরদর করে তার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে টর্চের আঘাতে। সুড়সুড় করে সে নেমে আসতেই টর্চধারী প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইল অধিকারীর কাছে, "কিছু মনে করবেন না, আপনি শুয়ে পড়ুন। আমরা চাই না কোনো প্যাসেঞ্জারের অসুবিধে হোক। এই, হট্, হট্ হিঁয়াসে।"

এইসময় একটা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চেকারকে আসতে দেখা গেল। তারা এসে আহত লোকটিকে ধরে আবার ট্রেনের অন্য প্রান্তে ফিরে গেল। শান্তু পুলিশ দেখে যতটা উত্তেজিত হয়েছিল টর্চধারীর কথাবার্তা শুনে ততটা মিইয়ে পড়ল। পুলিশ কি স্মাগলিং-এর খবর জানে ? টর্চধারীকে সে একটাও কথা

জ্বলল না কেন ?

শান্তু বাবার সঙ্গে নিজের জায়গায় ফিরে এল । এখন সমস্ত কামরা থমথমে । চোখের সামনে রক্ত দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল শান্তু । সুখেন আর একটুও দেরি করলেন না । তাড়াতাড়ি বাঙ্ক পেতে বিছানা করে শুয়ে পড়লেন । সবাই শুয়ে আছে কিন্তু শান্তুর ঘুম আসছে না । যেন শুয়ে পড়লেই সব বিপদ দূরে থাকবে—কামরায় এখন এইরকম ভাব ।

উপুড় হয়ে শুয়ে আপাতনিদ্রিত কামরাটিকে দেখছিল শান্তু । চারধার ভীষণ চুপচাপ । দেখতে দেখতে কখন ঘুম এসেছিল জানে না । হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে তেতলার বাঙ্কটা মাথায় লাগল । বালির মধ্যে একটা হাত বেরিয়ে আছে । স্বপ্নটা যেন এখনও চোখের সামনে ঝুলছে । একটু শান্ত হতেই ওদের কথা মনে পড়ে গেল । আর তক্ষুনি আবার টয়লেটে যাওয়ার তাগিদ এল । শান্তু ঝুঁকে দেখল বাবার নাক ডাকছে । টেকো ভদ্রলোক অসাড় এবং মা হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন । এখন যদি কেউ ওদের জিনিসপত্র নিয়ে যায় কেউ টের পাবে না । টর্চধারীর কথা ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত আর সামলাতে পারল না । সতর্ক পায়ে টয়লেটের সামনে চলে এল সে । এবার অন্য টয়লেটটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেখতে লাগল কোথায় আছে ছাতাগুলো । প্রথম চেষ্টায় কিছু পেল না শান্তু । তারপরেই নজরে এল একটা দড়ি ল্যাট্রিনের গর্তটার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে । পরিষ্কার ছিমছাম বলে হাত বাড়াতে সঙ্কোচ হল না শান্তুর । দড়িটা ধরে টানাটানি করতেই নীচে অদৃশ্য হয়ে থাকা ভারী জিনিসটার অস্তিত্ব টের পেল সে । হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই ও শীতল হয়ে গেল । দড়িটা হালকা হয়ে গেছে । অদৃশ্য হয়ে থাকা বস্তুটা যেন আর শেষপ্রান্তে নেই । ওটা নিশ্চয়ই ছাতার বাণ্ডিল ছিল এবং টানাটানিতে খুলে গেছে বোধহয় । ছুটন্ত ট্রেনের শরীর থেকে সেগুলো এতক্ষণে ছিটকে পড়েছে লাইনে । সোজা হয়ে দাঁড়াল শান্তু । ওরা যদি জানতে পারে সে ছাতাগুলোকে ফেলে দিয়েছে তাহলে— ! টিপটিপ করতে লাগল বুক । এ-রকম করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তার । জামার হাতায় মুখের ঘাম মুছল সে । তারপর চোরের মতো বেরিয়ে এল ।

"কী খোকা, জল নেই বলে অসুবিধে হচ্ছে ?"

প্রশ্নটা শুনতেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল টর্চধারী দরজায় ঠেস দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে । ঝিম ঝিম করল মাথাটা । কোনোরকমে ঘাড় নাড়ল, "না ।"

"উঁহু, হচ্ছে । মিথ্যে কথা বলছ । আসলে জলের পাইপগুলো আমরা আটকে রেখেছি তাই— । তোমার জল দরকার ? আমার বন্ধুরা এনে দিতে পারে ।"

"না ।" টর্চধারীর কথা বলার ধরনে ভয় কমে যাচ্ছিল ওর । লোকটার একটা হাত এখনও পকেটের ভেতর পোরা ।

"আসলে জানো, আমরা কারো অসুবিধে করতে চাই না । শুধু জলটা না আটকালে খুব অসুবিধে হয় তাই বন্ধ রেখেছি । একটা রাত জল ছাড়া চলে যায়, তাই না ?"

"আপনারা কলকাতায় যাচ্ছেন ?"

"হুঁ । তবে কলকাতার অনেক আগেই দমদম স্টেশনের কাছে ট্রেনটা থেমে যাবে আর আমরা জিনিসপত্র নিয়ে নেমে যাব ।"

"থামবে কেন ?"

"আমরা টাকা দিয়েছি তাই থামবে । ঠিক দশ মিনিট, তার মধ্যেই আমাদের সব কাজ সারতে হবে ।"

"কেউ কিছু বলে না ?"

"কেন বলবে ? চেকাররা টাকা নিচ্ছে, পুলিশ নিচ্ছে, আমরা তো কাউকে অখুশি করি না । প্যাসেঞ্জারদের বিরক্ত করি না । তোমাদের দরকারি জিনিস আমরা কষ্ট করে কলকাতায় পৌঁছে দিই । যারা আমাদের কাছ থেকে নেয় তারা ডবল দামে তোমাদের কাছে বিক্রি করে । এত দিয়ে-থুয়ে আমাদের সামান্যই লাভ থাকে । তোমরা যখন সেই জাপানি ছাতা মাথায় নিয়ে রাস্তায় হাঁটো তখন এসব জানতেও পারো না ।"

"যদি পুলিশ ধরে !"

"তাহলে তোমরা মনের মতো ছাতা পাবে না, আর আমরা তখন রাত্তিরে তোমাদের ভয় দেখিয়ে সব জিনিসপত্র নিয়ে নেমে যাব । আমাদের বাঁচতে হবে তো ! কেউ যে আমাদের চাকরি-বাকরি দেয়নি । যাও, শুয়ে পড়ো, কোনো ভয় নেই ।"

শান্তু চুপচাপ ফিরে এল নিজের বাঙ্কে । মায়ের ঝোলা থেকে জাপানি ছাতাটা উঁকি মারছে । আশি টাকা দিয়ে বাবা কিনে দিয়েছিল এসপ্লানেড থেকে । মায়ের খুব পছন্দের । এই স্মাগলাররা যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে বাবাও অন্যায় করেছে কিনে, মা-ও । তাহলে শুধু ওদের দোষ দেওয়া কেন ?

বাঙ্কে শুয়ে ওর আবার মনে পড়ে গেল বাণ্ডিলটার কথা । নামাবার সময় টর্চধারী কি টের পাবে তার জন্যে ছাতাগুলো পড়ে গেছে ? না-ও বুঝতে পারে । কিন্তু হঠাৎ শান্তুর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল । কত কষ্ট করে ওরা নিয়ে যাচ্ছে কলকাতার মানুষদের জন্যে আর সে ওদের ক্ষতি করে দিল ! টর্চধারী তো ওর সঙ্গে একটুও খারাপ ব্যবহার করেনি । বাবার যখন মন ভাল থাকে তখন ঠিক এমন করেই তো গল্প বলে ।

দু'দণ্ড চিন্তা করে নিঃশব্দে বাঙ্ক থেকে নামল শান্তু । তারপর চোরের মতো সতর্ক হয়ে মায়ের ঝোলা থেকে সুন্দর ছাতাটা বের করে ওপাশের জানলা দিয়ে ছুটন্ত ট্রেন থেকে শূন্যে ছেড়ে দিল । কাল সকালে মা যখন হা-হুতাশ করবে তখন সে চুপচাপ বসে থাকবে ।

ছবি : দেবাশিস দেব
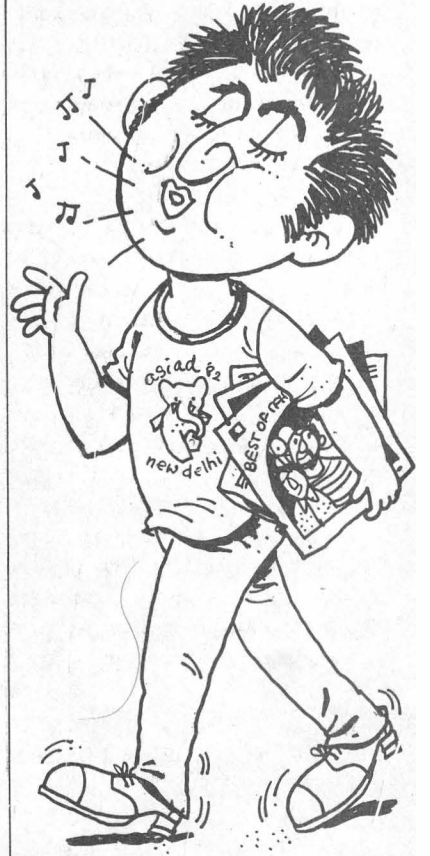
ধন্যি ধ্বনি

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

গটগট হাঁটি, পায়ে যদি থাকে জুতো,
জামা থেকে ছেঁড়ে পটপট করে সুতো,
ঘটঘট ঘুরি খটখটে পথঘাটে,
উনুনে কয়লা ফটফট করে ফাটে,
কান কটকট, আঠা চটচট করে,
ঝড়ে মটমট ডালপালা ভেঙে পড়ে,
ভটভট ছোটে স্কুটার, উড়িয়ে ধুলো,
ঝটঝট শিখি মজার শব্দগুলো ।

২

খটমটে অঙ্কটা খাতার পাতায়
তাকিয়ে রয়েছে, চোখ কটমট ।
ছটফটে পড়ুয়ার ভাবনা মাথায়—
কী করে মেলাবে অতি চটপট ।

৩

ফিনফিনে পাঞ্জাবি গায়ে তার,
চিনচিনে ব্যথা ওঠে বুকে,
ঝিনঝিনে যন্ত্রণা পায়ে তার,
মিনমিনে স্বর ফোটে মুখে ।

ছবি : দেবাশিস দেব

ধাঁধার পাতা

সত্যসন্ধ

১.

নীচের ছবিটাকে সমান চার ভাগ করতে হবে। এক মাপের ও একই রকম দেখতে যেন হয় প্রত্যেকটা ভাগ।
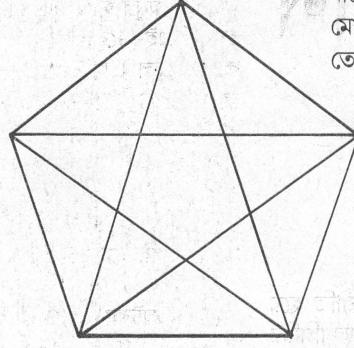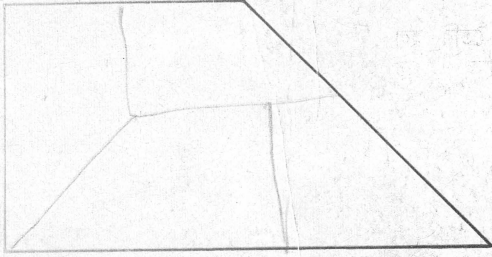
২.

নীচের এই ছবিটায় ক'টা ত্রিভুজ মোট রয়েছে, গুনে বার করো তো—

৩.

তুমি কি এমন একটা নিখুঁত বর্গক্ষেত্র আঁকতে পারো, যার এককেটি বাহু চারদিকে ছড়ানো এই বিন্দুগুলির এককেটিকে স্পর্শ করবে. অথচ যার কোনো বাহুই এই শব্দগুলিকে আদৌ স্পর্শ করবে না ?
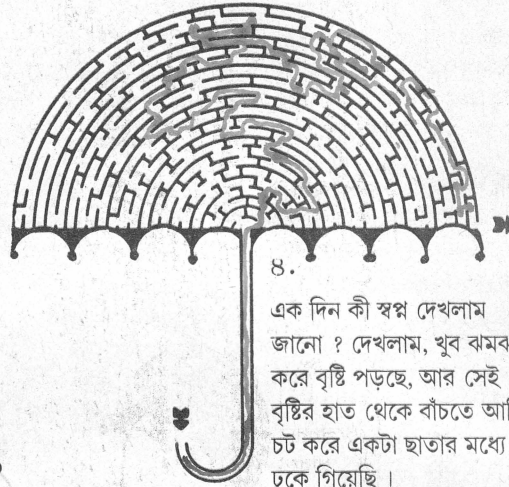
৪.

এক দিন কী স্বপ্ন দেখলাম জানো ? দেখলাম, খুব ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, আর সেই বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে আমি চট করে একটা ছাতার মধ্যে ঢুকে গিয়েছি।
ঢুকে তো গিয়েছি, কিন্তু বেরোই কী করে ? কী জটিল পথ রে বাবা। এদিকে বৃষ্টিও থেমে গিয়েছে। বেরোবার পথটা খুঁজে দিতে পারো ?
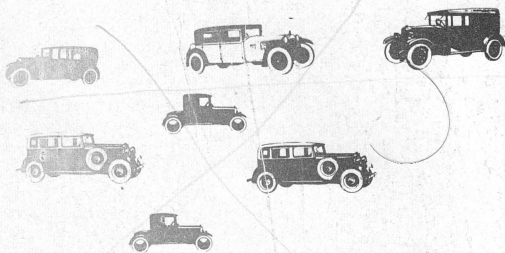
৫.

ছ' ভাই, সাতটা গাড়ি।
বৃদ্ধ বাবা একদিন ডেকে পাঠালেন ছ' ভাইকে।
প্রত্যেকের হাতে তুলে দিলেন পাশের ছবিটার মতো একটা ছবি। বললেন, পনের মিনিটের মধ্যে তিনটে সরলরেখা টেনে যে এই প্রত্যেকটা গাড়িকে আলাদা করে দিতে পারবে, তাকেই দিয়ে যাব আমার যাবতীয় সম্পত্তি।
চেষ্টা করল সবাই, কিন্তু একজনই পেরে গেল।
কী করে ভাগ করল সে ?
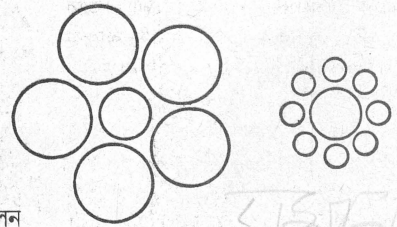
৬.

বাঁ দিকের ছবিটার মধ্যিখানে একটা গোল, ডান দিকের ছবির মধ্যিখানেও আরেকটা। এই দুই গোল নিয়েই গোলমাল। কোন্‌টা ছোট ?

উত্তর ৯০ পৃষ্ঠায়

অপারেশন রংরুট

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিল বিজ্ঞানচর্চার ক্লাব। রাতারাতি হয়ে দাঁড়াল 'রংরুট'। গোয়েন্দাগিরির শখের ক্লাব। পিক্‌লু বেশ গাঁইগুঁই করেছিল। কিন্তু স্রোতের জল তোড়ে গোয়েন্দাগিরির দিকে বইতে লাগল। ছোটকা দেখেশুনে বললেন, "সবাই চাইছে যখন, তখন একটা উপায় বার করতেই হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে গোয়েন্দাগিরি করা হয় বলে ইস্তাহার ছাপিয়ে দে।"

ব্যাপারটা ঘটেছিল মিনুকে কেন্দ্র করে। শহরে তখন বড় বড় রুই-কাতলার মতো ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে চারাপোনার মতো ছোট-ছোটদেরও ছেলেধরায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। মিনু ছিল পিক্‌লুদের বিজ্ঞান-বন্ধু-ক্লাবের রুই-কাতলা জাতীয় সদস্য। বাঘা-বাঘা মডেল বানিয়ে বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে নামও করেছিল বেশ কিছুটা। এহেন মিনু পড়ল ছেলেধরার হাতে। তারা নাকি ওকে সৌদি আরবে পাচারে ঠিক করেছিল। অন্তত ক্লাবের পাণ্ডা সন্তু তাই বলে। তার ওপর সন্তু ছেলেধরাটাকে নিজে চোখে দেখেওছে। সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, মিনুর ওপর চোখ পড়ল। বেশ খানিকটা দূরে খুব কেতাদুরস্ত ধরনের এক ভদ্রলোক এক হাতে মিনুর ব্যাগটা নিয়েছেন, অন্য হাতে ধরেছেন মিনুর হাতখানা। আর মিনু? সে অনেকটা পি সি সরকারের অনুষ্ঠানে 'হিপনোটাইজ' করা মেয়েদের মতো স্থির দৃষ্টিতে ওপর দিকে চেয়ে হেঁটে চলেছে। লোকটি অল্পবয়সী এবং অনর্গল আগাডোম বাগাডোম বকে চলেছে। খানিকটা পিছু-পিছু চলার পর সন্তুর প্রাণ উড়ে গেল। এ তো খাঁটি ছেলেধরা। নয়তো সোজা পথ না ধরে মাঠের দিকে হাঁটছে কেন, আর কেনই বা দূরে গাছতলায় একদল লোক ঘন-ঘন বিড়ি ফুঁকছে আর মিনুদের দিকে চেয়ে আছে। সন্তু, যা থাক কপালে, বলে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে চেঁচাতে আরম্ভ করল আর সঙ্গে সঙ্গে 'ছেলেধরা ধরেছে' কথাটা ইলেকট্রিক শকের মতো কাজ করল। কেতাদুরস্ত লোকটা মিনুর হাত ধরে ছুটতে যেতেই সন্তু ধরল অন্য হাতটা। একটুখানি টানাটানি। তারপর লঙ্কার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, ভিড় জমার আগেই লোকটি আর বিড়ি খাওয়ার দল উপে গেল। সে-যাত্রা মিনু বেঁচে গেল। মিনুর কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসতেই আর সঙ্গে সঙ্গে হল্লা শুরু হতেই পুলিশ এসে হাজির। ঘটনাটা মিনুর মুখে শুনে যা বোঝা গেল তা হচ্ছে এই—কেতাদুরস্ত লোকটি গেটের কাছেই ছিল। ছুটির ঘণ্টা পড়তেই একগাল হেসে বলল, "কী, চিনতে পারছ না? আমি প্রীতীশদা, মনে নেই?" মিনু লজ্জায় বলতে পারল না যে, সে চিনতে পারেনি। ফলে এই কেতাদুরস্ত লোকটা তাকে একটা চুয়িংগাম খেতে দিয়ে নিজে একটা খায়। তারপর মিনুর সব গুলিয়ে যেতে থাকে।

সেই ঘটনাকে ভিত্তি করে তৈরি হল 'রংরুট'। পিক্‌লু সবে যন্ত্রমানুষ তৈরি

ফরমুলাটা ধাতস্থ করেছে। বিজ্ঞান-বন্ধুকে এবার তার শ্রেষ্ঠ মডেল তৈরি করে দেবে ঠিক করেছে, এমন সময় এই গোয়েন্দাগিরির ক্লাব 'রংরুট' তৈরি হয়ে সব মাটি করে দিল। ছোটকা বললেন, "যখনকার যা। রংরুট হল সময়ের দাবি। ওটাকে বিজ্ঞান-বন্ধুর সহকারী সমিতি ভাবলেই তো হয়।"

"সন্তু, বাপ্পা, সানু, পাপু, রঞ্জু, কাজলি, মিনু, রেশমি, বাণ্টি প্রভৃতি ক্লাব-সভ্যরা রংরুটের কাজে এমন মেতে উঠল যে, দেখতে দেখতে এমন-কী ব্যাঙ্ক-ডাকাত ধরার প্ল্যানও করে ফেলল ওরা। কলকাতার বিরাট ম্যাপের ওপর, সুইচ টিপে আলো জ্বেলে জ্বেলে ছেলেধরার এলাকাগুলো 'ডেঞ্জার জোন' হিসেবে চিহ্নিত করা হল। গোঁফ দাড়ি থেকে, মেক-আপ-বক্স থেকে, 'ইন্টারকমে' কথা বলা পর্যন্ত কিছুই বাদ রইল না। ওদের আপিসঘর জমজমাট হয়ে উঠল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত এক মাসে একজন মাত্র ছেলেধরাকে ওরা ধরতে পেরেছিল। তা-ও দেখা গেল তিনি ছদ্মবেশী ছোটকা। ওদের পরীক্ষা করার জন্য গোঁফদাড়ি লাগিয়ে, চোখে আই-শ্যাডো দিয়ে এক কিম্ভূত সেজে গাছতলায় দাঁড়িয়ে সানুকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিলেন। দেখেই সানু ওদের সাংকেতিক আওয়াজ ছেড়ে লাফিয়ে ছোটকার পিছু নেয়। সানু ক্রিকেটখেলায় পাড়ার সেরা। ছোটকা পারবে কেন? ঝপাং করে ওরা ধরে ফেলল। কিন্তু বড্ড দুঃখু পেল সবাই। এত প্রস্তুতির এই ফল। এক ট্রান্সমিটার ছাড়া ওদের তো সবই আছে। ট্রান্সমিটারও রাখতে পারত। নেহাত পুলিশ অনুমতি দেবে না তাই।

পিক্‌লু আপিস-ঘরের মাথায় ওদের মটোটা মেরে দিয়েছিল— **'সবকিছুই সন্দেহের চোখে দেখবে।'** এই এক মাসের মধ্যে ওরা এই মটো মেনে এমন-কী ক্লাস টু-র অনির্বাণের বাবাকে পর্যন্ত ছেলেধরা সন্দেহে ধরে শেষে মার খেতে খেতে বেঁচে যায়। পিক্‌লু ওদের গবেষণা-বিভাগের অধিকর্তা। ওদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছে খুব উঁচুদরের। কিন্তু যোগাযোগের অভাবেই ওরা ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে। যে এলাকায় ছেলেধরার ঘটনা ঘটে, সেখানে ওরা থাকে না। খবর পেয়ে যেতে যেতে ছেলেধরা অন্য এলাকায় কাজ শুরু করে দেয়। এদের ধরার উপায় কী?

মিনুই একমাত্র সভ্য যাকে ছেলেধরা ধরেছিল। এবং সন্তুই একমাত্র সভ্য যে ছেলেধরাকে ছোঁয় এবং প্রায় ধরিয়ে দেয়। মিনুর অভিজ্ঞতার কথা ভেবে ওকে আপিসের কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু কাজলি আর রেশমি 'অপারেশন রংরুট'-এ আছে। এই স্কোয়াডের কাজ হল ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেধরা পাঁজাকোলা করে বামালসুদ্ধ নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। বাপি আর রঞ্জু ডাইভ দিয়ে লোক ধরায় বিশেষজ্ঞ। ছদ্মবেশ পরে ছেলেধরা ফলো করার কাজে শ্রেষ্ঠ হল বাণ্টি আর পাপু।

সেদিন খুব মেঘলা। টিপটিপ ঝিরঝির টপটপ ঝরঝর ঝুপঝাপ— কতরকমের আওয়াজ যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তৈরি করছিল! পিকলুর মেজাজও আকাশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো মেঘলা-মুডের ছিল। এই এক মাসের মধ্যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও কতটুকু কাজ করতে পেরেছে ওরা? 'অপারেশন রংরুট' ইতিমধ্যে অবিশ্যি ছেলেধরা না হোক, পকেটমার ধরেছে দু-দুটো। পকেট, হাত, যার পকেট, যার হাত সবসুদ্ধ ঝাঁপিয়ে জাপটে ধরেছিল স্কোয়াডের দুই বাঘা সভ্য কাজলি আর রেশমি। সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশী বাণ্টি আর পাপুর ধস্তাধস্তির মধ্যে একজনের পরচুল হারিয়ে যায়, অন্যের যায় নকল গোঁফটা পড়ে। বাপি আর রঞ্জু ডাইভ দিতে গিয়ে জখম হয়েছে বটে, কিন্তু দাঁত-টাত ভাঙেনি। আর এই অবস্থায় ছোটকা কী যে করছে—ভাবা যায় না। রাত জেগে একটা বই লিখছে। তার বিষয় হল 'ছেলেধরা বনাম কুচোকাচা'।

না, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। ইস্কুলের গেটের সামনে ওর আজ ডিউটি ছিল। আজ অন্য দিনের চাইতে আগে ছুটি হয়েছে।
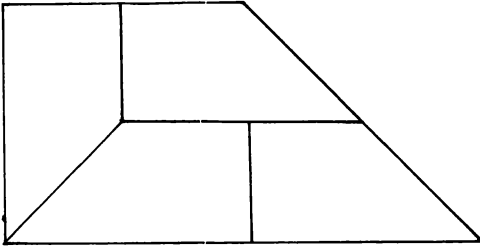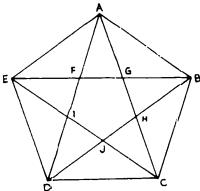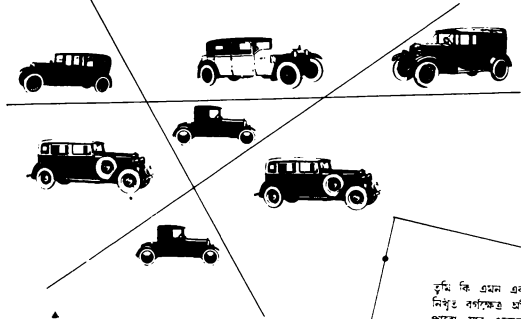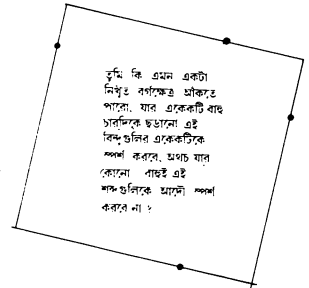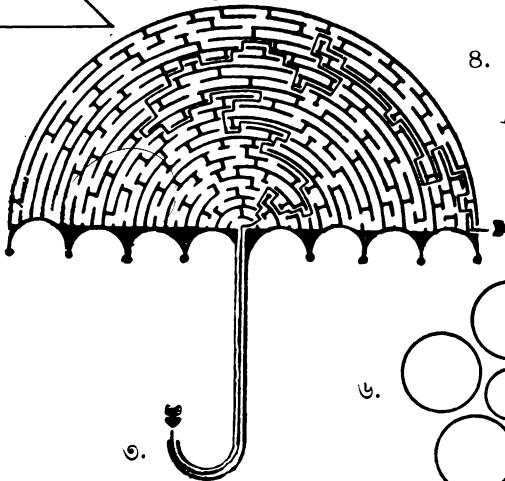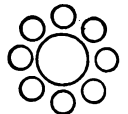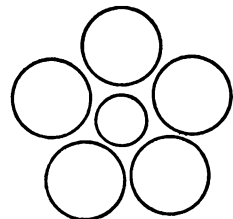
রংরুটের ওরা খানিকক্ষণ গেট ডিউটি দিয়ে খানিকটা ছড়িয়ে পড়েছে এদিক-সেদিক। ছোট্ট লেকের ধারে একটা ভিজে-ভিজে বেঞ্চির ওপর কাগজ পেতে বসে পিক্‌লু যেই বইগুলো পাশে রেখেছে, কে বলে উঠল, "বা, বা, এই বইগুলো চমৎকার তো! একটু দেখব?" চোখ তুলে পিক্‌লু দেখল তার পাশে বসে রোগামতো, চশমাপরা অল্পবয়সী এক ভদ্রলোক। পরনে শার্ট-প্যাণ্ট। হাতে একটা থলি। দু-একটা বই আর কাগজ উঁকি দিচ্ছে তার মধ্যে থেকে। কী থাকতে পারে ওতে?

"সব কিছুই সন্দেহের চোখে দেখবে"—নিজেরই লেখা স্লোগানটা পিক্‌লুর মনে পড়তে ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। আশ্চর্য হাসিটা তো! পিয়ানোতে বড়দির বাজানো কী একটা বিলিতি সুরের মতো আওয়াজ। কক্‌খনো এমন হাসির আওয়াজ পিক্‌লুর কানে বাজেনি। তার ওপর দাঁতগুলো শ্বেত-পাথরের মতো সাদা, দোক্তার দাগ-টাগ কিছু নেই। এবার অন্যভাবে হেসে ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম বুলবুল। তোমার নাম তো পিক্‌লু?"

"হ্যাঁ। কী করে জানলেন?"

"গোয়েন্দাগিরি কর আর এইটুকু জানো না? তোমার বইয়ের মলাটে নামটা লেখা রয়েছে। এখান থেকে পড়তে পারছি। একটু দেখব?" বলে বুলবুল নামধারী লোকটি পিক্‌লুর গবেষণার দুখানা বই আলতোভাবে টেনে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন।

একটু পরে চোখ তুলে বললেন, "এই সাধারণ জ্ঞানের বইটা তুমি পড়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তোমার সাধারণ জ্ঞান নিশ্চয় অসাধারণ।"

"তা বলতে পারব না। আপনি বরং 'গাছের জীবনের গভীরে' বইটা পড়ুন।"

"হ্যাঁ, আমার অনেকদিনের ইচ্ছে বইটা পড়ি। কখনও সুযোগ পাইনি। আজ দেখে এমন লোভ হচ্ছে। দেবে আমায় পড়তে? তোমার পাশে বসেই পড়ে নেব।"

পিক্‌লু অনায়াসে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। চেয়ে দেখলও না যে বেলা পড়ে আসছে, বর্ষার মেঘ পশ্চিম আকাশ ছেয়ে ডাকাতের দলের মতো রে-রে করে এগিয়ে আসছে। ও দেখছিল বুলবুলকে। মোটা চশমার নীচে বড় বড় চোখদুটো 'গাছের জীবনের গভীরে' ঢুকে গেছে। পিক্‌লু মুখ টিপে টিপে হাসল। ভাবল, পড়ো না বইটা, মজা বুঝবে। একটা ছোট্ট গাছও আর ছিড়তে পারবে না জীবনে। বুলবুলের বয়েস কত আর হবে? মেজদাদের বয়সী বড় জোর।

হঠাৎ হু-হু করে হাওয়া উঠল বকুল আর কৃষ্ণচূড়ার মাথার ওপর দিয়ে। সামনে লেকের জলে হাওয়া-কাটা ঝিরঝিরে ঢেউ। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। বই, কাগজ, ঝোলা-ব্যাগ সব ছিনিয়ে নিয়ে ওরা ছুটল স্টেডিয়ামের দিকে। ওখানে টানা বারান্দায় পৌঁছে দেখে বেশ ভিড়। গরম মুড়িওয়ালা, ফুচকাওয়ালা, সল্টেড বাদামওয়ালা—সব ভিজে সপসপে হয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ভিড় করেছে। বুলবুল এদিক-ওদিক তাকিয়ে মানিব্যাগটা বার করল। খুঁজেপেতে পঞ্চাশ পয়সা বেরুল। পিক্‌লুর দিকে চেয়ে বলল, "পঁচিশ পয়সা করে ঝালমুড়ি খাওয়া যাক।" পিক্‌লু নিজের পকেট হাতড়ে আরও পঞ্চাশ পয়সা বার করল। ফুচকা খেল দুজনে। বৃষ্টির জন্যে একটা করে ফাউ পেল ফুচকাওয়ালার কাছে। কোনোরকমে খেয়ে নিয়ে বুলবুল তার বই মেলে ভিজে মাটিতেই বসে পড়ল। তারপর অন্য রাজ্যে চলে গেল সে। পিক্‌লু ভাবল বৃষ্টি তো হচ্ছে। বাড়িতে নিশ্চয় ভাববে তার জন্যে আটকে গেছে ও। চ্যাটাল বারান্দার ভেতর দিকের দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে অনেকগুলো মুখ দেখতে পাচ্ছিল। নানারকমের মুখ। এর মধ্যে ছিনতাই, পকেটমার, ছেলেধরা কি আর দু-একটা নেই! বুলবুলের বইটা পড়া শেষ হলে ওকে ওদের ক্লাবের কথা বলবে। রংরুটে ....এই পর্যন্ত ভেবে পিক্‌লু হঠাৎ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। বারান্দায় আবছা আলোয় শেষবারের মতো দেখল, বুলবুল মুগ্ধ হয়ে বইটা পড়ছে।

হঠাৎ সাংঘাতিক চেঁচামিচির ধাক্কায় ঘুম ভাঙল। অপারেশন রংরুটের রেশমি আর কাজলি গুটিগুটি এগিয়ে এসে বুলবুলের হাত-পা বেঁধে ফেলল। বাপি পরচুল খুলে রঞ্জু গোঁফ পকেটে পুরে চেঁচিয়ে উঠল, "সন্তু! পিক্‌লুকে দ্যাখ, আমরা এর ব্যবস্থা করছি।" চারদিকের হৈচৈ বেড়ে উঠল। পিক্‌লু আচমকা জেগে উঠে দেখল ছোটকা, মেজদা, বাড়ির আরও কেউ কেউ এসেছেন। সঙ্গে পুলিশ অফিসার। কনস্টবল। এই মওকায় দু-চারটে মারকুটে লোক বুলবুলকে মারতে শুরু করে 'ছেলেধরা' রবটা তুলে দিল। পুলিশ অফিসার মারাটা বে-আইনি বলে আটকাতে যেতেই উনিও দু ঘা খেয়ে গেলেন। তখন কনস্টবল রুল তুলে ঘোরাতে লাগল। হ-য-ব-র-ল যা শুরু হল তা বলবার নয়। পিক্‌লুর যেন জ্ঞান ফিরে এল। চেঁচিয়ে উঠল, "ও ছেলেধরা নয় ছোটকা, ওকে মেরো না।" কিন্তু তখন রংরুটের ওরা (এমনকী মিনু পর্যন্ত এসেছে) এমন চেঁচিয়ে প্রমাণ দেখাতে লাগল যে ও ছেলেধরা, যে, বুলবুলকে বাঁচানো দায় হবে মনে হল। ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশ অফিসারের পকেটমার হয়ে গেল। উনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "হোয়্যার ইজ মাই মানি?" একজন রসিকতা করে বলল, "কোথায় আর যাবে, পকেটমারের পকেটে গেছে।" বলেই ভিড়ের মধ্যে সে মিলিয়ে গেল।

রেশমি আর কাজলি হতভম্ব হয়ে দৃশ্যটা দেখতে আরম্ভ করতেই ওদের বাঘিনীর মতো থাবা আলগা হয়ে গেল। বুলবুল খুব আস্তে আস্তে কারুর নজরে না পড়ে, এইভাবে কঠিন বাঁধনগুলো খুলে অদ্ভুত নতুন কায়দায় সরে সরে সরে সরে শেষে পিক্‌লুর কানের কাছে পৌঁছে বলল, "বইটা ফেরত পাবে।" বলে কাদামাখা অন্ধকারে সকলের চোখের আড়ালে চলে গেল। তখন পকেটমারেদের নেশা ধরে গেছে। কেননা, যেই পকেটে হাত দেয় সে-ই বলে 'এই সব্বনাশ—ফাঁকা করে নিয়ে গেল!'

বুলবুলের খোঁজ যখন হল তখন সে কোথায় কেউ জানে না। পিক্‌লু খুশি হয়ে বলল, "ছোটকা, তোমরা ভুল লোককে ধরেছিলে। ও ছেলেধরা নয়।" এ কথায় রঞ্জু, বাপি আর সন্তু দারুণ আপত্তি তুলল। ওরা নিজে চোখে যদি না দেখত কী ভাবে ফুচকা খাইয়ে পিক্‌লুকে ঘুম পাড়িয়ে দিল তাহলে আলাদা কথা ছিল। ওরা তখন থেকে চোখে চোখে রেখেছে। বুলবুলের ব্যাগটা পরীক্ষা করে দেখেছে। তাতে নানারকম যন্ত্রপাতি আর বই ছিল।

বাড়িতে খুব এক দফা হল। 'রংরুট যে একেবারে বে-রুটে চলে যাচ্ছ হে' বলে পিক্‌লুর ছোড়দারা ঠাট্টা করতে লাগল।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। বড়দি পিয়ানো বাজালেই পিক্‌লুর মনটা একটু খারাপ হয়ে যায়। বুলবুল হারিয়ে গেল ছেলেধরার বদনাম নিয়ে। কোনো ছেলেধরা কখনও ও-রকম করে হাসতে পারে? ও-রকম মন দিয়ে বই পড়তে পারে?

ছোটকা পিক্‌লুর মুডগুলো ভাল বোঝেন। একটা বুক-পোস্টের প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে বললেন, "তোমার বইটা বোধহয় সত্যিই ফেরত এল। যদি সত্যি হয়, বলব এমন বাঙালি বাঁচলে হয়।"

পিক্‌লু মোড়ক খুলে দেখল তার বইটা খুব যত্ন করে মলাট দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে বুলবুল। ভেতরে একটা চিঠি—

পিক্‌লু, আমাকে 'ছেলেধরা' না বলে 'বইধরা' নাম দিলেই ভাল হত। আমি একটি সাধারণ লোক। বয়েস পঁচিশ। ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার নেশা ছিল। কিন্তু আর্থিক অবস্থা খুব ভাল থেকে ক্রমে পড়ে গেলে যেমন একটা মাথা-ঘোরা ভাব হয় তেমনি হয়েছিল আমার। সব গুলিয়ে গিয়েছিল। শেষে একজন আমাকে মোটর গ্যারেজের কাজ শিখিয়ে একটা চাকরি ঠিক করে দেন। আমি তাই এখন মোটর-মেকানিক। আমার বাবা পূর্ব-বাংলায় চলে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। আমি যাইনি। আমার নাম বুলবুল চৌধুরী। জাতিতে মুসলমান। তোমাদের মতো ছেলেদের দেখলেই আমার ভীষণ মন কেমন করে। সেই হিসেবে আমি ছেলেধরা।—তোমাকে চিরদিন মনে থাকবে। তুমি অনেক বড় হবে পিক্‌লু।

তোমার গুণমুগ্ধ বুলবুল

ছবি : দেবাশিস দেব

পাখি

আলোক সরকার

সবুজ পাখি গলার কাছে কালো
বিকেল হবার একটুখানি আগে
উড়ে এসে বসল, কত ভাল
লক্ষ্মীছেলের মতন জানালায়—
বসেই থাকল, ছবি কোথায় লাগে

এমন শান্ত, কেবল আঁখি দুটো
একটু খুলছে বন্ধ হচ্ছে ফের।
কী দেখছে ও? আনবে কি খড়কুটো,
বাসা বাঁধবে কার্নিসের কোনায়?
সত্যি যদি ভাগ্য আমাদের

এমন হত! সবুজ পাখি এ কী
ডানা মেলে কোথায় যাচ্ছে উড়ে?
ওই ওখানে! একটু থেমেছে কি
অশথগাছের মাথায়? কত দ্রুত
হারিয়ে গেল দূরে অনেক দূরে!

একটু একটু ক'রে বিকেলবেলা
এবার নিল ঘন আঁধার রঙ।
দু-চোখে জল মলিন লাগে খেলা—
ভাবি কেন আমার ভালগুলো
হতে হতে হারায় এ-রকম!

ছবি : দেবাশিস দেব

টমি

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ফুটফুটে ছানা ছিল
একেবারে শান্ত,
সেই টমি এই হবে—
কারা আগে জানত?

পায়ে দুটো জুতো ছিল
নিয়ে গেছে গুঁতিয়ে,
পাজামায় টান মারে,
ছিঁড়ে দেয় ধুতি হে।

দুধ খায়, ভাত খায়,
বিস্কুট, মাংস,
ধমকিয়ে আমাদের
গলা হল কাংস।

ধাঁই করে লাফ দিয়ে
উঠে আসে চেয়ারে,
ল্যাজ তার বেড়ে গেছে
পত্নীর কেয়ারে।

চোর এলে চুপচাপ
শুয়ে থাকে ঘরে সে,
তফাত তো শিখল না
আপন ও পরে সে!

চালের জালার সাপ

হিমানীশ গোস্বামী

দাদামশায়কে বহুতবার বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর ঐ এক গোঁ—বাড়ি একেবারে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘর ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠে যাবেন না ! কিন্তু বাড়ি এ-রকম পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে যে-কোনো দিনই সেটা ভেঙে যে পড়বে সে-বিষয়ে কারুর সন্দেহই ছিল না। আর বাড়ি ভেঙে পড়লে দাদামশাই নিজেও যে খুব-একটা অক্ষত থাকবেন না—এমন-কী মারাও যেতে পারেন, সেটাও তাঁর জানা ছিল। বাড়িটার দশ-বারোখানা ঘরের উপরে এখন ছাত আর নেই বললেই চলে। ছাতের উপর বুনো গাছের জঙ্গলই হয়ে পড়েছে—দেয়ালগুলো ফেটে একেবারে চৌচির। সেগুলোকে আর দেয়াল বলে বলাই যায় না। প্রচুর লতা-পাতা শ্যাওলা ইত্যাদিতে ভাঙা দেওয়াল আচ্ছন্ন। আবার সেই সব ঘর ভর্তি ইঁট কড়ি বরগা সব স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। তার উপরও শ্যাওলা এবং গাছপালায় জবরজং হয়ে রয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে দাদামশায়ের ঘরটা মোটামুটি অক্ষতই আছে। যদিও ছাতের ধারা নেমে ঘরের মেঝে ভাসিয়ে দেয়।

দাদামশায়কে অনেক বলা হয়েছে, কিন্তু কেন সে-সব কথা তাঁর কানেই যায় না। ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানেন আর মৃদু-মৃদু হাসেন। সে হাসি তাঁর কাঁচাপাকা লম্বা দাড়ির জঙ্গল ভেদ করেও টের পাওয়া যায়। মামারা এবং বাড়ির অন্যান্যরা হাল ছেড়ে দিয়েছে অতঃপর। দাদামশায় মাঝে-মাঝে বলেন, আরে আমি যতদিন ঐ ঘরে থাকব ততদিন ঐ ঘর কিছুতেই ভেঙে গড়াব না। যে বাড়িতে মানুষজন থাকে সে বাড়ি কি কখনো ভেঙে পড়তে পারে ? ভিতুরা সব ছেড়ে চলে যাওয়াতেই তো ঐ সব ঘর-টর সব ভেঙে পড়েছে। আমি ঘর ছাড়িনি, তাই এ ঘরটার কিছু হয়নি ! অথচ এত কথা বলার পর তিনি নিজের মনেই বলেন—যদি ভেঙে পড়ে ? কিন্তু তবু তাঁর গোঁ ছাড়েন না।

কিছু আবার হয়নি ! ছাতের কথা তো আগেই বলেছি। দেয়ালে চুনকাম তো নেই-ই, এমন-কী পলস্তারা লাগানো ছিল কোন সেই আদ্যিকালে তাও আর প্রায় নেই। পুরনো আমলের চ্যাপটা ইঁট সব দেখা যায়—আর উইয়ের লাইনে লাইনে দেওয়াল প্রায় ভর্তি ! জানালা-দরজাগুলো অবশ্য মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু দরজা খোলা বা বন্ধ করার সময় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হয়। জানালা চারটের দুটো পুরো বন্ধ করা যায় না, তাই দরকার হলে শিকের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়।

ঘরের এক কোণে একটা খাট। দুটো জালায় চাল রাখা থাকে। আর খাটের মাথার দিকে লোহার একটা বিশাল সিন্দুক। তার মধ্যে যে কী আছে তা কেউ জানে না। দাদামশায়ও ঐ সিন্দুক যখন খোলেন তখন কেউ ধারেকাছে থাকে না। ঐ সিন্দুক নিয়ে অনেক কাহিনী আছে—কিন্তু আজ যে কাহিনী বলতে বসেছি তার সঙ্গে ঐ সিন্দুকের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই সিন্দুক-কাহিনী এখন তোলা রইল। আজকের কাহিনী হল দাদামশায়ের দারুণ এক অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপার নিয়ে। সে এক নাটকীয় কাহিনী।

দাদামশায় নতুন বাড়ি থেকে এক বর্ষার রাত্রে খেয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে যাবেন এমন সময় তাঁর হাতের লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলেন একটি লিকলিকে সাপ তাঁর ঘরের নর্দমা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। ঐ দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। বেশ ভয় হল তাঁর। এমনিতে দাদামশায়ের মতো সাহসী মানুষ কমই ছিল সে সময়। ভূতের ভয় একেবারেই ছিল না—কিন্তু তিনি জানতেন ভূত আছে, তবে তারা ক্ষতি-টতি করে না, অতএব তাদের ভয় পাওয়ার কী আছে, এরকম ছিল তাঁর মনোভাব ! ডাকাত, চোর, বাঘ—এসব নিয়েও তাঁর ভয় ছিল বলে জানা যায়নি। তবে হ্যাঁ, সাপ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল একদিকে যেমন প্রচণ্ড ভয়ের, অন্য দিকে ছিল তাঁর ঘৃণা ! সাপমাত্রেই শত্রু—এবং তাদের পেলে মেরে ফেলাই যে প্রশস্ত এবং সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এই ধারণা ছিল তাঁর বদ্ধমূল।

দাদামশায় যখন দেখলেন সাপটা তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছে তখন তিনি সাবধানে দরজাটা খুললেন। ঘরে ঢুকে তিনি দাঁড়িয়ে একবার দেখে নিলেন অবস্থাটা। সাপটিকে কোথাও দেখা গেল না। তিনি অবাক হলেন। এত তাড়াতাড়ি সাপটা বেরিয়েও যায়নি। তিনি ভাল করে এদিক-ওদিক তাকালেন। খাটের তলায় উঁকি মারলেন। বিছানার উপর রাখা বিরাট বৈদ্যুতিক টর্চটি জ্বাললেন। তন্নতন্ন করে চারদিক দেখলেন। কিন্তু সাপ কোথাও নেই।

দাদামশায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। বুঝতে পারলেন না কী করবেন। রাত তখন নটা। সকলেই জেগে রয়েছে। ডাকলেই বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়ে যাবে। কিন্তু সাপকে তো দেখা যাচ্ছে না কোথাও, লোকেরা এসে কী করবে ? একবার ভাবলেন, তিনি নতুন বাড়িতে গিয়ে রাত্তিরটা কাটাবেন। রাত্রে যদি বিষধর সাপটা এসে তাঁকে কামড়-টামড় বসিয়ে দেয় সে এক কেলেঙ্কারি হবে। অবশ্য সব সাপের বিষ থাকে না, এবং সব বিষধর সাপেরও বিষ সব সময় থাকে না এটা তিনি জানতেন, কিন্তু বিছানায় উঠে মশারির মধ্যে শুয়ে থাকলে সাপ তাঁকে কামড়াতে পারবে না এটা জেনেও তিনি আতঙ্কিত হলেন। আতঙ্কিত হলেন এটা ভেবে যে, একটা জলজ্যান্ত সাপ এই একটু আগে ঘরে ঢুকল, সেটা গেল কোথায় ? সেটা কি তাঁর বিছানার মধ্যেই কিংবা মশারির উপরে-টুপরে কোথাও লুকিয়ে-টুকিয়ে আছে ?

টর্চের আলো জ্বেলে তিনি ক্রমাগত খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু না, সাপ কোথাও নেই। তবে কি তিনি ভুল দেখলেন ? তাঁর মনে হল—তাই হবে। একটু বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে, ঘুমও পাচ্ছে—তাই ঘুমের ঘোরে লণ্ঠনের আলোয় গড়া কোনো ছায়া হয়তো দেখেছেন তিনি। তাই হবে—নইলে সাপটা কোথায় গেল ?

এই ভেবে তিনি ধীরে-ধীরে খাটের কাছে গেলেন। মশারি তুলে তার মধ্যে ঢুকে গেলেন। এবার কিছুটা নিরাপদ। সিন্দুকের উপর রাখা লণ্ঠনটাকে হাত বাড়িয়ে নিভিয়ে দিলেন। তারপর খাটের ঠিক মাঝখানটায় শুলেন, যাতে মশারির বাইরে থেকে ছোবল-টোবল দিতে না পারে সাপটা।

আর আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে যেই

একটু তাঁর তন্দ্রার মতো এসেছে অমনি আওয়াজ পেলেন খটখট ঠকঠক ! একেবারে ঘরের মধ্যেই এই আওয়াজ কেমন করে হল ? দাদামশায়ের ঘুম ছুটে গেল । তিনি উঠে বসলেন বিছানার উপর । আবার আওয়াজ হল খটখট ঠকঠক ! হুঁ ! এবারে বোঝা গেল । চালের জালার উপরকার সরাটা ঠকঠক করছে । বিদ্যুৎগতিতে দাদামশাই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা । সাপটা ঐ জালায় ঢুকেছে—এখন বোধ হয় বেরুনোর চেষ্টা করছে । জালার মধ্যে চাল খেতে ইঁদুর ঢোকে, আর ইঁদুর খেতে ঢোকে সাপ ! জালার উপরের সরাটা সরিয়ে সাপ ভেতরে ঢুকেছে—এখন বেরুতে পারছে না । হুঁ, ঠিক তাই ! দাদামশায় হুট করে উঠে জালার সরার উপর দুখানা ভারী বই চাপা দিয়ে একটা গামছা দিয়ে জালার মুখটাকে একেবারে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেন । জালার ভেতর থেকে তখন সরসর খসখস আওয়াজ আসছে । দাদামশায় হাসলেন । বাছাধনের আর বেরুতে হচ্ছে না । এখন আপনি ওখানেই থাকুন সাপমশাই, তারপর সকালে দেখা যাবে আপনাকে নিয়ে কী করা যায় । একথা বলে তিনি খাটে উঠে পড়লেন ।

সাপকে নিয়ে কী করা যায় এটা ভাবতে ভাবতে রাত দুটোর আগে দাদামশায়ের ঘুমই এল না ! তারপরও আধা-ঘুম আধা-জাগরণে ভোরের আলো ফুটতেই তিনি উঠে পড়লেন । কথাটা সকলকে বলা দরকার !

দাদামশায় সাপ মারবেন ! কথাটা প্রচার হয়ে গেল সর্বত্র ! গ্রামের লোকেদের কাজকর্ম বিশেষ থাকে না । সকাল থেকেই হাজার হাজার মানুষ এসে হাজির । শুধু দাদামশায়ের গ্রাম কালিকাপুরের লোক নয়—লোক এল সেই পাংশা, হাটগ্রাম, কালুখালি থেকেও ! কেউ কেউ শুনেছে দারুণ এক সাপ ধরেছেন দাদামশাই—সেটা নাকি কুড়ি হাত লম্বা । কেউ শুনেছে তালগাছের মতো মোটা সাপ । গুজব যে কীভাবে গ্রামে দাবানলের মতো ছুটে চলে তা এক দেখবার মতো ব্যাপার ! কেউ আবার শুনেছে সাপ নয়, কুমিরই হবে ! দাদামশায় সাপ মারবেন শুনে স্কুল-টুল সব বন্ধ হয়ে গেল ! এমন চমৎকার তামাশা ছেড়ে কে স্কুলে যায় ?

যাই হোক, লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে । দাদামশায় ভেবেছিলেন জালাটিকে মন্দিরের সামনেকার চত্বরে রেখে জালার মুখটাকে খুলে দেওয়া হবে, তারপর সাপটা বেরুলেই তাকে লাঠি মেরে শেষ করে দেওয়া হবে । এই ভেবে জনাপাঁচেক লোককে লাঠি হাতে প্রস্তুতও রেখেছিলেন । কিন্তু পরে তিনি ভাবলেন যদি সাপটা বেরিয়ে দ্রুত বেগে পালিয়ে যায় ? সেজন্য তিনি বন্দুকের সাহায্য নেবেন স্থির করলেন । তাঁর ঝকঝকে একনলা উইনচেস্টার বন্দুক বার করে পরিষ্কার করা হতে লাগল । মেজোমামার উপর ঐ কাজের ভার দেওয়া হল । যারা লাঠির সাহায্যে সাপ মারবে স্থির করেছিল তারা একটু মুখভার করল । বন্দুকের কাছে তাদের হেরে যেতে হচ্ছে । দাদামশায় অবশ্য তাদের বললেন, "উঁহু, বন্দুকে তো থাকবে মাত্র একটা গুলি, তাতে যদি সাপটা না মরে তাহলে তোমরা মারবে ।"

এত ভিড় হল যে মন্দিরের সামনে সাপ মারা যাবে না সাব্যস্ত হল । আরও বড় জায়গা দরকার । ঠিক হল চন্দনা নদীর ধারে বেশ খোলা জায়গা রয়েছে অনেকখানি, সেখানেই সাপের ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে । দশজন লোক পুরনো পালকির মধ্যে জালাটাকে ভরে নিয়ে চলল নদীর ধারে । কারা যেন বলে উঠল, বল হরি !!

নদীর ধারে একটা উঁচু জায়গায় জালাটাকে বসানো হল । বহু লোক জায়গাটাকে ঘিরে বসে পড়ল । জালাটার ভেতর থেকে আওয়াজ আসছে—খসখস ! বন্দুক নিয়ে দাদামশায় বাড়ি থেকে বেরুলেন । সঙ্গে লোকজনেরা চলল । এরকম একটা ঘটনা পাড়াগাঁয়ে সচরাচর ঘটে না তো ! সেই কবে একটা বাঘ এসেছিল, কবে চোর এসেছিল—লোকেরা সেই সব গল্প করেই সময় কাটায় । গ্রামের লোকেরা তাই উৎসাহে একেবারে যেন টগবগ করে ফুটছে !

দাদামশায় বীরদর্পে হেঁটে চললেন । হাতে ঝকঝক করছে বন্দুক । ছোটমামা একটা থলেতে করে নিয়েছে গোটাকয়েক গুলি । একটা গুলি তো বন্দুকে ভরাই রয়েছে ।

দাদামশায় নদীর ধারে পৌঁছুলেন যখন তখন হাজার দু-তিন লোক জড়ো হয়েছে । ভিড়—দাদামশায়কে অবশ্য সবাই পথ করে দিল । দাদামশায় জালার কাছে গিয়ে দু'মিনিট কী সব চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "উঁহু !"

"উঁহু মানে ?"

"যদি পালায় ?"

"যদি কে পালায় ?"

"কেন, সাপ ?"

তারপরই তলব পড়ল বড়মামার । "উপেন, উপেন কোথায় ?"

বড়মামাকে নিয়ে আসা হল সামনে ।

দাদামশায় বললেন, "এই কথাটা কেন মনে পড়েনি তোদের, অ্যাঁ ?"

বড়মামা নীরব । কোন্ কথা তাঁদের মনে পড়া উচিত ছিল ভাবতে লাগলেন । বললেন, "কোন্ কথা ?"

দাদামশায় হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "কেন, কার্বলিক অ্যাসিড !"

"কার্বলিক অ্যাসিড !" বড়মামা আমতা-আমতা করতে লাগলেন ।

"সাপের যম হচ্ছে কার্বলিক অ্যাসিড । কড়া কার্বলিক অ্যাসিড আন দেখি এক বোতল তোর ডিসপেনসারি থেকে । সঙ্গে তুলো আর কর্কও দরকার ।"

বড়মামা চললেন তাঁর ডিসপেনসারিতে । সেখান থেকে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড আর এক প্যাকেট তুলো আর কর্ক আনলেন । মনে-মনে ভাবতে লাগলেন, তুলো আর কর্ক দিয়ে হবেটা কী ?

একটু পরই সেটা বোঝা গেল । দাদামশায় কার্বলিক অ্যাসিড ঢাললেন ধীরে, অতি সন্তর্পণে বন্দুকের নলের মধ্যে তারপর তার মধ্যে তুলো দিয়ে মুখ বন্ধ করলেন । এবার একটা বেশ আঁটসাঁট কর্ক দিয়ে বন্দুকের নলের মুখটা বন্ধ করে দিলেন ।

এবার সাপ যাবে কোথায় ?

খুব সূক্ষ্মভাবে ধীরে ধীরে জালার উপরের দিকে একটা ছ্যাঁদা করা হল । এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ছ্যাঁদার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন বন্দুকের নল ।

হাজার হাজার লোকের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, প্রতীক্ষা প্রায় শেষ ।

দাদামশায় সেই ছ্যাঁদার মধ্যে বন্দুকের নল ঢুকিয়ে সাপের উদ্দেশে নানারকম আইনের কথা বলতে লাগলেন । বলতে লাগলেন, "তুই সাপ, মানুষের শত্রু । তোর বিষে হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরেছে, অতএব তোর মৃত্যুদণ্ড হয়েছে—এবারে তা কার্যকর করা হবে ।" তারপর বললেন, "ওয়ান-টু-থ্রি !"

গুড়ুম ! ক্র্যাটাশ !! ফস !!!

সাংঘাতিক ব্যাপার—জালা ফেটে চৌচির—একটা নিরীহ গোছের রোগা ভীত সন্ত্রস্ত সাপ, হাত দুয়েক লম্বা হবে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এঁকে-বেঁকে মাঠেরই একটা গর্তে ঢুকে গেল । পাঁচ-পাঁচ জন লোক লাঠি নিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল । তাছাড়া তারা ভেবেছিল বিশাল সাপ হবে—কিন্তু ঐটুকু সাপ দেখে তারা তাকে মারবার কথাই ভুলে গেল । দাদামশায়ও আদেশ-টাদেশ দিলেন না কিছু । আদেশ দেবেন কেমন করে ? তাঁর চোখ তখন কপালে উঠেছে । বন্দুকটা ফেটে চৌচির হয়েছে । কার্বলিক অ্যাসিডে চারিদিক ভরে গেছে । তার একটা গন্ধ চারিদিকে আমোদিত করছে । হাজার হাজার লোক বিস্মিত, এবং নীরব । কিছুটা হতাশার দীর্ঘ-নিশ্বাসও যেন শোনা গেল ।

না, দাদামশায়ের এবং অন্য অনেকেরই ভাগ্য ভাল । বন্দুক ফেটেছে কিন্তু তাতে কারুর ক্ষতি হয়নি । কার্বলিক অ্যাসিডও কারুর গায়ে লাগেনি । লোকেরা অবশ্য খুবই হতাশ, তারা ভেবেছিল মজা আরও কিছু জমবে, কিন্তু তা জমল না । আর সাপটারও ভাগ্য ভালই বলতে হবে । সে যে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে রইল তা আর জানা গেল না । কেউ খেয়ালও করল না বিশেষ । কেবল দাদামশায় চিৎকার করে সাপের উদ্দেশে বললেন, "যা, এবারকার মতো তোকে মাপ করে দিলাম !"

তারপর দাদামশায় ভাঙা বন্দুক এবং মন নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন । অত লোকজন সব কর্পূরের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল দু' মিনিটেই ।

ছবি : দেবাশিস দেব

ব্যাপারটা কী ? অজেয় রায়

আনন্দবাবুর আত্মীয়বন্ধুরা তাঁর জন্য বেজায় ভাবিত। বাড়ি সারানো হয়ে গেছে তিন মাস। কিন্তু আনন্দবাবু এখনও কাউকে নেমন্তন্ন করছেন না কেন ? কেউ গায়ে পড়ে যেতে চাইলেও আটকাচ্ছেন—"এখন নয়। অসুবিধা আছে। পরে জানাব।"—এমনি নানান ছুতো। ব্যাপারটা কী ?

গোড়ার কথা একটু বলি।

চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আনন্দবাবু একটা বাড়ি কিনে ফেললেন। বাড়িটা কলকাতার কাছেই। গঙ্গার ধারে। জায়গাটা আধা শহর বলা যায়।

আনন্দবাবু বিয়ে-থা করেননি। মহা আমুদে লোক। চাকরির খাতিরে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়েছেন। মাঝে-মাঝে দু-চার দিনের জন্য কলকাতা এসেছেন। সে কটা দিন আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে হৈচৈ করে কাটিয়েছেন।

আনন্দবাবু বললেন, "সবাই পালা করে আমার ওখানে যাবে। মাসে অন্তত একজন। আর ছ' মাস অন্তর একটা করে মহা সম্মেলন। সব গিয়ে একসঙ্গে জুটবে। খাসা বাড়ি। একেবারে গঙ্গার ওপরে। কী বাতাস ! বাড়ির ঘাট সোজা নেমে গেছে নদীতে। চুটিয়ে চান করো, সাঁতার কাটো। ঘাটে বসে চা খাওয়া। ইলেকট্রিসিটিও আছে। ওপরে নীচে পাঁচখানা শোবার ঘর। ফার্স্টক্লাস। আমিও আসব কলকাতায়। যখন খুশি। শ্যামবাজার থেকে বাসে মোটে সওয়া ঘণ্টার পথ। মাছ ধরার শখটা ওখানে মিটলেও মাঝে-মাঝে তো আসতেই হবে এখানে দু-চার চাল দাবা লড়তে।"

আনন্দবাবুর সম্পর্কে নাতি-নাতনি মণ্টু, বাবলু, বাচ্চু, বুলা, কেল্টুরা একদিন দল বেঁধে গেল ছোটদাদুর নতুন কেনা বাড়ি দেখতে। বাড়ি দেখে তারা থ। দোতলা বাড়ি, অনেকখানি কম্পাউণ্ড পাঁচিল ঘেরা, একেবারে গঙ্গার ওপরে, অনেক গাছপালা—সব ঠিক। কিন্তু বাড়িটা বড্ড পুরনো। দেয়ালের আস্তর খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে প্রচুর জায়গায়। উঠোন ও বাগান ভর্তি ঝোপঝাড়। চওড়া ঘাট ধাপে ধাপে নেমেছে বটে কিন্তু কত জায়গায় যে ভাঙাচোরা বাড়িময় চামচিকে আর পায়রার রাজত্ব।

"বাবা, কী রকম যেন পোড়ো বাড়ি," বলল বুলা, "একা একা থাকবে কী করে ?"

আনন্দবাবু বললেন, "আরে সেই জন্যেই তো এত শস্তায় পেলাম। একটু সারিয়ে-সুরিয়ে নিই, তারপর দেখবি চেহারাখানা। এসব পুরনোকালের বাড়ির কাঠামো ভারী মজবুত।"

প্রথমে বাড়িখানা যতটা খারাপ লেগেছিল, ঘুরে-ফিরে দেখে মণ্টু বাবলুদের আর তত অপছন্দ রইল না। খুব খোলামেলা। সামনে কী চমৎকার নদী বইছে। গরমের দিনেও সব সময় ফুরফুরে গা-জুড়নো হাওয়া। সারিয়ে নিয়ে সাফসুফ করলে দিব্যি দাঁড়াবে।

বিকেলে মণ্টুরা ফিরে গেল কলকাতায়। মাত্র একখানা ঘর পরিষ্কার করে বাস করার মতো হয়েছে। আনন্দবাবু সেটায় থাকছেন আপাতত। তাঁর কাজের লোক গোবিন্দ আছে কোনওরকমে মাথা গুঁজে। এবার মিস্ত্রিমজুর লাগবে। আশা করা যায় মাস দুয়েকের মধ্যেই বাড়িটা ভদ্রগোছের হয়ে উঠবে।

এরপর পাঁচ মাস কেটে গেছে। আনন্দবাবু কাউকে তাঁর বাড়িতে আনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। অতি অস্বাভাবিক কাণ্ড। কাজেই লোকের ভাবনা হওয়ারই কথা। ইতিমধ্যে আনন্দবাবু কলকাতায় এসেছেন মাত্র তিন বার। আগের মতনই হৈ-চৈ করেছেন। তবে একবারও রাত কাটাননি। সকালে এসে বিকেলের মধ্যে ফিরে গেছেন তাঁর গঙ্গার ধারের আস্তানায়। আর কেউ তাঁর বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কথা তুললেই কেমন গুটিয়ে গেছেন। কথাটা এড়িয়েছেন।

একদিন ভাইপো তিনকড়ি খবর না-দিয়ে হাজির হয়েছিল আনন্দবাবুর বাড়িতে বৌ-বাচ্চা সমেত। তিনকড়ি ফিরে এসে বলল, "যেই শুনলেন আমার রাতে থাকার প্ল্যান, অমনি ছোটকাকুর মুখ গোমড়া হয়ে গেল। দিনে অবশ্য বেশ গল্পগুজব করলেন। নদীতে চান। মাছ ধরতে ছিপ ফেলা। দুপুরে মাংস, ছোলার ডাল, দই চাটনি, রাজভোগ দিয়ে তোফা খ্যাঁট—কোনও গলতি নেই। কিন্তু রাত সাড়ে সাতটা বাজতে না বাজতে বললেন, 'এবার আমি খেয়ে নেব। তোরা না হয় পরে খাস।'

"খেয়ে দেয়ে ছোটকাকু সটান নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিলেন। বলে গেলেন, 'একটু কাজ আছে।' কী আর করি ? আমরাও একটু বাদে খেয়ে নিলাম। খানিক ঘাটে বসে থেকে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ছোটকাকু না থাকলে কি জমে ?"

নাঃ, আর দেরি নয়। এ-রহস্যের কিনারা করতেই হয়। মণ্টু বাবলু বাচ্চু বুলা কেল্টু এক সকালে দুম্ করে চড়াও হল আনন্দবাবুর বাড়ি।

"কী রে, তোরা যে হঠাৎ ?" আনন্দবাবু যেন বিব্রত।

"চলে এলাম। কলেজে দু-দিন ছুটি পড়েছে।"

"ও।" আনন্দবাবুর মুখ থমথমে।

ওসবে পরোয়া নেই মণ্টুদের। তারা হুল্লোড়ে বাড়ি মাতিয়ে তুলল। তাইতে আনন্দবাবুরও মুড এসে গেল। তিনিও ওদের সঙ্গে মেতে উঠলেন।

কিন্তু মণ্টুরা দেখল, সন্ধে হতে না হতেই ছোটদাদু কেমন ছটফট করছেন। গল্পগুজবে আর তেমন উৎসাহ নেই। সাড়ে সাতটা বাজতেই বললেন, "এবার আমি খাব। তোরা না হয় পরে খাস।"

খাওয়ার শেষেই আনন্দবাবু নিজের ঘরে ঢুকলেন। নাতি-নাতনিদের বলে গেলেন, "আমায় কেউ ডিসটার্ব করবিনে।"

মণ্টু বাবলুরা বাইরে গঙ্গার ঘাটে বসে নজর করে দেখল, দোতলায় ছোটদাদুর ঘরের আলো আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক জ্বলল। ঘুলঘুলি দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। সব কটা দরজা-জানলা বন্ধ। গরমের দিনে এমন ঘর বন্ধ করে উনি কী করছেন ? লেখাপড়া ? কী নিয়ে ? এত লুকোচুরির কী আছে ?

কন্‌ফারেন্স্ বসল। বাবলু বলল, "নেশা-টেশা করেন না তো ?"

আনন্দবাবু যৌবনে রীতিমত বাউণ্ডুলে ছিলেন। যথেষ্ট নেশা-ভাঙও করেছেন। তবে এখন সে-সব নেই। অন্তত তাই জানে লোকে। শেষে কি নতুন করে ওইরকম কোনও অভ্যেস ধরলেন ?

বুলা বলল, "সাধনা-ফাধনা, মানে যোগ-টোগ কিছু নয় তো ? শুনেছি সে-সবও ট্রাই করেছিলেন ইয়াং-ডেজে।"

হতে পারে। কোনওটাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গোবিন্দকে জেরা করে বিশেষ সুরাহা হল না। লোকটির বয়স হয়েছে। নেহাত গোবেচারা। আনন্দবাবু তাড়াতাড়ি খাওয়া সারতে ওর সুবিধেই হয়েছে। ও নিজেও চটপট খেয়ে-দেয়ে ঘুম মারে। নীচের তলায় কোণের দিকে একটা ঘরে শোয়। অতিথি কেউ না থাকলে আনন্দবাবু নাকি রাতে খাওয়ার পর অল্পক্ষণ ঘাটে বসে থাকেন। তারপর নিজের হাতে সদর দরজা বন্ধ করে ওপরে চলে যান। হুকুম আছে—বাবু না ডাকলে গোবিন্দ যেন রাতে দোতলায় না যায়।

মণ্টুরা গোবিন্দকে প্রশ্ন করল, "রাতে এত সকাল-সকাল খাচ্ছেন কদ্দিন ?"

"এই মাস-তিন হল।"

"সন্ধেবেলা কী করতেন তখন ?"

"প্রায়ই বেড়াতে যেতেন এপাড়া ওপাড়া। কোনও কোনও দিন ঘরে বসে বই পড়তেন। এখানে অনেকের সঙ্গেই চেনা হয়ে গেছে।"

বাবু কোনও নেশা ধরেছেন কি না, বলি-বলি করেও ঠিক জিজ্ঞেস করা গেল না গোবিন্দকে। তবে বুলা জানতে চাইল, "বাবু এখানে মেশেন কার-কার সঙ্গে জানো ? কোনও সাধু-টাধু ?"

"সাধু ? হাঁ, একজনের কাছে যান বটে। তিনিও একবার এয়েছেন। আশ্রম আছে ওপাড়ায়।"

"কেমন সাধু দেখেছ ?"

"হাঁ। ভারী জব্বর সাধু।" গোবিন্দ চোখ বড় বড় করে।

আনন্দবাবুর নাতি-নাতনিরা ঠিক করল, আজ রাতেই তারা এ রহস্য ভেদ করবে। দাদু নির্ঘাত কিছুর বা কারও খপ্পরে পড়েছেন। কোনও নেশা-টেশা বা কোনও লোকের। এখুনি উদ্ধার না করতে পারলে ফল মারাত্মক হতে পারে।

বিকেলে মণ্টুরা জায়গাটা টহল দিতে বেরোল।

পুরনো জায়গা। বড় বড় দালান-বাড়ি কিছু আছে। কিন্তু তাদের হাড়পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছে। আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা। মস্ত মস্ত গাছ। কোনও কোনও বাড়ির সঙ্গে বাগান। আম জাম লিচু জামরুল ইত্যাদি ফলের গাছের তলায় বুনো ঝোপ। বোঝা যায় যত্ন হয় না। এক সময় এ জায়গার বেশ শ্রী ছিল। এখন পড়তি অবস্থা।

কোনও কোনও বাড়ির বাইরে রোয়াকে আড্ডা হচ্ছে। কোথাও বুড়োর দল। কোনওটা ছোকরাদের দখলে। সবাই এই নতুন আগন্তুকদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে।

এক জায়গায় তারা থমকে দাঁড়াল। উঁচু চওড়া রোয়াক। পিছনে লম্বা একখানা ঘর। ঘরের ভিতর দুটো বোর্ডে কিছু ছেলে ক্যারাম খেলছে। এক ধারে বসে দুটি বয়স্ক লোক খেলছে দাবা। তাদের ঘিরে তিনজন লোক মহা আগ্রহে দেখছে। ঘরে পাশাপাশি কয়েকটা কাঁচের পাল্লা লাগানো আলমারি। তাতে ঠাসা বই। ঘরের বাইরে সাইনবোর্ড ঝুলছে—বান্ধব সমিতি।

রোয়াকে চেয়ার পেতে বসে ছিলেন এক ভদ্রলোক। বছর তিরিশ বয়স। পরনে ধুতি-শার্ট। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আসুন ভিতরে। এটা আমাদের ক্লাব।"

খানিকটা কৌতূহলে, খানিক সময় কাটাতে মণ্টুরা রোয়াকে উঠল।

"আমি অবিনাশ পোদ্দার। এখন সেক্রেটারি," ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন. "আপনারা ?"

"বেড়াতে এসেছি," জানাল বাবলু, "আনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়কে চেনেন ? এখানে বাড়ি কিনেছেন। আমরা তাঁর আত্মীয়।"

"বিলক্ষণ চিনি। আনন্দবাবু তো আমাদের ক্লাবের মেম্বর হয়েছেন। আগে প্রায়ই আসতেন। দাবা খেলতেন। বই নিতেন। কয়েক মাস আর আসছেন না। অবশ্য চাঁদাটা ঠিকমতো পাঠিয়ে দেন। আনন্দবাবুর শরীর ভাল ?"

"হ্যাঁ, ভালই আছেন।" দায়সারা জবাব দেয় বাবলু।

সেক্রেটারি ঘুরে ঘুরে দেখালেন—"এই আমাদের লাইব্রেরি। তিন হাজারের ওপর বই আছে। দাবা ক্যারাম তাস চলে। পিছনে একসারসাইজের জায়গা। ওই যে। বছরে একবার থিয়েটার হয় ক্লাব থেকে, পুজোর সময়। ক্লাব বিকেলে খোলে। গরমের সময় পাঁচটা থেকে রাত ন'টা অবধি।"

আলমারির মাথায় অনেকগুলো নানান সাইজের কাপ শীল্ড। সেক্রেটারি সগর্বে দেখান—"এগুলো ক্লাবের মেম্বাররা উইন করেছে। দাবা, ফুটবল, বডি-বিলডিং, থিয়েটার কম্পিটিশন, সব কিছুরই প্রাইজ আছে। আমাদের অনেক দিনের ক্লাব। চল্লিশ বছরের বেশি হল।"

দেয়ালে ঝুলছে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো নানাজনের বড় বড় ফোটোগ্রাফ। সেক্রেটারি দেখালেন, "এঁরা সব আমাদের ক্লাবের পেট্রন। মানী-গুণী মানুষ।"

এক বিশালদেহীর ছবি দেখিয়ে সেক্রেটারি বললেন, "ইনি হচ্ছেন গোরাবাবু। এই ক্লাবের একজন প্রতিষ্ঠাতা। বিখ্যাত কুস্তিগির ছিলেন। একসারসাইজের ব্যবস্থা উনিই প্রথম করেন।"

পাশের ছবি—বৃদ্ধ। ধবধবে সাদা লম্বা চুল-দাড়ি। সৌম্য চেহারা।

ছবিটি দেখিয়ে সেক্রেটারি বললেন, "ইনি হচ্ছেন ব্রজকিশোর গোস্বামী। মস্ত দাতা। সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। দারুণ দাবা খেলতেন। এই ক্লাবের ঘর বাড়ি সব ওঁর দান। গোরাবাবু আর ব্রজবাবু মিলে এই ক্লাবের পত্তন করেন।"

একটু আড়ালে এসে সেক্রেটারি হঠাৎ নিচু সুরে বললেন, "একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। আনন্দবাবু অতি সজ্জন ব্যক্তি, কিন্তু ভোলাবাবার কাছে যাতায়াত করছেন শুনলাম। একটু সাবধান করে দেবেন। গুরুজিটি সুবিধের নয়।"

"কেন ?"

"ভান করেন বটে মস্ত সাধক। তবে ...থাক, সে অনেক ব্যাপার আছে। ওঁর সংস্পর্শ ত্যাগ করাই ভাল। আমরা এপাড়ার লোক ওঁকে পছন্দ করি না। আনন্দবাবু নতুন লোক, তাই সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য মনে করি। আপনারা তো আত্মীয়। বলবেন

বুঝিয়ে।”

বান্ধব সমিতি থেকে বাড়ি ফিরল মণ্টুরা। আনন্দবাবু রাত সাড়ে সাতটায় যথারীতি খেতে বসলেন। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিলেন।

মণ্টুরা চুপিচুপি উঠে এল দোতলায়। আনন্দবাবুর ঘরে আলো জ্বলছে। দরজার নীচ দিয়ে বোঝা যায়। তারা কান পাতল দরজায়। মাঝে মাঝে অদ্ভুত ধরনের খুটখাট আওয়াজ। আর কোনও শব্দ নেই।

দোতলায় দুটো শোবার ঘর। ঘর দুটোর সামনে দিয়ে ভিতরে টানা বারান্দা। আর বাইরের দিকে, যে-পাশে গঙ্গা, দুটো ঘরেরই কোণের দিকে গোল ছোট্ট বারান্দা রয়েছে। কেবল ঘর দিয়েই গোল বারান্দায় যাওয়া যায়।

ভিতরের বারান্দা থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখা গেল আনন্দবাবুর ঘরের গোল বারান্দার কাছের জানলাটা একটুখানি ফাঁক। আলো দেখা যাচ্ছে ফাঁক দিয়ে। কিন্তু ওখানে পৌঁছনো যায় কী ভাবে? আলসে দিয়ে দেয়াল ধরে ধরে যেতে হবে। ভীষণ বিপজ্জনক কাজ। যদি আলসে ভাঙে, সটান আছড়ে পড়বে পঁচিশ হাত নীচে কঠিন জমিতে। এছাড়া আর কোনও ফাঁক-ফোকর চোখে পড়ল না যেখান দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দেওয়া যায়।

মণ্টু বেজায় ডানপিটে। বলল, “আমি যাব। ওই আলসে দিয়ে। বেশ চওড়া আলসে।”

শিউরে উঠল কেল্টু, “না রে, যদি ভেঙে পড়ে। পুরনো বাড়ি।”

মণ্টু বারণ শুনল না। রেলিং টপকে নেমে আলসে দিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল। আট-দশ পা পেরিয়েই বৃষ্টির জল নামার নল। সেইটে আঁকড়ে ধরে জানলায় উঁকি মারল মণ্টু। মিনিট খানেক দেখে সে ফিরে আসতে লাগল।

“কী দেখলি? কী ব্যাপার?” সবাই উদ্‌গ্রীব।

“একটা সন্ন্যাসী। গেরুয়া পরা। খাড়া হয়ে বসে আছে মেঝেতে। ঠিক তার সামনে বসে ছোটদাদু। অমনি বাবু হয়ে বসে। মাথা নামিয়ে রয়েছে। কেউ নড়ছে না।”

“সন্ন্যাসীর মুখ দেখতে পেলি?” বলল বুলা।

“না। আমার দিকে পিঠ ফিরে ছিল।”

“নির্ঘাত ভোলাবাবা। তন্ত্র সাধনা করছে। ও ঢুকল কী ভাবে?”

“হয়তো খিড়কির সিঁড়ি দিয়ে। দাদু দরজা খুলে দিয়েছেন।”

একতলার খিড়কির দরজার মুখ থেকে একটা দেয়াল মোড়া সরু ঘোরানো সিঁড়ি উঠে এসেছে দোতলার বারান্দার কোণে। এর নীচের দরজা বন্ধ থাকে। আগেকার দিনে মেয়েরা নাকি অনেক সময় অচেনা লোকের সামনে দিয়ে সদর পথে বাড়িতে না ঢুকে এই সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে আসত।

“হাওয়ায় ভেসেও আসতে পারে। তান্ত্রিকরা অনেক কিছু পারে শুনেছি।” বুলার মন্তব্য।

যা হোক, ব্যাপারটা ফাঁস করতে হবে। মণ্টু বলল, “আমি ফের জানালায় যাচ্ছি। ইশারা করলেই তোরা দরজায় ধাক্কা দিয়ে দাদুকে ডাকবি। দেখতে চাই তখন লোকটা কী করে। কে লোকটা?”

মণ্টুর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র বাকিরা দরজায় গুমগুম করে কিল মেরে চিৎকার জুড়ল, “ছোটদাদু। ও ছোটদাদু।”

“কে? কী চাই?” আনন্দবাবুর হুংকার শোনা গেল।

“ভীষণ দরকার। একবার দরজাটা খোলো।” সঙ্গে-সঙ্গে ফের ধাক্কা।

একটু বাদেই খিল খোলার আওয়াজ। কপাট খুলে দরজায় দাঁড়ালেন আনন্দবাবু। মুখে দারুণ বিরক্তি। জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার?”

ছোটদাদুর পাশ দিয়ে ঘরে উঁকি দিল বাচ্চু। ঘর ফাঁকা। মেঝেতে শতরঞ্চি পাতা। তার ওপর দাবার বোর্ড আর গুটি সাজানো।

“সে কই?” বাচ্চু হতভম্ব।

“কে?”

“সেই সন্ন্যাসী।”

“কী বাজে বকছিস? ঘরে আর কেউ নেই।”

নিশ্চয়ই লুকিয়েছে কোথাও। বাচ্চু জোর-গলায় বলল, “ছিল একটু আগেই। মণ্টু দেখেছে।”

“কই মণ্টু?”

“মণ্টু মণ্টু!” মণ্টুর সঙ্গীরা বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে ডাক দেয়।

মণ্টু তখন জলের পাইপ জড়িয়ে আলসেতে দাঁড়িয়ে। বোধহয় ফিরতে ভয় পাচ্ছে। একটু-একটু করে সে আবার বারান্দায় ফিরল। বেজায় হাঁপাচ্ছে।

“তুই জানলা দিয়ে উঁকি দিয়েছিলি?” কঠোর চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন আনন্দবাবু।

“হ্যাঁ।” মণ্টু মাথা নাড়ে।

“ঘরে যে ছিল, তার মুখ দেখেছিস?”

“হ্যাঁ। দরজায় শব্দ হতে যেই ঘাড় ফেরাল, তখন—” ভয়ে মণ্টুর গলা দিয়ে যেন স্বর বেরচ্ছে না।

“চিনতে পেরেছিস কে?”

“হুঁ। ব্রজকিশোর গোস্বামী। বান্ধব ক্লাবে ছবি দেখেছি।”

“ব্যাস, হয়ে গেল,” কাতরে উঠলেন আনন্দবাবু, “আর আসবেন না। তিন মাস ধরে খেলছি, একদিনও জিততে পারিনি। আজ প্রায় মাত করে এনেছিলুম। দিলি সব ভণ্ডুল করে। হতভাগা।”

দড়াম্ করে মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিলেন ছোটদাদু।

ছবি: দেবাশিস দেব
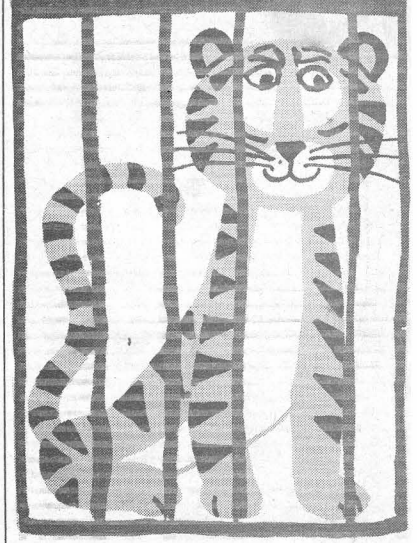
চিড়িয়াখানায়

পবিত্র সরকার

দাদা রে, দাদা রে, দাদা!
ঘাড়ের ওপরে হাঁকড়ে উঠেছে গাধা।
ধড়ফড় করে খুকিটা জুড়ল কাঁদা!
দাদা রে, দাদা রে, দাদা!

মামা রে, মামা রে, মামা!
শুকনো ডাঙায় কুমিরে দিচ্ছে হামা।
এক্ষুনি তোরা ওকে ঠেলে জলে নামা।
মামা রে, মামা রে, মামা!

বাবা রে, বাবা রে, বাবা!
খাঁচার সামনে ব্যাঘ্রে তুলেছে থাবা।
তোমরা এখন কে তার সামনে যাবা।
বাবা রে, বাবা রে, বাবা!

মাসি গো, মাসি গো, মাসি!
কোন্‌দিকে যেন হায়েনার শুনি হাসি।
চিড়িয়াখানায় আর কি কখনো আসি!
মাসি গো, মাসি গো, মাসি!

কাকা রে, কাকা রে, কাকা!
রেস্তোরাঁটায় চেয়ার পেয়েছি ফাঁকা।
চাইনিজ খাব দাও পঞ্চাশ টাকা।
কাকা রে, কাকা রে, কাকা!
চিড়িয়াখানায় পশুপাখি কেন রাখা!

ছবি: দেবাশিস দেব

বড়ই যদি হই তাহলে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড়ই যদি হই তা হলে হতেও তো হয় কিচুমিচু।
ভাবছ বড় হয়েও ছুটব বাঁদর-নাচের পিছু-পিছু ?
আমারই ঢের বাঁদর তখন—শুধু বাঁদর ? ভাল্লুক। বাঘ।
নাচ দেখিয়ে আসলে দেখো তখন আবার কোরো না রাগ !
তালাবেতালা বাঘের খেলা ভেলভেলাকি দেখবি না কি-
বাড়িসুদ্ধু দেখো তখন বিনটিকিটের হাঁকাডাকি।
থাকগে, না-হয় হব আমি চিড়িয়াখানার হেড পাহারা :
রাতবিরেতে শুনব যেতে বাঘ-ভালুকের হা রা রা রা—
আচ্ছা নিজেই বানাই যদি দোতলা জু ? এই বাড়িতে ?
ওপর মাচা পাখির খাঁচা, নীচতলা সেও পাখির ভিটে।
জন্তু যদি থাকেও তবে হরিণ মরিন এক-আধ জোড়া,
দোউরে একটা রাখতে হবে সেলাম দেয়া হাতিঘোড়া।
তাজা-বেতাজা তিড়িং নাচা ভেলভেলাকি দেখবি না কি-
বাড়িসুদ্ধু দেখো তখন বিনটিকিটের হাঁকাডাকি।
না গো মা, এর কিচ্ছু আমার সত্যি বলছি হয় না গো শখ !
হই যদি তো হই নে কেন বাইসিকেলের ভূপর্যটক !
ওই তো আমার জন্মদিনের হুশগাড়িটা—কখ্খনো কি
দেখতে পাওনি যেই চাপি যাই শোঁ-শন্‌শন্ ঘোড়া-উড়কি ?
হাসছ ? হাসো। যাক ক-টা দিন, ওই গাড়িরই চিমসে পেটে
দেখবে মেশিন গরগরিয়ে উঠছে—জোড়া পাখনা এঁটে !
ও কী করিস ! ও কী করিস !—বলার আগেই ছাদ ছাড়িয়ে
দেখবে দে-লাফ ! ধরে ফেলেছি মেঘগুলোকে আগ বাড়িয়ে।
ঝোপড়া-দাড়ি কী-সব লোক গো ! নীচ থেকে সে পাইনি টেরই—
সাতপাড়া লোক দিক কোরো না হয় যদি আজ একটু দেরি।
ফিরব যখন ফিরব নিয়ে আসবে না সে মনেও কারু :
বগল-চাপা দেখবে চেয়ে জুলজুলে চোখ দু' হাঁসজারু।
তারাবেতারা আকাশ ছাড়া ভেলভেলাকি দেখবি না কি-
বাড়িসুদ্ধু দেখো তখন বিনটিকিটের হাঁকাডাকি...

ছবি : দেবাশিস দেব

ছেলেধরা : ওয়াল্ট ডিজনি

একটা দামি গাড়ি ট্যাক্সিটার অনুসরণ করে শহরতলিতে...
জলজ্যান্ত চোর ! কী দাঁও মারলে বলো-না ।
শুধু দুটো বিচ্ছু...
TAXI

ঐ পাজি দুটো এখন কী করে দেখা যাক ।

লোক দুটোর হুকুমমতো ট্যাক্সি এসে একটা বাড়ির সামনে থামে ।
এখন তোমরা কেটে পড়ো !
এই তোমাদের আস্তানা ?

দাদুর বাড়ি থেকে ট্রেসি আর আমি পালাচ্ছিলাম তো....হংকং যাচ্ছি ।
আমরা এখানেই লুকিয়ে থাকব ।

সেটি হচ্ছে না বাছারা । আমাদের ঝামেলা চলছে, বুধবারের মধ্যে ৫০০০ ডলার ফেরত দিতে হবে । বিদায়, দেখেশুনে যেয়ো ।

বাচ্চা দুটোকে এভাবে ফেলে যাব ?
ঐ তোমার মুশকিল !

মাত্র একটা রাত, থাক্-না ।

দরজা খোলা ছিল তো ! ভাবলাম, না বসে গেলে ডিউক কী মনে করবে !

ডিউক আর বার্টের বাসায় বাচ্চারা ঢুকে যাওয়ার পর দামি গাড়ির আরোহীদের কথাবার্তা....
ওদের ধরে আনব স্যার ?
থাক না ! দেখাই যাক না কী করে !

টোনি, আমরা যাচ্ছি, তুমি এখান থেকে ওদের ওপর নজর রাখো । হয়তো এ থেকে একটু শিক্ষা হবে ওদের ।

দুজন ভয়ংকর 'অতিথি' ডিউক আর বার্টের ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করছিল....
গুজব শুনলাম তোমরা আজ এয়ারপোর্টে গিয়েছিলে ডিউক ?
হ্যাঁ, কিন্তু জুটল লবডঙ্কা ।

দেনাটা খেয়াল আছে তো ডিউক ?
টাকাটা কম নয়....
হ্যাঁ, হিসেব রেখেছি । ৫০০০ ডলার !

সে তো পুরনো হিসেব । এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ন' হাজার ।
!
ন' হাজার !
420 390
ILLINOIS 1940
289 772

কর্তা জো, শোনো, ন'হাজার পাব কোত্থেকে ?
তিন দিন হাতে পাচ্ছ—
দড়াম !

জে, ওরা আমাদের চেয়েও গরিব ।
ট্রেসি, টাকাটা ওরা জোটাবে কোত্থেকে ।

দাঁড়া, একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায় ।
?

পরদিন সকালে ট্রেসি
অসবোর্ন ঘুম থেকে
উঠল সক্কলের
আগে

ট্রেসি একটা কাজে বেরোল...

ডিমের পোচ আর বেকন ভাজার সুগন্ধে ডিউক আর বার্টের ঘুম ভাঙে...
সুপ্রভাত !
এ কী ? খাবার এল কোত্থেকে ?

ডাকে চিঠি ফেলতে বেরিয়ে একটু বাজার করে আনলুম !
চিঠি কিসের ?

এই দাদুকে লিখলুম, আমাদের মুক্তিপণ এক লাখ ডলার চেয়ে !

শোনো, আমি তালা ভাঙি বটে, কিন্তু ছেলেধরা নই।
ভাবছ কেন ? দাদুর কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা।

তা ছাড়া মুক্তিপণের চিঠি লিখেছি আমি। তোমরা না।
হ্যাঁ ডিউক, ট্রেসির কথাটা ঠিক।

শোনো, ঐ টাকা থেকে জে আর আমার হংকং-এ মা'র কাছে যাবার প্লেনভাড়াটা দিয়ে বাকিটা তোমরা নিয়ো, কর্তা-জো-র দেনা মিটিয়ো। ব্যস।

অসবোর্নের প্রাসাদে ট্রেসির চিঠি আসে...
সকালের
এল !

হুঁ, লেখাটা
চেনা ঠেকছে !

ট্রেসির চিঠি পড়েন,
কিন্তু তাঁকে বিচলিত
বোধ হয় না ।
হুঁ...মুক্তিপণের চিঠি । সই দেখছি না ;

শিশুরা আমাদের
জিম্মায়....চারটের সময়
গ্রিফিথ পার্কের গাছতলায়...
এক লাখ ডলার রাখবেন....

সর্বনাশ ! পুলিশে
খবর দিই স্যর ?
অত ঘাবড়াচ্ছ কেন সাটন ।
এ আমাদের ট্রেসির কারসাজি !

মনে হচ্ছে সে-ই ঐ 'নিশাচর' ভদ্রলোক দুটিকে এই প্ল্যানটা
ভজিয়েছে !

ঠিক আছে, ব্যাঙ্কে চললুম । চিঠির নির্দেশ মানব...অন্তত
খানিকটা তো বটেই !

পরে, ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায়
আস্তে চালাও বার্ট !
ঐ-যে গাছটা ।

মুক্তিপণের চিঠিতে কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে !
মার দিয়া কেল্লা ! এক লাখ ডলার !

এ কী ? এত হালকা ? লাখ ডলার আছে তো ?
হয়তো চেক দিয়েছে !

নতুন ছেলেধরাদের দারুণ হতাশা...
টাকা কোথায় ? একটা চিঠি শুধু !
কী লিখেছে ?

"টাকা যোগাড়ে অসুবিধা হচ্ছে। সময় চাই, অন্তত মাস ছয়েক!...জে ডব্লিউ অসবোর্ন !"

ডিউক আর বার্ট এসে ট্রেসি আর জে-কে খবর দেয়...
তোমাদের দাদু পাত্তাই দিচ্ছেন না।
তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি তাঁর কাছে।

সে কী করে হবে ? আমি তো পুলিশকে খবর দিলুম ! এখন আমরা সরকারিভাবে গুম হয়েছি।

কাজেই এখন **তুমিই** লেখো চিঠি। টাকা পেলে আমরা মা'র কাছে যাব।
আর তুমি জো-র দেনা শোধ করবে।
ক্লিক !

কে যেন আমার নাম বলছে ?

কর্তা-জো শেষ-কথা বলে যায়...
আর মাত্র দু-দিন। টাকাটা যোগাড় করো।

ভুল বলেছি, এক দিন তেইশ ঘন্টা পঞ্চান্ন মিনিট বাকি।

ডিউক কথা দেয়। মনে তার ভাবনা...
ভুল বললে হে! এখন ওটা এগারো হাজার!
ঠিক আছে, টাকা পাবে। ঐ ন'হাজারই!

বাচ্চাটা পুলিশে খবর দিয়েছে, এদিকে কর্তা-জো হুমকি দিচ্ছে—খুব ফাঁদে পড়েছি। করি কী?

ঠিক আছে, আরেকটা মুক্তিপণের চিঠি লিখব।

ওদিকে
চুপচাপ বসে থাকুন মিঃ অসবোর্ন। আমরা নজর রাখছি।
কিছু ভাববেন না। আমরা হাতে নিচ্ছি কেসটা।

কিচ্ছু করব না। মন্দ কী—একটু বিশ্রাম করা যাক। ড্রাইভার বিচ্ছু দুটোর ওপর তো নজর রাখছে, জানি ওদের কোনো ভয় নেই!
তারটা এক্ষুনি এল স্যার!

হুঁ...ঝামেলা বাড়ল! ওদের মা'র কাছে খবরটা গেছে, আর সে হংকং থেকে উড়ে আসছে।

ডিউক আরেকটা চিঠি লিখেছে...
ডাকে দিতে যাচ্ছি। বাচ্চা দুটোর ওপর নজর রাখিস, ঘরের বাইরে যাস না।

হুঁ, মনে হচ্ছে ওরাই ছেলেধরা, আমি ওদের বন্দী!

মা যে হংকং থেকে আসছে ট্রেসি আর জে জানে না।
আরে, করছিস কী তোরা?

আত্মরক্ষার কৌশল করছি। কত বিপদ-আপদ হতে পারে এখানে!

কর্তা-জোর মতো যে-কেউ এখানে ঢুকে পড়তে পারে।
এবার ঢুকলে বেরোনো কঠিন হবে।

তক্ষুনি...
আরে দ্যাখ দ্যাখ! ডিউকের বাসার ঐ বাচ্চা দুটোর ছবি!
I-25

আরে, ডিউক আর বার্ট দেখি ডাকসাইটে শিকার ধরেছে! নেহাত ছিঁচকে চোর নয় দেখছি ওরা!
কোটিপতির নাতি-নাতনির জন্য লাখ ডলার মুক্তিপণ দাবি
ট্রেসি অসবোর্ন,
জে অসবোর্ন

চল্ চল্! ব্যাপারটা আমরা কবজা করব এবার। বুড়োর কোটি কোটি টাকা!

ঠাকুর্দা মুক্তিপণের ২-নম্বর চিঠি পেলেন...
১৫০০০ ডলার...চারটেয়...স্যান ডিয়েগো... ৪৪ নম্বর জেটি...নিজে যাবেন ! !
শুনুন স্যর।

হংকং থেকে বৌমা এসে পৌঁছেছেন।

বাচ্চাদের মা হঠাৎ চলে এল...
ক্যারোলিন ? হঠাৎ এলে যে !
ওরা দুজন কোথায় ? ওরা ভাল আছে তো ?

ইয়ে—হ্যাঁ, দিব্যি আছে ! আমি মুক্তিপণ দিতে চলেছি।
আমি যাচ্ছি সঙ্গে।

পরে...
ঐ গাড়ি আসছে। নিশ্চয়ই ছেলেধরারা। ভয় পেয়ো না মা।

ঐ তো অসবোর্ন ! মহিলাটি কে আবার ?
এক্ষুনি সেটা জানা যাবে !

ডিউক আর বার্ট মায়ের রণমূর্তি দেখে...
ভাল চাও তো বাচ্চাদের বার, করো...

হঠাৎ
জেটি ৪৪
ডিউক, পুলিশ ফাঁদ পেতেছে !

পুলিশ দেখে ডিউক আর বার্ট পালাতে যায়...
ফাঁদ পেতেছে। চল্ পালাই ?

কোথায় পালাবে ?

বাচ্চাদের ভাবনায় মা বেপরোয়া কাণ্ড করে বসে...
আরে, আপনি ভেবেছেন কী ?
আমাকে বাচ্চাদের কাছে নিয়ে চলো !
Distributed by King Features Syndicate.

সর্বনাশ ! আমিও দৌড়োই ওদের পেছনে !
পোঁ-ওঁ-ওঁ

এই ! সামলে !
দমাস্ দুম্ !

ঘ্যাঁ-অ্যা-চ ! দুম্ !

আপনার বাচ্চারা ঠিক আছে মিসেস অসবোর্ন। চলুন দেখবেন।

এদিকে গুণ্ডার সর্দার কর্তা-জো নিজের প্ল্যান খাটাতে...
চলো বাছারা, আমাদের বাড়িতে আদরে থাকবে !
TV PROGRAMS

কর্তা-জো নিজের ফন্দি জানায়
এবার বসে দাদুকে একটা চিঠি লেখো তো লক্ষ্মীসোনা !

দশ লাখ ডলার দিলে তোমাদের ফেরত দেব ।

কর্তা-জোর ফন্দিটায় বাগড়া পড়ে
এই, ফিরে আর বলছি ! হতচ্ছাড়া...
জে, পেছনের দরজা দিয়ে, ছোট্ !

জে-র আফ্রিকান দড়ির ফাঁস কাজে লাগে
...উফ্ !
ঠকাস !
ঝনাত !
আঁ-আঁ-আঁ

বাঁচাও, নামাও !

পরে; অসবোর্নের প্রাসাদে...
বেশ হয়েছে ! সিন্দুক-ঘর খোলা... হংকং-এর ভাড়ার টাকাটা নিয়েই ভাগব !
HOFFMAN

কী কাণ্ড ! মিঃ অসবোর্ন সিন্দুক-ঘর খুলে রেখে গেছেন ! দরজাটা আটকে দিই !
শ্‌শ্‌ ! কে যেন আসছে !
HOFFMAN

ঘটাং !

সিন্দুক-ঘরে হঠাৎ আটকা পড়ে ট্রেসি আর জে।
বেরুব কী করে ?
কেউ জানে কি আমরা এখানে ?

কেউ শুনতে পাবে নিশ্চয়ই !
দুম ! দুম !

বাচ্চা দুটিকে অসবোর্নের প্রাসাদে ঢুকতে দেখা গেছে...
সে কী ?
আমি তো দেখিনি !
ওরা নিশ্চয়ই আছে ভেতরে কোথাও।

বাতাস ফুরিয়ে আসছে। কী রকম লাগছে যেন !
দরজায় মারতে থাক্। একটাই উপায় !
দমাস !

শুনুন ! নিশ্চয়ই সিন্দুক-ঘরে ওরা !
সর্বনাশ ! নম্বর ঘুরিয়ে তালা খুলতে পারেন এক মিঃ অসবোর্ন।
দুম দুম !

আমি—মানে—সিন্দুকের কারখানায় চাকরি করেছি তো ! দেখি পারি কি না।
হাত চালাও ডিউক ! ভেতরে বাতাস কতটা আছে কে জানে !

ধরা পড়বার ঝুঁকি নিয়েও তালা-ভাঙার ওস্তাদ ডিউক চেষ্টা করে।
প্রথম নম্বরটা ধরেছি !
MAN
ক্লিক !

ডিউকের চেষ্টা সার্থক হয়।
ট্রেসি ! জে ! আয় শিগ্‌গির।
মা ! তুমি ?

মা'র ছেলেমেয়ে মা'র কোলে ফিরে আসে
তোদের ছেলেধরার হাতে পড়ার খবর পেয়েই প্লেনে চড়েছি...

ছেলেধরায় ধরেনি মোটেই !
আমরাই তোমার কাছে যাব বলে কিছু টাকার ধান্দা করেছিলাম !

হঠাৎ ডিউক আর বার্টের আকাশে কালো ছায়া...
কী, ব্যাপার কী ?
মিঃ অসবোর্ন ! সঙ্গে পুলিশ !

আপনার সিন্দুক-ঘরে ট্রেসি আর জে আটকে পড়েছিল। এই ভদ্রলোক তার তালা খুলে ওদের বাঁচিয়েছেন !

মশাই, আপনার হাতের গুণ আছে বলতে হবে ! একজনকেই জানতাম যে এত সহজে তালা খুলতে পারে...

তবে ভুল হয়েছিল বোধ হয়...আসলে হয়তো দুজন ওস্তাদ আছেন। যাই হোক, শুনেছি আমার জানা 'সে ভদ্রলোক' এখন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন ! কী বলো হে সার্জেন্ট ?
ঠিক স্যর !

মা, ডিউক আর বার্ট মোটেই ছেলেধরা নয়। ওরা খুব যত্ন করেছিল আমাদের।
যেন ঠিক মামাবাড়িতে ছিলাম !

ফলে
'সে ভদ্রলোক'-এর ব্যবসা না ছেড়ে উপায় আছে ? এদের 'মামা' হওয়া আর ব্যবসা চালানো একসঙ্গে সম্ভব না।
য-যা ব-বলেছ !
সমাপ্ত

বুদ্ধি রাখা

নৃপেন্দ্র সান্যাল

বুদ্ধি রাখা কম কথা নয়, কে না জানে।
বুদ্ধিটাকে মাঝে-মাঝে খেলিয়ে নিলে
বুদ্ধিটা খুব ভাল থাকে। হাওয়ার টানে
দূর আকাশে নয়তো যাবে চলে।

বুদ্ধি খেলার নিয়ম-কানুন আছে অনেক।
উদাহরণ : শূন্যে ছোঁড়া পা মাথা হাত।
দেহের ভারটা এলিয়ে দিয়ে মিনিট কয়েক
ডিগবাজি আর ঘুরপাক খাও হঠাৎ হঠাৎ।

বালতি, কলসি যা পাওয়া যায় ঘরে
বুদ্ধিগুলো এদের মধ্যে ভালই থাকে।
তবে কিনা মুখটা রেখো বন্ধ করে
কেউ জানে না বুদ্ধি পালায় কিসের ফাঁকে।

বুদ্ধি ধরা যাবে হয়তো অনেক খুঁজে,
একটুখানি জাক দিলে তা পাকানো যায়।
পাকা বুদ্ধির অভাব কত, বুঝেসুঝে
হিসেব কষে রাখতে হবে জাব্দা খাতায়।

দেয়াল ঘিরে কাঁচ-লাগানো আলমারি যে,
থরে থরে বুদ্ধিগুলো রাখা আছে।
কে জানে কোন বুদ্ধি কখন দরকারি যে,
ঠিক সময়ে বুদ্ধি খুঁজে না-পাও পাছে।

লাইব্রেরিটা সব রকমের বুদ্ধি দিয়ে
কোনোক্রমে যদি বা কেউ করতে পারে,
ভাবনা কারো থাকবে না আর, কার্ড দেখিয়ে
প্রয়োজনে দিব্যি পাবে বুদ্ধি ধারে।

দুই রত্ন

রঞ্জন ভাদুড়ী

একটা ছেলে অট্ট হাসে,
একটি হাসে মুচকে।
একটি তাকায় সরল চোখে,
আর-একটা চোখ কুঁচকে।

একটা ছেলে চটপটে খুব,
আর-একটি খুব শান্ত।
একটা যেন তুরগ-গতি,
আর-একটি ধীর পান্থ।

একটা মুখে তুবড়ি ছোটায়,
আর-এক ছেলে গম্ভীর।
একজন চায় লোক-গমগম,
আর-একজনা কম ভিড়।

একটা ছেলে ঢিল ছোঁড়ে আর
ছুঁড়তে পটু গুলতি,
আর-একটি সে এমনি দয়াল—
ছিঁড়তে কাতর ফুলটি।

এমনিতরো দুজন ছেলে—
দুটিই কিন্তু রত্ন,
কারণ তারা অতিথ এলে
করে আদর-যত্ন।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

ডিমেংকারি

বুদ্ধদেব গুহ

আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা বলতে বসেছি। হাজারিবাগে গোপালদের ছবির মতো বাড়িতে উঠেছি গিয়ে গোপালের সঙ্গে। গোপালের ভাল নাম মিহির সেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং শিকারি। পনেরো দিন থাকব। একশো টাকা ক্যাপিটাল। এ-বেলা এবং ও-বেলা চমনলাল খিচুড়ি রাঁধে। মুরগি তিতির খরগোশ শিকার হলে আমিষ। নইলে নিরামিষ।

এখন শীত। শীত মানে, হাজারিবাগি শীত। সন্ধে হতে না-হতেই দু'কান পাকড়ে থাপ্পড় মারে।

আমাদের গাড়িও নেই, জীপও নেই। যোগাড় করার ক্ষমতা বা প্রতিপত্তিও নেই। পায়ে হেঁটে এদিক-ওদিক ঘুরি বন্দুক-কাঁধে। অথবা সাইকেল-রিকশা করে সীমারিয়ার রাস্তাতে বানাদাগ অবধি গিয়ে, সাইকেল-রিকশা ছেড়ে দিয়ে বন্দুক এবং ঝোলাঝুলি কাঁধে হন্টন মারি জেসমার উদ্দেশে। নাগেশ্বরোয়ার ঘর তেঁতুলগাছতলায়। নয়া তালাও-এর কাছে। সেই ঘরের লাগোয়া নাজিমসাহেবের তিন দিক বন্ধ আর একদিক একেবারে উদোম-খোলা মাটির ঘরটি। জাংগল্-কটেজ। সেই ঘরই আমাদের আস্তানা। রাতে, উদোম দিকটার সামনে আগুন জ্বেলে, আলুকা ভাত্তা, ঘি এবং খিচুড়ি খেয়ে ঘরের মাটির মেঝে-খোঁড়া ধিকিধিকি জ্বলা উনুনের পাশে প্রথম প্রহরে কাল-ঘুম ঘুমিয়ে উঠে একেবারে সূর্যোদয় অবধি পাল্সা শিকার করি। পায়ে হেঁটে—টর্চ নিয়ে। দু'দিন আগে খুব বড় একটা হুণ্ডার মেরেছিলাম আমি। আর গোপাল মেরেছিল একটা বড়্কা দাঁতাল শুয়োর।

শ্রী সত্যচরণ চ্যাটার্জি, মানে সুব্রতর বাবা তখন হাজারিবাগের পুলিশ-সুপার। এস-পির অফিসিয়াল কোয়ার্টারে থাকতেন তিনি তখন। গোপালই একদিন বলল, জীপ না হলে বড় শিকার কিছুই খবর নয়। রোজ রোজ কি সাইকেল-রিকশা করে সীতাগড়াতে গিয়ে মানুষখেকো বাঘের রাহান্-সাহান্-এর খোঁজ করে আবার ফিরে আসা আর শহরে ? এভাবে অসম্ভব। তার চেয়ে এক কাজ করো, তুমি বাংলায় একটা জম্পেস করে চিঠি লেখো এস-পি-সাহেবের ছেলেকে। লেখো যে, তার শিকারের উৎসাহর কথা শুনছি আমরা বহুদিন ধরে, তাই আলাপ করার বড়ই ইচ্ছে, তাছাড়া সীতাগড়া পাহাড়ে একটি মানুষখেকো বাঘ অপারেট করছে। আমরা তাকে মারবার চেষ্টাও করছি। যদি সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চায়, তো দিতে পারে। আমাদের একটুও আপত্তি নেই। এমন করে চিঠিটা লেখো যাতে এক চিঠিতেই পার্টি কাত হয়। রিয়েল স্পোর্টসম্যান - স্পোর্টসম্যান গন্ধ বেরোয় যেন, চিঠি থেকে। আসল কেসটা ধরে না ফেলে।

এক বিকেলে পূর্বাচল-এর পশ্চিমের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে অনেক পাঁয়তারা করে একখানি চিঠি লিখে ফেললাম। মালির হাত দিয়ে সে চিঠি গোপাল পাঠিয়ে দিল এস-পি সাহেবের বাংলোয়। জীপ-টিপ আর কোনো সমস্যাই নয়। যতক্ষণ না মালি উত্তর নিয়ে ফেরে, ততক্ষণ টেন্স্ হয়ে, ভুরু কুঁচকে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেতে লাগল গোপাল।

সূর্যও ডুবল, আর করম্ মালি ফিরে এল সাইকেলে কির্‌কির্ আওয়াজ তুলে। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা গাড়ি বাংলোর গেটে

ঢুকল। গাড়ি পার্ক করিয়ে লেংথ-উইদাউট-ব্রেথ কিন্তু প্রচণ্ড রাশভারী কুড়ি বছরের তেজি শৌখিন-গোঁফের সুব্রত চাটুজ্যে নামল গাড়ি থেকে।

গোপাল ফুলহাতা সোয়েটারের ওপরে একটা জাপানি কিমোনো পরে বসে ছিল। নীচে খাকি ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠেই বলল, "নমস্কার।"

সুব্রতর সঙ্গে আমাদের আলাপ বিলক্ষণই হল। কিন্তু তাৎক্ষণিক সুবিধে বিশেষ হল না। ও বলল যে, বাবার সঙ্গে ঝুমরিতিলাইয়াতে যাচ্ছে, দিন সাতেক পরে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে। কিন্তু আরো দিন সাতেক আমরা থাকতে পারব কি না তারই ঠিক নেই।

যাই হোক, সুব্রত তার ফিনফিনে তালঢ্যাঙা ফর্সা চেহারার সঙ্গে একেবারেই বেমানান কালো, ঢাউস মার্কারি - ফোর্ড গাড়িখানা চালিয়ে যখন চলে গেল তখন গোপাল কিমোনোর দু'হাতের মধ্যে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, "এ পার্টি বহুতই চালু আছে। জীপ তো পাওয়া যাবেই না, মধ্যে দিয়ে আমাদের সীতাগড়ের বাঘটাও বোধহয় বেহাত হয়ে যাবে।"

"বেহাত হবে মানে? বাঘটা কি তোমার হাতের পাঁচ? আজ অবধি লেজটি পর্যন্ত দেখাল না আমাদের! খালি থাবার ছাপ দেখিয়েই ঘুরিয়ে মারছে, চোখ-বাঁধা বলদের মতো।"

"উহারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে! একেই বলে যোগাযোগ! তবে আমাদের হাত থেকে ফশকেই গেল।"

কিমোনো থেকে বাঁ হাত হঠাৎ বের করে বাঁ গালে চটাস্ করে একটা মশা মেরে ও বলল, "তোমার মাথায় গ্রে-ম্যাটার বিলক্ষণ কম আছে। হাজারিবাগ জেলার এস-পি সাহেবের ছেলে যদি কোনো হাজারিবাগি বাঘকে মারতে চায়, তাহলে সে সুধন্য বাঘ কি অন্য কারো কাছেই গুলিখোর হবে? মরণে মহান হলে, কাগজে ছবি ছাপা হবে তার শিকারির সঙ্গে। এমন সুযোগ কোনো বোকা মানুষই ছাড়ত না, তার এমন চালাক বাঘ ছাড়বে? না, সাংঘাতিক স্ট্র্যাটেজিক ভুল হয়ে গেল। বুঝেছ?"

সেই মানুষখেকো বাঘটাকে পরে সুব্রত মেরেছিল সীতাগড়া পাহাড়ের নীচে। টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হকও সঙ্গে ছিল। ইজাহার আর আজকে বেঁচে নেই। সুব্রত এখন গোমীয়ার ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস-এর ভারী অফিসার। কয়েক বছর আগে কোথা থেকে এসে একটা গুলিখেকো রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার গোমীয়ার এক্সপ্লোসিভস ফ্যাক্টরির উঁচু পাঁচিল টপকে ভিতরের পুটুস আর ঝাঁটি-জঙ্গল ভরা এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। গত জন্মে বোধহয় ও সুব্রতর কাছে ঘুষ খেয়েছিল, তাই এ জন্মে কৃতজ্ঞতায় সুব্রতর রাইফেলের মিষ্টি গুলি না-খেয়ে মরবে না মনস্থ করে আত্মহত্যা করতে এসেছিল সুব্রতর সৎসঙ্গে। নাজিমসাহেবকে হাজারিবাগ থেকে ডাকিয়ে নিয়ে সেই মহান বাঘকে ঋণমুক্ত করেছিল সুব্রত এবং তার আত্মাকে বিষুনপুরের মোড়ে নিয়ে গিয়ে বাসে চড়িয়ে দিয়ে, গয়ায় পাঠিয়েছিল স্বপিণ্ডদানের জন্যে।

ভুতো-পার্টি ঠিক সেই সময় এসে লাফিয়ে নামল সাইকেল-রিকশা থেকে। এই এক ছেলে! একরত্তি, কিন্তু ভয়-ডর, শীত-গ্রীষ্ম, আরাম-বিরাম বলতে কিছুমাত্র নেই। দারুণ গাড়ি চালায় আর যে-কোনো গাড়ি বা জীপ ওর সঙ্গে কথা বলে। সবসময় গোপালের চাম্‌চেগিরি করছে এক-ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে।

ওকে পাঠানো হয়েছিল কোনো গাড়ি-টাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় কিনা, তারই খোঁজে।

এই শীতে, নিম্নাঙ্গে শুধুমাত্র জিনস। উর্ধ্বাঙ্গে সোয়েটারহীন মাল্‌টিকালারড্ প্যারালাল স্ট্রাইপ্‌স-এর গেঞ্জি। শ্রীচরণে এক-জোড়া হাফ-ক্ষয়ে-যাওয়া হাওয়াইয়ান্ চপ্পল। ঝাঁকি মেরে মেরে, হাঁটতে হাঁটতে ভুতো এসে সীরিয়াস মুখে বলল, "হবে।"

আমি শুধোলাম, "কী হবে?"

"গাড়ির বন্দোবস্ত। দেখে এলাম মসজিদের পেছনে থাকে-থাকে সাজানো ইঁটের উপর বসে আছে নাইনটীন থার্টি-টুর হুড-খোলা টি-মডেল ফোর্ড। হাঁস যেমন করে বসে ডিমে তা দেয়, তেমন করেই ইঁটে তা দিচ্ছে। তিরিশ টাকা ভাড়া এক রাতের। কাড়ুয়া - তেলেও চলে, সুরগুজার তেলেও চলে, আবার পেট্রলেও চলে। তবে তেলের কোয়ালিটি যত ভাল হবে ততই ভাল হবে পিক্-আপ্। বুক করতে হলে ক্লিয়ার ফটি-এইট্ আওয়ার্সের নোটিস দিতে হবে মালিক-কাম-ড্রাইভারকে, কারণ, ইঁট-ফিট সরিয়ে, এঞ্জিনের মধ্যে বাসা-বাঁধা নেংটি ইঁদুরদের তাড়িয়ে সব ঠিকঠাক করতে টাইম লাগবে তো!"

গোপাল অনেকক্ষণ ভুতোর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কী ভেবে, হঠাৎই ধমক দিয়ে বলল, "মগের মুলুক পেয়েছ? তিরিশ টাকা কম টাকা হল নাকি? কম-টম করে কি না, কাল গিয়ে একটু হিগ্‌লিং করে দেখে এসো। তিরিশ টাকা যেন তোমার গায়েই লাগছে না?"

ভুতো তীব্র আপত্তি করে জানাল যে, হিগ্‌লিং-ফিগ্‌লিং-এর মধ্যে সে আর নেই।

পরশু রাতে ছাড়োয়া ড্যামের কাছে একগাদি শুয়োর মেরে এনে আমরা ভুতোকে পাঠিয়েছিলাম সর্দারজির হোটেলে। ভুতো, প্রায় মাঝরাতে জনা-পাঁচেক তাগড়া সর্দারজিকে নিয়ে গিয়ে ছাড়োয়া ড্যামের জঙ্গলের মধ্যে টর্চ ফেলে ফেলে মরা শুয়োর দেখাচ্ছিল আর হিগ্‌লিং করছিল। একজন দৈত্যপ্রমাণ সর্দারজি ওকে কিছুতেই কায়দা করতে না পেরে, শেষে বগলচাপা করে রেখে দিয়েছিল অনেকক্ষণ। অত্যন্ত বেকায়দায়। এখনও নাকি সর্দারজির গায়ের প্যাঁজ-রসুনের গন্ধ যায়নি ওর নাক থেকে। হিগ্‌লিং-এর নাম শুনেই ভুতো পেছিয়ে গেল।

তবে, তিরিশ টাকা তখনকার দিনে অনেক এবং আমাদের তো ঐ অবস্থা। সুতরাং ভাড়া-গাড়িও জুটল না। গোপালের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ চেষ্টা করাই সাব্যস্ত হল। পেট্রল-পাম্প থেকে ডালটনগঞ্জে একটা ফোন বুক করে দিয়ে ধুকপুক বুক নিয়ে আমরা বসে রইলাম মবিলের আঠাতে চ্যাটচেটে টেবিলের উপর। আশ্চর্য! সেদিন দশ মিনিটের মধ্যেই লাইন মিলে গেল। ডালটনগঞ্জের মোহন বিশ্বাস বলল, "দু'দিনের জন্যে, নো-প্রবলেম। বে-ফিক্কর্ থাকুন। কাল দুপুরের মধ্যেই জীপ পৌঁছে যাবে হাজারিবাগের বাড়িতে।"

আমাদের আর পায় কে! পাম্প থেকে সোজা একেবারে নাজিম মিঞার বাড়িতে। ঈদে জবাই হবার অপেক্ষায় পেতলের চেনে-বাঁধা মসৃণ, সফেদ খাসি উজ্জ্বল চোখে রোদ পোয়াচ্ছিল নাজিমসাহেবের বাড়ির বারান্দায়। তার পাশেই নাজিমসাহেবও স্বয়ং। খবরটা পেয়েই তো উনি লাফিয়ে উঠলেন। "জীপ পাওয়া যাচ্ছে? কিন্তু কোন্ দিকে যাওয়া যায়? আর কে কে যাবে?" বলেই বললেন, "একেবারে হল্লা-গুল্লা নয়। গোপালবাবু, ভুচু, আমি আর আপনি।"

নাজিমসাহেব ভুতোকে প্রথম দিন থেকেই ভুচু বলে ডাকতেন। কেন, তা উনিই জানেন আর ভুতোই জানে। রহস্যটা এ-পর্যন্ত আমাদের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

ভুতো নাজিমসাহেবকে ধমকে বলল, "সে না-হয় হল, কিন্তু যাবেন কোন্ দিকে?"

আমরা নাজিমসাহেবকে খুবই সমীহ করতাম। কিন্তু হাজারিবাগে নবাগত, গোপালেরই অতিথি ভুতো (ওরফে ভুচু) প্রথম দিন থেকেই যে নাজিমসাহেবকে এমন ডেঁটে কথা বলত কোন্ সাহসে তা সত্যিই আমাদের বুদ্ধির বাইরে ছিল। পরে অবশ্য বিস্তারিত জানা গেছিল সে রহস্য। সে-কথা, অন্যখানে বলা যাবেখন।

নাজিমসাহেব বললেন, "তাই-ই তো ভাবছি। কোথায় যাওয়া যায়?"

"টুটিলাওয়া হয়ে ওল্ড চাত্‌রা রোড ধরে চাত্‌রা যাবেন?" আমি বললাম।

গোপাল বলল, "কাট্‌কামচারী চলুন না, নাজিমসাব?"

ফচকে 'ভুচু' বলল, "দানুয়া-ভুলুয়ার জঙ্গলে?"

নাজিমসাহেব ঈদের খাসির মতোই অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পর ধ্যান ভেঙে বললেন, "নেহি। উ সব ছোড়িয়ে। কাল চলেঙ্গে হান্টারগঞ্জ। মশহুর জাগা। হান্টার লোঁগোকা বেহেস্ত্।"

আমরা সবিস্ময়ে, সহর্ষে, সমস্বরে বললাম, "হান্টারগঞ্জ! ওয়া! ওয়াহ্।"

॥ ২ ॥

পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ ডালটনগঞ্জ থেকে চাঁদোয়া-টোড়ি, বাঘড়া মোড়, সীমারীয়া, টুটিলাওয়া হয়ে মোহনের জীপ সত্যিই হাজারিবাগে এসে পৌঁছল। ড্রাইভারের নাম সাকির মিঞা। এই প্রচণ্ড শীতে এতখানি জঙ্গলের পথ আসতে ফ্যাকাসে হয়ে গেছিল বেচারা। তার শরীরটা বেঁকে গিয়ে গাড়ির শক-অ্যাব্‌সরবারের মতো দেখাচ্ছিল। সাকির মিঞাও আজ বেঁচে নেই।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ নাজিমসাহেব এসে পৌঁছলেন দুই হ্যাণ্ডেল থেকে লাল-নীল প্লাস্টিকের ফিতে ঝোলানো তাঁর ঝিং-চ্যাক্ সাইকেলে, রিং-টিং বেল বাজিয়ে। আমরা বন্দুক মুছে, তেল দিয়ে, ক্লিনসে মুছে গুলি-টুলি ঠিকঠাক করে, ওভারকোট, টুপি, মাফ্লার, ওয়াটার-বটল্ সব এক জায়গায় জমিয়ে রেডি হয়েই বসে ছিলাম।

নাজিমসাহেব এসেই গোপালকে বললেন, "চমনকো বুলাইয়ে।"

চমন এসে দাঁড়াল গোপালের ডাকে। আমাদের চমনলাল সত্যিই গ্রেট লোক ছিল। কারো কথা শোনার সময় চমনের কান দুটো ওয়াইডারের ব্লেডের মতো নড়াচড়া করত। ওর আর যে গুণটি ছিল, তা কোনো মডার্ন সাবমেরিনের হাইড্রো-সোনার সিস্টেমেরও নেই। ইচ্ছাশ্রুতির মানুষ ছিল সে। যে-কথা সে শুনতে চাইত না, সে-কথা শুনতেই পেত না।

নাজিমসাহেব চমনকে বললেন, "চিতলের কাটলেট হবে। শুধু খিচুড়িটা রেঁধে রাখলেই চলবে চমনের। কিন্তু মসলা-টসলা বেটে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে মাংসর জন্যে। বাকি রান্না নাজিমসাহেব ফিরে এসে স্বয়ং ফটাফট্ করে ফেলবেন। নাজিমসাহেবের রান্নার হাতের জবাব ছিল না।

ভুতো কিছুক্ষণ বোকার মতো চেয়ে থেকে বলল, "হান্টারগঞ্জের বাজারে বুঝি চিতল মাছ পাওয়া যায়? হাজারিবাগে তো পাওয়া যায় না!"

নাজিমসাহেব খিকখিক করে হেসে উঠলেন। পানের পিক আর কালা পিলাপাত্তি জর্দা ছিটকে এল দাঁতের ফাঁক দিয়ে। ঠাট্টার গলায় বললেন, "আরে ভুচু, ঈ চিতল তুমহারা কুলকাত্তাকে চিতল নেহি হ্যায়।"

ভুতোকে বললাম, "চিতল মানে স্পটেড-ডিয়ার।"

আমাদের গোপালও দারুণ ভাল কুক। হাজারিবাগের বাড়ির নিরবচ্ছিন্ন নিরিবিলিতে ইংরিজি, মোগলাই, বাঙালি, চাইনীজ এবং নানারকম পদ নিয়েই এক্সপেরিমেন্ট চালাত ও। চমনলাল আর আমাকে দিয়ে সে-সব এক্সপেরিমেন্টাল অখাদ্য খাওয়াত। খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে ও নিজে কোনোদিনই ছিল না। ও খালি ফুঁকত। চিরদিনই নিখাকিবাবা। তবে, গোপালের রান্নার হাত এখন যে-রকম তাতে অনেক বড় বড় হোটেলের শেফ্‌ও লজ্জা পাবে।

ড্রাইভার সাকির মিঞাকে উদ্দেশ করে নাজিমসাহেব বললেন, "অব্ চলা যায় ড্রাইভার সাহাব।"

সাকির মিঞা বলল, "জি, জনাব।"

আমি আর গোপাল সামনে বসলাম। পেছনে ভুতো আর নাজিমসাহেব। একমাত্র ভুতোরই গায়ে কোনো গরম জামা নেই। কারোই কোনো কথা শোনে না ও। নাজিমসাহেব বলতেই বলল, "কলকাতায় তো শীত পাওয়া যায় না। এখানে পাচ্ছি, বিনা-পয়সায় তাই খেয়ে নিচ্ছি খালি গায়ে। শীতটা ভাল। আপনাদের মশাগুলো খারাপ।"

জীপ ছেড়ে দিল। মুখ বাড়িয়ে গোপাল চমনকে বলল যে, আমরা খুব বেশি দেরি করলে রাত এগারোটা করব। খিচুড়ি যেন রেঁধে রাখে।

পদ্মার রাজার বাড়ির দিকে জীপ ছুটল। রাস্তাটা খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে। বড় বড় গর্ত। পথের দু'পাশের কাঁচা রাস্তাতে আরও বড় বড় গাড্ডা। কিন্তু সাকির মিঞা আড়াই-পাক ফলস্ আর্মি-জীপের স্টীয়ারিংটা শক্ত করে ধরে সটান সামনে চেয়ে বসে রইল তো রইলই। ঐ ঠাণ্ডায় হাত-নাড়ানাড়ির ঝামেলার মধ্যে সে একেবারেই যেতে চায় না বলেই মনে হল।

ওকে একটু লক্ষ করার পর নাজিমসাহেব বললেন, "ক্যা, মিঞাসাব? 'নিম্মন্ গীতিয়া না গায়েব; না, সরকারনে পাকড়ায়েব'?"

সাকির মিঞা গুঁ এবং গাঁর মাঝামাঝি একটা চাপা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করল। স্টীয়ারিং ঐভাবেই ধরে থেকে। কী যে বলতে চাইল তার কিছুমাত্রও বুঝলাম না আমরা।

"ব্যাপারটা কী?" ভুতো শুধোল।

"ব্যাপার বুঝে আর কাজ নেই। যার বোঝার সে ঠিকই বুঝেছে। শরীরের সমস্ত যন্ত্রপাতির ঠিকানাই বদলে যাচ্ছে। আর জনাব বে-ফিক্কর্। শেষমেশ ভুচুকেই চালাতে হবে জীপ। এভাবে যাওয়া..."

"কেন? এখন কুলকাত্তার ড্রাইভারকে তলব কেন? আপনার হাজারিবাগের সবই তো একেবারে উঁম্‌দা! সুইট্জারল্যাণ্ডের চেয়েও ভাল জায়গা!"

ভুতো চিবিয়ে দিল নাজিমসাহেবকে। গোপাল বলল, "বর্হিতে তেল দেখে নিতে হবে ভুতো। ভুলো না।"

ন্যাশানাল পার্কের পাশে পৌঁছবার আগেই ভুতোকে এসে স্টীয়ারিং-এ বসতে হল। আমাদের হাড়গোড় নইলে সত্যিই আর আস্ত থাকবে না। সাকির মিঞা শেয়াল-রঙা চাদরে তার শরীর এবং সম্মান আপাদমস্তক ঢেকে ফেলে পেছনের সীটে নির্বিকারে ঘুমোতে লাগল।

ভুতো জীপ চালাচ্ছে। তবুও, মাঝে-মাঝেই, নাজিমসাহেবের বিরক্তিসূচক আঃ, উঃ, ক্যা হো রহা হ্যায়? ইত্যাদি আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল পেছন থেকে।

গোপাল বলল, "ক্যা হুয়া নাজিমসাব?"

"হোগা ঔর ক্যা? ড্রাইভারজাদা তো আমাকে ইজিচেয়ার করেছেন। ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমুতে ঘুমুতে চলেছেন। পুরো শরীরের ভার আমারই গায়ে।"

মিনিট দশেক পর হঠাৎ কেঁয়াও বলে চেঁচিয়ে উঠলেন নাজিমসাহেব।

ভুতোও সেটাকে ভুতুড়ে আওয়াজ মনে করে আচমকাই ব্রেক-শুতে মারল ডান পায়ে এক জোর লাথি। মারতেই, একেবারে কেলো! ঘুমন্ত, আত্মবিস্মৃত সাকির মিঞা সীট থেকে এক ঝটকায় নাজিমসাহেবের কোলে। এবং নাজিমসাহেব তাকে দু'-উরুর উপরে নিয়ে ঘুঘুরসই করতে করতে জীপের মেঝেতে। ইনস্ট্যান্টেনাস্‌লি, আমাদের মাথা ঠুকে গেল উইণ্ডস্ক্রীনে। কিন্তু এততেও যতি হল না। মনে হল, আমার ঘাড়েরই উপর দুটি মামদো-ভূতে গামদা-গামদি করছে। তার উপর হঠাৎ কাঁচা-ডিমের ফাটা গন্ধ আর তার সঙ্গে উঁ-উ-উ, আঁ-আঁ, ইঁ-ইঁ-ইঁ, ঈঁ-ঈঁ-ঈঁ, গিস্-গিস্, টিস্-টিস্—নানারকম সব উদ্ভট আওয়াজ।

ভুতো একঝলক ব্যাপারটা দেখে নিয়েই স্টীয়ারিং ছেড়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে বাঁ দিকের গাছতলায় দাঁড়িয়ে পেটে হাত দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে হাসতে লাগল। সে হাসি আর থামে না। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে আমরাও ঘাবড়ে গিয়ে নেমে পড়তেই দেখি, একেবারে ডুনুন্-ডুনুন্ কাণ্ড! আনডাউটেড্‌লি আণ্ডা-হুল্ট্।

গোপাল সাকির মিঞাকে ধমকে বলল, "আণ্ডা কাঁহাসে লেতে আয়া আপ?"

সাকির মিঞা এবং নাজিমসাব দুজনের কারোই কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না। জীপের সীটের নীচে রাখা এক ঝুড়ি ডিমের মধ্যে বডি-থ্রো দিয়েছিলেন দুজনে জাপটা-জাপটি করতে করতে।

সাকির মিঞা যা বলল, তাতে বোঝা গেল যে, চিপাদোহরের ডেরায় রোড-আইল্যাণ্ড আর লেগ-হর্ন মুরগির অনেক ডিম হওয়াতে মোহনের মেজকাকা ঝুড়ি-ভর্তি ডিম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শালপাতা দিয়ে প্যাক করে এই জীপে করেই। সাকির মিঞা ডিমের ঝুড়িটা নামাতে একেবারেই ভুলে গেছিল ডালটনগঞ্জে।

ভুতো একবার বাঁ পা ছুঁড়ে ডান হাত তুলে, আর একবার ডান পা ছুঁড়ে বাঁ হাত তুলে, 'ও বাব্বা রে! ও মাম্মা রে! কী গন্ধ রে!' বলে তখনও লাফাচ্ছিল ক্রমাগত।

সত্যিই, কাঁচা ডিমে ভারী বদ গন্ধ! তাও আবার এক-ঝুড়ি বিলিতি মুরগির ডিমের একগাদা বিজাতীয় গন্ধ। ওয়াটার-বট্‌ল দুটোর সব

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

জলই শেষ হয়ে গেল ওদের দুজনকে ডিম-ফুটিয়ে বের করতে। ভুতো নিজের হিপ-পকেট থেকে ধূপকাঠির প্যাকেট নিকালকে চারগাছি ধূপকাঠি জ্বেলে জীপের ড্যাশবোর্ডে গুঁজে দিয়ে নাজিমসাহেবকে বলল, "ক্যা আণ্ডাবাবা ? চল্‌না হ্যায় তো হান্টারগঞ্জ ? হাস্টারলৌগোকা বেহেস্তমে ?"

"হাঁ। হাঁ। চলো ভুচু। চলো। জরুর যানা !" গলায় কাঁচা-ডিমের কুসুমের সঙ্গে কুসুম-কুসুম উৎসাহ মাখিয়ে নাজিমসাহেব বললেন।

সাকির মিঞার বাতচিত বিলকুল বন্ধ। কারণ, ডিম-ফাটাফাটি যা হবার তা তো হয়েছিলই, তার উপরে নাজিমসাহেবের বন্দুকটার বত্রিশ ইঞ্চি লম্বা ব্যারেল একেবারে গদার মতো গিয়ে গদ্দাম করে তার চাঁদিতে পড়ায় তার মাথা ফাটাফাটিরও উপক্রম হয়েছিল।

আমার মন বলছিল যে, পুরো ব্যাপারটাই ভুতোর প্রি-প্ল্যাণ্ড। যখন পেছনে বসেছিল ও তখনই নিশ্চয়ই ডিম-আবিষ্কার করেছিল।

বর্‌হিতে পৌঁছে তেল নেওয়া হল। চার গ্যালন মতো খেল তেল। সাকির মিঞা নেমে ড্রাইভিং সীট তুলে একটা বাঁশের টুকরো পেট্রল ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েই, তুলে নিয়ে, তার গন্ধ শুঁকে বলল, "হাঁ ! পুরা ফুল্‌ হ্যায় ট্যাঙ্কি !"

সাকির মিঞা এবং নাজিমসাহেব দুজনেই পানের দোকানে গিয়ে কষে কালা-পিলা -পাত্তি জর্দা দিয়ে পান খেলেন, গন্ধ তাড়াতে। ভুতো বলল, "গোপালদা, এই ফাটা ডিমের ঝুড়ি ধাবার সর্দারজিকে দান করে দিন, নইলে বিপদ হবে। ডিমের মতো অযাত্রা আর নেই। তার উপর শিকারে !"

আমি বললাম, "সব ডিম তো ভাঙেনি। রোড-আইল্যাণ্ড আর লেগ-হর্নের ডিম। তাছাড়া, পরের ডিম। দিয়ে দেবে ?"

ভুতো চটে বলল, "নিজের ডিম হলেও দেওয়া উচিত। ডিম ফটাফট ফাটবে এখানে ; আর ওমলেট ফুলবে ডালটনগঞ্জের তাওয়ায়, তা তো হয় না। না দিতে চান তো সবগুলো ডিম গুলে একটা বারকোশের সাইজের ওমলেট বানাতে বলে দিয়ে, নামিয়ে দিন ড্রাইভারকে সর্দারজির ধাবায়। খাক্‌গে সে বসে বসে।"

গোপাল বলল, "মাথা গরম করে না ভুতো। দেখছ না, পরের ডিম।"

ভুতো গোপালের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চাবি ঘুরিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট করল।

বর্‌হি থেকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে দোভিতে এলাম আমরা। দোভি থেকে ডানদিকে গেলেই বুদ্ধগয়া হয়ে গয়া আর বাঁ দিকে গেলে চাত্‌রা। ঐ রাস্তাতেই কয়েক মাইল গিয়ে ডানদিকের পাহাড়ের উপরে চলে গেছে একটি রাস্তা—হান্টারগঞ্জে। গয়ার অন্তঃসলিলা ফল্গুর শাখানদী ইলাজান বয়ে গেছে সেখানে এঁকে-বেঁকে। ভারী সুন্দর নদী। দোভিতে এসে বাঁ দিকে মোড় নেব আমরা। শীতটা বাড়ছে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। ওখানে চা খেয়ে গা গরম করে নিলাম। ওঁরা দুজনে আবারও জর্দা-পান খেলেন।

"ওয়াটার-বট্‌লগুলোতে এখানে জল ভরে নেওয়া যাক ভুতো। সব জল তো ডিম ধুতেই গেল।" আমি বললাম।

নাজিমসাহেব বললেন, "ছোড়িয়ে তো। ঝুট্‌মুট্‌ দের হো রহা হ্যায়। ঔর দের কর্‌নেসে শিকার-উকার কুছ্‌ নেহী মিলেগা। ঝুটা পরিসানী হোগা।"

ভুতো জীপ স্টার্ট করে বলল, "আপনারা কি কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্র-ছাত্রী নাকি ? যেখানেই যান, জলের বোতল গলায় ঝুলিয়ে....."

গোপাল চটে উঠে বলল, "সবটাতে ইয়ার্কি কোরো না। বন-পাহাড়ে ঘুরে ঘুরেই এই অভ্যেস হয়েছে। কিছু খারাপ অভ্যেস নয়। জল হচ্ছে প্রাণ। জঙ্গলে গেলে জল সবসময়ই নেওয়া উচিত।"

ভুতো বলল, "যত্ত সব বাতিক আপনাদের। রাতে এই ঠাণ্ডাতে কেউ আবার ঘড়-ঘড়া জল খায় নাকি ? এমনিতেই তো শীতের দিনে ঘাম হয় না বলে বাথরুম করতে করতে হয়রান অবস্থা। তার উপর...। আমরা কি ফায়ার ব্রিগেডের লোক ?"

ভুতোর সঙ্গে কথায় পারা ভার।

নাজিমসাহেব, যাঁর ভয়ে আমি আর গোপাল কেঁচো, তিনিই পারেন না ; তার আমরা কোন্‌ ছার।

এবার চাত্‌রার রাস্তা ছেড়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠছি। এইসব অঞ্চল, হান্টারগঞ্জ-পরতাপপুর-জৌরী খুবই নামী শিকারের জায়গা ছিল একসময়। যখনকার কথা বলছি, তখনও ছিল—মানে বছর পঁচিশ-তিরিশেক আগে। বেশ ভাল জঙ্গল দু'দিকে। হান্টারগঞ্জে

নাজিমসাহেবের চেলা আছে একজন। সেখানে গিয়ে পৌঁছলে নাকি আর ভাবতেই হবে না। ওর সঙ্গে মাইলখানেক এমন-কী আধ-মাইলটাক হেঁটে গেলেই নিশ্চয়ই শিকার। গুলি ভরো আর মারো, মারো আর ভরো, খচাখচ—গোলি অন্দর ; জান-বাহার।

পাহাড়ের উপরের মালভূমিতে এবং ঢালে ঢালে ফসল লেগে আছে সব। কুল্‌থী, সুরগুজা, মকাই, জিনোর, অড়হর, মটরছিম্মি। খেতে খেতে এখন শম্বর, চিতল হরিণদের ফিস্টি। আলু, কচু ইত্যাদির লোভে আসে শুয়োরের ধাড়ি-কাচির দল। শজারু আর ভাল্লুক। আর তাদের পিছন পিছন চুপিসারে, আড়ে-আড়ে আসে বড় বাঘ ও চিতা।

ভুতো কিন্তু দারুণ জীপ চালাচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তা। খুব কম ব্রেক ব্যবহার করে শুধু গীয়ারেই এত ভাল গাড়ি চালায় ভুতো যে, শেখবার আছে ওর কাছে। গাড়ি তো চালায় অনেকেই, কিন্তু ঠিকমতো গাড়ি চালাতে খুম কম লোকই জানে। নাজিমসাহেব আমাদের সবসময় বলতেন যে, একজন মানুষের সঙ্গে অন্যজনের তফাত হল—ব্যস্‌স্‌ এটুকুতেই। বলতেন, যা-কিছুই করো না কেন জীবনে এমন করে করার চেষ্টা করবে যেন তোমার চেয়ে ভাল করে আর কেউই সেই কাজটা না করতে পারে। যখন যা করবে, তাতেই সেরা হবার সাধনা করবে। বলতেন, এই জেদটুকু থাকলে তবেই না মানুষ মানুষ হয়। মানুষের শরীর তো সব মানুষেরই আছে। কিন্তু তা বলে সবাই-ই কি মানুষ ?

আমরা এখন পাহাড়ের অনেক উপরে উঠে এসেছি। লাল সুরকি-রঙা মাটির কাঁচা পথ। ধারে পাহাড়-জঙ্গল। ধুলো উড়ছে না বেশি। ধুলোরাও যেন শীতের রাতে শিশিরের কাঁথা মুড়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে। বাঁকের মুখে হঠাৎ একটা পাটকিলে-রঙা ধেড়ে খরগোশ দেখা গেল। পথের একেবারে উপরেই।

নাজিমসাহেব বললেন, "মান্‌হুস্‌।"

অর্থাৎ, মহা-অপয়া। বড় শিকারে বেরিয়ে খরগোশ মারা বারণ ছিল। জঙ্গলে ঢুকে প্রথমেই খরগোশ দেখলে সেদিন শিকার পাওয়া যাবে না বলেই বিশ্বাস করতেন এই অঞ্চলের শিকারিরা। এ ব্যাপারে এক-এক জায়গায় এক-একরকম কুসংস্কার। শিকারিদের মতো কুসংস্কার বোধহয় গ্রামের মেয়েদেরও নেই।

ভুতো বলল, "দুস্‌-স্‌-স্‌-স্‌..."

খরগোশটা টুইস্ট নাচতে নাচতে চলল কিছুক্ষণ জীপের সামনে সামনে। তারপর হঠাৎই তড়াক্‌ করে বাঁয়ে লাফিয়ে গেল। খাদে পড়ল কি কাঁটা-ঝোপে বিঁধল, বোঝা গেল না। খরগোশটার দিক থেকে চোখ ফেরাতেই দেখি এক প্রকাণ্ড চিতা, শীতের চকচকে জেল্লাদার চামড়াখানা গায়ে ফেলে দিব্যি গোঁফে চুমকুড়ি দিতে দিতে একেবারে বড় রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে কোমর আর লেজ দুলিয়ে লটর্‌-পটর্‌ করতে করতে রোঁদে বেরিয়ে এদিকেই আসছে।

ভুতো এর আগে কখনও বাঘ দেখেনি জঙ্গলে ; চিতাও নয়। জঙ্গল বলতেও দেখেছে মামাবাড়ির আমবাগান। হাজারিবাগেও এই প্রথম আসা ওর। শিকার বা বনজঙ্গল সম্বন্ধে ওর অভিজ্ঞতা তখন কিছুই ছিল না বলেই উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনা খুবই বেশি ছিল। ক্যাল্‌কেশিয়ান ভুতোকে মানা করার আগেই সে দু'হাতে হর্ন টিপে ধরে হর্নের সঙ্গে গলা মিলিয়ে, 'ওরে বাবাগো ! বাঘে খেলেগো !' বলে চিৎকার করে উঠল। কত পার্সেন্ট ভয়ে, আর কত পার্সেন্ট পেজোমিতে , তা ওই-ই জানে।

বাঘই বেশি ভয় পেয়েছিল, না ভুতো, তাও ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু আচমকা হর্ন বাজার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ ঘাবড়ে গিয়ে 'ঘাবুড়' বলে এক হাঁক ছেড়ে লাফ মেরে জঙ্গলের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল।

বাঘকে বেকায়দায় ফেলার জন্যে আমরা কায়দা করে হুড়হুড়িয়ে নামতে যাচ্ছিলাম জীপ থেকে। সামনের কাঁচ ও হুড নামানো ছিল বলে জীপে বসে তাকে কব্জা করা মুশকিল ছিল। নাজিমসাহেবও তার চামড়ার কেস থেকে বন্দুকটা আর্ধেক বের করে ফেলেছিলেন, কিন্তু

চিতা-মহারাজের হাওয়া হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোঁ-কোঁওও-কোঁ-চোঁ-চোঁ-চোঁওও—একটা বদখত আওয়াজ করে উঠল জীপটা।

ভুতো স্টীয়ারিং-এ বসেই বাঘের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বেদম হাসতে লাগল।

সাকির মিঞা রেগে বলল, "কেয়া লড়প্পন্‌বাজি কর্ রহা হ্যায় আপ ?"

"লড়প্পন্ তো হ্যায়ই হ্যায়।" বলেই নাজিমসাহেব ড্রাইভারকে বললেন, "আপ উতারকে জারা দেখিয়ে না জনাব ক্যা হুয়া !"

সাকির মিঞা নামার আগেই ভুতো বলল, "ট্যাঙ্কে তেল শেষ গোপালদা। জীপ আর যাবে না। চিতল্‌কা কাটলিস্ ? ক্যা আগুাবাবা ?"

"যাঃ। তা কী করে হয় ?" গোপাল অবিশ্বাসের গলায় বলল।

"অনেক কিছুই হয়। হবার হলে।"

নাজিমসাহেব বললেন, "এই ভুচু, মজাক্ মত করনা। ইয়ে মজাক্‌কা বাত নেহী। ওয়াক্ত ভি নেহী !"

"মজাক্-উজাক্ নেহী। পেট্রলকা ট্যাঙ্কিমে পেত্নি ঘুষ গ্যয়া।" ভুতো নাকি সুরে বলল।

বিরক্ত মুখে নাজিমসাহেব বললেন, "পেত্নি ? পেত্নি, কা চিজ ?"

"কা চিজ ? বাঙালি, জানানা ভূত। যিস্‌কা পাকড়তা ওহি জান্‌তা কা চিজ। অব্ বোলিয়ে নাজিম মিঞা ক্যা কিয়া যায় ?"

আমরা সকলেই নামলাম। ড্রাইভিং-সীট তুলে আবার সাকির মিঞা বাঁশ বাগিয়ে তেল মাপল। আশ্চর্য ! সত্যিই একটুও তেল নেই।

ভুতো বলল, "আপ্‌কা ট্যাঙ্কিমে জরুর ছ্যাঁদা হো গ্যয়া।"

সাকির মিঞা নট্-নড়ন-চড়ন নট্-কিচ্ছু, স্থিরনেত্র হয়ে তাকিয়ে রইল।

নাজিমসাহেব যে-কোনো বিপদেই মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। আর বাক্যব্যয় না করে, জীপ থেকে ধীরেসুস্থে নেমে, ভাঙা কাঠকুটো যোগাড় করে জীপের একটু দূরেই দেশলাই জ্বেলে আগুন করলেন। আমরাও নেমে কাঠকুটো যোগাড় করে এনে তার পাশে জমা করে রাখতে লাগলাম। হয়তো সারারাতই এখানে পড়ে থাকতে হবে। কে জানে ?

আগুনের সামনে সকলে গোল হয়ে বসতেই নাজিমসাহেব পেটে হাত দিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, "না-দানা, না-পানি। ক্যা হায়রানি ! ঔর বহত্‌ই খাত্‌রা। পাক্‌ড়া গিয়া তো কা হোগা ? পইলে ডাণ্ডা পিছে বাত্। হান্টারগঞ্জকা শুটিং পারমিট লেকে হামলোগ্ থোড়ি আয়া ! ইয়া আল্লা। ক্যা বদ্‌নসীবি !"

গোপাল উঠে ওয়াটার-বটল দুটো নেড়ে-চেড়ে দেখল।

নাঃ, এক ফোঁটা জলও নেই সঙ্গে। শিকারে বেরোলেই নাজিমসাহেবের সঙ্গে অ্যামেরিকান আর্মির ডিস্‌পোজালের একটা রাক্‌স্যাক্‌ও থাকতই থাকত। ছোট, কিন্তু তার মধ্যে থেকে রাত-বিরেতে জায়গায়-অজায়গায় কতবার বাখরখানি রোটি, শাণ্ডিলা লাড্ডু, গরমে বা বর্ষায় পাটনাই ল্যাংড়া বা দশেরি আম, তিতির-বাটরের কাবাব ইত্যাদি অবিশ্বাস্যভাবে বেরিয়ে পড়ত। আমরা বলতাম প্যাণ্ডোরা'জ বক্‌স্। কিন্তু ঠিক আজকেই সেই রাক্‌স্যাকটি সঙ্গে নেই। ঘড়িতে এখন রাত ন'টা। হানটারগঞ্জ-পরতাপ্‌পুর থেকে একটা বাস নাকি ছাড়ে ভোর চারটেতে—যায় দোডি হয়ে অন্য জায়গায়। সেই বাসেই পাহাড় থেকে নেমে দোডিতে পেট্রল কিনে আমাদের ফিরে আসতে হবে। নাজিমসাহেব জানালেন।

মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একে শিকার পণ্ড, তায় এই বিপদ !

ঠিক হল, গোপাল এবং সাকির মিঞা বাসে করে কাল ভোরেই গিয়ে তেল, আমাদের জন্যে খাবার এবং পেট্রল ট্যাঙ্কের জন্যে সাবান নিয়ে আসবে। কোনোরকমে ট্যাঙ্কের ছ্যাঁদা সাবান দিয়ে বন্ধ করে দোডি বা চাত্‌রা পর্যন্ত চলে গেলেই ট্যাঙ্ক ঝালাইয়ের ব্যবস্থা একটা হবেই।

কাল ভোরের তো এখনও অনেকই দেরি। এখন তো সময় আর এগোচ্ছে না। দশটা, এগারোটা ; বারোটা তারপর একটা। ফুটফাট করে কাঠ পুড়ছে। যতরকম গল্প জানা ছিল আমাদের সব গল্প জমা করেও সময় জ্বলছে না। পেটের মধ্যে ধেড়ে ধেড়ে পাটকিলে খরগোশ কন্‌টিন্যুয়াস্‌লি লাফাচ্ছে। হায় চমনলাল ! আহা ! তোমার খিচুড়ির জবাব নেই।

আমি আর গোপাল নাজিমসাহেবের পাশে আগুনের সামনে বসে আছি। পাশেই বন্দুক রাখা আছে। গুলিভরা। এ জঙ্গলে খুব ভাল্লুক। নাজিমসাহেব বলছিলেন। চিতাবাঘের দেখা তো পাওয়াই গেল একটু আগেই। বড় বাঘও আছে। তবে মানুষখেকো না হলে বাঘকে নিয়ে ঝামেলা নেই। ভাল্লুকগুলোই গায়ে-পড়ে ঝামেলা বাধায়, নাক-চোখ খুব্‌লে নেয়, ভারী যাচ্ছেতাই। কিন্তু খালি হাতে থাকলে তবেই ভয়। গায়ে-পড়া স্বভাবের জন্তু-জানোয়ারই তো আমাদের পছন্দ। বন্দুক তুলব আর চিতপটাং। ভুতো আর সাকির মিঞা জীপের মধ্যেই ঘুমোচ্ছে। এই ঠাণ্ডায় কী করে যে ঘুমোচ্ছে খালি গায়ে, তা ভুতোই জানে ! ওর নাক-ডাকার ফঁফর্ ফঁর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। গোপাল আর আমিও আগুনের পাশে বসে বসেই ঢুলছিলাম। ঘুমোন না কেবল নাজিমসাহেব। আমরা তাঁর কাছে সহোদর-প্রতিম বলে, বিপদ ঘটলেই সেল্ফ-অ্যাপয়েন্টেড্ লোকাল-গার্জেন হয়ে যান তিনি সব জায়গাতে।

হঠাৎ ভ্যাঁ-পোঁ, ভ্যাঁ-পোঁ বাসের হর্নে আমরা চমকে উঠলাম। চমকে উঠে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সত্যিই ভোর হয়ে এসেছে। এই রাত কী করে ভোর হবে তাই ভাবছিলাম, কিন্তু ভাবনা শেষ হবার আগেই ভোর হয়ে গেল। সব রাতই শেষ হয় একসময়, সুখের রাত ; দুখের রাত। চারটে বেজে গেছে। বাস এসে গেছে পরতাপ্‌পুর থেকে। কুল্লে জনা-পাঁচেক যাত্রী তাতে আপাদমস্তক কম্বলে ঢেকে পা-মুড়ে বসে আছে। অতিকষ্টে ঠেলেঠুলে জীপটাকে আমরা সাইড করে দিলাম। বাস পাস করলে গোপাল সাকির মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে বাসে উঠে চলে গেল। বলল, "সকাল আটটা-ন'টার মধ্যেই ফিরে আসছি পেট্রল এবং খাবার-দাবার নিয়ে। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।"

বাস চলে গেল। শীতের রাতে জেগে থাকলে ভোরের দিকে ভীষণ ঘুম পায়। শীতও তখন প্রচণ্ড জ্বালায়। গোপালের অভয়বাণী শুনে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে, টুপিটা ঘাড় অবধি দিয়ে। ওভারকোটের কলারের উপর নামিয়ে। এক সময় প্রথম-সকালের মুরগি-ময়ূর ডেকে উঠল কঁকর-ক্, কেঁয়া-কেঁয়া করে। শিকার-টিকারের ইচ্ছা বা উপায় তখন ছিল না। ভুতো জীপ থেকে নেমে দুবার আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে নাজিমসাহেবকে বলল, "গুড মর্নিং নাজিমসাহেব। ব্রেকফাস্টমে কেয়া খাইয়েগা ? ফরমাইয়ে !"

নাজিমসাহেব ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভুচু, ভুচু.....ভুচু-উ-উঃ" মানে, ভুচু সাবধান।

বেশ রোদ উঠে গেছে। চারধারের জঙ্গল জেগে উঠেছে। রাতে খালি রাত-চরা পাখিদের ডাক আর শম্বর চিতলের শব্দ ছিল। এখন কত পাখি, প্রজাপতি ; পোকা-মাকড়। শীতের রোদ-পড়া চকচকে সকালের জঙ্গল গম্‌গম্ করছে প্রাণের শব্দে চারপাশে। হঠাৎ একটি দেহাতি ছেলেকে আসতে দেখা গেল পাহাড়তলি থেকে। লোহার নাল-লাগানো নাগরা জুতো পায়ে চটাং-ফটাং শব্দ করতে করতে পাথর-ভরা পথে। সে আসছিল। তার কাঁধে একটা মস্ত লাঠি। লাঠির ডগায় একটা কাপড়ের পুঁটলি।

আমি বললাম, "পুঁটলিতে খাবার-টাবার থাকতেও পারে। কী নাজিমসাহেব ? বাজিয়ে দেখুন না একটু। অবস্থা যে কাহিল !"

নাজিমসাহেব ডাকলেন, "আরে ও বাব্বুয়া ! ইন্নে আ বাবা ; ইন্নে আ..."

বাবুয়া কাছে এসে হাঁ করে দাঁড়াল।

"তেরা গাঁঠ্‌রিমে ক্যা বা ?"

ছেলেটি হাসল।

ভুতো বলল, "ছাতু-ফাতু হবে। এখন আবার বাছ-বিচার। একে মায়ে রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা ! ম্যানেজ করুন না পুঁটলিটা কোনোক্রমে। কোঈ কাম কা নেহী আপ।"

নাজিমসাহেব পটিয়ে-পাটিয়ে ওকে দিয়ে পুঁটলিটা নামিয়ে খুব যত্ন

ধরে নাকের কাছে এনে শুঁকলেন। কী বুঝলেন, উনিই জানেন।
ভুতো বলল, "গন্ধগোকুল ! ছাতু-ফাতু হলে আমি খাব না। আমার কুতুকুতু লাগে ছাতু খেলে। মানে, ছাতু মাখতে গেলেই !"
তারপর পুঁটলিটা খুললেন নাজিমসাহেব সযত্নে, নিজে হাতে পরম ধৈর্যের সঙ্গে।
চোখ গোল করে চেয়ে রইলাম ভুতো আর আমি। পুঁটলি খোলা হতেই দেখা গেল, দু'জোড়া নতুন নাল-বসানো প্রমাণ সাইজের নাগরা জুতো তাতে।
ভুতো বলল, "ও লালাদা ! গোল্ড-রাশে চার্লি চ্যাপলিন জুতো খেয়েছিলেন, তাই না ? তবে, সে তো সুস্বাদু সেদ্ধ জুতো। এ জুতো খেলে সাক্ষাৎ বদহজম। খাওয়া উচিত হবে না। কী বলেন ?"
নাজিমসাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেছিল। ছেলেটি নীরবে হেসে আবার পুঁটলি উঠিয়ে চলে গেল।
ভুতো ছেলেটির দিকে চেয়ে বাংলায় বলল, "খুব ঠকালি, না ? আচ্ছা ! এখন যা ! তোকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যখন ধর্মতলার মোড়ে দাঁড় করিয়ে দেব তখন বুঝবি, কত প্যাডিতে কত রাইস। তিনদিন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেও রাস্তা পেরুতে পারবি না ট্রাফিকের ভিড়ে। টিট-ফর-ট্যাট করে দেব !"
পেছন দিকে অনেক দূর থেকে মাদলের ধুতুর-ধাতুর-ধিতাং-ধিতাক্ ধুতুর-ধাতুর আওয়াজ আসতে লাগল। আমাদের পেছনেই পাহাড়ের পায়ে পায়ে ইলাজান নদী ঘুরে গেছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে নদী ছবির মতো। ভুতো বলল, "চলুন, ঐ দিকেই ঘুরে আসি। মাদল বাজছে যখন, তখন কোনো ব্যাপার আছে। লোকজন থাকলে খাবারও পাওয়া যেতে পারে। চলিয়ে, নাজিমসাব।"
নাজিমসাহেব বললেন, "আমি বুড়হা-পুরানা আদ্মী। আমি কোথাওই যাব না। বন্দুকগুলোও পাহারা দিতে হবে।" বলেই আমাকে বললেন, "আপভি মত যাইয়েগা। কোতোয়ালীমে ভর্ দেনেসে বাতচিত করনেকা লিয়ে ভি তো কই দোস্ত চাহিয়ে !"
তবু, নিজের বন্দুকটা হাতে নিয়ে আমি ভুতোর সঙ্গে ওকে একটু এগিয়ে দিতে গেলাম। নাজিমসাহেব ভাল্লুক সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে দিলেন ওকে। বললেন, "নোচ্ লেগা। বড়ী খতরনাগ হ্যায়। ইয়ে জঙ্গল তুম্হারা মাম্মাবাড়িকা আম্‌কা-বাগিচা মত্ শোচ্‌না।"
নদীতে পৌঁছে হাত-মুখ ধুয়ে জল খেলাম। দাঁত জমে গেল। এখনও ভীষণ ঠাণ্ডা। ফ্রিজ খুললে যেমন ধোঁয়া বেরোয় তেমন ধোঁয়া বেরুচ্ছে জল থেকে। ভুতো বলল, "ঐ দেখুন, নদীর ওপারে যেন কার বিয়ে হচ্ছে। শ্রাদ্ধ হলেই বা কী এল গেল। গেলেই খেতে দেবে। চলুন চলুন। ধিতাং ধিতাং বোলে, মাদলে তাল তোলে—" বলেই গান জুড়ে দিল ভুতো বেসুরে, কোমর দুলিয়ে।
আমি বললাম, "নেমন্তন্ন ছাড়াই যাবে ? মান-সম্মান নেই ?"
"আর মান-সম্মান ! পড়েছি আপনাদের খপ্পরে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"
বলেই, ছপাং-ছপাং করে হাওয়াইন্ চপ্পল পরে জিনস ভিজিয়ে নদীর মধ্যে দিয়ে ওপারের দিকে যেতে লাগল ভুতো। ওয়াটার-বট্‌লে ভর্তি করে নাজিমসাহেবের জন্যে খাবার জল নিয়ে ফিরে এলাম আমি নদী থেকে। এখন এগারোটা বাজে। কাল দুপুরেই শেষ খেয়েছিলাম আমরা। ব্যস্‌স্ ! বিকেলে হাজারিবাগে চা। রাতে দোভিতেও শুধু চা। গরমাগরম রোদ এসে পড়ছিল ঘাড়ে। আরাম লাগছিল খুব। জল খেয়ে আমি আর নাজিমসাহেব চওড়া চ্যাটালো পাথরের উপর শুয়ে পড়লাম।
অনেকক্ষণ পর ভুতোর ডাকে চোখ খুলল।
ভুতো বলল, "নাপিতের বাড়ি বিয়ে ছিল। খুবই খাতির-যত্ন করল। দই আর লাড্ডু খেয়েছি। মাছ খেয়েছি ; চালোয়া। মাড়ুয়ার রুটি দিয়ে।" বলেই, হেকুত্ শব্দ করে একটা ঢেকুর তুলল।
ঢেকুরের শব্দ যে এত মিষ্টি, আগে তা কখনও খেয়াল করিনি।
ঘড়িতে এখন দুটো বাজে। শীতের বনে বনে রোদ ঝক্‌ঝক্ করছে। এতক্ষণ কী করছে গোপালরা দোভিতে ? ভারী রাগ হতে লাগল আমাদের। দুটো থেকে তিনটে, তিনটে থেকে চারটে। আবারও রাত ঘনিয়ে আসতে লাগল। সারাটা দিন পরের খোলা জীপ, পরের ডিম, পরের বন্দুক ছেড়ে যেতেও পারিনি কোথাও। আর নিশ্চিন্ত করে যারা গেল তারা কখন যে দয়া করে এসে পড়ে তাও তো অজানা। খিদের কথা ছেড়েই দিলাম, কখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক এসে ক্যাঁক্ করে ধরে সেই ভয়ে সবসময়ই টেন্স হয়ে বসে আছি। একটুও রিল্যাক্স করতে পারলুম না এমন সুন্দর পরিবেশেও। শিকারের কথা ভাবছিই না....
ময়ূর-মুরগি ডাকতে লাগল। তারপর দেখতে দেখতে অন্ধকারও ডাকতে ডাকতে এসে হাজির হল। নাজিমসাহেব সূর্য ডোবার আগে ওরই মধ্যে একবার নামাজ পড়ে নিলেন। প্রার্থনাতে কী কী বললেন তা আর বুঝতে বাকি রইল না। আমাদের দুজনের অবস্থাই বেশ কাহিল। ভুতো কেবল এখনও লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একা।
নাজিমসাহেব কালকের আগুনের জায়গাতেই বাসিবিয়ের আসনের মতো যত্ন করে আগুন জ্বালালেন নতুন করে। কে জানে, এই আগুনই চিতার আগুন হবে কিনা ! আগুনের কাঁপা-কাঁপা লাল আলোয় আমরা তিনজনে তিনজনের মুখ দেখতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ বাসের এঞ্জিনের আওয়াজ এবং ভ্যাঁ-পোঁ, ভ্যাঁ-পোঁ হর্ন শোনা গেল।
আমরা চমকে উঠলাম, অবিশ্বাসে।
নাজিমসাহেব বললেন, "গোপালবাবু যদি এই বাসেও না আসেন ?"
ভুতো বলল, "যদি না আসেন ? তাহলে কোর্ট-মার্শাল করা হবে। ফায়ারিং-স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হবে।"
কিন্তু ওরা নামল শেষ পর্যন্ত ঐ বাস থেকেই। গোপালের হাতে একটা মাটির হাঁড়ি, সাকির মিঞার হাতে শালপাতার ঠোঙায় অনেকগুলো রুটি। বাসের কনডাক্টর তেলের জেরিক্যানটাকে একজন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ধরাধরি করে নামিয়ে দিয়ে বাসের গায়ে দুটো জব্বর চাঁটি মেরে বলল, "হাঁ উস্তাদ ! টিকিয়া উড়ান্।"
গোপাল বলল, "নাও, শিগগিরি খেয়ে নাও দেখি ! কী কাণ্ড ! তোমাদের জন্যে ভোরে গিয়েই খাবার কিনেছিলাম। তখন কি জানি যে পেট্রল নিয়ে কোনো ট্রাকই এদিকে আসতে চাইবে না। সাইকেল-রিকশাতে খুচুর-খুচুর করে এত মাইল এসে বসে আছি পাহাড়ের নীচে সারাদিন হা-পিত্যেশে ! এই বাসও তো পেট্রল বইতে চাইছিল না। নেহাতই যাবার সময় ওরা তোমাদের দেখে গেছে পথে বসে আছ, তাই দয়া করল। যাক্‌গে, কথা পরে শুনবে, খেয়ে নাও আগে। খাও, খাও।"
কথা শোনার মতো সময় বা অবস্থা আমাদেরও একেবারেই ছিল না।
তাড়াতাড়ি রুটি ছিঁড়ে, ডিমের হাঁড়িতে হড়হড়িয়ে হাত ঢোকাতে যাব হঠাৎ পাশ থেকে শুনি আঁ-আঁ-আঁ-আঁক।
শুকনো রুটি আর ডিম আটকে গেছে নাজিমসাহেবের গলার মধ্যে। দুপুর বেলার দাঁড়কাকের মতো হাঁ করে রয়েছেন তিনি।
গোপাল ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "দেখেছ। কী খারাপ ! ধাবাওয়ালাটা ! নতুন মাটির হাঁড়িতে করে ডিমের-কারি দিয়ে দিয়েছে। তাও সেই সক্কালবেলায়। ঝোল সব তো খেয়ে নিয়েছে হাঁড়িই। ঈসস্-স্-স্-স্-ঈসস্-স্...."
আমার খাওয়া মাথায় উঠল। চেঁচিয়ে বললাম, "অ্যাই ভুতো ! নাজিমসাহেবকে জল দাও। শিগগিরি জল। মারা যাবেন যে ! ওয়াটার-বটল।"
"জল কোথায় ? জল নেই।" ননশালান্টলি ভুতো বলল, "একটু আগেই তো আমি জঙ্গলে গেছিলাম। অন্ধকারের মধ্যে নদীতে গিয়ে তো আর পশ্চাৎদেশে ভাল্লুকের খামচানি.... । মাড়ুয়ার রুটি—পেটের মধ্যে সাংঘাতিক গ্যাঞ্জাম্.... । হান্টিং করতে নিয়ে এসেছে নাজিম-বুড়ো হান্টারগঞ্জে ! আর জায়গা পেলে না ! মরুক গে যাক বুড়ো গলায় ডিম বিঁধে।"
গোপাল, নাজিমসাহেবের হাঁ-করা মুখের এবং জীপের হেডলাইটের মতো ড্যাবড্যাবে জ্বলজ্বলে চোখ-জোড়ার দিকে চেয়ে আতঙ্কিত গলায় বলল, "ডিমই এযাত্রা ডোবাল আমাদের। কেলেঙ্কারি !"
ভুতো ওরই মধ্যে ফিচিক্ করে হেসে উঠে বলল, "ঈস্‌স্-স্-স্, ইক্কেরে ইন্‌ফিনিচুড় ডিমেংকারি !"

পাচকসূর্য

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নারানপুরের হারান রায়দা
জানে রান্নার নানান কায়দা,
কোনোটাই নয় সেকেলে।
নয় মোগলাই নয় চাইনিজ,
নবাবিস্কৃত অপরূপ 'চিজ'
ভুলবে না কেউ সে খেলে।
পায়সে সে দেয় লঙ্কা প্রচুর,
মাংসের চপে দোক্তার পুর,
ভোক্তার মাথা ঘুরে যায়।
বেসনেতে ভাজা কাঁঠালের কোয়া,
ঝালবড়া দিয়ে রাঁধা মালপোয়া,
পাতে পড়লেই উড়ে যায়।
পাকা কলা দিয়ে চিংড়িঘন্ট
চেয়ে চেয়ে লোকে খায় আকণ্ঠ।
কচু ঢ্যাঁড়সের খিচুড়ি
দেখে পাছে হয় বোঝবার ভ্রম—
চোখ বুজে তাই খাওয়াই নিয়ম ;
চাল ডাল তাতে কিছুরি
থাকে নাকো কোনো সম্বন্ধই।
জোঁদা টক রোজ আধ মন দই
রন্ধনে লাগে রায়দার।
যা রাঁধে তাতেই দু'চার হাতা সে
দই দেয়, যাতে খেয়ে অনায়াসে
অতিথিরা বেঁচে যায় তার।
সম্প্রতি এক বেধেছে ফ্যাসাদ,
দমভোর খেয়ে হেরম্বনাথ
গিয়েছেন মারা কল্য ;
বড়লোক তিনি। জুড়ে বারান্দা
পুলিশ দাঁড়িয়ে ; বুঝি হারানদা
এইবার জেলে চলল।
'পাচকসূর্য' উপাধিটা তারে
দেওয়া হবে কথা ছিল রবিবারে,
মুলতুবি সেটা হইল।
রেড়ির তেলেতে ভেজে ছোলাবাটা
হালুয়া করার যে পরীক্ষাটা
চলছিল — বাকি রইল।

ছবি : দেবাশিস দেব

উপন্যাস

গোগোল চিক্কুস নাগাল্যাণ্ডে

সমরেশ বসু

গোগোল যেবারে গরমের ছুটিতে দার্জিলিং গিয়েছিল, আর দার্জিলিং থেকে নেমে গিয়েছিল হলং স্যাংচুয়ারিতে, সেটা বছর দুয়েক আগের ঘটনা। সেবারই হলংয়ের জঙ্গলে এক পাগলা হাতির সঙ্গে গোগোলের বন্ধুত্ব হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। গল্পটা আর নতুন করে কিছু বলার নেই। অনেক আগেই সে-গল্প জানাজানি হয়ে

ছবি : অনুপ রায়

গিয়েছে। নেহাত খেই ধরিয়ে দেবার জন্য এইটুকু বলা যায়, সেবার হলংয়ে বিরাট এক দাঁতাল পাগলা হাতি নেমে এসেছিল, আসাম থেকে ভুটান পেরিয়ে। সে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, পোষা হাতির পিঠে চেপে কেউ আর গণ্ডার হরিণ ময়ূর বাঘ ইত্যাদি দেখতে যেতে সাহস পায়নি। অথচ সেই হাতিই, গোগোলকে জঙ্গলের ধারে একলা পেয়ে, শুঁড় দিয়ে আলতো করে ঠেলে নিয়ে জঙ্গলের গভীরে ঢুকে গিয়েছিল। গোগোল খুবই ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ভয় ভাঙতেও বেশি দেরি হয়নি। হাতিটি মোটেই রেগে যায়নি, পাগলামিও করেনি। গোগোলকে শুঁড় দিয়ে ঠেলে ঠেলে অনেকখানি ঘুরে, আবার বাংলোর কাছেই ফিরে এসেছিল। তাতেই গোগোল গণ্ডার হরিণ ময়ূর বাঘ সব দেখে নিয়েছিল।

গোগোলের সেবারে কোন পাগলা হাতির সঙ্গে বন্ধুত্বই হয়নি। শিলিগুড়িতে মামার বাড়িকে সেন্টার করে ভুটানের ফুন্‌সলিংয়েও বেড়াতে গিয়েছিল। গিয়েছিল মামার সঙ্গেই, তাঁর এক নেপালি বন্ধুর বাড়িতে। তিনি গোগোলকে একটি সুন্দর উপহার দিয়েছিলেন। সেই জ্যান্ত উপহারটির প্রতি গোগোলেরও বিশেষ নজর পড়েছিল, আর তার সঙ্গেই ওর খুব ভাব জমে গিয়েছিল। কেবল তার সঙ্গেই নয়, তার বাবা মা ঠাকুর্দার সঙ্গেও গোগোলের ভাব কিছু কম জমেনি। তার নাম ছিল চিক্কুস। এরকম নাম গোগোল কখনও শোনেনি। কিন্তু চিক্কুসের বাবা মা ঠাকুর্দার নামগুলো ছিল অন্যরকম। ঠাকুর্দার নাম ছিল জং। এরকম নামও অবশ্য গোগোল আগে শোনেনি। তবে তেমন একটা অদ্ভুত মনে হয়নি। বাবার নাম ছিল সোন্‌দা। আসলে সোন্‌দা নামের সঙ্গে নাকি ভল্লুকের সম্পর্ক আছে। দার্জিলিং যাবার পথে, সোনাদা নামে একটা রেলস্টেশন আছে। গোগোলের কেবল এইটুকু মনে আছে, কেউ একজন ওকে বলেছিল, নেপালিতে সোনাদা মানে ভল্লুক বা ভল্লুকের আস্তানা। তা হলে, চিক্কুসের বাবার নাম হওয়া উচিত ছিল শ্বেত সোন্‌দা, বা সাদা সোন্‌দা। কারণ চিক্কুসদের বংশে কালো রঙ বলে কিছু নেই। বেশির ভাগ একেবারেই সাদা। যাকে বলে ধবধবে সাদা। তার সঙ্গে বড়জোর পিঠ বা কানের দিকে খুব হালকা হলদে রঙের আভাস। সেটাও অনেকটা সোনালি রঙের মতোই বলা যায়। চিক্কুস আর ওর বুড়ো ঠাকুর্দা জংয়ের পিঠের দিকের রঙ অনেকটা সেইরকম। আর চিক্কুসের মায়ের নাম গোল্ডি। অথচ গোল্ডির বা সোন্‌দার কারোর গায়েই সোনালি রঙের ছোঁয়া মাত্রও নেই।

চিক্কুসদের বংশগত নাম হল লাসা পপি। লাসা তিব্বতের রাজধানী। মামার বন্ধু নেপালি ভদ্রলোক চিক্কুসদের আদি পরিচয় দিতে গিয়ে, তিব্বতি বলেছেন। হিমালয়ের বরফ-ঢাকা দেশের প্রাণী তো, চিক্কুসদের গায়ে নাকি সেইজন্যই ঐ রকম বড় বড় লোম। বড় লোম তো অনেক কুকুরেরই থাকে। কিন্তু লাসা পপিদের গায়ের লোম যেন সারা গা ঢেকে, বটের ঝুরির মতো নেমেছে। ধবধবে সাদা লোমের মধ্যে, তিনটি কালো বিন্দু মাত্র দেখা যায়। তিনটি কালো বিন্দুর মধ্যে, দুটি হল চোখ। আর একটি নাক। বাদবাকি সবই সাদা লোমে ঢাকা। জংয়ের আর সোন্‌দা ও গোল্ডির ভুরুর ওপরের চুল নাকি মাঝে-মাঝে ছেঁটে দিতে হয়। নইলে, যেভাবে দু'চোখ ভুরুর লম্বা লোমে ঢেকে থাকে, চোখে দেখতে পাওয়াই মুশকিল।

কথাটা যে মিথ্যে নয়, গোগোল চিক্কুসকে দেখেই বুঝেছিল। মাত্র ছ সপ্তাহ বয়সেই, তার ঝোলা কান আর লোমশ মুখে, তিনটি ছোট কালো বিন্দু ছাড়া কিছুই দেখা যেত না। আর কিছুই দেখা যেত না, সেটা বললে ভুল হবে। মাঝে-মাঝে তার টুকটুকে লাল জিভ আর নতুন গজানো সাদা ছোট-ছোট ঝকঝকে দাঁত দেখা যেত। কান ঝোলা হওয়ার কারণ নিশ্চয়ই মাফলারের প্রয়োজনে। কনকনে ঠাণ্ডা বরফের দেশের প্রাণী বলেই, প্রকৃতি তাদের বড়-বড় লোমওয়ালা কান দুটো এমন ভাবে ঝুলিয়ে দিয়েছে, যাতে, কানের ভিতরে ঠাণ্ডা না ঢুকতে পারে। তার মানে, লাসা পপিদের ঘন লম্বা লোমই তাদের ফারের কোটের থেকেও বেশি কাজ দেয়। জামা গায়ে দেবার কোনো দরকার হয় না।

প্রথম দর্শনে, গোগোল চিক্কুসকে একটি বেশ বড়সড় সাদা খরগোশ ভেবেছিল। সে-ভাবাটা মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। খরগোশের সঙ্গে চিক্কুসের তফাত ধরা মোটেই শক্ত ছিল না। খরগোশের মুখ, কান, চোখ, সামনের দিকের চেহারা একেবারেই আলাদা। খরগোশদের কান খাড়া, চোখ দুটো চুনির মতো লাল দেখায়। তাদের গোঁফের চেহারাও অন্যরকম। সেই তুলনায় চিক্কুসের গোটা মুখ আর শরীরের চেহারাই আলাদা। তা ছাড়া, ফুন্‌সলিংয়ে গোগোল সেই নেপালি ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে পৌছবামাত্রই, দেখতে পেয়েছিল, বড় খরগোশের মতো একটা প্রাণী প্রথমেই লাফ দিয়ে ওর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। গোগোল খুব চমকে গিয়েছিল। বলতে গেলে, ও ভয় পেয়েই দু' পা পেছিয়ে গিয়েছিল। যেমনি পেছনো, অমনি চিক্কুসের আর-এক লাফ। গোগোলের দু-পায়ের ফাঁকে মাথা গুঁজে দিয়ে, জুতোর গোড়ালির ওপরে, মোজায় কুটকুট করে দাঁত বিঁধিয়ে দিয়েছিল। সেই দাঁত বিঁধনোতে গোগোলের ভারী সুড়সুড়ি লেগেছিল। তারপরেই, নিচু হয়ে, চিক্কুসকে দু হাতে তুলে নিয়েছিল। আর চিক্কুস এমনভাবে ওর গাল গলা চেটে আদর করেছিল, যেন গোগোল ওর কত দিনের চেনা।

চিক্কুসের আদরেও গোগোলের সুড়সুড়ি লেগেছিল। চিক্কুসের লাল জিভের স্পর্শ ছিল বেশ গরম। নাকের ডগা ছিল ভেজা। আর ফোঁস্-ফোঁস্ করে যেন অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিল। তৎক্ষণাৎ গোগোল চিক্কুসকে ভালবেসে ফেলল। চিক্কুসের কালো দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে গোগোলের মনে হয়েছিল, ও যেন হাসছে। চোখের সাদা অংশ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কালো চোখ দুটি খুশি আর দুষ্টুমিতে ভরা।

গোগোল খেয়াল করেনি, কখন সোন্‌দা আর গোল্ডি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির নেপালি কর্তা তখন মামা বাবা মাকে অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত। অন্য কোনো ঘর থেকে বুড়ো জং তখন ভাঙা গলায় খানিকটা বিরক্ত আর গম্ভীর স্বরে ঘেউ-ঘেউ করছিল। গোগোল একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল সোন্‌দা আর গোল্ডি বোধহয় ওর কোলে চিক্কুসকে দেখে রেগে গিয়েছে। সেরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কে এক অচেনা ছেলে এসে, তাদের ছেলেকে কোলে তুলে নিয়েছে, তারপরে হয়তো নিয়ে পালাবে। এরকম সন্দেহ আর রাগ হওয়া অসম্ভব ছিল না। নতুন বাচ্চাদের গায়ে হাত দেবার জন্য, মা-কুকুরকে রেগে উঠতে দেখা যায়। তাই গোগোল তাড়াতাড়ি চিক্কুসকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছিল।

নামিয়ে দিলে কী হবে। চিক্কুস আবার গোগোলের পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সামনের দুই থাবা তুলে দিয়েছিল গোগোলের হাঁটুর দিকে। সেই কালো চোখ দুটো তুলে এমন ভাবে তাকিয়েছিল, যেন স্পষ্টই বলছিল, "নামিয়ে দিলে কেন ? আমাকে আদর করবে না ? আদর করতেও দেবে না ?" আর ওর ছোট্ট ল্যাজটা তখনই ছিল পাকানো, পিঠের ওপর তোলা। ল্যাজটা খুব নাড়িয়ে, কুঁই কুঁই করে আদুরে গলায় শব্দও করেছিল।

গোগোলই বা কী করে ? ওর ভীরু সন্দিগ্ধ চোখ তখন সোন্‌দা আর গোল্ডির দিকে। কিন্তু গোগোল মিছেই ভয় পেয়েছিল। সোন্‌দা গোগোলের দিকে একবার তাকিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিল নেপালি ভদ্রলোকের কাছে। আর গোল্ডি এগিয়ে এসে, গোগোলের পা শুঁকেছিল। চিক্কুসের গায়ে বার কয়েক চেটে দিয়ে, তারপরে গোগোলের দু পায়ের মাঝখানে মুখ গুঁজে দিয়েছিল চিক্কুসের মতোই। মুখ তুলে, গোগোলের মোজার ওপরে চেটেও দিয়েছিল। চিক্কুস তখন মোটেই মায়ের আদর পেতে চাইছিল না। ও মায়ের পিঠে একটা থাবা তুলে, আর একটা থাবা দিয়ে গোগোলের মোজার ওপরে আঁচড় কাটছিল। গোগোল সাহস করে চিক্কুসকে আবার কোলে তুলে নিয়েছিল। তারপরেই চিক্কুসের সেই আবার আদরের ঘটা। গোগোল তো খুশিতে আর সুড়সুড়িতে হেসেই বাঁচে না।

ফুনসলিংয়ে গোগোলরা তিন দিন ছিল। সেখান থেকে থিম্পু যাবার কথা উঠেছিল। নানা কারণে যাওয়া হয়নি। তার মধ্যে একটা কারণ, নেপালি ভদ্রলোককে নাকি ভুটানের অনেকেই পছন্দ করছিল না। পছন্দ না করার কী কারণ থাকতে পারে, গোগোল তা শোনেনি। তাছাড়া মামারও আর ছুটি ছিল না।

থিম্পু যাওয়া নিয়ে গোগোলের তেমন উৎসাহ ছিল না। ও চিক্কুসকে পেয়েই ভীষণ খুশি আর উত্তেজিত ছিল। নেপালি

ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা সবাই বড়। তারা কেউ ছিল না। ভদ্রলোকের নাম শ্রী অশোক চিত্রকর। এরকম পদবী গোগোল কখনও শোনেনি। চিত্রকর বললে শিল্পীই বোঝায়। কিন্তু অশোক চিত্রকর ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি আর তাঁর স্ত্রী, দু'জনের সংসার। আসলে সংসারটা জমজমাট ছিল চিক্কুসদের নিয়েই।

চিক্কুস গোগোলকে পেয়ে প্রায় একরকম খেপেই গিয়েছিল। কোনো সময়েই গোগোলকে ছেড়ে থাকতে চাইত না। গোগোলেরও সেই অবস্থা। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হয়েছিল, মাও চিক্কুসকে খুব ভালবেসে ফেলেছিলেন। গোগোল ভাবতেই পারেনি, চিক্কুসকে মা এত ভালবাসবেন। মা যেন কোলের শিশুর মতো চিক্কুসকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। খেলা করতেন, কোলে নিয়ে নিজের হাতে খাওয়াতেন। গোগোল কেবল অবাকই হয়নি, মা যে কুকুর-বাচ্চাকে এত আদর করতে পারেন, সেটা যেন ও বিশ্বাস করতেই পারেনি। এমনকী, কল্পনাও করেছিল, ও নিজে যখন চিক্কুসের মতো ছোট ছিল, মা নিশ্চয়ই ওকেও সেইরকম আদর করতেন। চিক্কুস লাসা পপি না হয়ে যদি নিজের ভাই-বোন কেউ হত, তা হলে বোধহয় মনে-মনে হিংসেই হত। ফুন্‌সলিংয়ে তিন দিনে বেড়ানো যেটুকু হয়েছে, তার চেয়ে বেশি চিক্কুস আর ওর বাবা মা ঠাকুর্দাকে নিয়েই কেটেছে। তবে তিন দিনের মধ্যে একটা ব্যাপার বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। মা চিক্কুসকে যতই আদর করুন, ও গোগোলের কাছেই বেশি থাকতে চাইত। তার কারণও ছিল। মা তো আর গোগোলের মতো ছুটোছুটি করতে পারতেন না। আর চিক্কুসের খেলাই ছিল ছুটোছুটি করা, লাফানো ঝাঁপানো আর নতুন দাঁতে কামড়ানো। এক-এক সময় চিক্কুস, ঠিক বাঘের মতো, ওত পেতে থাকত, আর হঠাৎ লাফ দিয়ে গোগোলের কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। তিন দিনেই ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, চিক্কুস গোগোলের সঙ্গে শুত। তার ফলে, গোগোলের গায়ে এক-আধ দিন হিসিও করে দিত। কিন্তু গোগোলের তাতে মোটেই ঘেন্না হত না।

অশোক চিত্রকর মশায়, চিক্কুসকে নিয়ে গোগোল আর মায়ের কাণ্ড দেখে, বিদায়ের দিন বলেই ফেললেন, "আমাদের বাড়িতে বাচ্চা আর নেই। চিক্কুসের আর তিনটি ভাইবোনকে অন্যেরা নিয়ে গিয়েছেন। তা হোক, গোগোলকে উপহার হিসাবে চিক্কুসকে আমি দিচ্ছি।"

গোগোল তো খুবই খুশি। মাও কম খুশি হননি। কেবল বাবা আর মামা একটু যেন কিন্তু-কিন্তু করেছিলেন। তবে মায়ের ঝোঁক দেখে, তাঁরা আর আপত্তি করেননি। তাছাড়া, অশোক চিত্রকর জানিয়ে দিয়েছিলেন, চিক্কুসকে দিন সাতেক আগেই অ্যান্টি-র‍্যাবি ইনজেকশন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। সে-কথা শুনে, বাবা ইনজেকশনের দামটা দিতে চেয়েছিলেন। কারণ জার্মানিতে তৈরি সেই ইনজেকশনের দাম বেশ বেশি। অশোক চিত্রকর টাকা তো নেনইনি, বরং বাবার প্রস্তাবে ক্ষুণ্ণ মুখে হেসেছিলেন। বাবা আর কিছুই বলতে পারেননি। মিঃ চিত্রকর চিক্কুসের অ্যান্টি-র‍্যাবি ইনজেকশনের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। ওটা নাকি দরকার হতে পারে। তারপরে তিনি চিক্কুসের খাবার আর ওষুধের একটা নিয়মিত চার্ট করে দিয়েছিলেন। আর বলে দিয়েছিলেন, বিশেষ পাউডার দিয়ে চিক্কুসের লোমের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। দিনে অন্তত দু'বার ভাল করে সারা গা ব্রাশ করতে হবে। আরও বলেছিলেন, কলকাতার গরমে চিক্কুসের কষ্ট হবে। বিশেষ করে কলকাতায় যা লোডশেডিং চলছে। পাখার বাতাস সব সময়ে মিলবে না। অতএব, ওকে যেন যতটা সম্ভব ঠাণ্ডা জায়গায় রাখা হয়। খাবারের আর ওষুধের অনিয়ম একেবারেই চলবে না। আর বিশেষ প্রয়োজন না হলে, বাড়ির বাইরে বের না করাই উচিত।

বাবা বলেছিলেন, "সংসারে আর একটি প্রাণী বাড়ল।"

"বাড়ুক।" মা বলেছিলেন, "তুমি যখন অফিসে যাবে আর গোগোল থাকবে স্কুলে, আমার সময়টা চিক্কুসকে নিয়ে ভালই কাটবে।"

বাবা যেন অবাক হয়ে হেসে বলেছিলেন, "তোমার হাতে যে আজকাল এত সময় আছে, তা তো জানতাম না?"

কথাটা গোগোলেরও মনে হয়েছিল। বাড়িতে কাজের লোক বঙ্কিমদা যত কাজই করুক, মায়ের কাজের যেন শেষ নেই। বঙ্কিমদার হাতের রান্না এমন কিছু খারাপ না। কিন্তু রান্নার কাজ মা অন্য কারো হাতেই দিতে চান না। বাবার কথা শুনে মা হেসেছিলেন, আর যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলেছিলেন, "তা যাই বলো, চিক্কুসকে আমার ভাল লেগেছে।"

মায়ের কথা শুনে বাবা আর মামা হাহা করে হেসে উঠেছিলেন। গোগোল তো মহা খুশি। মায়ের আপত্তি থাকলে, চিক্কুসকে কিছুতেই আনা যেত না। ফুন্‌সলিং থেকে শিলিগুড়িতে ফেরার পথে, গাড়িতে গোগোল বলেছিল, "চিক্কুস আমার একটা ভাই।"

গোগোলের কথা শুনেও সবাই হেসেছিলেন। বাবা বলেছিলেন, "চমৎকার! তবে দেখো, ভাইটিকে নিয়ে এমন মেতে যেও না যে লেখাপড়া ডকে উঠে যায়।"

"তার আগে দেখো, চিক্কুসকে নিয়ে গোগোল ক'দিন মাতামাতি করে," মা বলেছিলেন, "গোগোলের তো সবই দুদিনের জন্য। তারপরেই আবার নতুন কিছু নিয়ে মেতে উঠবে।"

গোগোল মুখ ফুটে কিছু বলেনি। ওর আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়া চিক্কুসকে কোলের মধ্যে একটু চেপে ধরে মনে-মনে বলেছিল, "তা কখনোই হবে না। লেখাপড়াও ডকে উঠবে না, চিক্কুসকেও আমি ছেড়ে থাকব না। ও আমার ভাই আর বন্ধু। কলকাতায় বন্ধুদের ডেকে দেখাব। কিন্তু ছুঁতে-টুতে দেব না। মিঃ চিত্রকর বলে দিয়েছেন, বাইরের লোক এসেই যেন চিক্কুসের গায়ে হাত না দেয়। আর লক্ষ রাখতে হবে, চিক্কুস যেন যার-তার জুতো না চিবোয়। এখন ওর দুধের দাঁত, যা পাবে সবই চিবোতে চাইবে। তা বলে যেন আজেবাজে জিনিস না চিবোয়। সব সময় চিবোবার জন্য ওকে একটা শক্ত রবারের হাড় কিনে দিতে হবে। সেটা মাংসের হাড়ের মতোই দেখতে। আমি মা'র সঙ্গে গিয়ে নিজে সেটা কিনে নিয়ে আসব। আর পিজবোর্ডের ছোট একটা চাকতিতে লিখে দেব, 'ডোন্ট টাচ্ মী'। সেই চাকতিটা ঝুলিয়ে দেব চিক্কুসের গলার বেল্টের সঙ্গে।"

গোগোল এরকম অনেক কথাই তখন মনে মনে ভেবেছিল।

২

সেবারে হলংয়ে পাগলা হাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব, আর চিক্কুস উপহার, দুটোই মনে রাখবার মতো ঘটনা। তারপরে কলকাতায় ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু আবার এক নতুন আনন্দ আর উত্তেজনার দামামা বেজে উঠেছিল। দার্জিলিং, ফুন্‌সলিং, তারপরেই নতুন একটা নিমন্ত্রণ জুটে গিয়েছিল, নাগাল্যাণ্ড যাবার।

নিমন্ত্রণটা এসেছিল মামারই এক বন্ধুর কাছ থেকে। মামা তাঁকে জটু বা জটা বলে ডাকতেন। আসলে তাঁর নাম ছিল জটিলেশ্বর মজুমদার। মামা অনেক সময় তাঁকে ঠাট্টা করে, মিস্টার জট্‌মজ্ বলেও ডাকতেন। জটিলেশ্বর মজুমদারের ওটাই বোধহয় ছাঁটকাট করা নাম। অবশ্য মামা তাঁকে, জ্যাক অব অল ট্রেড্, মাস্টার অব নান্‌ও বলতেন কোনো কোনো সময়। সেটা বলার কারণ ছিল, মিস্টার জট্‌মজ্ যে ঠিক কী কাজ করতেন, সেটা কেউ-ই বিশেষ জানত না। অথচ তিনি নাকি আজ দিল্লি, কাল বম্বে, পরশু কলকাতা, তারপরেই দেখা গেল তিনি মাদ্রাজ থেকে গৌহাটি হাজির। কিংবা পাহাড়ের ওপর দার্জিলিং, গ্যাংটক, শিলং নয়তো কোহিমায়।

গোগোল এরকম অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ আর দেখেনি। মামার বন্ধু বলেই, গোগোল তাঁকে জটুমামা বলে ডাকত। আর জটুমামা বাবা-মাকে দিদি আর জামাইবাবু বলে ডাকতেন। জটুমামার সঙ্গে আলাপও হয়েছিল সেবারেই। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার আগে তিনি এসেছিলেন। তখন প্রথম দেখা। হলং থেকে ফিরে ফুন্‌সলিংয়ে যাবার আগে কয়েকবারই তিনি মামার বাড়িতে এসেছিলেন।

গোগোল মামার কথাবার্তা থেকে বুঝেছিল, জটুমামা বিয়ে-থা করেননি। পড়াশোনা করেছেন বিস্তর। কোনো একটা বিষয়ে নয়। বরং বলা যায়, এমন কোনো বিষয় নেই, যা তিনি পড়েননি। আসলে তিনি নাকি শিবপুরের বি·ই· কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন। তারপরে বেশ কয়েক বছর বিলেতে কাটিয়েছিলেন। অনেকেই ভেবেছিল, তিনি চিরকাল ইঞ্জিনিয়ারই থাকবেন। সকলে যা খুশি ভাবতে পারে। জটুমামা বিলেত থেকে ফিরে, ইংরেজি আর

বাঙলায় ফরাসি চিত্র আর ভাস্কর্যের ওপর অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গিয়েছিলেন একজন আর্ট সমালোচক। তারপরেই দেখা গিয়েছিল, তিনি কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারগুলোর স্টেজের আলো-নির্দেশক হয়ে গিয়েছেন। এমনকী, নাটক লিখতেও বাকি রাখেননি। নাটকের পরেই, কবিতা গল্প উপন্যাসও বেশ কিছু লিখে ফেলেছিলেন। আর একটা নাম-করা দৈনিক সংবাদপত্রে তখন চাকরিও করেছিলেন। তারপরে কী মনে করে, তিনি হঠাৎ অঙ্ক নিয়ে এম-এ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গেই আইন। ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে, বুঝে ওঠার আগেই, দেখা গিয়েছিল, জটুমামা এক রাজনৈতিক দলের টিকিট নিয়ে নির্বাচনে নেমে পড়েছেন। কিন্তু জিততে পারেননি। তবে তাঁকে কখনও কোনো কারণেই কেউ নিরুৎসাহিত হতে দেখেনি।

এরকম ঘটনার মধ্যেই, জটুমামাকে দেখা গিয়েছিল, তিনি ইউ এন আই-এর একজন প্রতিনিধি হিসাবে, বিশেষ করে আসাম মেঘালয় নাগাল্যাণ্ড নেফা অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই সময়েই নাগা ন্যাশানাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা আর মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁকে খুব মেলামেশা করতে দেখা গিয়েছিল। তার ফলটা অবশ্য ভাল হয়নি। দিল্লি তাঁকে নাকি কেমন একটু সন্দেহের চোখে দেখছিল। কারণ, বৈরী নাগাদের সঙ্গে নাকি তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল। জটুমামার জবাব, "বিশেষ যোগাযোগ কাকে বলে ? একটা সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে বৈরী নাগারা আমাকে বিশ্বাস করত, আমি তাদের মতামত আর খবর সংগ্রহ করতাম। ঠিক আছে, দিল্লি যখন সন্দেহের চোখে আমাকে দেখছে, আমি এ-চাকরিতে ইস্তফা দিলাম।"

কথা তো কথাই। সংবাদ সংস্থার চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জটুমামা নাগাল্যাণ্ড ছাড়লেন না। কোহিমায় পি ডব্লিউ ডি-র ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি নিয়েছিলেন। গোগোলদের সঙ্গে পরিচয় হবার খুব বেশি দিন আগের ঘটনা সেটা নয়। কিন্তু এক জায়গায় থিতু হয়ে বসার লোক তিনি ছিলেন না। ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি ছেড়ে তিনি আবার কলকাতায়। উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে ইংরেজিতে একটা বই লিখে ফেলেছিলেন। প্রকাশকও জুটে গিয়েছিল। দু' বছর আগে শিলিগুড়িতে যখন মামার বাড়িতে গোগোলদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, তখন তিনি গভর্নমেন্টের পার্বত্য নগর পরিকল্পনা বিভাগে চাকরি করছিলেন। তার চেয়ে বেশি অবশ্য তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলের অরণ্যের পশুপাখি আর খরস্রোতা নদীর মাছের বিষয়েই খোঁজখবর নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

গোগোল একটা মজার ব্যাপার লক্ষ করেছিল। জটুমামা যে এত দেশে ঘুরেছেন, আর নানা কাণ্ড করে বেড়িয়েছেন, তাতেও কিন্তু তাঁর বাঙলা কথার উচ্চারণ শ্রীহট্টের মতোই ছিল। অর্থাৎ, তাঁর কথায় সিলেটি টানে কখনও একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। তাঁর দেশ আর জন্মস্থান ছিল সিলেট। আর বিশেষ ভাবে লক্ষ করার মতো ছিল তাঁর চেহারা ও চলাফেরা। ঠিক ঘাড়ে-গর্দানে না হলেও, তাঁকে বেশ মোটাসোটাই বলা যায়। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি হবেন না। গায়ের রঙ ময়লাই বলতে হবে। মুখটি চওড়া, চৌকোমতো। বড়-বড় লোমওয়ালা ভুরুর নীচে চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল। কিন্তু সব সময়েই যেন কিছু ভেবে চলেছেন। নাক মোটা আর উঁচু। নাকের নীচে কুচকুচে কালো জোড়া-ভ্রমরের মতো গোঁফ। বোধহয় তাকেই বাটারফ্লাই গোঁফ বলে। মাথার কুচকুচে কালো চুল অনেকটা কোঁকড়ানো, আর বেশ ছোট করে ছাঁটা। প্রথমে দেখলেই মনে হবে, মানুষটি নিশ্চয়ই আরামপ্রিয় আর গদাইলশকরি চালের। তা মোটেই নয়। ঐ ভারী মোটাসোটা শরীর নিয়ে, তাঁর চালচলন যেমন হালকা, তেমনি ক্ষিপ্র। মুখে হাসি লেগেই আছে।

নাগাল্যাণ্ডে যাবার হঠাৎ-প্রস্তাবটা যখন তিনি পেড়ে বসেছিলেন, মামা তখন মোটেই খুশি হননি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বাবা বেশ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। অথচ তখন বাবার অফিসে আর মাত্র কয়েকদিনের ছুটি ছিল। বাবা এতই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন, টেলিগ্রাম করে ছুটির মেয়াদ বাড়াতে রাজি হয়েছিলেন। গোগোল তো

মনে-মনে খুবই খুশি হয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। পাছে মা আবার চটে যান। কারণ দার্জিলিং ফুন্‌সলিং বেড়িয়ে, আবার পাহাড়ে বেড়াতে যাবার তেমন ইচ্ছে মায়ের ছিল না। তবে জটুমামা নাগাল্যাণ্ড পাহাড়ের এমন বর্ণনা দিয়েছিলেন, যেন সুইজারল্যাণ্ড তার কাছে কিছুই নয়। শুনে মায়ের চোখ দুটোও যেন একটু চকচক করে উঠেছিল।

জটুমামা আরও বলেছিলেন, মে মাসে কোহিমাতে শীত নেই-ই বলতে গেলে। রাত্রের দিকে সামান্য একটু শীত লাগে। তবে কোহিমার মতো পাহাড়ি শহরে সন্ধ্যার পরেই সব ফাঁকা। সারা দিন বেড়ানো। সন্ধ্যার পরেই ঘরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিলেই হল। তবু মামা অনেক প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রথমত, কোহিমায় গিয়ে কোথায় থাকা হবে। সেখানে থাকবার মতো ভাল হোটেল বলতে কিছুই নেই। জটুমামা তো শুনে হেসেই বাঁচেননি। বলেছিলেন, "আমি জটিলেশ্বর মজুমদার কোহিমায় যাব, সঙ্গে আমার দিদি ভগ্নীপতি ভাগ্‌নে, আমাকে হোটেলের কথা ভাবতে হবে? তা হলে তো বলতে হয়, মিস্টার জট্‌মজের জন্য নাগাল্যাণ্ডের চিফ্ মিনিস্টারের বাড়ির দরজাই খোলা আছে! চাও তো, অন্য কোনো মিনিস্টারের বাড়িতেও উঠতে পারি। তবে প্রস্তাবটা দেবার সময়েই, আমি ঠিক করে রেখেছি, মেকানিকাল বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফকজুলু হারালুর বাড়িতেই উঠব। আমার খুবই বন্ধু, মানুষটিও ভারী প্রাণখোলা দিলদরিয়া। ওঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা 'মজুমদার আঙ্কল্' বলতে অজ্ঞান। ওঁর বাড়ির ভেতরে যেটাকে গেস্টরুম বলা হয়, আসলে সেটা একটা গেস্ট-হাউসের মতো। ডাইনিং রুমের পাশে বড় বড় দুটো শোবার ঘর, অ্যাটাচড় বাথরুম। চারদিন আগেই হারালুর চিঠি পেয়েছি, দিল্লি থেকে লিখেছে। সেদিনই সে দিল্লি থেকে দমদমের প্লেন ধরেছে। হিসেবমতো পরের দিনই তার কোহিমায় পৌঁছে যাবার কথা।"

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, "কোহিমায় কী ভাবে যাওয়া হবে। সেখান থেকেই কি দিদিরা কলকাতায় ফিরবে, না আবার শিলিগুড়ি ব্যাক করবে?"

জটুমামা বলেছিলেন, "আমরা বাগডোগরা থেকে প্লেনে গৌহাটি যেতে পারি, গৌহাটি থেকে আবার প্লেনে ডিমাপুর। ডিমাপুর থেকে গাড়িতে কোহিমা। আর যদি প্লেনে না যাই, নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে ট্রেনে ডিমাপুর যাওয়া যায়। ফেরার ব্যাপারটা কী হবে, সেটা জামাইবাবুই ভাল বলতে পারেন। তিনি যদি আবার শিলিগুড়ি ফিরে আসতে চান, আসতে পারেন। তারপর এখান থেকে কলকাতা।"

বাবা মাথা নেড়ে বলেছিলেন, "না, কোহিমা থেকে আবার এখানে ফিরে আসার কোনো মানেই হয় না। আমি বরং বলি, এখান থেকে আমরা ডিমাপুর অবধি ট্রেনে যাব। সেখান থেকে গাড়িতে কোহিমা। ফেরবার সময় কোহিমা থেকে ডিমাপুরে নেমে প্লেনে করে গৌহাটি। গৌহাটি থেকে নিশ্চয়ই কলকাতা যাবার করেসপণ্ডিং ফ্লাইট আছে?"

"নিশ্চয়ই আছে।" জটুমামা বলেছিলেন, "আর সত্যি বলতে কী, জামাইবাবু, আপনার প্ল্যানটাই ঠিক।"

বাবা বলেছিলেন, "তা নাহয় হল। এখন কথা হচ্ছে, ট্রেনে যাবার ব্যবস্থা কী রকম? আপনি নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনের কথা বললেন। সেখান থেকে কোন্ ট্রেন কখন ছাড়ে, আমি সে-সবের কিছুই জানিনে। তাছাড়া, মনে হচ্ছে, এখান থেকে ডিমাপুর ট্রেনে নিশ্চয়ই দিন দুয়েকের জার্নি। এত হ্যাপা কি..."

"কে বললে দু'দিন?" জটুমামা মোটা ঠোঁট ছড়িয়ে এমন হেসেছিলেন, তাঁর গোঁফজোড়াও যেন বেশ খানিকটা ডানা মেলে দিয়েছিল। বলেছিলেন, "তিনটি ট্রেন এখান থেকে ডিমাপুর অবধি যায়। তিনসুকিয়া মেল, কামরূপ মেল, আর আসাম মেল। আর ট্রেনেই যদি যাওয়া ঠিক করেন, আমি বলব, আসাম মেলে যাওয়া হচ্ছে সব থেকে ভাল। আমি দু'বার আসাম মেলে ডিমাপুর গেছি। বলতে পারেন, প্রায় চব্বিশ ঘন্টার জার্নি। এখান থেকে আসাম মেল সন্ধেবেলা ছাড়ে, পরের দিন বিকেল সাড়ে-চারটে পাঁচটা নাগাদ ডিমাপুর পৌঁছোয়।"

মামা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হাতে সময় নেই বললেই চলে। রিজারভেশনের কী হবে?"

জটুমামার আবার সেই প্রজাপতির ডানা মেলা হাসি দেখা গিয়েছিল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখের পাতা বুজিয়ে রেখে বলেছিলেন, "ওটা আমার ওপরে ছেড়ে দাও। তুমি জানো, আমার কাছে ওটা কোনো সমস্যা নয়। লোকে আমাকে পাগল-ছাগল যা-ই ভাবুক, জটুমজকে একটু ভালও বাসে। আমি এখুনি নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে যাচ্ছি। ফার্স্টক্লাস খালি থাকলে, নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। এখানে রিজারভেশনে আছেন কালিদা—মানে, কালিদাস পুরকায়স্থ।"

বাবা একটু কিন্তু-কিন্তু করে বলেছিলেন, "ডিমাপুরে যদি বিকেল সাড়ে-চারটে পাঁচটায় পৌঁছই, সেদিনই নিশ্চয় আমরা কোহিমায় উঠতে পারব না? গাড়ি-টাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে। ডিমাপুর থেকে কোহিমা কতদূর?"

"পঁচাত্তর কিলোমিটার।" জটুমামা বলেছিলেন। তাঁর মুখে ছিল আশ্বাসের হাসি, আর গলার স্বরেও ছিল আশ্বাস। "জামাইবাবু, গাড়ি-টাড়ির জন্য আপনি একদম ভাববেন না। আমি আজই ডিমাপুরে ট্রাঙ্ককলে কথা বলছি। ডিমাপুর থেকে কোহিমার রাস্তা খুব খারাপ না হলেও, তেমন ভাল বলা যায় না। ওখানে রাত্রের দিকে ড্রাইভাররা পাহাড়ে গাড়ি চালাতে চায় না। চাইলে আমরা চলে যাব। নইলে রাত্তিরটা ডিমাপুরেই থেকে যাব।"

মামা বলে উঠেছিলেন, "কোথায়? ডিমাপুর স্টেশনে?"

জটুমামার মুখে সেই গোঁফ মেলে দেওয়া নির্মল হাসি। ভুরু কোঁচকাতে জানেন না, রাগও করেন না। মামার কথার মধ্যে যে খোঁচা ছিল, তা একরকম হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "আজ পর্যন্ত আমাকে কখনো ডিমাপুর স্টেশনে থাকতে হয়নি। সেখানে পাঁচ-তারা কেন, তিন-তারা হোটেলও নেই। কিন্তু আমার পরিচিত আস্তানা আছে কম করে চারটি। আর সে-সব আস্তানা পাঁচ-তারা হোটেলের থেকে কম রাজকীয় নয়। আমি মনে করি, চব্বিশ ঘন্টা ট্রেন জার্নি করে, জামাইবাবুরা টায়ার্ড হয়ে পড়বেন। তাই রাতটা ডিমাপুরেই থেকে যাব। দিদি যদি এখনই বলে দেন, তা হলে রাত্রে আমরা কী খাব না খাব, সেটাও জানিয়ে রাখতে পারি।"

জটুমামার কথা শুনে মা হেসে উঠেছিলেন। বাবার সঙ্গে গোমড়া-মুখ মামাও হেসেছিলেন।

জটুমামা বলেছিলেন, "বাজে কথা বলতে আমি ভালবাসিনে। যা বলবার তাই বললাম। বরং গোগোলই বলুক, ডিমাপুরে গিয়ে রাত্রে আমরা কী খাব। চটপট বলে ফেলো হে খুদে গোয়েন্দা মাস্টার গোগোল। নাকি আমিই বলব?"

গোগোল লজ্জা পেয়ে হেসেছিল। মা আর মামার দিকে একবার দেখে বলেছিল, "আপনিই বলুন।"

"বেশ।" জটুমামা একটুও না ভেবে চটপট বলেছিলেন, "গরম ভাত রুটি, দুই-ই থাকবে। স্যালাড, ডালফ্রাই, একটা শুকনো-মতো নিরিমিষ তরকারি, মুরগির মাংস। মাছও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু রাত্রে তার কী দরকার? হয়তো ভাল মাছ নাও পাওয়া যেতে পারে। সবশেষে রাজভোগ। অলরাইট?"

জবাবে গোগোল তো হেসেইছিল। বাকিরাও হেসে উঠেছিলেন। মা বলেছিলেন, "খাওয়া নিয়ে এখনই এত ভাববার কী আছে? বাইরে বেরোলে, সব সময় সব কিছু মনের মতো হাতের কাছে পেতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই।"

জটুমামা মামার দিকে তাকিয়ে গোঁফের ডানা মেলে হেসেছিলেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "ঠিক কথা, কিন্তু আমরা তো সেরকম বাইরে যাচ্ছি নে। আমাদের হাতের কাছে সবই থাকবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, চান-টান করে, পরোটা আলুর দম ডিমের ওমলেট মিষ্টি আর কফি খেয়ে আমরা বেরোব।"

জলখাবারের ফিরিস্তি শুনে আবার সবাই হেসে উঠেছিলেন। জটুমামার মুখের কোনো ভাবান্তর হয়নি। বলেছিলেন, "কিন্তু গাড়িতে উঠে আমরা তখনই কোহিমায় রওনা হব না। তার আগে আমরা যাব ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্য়ের অফিসে। এ-কাজটা হয়তো ডিমাপুর পৌঁছে সন্ধ্যাবেলাতেই সেরে নেওয়া যেত। কিন্তু এয়ারলাইনস্য়ের অফিস তখন বন্ধ থাকবে। অবশ্য, এয়ারলাইনস্য়ের মিঃ আও বা হারু দত্তকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তবে তার দরকার হবে না। সকালবেলা আমরা কলকাতার প্লেনের টিকিট আর তারিখ-মতো সিট রিজারভেশন করে, কোহিমায় চলে যাব। পৌঁছতে সময় লাগবে ঘন্টা দুয়েকের মতো। ততক্ষণে মিঃ হারালুর বাড়িতে খবর চলে যাবে। এখন, স্টেশনে যাবার আগে, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? তুমিও তোমার বউ-বাচ্চা নিয়ে চলো।"

জটুমামা শেষের কথাগুলো বলেছিলেন মামার দিকে তাকিয়ে। মা বলে উঠেছিলেন, "তা হলে খুব ভাল হয়।"

মামাকে তখন কেমন মুষড়ে পড়তে দেখা গিয়েছিল। বলেছিলেন, "আমার হাত-পা বাঁধা, অফিস এখন কিছুতেই ছাড়বে না। যেতে পারলে ভালই লাগত, কিন্তু কপালে নেই। শুনে এখন খুব লোভ হচ্ছে। যাই হোক, তুমি তো আছই। আমরা পরে এক সময়ে যাব। এ-যাত্রায় তুমি দিদিদের নিয়ে যাও।"

জটুমামা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, "তা হলে আর দেরি না করে আমি এখনই স্টেশনে চলে যাই। আগামীকালের টিকিট পেলে, আমি বুক করে ফেলব।"

বাবা ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, "দাঁড়ান দাঁড়ান। টিকিটের টাকাটা আগে দিয়ে দিই।"

জটুমামা হাত তুলে বলেছিলেন, "দেখুন জামাইবাবু, একে তো আপনি আমার একটা কথা কিছুতেই রাখছেন না, কেবলই আমাকে আপনি আপনি করে বলে যাচ্ছেন। আশা করি, এর পরে আপনি আমাকে নাম ধরে 'তুমি' করে বলবেন। আগে আমি স্টেশনে যাই, টিকিট পাই কি না দেখি। টাকা আপনার কাছ থেকে আমি ঠিক সময়মতো চেয়ে নেব।"

জটুমামা কথা বলেই পিছন ফিরেছিলেন। মামা বলে উঠেছিলেন, "একটা কথা।"

"আবার কী কথা?" জটুমামা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

মামা গোগোলের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলেছিলেন, "চিক্কুসের কী হবে? তাকে কি রেখে যাওয়া হবে? না নিয়ে যাওয়া হবে?"

গোগোলের বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। আশ্চর্য, আসল কথাটাই ভাবা হয়নি। কোহিমা কেন, সত্যি সুইজারল্যাণ্ড যেতে হলেও, তখন গোগোল চিক্কুসকে ছেড়ে যেত না। জটুমামার মুখের কোনো ভাবান্তর হয়নি। তেমনি হাসিমুখেই, তাঁর সহজ ভঙ্গিতে বলেছিলেন, "মানে তুমি বলতে চাইছ, চিক্কুসকে খাঁচায় পুরে অ্যানিমেল ভ্যানে নিয়ে যাবার জন্য আলাদা টিকেট কাটতে হবে কি না? নিয়ম অনুযায়ী তা-ই করা উচিত। তবে গোগোল আর দিদির মুখ দেখে বুঝতে পারছি, চিক্কুসকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। চার সিটের একটা কামরায় আমরাই শুধু থাকব। অন্য প্যাসেঞ্জার থাকলে আপত্তি করতে পারত। এখানে সে প্রশ্ন নেই। আর দ্বিতীয় হল, গার্ড সাহেবের সঙ্গে কথা বলে, চিক্কুসকে আমরা আমাদের সঙ্গেই রেখে দেব। কেবল ওর খাবারের ব্যবস্থাটা আলাদা করে নিয়ে যেতে হবে। সেটা করতে নিশ্চয় অসুবিধে হবে না?"

মা বলেছিলেন, "না, হবে না। সে-ব্যবস্থা আমি করে নিয়ে যাব।"

মামা বলেছিলেন, "সেটা তো না-হয় এখান থেকে ব্যবস্থা হল। কোহিমা থেকে কলকাতায় ফেরার সময় প্লেনে কী ব্যবস্থা হবে?"

গোগোল দম বন্ধ করে জটুমামার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। জটুমামার কোনো ব্যাপারেই কোনোরকম আটকায় না। বেশ সহজভাবেই বলেছিলেন, "কী আবার? চিক্কুসের জন্য প্লেনের একটা হাফ টিকেট কাটতে হবে। তবে হ্যাঁ, চিক্কুসের জন্য তখন একটা খাঁচার দরকার হবে। সে-ব্যবস্থা করা এমন কিছু হাতি-ঘোড়া ব্যাপার নয়। তাছাড়া মিঃ চিত্রকর তো চিক্কুসের অ্যান্টি-র‍্যাবি ইঞ্জেকশনের সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন। নিয়মকানুনের ঝামেলা ওখানেই মিটে গেল। এর পরে হচ্ছে, চিক্কুসকে কতক্ষণ প্লেনে থাকতে হবে। ডিমাপুর থেকে গৌহাটি পঁয়তাল্লিশ মিনিট। গৌহাটিতে খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টাই অপেক্ষা করতে হতে পারে। গৌহাটি থেকে কলকাতাও পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা। অর্থাৎ ডিমাপুর থেকে সাড়ে নটায় প্লেনে উঠে, গৌহাটিতে ফ্লাইট চেঞ্জ করে কলকাতায়

সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। আর কোনো সমস্যা?"

জটুমামা মামার দিকে তাকিয়েছিলেন। গোগোলও তাকিয়েছিল। মামা হেসে বলেছিলেন, "জট্মজ্ থাকতে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। জট খুলতে সে খুবই ওস্তাদ।"

"ধন্যবাদ।" জটুমামা যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বলেছিলেন, "এর জন্য অঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং,আইন, কোনো কিছুই দরকার হয় না। দরকার কেবল চোখ-কান খোলা রেখে চরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা। আগামীকালের আসাম মেলের টিকিট আর রিজার্ভেশন পেলে, রাত্রে তোমার এখানে এসে খাব।"

মামা বলেছিলেন, "ওয়েলকাম।"

বাবা বলেছিলেন, "ভারী মজার ছেলে।"

গোগোল তখন পাশের সোফায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা চিক্কুসের দিকে দেখছিল। ওর একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়েছিল।

৩

ঘুমন্ত গোগোল একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিল। কোন্ একটা পাহাড়ি দেশে ও গাছপালা ঘেরা চড়াই উতরাইয়ের পথ ধরে হাঁটছিল। সে-পাহাড়ি দেশটা মোটেই দার্জিলিং বা কালিম্পং কিংবা ফুনসলিংয়ের মতো নয়। ওর কোলে ছিল চিক্কুস। ও বেশ খুশি মনেই চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছিল। চিক্কুসও ওর সাদা লোম ঢাকা কালো গোল চোখ দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেখছিল। তারপরেই হঠাৎ কী হল, চিক্কুস গোগোলের কোল থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে ছুটতে আরম্ভ করল। গোগোলও চিক্কুসের পিছন ধাওয়া করে, ওর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। তবু চিক্কুস থামল না। এক এক সময় পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে চিক্কুস হারিয়ে যেতে লাগল। হারাবার ভয়ে গোগোলের রীতিমত দম আটকে আসছিল। আবার হঠাৎ চিক্কুসকে দেখা গেল। কিন্তু ও কিছুতেই থামছে না, পাগলের মতো ছুটছে। পাহাড়ের উঁচু-নিচু পথে ছুটে, গোগোল ক্রমেই হাঁপিয়ে পড়তে লাগল। গলা ক্রমশ শুকিয়ে গেল, চিক্কুসের নাম ধরে ডাকতেও পারছে না।

এরকম অবস্থায় হঠাৎ ওর গায়ে ধাক্কা লাগল। ও মায়ের গলা শুনতে পেল, "গোগোল—এই গোগোল, ওঠ্। ভোর হয়ে গেছে। দ্যাখ, নতুন দেশে এসেছি আমরা।"

গোগোল ধড়ফড় করে উঠে, উদ্বেগ ভরা দু চোখ মেলে তাকাল। প্রথমেই বলল, "চিক্কুস্ পালিয়ে যাচ্ছে!"

বাবা হেসে উঠে বললেন, "মাথায় চিক্কুস্ ছাড়া আর কিছু নেই। বোকা ছেলে, এই রেলগাড়ির কামরা থেকে চিক্কুস্ কোথায় যাবে? দ্যাখ, কাঁচের জানালা দিয়ে ও কেমন বাইরের দিকে দেখছে।"

গোগোলের চোখে তখনও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। মুখ ফিরিয়ে দেখল, চিক্কুস্ কাঁচ-ঢাকা জানালার ওপরে দুটো পা তুলে দিয়ে বাইরের দিকে দেখছে। আসাম মেল দাঁড়িয়ে আছে একটা স্টেশনে। ও কামরার চারদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল। আস্তে আস্তে গত-রাত্রের কথা ওর মনে পড়ল। মনে পড়ল, গতকাল রাত্রে সন্ধ্যার সময় ওরা জটুমামার সঙ্গে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে, মিটার গেজ লাইনের আসাম মেলে উঠেছিল। চিক্কুস্ তখন ওর কোলে ছিল। মামা-মামিমা ওদের তুলে দিতে এসেছিলেন। মামিমা বড় টিফিনকেরিয়ার ভরতি করে, শুকনো মুরগির মাংস, আর লুচি দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে মালদার কারিগরের হাতে তৈরি ক্ষীরকদম্ব। ট্রেন ছাড়তে ছাড়তেই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। জটুমামা দেশবিভাগের আগের আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের মেন লাইনের গল্প শুনিয়েছিলেন।

রেললাইনের পথের কথাও যে গল্পের মতো শুনতে লাগে, গত রাত্রে জটুমামার কথা শুনে তাই মনে হয়েছিল। জটুমামার বয়স তখন অনেক কম। গোগোলের মতোই নাকি। তিনি এসেছিলেন, বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে ট্রেনে চেপে নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমারে চাঁদপুর। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় সে-গাড়ি লাকসাম নামে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। তারপর জটুমামা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপরে ঠিক ভূগোল পড়ার মতো মুখস্থ বলেছিলেন, লাকসাম জংশন থেকে নোয়াখালি, আখাউরা জংশন থেকে ভৈরববাজার। কুলাউরা জংশন থেকে সিলেট—মানে, শ্রীহট্ট, বদরপুর জংশন থেকে শিলচর, লামডিং জংশন থেকে গৌহাটি, সে-সব ছিল শাখা লাইন। আর আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের মেনলাইন ছিল চট্টগ্রাম থেকে তিনসুকিয়া। মেনলাইন কাছাড়ের উত্তরের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে গিয়েছে। বদরপুর নামে একটা জায়গার কাছে। পাহাড়ি বরাক নদী নাকি দারুণ সুন্দর। আসলে সে-নদীটা নাকি নাগাল্যাণ্ডের পাহাড় থেকেই নেমে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গোগোলদের ট্রেন একেবারে অন্য রাস্তা দিয়ে গিয়েছে। তখন নাগাল্যাণ্ডে যেতে হলে, লামডিং থেকে 'মণিপুর রোড' স্টেশনে নামতে হত। সেখান থেকে টাঙায় চেপে ছেচল্লিশ মাইল গেলে তবেই কোহিমায় যাওয়া যেত।

জটুমামা আরও অনেক গল্পই বলেছিলেন বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের রাস্তার সম্পর্কে। বিশেষ করে পাহাড়ের ভিতরে সুড়ঙ্গের রাস্তা দিনের বেলাতেও ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। দেশটা যদি ভাগাভাগি না হত, তবে গোটা বাংলাদেশের আরও অনেক সুন্দর জায়গা দেখা যেত। জটুমামার সেই পথের গল্প বাবা-মাও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। আর বাবা খুব দুঃখ করে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের ঢাকায় জন্মেও, সে-দেশটা আমি তেমন করে দেখতে পাইনি। ছেলেবেলাতেই কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল। অবশ্য বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে গেছি, পার্বত্য চট্টগ্রামও দেখে এসেছি। তবে জটু, তুমি যেমনটি বললে, তার কিছুই আমি দেখতে পাইনি।"

মা আফসোস করে বলেছিলেন, "বাংলাদেশ আমারও খুব দেখতে ইচ্ছে করে।"

জটুমামা বলেছিলেন, "দিনের বেলা আমরাও আসামের অনেক ন্যাচারাল বিউটি দেখতে পাব।"

রাত্রে হাসিমারা স্টেশন ছাড়িয়ে যাবার পরেই, মা প্রথমে চিক্কুসকে ফিডিং বোতল থেকে দুধ ঢেলে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তারপর গোগোল খেয়েছিল। ঘুম পেতেও বেশি দেরি হয়নি। কিন্তু ও তো শুয়েছিল বাংকের ওপর। নীচে এল কেমন করে? কথাটা জিজ্ঞেস করার আগে, গোগোল চিক্কুসের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দিল। চিক্কুস্ চমকে পিছন ফিরে গোগোলকে দেখবার আগেই মাঝখানের কালো বিন্দুটি একটু বড় হল। চট করে মুখ তুলে, গোগোলের গালে একবার চেটে দিয়েই আবার ব্যস্তভাবে কাঁচের জানালায় মুখ ঠেকাল। গোগোলও জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। এখনও সূর্য ওঠেনি। পুবের আকাশ লাল। তার গায়ে হালকা মেঘের মতো ঢেউ খেলানো পাহাড় দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে। প্ল্যাটফরমে লোকজন চলাচল করছে, চা আর খাবারওয়ালারা হেঁকে বেড়াচ্ছে। প্ল্যাটফরমের আশেপাশে অনেক গাছপালা। নানারকম পাখির ডাক ভেসে আসছে। গোগোল ঝুঁকে পড়ে স্টেশনের নাম দেখার চেষ্টা করল। দেখতেও পেল, ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, "নলবাড়ি"।

এই সময়েই জটুমামা কামরায় এসে ঢুকলেন। তাঁর হাতে দুটো ফ্লাস্ক। তখনই বাইরে ঢং ঢং ঘন্টা বেজে উঠল। কয়লার এঞ্জিনের হুইসল্ ভেসে এল। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "দুধ পেলে?"

জটুমামা হেসে বললেন, "নিশ্চয়ই। আমাদের কিছু জুটুক না জুটুক, চিক্কুসের জন্য টাটকা দুধ মিলতেই হবে।"

জটুমামার অসাধ্য যেন কিছুই নেই। তিনি মায়ের হাতে ছোট ফ্লাস্কটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "নিন দিদি, জ্বাল দেওয়া টাটকা দুধ, চিক্কুসের জন্য। তবে সবটা নয়। আমাদের চায়ের জন্যও কয়েক চামচ দুধও ওতে আছে। আর এই ফ্লাস্কে চায়ের লিকার আছে।"

বাবা বললেন জটুমামাকে, "দরজাটা বন্ধ করে এবার বসে পড়ো।"

চিক্কুস্ ইতিমধ্যে জানালা থেকে সরে এসে, গোগোলের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মা চা আর দুধের ফ্লাস্ক কামরার আয়নার নীচে ছোট তাকের ওপর রাখলেন। একটা বেতের ব্যাগ থেকে গোগোলের টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "গোগোল, যাও, আগে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নাও।"

গোগোল উঠতে গেলেও চিক্কুস্ ওকে ছাড়তে চাইল না। জামার হাতা কামড়ে ধরল। গাড়ি তখন ঝুক-ঝুক শব্দে চলতে আরম্ভ করেছে। মা এগিয়ে এসে চিক্কুসকে টেনে নিজের কোলে তুলে নিয়ে

আদর করে ধমক দিলেন, "খালি কুটকুট করে কামড়ানো। দুধের দাঁত খুব শরশর করছে। দেব একেবারে ভেঙে।"

গোগোল মুগ্ধ চোখে চিক্কুসকে দেখে, বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। বেসিনের ট্যাপ খুলে, মুখে জল কুলকুচি করে, ব্রাশ ভিজিয়ে নিল। দাঁত মাজতে মাজতে বাইরে এসে বলল, "মা, আমি তো বাংকের ওপর কাল রাত্রে শুয়েছিলাম। নীচে এলাম কেমন করে?"

"সেটাই হল রহস্য।" জটুমামার গোঁফজোড়া ডানা মেলে দিল। ঝকঝকে চোখে তাকিয়ে হাসলেন।

মা তখন কামরার এক পাশে একটা প্লেটে দুধ ঢালছেন। চিক্কুস্ কোল থেকে নামবার জন্য ছটফট করছে। মা ধমকে দিয়ে বলছেন, "রোসো, রোসো। খিদেয় আর থাকতে পারছ না দেখছি। গরম দুধ খেয়ে জিভ পোড়াবে নাকি?"

বাবা বললেন গোগোলকে, "মাঝরাত্রে নেমে তুমি বাথরুমে গেছলে। ফিরে এসে চিক্কুসকে দেখে ঘুমচোখেই তোমার জেদ চাপল, ওকে নিয়ে শোবে। তার জন্যে আমার জায়গা তোমাকে ছেড়ে, আমাকেই বাংকের ওপরে যেতে হয়েছিল।"

জটুমামা গোগোলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "আর আমি হলফ্ করে বলতে পারি মাস্টার গোগোল, কাল রাত্রে তুমি নিশ্চয়ই চিক্কুসকে স্বপ্ন দেখেছ।"

গোগোল দাঁত মাজতে ভুলে গিয়ে, পেস্টের ফেনাসুদ্ধ মুখ হাঁ করে জটুমামার দিকে তাকাল। আশ্চর্য, স্বপ্নের কথা জটুমামা জানলেন কী করে? বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল? সত্যি স্বপ্ন দেখেছ নাকি?"

গোগোল অবাক চোখে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকাল। জটুমামা আর বাবা মুখোমুখি তাকিয়ে হেসে উঠলেন। বাবা বললেন, "চিক্কুস্ ছাড়া মাথায় এখন আর কিস্যু নেই।"

গোগোল পেস্টের ফেনাসুদ্ধ মুখে কিছু বলবার চেষ্টা করল। বাবা বাধা দিয়ে বললেন, "যাও, আগে মুখ ধুয়ে এসো, তারপরে স্বপ্নের কথা শোনা যাবে।"

গোগোল মুখ ধুতে যাবার আগে দেখল, মা তখনও চিক্কুসকে কোল থেকে নামতে দেননি। চিক্কুস্ কুঁই কুঁই করে বায়না করছে। গোগোলের ভাল করে দাঁত মাজা হল না। কোনোরকমে কয়েকবার দাঁতে ব্রাশ বুলিয়ে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এল। আয়নার কাছে হুকে একটা ঝোলানো ছোট তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চিক্কুসকে তখন নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ও জিভ দিয়ে চেটে-চেটে দুধ খাচ্ছে। মা কাঁচের গেলাসে চায়ের লিকার ঢেলে, দুধ মিশিয়ে বাবা আর জটুমামাকে দিলেন। এগিয়ে দিলেন বিস্কুটের প্যাকেট। গোগোল সকালে মুখ ধুয়ে চা খায় না। কিন্তু মা ওকে গেলাসে চা দিয়ে বললেন, "আজ আর দুধ নেই। তুমিও বিস্কুট দিয়ে চা খাও।"

জটুমামা বললেন, "এসো মাস্টার, বোসো। তারপরে তোমার স্বপ্নের কথা শুনি।"

গোগোল ভারী লজ্জা পেল। প্যাকেট থেকে বিস্কুট নিয়ে, জটুমামার পাশে বসে, ভোরের স্বপ্নের কথা বলল। আর সেই সঙ্গেই মন খারাপ করে বলল, "ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়।"

জটুমামা গোঁফের ডানা মেলে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "ওসব বিলকুল বাজে কথা। আসলে চিক্কুস্ তোমার মাথায় ঢুকে রয়েছে। সব সময়েই একটা হারাই-হারাই ভয়, তাই ওরকম স্বপ্ন দেখেছ। ওটা কিছু নয়। এখন নতুন দেশটা দ্যাখো। চারদিকেই দেখবে কেবল জঙ্গল আর পাহাড়।"

কথাটা সত্যি, কিন্তু নতুন দেশের থেকেও চিক্কুসই ওর নজর কেড়ে নিচ্ছে বারে বারে। মা ওর প্লেটে দু-বার দুধ ঢেলে দিয়েছেন। চিক্কুস্ সবটাই খেয়ে নিয়ে কামরার চারপাশে শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। মায়ের চোখও চিক্কুসের দিকে। গাড়ির ঝাঁকুনি সামলাবার জন্য মা কামরার দেওয়ালে হেলান দিয়ে চা আর বিস্কুট খাচ্ছেন। তারপরেই কী মনে করে, চায়ের গেলাস রেখে দিলেন আয়নার নীচে তাকের ওপর। চিক্কুসকে তুলে নিয়ে, বাথরুমের দরজা খুলে ওকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চিক্কুস্ মিনিট খানেক বাথরুমে দরজার কাছে শুঁকে, হিসি করে দিল। আশ্চর্য, মা কী করে বুঝলেন, চিক্কুসের হিসি পেয়েছে। আর চিক্কুস্ যেন বাথরুমে যাবার জন্যেই তৈরি ছিল। তারপরেই চিক্কুস্ কামরায় এসে খরগোশের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ুতে আরম্ভ করল। সকলের পায়ের কাছে গিয়ে, শাড়ি আর পায়জামা কামড়ে ধরতে লাগল। একেবারে শেষে এল গোগোলের কাছে। গোগোলের রাতের পরা ঢলঢলে পায়জামার ওপর পা তুলে দিয়ে, ওর মুখের দিকে তাকাল। গোগোলের চা বিস্কুট খাওয়া শেষ। ও চিক্কুসকে কোলের ওপর তুলে নিল। শুরু হয়ে গেল চিক্কুসের তাণ্ডব। গোগোলের গাল গলা মুখ চেটে দিয়ে, জামার কলার কামড়ে ধরতে লাগল। ভাবটা অনেকটা লড়াই-লড়াই খেলার মতো।

গোগোলেরও খেলা জমে উঠল। চাটলে সুড়সুড়ি, কামড়ালেই উঃ আঃ। তবে বেশিক্ষণ নয়। মা পাউডার আর ব্রাশ বের করলেন। চিক্কুসকে টেনে নিয়ে ওর গায়ের বড় বড় লোম সরিয়ে সারা গায়ে পাউডার মেখে ব্রাশ করে দিতে লাগলেন। চিক্কুস্ বারেবারে ব্রাশটা কামড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। মা বারেবারেই চোখ পাকিয়ে ধমক দিচ্ছেন, "ফের দুষ্টুমি হচ্ছে? এবার কিন্তু খুব মারব।"

চিক্কুসের বয়ে গেছে মায়ের কথা শুনতে। এমন-কী, মায়ের ধমকের প্রতিবাদে, কয়েকবার সরু গলায় ঘেউ ঘেউ করেও উঠল। গোগোল হা হা করে হেসে উঠল। কিন্তু একটু পরেই চিক্কুস ভাল ছেলেটির মতো মায়ের কোলের কাছে পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়েই ঘুম।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু স্টেশন পেরিয়ে গিয়েছে। গোগোল চেষ্টা করেছে স্টেশনগুলোর নাম পড়ার। সব পড়তে পারেনি। রঙিয়া জংশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেখানেই একজন উর্দিপরা রেলের ক্যেটারারের লোক সকালের খাবার দিয়ে গেল। বাটার টোস্ট, ওমলেট আর চা। মা বের করে দিলেন মামিমার দেওয়া ক্ষীরকদম্ব। চিক্কুস্ একটুও নড়ল না। বার্থের উপর উপুড় আর লম্বা হয়ে ঘুমোতেই লাগল।

ট্রেন সাড়ে দশটায় পৌঁছুল গৌহাটি। বিরাট স্টেশন। লোকজনের ভিড়ও বেশ। গোগোল ইংরেজিতে পড়ল "গৌহাটি।" আর অসমিয়া ভাষায় লেখাটা উচ্চারণ করল, "গুবাহাটি।"

জটুমামা হো হো করে হেসে বললেন, "গোগোল, ওটা বাঙলা নয়, অসমিয়া। আসলে র-এর ফুটকি, আর পেট-কাটা ব তোমাকে ঘুলিয়ে দিয়েছে। ওটা পড়তে হবে গুয়াহাটি বা গৌহাটি। যতদূর জানি, অসমিয়া ভাষায় সুপুরি দেওয়া পানকে বলে গুয়া। অথবা হয়তো কেবল সুপুরিকেই গুয়া বলে। তার থেকেই গুয়াহাটি নাম হয়েছে কি না আমি জানিনে।"

গোগোল বলল, "গৌহাটি তো আসাম রাজ্যের রাজধানী।"

"ঠিক বলেছ।" জটুমামা বললেন, "আমরা ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর যে রেল-ব্রিজটা দিয়ে এলাম, ওটা আগে ছিল না। ছেলেবেলায় যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন ওপারে পাণ্ডুঘাট বলে একটা স্টেশন ছিল। ফেরি স্টিমারে নদী পেরিয়ে এসে আবার ট্রেনে উঠতে হত।"

এই সময়েই রঙিয়ার সেই রেল-কেটারিংয়ের লোকটি এল খালি থালাবাসন নামিয়ে নেবার জন্য। আর একটা বিল বাড়িয়ে দিল জটুমামার দিকে। জটুমামা হাত বাড়াবার আগেই, বাবা বিলটা নিজের হাতে টেনে নিলেন। জটুমামা বললেন, "আহা, এত টানাটানি কিসের? আপনাকে তো বলেইছি, ঠিক সময়ে আপনার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেব।"

বাবা বললেন, "সে যখন নেবে, তখন দেখা যাবে। এখন লোকটিকে আমাদের দুপুরের খাবারের কথা বলে দাও। চিক্কুসের জন্যও বলতে ভুলো না।"

মা বললেন, "চিক্কুসের জন্য আলাদা কিছু বলতে হবে না। ভাতের সঙ্গে মাছ মাংস যা-ই পাওয়া যাক, আমি জলে ধুয়ে, হাড় কাঁটা ছাড়িয়ে চিক্কুসকে দেব।"

জটুমামা রেলওয়ে কেটারিংয়ের লোকটির কাছে জেনে নিলেন, দুপুরের খাবার মিলবে চাপারমুখ জংশন স্টেশনে। চিকেন-কারি রাইস ডাল আর ভাজি মিলবে। লোকটিকে দেখে নেপালি মনে হল। কিন্তু জটুমামার সঙ্গে সে বাংলাতেই কথা বলল। জটুমামা চার প্লেট খাবারের অর্ডার দিলেন। বাবা বিলের টাকা মিটিয়ে দিতে, সে একটা সেলাম ঠুকে নেমে গেল।

চিক্কুসের ঘুম ভাঙল সাড়ে এগারোটা নাগাদ। মা ওর প্লেটে জল ঢেলে দিলেন। ও চুকচুক করে জল খেল। আবার একবার বাথরুমের দরজা খুলতেই ও ভিতরে গেল। ঠিক শেখানো-পড়ানো বাচ্চার মতোই। কিন্তু এখন ওর লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি তেমন নেই। বাথরুম থেকে বোধহয়, গোগোলের রবারের স্যাণ্ডেল একটা মুখে করে, এক কোণে গিয়ে বসে চিবোতে লাগল।

বাথরুমের শাওয়ারে জল ছিল। গোগোলই সকলের আগে চান করে নিল। জলটা বেশ গরম হয়ে গিয়েছে। তারপরে বাবা আর জটুমামা। সকলের শেষে মা। চাপারমুখ জংশনে খাবার এল। মা আগে চিক্কুসের খাবার তৈরি করলেন। ওযুধ মিশিয়ে দিলেন খাবারে। চিক্কুসের খুবই খিদে পিয়েছিল। কিন্তু জিভের ঠেলায় খাবার একপাশে জমে যেতে লাগল। মা আবার সেটা আঙুল দিয়ে চারিয়ে দিলেন। চিক্কুসের তাতে খেতে বেশ সুবিধে হল।

গোগোল বাবা জটুমামার সঙ্গে কোলে প্লেট তুলে নিয়ে খেল। ওদিকে চিক্কুসের তখন আবার খেলার ঝোঁক চেপেছে। মা আগেই বলে দিলেন, "চিক্কুস্ যেন কারো এঁটোতে মুখ না দেয়।"

গোগোল খাবার পরে, আবার খানিকক্ষণ চিক্কুসের সঙ্গে খেলা জুড়ল। ইতিমধ্যে গাড়ি যতই চলছে, পাহাড় আর জঙ্গল ততই বাড়ছে। মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে চা-বাগান। বাগানে মেয়েরা পিঠে ঝুপড়ি ঝুলিয়ে চা-পাতা তুলছে। কেউ কেউ ট্রেনের দিকে তাকিয়ে দেখছে। অনেকে কাছাকাছি থেকে হেসে হাত তুলে যেন টা-টা জানাচ্ছে। জার্নিটা সত্যি মজার। গোগোল চা-বাগান আগেই দেখেছে, চা-পাতা তোলাও দেখেছে হলং আর ফুনসলিংয়ের পথে যেতে যেতে। দার্জিলিংয়েও দেখেছে।

চিক্কুস্ আবার ঘুমিয়ে পড়ার পরে, গোগোলেরও কেমন ঝিমুনি ধরল। কিন্তু চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য ওর চোখ টেনে রাখল। গোগোল জানালা দিয়ে রোদের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিল, গাড়ি যেন পুব ঘেঁষে উত্তর দিকে চলেছে। বাবা তো সিটে বসেই একটু

ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন। মা একটা গোটা সিটে গা এলিয়ে পাশ ফিরেছেন। কেবল জটুমামাই গৌহাটি থেকে কেনা ইংরেজি আর অসমিয়া ভাষার দুটো পত্রিকা পড়ছেন।

লামডিং জংশনে এল প্রায় তিনটের সময়। আবার সেই রেলওয়ে কেটারার এল খালি বাসনপত্র গেলাস নিতে। বাবার ঠিক ঘুম ভেঙে গেল। তিনিই খাবারের বিল মিটিয়ে দিলেন। লোকটি আবার সেলাম করে, বাসনপত্র নিয়ে নেমে গেল। জটুমামা গোগোলকে বললেন, "আমি তোমাকে যে মেইনলাইনের কথা বলেছিলাম, এখানে এসেই সেটা মিশেছে। ওই দেখ, সেই ব্রডগেজ লাইন। আমরা যদি কাছাড় দিয়ে বদরপুর হয়ে আসতাম, সে পথ আরও সুন্দর। ওদিকে প্রায় সবই হিলি স্টেশন। চিহারা বলে একটা স্টেশন আছে সেই পথে, আর সেখান থেকেই পাহাড়ি রেলপথের শুরু। সেই পথে প্রায় বত্রিশটা পাহাড়ি সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে রেল চলে। এর মধ্যেই তুমি দেখছ, জায়গাগুলোর নাম কেমন অদ্ভুত বদলে যাচ্ছে। ও-পথে এলে, তুমি পেতে হারাংগাজাও, জাঠিঙ্গা, সাইলংডিসা, হাফলং, মাইবং হেনেমা—এমনি সব স্টেশনের নাম। আর ওই যে দেখছ, ডান দিকে একটু দূরেই বিরাট ফরেস্ট, ওটা হল নামুর ফরেস্ট। ছেলেবেলায় যখন এসেছিলাম, তখন বাবা বলেছিলেন, ভুলে যেন লামডিংয়ের জল মুখে না দিই। তখন এ অঞ্চলের জল ছিল খুব খারাপ, ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাকওয়াটার জ্বরের হাত থেকে রেহাই পাওয়াই ছিল মুশকিল। এখন অবশ্য অনেক বদলে গেছে।"

জটুমামার কথা শুনতে শুনতে গোগোলের নজর পড়ল প্ল্যাটফরমের একদল মেয়ে-পুরুষের দিকে। তাদের চেহারা আর পোশাক অদ্ভুত রকম। গোগোল সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, "জটুমামা, ওরা কারা?"

জটুমামা দেখে বললেন, "নিশ্চয়ই নাগা। তবে ওরা যে কোন্ ট্রাইবের নাগা, সেটা ঠিক বুঝতে পারছিনে। তোমার যদি খুব কৌতূহল হয়, তবে চলো গিয়ে জেনে আসি। গাড়ি এখানে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়াবে।"

গোগোল তখনই লাফিয়ে উঠল, বলল, "চলুন।"

গোগোল লাফিয়ে উঠতেই, চিক্কুসও লাফিয়ে ওর পায়ের ওপর পড়ল। মা জেগে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি চিক্কুসকে তুলে নিলেন। গোগোল জটুমামার সঙ্গে প্ল্যাটফরমে নেমে, সেই দলটার দিকে এগিয়ে গেল। জটুমামা দলটার সামনে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষকে কী একটা ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করলেন। লালচে মুখে অজস্র দাগ, লোকটা একটা লম্বা বাঁশের পাইপ কামড়ে ধরে তামাক টানছিল। জটুমামার দিকে তাকিয়ে হেসে, সেই ভাষাতেই জবাব দিল। কয়েকজন মেয়েও পুরুষদের সঙ্গে পাইপ মুখে তামাক টানছিল। মেয়েদের পাইপ একটু আলাদা রকমের। কিন্তু লম্বায় সবই প্রায় আট-দশ ইঞ্চি। দলের মেয়ে পুরুষরা সবাই জটুমামার দিকে দেখছিল। গোগোলকেও দেখছিল। গোগোলের মনে হচ্ছিল, জটুমামার কথার মধ্যে দু-চারটে বাংলা শব্দও যেন আছে। অথচ ধরতে পারছিল না।

জটুমামা গোগোলকে বললেন, "এরা হচ্ছে কুকি নাগা। এসেছে হেনেমা থেকে। গেছল মাইবংয়ে তুলো বেচতে। হেনেমায় তুলো বেশ ভাল হয়। হাতে কিছু টাকা-পয়সা আছে, তাই এদিকে একটু বেড়িয়ে যাচ্ছে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "ওরা আমাদের সঙ্গে ডিমাপুর যাবে না?"

"না।" জটুমামা হেসে বললেন, "তাতে ওদের অনেক ঘুরে যেতে হবে। কোহিমা থেকে হেনেমা অনেক দূর।"

গোগোল আবার জিজ্ঞেস করল, "কুকি নাগা মানে কী? ওরা কি নাগা নয়?"

"ওরাও নাগা। তবে কুকি নাগা।" জটুমামা গোগোলের হাত ধরে সরে এসে বললেন, "নাগাদের মধ্যে অনেকগুলো ট্রাইব আছে—মানে উপজাতি। প্রায় ষোলটা। আর তাদের ভাষাও সব আলাদা। কেউ কারো ভাষা বিশেষ বুঝতে পারে না। পরে আমি তোমাকে নাগা উপজাতির নামগুলো সব বলব। এরা হল কুকি নাগা। তবে কোহিমায় তুমি সব থেকে বেশি যাদের দেখতে পাবে, তারা হল আঙ্গামি নাগা। কুকিদের থেকে আঙ্গামিরা অনেক বেশি আধুনিক আর শিক্ষিত। কোহিমা গেলেই সেটা দেখতে পাবে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ওদের সঙ্গে নাগা কথা বলছিলেন?"

জটুমামা মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বললেন, "না। ওরা নিজেরাই আলাদা ট্রাইবের ভাষা জানে না, আমি কী করে কুকি নাগাদের ভাষা জানব। সকলের বোঝবার মতো একটা ভাষা এখানে চালু আছে, তাকে বলে নাগামিজ। তার মানে কিছু নাগা কমন শব্দের সঙ্গে ওটা অসমিয়া ভাষার একটা জগাখিচুড়ি। নাগামিজ কথাটা এসেছে বোধহয় নাগা-আসামিজ থেকে। আমাদের বাঙালিদের আনাড়ি হিন্দির মতো বলতে পারো। এর কারণ হল, নাগাল্যাণ্ড এক সময়ে ছিল আসাম রাজ্যের একটি জেলা। নাগারা সেটা পছন্দ করেনি। নাইনটিন সিক্সটিথ্রিতে, ফার্স্ট ডিসেম্বর নাগাল্যাণ্ড একটি আলাদা রাজ্য হয়, যাকে বলা হয় ভারতবর্ষের সিক্সটিন্থ স্টেট। বুঝতে পারলি?"

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "পারলাম। তার মানে নাগাল্যাণ্ড হয়ে গেল একটা আলাদা রাজ্য। যেমন বাংলা বিহার ওড়িশা, সেইরকম।"

"গুড"। জটুমামা মুখ তুলে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিগন্যাল ডাউন হয়েছে, এবার গাড়ি ছাড়বে। চলো, আমরা উঠে পড়ি। তারপরে বলছি।"

গোগোল জটুমামার সঙ্গে গাড়িতে নিজেদের কামরায় উঠল। দরজাটা ভেজানো ছিল। মা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। বাবা পশ্চিমদিকের জানালা দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। জটুমামা দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করলেন। গোগোল মায়ের সিটে তাকিয়ে চিক্কুসকে দেখতে পেল না। ভাবল, মায়ের শরীরের আড়ালে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। না, মায়ের শরীরের আড়ালে, কোলের বা বুকের কোথাও চিক্কুস্ নেই। বাইরে তখন ঘণ্টা বেজেছে। হুইস্‌লের শব্দ ভেসে এল। গাড়ি নড়ে উঠল। গোগোল বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, চিক্কুস্ কোথায়?"

বাবা মুখ ফিরিয়ে মায়ের আসনের দিকে আগে তাকালেন। বললেন, "ও তো তোর মায়ের কাছেই ছিল দেখেছিলাম?"

গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। গোগোল আবার মায়ের গায়ের কাছে গেল। কথাবার্তার শব্দে মায়ের ঝিমুনিও কেটে গিয়েছিল। চোখ মেলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"চিক্কুস্ কোথায় মা?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

মা নিজের আশেপাশে দেখে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, "ও তো আমার গা ঘেঁষেই শুয়েছিল। কোথায় গেল?"

গোগোলের মুখ শুকিয়ে গেল। বাবা বললেন, "আশ্চর্য, ওরা যখন গাড়ি থেকে নেমে গেল, আমিও তো তাই দেখলাম। চিক্কুস্ তোমার গা ঘেঁষে শুয়ে আছে।"

মা ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, "দরজাটা কি খোলা ছিল?"

"না তো!" জটুমামা বললেন, আর নিচু হয়ে মায়ের সিটের তলা দেখে, মাথা নাড়লেন, "না, ওখানে ঢোকেনি।"

গোগোলের মনটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। ও বাবার সিটের তলায় নিচু হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মুখ তুলে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "এখানেও নেই।"

মা উৎকণ্ঠিত চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দরজা খোলা পেয়ে বেরিয়ে যায়নি তো?"

"অসম্ভব!" জটুমামা জোরের সঙ্গে বললেন, "আমি আগেই লক্ষ করে দেখেছি। চিক্কুস্ সিটের ওপর থেকে লাফিয়ে নীচে নামতে ভয় পাচ্ছিল। দরজা খোলা ছিল না। যদিও বা থাকত, প্ল্যাটফরমের ওপর কখনোই লাফ দিত না।"

গোগোল তখন পাগলের মতো বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি খুলে ফেলেছে। বাবা মা উঠে দাঁড়িয়েছেন। সকলের মুখেই উৎকণ্ঠা। গোগোলের মনে হল, ও কান্না চাপতে পারবে না। জটুমামা হঠাৎ হোহো করে হেসে উঠলেন। সকলের চোখ জটুমামার দিকে। তিনি হাসতে-হাসতে বললেন, "সত্যি, চিক্কুসের সাহস বেড়ে গেছে। ও সিট থেকে লাফিয়ে নামতে পেরেছে। আমি তাই অবাক হয়ে ভাবছি, দুটো ছোট ব্যাগের মাঝখানে সাদা তোয়ালেটা নড়ছে কেন?"

বাবার দিকের সিটের এক পাশে দুটো ব্যাগ রয়েছে। তার ধারেই সিটের নীচের দিকে ঢোকানো বড় দুটো স্যুটকেস্। ব্যাগ দুটোতে ছোটখাটো কাজের জিনিসপত্র। চিক্কুস্ একটা ব্যাগ থেকে, ওপরে রাখা সাদা তোয়ালেটা তুলে নিয়ে, সেটাকে কামড়াতে গিয়ে নিজেই তোয়ালে চাপা পড়ে গেছে। এখন তোয়ালের ভিতর থেকে নিজেকে বের করার চেষ্টা করছে। বাইরে একমাত্র সাক্ষী হিসাবে বেরিয়ে আছে তার লোমশ একটি পা।

গোগোল ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটা ব্যাগ সরিয়ে দিল। তোয়ালেটা টেনে তুলতে গেল। চিক্কুসসুদ্ধ তোয়ালেটা উঠে পড়ল। ও তোয়ালেটা কামড়ে ধরে ঝুলছে। গোগোল হাসছে, কিন্তু ওর চোখে তখন জল এসে পড়েছে। মায়ের অবস্থাও একই রকম। হাসছেন, কিন্তু তাঁর চোখও ছল্ছল্ করছে। বাবা ধপাস করে সিটের ওপর বসে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরালেন। বললেন, "বাব্বা! একটা সামান্য প্রাণী এমন ওলটপালট কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে, ভাবা যায় না।"

"চিক্কুস্ না, ওর নাম রাখা উচিত লুক্কুস্।" জটুমামা বাবার পাশে বসে গোঁফের ডানা মেলে হেসে বললেন, "লুকোচুরি খেলতে গেলে, ওর মতো লুকোবার জুড়ি মিলবে না।"

গোগোল তখন চিক্কুসের মুখ থেকে তোয়ালেটা ছাড়াবার চেষ্টা করছে। চিক্কুস্ সেটা ছাড়বে তো নাই, উল্টে গরগর শব্দ করে, মাথা ঝাঁকিয়ে এমন ঝটকা মারতে লাগল, যেন বাঘ তার শিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। মা এগিয়ে গিয়ে, রাগের ভান করে বললেন, "দেখি তো ওর কত তেজ হয়েছে। মেরে ওর হাড় ভাঙব।"

মা বসে পড়ে, চিক্কুসের চোয়াল ফাঁক করে ধরে, তোয়ালে আটকে যাওয়া ওর দুধের দাঁত সরিয়ে আনলেন। গোগোল তোয়ালেটা টেনে নিল। মা চিক্কুসকে কোলে তুলে উঠে দাঁড়িয়ে, ওর গালের দু'পাশে আল্‌তো করে মেরে বললেন, "আমার প্রাণ উড়িয়ে নিয়েছিলে তুমি, দুষ্টু কোথাকার!"

চিক্কুস তার জবাবে মায়ের হাতই কামড়ে ধরল। মা যতবার হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলেন, ওর জেদ যেন ততই বেড়ে যেতে লাগল। মা আবার ধমক দিতেই, চিক্কুস যেন একটু থমকে গেল। লোমের ভিতরে ওর কালো চোখের বিন্দু দুটো ঝকঝক করছে। হঠাৎ মুখ তুলে মায়ের চিবুক চেটে দিল।

গোগোল হেসে বলল, "এখন তোমাকে ভোলাচ্ছে।"

জটুমামা বললেন, "লাসা পপিগুলো ট্রেনিং পেলে দারুণ কাজ দিতে পারে। তিব্বতিরা ওদের নিয়ে শিকারে বেরোয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বরফের রঙে এমন মিলিয়ে যায়, খুঁজে পাওয়াই দায়।" গোগোলের মন শান্ত। ও মায়ের পাশে বসে চিক্কুসকে মুখ নিচু করে বকুনি দিতে গেল। চিক্কুস্ অমনি ওর গালে মুখেও চেটে দিল। জটুমামা হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, "আমরা প্রায় এসে গেছি। ধানসিড়ি স্টেশন পেরিয়ে গেল। এর পরে রাঙাবাহার, তারপরেই ডিমাপুর।"

বাবা বলে উঠলেন, "বাঃ, নামটা তো বেশ, ধানসিড়ি। একমাত্র জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই কথা পেয়েছি।"

জটুমামা বললেন, "ধানসিঁড়ি না ধানসিঁড়ি, তা বোঝা যায় না, তবে একটা চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে দিতে অসুবিধে কী আছে। তারপরেই রাঙাবাহার নামটিও চমৎকার।"

"আর তারপরেই ডিমাপুর।" মা বললেন, "কোথাও কোনো মিল নেই।"

গোগোলের হাত তখন চিক্কুসের মুখের মধ্যে। ও বলে উঠল, "অমিলের মধ্যেই নাকি মিল আছে। ক্লাসের আন্টি কবিতা বোঝাবার জন্য বলেছিলেন।"

বাবা ভুরু কুঁচকে গোগোলের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর জটুমামার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

৪

ডিমাপুর স্টেশনে টিকেট কলেকটর গোগোলের কোলে চিক্কুসকে দেখে ভুরু কোঁচকাল। ওদিকে জটুমামার সঙ্গে এগিয়ে এলেন আসাম মেলের গার্ড। জটুমামা হাত রাখলেন গোগোলের কাঁধের ওপর। টিকেট কলেকটরের ভুরুজোড়াও সোজা হয়ে গেল। জটুমামা তাকে বললেন, "আইন মাফিকই আনতে চেয়েছিলুম। গার্ড সাহেব নিজেই অন্যরকম ব্যবস্থা করলেন।"

টিকেট কলেকটর বোধহয় বাঙালি। একগাল হেসে বললেন, "আমি কি স্যার কিছু বলেছি? অনেকদিন পরে এলেন। অবশ্য রেল-পথে।"

জটুমামা হাসতে হাসতে, গার্ডকে ধন্যবাদ দিয়ে গোগোলকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কুলির মাথায় বড় বড় দুটো স্যুটকেস। বাবা মা'র হাতে দুটো ব্যাগ। স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একটাই মাত্র সাদা অ্যামবাসাডার। বাকি দুটো জিপ। অন্য দিকে দুটো ট্রাক। অ্যামবাসাডারের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, জিনের ট্রাউজার আর টাওয়েল গেঞ্জি গায়ে, মাথায় টুপি পরা একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক। জটুমামাকে দেখেই, ছুটে এসে কপালে হাত ঠেকাল। জটুমামা তাঁর সেই নাগামিজ ভাষায় হেসে কী সব বললেন। তার মধ্যে কেবল এটাই বোঝা গেল, যুবকের নাম "মাচু"। মাচুও নাগামিজ ভাষায় কী সব জবাব দিল, আর গোগোলের দিকে ছোট জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে দেখল। বিশেষ করে, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তার দৃষ্টি যেন চিক্কুসের দিকে থমকে রইল। জটুমামা বাবা মা আর গোগোলের সঙ্গে মাচুর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মাচু ঘাড় ঝাঁকিয়ে, মাথা নিচু করে সবাইকেই নমস্কার জানাল। তার চোখ ছোট, গালের হাড় উঁচু। রঙ হলদে আর তামাটে। পাহাড়ি ছাপ থাকলেও, মাচু বেশ লম্বা। সাহেবদের মতো টুপি খুলে সম্মান দেখানো তাদের আদপ নয়, তাই সে টুপি খুলল না। হাতে তার গাড়ির চাবি। কুলিদের ইশারা করে, সে গাড়ির পেছনের কেরিয়ার খুলে দিল। জটুমামা বললেন, "মিঃ হারালু তাঁর নিজের গাড়ি আর ড্রাইভার মাচুকে আজ সকালেই কোহিমা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আর আমাদের কোহিমায় ওঠা হচ্ছে না। থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে ডিমাপুরের পি· ডব্লিউ· ডির বাংলোয়। সেখানেও খবর দেওয়া আছে।"

বাবা বললেন, "এমনিতেই ধুলোয় আর কয়লার ধোঁয়ায় আমাদের যা ছিরি হয়েছে, এখন আর একবার চান না করলে নয়। টায়ার্ড লাগছে। আজ কোহিমায় যেতে হলে কষ্টই হত।"

জটুমামা গোগোলকে নিয়ে গাড়ির সামনের আসনে বসলেন। গোগোলের কোলে চিক্কুস। বাবা মা বসলেন পিছনে। কুলিদের ভাড়া মিটিয়ে দেবার পরেই মাচু গাড়ি চালিয়ে দিল। বেলা প্রায় পাঁচটা। দূরে আকাশের গায়ে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে ভিড় তেমন নেই। বেশ কয়েকটা মিলিটারি ট্রাক আর জোঙা জিপ দেখা গেল। হালকা অটোমেটিক গান হাতে একদল সৈনিক রাস্তার ধারের জঙ্গলের দিকে চলেছে। তখনও কিছু ইউনিফর্ম পরা মেয়ে বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে চলেছে। দেখলেই বোঝা যায়, ওরা স্কুলের ছাত্রী, এবং নাগা। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "জটুমামা, এখানে কি স্কুলে এখনো সামার ভেকেশান হয়নি?"

"ডিমাপুরে হয়তো শিগগিরই হবে।" জটুমামা বললেন, "তবে পাহাড়ের ওপর স্কুলে সামার ভেকেশান বলে কিছু নেই। সেখানে উইণ্টারের ছুটিই হল সব থেকে লম্বা, কারণ ওখানে শীতটাই বেশি।"

গাড়ি এসে পৌঁছে গেল পি· ডব্লিউ· ডি-র বাংলোয়। দুটো শোবার ঘর, সঙ্গে বাথরুম। ব্যবস্থা চমৎকার। হাত মুখ ধোবার আগেই এসে গেল চা। সকলেই আর একবার স্নান করলেন। মা একটা তোয়ালে ভিজিয়ে, ভাল করে নিংড়ে চিক্কুসকে মুছিয়ে দিলেন। গায়ে পাউডার ছড়িয়ে, আর এক প্রস্থ ব্রাশ করা হল। তারপরে জলখাবার এল, পরোটা, আলুর দম আর মিষ্টি। জটুমামা আর বাবা বেরোবার কথা ভাবছিলেন। তা আর হল না। হঠাৎ মেঘ করে বৃষ্টি নামল। মা বললেন, "তবু একটু ঠাণ্ডা হল।"

জটুমামা বললেন, "পাহাড়ে বৃষ্টি নামলে মোটেই ভাল লাগবে না। বেড়ানোটা মার খেয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাকে যে একবার বেরোতেই হবে।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

জটুমামা বললেন, "কোহিমায় যাবার আগে, আমাদের একটু

অনুমতিপত্র চাই। ওদের অফিসে একবার যেতেই হবে। ঠিক পাসপোর্ট ভিসা না হলেও, অনুমতিপত্র ছাড়া যেতে দেবে না। সবাই আমার চেনা, আর অফিস এখন খোলাই পাব। আমি ঘুরে আসি।"

বাবা সঙ্গে যেতে চাইলেন। জটুমামা এই বৃষ্টিতে আর বাবাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না। একলাই বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন ঘন্টাখানেক পরে। হাতে অনুমতিপত্র।

রাতের খাওয়া-দাওয়াও, রাইস্ চিকেন-কারি দিয়ে ভালই হল। মা চিক্কুসকে রাত্রে দুধ খাইয়ে দিলেন। দেখা গেল, চিক্কুস কার্পেটের বাইরে ঠাণ্ডা মেঝেয় গা এলিয়ে আরামে শুয়ে পড়েছে। কারোরই আর জেগে থাকবার ইচ্ছে ছিল না। বাবা আর জটুমামা এক ঘরে ঘুমোতে গেলেন। মা আর গোগোল আর-এক ঘরে। চিক্কুস তাদের সঙ্গে।

পরের দিন ঘুম ভাঙল বেশ ভোরে। জটুমামা তাড়া লাগালেন, সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে। যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যায় ততই ভাল। ডিমাপুর থেকেই স্নান সেরে, জলখাবার খেয়ে এবার কোহিমা যাত্রা। রাস্তায় বেরিয়ে জটুমামা বললেন, "মিঃ হারালু দেখছি গাড়ির ট্যাংক ভর্তি করে পেট্রোল দিয়ে দিয়েছেন। যাবার আগে আমরা একবার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্য়ের অফিসে ঘুরে যাব।"

মাচুকেও সেই কথা জানিয়ে দিলেন। সকাল তখন মাত্র আটটা। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্য়ের অফিসে দরোয়ান আর বেয়ারা ছাড়া কেউ নেই। জটুমামা সেখান থেকেই মিঃ পুরকায়স্থকে টেলিফোন করলেন। জানিয়ে দিলেন, আগামী সপ্তাহের ঠিক এই দিনে, কলকাতার ফ্লাইটের জন্য তাঁর তিনটি ফুল আর দুটি হাফ টিকেট চাই। একটি হাফ টিকেট চিক্কুসের জন্য। সেকথাও জানিয়ে দিলেন, আর মোটামুটি একটা মাপ দিয়ে, চিক্কুসের জন্য একটা খাঁচা তৈরি রাখার অনুরোধও জানালেন। কথাবার্তা শুনে, আর জটুমামার মুখ দেখে বোঝা গেল, সব ব্যাপারটাই ঠিক হয়ে গেল। তিনি পুরকায়স্থকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখে বেরিয়ে এলেন।

গাড়ি ছুটল কোহিমার দিকে। সামনের আসনে জটুমামার সঙ্গে গোগোল। ওর কোলে চিক্কুস। বেশ খানিকটা সমতল পথে গিয়ে, গাড়ি পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগল। ডান দিকে একটা পাহাড়ি নদী, আর বিরাট বড় বড় গাছপালায় ঘন অন্ধকার। পথে অনুমতিপত্র কেউ দেখতে চাইল না। জটুমামা গোগোলকে নাগাদের কিছু ইতিহাস শুনিয়ে দিলেন। যেমন নাগাদের প্রত্যেকটি ট্রাইবেরই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা, কোথা থেকে তাদের জন্ম হল। যেমন আঙ্গামি নাগাদের বিশ্বাস, "জ্যাজোমা" গ্রামের কাছে একটা হ্রদ থেকে তাদের জন্ম হয়েছে। আবার কেউ বলে, "খনসা" গ্রামের একটা গাছ থেকে তারা জন্মেছে। আবার এমন কথাও শোনা যায়, "খেজেখেনোমা" গ্রামের বিরাট এক পাথরের চাঁই থেকেই তারা জন্মেছে। আসলে এ সবই অনেকটা রূপকথার মতো। জটুমামা বললেন, "যেমন ধরো, কোনো এক সময়ে সেই পাথরের কাছে থাকত এক বুড়োবুড়ি। তাদের ছিল তিন ছেলে। রোজ তারা পাথরের ওপর ধান শুকোত, সন্ধে হলে এক বোঝা ধান শুকিয়ে দু বোঝা করা হত। কিন্তু একদিন তিন ছেলের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া। বাবা মা ভয় পেয়ে সেই পাথরের ওপর খড়ের আগুন জ্বালিয়ে দিল। যেমনি দেওয়া, অমনি বাজ পড়ার মতো শব্দ করে, সেই পাথর ভেঙে দু টুকরো। আর তার ভেতর থেকে প্রকাণ্ড এক দৈত্য বেরিয়ে চলে গেল স্বর্গে। ফলে সেই পাথরের মহিমা গেল খতম হয়ে। তিন ভাই হয়ে গেল আলাদা। আর সেই তিন ভাইয়ের ছেলেমেয়েরাই নাকি পরে ভাগাভাগি করে হয়ে গেছল আঙ্গামি, সেমা আর লোটা নাগা। আঙ্গামিরা নিজেদের বলে টেঙ্গিমা। সংখ্যায় তারাই বেশি।"

জটুমামা একটু থেমে, আবার বললেন, "যেমন ধরো মাউখান নাগা, সাধারণত তাদের মেমি নাগা বলে। তারা থাকে মণিপুরের কাছে, উঁচু জাফু পাহাড়ে। তাদের ধারণা তাদের পূর্বপুরুষ হল "কেথেকুয়া"। সে আর তার বউ নাকি দৈত্য বাঘ আর মানুষের পূর্বপুরুষ। তাদেরও তিনটি সন্তান ছিল। একটি দৈত্য, একটি বাঘ, আর একটি মানুষ। অবশ্য এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মানুষ ভাইয়েরই জয় হল, কারণ তার বুদ্ধি বেশি। এরাও আবার দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল, "চেক্রিমা" আর "চেভোমা"। তাদের থেকে আবার আর এক জাতি হল "বেরিচিমো"।
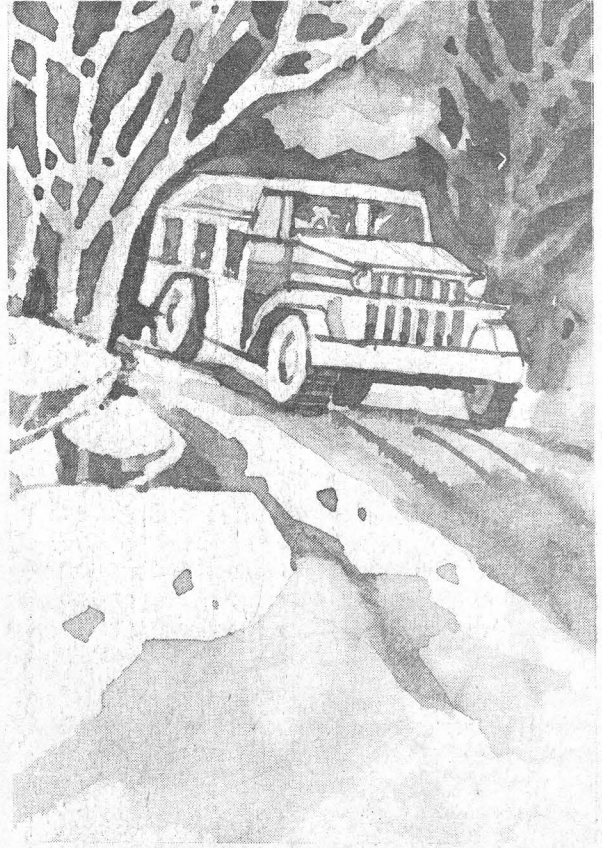
নাগাদের প্রত্যেকটা উপজাতিরই এরকম জন্মের ইতিহাস আছে। ষোলটা ট্রাইবের ষোলটা কাহিনী, আর ভাষাও আলাদা। এরকমই মিরি, সেমা, আরও সব নাগা উপজাতি আছে। আর তাদের সমাজের রীতিনীতিও অনেক আলাদা। এক সময়ে এরা নিজেদের মধ্যে লড়ত, আর শত্রুর মুণ্ডু কেটে নিয়ে গ্রামে গিয়ে উৎসব করত। যাকে বলে হেড হান্টিং। আর বীরত্ব দেখাবার জন্য শত্রুদের মুণ্ডু বাড়ির মাথায় ঝুলিয়ে রাখত। ইংরেজরা আসার পরে হেড হান্টিং বন্ধ করে। এখন নাগাজাতি অনেক উন্নতি করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায়, সবকিছুতে। মিশনারিরা একটা খুব ভাল কাজ করেছে। নাগাদের কোনো অক্ষর ছিল না। মিশনারিরা ইংরেজিতে ওদের ভাষা লিখতে শিখিয়েছে। ফলে ইংরেজিটা এখন এরা অনেকেই বেশ ভাল জানে। মানুষ হিসাবে এরা খুব সরল, খুব অতিথিপরায়ণ, দরাজদিল। তা বলে তুমি যদি ওদের কোনো কারণে ছোট করতে চাও, খেপে একেবারে আগুন হয়ে যাবে। আর একটা কথা বলে দিই। তুমি প্রথম-প্রথম বুঝতে পারবে না। এরা নিজেদের গায়ের শাল নিজেরাই বোনে। প্রত্যেক শালই আলাদা, আর শাল দেখলেই চেনা যায়, কে কোন্ উপজাতির নাগা।"

এই পর্যন্ত বলে জটুমামা জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলো তো, আমাদের মহাভারতের কোন্ বীর এখানে এসেছিলেন, আর নাগা মেয়ে বিয়ে করেছিলেন?"

গোগোল সমস্যায় পড়ে গেল। মহাভারতের গল্প আওড়াতে লাগল মনে মনে। বাবা-মাও জটুমামার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। গোগোল মুখ ফিরিয়ে তাঁদের দিকে দেখল। বাবা মা দুজনেই মুখ টিপে হাসছেন। গোগোল বলল, "বাবা, তুমি জানো?"

বাবা বললেন, "জানি, তবে নাগাল্যাণ্ডই সেই দেশ কি না আমি বলতে পারি না। অর্জুন একবার নাগভূমিতে এসেছিলেন, আর নাগকন্যা উলুপীকে বিয়ে করেছিলেন। ঠিক বললাম কি জটু?"

জটুমামা হেসে বললেন, "আপনাকে আমি পরীক্ষা করব? দেখলাম গোগোল জানে কি না।"

গোগোল ভারী লজ্জা পেল। মহাভারত ও পড়েছে, তবে তেমন করে পড়া নেই। ইতিমধ্যে পাহাড়ের পথের চেহারা বদলে গিয়েছে

অনেক। সেই পাহাড়ি নদীটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের গা বেয়ে গাড়ি উঠছে। আর চার দিকেই সবুজ উপত্যকার মতো, পাহাড় নীচে নেমে গিয়েছে। কোথাও থাক দেওয়া চাষ, ছোট-ছোট আল্ দিয়ে ঘেরা। কোথাও শুধুই পাহাড়ের ঢালু জমিতে চাষ। জটুমামা বুঝিয়ে দিলেন, আল্-ঘেরা ধাপে-ধাপে-নামা চাষকে বলে টেরাস কালটিভেশন, আর অন্যটার নাম ঝুম চাষ।

গোগোল একটা ব্যাপার অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ করছিল। ড্রাইভার মাচু প্রায়ই চিক্কুসের দিকে দেখছিল। ওর বোধহয় চিক্কুসকে খুব ভাল লেগেছে। "ঘাসপানি" নামে একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে নেমে সকলেই চা খেলেন। গোগোল খেল একটা বড় রাজভোগ। চিক্কুসও খাবার জন্য ভারী ছটফট করছিল। মা ওকে একটু জল দিলেন। কিন্তু চিক্কুসের নজর গোগোলের রাজভোগের দিকে। শেষ পর্যন্ত রাজভোগের একটু টুকরো রস নিংড়ে মা ওকে দিলেন।

দশ মিনিট পরেই আবার যাত্রা। গাড়ির সামনে চিক্কুসের গরম লাগছে, তাই মা ওকে নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। মাচু চিক্কুসের দিকে আবার দেখল। আর হেসে, নিজের ভাষায় জটুমামাকে কিছু বলল।

গোগোল দেখল, মাচুর কথা শুনেই, জটুমামার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। তিনি পিছন ফিরে একবার চিক্কুসকে দেখলেন। মুখ ফিরিয়ে মাচুকে দু-একটা কী কথা বললেন। মাচু মাথা ঝাঁকাল। কিন্তু গোগোল দেখল, জটুমামার মুখে কেমন একটা অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গোগোল মাচুর মুখের দিকে একবার দেখল। সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। জটুমামা আর-একবার পিছন ফিরে, মায়ের কোলে বসা, রাস্তার দিকে মুখ করা চিক্কুসকে দেখলেন। মা বা বাবা কিছুই খেয়াল করলেন না। জটুমামা আবার সামনের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়াটা যেন আরও গাঢ় হল। কিছুই বললেন না।

গোগোলের মনে হল, কী একটা যেন ঘটে গেল। জটুমামার এরকম অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তা ভরা মুখ ও একবারও দেখেনি। তাঁর সঙ্গে মাচুর কী কথা হল, তাও বোঝবার উপায় নেই। কিন্তু মাচুর কথা শুনে, এবং তিনি নিজে কী একটা বলার পরেই, তাঁর মুখ বদলে গেল। আর দু'বার চিক্কুসের দিকে কেনই বা ঐরকম করে তাকিয়ে দেখলেন, তাও বোঝা গেল না। অথচ গোগোল কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছে না।

জটুমামা হঠাৎ গোগোলকে চমকে দিয়ে, বিড়বিড় করে কী যেন বলে উঠলেন। ওঁর মোটা ভুরুজোড়া বারেবারেই কুঁচকে উঠল। বেশ বোঝা গেল, তিনি যেন দুশ্চিন্তায় কেমন গুম খেয়ে গিয়েছেন। গোগোল ভেবে পেল না, মাচু এমন কী বলতে পারে, যাতে জটুমামার মুখের চেহারা এরকম বদলে যায়। কোনো দুঃসংবাদ কি সে জটুমামাকে শুনিয়েছে? কোহিমায় যাঁর বাড়ি যাচ্ছে গোগোলরা, তাঁদের কি কোনো খারাপ খবর আছে? তাই বা কেমন করে হবে? মাচু তো চিক্কুসের দিকে তাকিয়ে হেসে কী বলেছিল। আর জটুমামার ভুরু তখনই কুঁচকে উঠেছিল। অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তা নিয়ে চিক্কুসকে দেখেছিলেন।

মিনিট কয়েক পরেই জটুমামা হঠাৎ নিজের মনে হেসে উঠলেন। শব্দ করে নয়, শুধু তাঁর বাটারফ্লাই কালো গোঁফের ডানা মেলে দিয়ে। চোখমুখের অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তাও কেটে গেল। ঠিক যেন ধাঁধার জবাব পেয়ে যাবার মতো। যেন কোনো ধাঁধায় পড়েছিলেন, আর জবাব খুঁজছিলেন। জবাব পাবার পরেই, তাঁর মুখের চেহারা আবার আগের মতো হয়ে গেল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জুবজা এসে গেল।"

জটুমামার "জুবজা"র জ যেন ইংরেজি জেড-এর মতো শোনাল। তারপরেই রাস্তার ধারে একটা বোর্ডে দেখতে পেল, ইংরেজিতে লেখা আছে, "কশন। জুবজা ব্রিজ ইজ অ্যাহেড"। বানান লেখা রয়েছে, "ZUBZA"। গাড়ি একটা ছোট সেতু পার হয়ে, বাঁক নিল। জটুমামা সামনে হাত দেখিয়ে বললেন, "ঐ যে কোহিমা দেখা যাচ্ছে।"

গোগোল সামনে তাকিয়ে দেখল, পাহাড়ের গায়ে, নিচু থেকে উঁচুতে ছড়িয়ে পড়া একটা শহর দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ি শহর যেমন হয়। অনেক রঙ-বেরঙের বাড়ি, থাকে-থাকে সাজানো। সবই যেন সাজানো খেলনার মতো। গোগোলের মনটাও তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। যদিও জটুমামার ভাবান্তরের ব্যাপারে কৌতূহল কিছুতেই কাটছে না। ও জিজ্ঞেস করল, "কোহিমা এখান থেকে আর কত দূর?"

"তা প্রায় তেরো কিলোমিটার হবে।" জটুমামা হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, "এখন বেলা দশটা বাজে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্যের অফিসে না গেলে, আর ঘাসপানিতে চা খেতে যেতে না নামলে, এতক্ষণে আমরা নাগাল্যাণ্ডের ক্যাপিটাল কোহিমায় পৌঁছে যেতাম। আশা করছি, দশটা কুড়ি-পঁচিশে পৌঁছে যাব।"

গোগোল এবার একটু শীত বোধ করল। পিছন ফিরে মা'কে বলল, "মা, আমাকে গরম কিছু গায়ে দিতে দেবে?"

মা একটি হাতকাটা পাতলা সোয়েটার বের করে রেখেছিলেন সেটা গোগোলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "নাও, এটা তো আমি অনেক আগেই বের করে রেখেছি। আমারও যেন এবার একটু গা শিরশির করছে।"

বাবা বললেন, "আমি তো একটুও শীত বোধ করছিনে।"

জটুমামার গায়ে, পাতলা একটা হাওয়াই শার্ট। বললেন, "মে মাসে কোহিমায় আমি কোনোদিন গরম জামা পরিনি। আমার তো রীতিমত গরম লাগে। তবে, কোহিমার নাগাদের দেখেছি, দিনই হোক আর রাত্রেই হোক, বেশির ভাগ লোক যা হোক একটা গরম জামা গায়ে রাখে।"

"সেটাই উচিত বলে আমার মনে হয়।" বাবা বললেন, আর মায়ের পাশের ব্যাগ থেকে একটা জহর কোট বের করে গায়ে দিলেন। আবার বললেন, "এখানকার লোকেরাই একমাত্র বোঝে, এখানে কী ভাবে থাকা উচিত।"

গোগোল পাতলা হাতকাটা সোয়েটারটা মাথা গলিয়ে পরে নিয়ে বলল, "আমি কিন্তু রাস্তায় আসতে যত এদেশের লোক দেখলাম, সকলের গায়েই গরম জামা রয়েছে।"

গাড়ি এখন ক্রমেই আরও ওপরে উঠছে। কোহিমা শহর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শহরের নীচের দিকে আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলন্ত গাড়িগুলোকে অনেকটা টয় গাড়ির মতো দেখাচ্ছে। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ছে দু' একটা বড় বড় বাড়ি, জলের ট্যাংক। কিছু কিছু বাড়ির মাথা কাচের মতো চিকচিক করছে। দেখলেই বোঝা যায়, ওগুলো টিনের চাল।

গোগোলের হঠাৎ মনে হল, চিক্কুসের ঠাণ্ডা লাগবে না তো! কথাটা বলতেই সবাই হেসে উঠলেন। জটুমামা বললেন, "চিক্কুস হচ্ছে বরফের দেশের জীব। পায়ের নখ দিয়ে বরফ খোঁড়ে। যত ঠাণ্ডা পাবে, ততই আরামে থাকবে।"

গোগোল লজ্জা পেল। মিঃ চিত্রকরের কথা ওর মনে পড়ল। তিনি বলেই দিয়েছিলেন, কলকাতার গরমে চিক্কুসের কষ্ট হবে। জটুমামার হিসাবে ভুল নেই। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই গাড়ি পাহাড়ি শহর কোহিমার রাস্তায় এসে পড়ল। হুইসল্ বেজে উঠতেই, গোগোলের চোখ গেল ট্রাফিক পুলিশের দিকে। দেখেই বোঝা যায়, নাগা ট্রাফিক পুলিশ। সাদা পোশাক, মাথায় টুপি। কলকাতার ট্রাফিক পুলিশের মতো নয়। এদের হাত দেখানোর ভাবভঙ্গি, ফিরে দাঁড়ানো আর তাকানো, সবই যেন খুব চটপট স্মার্ট ভাবের। আর প্রত্যেকটা গাড়ির যাত্রীদেরই যেন তারা চিলের মতো চোখে লক্ষ করে দেখছে। গোগোলের সেইরকমই মনে হল। এ কথাও মনে হল, গোগোল নিজে ট্রাফিক পুলিশ হলে বোধহয় এইরকম দেখত। কেননা, সব দিকে লক্ষ রাখতে ওর ভাল লাগে।

রাস্তা দিয়ে যারা চলেছে, তারা প্রায় সকলেই নাগা পুরুষ আর মহিলা। দুচারজন পাগড়িধারী গোঁফ-দাড়িওয়ালা শিখ ছাড়া, অন্য অঞ্চলের লোক যেন চোখেই পড়ছে না। পুরুষ, যে-বয়সেরই হোক প্রত্যেকের গায়েই প্রায় শাল রয়েছে। লাল আর কালো চওড়া ডোরাকাটা শালের কালো ডোরার গায়ে লাল কাজ করা। গরমের সময় বলেই বোধহয়, কারো গায়েই শাল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো নেই। ঘাড়ের এক পাশ বা দু পাশ দিয়ে ঝুলছে। মেয়েদের বেশির ভাগের

গায়েই শাল নেই। যাও বা আছে, সেগুলো কলকাতার লেডিজ শালের মতোই। মেয়েদের বেশির ভাগের গায়েই রঙিন স্কার্ট আর জামা। কয়েকজনকে দেখা গেল, তাদের পোশাক একেবারে অন্যরকম। হাঁটুর ওপর থেকে কোমর পর্যন্ত জড়ানো, অনেকটা শালের মতো কাপড় জড়ানো। আর এক টুকরো শাল, কোমরের কাছ থেকে গুঁজে, পিঠের দিকে জড়িয়ে বাঁধা। মাথায়ও সেইরকম ফেটি জড়ানো। গলায় গোছা-গোছা পাথরের মালা। হাতে কানেও অলঙ্কার। আর পিঠে বেতের একটা ঝুড়ি। নয় তো, ঝুড়ির বদলে শিশু। পিঠে শিশু ঝুলিয়ে নিয়ে পথ হাঁটতে সাঁওতালদেরও দেখা যায়। তবে এদের ফরসা পা, আর পায়ের গোছাগুলো বেশ মোটা। কিন্তু জটুমামা বলেছিলেন, শাল দেখলেই কোন্ ট্রাইবের নাগা, তা চেনা যায়। গোগোল দেখল, কিছু-কিছু পুরুষ নাগা হাসপাতালের লাল কম্বলের মতো, কেবল লাল শালই গায়ে জড়িয়ে ঝুলিয়ে চলেছে। বাস ট্রাক প্রাইভেট গাড়ি আর জিপ ছুটছে পথে পথে।

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "জটুমামা, টকটকে লাল শাল যারা পরেছে, তারা কোন্ ট্রাইব ?"

জটুমামা বললেন, "এরা যে-কোনো ট্রাইবই হতে পারে। তোমার লক্ষ পড়েছে ঠিকই। লাল শাল দেখে বিশেষ কোনো ট্রাইবকে চেনা যায় না, কারণ ওগুলো সরকারি শাল। মানে সরকার থেকে দেওয়া শাল। এরা ছোট দরের সরকারি কর্মচারী। অনেক সময় গরিবদেরও এরকম শাল দান করা হয়। তবে, কোহিমাতে পাঁচমেশালি নাগা আছে ঠিকই, কিন্তু এখানে বেশির ভাগ আঙ্গামি নাগারাই থাকে।"

ভিড়ের রাস্তা থেকে গাড়ি ডান দিকে মোড় নিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। লোকজন কম, গাড়িও কম। রাস্তা পরিষ্কার, বাড়িগুলো সুন্দর বাংলোর মতো। রাস্তার ধারে পাহাড়ের গায়ে বুনো গোলাপ ছেয়ে আছে। বড়-বড় গাছে ঝুলছে অর্কিড। কিছুটা উঠে, গাড়ি দু-তিনটে বাঁক ঘুরে, আবার নামতে লাগল। নামতে নামতে, একটা বাড়ির খোলা গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকল। জটুমামা বললেন, "আমরা মিঃ হারালুর বাংলোয় এসে গেছি।"

গাড়ি চলার দু পাশেই, চারদিকে ঘেরা বাগান। গোলাপ এখানে যেন তুলসীবনের মতোই ছড়িয়ে আছে। আরও কত রকমের ফুলের গাছ আর টব যে সাজানো আছে, তা গুনে দেখতে হবে। গাড়িটা দাঁড়াল নীল রঙ করা রেলিংয়ের কাঠের বারান্দার সামনে। আসলে গোটা বাড়িটা কাঠেরই। বারান্দার উপরে কতগুলো লাল রঙ করা চেয়ার আর একটা নিচু টেবিল রয়েছে। বারান্দায়ও অনেকগুলো ফুলের টব সাজানো। মাথার ওপরে টিন, নীচে কাঠের সিলিংয়ের গায়ে ঝুলছে অর্কিডের ছোট ছোট টব।

মাচু নামবার আগেই, বারান্দার সামনের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। ঘন নীল রঙের স্যুট। সাদা শার্ট, আর ডবল নটের লাল টাই তাঁর গলায়। ছোট চোখ, একটু লালচে মুখ, গালও একটু উঁচু, আর চোখ দুটো কালো ঝকঝকে। মাথার চুল উল্টে আঁচড়ানো। জটুমামা নামতেই, তিনি বারান্দা থেকে হাত বাড়িয়ে, হাসতে হাসতে নেমে এলেন, আর ইংরেজিতে বললেন, "হ্যালো হ্যালো মজুমদার, অনেককাল বাদে আপনাকে পাওয়া গেল।"

জটুমামাও ভদ্রলোকের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "অনেককাল আগে আর কোথায় মিঃ হারালু। সাত মাস আগেই তো ঘুরে গেছি।"

"সেটাই আমার কাছে অনেককাল।" মিঃ হারালু হেসে জটুমামার হাত ঝাঁকিয়ে বললেন, "আপনার দিদি আর ভগ্নীপতিকে দয়া করে নামতে বলুন।"

বাবা-মা তখনও গাড়িতে বসে ছিলেন। তাঁরা নেমে এলেন তাড়াতাড়ি। জটুমামা পরিচয় করিয়ে দিতেই, মিঃ হারালু মা'কে ঠিক বাঙালিদের মতোই দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। আর বাবার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "সুপ্রভাত। স্বাগতম ! আপনারা দয়া করে যে আমার এখানে এসেছেন, এতে আমি খুবই সুখী হয়েছি। দয়া করে ভেতরে আসুন।"

মিঃ হারালুকে গোগোলের বেশ ভাল লেগে গেল। 'কাইণ্ড এনাফ' আর 'প্লিজ' তাঁর প্রতিটি কথায় লেগেই আছে, আর সেই সঙ্গে, গোঁফদাড়ি কামানো মুখে ঝকঝকে হাসি। বাবা মা কাঠের বারান্দায় উঠতেই, সোনালি ফ্রেমের চশমা চোখে একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। তাঁর মাথার চুল ঘাড় অবধি ছাঁটা। নাগা শালের মতো দেখতে একটি কাপড় তিনি কোমরের কাছ থেকে শাড়ির মতোই পরেছেন। গায়ের ওপর একটা পাতলা শাল। তিনি খুব ফরসা, যেন টুকটুকে লাল। মিঃ হারালু তাঁর সঙ্গে বাবা-মা'র পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি হলেন মিসেস হারালু। মিসেস হারালু ইংরেজিতেই বাবা-মা'কে সাদরে ডাকলেন। জটুমামাকে ডাকলেন বন্ধুর মতো। মিসেস হারালুকে গুডমর্নিং জানাতে গিয়েই বোধহয়, গোগোলের কথা জটুমামার মনে পড়ে গেল। সত্যি বলতে কী, গোগোলের একটু অভিমানই হচ্ছিল। ওর কোলে এখন চিক্কুস। ওকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা যেন কারো মনেই নেই। মাও বোধহয় এখন চিক্কুসের কথা ভুলে গিয়েছেন। গোগোল তাই গাড়ির সামনের আসনে চুপচাপ বসে সব দেখছিল।

জটুমামা ওর দিকে দেখে, তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসতে আসতে ইংরেজিতে বললেন, "ওঃ মিঃ ভারালু, আমি খুবই দুঃখিত। মাস্টার গোগোলের সঙ্গেই আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। এসো, গোগোল, তুমি গাড়িতে বসে কেন ?"

জটুমামা গাড়ির দরজা খুলে ধরলেন। গোগোল চিক্কুসকে কোলে নিয়ে নেমে এল। এখন ওর মুখে লাজুক হাসি ফুটেছে। মিঃ হারালু গোগোলের কোলে চিক্কুসকে দেখে যেন খুশিতে ফেটে পড়লেন। এমন-কী মিসেস হারালুও। দু'জনে এক সঙ্গেই বলে উঠলেন, "কী সুন্দর কুকুর !"

মিঃ হারালু এগিয়ে এসে গোগোলকে চিক্কুসসহ জড়িয়ে ধরলেন। চিক্কুসকে একটু আদর করে দিয়ে বললেন, "গোগোল ! এ তো বিরাট নাম, রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক। তুমিও কি লেখো নাকি ?"

"না মিঃ হারালু, গোগোল লেখে না।" জটুমামা বললেন, "তবে গোগোল একজন খুদে গোয়েন্দা, কিন্তু কাজে খুদে নয়। আপনার মনে আছে কি না জানি না, কাশ্মীরে পহেলগাঁয়ে সেই একবার একটা সাংঘাতিক ডাকাত দল ধরা পড়েছিল, সেটা গোগোলই ধরিয়ে দিয়েছিল।"

মিঃ হারালু হেঁকে উঠলেন, "কী বিরাট ব্যাপার ! কিন্তু আমাদের নাগাল্যাণ্ডে এখনো সে-রকম ডাকাতি হয়নি, এখানে গোগোল কেবল খেলেই বেড়াতে পারবে।"

গোগোল ইতিমধ্যে আর-একজনকে দেখতে পেয়েছে। ওরই বয়সী একটি ছেলে। সে কেবল গোগোল আর চিক্কুসকেই দেখছে। ছেলেটার মুখ অনেকটা মিসেস হারালুর মতোই। মিসেস হারালু সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। গোটা ঘরের কাঠের মেঝে নরম আর মোটা সবুজ কার্পেটে মোড়া। ছোটখাটো ঘর নয়, প্রায় হলঘরের মতো বড়। মাঝের সেণ্টার টেবিলটা ইংরেজি "এস" অক্ষরের মতো। পায়াগুলো যেন গাছের এবড়োখেবড়ো একটা গুঁড়ি। কাঠের ঝকঝকে দেওয়াল। প্রথমেই চোখে পড়ে সুন্দর দুটো শিংওয়ালা কালো মোষের মুণ্ডু দেওয়ালে আটকানো। চোখ দুটো হরিণের মতো। কিন্তু মুখটা যেন ঠিক মোষের মতো নয়। দেওয়ালে আরও সব নানা জিনিস ঝুলছে, বেতের আর বাঁশের তৈরি। সেগুলো যে কী, গোগোল তা বুঝতে পারল না। কেবল দুটো ফুলদানি ছাড়া।

মিসেস হারালু মা'কে নিয়ে, পাশের ঘরে গেলেন। বাবাকেও ভিতরে ডাকলেন। আর গোগোলের বয়সী ছেলেটিকে বললেন, "আলেবো, তুমি গোগোলকে নিয়ে এসো।"

আলেবোর নজর যেন গোগোল আর চিক্কুসের দিকে গেঁথে গিয়েছিল। ও গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসল। গোগোলও হাসল, আর ওর সঙ্গে পাশের ঘরে পা বাড়াবার আগেই শুনতে পেল, জটুমামা বলছেন, "মিঃ হারালু, আপনার অ্যালসেশিয়ান টুলুর কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কেন ?"

এ-বাড়িতে তা হলে অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে ! গোগোল চিন্তিত হয়ে পড়ল। অ্যালসেশিয়ান মানেই বড় জাতের কুকুর। চিক্কুসকে কামড়ে দেবে না তো ? কিন্তু ও দেখল, মিঃ হারালুর মুখে দুঃখের ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "মিঃ মজুমদার, আমার টুলু আর নেই।"

জটুমামা শুনে খুবই অবাক হলেন। তাঁর মুখে কেমন একটা আশঙ্কা ফুটে উঠল। জিজ্ঞেস করলেন, "টুলু নেই ? মানে...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ হারালু। টুলুর কি কোনো অসুখ-বিসুখ করেছিল ?"

"না, টুলুর কোনো অসুখই করেনি।" মিঃ হারালু ব্যথিত স্বরে বললেন, "অবশ্য তার আট-ন' বছর বয়স হয়েছিল। নীচের পাটির ছোট দাঁতের দু-একটা পড়েও গেছল। কিন্তু স্বাস্থ্য তার খুব ভাল ছিল। দিল্লি থেকে ফিরে এসে আমি আর টুলুকে দেখতে পাইনি। তবে দিল্লিতেই কুমভো—আমার বড় ছেলে ট্রাংককলে আমাকে সংবাদটা দিয়েছিল।"

জটুমামার মতো গোগোলও অবাক উৎসুক চোখে মিঃ হারালুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু টুলুর কী হয়েছিল, মিঃ হারালু সে-বিষয়ে খোলসা করে কিছুই বললেন না। বরং গোগোলের কোলে চিক্কুসের দিকে একবার দেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "পরে আপনাকে আমি সব কথা বলব।"

জটুমামাও এই সময় গোগোলের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। কিন্তু গোগোলের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, ঝট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "গোগোল এখনো ভেতরে যাওনি ? আচ্ছা, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।" বলে তিনি দেওয়ালে আটকানো, শিং ওয়ালা মোষের মুণ্ডু দেখিয়ে বললেন, "তুমি এটা কিসের মাথা ভেবেছ বলো তো ?"

গোগোল বলল, "মোষের।"

জটুমামা হেসে বললেন, "তুমি এ কথাই বলবে আমি জানতাম। অবশ্য আমরা সবাই প্রথম এরকম ভুল করি। কিন্তু শিং দুটো দেখেছ। কেমন ওপর দিকে গোল হয়ে উঠে, ডগার দিকটা বেঁকে গেছে ? আর দুটো শিং যেন মাপজোক করা এক সাইজের। তাই না ?"

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। আর মুখটা যেন ঠিক মোষের মতোও লম্বা নয়। অনেকটা হরিণের মতো।"

"গুড !" জটুমামা বললেন, "আমি তোমার দৃষ্টির প্রশংসা না করে পারছি না। এটা আসলে মোষ গোরু কোনোটাই নয়, কিন্তু গোরু আর মোষ থেকেই এর জন্ম। এদের বাবা মা, দুজনের একজন হয় গোরু, আর একজন মোষ। এদের নাগাল্যাণ্ডে বলে মিথুন। এ দেশে মিথুন হল ন্যাশনাল অ্যানিম্যাল। এদের সংখ্যা এখন একেবারেই নগণ্য। কোহিমার চিড়িয়াখানায় গেলে দেখতে পাবে।"

গোগোল দেওয়ালের গায়ে আবার মিথুনের মুণ্ডুটা দেখল। কিন্তু টুলুর ব্যাপারটা কী ? গোগোলের মাথায় সেটাই ঘুরছে। জটুমামা আর মিঃ হারালু ওকে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন। সেটাও একরকমের বসবার ঘরের মতোই। আকারে ছোট। দেখলে মনে হয় খাবার টেবিল। চেয়ারও রয়েছে বেশ কয়েকটা। আর ফ্রিজ দেখেও খাবার টেবিল বলেই মনে হয়। বাবা-মা মিসেস হারালুর সঙ্গে সেখানেই বসেছেন। টেবিলের মাঝখানে চায়ের সরঞ্জাম রয়েছে। গোগোলের পাশেই রয়েছে আলেবো। টেবিলে আর-একজন বসেছিল। পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে। স্কার্ট আর জামা পরা। চুল ছোট করে কাটা। বিজ্ঞাপনের ছবির মতোই দেখতে সুন্দর। সে গোগোলের দিকে তাকিয়ে উঠে এল। হাত ধরে বলল, "গোগোল, তোমার সঙ্গে আলেবোর পরিচয় হয়েছে ?"

গোগোল আলেবোর দিকে তাকিয়ে হাসল। আলেবোও হাসল। মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "এ আমার দিদি তোশিলি।"

তোশিলি গোগোলের কোলে চিক্কুসকে আদর করে দিল। চিক্কুস তেমন উৎসাহ দেখাল না। অনেকক্ষণ থেকেই চিক্কুস বেশ চুপচাপ। একেবারেই ছটফট করছে না। কোল থেকে নামবারও চেষ্টা করছে না। জটুমামা বললেন, "আলেবো, গোগোলকে নিয়ে তুমি ভেতরের ঘরে গিয়ে বসে গল্প করো।"

তোশিলি জটুমামাকে জিজ্ঞেস করল, "আঙ্কল, গোগোল কি চা খাবে না ?"

গোগোল নিজেই বলল, "না, আমি চা খাব না।"

মিসেস হারালু বললেন, "তোশিলি, তুমি গোগোলকে ফল আর মিষ্টি খেতে দাও।"

গোগোলের কিছুই খাবার ইচ্ছে ছিল না। মনে হচ্ছিল, চিক্কুসের বোধহয় জলতেষ্টা পেয়েছে। আলেবো তখন গোগোলের ডান হাতের কনুইয়ের ওপর একটা হাত রেখেছে। ও আলেবোর সঙ্গে অন্য ঘরে যেতে যেতে বলল, "চিক্কুসকে একটু জল খাওয়াতে হবে।"

আলেবো এমন হাসল, ওর কালো চোখ দুটো নরুন-চেরা দেখাল। বলল, "ওর নাম চিক্কুস ? খুব সুন্দর নাম। চলো, আমি জল দিচ্ছি। চিক্কুস মেয়ে, না ছেলে ?"

"ছেলে।" গোগোল জবাব দিল। আলেবোর সঙ্গে একটা শোবার ঘরে ঢুকল।

বন্ধ জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে, পাহাড় আর বন দেখা যাচ্ছে। নীচের দিকে নেমে গিয়েছে, যেন ঢালুর পর ঢালু উপত্যকা। বাঁশবন আর গাছপালা বাতাসে যেন নুয়ে পড়ছে। অনেকটা ঝড়ের মতো। কিন্তু আকাশে মেঘ নেই, চারদিকে রোদ ঝকমক করছে। ঘরে হাওয়া ঢুকছে না। আলেবো গোগোলকে খাটের বিছানায় বসতে বলে, দৌড়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই, একটা কাঠের পাত্রে জল নিয়ে এল। গোগোল চিক্কুসকে কাঠের পাত্রের সামনে ছেড়ে দিল।

চিক্কুস কাঠের পাত্রটা অনেকবার শুঁকল, কিন্তু জল খেল না। সারা ঘরে ঘুরে ঘুরে, ও কেবলই শুঁকতে লাগল। যেন ও একটা কিছু পেয়েছে, বা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘরের দরজাটা বন্ধ আছে। চিক্কুস বেরোতে পারবে না। গোগোল নিশ্চিন্ত হয়ে, এবার আলেবোকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল ?"

"হ্যাঁ। তার নাম ছিল টুলু।" আলেবো বলল, "টুলু মানে হল 'বড়'। ওটা আমাদের আঙ্গামিদের কথা নয়, আওদের কথা।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "টুলু কোথায় ? তোমার বাবা বলছিলেন, সে আর নেই। টুলু কি কোথাও চলে গেছে, না মরে গেছে ?"

আলেবোর মুখ গম্ভীর হল। বলল, "না। আমার দাদা বাড়িতে তার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিল। বাবা তো ছিলেন না এখানে। দাদা টুলুর মাংস দিয়ে বন্ধুদের ভোজ খাইয়েছে।"

গোগোল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। এমন কী, আলেবো সত্যি কথা বলছে কিনা, তাও বিশ্বাস করতে পারছে না। আলেবোর মুখের দিকে অবাক আর সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, "টুলুর মাংস দিয়ে ভোজ ? তার মানে কী ? কুকুরের মাংস কি খায় ?"

"কেন খাবে না।" আলেবো বলল, "আমি খাইনি, বিশেষ করে টুলুর মাংস বলেই। তা ছাড়া আমি কুকুরের মাংস খেতে ভালবাসি না। আমাদের বাড়ির সবাই অবশ্য খেতে খুবই ভালবাসে। মাংসটা তো খুবই ভাল। তবে বাবা বাড়ি থাকলে, টুলুকে হয়তো খেতে দিতেন না। দাদা ট্রাংককলে বাবাকে জানিয়েছিল, ভোজ হয়ে যাবার পর। চাইলেই তো আর কুকুরের মাংস পাওয়া যায় না। এ তো আর গোরু-শুয়োর নয় যে, আখচার বাজারে পাওয়া যায় ? ওটা অনেক দামি।"

গোগোল আলেবোর কথা আর শুনছিল না। ওর মাথাটা খারাপ হয়ে যাবার মতো হয়েছে। কিছু ভাবতেই পারছে না। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। ওর দৃষ্টি চিক্কুসের দিকে। আলেবো তখনও কী সব বলে চলেছে। গোগোল বিছানা থেকে উঠে, চিক্কুসকে কোলে তুলে নিয়ে বসল।

৫

গোগোল মুখ না খুললেও, জটুমামাই একমাত্র ওর মনের কথা টের পেলেন। সকলের স্নান করার সময়, গোগোল যখন জানাল, ওর স্নান করতে ইচ্ছে করছে না, খিদেও নেই, আর চিক্কুসকে এক মুহূর্তের জন্যও কোলছাড়া করছে না, তখনই উনি ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিলেন। আলেবোর কাছ থেকেই যে গোগোল টুলুর কথা শুনেছে, তাতেও তাঁর সন্দেহ ছিল না। অথচ চিক্কুস আর কোলে থাকতে চাইছিল না। মাও অনেকবার চিক্কুসকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে বলেছেন। গোগোল নামায়নি। তবে, শেষ পর্যন্ত মায়ের হাতে চিক্কুসকে দিতেই হয়েছে। কারণ মা চিক্কুসের খাবার তৈরি করেছিলেন।

গোগোল মা'কে বা বাবাকে কিছুই বলেনি। ও আলেবোর সঙ্গে

কথা বলে বুঝেছে, কুকুরের মাংস খাওয়াটা অবাক হবার মতো কোনো ঘটনাই নয়। ওর বাবা টুলুকে খুব ভালবাসতেন বলেই মনে দুঃখ পেয়েছেন। নইলে, তিনিও কুকুরের মাংস ভালবাসেন। গোগোল আলেবোকে জিজ্ঞেস করেছিল, ওর দাদা কুম্ভো বাড়িতে এসে, চিক্কুসকেও খেতে চাইবে কি না। আলেবো খুব অবাক হেসে বলেছিল, "তা কখনো হয় ? ও তো তোমাদের পোষা, প্রিয় চিক্কুস। ওকে কেউই খেতে চাইবে না। বরং সবাই আদরই করবে।"

গোগোল নিশ্চিন্ত হয়ে, আলেবোর সঙ্গে, চিক্কুসকে নিয়ে ওদের রান্নাঘরে গিয়েছিল। রান্নাঘরটা বিরাট বড়। কাঠের পাটাতনের মেঝে। ঘরের প্রায় মাঝখানে ছ স্কোয়ার ফুটের মতো জায়গা মাটি দিয়ে লেপা। সেখানে লোহার লম্বা রেলিংয়ের মতো দুটো ডাণ্ডার ওপর-নীচে কাঠ জ্বলছিল। রান্নাও হচ্ছিল। সেই জায়গাটাকে ঘিরে ছোট-ছোট কাঠের চেয়ার আর মোড়া রয়েছে। আবার তার চারপাশে ছড়ানো রয়েছে চওড়া কতগুলো বেঞ্চি। আলেবো বুঝিয়ে দিয়েছিল, ও-ঘরটাই আসলে বাড়ির অন্দরমহল। ওখানে বসেই সবাই খায়, আর শোয়। অবশ্য আলেবোরা তা করে না। কারণ ওদের খাবার শোবার ঘর অনেক রয়েছে। সাধারণত গ্রামের লোকেরাই রান্নাঘরে খায় এবং শোয়।

গোগোল দেখেছিল, যেখানে কাঠ জ্বলছিল, রান্না হচ্ছিল, তার কাছেই উঁচুতে একটা মাচা রয়েছে। মাচার সঙ্গে লোহার শিকের আংটার গায়ে ঝুলছিল বড় বড় মাংসের চাংড়া। আলেবো বলেছিল, ওগুলো সবই গোরু আর মোষের মাংস। বলেছিল মুরগি আর মাছ ফ্রিজের মধ্যে আছে।

গোগোলের সে-সব দেখে কিছুই মনে হয়নি। নতুন জিনিস দেখে ভালই লেগেছিল। কিন্তু একজন বয়স্ক ব্যক্তি ঘরের এক কোণে বসে ছিলেন। তাঁর ফরসা মুখের চামড়ায় অনেক রেখা। মুখে ছিল একটা লম্বা পাইপ, ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। তিনি এক দৃষ্টিতে চিক্কুসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, আর ঘড়ঘড়ে গলায় আলেবোকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন। আলেবো তাঁর কথার জবাব দিয়েছিল। তিনি তাঁর কয়েকটি মাত্র দাঁত দেখিয়ে হেসেছিলেন। চিক্কুসের দিকে তাকিয়ে, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটেছিলেন। আলেবোকে আবার কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন। আলেবো তখন বেশ রেগে জবাব দিয়েছিল। গোগোল জিজ্ঞেস করাতে, বলেছিল, বৃদ্ধ ব্যক্তি ওর ঠাকুর্দা। লেখাপড়া জানলেও, তিনি হলেন সেকেলে লোক। এখনও প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বাস করেন। আলেবোর রেগে যাওয়ার কারণ ছিল। উনি নাকি চিক্কুসকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নবাগত অতিথিরা চিক্কুসকে ভোজের উপহার হিসাবে এনেছেন কি না।

গোগোলের বুকটা ছাঁত করে উঠেছিল। আলেবোর ঠাকুর্দার সামনে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারেনি। তারপরেই সে ঘরের বাইরে, বাড়ির পিছন দিকে, যেখান থেকে পাহাড়ের গা উঠেছে, সেখানে মাচুকে দেখেছিল। আরও একজন গরিব নাগাকে দেখেছিল, যার মাথার চুল কানের ওপর থেকে ঘাড় অবধি গোল করে কামানো। ঠিক যেন মাথায় একটা বাটি বসিয়ে, বাকিটা ক্ষুর দিয়ে চেঁছে দিয়েছে। একটা ময়লা হাফপ্যান্টের ওপর তার জামাটাও ছিল ছেঁড়া। সে কুড়োল দিয়ে কাঠ কাটছিল। কাঠ কাটা থামিয়ে, গোগোল আর চিক্কুসের দিকে তাকিয়েছিল। তার চিক্কুসের দিকে তাকানোর ভঙ্গিটা মোটেই ভাল লাগেনি। অনেকটা যেন আলেবোর ঠাকুর্দার মতোই। সে মাচুকে কিছু বলেছিল। মাচুও হেসে কিছু বলেছিল। লোকটি আবার চিক্কুসের দিকে তাকিয়েছিল, আর হেসেছিল। গোগোল আলেবোকে লোকটির পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল। আলেবো বলেছিল, ওর নাম "ল্যামচন"। ও শহরের বাইরে গ্রামের বস্তিতে থাকে। আলেবোদের বাড়িতে কাজ করে।

আলেবো আরও বলেছিল, ও ল্যামচনকে মোটেই পছন্দ করে না। ও খুব লোভী আর পেটুক। আলেবো ওকে মাঝে-মাঝে "তেমি" বলে রাগায়। তেমি মানে ভূত। ওরা মানুষকে মারতে পারে না, কেবল ভয় দেখায়।

পরে গোগোলকে একলা পেয়ে জটুমামা ওর সঙ্গে কথা বলেছেন। বলেছেন, "আমি জানি, তুমি আলেবোর কাছ থেকে টুলুর ঘটনা শুনেছ। কিন্তু এতে চিক্কুসের জন্য ভয় পাবার কিছু নেই। কত দেশে কত জাতি কত রকম খাবার খায়। তবু মনে রাখতে হবে, তারা মানুষ খারাপ নয়। তারা সভ্য এবং শিক্ষিত। হারালু-পরিবার হচ্ছে আমাদের দেশের যে-কোনো শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের মতো ; বরং অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ।"

গোগোল জটুমামাকে অবিশ্বাস করেনি। তবে জিজ্ঞেস করেছে, কোহিমা থেকে আসবার সময়, মাচুর সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল ? তিনি কেন খুবই চিন্তিত হয়েছিলেন, পরে আবার হেসেছিলেন ? জটুমামা গোগোলের পিঠ চাপড়ে বলেছেন, "সেটাও তুমি লক্ষ করেছ ? শাবাশ ! তবে শোনো, সত্যি কথাই বলি। মাচু আমাকে বলেছিল, এই সুন্দর কুকুরটি নিয়ে আপনি কোহিমায় যাচ্ছেন কেন ? তখনই আমার প্রথম খেয়াল হয়েছিল, আঙ্গামি নাগাদের মধ্যে অনেকের কাছেই কুকুরের মাংস বেশ প্রিয়। শেষ পর্যন্ত চিক্কুসকে নিয়ে কোনো গোলমালে পড়তে হবে না তো ? এটাই ছিল আমার দুশ্চিন্তার কারণ। কিন্তু তার মানে এই নয়, আমরা খাসির মাংস খাই বলে, যেখানে-সেখানে যার খাসি পাব, তাই ছিনিয়ে নেব। তা ছাড়া, আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেছল, মিঃ হারালুর নিজেরই তো অ্যালসেশিয়ান কুকুর রয়েছে। তখনই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মনে-মনে হেসে উঠেছিলাম। তবে মিছেই আমার হাসি। কুম্ভো টুলুকে বন্ধুদের ভোজ খাইয়ে দিয়েছে। এতে মিঃ হারালুর মনও খুব খারাপ হয়ে গেছে। তবু তোমাকে আমি বলব, তুমি চিক্কুসের জন্য ভয় পেও না, আর মানুষের খাবার নিয়ে কোনো রকম আজেবাজে চিন্তা করবে না।"

গোগোল বলেছে, "জটুমামা, আমি কোনো দেশের মানুষের খাবার নিয়ে আজেবাজে চিন্তা করিনে। আমরা এমন অনেক কিছু খেতে ভালবাসি, যা অন্য দেশের লোকেরা মুখে দিতে চাইবে না। তাতে কী যায় আসে ? ইওরোপের অনেক মানুষ ঘোড়ার মাংস খায়, তাতে কী ?"

"ঠিক। কথায় বলে আপ্ রুচি খানা।" জটুমামা বলেছেন, "কিন্তু মানুষকে আমরা সম্মান করব। তা ছাড়া আমি এই আঙ্গামি নাগাদের বিষয়ে তোমাকে আরো কিছু বলতে চাই। এরা কুকুরের মাংস খেতে ভালবাসে, একথা ঠিক। কিন্তু এরা যে-সব কুকুরকে শিকারের জন্য শিক্ষা দেয়, তাদের কখনো খায় না। তাদের লেজ আর কান কেটে দেওয়া হয়। মারা গেলে ডেডবডি কবর দেয়। এদের একটা উৎসব আছে, যার নাম 'সেক্রেনি'। ঐ সেক্রেনির দিনই বিশেষ করে কুকুর মারা হয়। তা বলে, কালীপুজোর বলি ছাড়া কি আমরা মাংস খাইনে ! এও সেইরকম। তাছাড়া, তোমাকে আমি নাগাদের একটা মজার রূপকথা শোনাচ্ছি।"

জটুমামা মনে-মনে একটু ভেবে নিয়ে, দু হাত ঘষে রূপকথাটি বলেছেন, "গল্পটা হচ্ছে, কুকুর কেমন করে তার শিং হারাল।"

"কুকুরের শিং ?" গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

জটুমামা গোঁফের ডানা মেলে হেসে বলেছেন, "হ্যাঁ। গল্পটার মজাই সেখানে। বহু বহুকাল আগে কুকুর আর ছাগলের খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু ছাগলের শিং ছিল না, ছিল কুকুরের। ছাগলের মনে এতে খুবই হিংসে ছিল, আর ভাবত, কেমন করে কুকুরের সুন্দর শিংজোড়া চুরি করা যায়। সেই সুযোগ হঠাৎ এসে গেল। একদিন এক গ্রামের বউ, বাড়ির বাইরে চৌকির ওপর কিছু চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে রেখেছিল। কুকুর তা দূর থেকে দেখতে পায়, আর খাবে বলে মনস্থ করে। চালের গুঁড়ো খেতে যাবার আগে, সে তার শিংজোড়া এক জায়গায় খুলে রেখে যায়।"

"শিং কী করে খুলবে ?" গোগোল জিজ্ঞেস করেছে।

জটুমামা চোখ বুজে হেসে বলেছেন, "সেটা কোনো কথাই নয়। রূপকথার নৌকো পাহাড়ে ওঠে। কুকুরও তেমনি শিংজোড়া খুলে রেখে চালের গুঁড়ো খেতে গেল। অমনি ছাগল এসে সেখানে উপস্থিত। বন্ধুর শিংজোড়া দেখেই সে তাকে বলল, একটু সময়ের জন্য সে শিংজোড়া নিজের মাথায় পরতে চায়। কুকুর তাতে কোনো আপত্তির কারণ দেখল না। ছাগল শিংজোড়া মাথায় চাপিয়ে, বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, তাকে কেমন দেখাচ্ছে ? কুকুর জবাব দিল 'চমৎকার !' তখন ছাগল বলল, 'আমি ছুটছি। তুমি আমাকে ধরো

পারলে, তবেই শিংজোড়া ফেরত পাবে।' বলেই দৌড়। কুকুর তো ক্ষেপে গেল, ছাগলের পেছনে ছুটল। কিন্তু ছুটলে কী হবে। ছাগলকে সে কোনোদিনই ধরতে পারেনি। সেই থেকে কুকুরের শিং গেল, ছাগলের শিং হল। কেমন লাগল?"

গোগোল বলেছে, "উদ্ভট।"

"তা ঠিক।" জটুমামা বলেছেন, "কিন্তু একটা বিষয় তুমি লক্ষ করে দেখো। এ গল্পে যেন বলতে চাওয়া হয়েছে, কুকুর ছাগলে কোনো তফাক নেই, কেবল শিংজোড়া ছাড়া।"

এসব শোনার পরেও গোগোল ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। বলেছে, "কিন্তু জটুমামা, আলেবোর ঠাকুর্দা আর ঐ কাজের লোক ল্যামচনকে আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

জটুমামা হেসে বলেছেন, "ঠাকুর্দার কথা ছেড়ে দাও। উনি তো নড়তেই পারেন না। আর ল্যামচনের সাহসই হবে না, চিক্কুসের গায়ে হাত দিতে।"

এর পরে গোগোল মাছ আর মুরগি দিয়ে ভাত খেয়েছে। মিসেস হারালুর হাতের রান্না বেশ ভাল। তবে গোগোল চিক্কুসকে একেবারে চোখের আড়াল করেনি। কুমভোকে নিয়ে ওর মনে দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু কুমভো কলেজ থেকে ফেরার পর, তাকে দেখে গোগোল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাক হাসি কথাবার্তা খুবই সুন্দর। চিক্কুসকে কোলে নিয়ে আদর করার সময়, গোগোলের গা শিরশির করেছিল। কিন্তু কুমভোকে দেখে একবারও মনে হয়নি, সে লোভীর চোখে চিক্কুসকে দেখছে। বরং চিক্কুসকে সে এমন মাতিয়ে দিয়েছিল, দু'জনের মধ্যে খেলা জমে উঠেছিল। এরকম ছেলে কেমন করে নিজেদের পোষা কুকুরকে খেয়ে ফেলে, গোগোল ভাবতেই পারেনি।

মিঃ হারালুর হেফাজতে একটা জিপও ছিল। তার ড্রাইভার একজন নেপালি, বাহাদুর সিং। বিকালে জিপে চেপে বেড়াতে যাওয়া হল। গোগোল চিক্কুসকে সঙ্গে নিয়েছিল। মিস্টার আর মিসেস হারালু ছাড়া, বাবা মা জটুমামা সঙ্গে গেলেন! গোগোলের সঙ্গে আলেবো। প্রথমে শহরের বাইরে এক জায়গায় গিয়ে, মিঃ হারালু পাহাড় আর জঙ্গল দেখিয়ে বললেন, কোহিমার নতুন ক্যাপিটাল ওখানে তৈরি হবে। নতুন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং থেকে সব সরকারি অফিস ওখানে হবে। তারপরে যাওয়া হল, মিঃ হারালুর ওপরে চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মুখার্জির বাড়িতে। গল্পগুজব ভালই হল। কিন্তু মিঃ মুখার্জির একটা কথায় গোগোলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বললেন, কুকুরের মাংস খেতে তিনি ভালবাসেন। চিক্কুসকে আদর করে, তিনি বললেন, "ডগ মিট সত্যি ডিলিশাস।"

মা-বাবাও খুব অবাক হলেন, আর তাঁরা প্রথম মিঃ মুখার্জির বাড়িতেই জানলেন, এখানে কুকুরের মাংস খেতে সবাই ভালবাসে। কিন্তু একজন বাঙালিও যে ভালবাসেন, এটা গোগোলের কাছে নতুন ঘটনা। বোঝা গেল, বাবা মা'র মনও খারাপ হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে গোগোল আলেবোর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল, আঙ্গামি ভাষায় কুকুরকে বলে "তেফ্যু"। আর কুকুরের মাংস হল, "তেফ্যুৎসা"। ফেরবার পথে জটুমামাও বললেন, "মুখার্জি বরাবরই একটু আলাদা রকমের। উনি ফিলিপিন্সে প্রথম ডগ মিট টেস্ট করেছিলেন, সে-কথা আমাকে বলেছিলেন।"

মিসেস হারালু বললেন, "এখানে সেক্রেনি ফেস্টিভ্যালে, আমাদের বাড়িতে এসে উনি খেয়ে যান। উনি বাঁদর খেতেও খুব ভালবাসেন। মিঃ মজুমদারও তো সব খেতে ভালবাসেন।"

গোগোল কথাটা শুনেই, হতবাক চোখে জটুমামার দিকে তাকাল। তাঁর গোঁফের ডানা মেললেও, হাসলেন যেন ভারী সলজ্জভাবে। তিনি গোগোলের দিকে তাকালেন। গোগোল যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত জটুমামাও! অথচ এতক্ষণ কিছুই বলেননি? বাবা হাসছিলেন। কিন্তু মায়ের চোখমুখের অবস্থা অনেকটা গোগোলের মতোই। বেকায়দায় পড়লে লোকে যেমন হাসে, জটুমামা সেইরকম হেসে, গোগোলকে বললেন, "গোগোল, তা বলে তুমি আমাকে মানুষরূপী নেকড়ে-টেকড়ে ভেবে বসো না। খাদ্য বস্তুটাকে সহজ করে নেওয়াই ভাল, যাতে কোথাও গিয়ে, নিজেকে খাপছাড়া মনে না হয়। তবে তুমি নিশ্চিন্তে থেকো। যার জন্য তোমার ভাবনা, তার কোনো ক্ষতিই কেউ করতে পারবে না।"

কোহিমার রাস্তা সন্ধ্যার পরে একেবারে ফাঁকা। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। দু' একটা লোককে দেখা যাচ্ছে, শাল মুড়ি দিয়ে এদিকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। গাড়িও প্রায় চলছে না। পাহাড়ের দেশটা যেন কেমন নিঝুম, থমথম করছে। সেইদিকে তাকিয়ে, গোগোলের মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছিল বলেই, মিসেস হারালু জটুমামাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গোগোল কার ক্ষতির কথা ভাবছে, মিঃ মজুমদার?"

জটুমামা চিক্কুসের কথা বললেন। সেই সঙ্গে ঠাকুর্দা আর ল্যামচনের কথাও বললেন। গাড়ির ভিতরে অন্ধকার থাকলেও, রাস্তার আলো মাঝে-মাঝে ভিতরে উঁকি দিচ্ছিল। গোগোল দেখল, মিসেস হারালুর মুখে কেমন একটা অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তা। তিনি চিন্তিত স্বরে বললেন, "আমার শ্বশুরমশাই একজন খাঁটি সেকেলে আঙ্গামি পুরুষ। তিনি খুব সুস্থও নেই। তাঁর খিদে এত বেড়ে গেছে, ডাক্তাররাও বলেছেন, এটা ভাল লক্ষণ নয়। চিক্কুসকে দেখে, উনি ভাল একটা খাবার উপহারের কথা ভাবতেই পারেন। তবে তিনি চলাফেরা বিশেষ করতে পারেন না। কিন্তু ল্যামচনকে নিয়ে একটু ভাবনা হয়। ও একটু লোভী আর বেপরোয়া আছে। গ্রামের মানুষ তো। তবে সাহস পাবে না।"

মিসেস হারালুর কথা শুনে গোগোলের মন আরও খারাপ হয়ে গেল। একটা অশুভ ভাবনায় ওর ভেতরটা ছেয়ে গেল। চিক্কুস গাড়ির ভিতরে, মনের আনন্দে এর ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হাত কামড়ে, চেটে খেলা করছে। আবার মাঝে-মাঝে যেন খুবই রেগে গিয়ে, ওর কচি গলায় গরগর করছে, ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠছে। আসলে সেটাও ওর খেলা।

গোগোলের নাগাল্যাণ্ড বেড়ানোর আনন্দ ঘুচে গিয়েছে। জটুমামার কথা শোনার পরে, কারোর ওপরেই যেন ও আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। বাড়িতে পৌঁছে, মা চিক্কুসকে নিজের কোলে নিয়ে নিলেন। বসবার ঘরের পাশের ঘরে, রেকর্ডে তখন জোর ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজছে। কুমভো আর তোশিলি, দুজনেই গলা ছেড়ে, রেকর্ডের বাজনার সঙ্গে গান করছে। শীতটা এখন ভালই বোধ হচ্ছে। বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে, বড়রা সবাই আড্ডায় বসে গেলেন। মা চিক্কুসকে নিয়ে চলে গেলেন শোবার ঘরে। আলেবো গেল বাথরুমে।

গোগোলের তখন ভাবনা, ল্যামচন রাত্রে কোথায় শোয়? বাড়িতে একজন মাঝবয়সী নাগা স্ত্রীলোক কাজ করে। তার নাম মাওলি। গোগোল তাকে একবারও হাসতে দেখেনি, কথা বলতেও শোনেনি। চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন। সে সব সময়েই কোনো-না-কোনো কাজ করে, আর নিঃশব্দে চলাফেরা করে। সেই মাওলি, ড্রাইভার মাচু কোথায়? বাড়ির পিছন দিকে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে দু-তিনটে ঘর রয়েছে। ল্যামচন, মাওলি আর মাচু বোধহয় সেখানেই থাকে। তবু রান্নাঘরটাই গোগোলকে টানতে লাগল। ও সকলের অলক্ষ্যে, বাড়ির পিছন দিকে গেল। পিছন দিক দিয়ে রান্নাঘরে যাবার একটা রাস্তা আছে। দেখা গেল, দরজাটা খোলাই আছে। গোগোল কাঠের সিঁড়ির তিন ধাপ উঠে, দরজার ধারে দাঁড়াল। ভিতরে কারা যেন কথা বলছে। গোগোল সাবধানে উঁকি দিল, যেন ওকে কেউ দেখতে না পায়। দেখল, ঘরের এক কোণে আলেবোর ঠাকুর্দা বসে আছেন। গায়ে শাল জড়ানো। মুখে সেই লম্বা পাইপ। তাঁর একেবারে গা ঘেঁষে বসেছে ল্যামচন। ঘরের মাঝখানে মাটি-লেপা জায়গায় কাঠের আগুন অল্প জ্বলছে। ঠাকুর্দা আর ল্যামচনের কথা গোগোল কিছুই বুঝতে পারছে না। ল্যামচনের কথায় কয়েকবার দুটো কথা শুনে ওর মনটা চমকে-চমকে উঠল। 'তেফ্যু' আর 'তেফ্যুৎসা' এই শব্দ দুটোর মানে ও জানে। 'কুকুর' আর 'কুকুরের মাংস'। ল্যামচনের কথা শুনে, ঠাকুর্দা পাইপ মুখেই মাথা ঝুঁকিয়ে হাসছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ল্যামচন কোনো শলা-পরামর্শ দিচ্ছে। ঠাকুর্দা তা শুনে মজা পাচ্ছেন। তেফ্যু আর তেফ্যুৎসা, এই শব্দ দুটো থেকেই বোঝা যায়, চিক্কুসের কথাই বলছে। মিসেস হারালুও বলেছেন, ল্যামচন একটু লোভী আর বেপরোয়া গ্রামের লোক। আলেবো থাকলে কথাগুলো সব বুঝতে পারত।

গোগোলের পিঠে হঠাৎ একটা আল্‌তো ছোঁয়া লাগল। আলেবো ভেবে পিছন ফিরেই দেখল মাওলি ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। রান্নাঘরের আলোতেই ও মাওলির মুখটা দেখতে পেল। আর এই প্রথম মাওলিকে ও হাসতে দেখল। দেখে ভাল তো লাগলই না, বরং গায়ের মধ্যে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। কোনোরকমে মাওলির পাশ কাটিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। পিছনের উঠোন পেরিয়ে, ঘরে ঢোকবার আগে একবার পিছন ফিরে দেখল। মাওলি তখনও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। গোগোলকে দেখছে। গোগোল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এমন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু গোগোলের বুকের মধ্যে কেমন ধক্‌ধক্ করছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখল, রেকর্ডে মিউজিক বাজছে। কুম্‌ভো তোশিলির সঙ্গে জটুমামাও নাচছেন। বাইরের ঘরে বাবা, মা, মিঃ আর মিসেস হারালু গল্প করছেন। চিক্কুস কোথায়? আলেবোই বা কোথায়? জটুমামা গোগোলকে দেখে নাচ থামিয়ে বললেন, "গোগোল, তুমিও নাচতে পারো। শীতটা একদম লাগবে না।"

জটুমামা কুকুরের মাংস খেতে ভালবাসেন, আর সেই কথা একদম চেপে গিয়েছেন, এটা জানার পরে ওর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে। ও নাচতে জানে না বলে, বাইরের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল। আলেবো সেখানে নেই। মা চিক্কুসকে নিয়ে যে-ঘরে ঢুকেছিলেন, গোগোল সেই ঘরে গেল। দেখল, আলেবো চিক্কুসের সঙ্গে একটা তোয়ালে নিয়ে খেলছে। আলেবো তোয়ালেটা চিক্কুসের মুখের কাছে ধরছে, আর তুলে নিচ্ছে। চিক্কুস থাবা বাড়িয়ে লাফ দিচ্ছে। গোগোলকে দেখেই, চিক্কুস ছুটে এসে ওর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আলেবো জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় গেছলে?"

গোগোল চিক্কুসকে কোলে তুলে নিয়ে, রান্নাঘরের ঘটনাটা বলল। আলেবোর লালচে গাল, উঁচু মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। কালো চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, "তুমি চিক্কুসকে নিয়ে এ ঘরে থাকো, আমি ঘুরে আসছি।"

আলেবো বেরিয়ে গেল। গোগোল চিক্কুসকে নিয়ে খাটের বিছানায় বসল। চিক্কুস ওর কোল থেকে লাফিয়ে নেমে গেল। এমন সময় অনেক দূর থেকে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাক ভেসে এল। গোগোল চমকে উঠল। এসে অবধি ও রাস্তাঘাটে একটা কুকুরও দেখতে পায়নি। ডাক শোনা তো দূরের কথা। এখন হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে, ও বন্ধ কাচের জানালার কাছে এগিয়ে গেল। ছিটকিনি টেনে কাচের পাল্লা খুলল। ঘরের আলোয় জানালার বাইরে বাগানের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। বাকি সবই অন্ধকার। শোবার ঘরের একদিকটায়, বাগান পেরিয়ে, দূরে কয়েকটা বাড়ির ছোট ছোট আলো দেখা যাচ্ছে। আর সবই অন্ধকার। কুকুরের ডাক এবার স্পষ্টই শোনা যাচ্ছে। মনে হয় দূরের বাড়িগুলোর কোনো একটা থেকে ডাক ভেসে আসছে। তাহলে, মিঃ হারালুর মতো আরও কেউ কুকুর পোষে!

গোগোল যখন দূরের দিকে তাকিয়ে এ-কথা ভাবছে, তখনই বাগানের ধারে, নীচের পাহাড়ের গা-বেয়ে-ওঠা বাঁশঝাড়ের ডগার কাছে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল। যেন সে নীচের বাঁশঝাড় থেকেই উঠে এল। তার মাথাটা এদিক-ওদিক নড়তে দেখা গেল। তারপরেই সে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন এতক্ষণ সে জানালার সামনে গোগোলকে দেখতে পায়নি। এখন দেখতে পেয়ে, এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েই, পিছন ফিরে, বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে ডান দিকের অন্ধকারে, মাথা নিচু করে মিশে গেল। ডান দিক তো এ বাড়ির পিছন দিক। মূর্তিটা কার? ল্যামচনের? বোঝা গেল না। ল্যামচন একটু বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা চেহারার। ছায়াটাকে যেন ঠিক তেমন মনে হল না। মাচু হতে পারে কি? যে-ই হোক, সে যে এ ঘরের দিকেই আসছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন আসছিল? আর ওরকম চুপি-চুপি চোরের মতোই বা কেন?

পিছনে দরজার কাছে শব্দ হতেই গোগোল চমকে ফিরে তাকাল। আলেবো ঘরে ঢুকল। অথচ গোগোল এমন চমকে উঠেছে, ওর বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করছে। আসলে পর পর এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, যাতে ওর মন উদ্বেগে ভরে গিয়েছে। মিঃ মুখার্জির বাড়ি গিয়ে তাঁর কুকুরের মাংস খেতে ভাল লাগার কথাটা মোটেই ভাল লাগেনি। জটুমামাই সব থেকে বেশি আঘাত করেছেন। তিনিও কুকুরের মাংস খেতে ভালবাসেন! এ-বাড়িতেও আলেবো ছাড়া সবাই কুকুরের মাংস পছন্দ করেন। এমন-কী, বাড়ির কুকুর মেরে বন্ধুদের ভোজ দিয়েছে আলেবোর দাদা কুম্‌ভো। সব থেকে সন্দেহজনক চরিত্র হল ল্যামচন আর আলেবোর ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দা ল্যামচনের সঙ্গে যে কুকুরের মাংসের কথা বলছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরে একটু আগেই গোগোল যে-লোকটাকে বাগানের বাঁশঝাড়ের দিক থেকে আসতে আর পালিয়ে যেতে দেখল, সে-ই বা কে?

আলেবোর মুখ গম্ভীর। শুধু গম্ভীর নয়, ওর লাল গাল আর কালো চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। ও গোগোলের দিকে এগিয়ে এল। গোগোল ওর মুখের ভাব বিশেষ লক্ষ করেনি। প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "আলেবো, আমি একটু আগে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পেয়েছি। ডাকটা ওই দিক থেকে আসছিল। অথচ এসে অবধি আমি তো একটা কুকুরও রাস্তায় দেখতে পাইনি?"

গোগোল জানালার দিকে হাত তুলে দেখাল। আলেবো বলল, "তুমি ঠিকই শুনেছ। ওটা হল সেক্রেটারি মিঃ জোপিয়াংগার বাড়ির কুকুর। আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। একটু উঁচুতে, দেড় ফার্লং দূরে। ওটা হল টিবেটান অ্যাপসো। তোমার চিক্কুসের মতোই প্রায় দেখতে, তবে মিঃ জোপিয়াংগার কুকুরের বয়স বেশি, দেখতেও বড়। চার বছর বয়স নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু কোনো বিশ্বাস নেই।"

গোগোল অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোনো বিশ্বাস নেই মানে?"

"কোনো বিশ্বাস নেই মানে কোনো বিশ্বাস নেই।" আলেবো গোগোলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোন্ দিন শুনব, টিবেটান অ্যাপসোকে কোন্ উৎসবের দিন ভোজ দেওয়া হয়েছে।"

কথাটা শুনেই গোগোলের বুক আবার ধকধক করে উঠল। জিজ্ঞেস করল, "মানে, তুমি বলছ, পোষা কুকুরটিকে খাওয়া হবে?"

"অসম্ভব নয়।" আলেবো বলল, "তুমি অবাক হচ্ছ কেন? আমাদের অ্যালসেশিয়ানকে খাওয়া হয়নি? পোষা মানেই এই নয়, তাকে খাওয়া হবে না। এরকম ঘটনা আমি কয়েকটা ঘটতে দেখেছি। তুমি আমাদের দেশের মিথুনের নাম শুনেছ?"

গোগোল মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "শুনেছি। এখনো দেখিনি।"

"আমাদের চিড়িয়াখানায় আছে, তোমাকে দেখাব।" আলেবো বলল, "মিথুন এখন খুবই কমে গেছে। খুব বড় কোনো উৎসব না হলে মিথুন মেরে খাওয়া হয় না। যারা খুব বড়লোক, একমাত্র তারাই মিথুন পোষে। কী জন্য পোষে? খাওয়ার জন্যই তো? তাহলে পোষা কুকুর কেন খাবে না?"

গোগোল এ-কথার কোনো জবাব দিতে পারল না। আলেবো ভুল কিছু বলেনি। এ যেন অনেকটা খাসি পাঁঠা পোষার মতো। কুকুরও যখন খাদ্যবস্তু, তখন পোষা হলেও তাকে খাওয়া যায়। এতে অন্যায় কিছুই নেই। কিন্তু গোগোলের মুখটা শুকিয়ে গেল। ও খাটের দিকে তাকাল। আর তৎক্ষণাৎ বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠল। চিক্কুস কোথায়? ও খাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুটো সাদা ওয়াড় লাগানো বালিশের মাঝখান থেকে চিক্কুস্ লাফিয়ে উঠল।

গোগোলের যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। চিক্কুসের সাদা লোম-ভরা শরীরটা বালিশের সঙ্গে মিশে ছিল। গোগোল ঝাঁপিয়ে পড়তেই, চিক্কুস খেলা পেয়ে গেল। ও লাফিয়ে উঠে বাঘের মতো ওত পেতে বসল। গোগোল হাত বাড়াতেই, প্রায় ডিগবাজি খেয়ে বিছানার অন্যদিকে চলে গেল। আলেবো জিজ্ঞেস করল, "তুমি তখন ওরকম চমকে উঠলে কেন? জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কুকুরের ডাক শুনে ভয় পাচ্ছিলে?"

"না।" গোগোলের মুখে আবার ভয় আর সন্দেহ ফুটে উঠল। ও বাগানের দিকের লোকটার কথা বলল।

আলেবো গম্ভীর মুখে কথাটা শুনল। তারপরে ওর ভুরু কুঁচকে উঠল। জানালার কাছে গিয়ে, কাঁচের পাল্লা খুলে দেখল। দেখে, পাল্লা দু'টো বন্ধ করে ফিরে এল। বলল, "ল্যামচন আসেনি। ওকে আমি রান্নাঘরে দাদুর কাছে দেখে এলাম। তোমার কি মনে হয়, মাওলি হতে পারে?"

গোগোল মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।"

আলেবো গম্ভীর চালে, দু'ঠোঁট টিপে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। গোগোল ওর মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল। চিক্কুস্ তখন পায়ের থাবা দিয়ে বিছানার চাদর আঁচড়াচ্ছে। প্রায় এক মিনিট পরে আলেবো বলল, "মাওলি আর মাচু ছাড়া কে হতে পারে? বাকিরা তো সব ঘরের মধ্যেই রয়েছেন। দাদা কুম্ভো আর দিদি তোশিলির সঙ্গে মজুমদার আংকল্ গল্প করছেন।"

আলেবো খাটের ওপর বসল। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় গেছলে?"

"রান্নাঘরে।" আলেবো বলল, "তোমার কথা শুনে, আমি শুনতে গেছলাম, দাদু আর ল্যাম্চনের কী কথা হচ্ছে। তুমি যা শুনেছ, ঠিকই শুনেছ। চিক্কুসের কথাই হচ্ছিল। আমি খুব রেগে গিয়ে দাদুকে বললাম, কেন তোমরা চিক্কুসের কথা বলছ? দাদু হেসে বললেন, এতে তোমার রাগ করার কিছুই নেই। তুমি জানো, সেক্রেনি গেনা—মানে উৎসবে আমরা বড় কুকুর মেরে থাকি। এবার মার্চ মাসেও আমাদের গ্রামে সেক্রেনি গেনার দিন একটি মাত্র বড় কুকুর পাওয়া গেছল। আর আমরা আঙ্গামিরা কখনো আমাদের শিকারি কুকুরদের মারি না। তাদের লেজ আর কান কেটে দেওয়া হয়। তারা মরে গেলে, কাপড় জড়িয়ে বাড়ির সামনেই মাটিতে পুঁতে দিই। যে-কুকুর শিকারি নয়, তাদের খেতে কোনো দোষ নেই। আমরা আমাদের অতিথির কুকুরকে নিশ্চয়ই খাব না। কিন্তু খাবার ইচ্ছে হওয়াটা অপরাধ নয়।' দাদু অবশ্য ভুল কিছু বলেননি। যা বলবার, সত্যি কথাই বলেছেন। কিন্তু ল্যাম্চনের হাসিটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। ও হচ্ছে গেঁয়ো মানুষ। দাদু সেকালের লোক হলেও অন্যায় কিছু করবেন না। অশিক্ষিত ল্যাম্চন, বা মাওলি, এরা সেকেলে তো বটেই, এদের মাথাও মোটা। মোটা মাথায় একটা কিছু চেপে বসলে, কী করবে বলা যায় না। ল্যাম্চনের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, চিক্কুসের দিকে ওর নজর পড়েছে।"

গোগোল প্রায় দমবন্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, "নজর পড়েছে মানে?"

"নজর পড়েছে মানে, ও আমাকে স্পষ্টই বলল, অতিথিরা তাদের কুকুরটা আমাদের দিয়ে দিলেই পারে।" আলেবো রেগে বলল, "আমি ওকে বলে দিয়েছি, এরকম কথা তুমি যদি আর একবার বল, আমি গুলি করে তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেব। আমার কথা শুনেও ল্যাম্চন হাসতে লাগল। বলল, 'কেন শুধু-শুধু তুমি আমার মুণ্ডু উড়িয়ে দেবে? আমি তো অন্যায় কিছু বলিনি। খাবার দেখলে, সবাই খেতে চায়।' আমার ইচ্ছে হচ্ছিল, তখনই ওকে দু ঘা কষিয়ে দিই। ওর কথা শুনে দাদু কিছু না বলাতে আমার আরো রাগ হচ্ছিল। আমি ল্যাম্চনকে বলে দিয়েছি, তুমি একটি মূর্খ। সব কুকুরই তোমার খাবার হতে পারে না। আর খাবার দেখলেই যারা খেতে চায়, তারা পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আমি এখুনি গিয়ে বাবাকে বলছি। তুমি যদি চিক্কুসের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করো, তা হলে খুব খারাপ হবে। চলে আসবার সময় বাবাকে কথাটা বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু দেখলাম তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে আমার বাবা-মা কথা বলছেন।"

আলেবোর কথা শুনে গোগোল কোনো আশার আলোই দেখতে পেল না। তার চোখের সামনে ল্যাম্চনের চেরা চোখ আর হিজিবিজি-কাটা মুখটা ভেসে উঠল। আবার ওর ভাবনা হল, তা হলে বাগানের দিকে কে এসেছিল? ল্যাম্চন তো রান্নাঘরে ছিল। তা হলে কি মাওলি? মাচু নিশ্চয়ই আসেনি। তাকে দেখে সেরকম সন্দেহজনক মনে হয় না।

এই সময়ে জটুমামা ভেজানো দরজা খুলে ঢুকলেন। বললেন, "এই যে, মাস্টার গোগোল আর আলেবো, তোমরা এখানেই আছ? তোমাদের খাবার দেওয়া হয়েছে, খেতে চলো।"

গোগোল একবার মাত্র জটুমামার দিকে দেখে, মুখ ফিরিয়ে নিল। তাঁর ওপর ওর এখন খুব অভিমান হচ্ছে। একটা কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না। জটুমামা কুকুরের মাংস খান। মানুষের খাবার নিয়ে কিছু বলা উচিত নয়। কিন্তু তিনি জেনে-শুনে চিক্কুসকে নিয়ে এ-বাড়িতেই এলেন কেন?

জটুমামা দুজনের দিকে তাকিয়ে মোটা ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, তোমাদের কী হয়েছে? দু'জনের কেউ একটা কথাও বলছ না কেন?"

আলেবো গোগোলের দিকে তাকাল। গোগোল খাটের ওপর থেকে চিক্কুসকে কোলে তুলে নিল। জটুমামা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে আলেবো?"

আলেবো সব কথাই সংক্ষেপে বলল। জটুমামা তাঁর গোঁফের প্রজাপতির ডানা মেলে হাহা করে হেসে উঠলেন। বললেন, "তোমাদের দুজনেরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। কার এত সাহস আছে, চিক্কুসকে চুরি করবে? ল্যাম্চনের এত সাহস কখনোই হবে না। তবে হ্যাঁ, বাগানের দিক থেকে কে এদিকে এসেছিল, সেটা একটু ভেবে দেখা দরকার। তবে আমার মনে হয়, ভয়ের কিছু নেই। হয়তো মাওলি কোনো কারণে ওদিকে গেছল। জানালায় গোগোলকে কাছে থেকে এসে দেখে, ফিরে গেছে। সেটা তো ওদের জিজ্ঞেস করলেই হবে। চলো এখন খেতে যাওয়া যাক।"

আলেবো ডাকল, "চলো গোগোল, আমরা খেয়ে নিই।"

গোগোল জটুমামার দিকে না তাকিয়ে, আলেবোর সঙ্গে দরজার দিকে গেল। কোলে চিক্কুস্। জটুমামা এতক্ষণে বুঝলেন, গোগোল ওঁর ওপরে অভিমান করে আছে। তিনি গোগোলের কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল গোগোল, তুমি কি আমার সঙ্গে আড়ি করেছ নাকি?"

গোগোল কোনো জবাব দিল না। জটুমামা হেসে বললেন, "বুঝেছি, আমি কুকুরের মাংস খাই শুনে, তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে। আমি তো আর রোজ-রোজ খাইনে। এখানেও কেউ রোজ কুকুরের মাংস খায় না। রোজ খাবার মতো এত কুকুর পাবে কোথায়? আমি হয়তো দু'চারবার খেয়েছি, তা বলে তোমার চিক্কুসকে খাব, এমন কথা কি তুমি ভাবতে পারছ?"

গোগোল অভিমানের স্বরে বলল, "আমি মোটেই তা ভাবছি না। কিন্তু আপনি একবারও বলেননি আপনি কুকুরের মাংস খান।"

"সে-কথা অবশ্য তুমি বলতে পারো।" জটুমামা গোগোলের কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বললেন, "প্রথমে কথাটা আমার মনেই আসেনি। তারপরে এসে যখন শুনলাম, মিঃ হারালুর কুকুরটি দিয়ে কুম্ভো তার বন্ধুদের ভোজ দিয়েছে, তখন মনে পড়েছিল, আমিও খাই। কিন্তু তুমি আবার কী ভাববে, তাই বলিনি। তবে আমি তোমাকে মিথ্যেকথা কিছু বলিনি। বরং ডিমাপুর থেকে আসবার সময় মাচু যখন চিক্কুসের কথা বলেছিল, আমি একটু ভাবনায় পড়ে গেছলাম। এখানে এসেও অ্যালসেশিয়ানের কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেছল। তারপরে তোমাকে আমি সবই বুঝিয়ে বলেছি, কত দেশের মানুষ কত কী খায়।
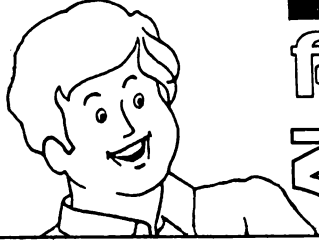
কি করে মন্টু সত্যিকারের ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে সুরু করল
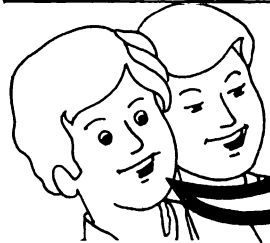
আমরাও খাই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, চিক্কুসের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

গোগোল তবুও কথা বলল না, হাসলও না। জটুমামার কথায় ও কোনো ভরসা পাচ্ছে না। চিক্কুসের জন্য একটা অজানা ভয় ওর মাথায় বিঁধে গিয়েছে। গোগোলের চরিত্রই এইরকম। খারাপ কিছু ঘটবার আগে, ও যেন কিছু একটা অনুভব করতে পারে। আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে, আর গোগোল সাংঘাতিক সব বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এরকম বিপদে ও আর কখনও পড়েনি।

জটুমামা গোগোলের পিঠ চাপড়ে বললেন, "আরে মাস্টার গোগোল, তুমি একজন খুদে গোয়েন্দা, তোমার সাহসের কথা আজ কে না জানে? আর এই সামান্য ব্যাপারে তুমি এত মুষড়ে পড়ছ? পাগল ছেলে। চলো, খেয়ে নেবে, আর গেস্ট-রুমে চিক্কুসকে নিয়ে তুমি আমি আর আলেবো রাত্রে শোব। তুমি নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে, কোনো ভয় নেই।"

জটুমামার সঙ্গে এক ঘরে চিক্কুসকে নিয়ে? গোগোল আরও ভয় পেয়ে গেল। জটুমামার বাটারফ্লাই গোঁফওয়ালা চওড়া মুখের দিকে তাকাল। তিনি গোঁফের ডানা ছড়িয়ে, ঝকঝকে দাঁতে হাসছিলেন। গোগোলের চোখের সামনে ভেসে উঠল, জটুমামা বেশ তারিয়ে-তারিয়ে কুকুরের ঠ্যাং চিবোচ্ছেন। আর সে ঠ্যাং যেন চিক্কুসেরই। ও খুব করুণ স্বরে বলল, "আমি রাত্রে বাবা মা'র কাছে থাকব। আলেবোও আমার সঙ্গে থাকবে।"

"তার মানে তুমি আমাকেও বিশ্বাস করতে পারছ না।" জটুমামা হো হো করে হেসে উঠলেন। গোগোলকে ঠেলে নিয়ে ঘরের বাইরে যেতে যেতে বললেন, "আচ্ছা, তাই হবে। ঘরের তো অভাব নেই। গেস্ট-রুমে না-হয় আমি আর তোমার বাবা থাকব। তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে আলেবোকে নিয়ে অন্য ঘরে থেকো।"

ঘরের বাইরে এসে দেখা গেল, কুম্ভো আর তোশিলি খাবার টেবিলে খেতে বসে গিয়েছে। বাইরের বসবার ঘরে বাবা-মা তখন গল্প শেষ করে, মিঃ আর মিসেস হারালুর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এদিকেই আসছেন। তোশিলি তার পাশের চেয়ার দেখিয়ে গোগোলকে ডাকল, "তুমি এখানে এসে বোসো।"

"না না, গোগোল, তুমি আমার কাছে এসে বোসো।" কুম্ভো বাঁ হাত তুলে ডাকল, "তোমার চিক্কুসকে আদর করতে করতে আমি খাব।"

গোগোল কাঠ হয়ে গেল! কুম্ভো চিক্কুসকে আদর করতে করতে খাবে? কী রকম আদর করবে? বাবা-মা মিস্টার আর মিসেস হারালুর সঙ্গে খাবার ঘরে এলেন। জটুমামা বললেন, "গোগোল চিক্কুসকে নিয়ে খুবই ভাবনায় পড়ে গেছে।"

"কেন, কী ঘটল?" মিঃ হারালু জিজ্ঞেস করলেন।

জটুমামা আলেবোর মুখে যা শুনেছিলেন, সে-সব কথা বললেন। কুম্ভো আর তোশিলি হেসে উঠল। কিন্তু মিস্টার আর মিসেস হারালু হাসলেন না। তাঁরা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকালেন। মিসেস হারালু বললেন, "ল্যাম্‌চন খুবই সেকেলে, বোকা আর লোভী।"

"তা বলে নিশ্চয়ই ওর এত সাহস হবে না, চিক্কুসকে খেয়ে ফেলবে?" মিঃ হারালু মিসেস হারালুর দিকে তাকিয়ে বললেন।

গোগোল দেখল, বাবা-মায়ের মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। দু'জনেই যেন কেমন চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মা গোগোলের কোলে চিক্কুসকে দেখলেন। মিসেস হারালু বললেন, "ল্যামচন যদি কিছু করে, তবে সেটা সাহসের থেকে করবে না। বোকা আর লোভীদের ভয় ছাড়া সাহস-বোধ কিছু আছে বলে আমি মনে করিনে।"

"মা, এটা তুমি অদ্ভুত কথা বলছ," কুম্ভো বলল, "বাবা ঠিকই বলেছেন, ল্যামচনের এত সাহস কখনোই হবে না।"

তোশিলি বলল, "কিন্তু কুম্ভো, তুমি মনে করে দ্যাখো, ল্যাম্‌চন দু বছর আগে, আমাদের কাঠবেড়ালিটার কী দশা করেছিল। আমরা যখন ভেবছিলাম, একটা কাঠবেড়ালির মাংসে আমাদের কিছুই হবে না, আরো অন্তত দু-তিনটে পাওয়া যাক, তখন একসঙ্গে খাওয়া হবে, তখন ল্যাম্‌চন সেটা—"

"এসব আলোচনা করার কোনো মানেই হয় না।" জটুমামা তোশিলিকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, "মিঃ হারালুই ঠিক বলেছেন। ল্যামচনের সেরকম সাহসই হবে না। বরং খাওয়া হয়ে যাবার পরে মিঃ হারালু ল্যামচনকে ডেকে শাসিয়ে দেবেন, তা হলেই হবে। এখন আমার খুব খিদে পাচ্ছে।"

বিরাট বড় ডাইনিং টেবিল। সাধারণ লোকের বাড়িতে দশ জন বসবার মতো ডাইনিং টেবিল চেয়ার থাকে না। এখানে রয়েছে। গোগোল বুঝতে পারল, জটুমামা তোশিলিকে ইচ্ছে করেই চুপ করিয়ে দিলেন। কিন্তু ল্যামচন কাঠবেড়ালিটার কী দশা ঘটিয়েছিল, তা জানবার জন্য ওর ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। তা ছাড়া, নতুন একটা সংবাদও জানা গেল, কাঠবেড়ালিও খাওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য গোগোল বিষ্ণুপুরে ওর মাসিমার বাড়ি বেড়াতে গিয়েই জেনেছিল, সাঁওতালরা কাঠবেড়ালির মাংস খায়। এমন-কী সাপ আর বনবেড়ালের মাংসও। কিন্তু কাঠবেড়ালির মতো সুন্দর নিরীহ জীবকে খেতে কি কষ্ট হয় না? কথাটা বিষ্ণুপুরেই মনে হয়েছিল। আর সে-কথা মাসিমাকে বলাতে, তিনি বলেছিলেন, জলের মাছ আর গুগলিও তো নিরীহ, তাদের আমরা খাই কেন? গোগোল কোনো জবাব দিতে পারেনি। বরং অনেকটা কষা মাংসের মতো গুগ্‌লি রান্না খেতে ভালই লেগেছিল।

মিঃ হারালু বললেন, "যাই হোক, রাত না বাড়িয়ে এবার আমরা খেয়ে নিই।"

গোগোল আলেবোর সঙ্গে পাশাপাশি বসল। টেবিলের ওপরেই সব খাবার সাজানো ছিল। ভাত, রুটি, মুরগির মাংস, ছোলার ডাল, আলুভাজা, স্যালাড আর মিষ্টি। একটা পাত্রে ছিল অনেকগুলো ছোট ছোট রসুনের কোয়া, আর চাটনি।

গোগোলের কোলে চিক্কুস খুব ছটফট করছিল। চেষ্টা করছিল, কোল থেকে খাবারের টেবিলে ওঠবার। কুম্ভো বলল, গোগোল, চিক্কুস তোমাকে খেতে দেবে না। ওকে আমার কাছে দাও।"

মা এগিয়ে এসে গোগোলের কাছ থেকে চিক্কুস্‌কে নিজের কোলে নিলেন। বললেন, "ওকে আমি দেখছি। রাত্রের দুধ খাওয়া হয়ে গেছে, ও আর কিছুই খাবে না।"

গোগোল কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে আরম্ভ করল। কিন্তু ল্যামচন কাঠবেড়ালির কী দশা ঘটিয়েছিল, সেটা জানবার জন্য মনটা খুবই ছটফট করছিল। জটুমামা থামিয়ে না দিলে তোশিলি নিশ্চয়ই বলত। জটুমামার এ রকম আচরণ গোগোলের মোটেই ভাল লাগেনি। তাছাড়া, তোশিলির কথা থামিয়ে দিলেও, সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে।

গোগোল আর আলেবোর খাওয়া সকলের আগে হয়ে গেল। তার মধ্যেই জটুমামা পরের দিনের বেড়াবার প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেললেন। মিঃ হারালু অফিসে যাবেন। কুম্ভো আর তোশিলি যাবে কলেজে এবং স্কুলে। আলেবো গোগোলের সঙ্গে থাকবে। আগামীকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, মিউজিয়াম আর চিড়িয়াখানা দেখা হবে।

গোগোল বেসিনে মুখ ধুয়ে, মায়ের কাছ থেকে চিক্কুস্‌কে নিল। আলেবোর সঙ্গে আগের শোবার ঘরে ঢুকল। গোগোল প্রথমেই আলেবোকে জিজ্ঞেস করল, দু' বছর আগে ল্যামচন কাঠবেড়ালিকে নিয়ে কী করেছিল। আলেবো বলল, "আমি ঘটনাটা চোখে দেখিনি। তখন আমি স্কুলে ছিলাম। বাড়ি এসে শুনলাম, ল্যামচন ওর গ্রামে চলে গেছে। তারপর কাঠবেড়ালিটার খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, ল্যামচন ওকে মেরে ছাল ছাড়িয়ে, ঝলসে নিয়ে খেয়ে ফেলেছে। চামড়াটা নিয়ে যায়নি, সেটা এখনো আমাদের কাছে আছে। তারপরে ওর ভয় হয়, বাবা নিশ্চয় বাড়ি ফিরে ওকে শাস্তি দেবেন। ও গ্রামে পালিয়ে যায়। তবে আমার মনে হয়, মাওলি বোধহয় ব্যাপারটা জানত। একেবারে চুপিচুপি সব ব্যাপারটা সম্ভব ছিল না।"

"তারপরে ও আবার তোমাদের এখানে ফিরে এল কেমন করে?" গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আলেবো বলল, "কেমন করে আর? এক মাস বাদে ফিরে এল। বাবার রাগ তখন পড়ে গেছল। ও বাবা-মা'র কাছে ক্ষমা চায়। মা ওকে বললেন, তোমার কি তেরহমার ভয় নেই?"

"তেরহমা কী ?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

আলেবো বলল, "তেরহমা হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর তো অনেক আছেন। যারা মিথ্যে কথা বলে বা কোনো পাপ করে, তেরহমা তাকে মেরে ফেলেন। আর তার আত্মা মাটির তলায় চলে যায়, সেখানে সে অনেক রকম শাস্তি পায়। মা'র কথা শুনে ল্যামচন বারবার তেরহমার নাম করে কাঁদতে লাগল। বাবা বললেন, ঈশ্বরের শাস্তি তো তোমাকে পেতেই হবে। তার যখন সময় হবে, তখন শাস্তি পাবে। এখন কাজে লেগে যাও। আর কখনো ওরকম কাজ কোরো না।"

"আর কখনো কোনো অন্যায় কাজ করেনি ?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

আলেবো মাথা নেড়ে বলল, "না, সেরকম কিছু করেনি। তবে ও তো ভীষণ বোকা। ও একবার আমাদের ঘরের আগুন নিভিয়ে ফেলেছিল।"

গোগোল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আগুন নিভিয়ে ফেলেছিল মানে ?"

আলেবো বলল, "আমাদের ঘরে সব সময় একটু আগুন জ্বলবেই। তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। সে-আগুন কখনো নিভবে না। নিভলে অমঙ্গল হয়। ল্যামচন একবার সে-আগুন নিভিয়ে ফেলেছিল। তাতে ঠাকুর্দাই ওর ওপরে সব থেকে বেশি চটেছিলেন। তাড়িয়ে দিতেও চেয়েছিলেন। সেবার মা ওকে রক্ষা করেন।"

গোগোল আলেবোর সব কথাই মন দিয়ে শুনল। ভাবল কত দেশের কত লোকের কত রকম বিশ্বাস। ওদের কলকাতার পাড়ায় পারশিদের বাড়িতেও দেখেছে, ঘরের মধ্যে সব সময় একটা প্রদীপ জ্বলে। সেটা কখনও নেভানো হয় না। ওটা নাকি চিরকাল ধরেই জ্বলছে, জ্বলবেও। আলেবোর কথা শুনে ওর নতুন অভিজ্ঞতা হল। কিন্তু ও আর জেগে থাকতে পারছে না। আবার চিক্কুসের জন্য ভয়ও রয়েছে। ও মনে-মনে বলল, চিক্কুসের যদি কেউ ক্ষতি করে, তাহলে যেন তেরহমা তাকে শাস্তি দেন। ও চিক্কুসকে নিয়ে খাটের উপর উঠল। বলল, "আলেবো, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।"

"আমারও।" আলেবো বলল, "এসো, আমরা দু'জনেই শুয়ে পড়ি। তোমার শীত করছে না ?"

গোগোল বলল, "করছে। কম্বল তো রয়েছে। চিক্কুসও মনে হয় ঘুমোবে। ও একদম চুপ হয়ে গেছে। কিন্তু দরজাটা কি খোলা থাকবে ?"

"থাক।" আলেবো বলল, "এ ঘরে আজেবাজে লোক ঢুকতে সাহস পাবে না। আলোটা জ্বলতে থাক।"

গোগোল চিক্কুসকে শুইয়ে দিতেই, ও গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ল। গোগোল আর আলেবো কম্বল জড়িয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। গোগোল ভাবল, জটুমামা তোশিলিকে থামিয়ে দিলেন কেন ?

৬

গোগোলের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। স্বপ্ন দেখছিল কি-না, নিজেরই মনে পড়ল না। অথচ ঘুমটা ভাঙল একেবারে আচমকা। ঘুম ভেঙেই উঠে বসল। পাশে শুয়ে আছে আলেবো। তারপরেই চোখ ফেরাল, যেখানে চিক্কুস শুয়েছিল, সেদিকে। চিক্কুস সেখানে নেই। গোগোল গায়ের কম্বল ফেলে দিয়ে খাটের আশেপাশে দেখল, চিক্কুস নেই। গতকাল রাত্রে এ বিছানায় আর কেউ শুয়েছিল কিনা, গোগোল জানে না। ও ধড়মড়িয়ে খাট থেকে মেঝের কার্পেটে নামল। দেখল, মায়ের হাতব্যাগ একটা বালিশের পাশে। তা হলে কি মা রাত্রে এখানে শুয়েছিলেন ?

গোগোল কাঁচের জানালার দিকে তাকাল। সেখানে পর্দা টানা। বাথরুমের দরজার দিকে তাকাল। মনে হল, বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। হয়তো মা গিয়েছেন। ঘরের দরজাটার ভিতর থেকে ছিটকিনি আটকানো নেই। ভেজানো রয়েছে। ঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার। কিন্তু চিক্কুস গেল কোথায় ?

গোগোল যখন ধড়মড়িয়ে খাট থেকে নামছিল, আলেবো তখনই জেগে গিয়েছে। ও উঠে বসে আগেই গলাবন্ধ ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে চাপাল। গোগোলের সোয়েটারটা নিয়ে খাটের নীচে নেমে বলল, "গোগোল, এটা গায়ে দিয়ে নাও, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

গোগোলের তখন শীত-টিতের কোনো বালাই নেই। খাটের নীচে উঁকি দিয়ে ভাল করে দেখল। চিক্কুস্ সেখানে নেই। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে গোগোল প্রায় দমবন্ধ স্বরে বলল, "আলেবো, চিক্কুস্‌কে দেখতে পাচ্ছিনে।"

আলেবো গোগোলের হাতে সোয়েটার দিয়ে, নিজে জুতো মোজা পরতে পরতে বলল, "তোমার মা হয়তো ওকে নিয়ে বাইরে গেছেন কিন্তু এখন কি দিন হয়েছে ?"

গোগোল ওর গলাবন্ধ পুরো-হাতওয়ালা সোয়েটার গায়ে দিল জুতো মোজা পরতে পরতে বলল, "এখন যদি রাত হত, তাহলে কি ঘরের সব কিছু দেখা যেত ? অন্ধকার থাকত নিশ্চয়ই ?"

"ঠিক বলেছ।" আলেবো লজ্জা পেয়ে হেসে বলল, "আমরা আরো বেলায় ঘুম থেকে উঠি।"

গোগোল বলল, "মনে হয় আমার মা রাত্রে এ-খাটে শুয়েছিলেন জানিনে মা বাথরুমে গেছেন কিনা। কিন্তু চিক্কুস কোথায় যেতে পারে ?"

আলেবো তখন কাঁচের জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল গোগোলও ওর পাশে এসে দাঁড়াল। দিনের আলো এখনও ফোটেনি সবে ভোর হয়েছে, আর হাল্কা কুয়াশাও রয়েছে। রাস্তার আলো এখনও জ্বলছে। বাইরে একটাও লোক বা গাড়ি দেখা যাচ্ছে না বাতাস নেই, গাছপালা নড়ছে না। বাঁশপাতায় আর বাগানের গাছগুলোর পাতায় ফুলে শিশির পড়েছে। কাক কিংবা অন্য কোনো পাখি চোখে পড়ছে না। ডাকও শোনা যাচ্ছে না। গোগোল মনে করতে পারছে না, এখানে ও কোনো পাখির ডাক শুনেছে কিনা বাইরে অস্পষ্ট বাড়ি, পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। নীচের উপত্যকার ওপর সাদা মেঘ জমে আছে। গোটা পাহাড়ি দেশটা যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজপুরীর মতো ঘুমিয়ে আছে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আলেবো ঘাড় কাত করে বাড়ির পিছন দিকে দেখল। ওর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল। বলল, "গোগোল, চলো আমরা বাইরে যাই। চিক্কুস হয়তো দরজা খোলা পেয়ে বেরিয়ে গেছে।"

গোগোলের বুক ধক্ করে উঠল। চিক্কুস বেরিয়ে গিয়েছে ? কী করে যাবে। দরজা তো ভেজানো। চিক্কুস্ কি দরজা ঠেলে ফাঁক করে বেরোতে পারে ? আলেবো ততক্ষণে দরজার কাছে চলে গিয়েছে গোগোল আলেবোর সঙ্গে ঘরের বাইরে এল। বাঁ পাশে আরও দুটো ঘর। কাঠের বারান্দা, বন্ধ কাঁচের জানালা দিয়ে সব ঘেরা। ডান দিকে গেস্টরুম। তারপরে বড় বসবার ঘরটা অন্ধকার। খাবার ঘর থেকে রান্নাঘরে যাবার দরজা খোলা। কিন্তু বাড়ির পিছনে যাবার দরজাটা বন্ধ। চিক্কুস তাহলে বাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে। বাইরে বেরোবার কোনো দরজাই খোলা নেই।

গোগোল বলল, "আমি বাইরের ঘরটা দেখে আসি। চিক্কুস ওদিকেই হয়তো গেছে। অন্য সব ঘরের দরজা তো বন্ধ। তুমি আমার সঙ্গে এসো গোগোল।" আলেবো রান্নাঘরে যাবার দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "ও-ঘরটা পরে দেখলেও হবে।"

গোগোলের কানে আলেবোর কথাগুলো কেমন ব্যস্ত শোনাল খাবার ঘরের থেকে রান্নাঘরে যাবার সরু করিডর অন্ধকার। সারা বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরটাই বোধহয় সব থেকে বড়। সে-ঘরের মাঝখানে কাঠের আগুনের অঙ্গার দেখা যাচ্ছে। অল্প ধোঁয়া উঠছে। আর একপাশে কয়েকটা পাথরের চাংড়ার মাঝখানে টিম্ টিম্ করে আগুনের শিখা জ্বলছে। এই বোধহয় সেই অনির্বাণ আগুন। কিন্তু সেই আগুনের আলোয় ঘরের কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না। একদিকে কাঁচের জানালা বন্ধ। পর্দা ঢাকা নেই। জানালার আলোয় দেখা গেল, আলেবোর ঠাকুর্দা একটা বাঁশের মাচার বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। রান্নাঘর থেকে বাড়ির পিছনে যাবার দরজাটা ভেজানো। আলেবো সেদিকে গিয়ে দরজা খুলে বাইরে গেল। গোগোলও গেল

কাউকে দেখা গেল না। বাড়ির পিছনে, পাহাড়ের গা ঘেঁষে দুটো ঘর। আলেবো সেদিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে ডান দিকে ওপরের রাস্তার দিকে ওর চোখ পড়ল। পড়তেই থমকে দাঁড়াল।

গোগোলও তাকাল। ঐ রাস্তা দিয়েই এ বাড়িতে নেমে আসতে হয়। গোগোল দেখল লাল কম্বল জড়ানো একটা লোক ওদের দিকে একবার দেখল। দেখেই মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। আলেবো বলে উঠল, "ল্যামচন। ও এখন বাড়ির বাইরে কোথায় যাচ্ছে?"

"ল্যামচন?" গোগোল চোখ বড় করে বলল।

আলেবো বাড়ির সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে বলল, "গোগোল, তাড়াতাড়ি এসো। ল্যামচনের হাবভাব মোটেই ভাল ঠেকছে না। ওর সারা গায়ে শাল জড়ানো। চিক্কুসকে হয়তো শাল ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

গোগোলের বুকের মধ্যে ঢাকের বাজনা বেজে উঠল। ও আলেবোর সঙ্গে ছুটল। বড় গেটটা বন্ধ। পাশে দুটো গ্যারাজের দরজাও বন্ধ। আলেবো গেট খুলে, বাঁ দিকে চড়াইয়ের রাস্তা ধরে ছুটল। গোগোল ওর পাশে। কিন্তু ল্যামচনকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাঁ দিক দিয়ে রাস্তা উঠে, কিছু দূর গিয়ে, ডান দিকে বেঁকে গিয়েছে। আলেবো চিৎকার করে বলল, "গোগোল থেমো না। যেমন করে হোক ল্যামচনকে আমাদের ধরতেই হবে।"

গোগোল মোটেই থামেনি। বরং আলেবোর থেকে দু কদম এগিয়ে গেল। বলল, "তোমার কি মনে হয়, ল্যামচন চিক্কুসকে নিয়ে পালাচ্ছে?"

"অসম্ভব কিছু নয়।" আলেবো ছুটতে ছুটতে বলল, "আমার দেখে মনে হল, ও যেন কেমন চোরের মতো পালাচ্ছে।"

ডান দিকে মোড় নিয়ে দেখা গেল, ফ্যাকাসে শাল জড়ানো ল্যামচন ছুটে অনেক দূর চলে গিয়েছে। ও একবার পিছন ফিরে গোগোল আর আলেবোকে দেখল। দেখে, আরও জোরে ছুটতে আরম্ভ করল। আলেবো ল্যামচনের নাম ধরে চিৎকার করে ওদের নিজেদের ভাষায় কিছু বলল। কিন্তু ল্যামচন ফিরে তাকাল না। বাঁ দিকের উতরাইয়ের পথে নেমে, অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাস্তায় একটাও লোক দেখা যাচ্ছে না। সামনের পাহাড়ের গায়ে উঁচু রাস্তা দিয়ে একটা জিপ চলে যাচ্ছে। আলেবো জিপটার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে ইশারা করল। জিপের ড্রাইভার দেখতে পেল কি না কে জানে। সে থামল না। ওরা দু'জনে বাঁ দিকের উতরাইয়ের পথে নেমে গেল। ল্যামচনকে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাটা আবার বাঁ দিকেই বেঁকে গিয়েছে। বাঁ দিকে ওপরে কতগুলো বাড়ি। কোনো বাড়িরই দরজা-জানালা খোলা নেই। শহরের ঘুম এখনও ভাঙেনি।

গোগোল আর আলেবো বাঁ দিকে মোড় নিল। বাঁ দিকে রাস্তাটা প্রায় সমতলভাবে গিয়ে, ডান দিকে মোড় নিয়েছে। ল্যামচনকে দেখা গেল, ও ডান দিকের রাস্তার শেষ প্রান্তে, আবার বাঁ দিকে হারিয়ে গেল। ওরা যখন সেখানে পৌঁছল, ল্যামচন তখন আর পিচের রাস্তায় নেই। নীচের দিকে একটা পায়ে-হাঁটা পথে নেমে পড়েছে। আলেবো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ল্যামচন ওর গ্রামের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু নীচের রাস্তায় নামলেও, ওকে আবার ওপরেই উঠতে হবে। তবে ওর পেছন ছাড়া ঠিক হবে না। উত্তর-পুবে গিয়ে, তারপর ও দক্ষিণ-পুবে বড়বস্তিতে যাবে।"

"বড়বস্তিটা কী?" গোগোল জিজ্ঞেস করল।

আলেবো বলল, "নাগাল্যাণ্ডের সব থেকে বড় গ্রাম। অনেকে বলে এশিয়ার মধ্যেই নাকি ওটা সব থেকে বড় গ্রাম। দশ হাজার লোক থাকে সেই গ্রামে।"

গোগোল আলেবোর সঙ্গে নীচের পায়ে-হাঁটা পথে নেমে পড়ল। রাস্তার দু'পাশে চাষের জমি। মাঝে-মাঝে ঝোপঝাড়। ল্যামচনকে দেখা যাচ্ছে না। গোগোলের উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে, আর হাঁপিয়েও পড়ছে। বলল, "ল্যামচনকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।"

"না দেখা গেলেও, আমি নির্ঘাত জানি ও গ্রামেই যাচ্ছে।" আলেবো বলল, "আমার কেবল একটাই ভয়।"

গোগোল চলতে চলতে, আলেবোর লাল ঘামে-ভেজা মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু আলেবোর কিসের ভয়, সেটা ও বলল না। গোগোল চুপ করে থাকতে পারল না। জিজ্ঞেস করল, "কিসের ভয়?"

আলেবো উতরাইয়ের পথে যেন গড়ানো পাথরের মতো নামছে। এক মিনিট কোনো জবাব দিল না। গোগোল অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আলেবো, বলছ না কেন, কিসের ভয় তোমার?"

পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের নীল চূড়ায় তার রঙ লেগেছে। আলেবো বলল, "তুমি তো আমার মা'র মুখে শুনেছ, ল্যামচনটা একেবারে বোকার বেহদ্দ। মাথায় কিছুই নেই। সাহস বলতে কী বোঝায়, তাও জানে না। যা মনে হয়, তাই করে বসে। আমার ভয় হচ্ছে, চিক্কুসকে ও শাল ঢাকা দিয়ে, গলা টিপে—।"

"আলেবো!" গোগোল আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। তারপরেই ওর গলার কাছে যেন কান্না ঠেলে এল, "আমি এটা ভাবতেও পারিনে।"

গোগোলের মতো ছেলের চোখ ছলছল করে উঠল। রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে ওকে ডাকাতরা লুঠ করে নিয়ে পালিয়েছিল। আর একবার ওকে অন্য ডাকাতরা ট্রাকে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। ও কখনও ভয় পায়নি। কান্না তো দূরের কথা। কিন্তু আলেবোর কথা শুনে আজ ওর কান্না পাচ্ছে। চিক্কুসের সেই সাদা লোমে ঢাকা দুটো কালো চোখ আর কালো নাকের ডগা ভেসে উঠল। ওর দুষ্টুমি, দৌড়োদৌড়ি, লাফানো-ঝাঁপানো খেলা, সবই চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

রাস্তা আবার উত্তর-পুবে, ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। পাহাড়ের চূড়ার ওপরে সূর্য উঠে এসেছে। রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। দু'চারজন মহিলা-পুরুষকে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের কাজে চলেছে। গোগোল কাঁদো-কাঁদো স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আলেবো, ল্যামচন কি এতটা নিষ্ঠুর হবে, চিক্কুসকে—"

গোগোল কথাটা শেষ করতে পারল না। এক রকম কান্নায় ডুবে গেল। আলেবো গোগোলের একটা হাত চেপে ধরে বলল, "হয়তো তা হবে না। কিন্তু বোকাদের বিশ্বাস করা যায় না। কেননা, সে যে কী করছে, তা সে বুঝতে পারে না।"

গোগোলের মনে পড়ল, কাঠবেড়ালিকে ল্যামচন কীভাবে মেরে খেয়ে ফেলেছিল। ওর মনটা ভয়ে আর আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। ও মনে-মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল, "হে ভগবান, তুমি চিক্কুসকে বাঁচাও।"

আলেবো হাত তুলে বলে উঠল, "ঐ যে, ঐ তেমিটা যাচ্ছে।"

গোগোল দেখল, ল্যামচন অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে ওকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আলেবো ল্যামচনকে তেমি বলল কেন? জিজ্ঞেস করল, "তেমি মানে কী?"

"ভূত।" আলেবো বলল, "আমাদের ভাষায় তেমি মানে ভূত। কিন্তু সে মানুষ মারতে পারে না। কেবল ভয় দেখাতেই পারে।"

গোগোল মনে-মনে বলল, "তাই যেন হয়, ল্যামচন যেন শুধু ভয়ই দেখায়। কিন্তু চিক্কুসকে যেন না মেরে ফেলে।"

সূর্য ক্রমেই পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে আরও ওপরে উঠে এল। রোদটা বেশ চড়া লাগছে। গোগোল আর আলেবো সোয়েটার পরে আছে। ভিতরে শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। এরকম পাহাড়ের পথে এতটা কোনোদিন ছোটেনি। ও জিজ্ঞেস করল, "গ্রামটা আর কত দূর?"

"বেশি দূরে নয়।" আলেবো বলল, "ওপরে উঠে, তারপরে আমরা বাঁ দিকে ঘুরে গেলেই গ্রামটা দেখতে পাব। আমরা চার কিলোমিটার পেরিয়ে এসেছি। আর দুই কিলোমিটারের মতো রাস্তা আছে। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? তা হলে আমরা একটু জিরিয়ে নিতে পারি।"

গোগোল ব্যস্ত হয়ে বলল, "তা হলে ল্যামচনকে ধরব কেমন করে?"

"ল্যামচনকে আমরা ধরতে পারব ঠিকই।" আলেবো বলল, "আমি তো ওর বাড়ি চিনি। ও বাড়িতেই যাবে। এসো, গাছতলায় এই পাথরটার ওপর বসে একটু জিরিয়ে নিই।"

আলেবোও হাঁপিয়ে পড়েছিল। গোগোলের তো এরকম পাহাড়ি পথে ছোটা অভ্যেসই নেই। ও আরও অনেক বেশি হাঁপিয়ে পড়েছে।

দুজনেই বসল। আলেবো বসে বলল, "আমার খিদেও পাচ্ছে। আগে মনে পড়লে, কিছু খাবার সঙ্গে আনতে পারতাম। কিন্তু সে-কথা তখন মনেই আসেনি।"

গোগোলেরও খিদে পাচ্ছে। কিন্তু ওর মনে এতই হুতাশ, খিদের জন্য কোনো কষ্টই হচ্ছে না। আলেবো হঠাৎ বলল, "এমন যদি হয়, ল্যামচন চিক্কুসকে আনেইনি, তা হলে আমাদের এই ছোটার কোনো মানেই হবে না।"

গোগোলের চোখে আনন্দ ঝিলিক দিয়ে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। বলল, "তাই যদি হবে, তবে ল্যামচন ওভাবে পালাচ্ছে কেন? ওর কি আজ বাড়ি যাবার কথা ছিল?"

"না, তা ছিল না।" আলেবো বলল, "কথাটা আমার মনে এল, কারণ আমরা ল্যামচনের হাতে চিক্কুসকে একবারও দেখতে পাইনি। তবে, চিক্কুসকে ও নিশ্চয়ই শাল ঢাকা দিয়ে রেখেছে, যাতে বাইরের লোকও কেউ দেখতে না পায়। বাড়ির সবাই যে কী ভাবছেন আর কী করছেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আমরা কাউকে বলেও আসিনি।"

গোগোল মনে-মনে ভাবল, তাতে ক্ষতি কিছু নেই। সবাই বুঝবেন, ওরা চিক্কুসের খোঁজেই বেরিয়েছে। ও দু হাঁটুর ওপর দু হাত রেখে, মুখ গুঁজে ছিল।

৭

গোগোল আলেবোর সঙ্গে যখন বড়বস্তি গ্রামে ঢুকল, তখন অবাক হয়ে সব দেখতে লাগল। গ্রামের মধ্য দিয়ে পিচের রাস্তা চলে গিয়েছে। কিন্তু এত্ত বাড়ি, এমন ঘিঞ্জি, পাহাড়ের ওপর যেন ভাবাই যায় না। গোগোল এত বড় গ্রাম কখনও দেখেনি। যেন চারপাশে কয়েকটি উপত্যকা, আর সেই উপত্যকাগুলির ওপর সারি সারি ঘর দু' পাশে। মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে। একটাই মাত্র পিচের রাস্তা, গ্রামের প্রধান সড়ক, একদিকে চলে গিয়েছে।

গোগোল আর আলেবোকে দেখে অনেক ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এক-এক জায়গায় জমায়েত হয়ে দেখতে লাগল। আবার দু'চারটি খুব বাচ্চা ওদের দেখেই দৌড়ে পালাতে আরম্ভ করল। বড়রাও বেরিয়ে আসতে লাগলেন, আর অবাক চোখে দুজনকে দেখতে লাগলেন। আলেবো নিজের থেকে কারও সঙ্গেই কথা বলল না। বড়রা, মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। গোগোল বুঝতে পারছে, ওদের দেখেই বড়রা কিছু বলাবলি করছেন। ও একটা কথাও বুঝতে পারল না।

বাড়িগুলো সবই কাঠের তৈরি। ঘরের মাথার চালগুলোর কোনো কোনোটা এক রকমের পাতার তৈরি। খড় নয়, অথচ খড়ের মতোই, কিন্তু পাতাগুলো চওড়া। সেই পাতার নীচে বোধহয় বাঁশের সিলিং আছে। কারণ বাঁশ বেরিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কোনোটা হয়তো কাঠ আর বাঁশের শক্ত চাল। টিনও আছে কোনো কোনো ঘরের মাথায়। আর চালের সঙ্গে পাটের মতো কিছু ঝুলছে কোনো কোনো বাড়িতে। এমন বাড়িও চোখে পড়ছে, যার চালা দাঁড়িয়ে আছে পাথরের স্তম্ভের ওপর। কিছু বাড়ির সামনের দিকে নানারকম রং করা। তার মধ্যে নানারকম পশুপাখির ছবি আঁকা। অনেক বাড়ির সামনে গোরু আর মোষ চোখে পড়ছে। মুরগি চরছে সবখানেই। শুয়োরেরও অভাব নেই।

একজন বয়স্ক লোক এগিয়ে এসে, তাঁর ভাষায় কিছু বললেন। গোগোল বুঝতে পারল না। আলেবো হাত তুলে একদিকে দেখিয়ে সেই ভাষাতেই কিছু বলল। কেবল ল্যামচনের নামটা গোগোল শুনতে পেল। লোকটি সে-কথা শুনে বড়দের দলকে কিছু বললেন। ইতিমধ্যেই ছোট ছেলেমেয়ের দল আর কয়েকজন বয়স্ক পুরুষ গোগোলদের পিছনে ভিড় করল।

আলেবো বড়দের দিকে তাকিয়ে, নিজেদের ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল। গোগোল তার মধ্যে কেবল ল্যামচনের নাম আর তেফ্যু শব্দ থেকে বুঝতে পারল, কুকুরের কথা বলছে। বড়রা আলেবোর কথা শুনে, আবার নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করলেন। আলেবো না থেমে, গোগোলের একটা হাত ধরে গ্রামের ভিতরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। বয়স্কদের একটা দল গোগোলদের পিছনে চলেছেন। ছোটরাও সঙ্গ ছাড়েনি। তারা মোটেই পিছনে থাকছে না। সব সময়েই দৌড়ে আগে আগে চলেছে, যাতে গোগোল আর আলেবোকে দেখতে পায়।

বয়স্কদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে, আলেবোর পাশে চলতে চলতে কিছু জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আলেবো তাঁর প্রত্যেকটি কথারই জবাব দিতে লাগল। গোগোল জিজ্ঞেস করল, "আলেবো, এঁদের সঙ্গে তোমার কী কথা হচ্ছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে। এঁরা কি ল্যামচনকে দেখেছেন? ল্যামচনের সঙ্গে কি চিক্কুসকে দেখেছেন?"

আলেবো মাথা নেড়ে জবাব দিল, "না, এঁরা ল্যামচন বা চিক্কুসকে দেখতে পাননি। এঁরা আমার আর তোমার পরিচয় জেনে নিয়েছেন। আর আমার মুখে, ল্যামচনের কথা শুনে সবাই খুব রেগে গেছেন। যিনি আমার পাশে পাশে চলেছেন, ইনি গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্য। উনি বলছেন, ল্যামচন যদি সত্যি এরকম একটা অপরাধ করে থাকে, তবে তাকে ওঁরা শাস্তি দেবেন। কারণ, ওঁরা মনে করছেন, ল্যামচনের এরকম কাজ করা সমস্ত গ্রামের পক্ষে অপমানকর।"

গোগোল আলেবোর কথা শুনে, পঞ্চায়েত সদস্যের মুখের দিকে তাকাল। তাঁর মুখ গম্ভীর হলেও, তিনি গোগোলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ওর কাঁধে হাত দিয়ে, আস্তে একটু চেপে কিছু বললেন। গোগোল কথা না বুঝলেও, এটা বুঝতে পারল, উনি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলছেন।

পথে চলতে চলতে, গ্রামের মহিলা পুরুষরা কাজকর্ম ফেলে, অবাক চোখে গোগোল আলেবোকে দেখছেন। সেই সঙ্গে বয়স্ক আর ছোটদের মিছিল। তাঁরাও চুপ করে থাকছেন না। কিছু জিজ্ঞেস করছেন। আর বড়রা জবাব দিচ্ছেন। তাঁদের জবাবের মধ্যে ল্যামচনের নাম আর তেফ্যু শব্দটা শোনা যাচ্ছে। শুনে সকলেরই ভুরু কুঁচকে উঠছে। তাঁদের মধ্যেও কোনো কোনো পুরুষ গোগোলের সঙ্গ নিচ্ছেন।

গোগোল একটা উত্তেজনা বোধ করছে। আবার চিক্কুসের জন্য ভিতরে ছটফট করছে। হঠাৎ ওর একটা কথা মনে এল। ও আলেবোর কানে কানে জিজ্ঞেস করল, "এঁরা কি কুকুরের মাংস খাওয়া পছন্দ করেন না?"

"তা কেন করবেন না?" আলেবো বলল, "তা বলে একজন বিদেশী অতিথির কুকুর কেউ জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে খাবে, এটা কোনো আঙ্গামিই সহ্য করবে না। এটা হচ্ছে একটা বোকা লোভী লোকের কাণ্ড। এটা কেউ সহ্য করবেন না।"

গোগোলের এতক্ষণে হঠাৎ খেয়াল হল, এই বিশাল গ্রামের উঁচু নিচু পথে, কোথাও একটা কুকুর দেখা যাচ্ছে না। অথচ আজ পর্যন্ত গোগোল যত গ্রামে গিয়েছে, সবখানেই কুকুর দেখেছে। কুকুর ছাড়া গ্রাম দেখাই যায় না। কুকুর নেই, বেড়ালও চোখে পড়ছে না। পাখিদের মধ্যে একমাত্র চড়ুই চোখে পড়ছে। আর চোখে পড়ছে লাউ কুমড়োর মাচা। পেঁপে গাছও দু-চারটে দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো বাড়ির সামনে বাগান। বাগানওয়ালা বাড়ির চেহারা আলাদা। ঠিক প্যাগোডার মতো নয়। চালগুলো টিনের, আর পালিশ করা কাঠের দেওয়াল, দরজা জানালা খুবই সুন্দর। কাঠের ওপর খোদাই করা নানান মূর্তি। নকশা আর ফুল। কিন্তু ল্যামচনের বাড়ি কত দূর? গোগোল না জিজ্ঞেস করে পারল না, "ল্যামচনের বাড়ি কোথায়? অনেক দূরে?"

"খুব বেশি দূরে আর নেই।" আলেবো বলল, "এ গ্রামে চারটে 'খেল' আছে। পুসাত্সুমা খেলের লোক হল ল্যামচন। ওদের তল্লাটে আমরা প্রায় এসে গেছি।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "খেলটা কী?"

"খেল হল এদের অনেকটা গোষ্ঠীভাগের মতো। এরকম চারটে ভাগের লোক এ গ্রামে আছে।" আলেবো বলল, "তুস্তুওনোমা, লেহ্ইসেমা, দাফুত্সুমা আর পুসাত্সুমা।"

গোগোল মনে-মনে উচ্চারণ করতে গিয়ে, কোনোটাই ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারল না। সেটা সম্ভবও নয়। আলেবো জন্ম থেকেই এসব শুনছে। ওর পক্ষে সম্ভব। এদিকে, আলেবো আর গোগোল

পৌঁছুবার আগেই, বড়রা একটি বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ছোটরাও সেখানে ভিড় করেছে। ইতিমধ্যে একজন মহিলা আলেবোর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর বয়স তোশিলির থেকে কিছু বেশি হবে। তাঁর চোখে চশমা, পোশাকও আলাদা। স্কার্টের ওপর গোলাপি রঙের জামা। আলেবোর মুখ থেকে সব শুনে, তিনি ইংরেজিতে বলে উঠলেন, "হে খ্রীষ্ট ! ল্যামচনটা এমন কাজও করতে পারে ?"

যে-বাড়িটার সামনে সবাই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার দরজা বন্ধ। আলেবো গোগোলকে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে বলল, "এটাই ল্যামচনের বাড়ি।"

আশেপাশের বাড়ি থেকে মহিলা পুরুষ কয়েকজন বোধহয় এলেন। পঞ্চায়েত সদস্য তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরাও অবাক চোখে তাকিয়ে জবাব দিলেন। আলেবো বলে উঠল, "ল্যামচনের বউ আর ছেলেরা জমি চাষ করতে গেছে। কিন্তু সর্বনাশ বোধহয় হয়ে গেছে।"

আলেবোর স্বরে এমন ভয় আর হতাশা ফুটে উঠল, গোগোলের বুকে যেন হাজারটা ঢাক বেজে উঠল। দম আটকানো স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে আলেবো ? চিক্কুসকে কি ল্যামচন— ?"

গোগোল শেষ কথাটা উচ্চারণ করতে পারল না। আলেবো বলল, "সেটা কেউ বলতে পারছেন না। তবে ল্যামচনকে ওঁরা দেখেছেন। ওর শালের আড়ালে কিছু ছিল, সেটা ওঁরা বুঝতে পেরেছেন, তবে চিক্কুসকে তাঁরা দেখতে পাননি। ঘরে তালা লাগানো ছিল না। এখানে কেউ ঘরে তালা লাগিয়ে বেরোয় না, কারণ এখানে চুরি-টুরি কিছুই হয় না। ল্যামচন দরজা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল। তারপরে একটা ছোট দা নিয়ে সে আবার বেরিয়ে গেছে।"

গোগোলের চোখের সামনে ভেসে উঠল, রক্তাক্ত চিক্কুসের চেহারা। ও দু হাতে মুখ ঢাকল। গোগোলের মতো সাহসী ছেলে এই প্রথম দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আলেবোর মুখের অবস্থাও ভাল না। গোগোলকে কেঁদে উঠতে দেখে, ওরও গলার কাছে কান্না ঠেলে এল। ঘুম থেকে উঠেই দু'জনে ছ' কিলোমিটারের ওপর পাহাড়ি রাস্তা ভেঙে ছুটে এসেছে। চোখে মুখে জল দেয়নি। সামান্য একটা বিস্কুট পর্যন্ত খায়নি। তার ওপরে এই ভয়ানক দুঃসংবাদ !

বড়রা তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। পঞ্চায়েত সদস্য যিনি, তিনি সবাইকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। আর কয়েকজনের এক-একটা দল নানা দিকে ছুটতে লাগলেন। তাদের সঙ্গে ছোটরাও সঙ্গ নিচ্ছে।

সেই মহিলা এগিয়ে এসে গোগোলকে দু হাতে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, "গোগোল, তুমি এমন করে ভেঙে পোড়ো না। গ্রামের লোকেরা ল্যামচনকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁরা ওকে খুঁজে বের করবেনই। ও কোথাও পালিয়ে থাকতে পারবে না।"

"কিন্তু ল্যামচন যদি তার আগেই চিক্কুসকে মেরে ফেলে ?" আলেবোর গলাও ধরে এল। মহিলা আলেবোকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "আমি ভগবান যিশুর কাছে প্রার্থনা করছি, এমন সর্বনাশ ঘটবার আগেই যেন ল্যামচন ধরা পড়ে যায়। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, সেই ভোরে তোমরা শহর থেকে ছুটে এসেছ। এখন বেলা ন'টা বাজতে চলেছে। তোমরা নিশ্চয় কিছু খেয়ে বেরোওনি। ওঁরা ল্যামচনকে খুঁজে বের করুন। তোমরা ততক্ষণে আমার বাড়িতে বসে একটু কিছু খেয়ে নাও।"

"না না, আমি কিছুই খেতে পারব না।" গোগোল কান্নার স্বরে বলল, "আন্টি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। চিক্কুসের কী হয়েছে, যতক্ষণ জানতে না পারছি, ততক্ষণ আমি এক গেলাস জলও খেতে পারব না।"

গোগোলের ভেজা চোখ আর মুখ লাল। আলেবোর মুখ তো লাল টোমাটোর মতো হয়ে গিয়েছে। মহিলা গোগোলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলেন। তাঁর করুণ মুখে দুঃখের হাসি ফুটল। বললেন, "হ্যাঁ, গোগোল, আমি তোমাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ল্যামচন কোন্ দিকে গেছে, সেটা আমি শুনেছি। তবে বোকা পাগলটা সেদিকেই গেছে, নাকি অন্য দিকে চলে গেছে, তা কেউ বলতে পারে না। তাহলে চলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই। তার আগে এখানে দাঁড়িয়েই তোমরা দুটো বিস্কুট আর জল খেয়ে নাও। এটা আমার নির্দেশ। দু মিনিট দেরিতে নতুন কিছু ঘটবে না। যা ঘটবার তাই ঘটবে।"

বলেই তিনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মেয়েকে তাঁর নিজের ভাষায় কিছু বললেন। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ ভোঁ দৌড় দিল। পঞ্চায়েত-সদস্য এগিয়ে মহিলাকে কিছু বললেন। তিনিও ঘাড় বাঁকিয়ে কিছু বললেন। দু' জনের মধ্যে মিনিট খানেক কথা হল। তার মধ্যেই সেই মেয়েটি ছুটে এল। ওর হাতে বিস্কুটের প্যাকেট। আর একজন গ্রামের মহিলা দুটো কাঁচের গেলাসে জল নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। আন্টি নিজে বিস্কুটের প্যাকেট খুলে, গোগোলের মুখের সামনে বিস্কুট ধরলেন, "খাও, খেয়ে নাও।"

বলতে গেলে, তিনি একরকম জোর করেই গোগোল আর আলেবোর মুখে বিস্কুট গুঁজে দিলেন। শুকনো গলা দিয়ে বিস্কুট গলতে চাইছিল না। গোগোল অন্য মহিলার হাত থেকে জলের গেলাস নিয়ে চোঁ চোঁ চুমুক দিল। আলেবোও তাই করল। মহিলা বললেন, "এবার চলো, আমরাও ল্যামচনকে খুঁজতে বেরোই।"

গোগোল আর আলেবোকে মনে মনে স্বীকার করতে হল, এখন ওরা যেন শরীরে একটু জোর পাচ্ছে। তবে গোগোলের প্রাণটাই যেন গলার কাছে এসে ঠেকে আছে। গোগোল আলেবোকে জিজ্ঞেস করল, "আন্টির নাম কি তুমি জানো ?"

"জানি।" আলেবো বলল, "উনি লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের টিচার মিস উজেইলি আ আঙ্গামি। আমরা ওঁকে সিস্টার উজেইলি বলে ডাকি।"

সিস্টার উজেইলি গোগোলরা যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে চললেন। সঙ্গে পঞ্চায়েত-সদস্যও আছেন। সিস্টার উজেইলি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "আলেবো, তুমি গোগোলকে কী বলছ ?"

"আমি ওকে আপনার পরিচয় দিচ্ছিলাম।" আলেবো লজ্জা পেয়ে হেসে বলল।

সিস্টার উজেইলি গোগোল আর আলেবোকে দু'পাশে নিয়ে বেশ জোরে হাঁটতে লাগলেন। কিছুটা গিয়ে, পিছন ফিরে পঞ্চায়েত-সদস্যকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। সদস্য একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলেন। সিস্টার একটা মোড়ে এসে, বাঁ দিকের রাস্তায় চললেন। রাস্তাটা কাঁকর-পাথরের হলেও বেশ চওড়া। প্রত্যেক বাড়ি থেকেই গ্রামবাসীরা গোগোলদের দেখছিল। বেশ বোঝা যায়, খবরটা গোটা গ্রামে রটে গিয়েছে।

রাস্তাটা বাঁ দিকে গিয়ে, আবার ডান দিকে উঁচুতে উঠেছে। কিছুটা যাবার পরেই, গোগোলের বয়সী একটি ছেলেকে উলটো দিক থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল। দেখে মনে হল সে গরিব আর গ্রাম্য ছেলে। ময়লা হাফপ্যান্টের ওপর, বুকখোলা একটা কাঁধ-কাটা জামা ওর গায়ে। ও ছুটে এসে, বড় বড় চোখ করে, খুব তাড়াতাড়ি কিছু বলল। সিস্টারও রুদ্ধশ্বাস গলায় ওকে আরও কিছু জিজ্ঞেস করলেন। আলেবো গোগোলের হাত টেনে ধরে বলল, "গোগোল, ল্যামচনকে দেখা গেছে। তার সঙ্গে চিক্কুসকেও।"

"চিক্কুসকেও ?" গোগোল প্রায় চিৎকার করে উঠল, "চিক্কুস বেঁচে আছে ?"

সিস্টার প্রায় দৌড়তে আরম্ভ করলেন। বললেন, "হ্যাঁ, চিক্কুস এখনো বেঁচে আছে। ল্যামচন যে ওরকম জায়গায় যেতে পারে, ভাবাই যায় না।"

আলেবো গোগোলের হাত ধরে, সিস্টারকে ছাড়িয়ে দৌড়তে লাগল। বলল, "বোকাটা নিশ্চয় সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে ভেবেছিল। ভাগ্যিস এখনো চিক্কুসকে মারেনি। মনে হয়, ও টের পেয়ে গেছে, গ্রামের লোক সবাই ওর পেছনে তাড়া করেছে। আর সেই ভয়েই হয়তো এখনো চিক্কুসকে মারেনি।"

"কিন্তু ও তো বোকা আর লোভী।" গোগোল বলল, "যে-কোনো মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারে। তাই না ?"

আলেবো বলল, "তা পারে। তবে আমরা প্রায় সেখানে এসে গেছি। আসলে জায়গাটা তো গ্রামে ঢোকবার মুখের সামনেই। ডেকাচাং ঘরে ও ঢুকেছে।"

"ডেকাচাং ঘরটা কী ?" গোগোল জিজ্ঞেস করল। ভাবল ডেকাচাং ঘরের সঙ্গে মরার ঘরের কোনো যোগ আছে কি না।

অ=অজগর আসছে তেড়ে ম=মিলকোজ খেলে শক্তি বাড়ে

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

মা মাসি ঠাকুমা দিদিমা যখন পেছন পেছন দুধের গ্লাস নিয়ে ছুটে বেড়ান তখন তোমরা একটা না একটা ছুতো করে সরে পড়বার চেষ্টা কর কেন বলতো ? আমি বলবো ? আসলে দুধ খেতে তোমাদের একদম ভাল লাগে না । তাই না ? তাই যতই গুরুজনেরা বলুন না কেন যে দুধ খেলে গায়ে জোর হবে তোমরা তা কানেই নাও না ।

বইয়েও তো পড়েছ তোমরা দুধ হচ্ছে সম্পূর্ণ খাদ্য। এতে আছে জল (সে তো বুঝতেই পার), স্নেহজাতীয় পদার্থ—ইংরেজিতে যাকে বলে ফ্যাট (দুধের ওপর যেটা সরের মত ভেসে থাকে,), প্রোটিন, চিনি এবং লবণ । দুধের প্রোটিনের মধ্যে আছে সব রকমের এমিনো এসিড । তাছাড়া আছে ফসফরাস (যাতে চোখের দৃষ্টি ভাল করে) এবং ক্যালসিয়াম (হাড় মজবুত করার প্রধান উপাদান) । ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলতে কি বোঝায় তাও তো ভাল করেই জান তোমরা । সেই ভিটামিনের এ বি (বি২ বি২ সমেত) সি ডি ই কে সবই আছে দুধে । **তাই শরীর গঠনের জন্য শুধু মানুষ নয় পৃথিবীর সবরকমের স্তন্যপায়ী প্রাণীই শৈশবে নির্ভর করে একমাত্র দুধের ওপর ।** বাছুর, কুকুর ছানা, বেড়ালের বাচ্চা, কে নয় । শিশু অবস্থায় প্রাণীরা অন্য খাবার খেতে পারে না—হজম করতে পারে না । **তাই প্রকৃতি মাতৃদেহে সহজ পাচ্য দুধের ভাণ্ডার গড়ে দেয় । যার ওপর নির্ভর করে সেই শিশুরা বড় হয় ।**

কিন্তু তোমরা বলবে, আমাদের দুধ সহ্য হয় না পেটে । বাজার থেকে কিনো আনা দুধ খেলেই পেট ভুটভাট করে । ভারী ভারী লাগে । সেটা হতে পারে । কারণ কি জান ? দুধে যে স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে সেটা হজম করা বেশ কঠিন । দেখে থাকবে দুধের ওপরে সর পড়ে, সেই সরের মধ্যেই আছে স্নেহজাতীয় পদার্থ । তার থেকে তৈরি হয় মাখন ঘি এইসব । আবার দুধ ঠাণ্ডা করলেও ওপরে ভেসে ওঠে ননী । দুধকে ভাল করে মন্থন করলে এই স্নেহজাতীয় জিনিসটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায় । কিন্তু একে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দুধ পান করলে শরীর গঠনের কাজে সে আর তেমন লাগতে পারে না । তাই এমন একটা উপায় বার করা দরকার যাতে এই স্নেহজাতীয় পদার্থ দুধের মধ্যে বর্তমান থাকে অথচ সহজে একে হজম করা যায় ।

আর একটা কথা দুধ একটু বেশি সময় থাকলেই টকে যায় বা ছানা কেটে নষ্ট হয়ে যায় লক্ষ্য

করেছ নিশ্চয়ই । কেন জান কি ? দুধের মধ্যে প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ কোটি কিটি জীবাণু তৈরি হচ্ছে । তারা দুধটাকে সুযোগ পেলেই নষ্ট করে দেয় । এমনিতেই আমাদের চারদিকের জল হাওয়া এমন দুষিত যে গরু বা মোষের দুধের মধ্যে তার প্রভাব থাকে । দুধকে ফুটিয়ে রাখলে দুধটা কিছুক্ষণের জন্য ঐসব জীবাণুর হাত থেকে রেহাই পায় । কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরেই আবার তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে । তাই দুধকে সরাসরি না খেয়ে জীবাণুমুক্ত করে খাওয়াই উচিত । ইওরোপ এবং আমেরিকায় জীবাণুমুক্ত না করে দুধ বিক্রি করা যায় না বাজারে । সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত না করলে দুধকে বোতলে ভরে রাখা অসম্ভব । সে নষ্ট হয়ে যাবেই ।

মিলকোজ দেখেছ তোমরা ঠাণ্ডা পাণীয়ের দোকানে ? মিলকোজ কিন্তু বোতলে ভরা দুধ ছাড়া কিছুই নয় । তবে হ্যাঁ মিলকোজ যাঁরা তৈরি করেন সেই ইস্টার্ণ মিল্ক ফুডস সব দিকে সতর্ক ব্যবস্থা নিয়েই একাজে নেমেছেন । প্রথমত, এঁরা দুধের ভেতরের স্নেহপদার্থ যাতে শরীর খারাপ না করতে পারে তাই সেই স্নেহপদার্থকে এমন সমানভাবে সারা দুধের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যে সেই স্নেহপদার্থের সাধ্যই নেই পেটের মধ্যে গিয়ে উৎপাত সৃষ্টি করে । ইংরেজিতে এই প্রক্রিয়াকে বলে হোমোজেনাইজেশন । পৃথিবীর সর্বত্রই এটা চালু । ভারতের পূর্বাঞ্চলে মিলকোজই সর্বপ্রথম এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ।

তারপর জীবাণুমুক্তি । জীবাণুকুলকে যদি একটা নির্দিষ্ট সময় অবধি অবশ করে রাখা যায় তবে সেই সময় পর্যন্ত তাদের দুধকে নষ্ট করে দেবার ক্ষমতা থাকে না । একে বলে পাস্তুরাইজড দুধ । বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের নাম অনুসারেই এই শব্দটির প্রচলন । কিন্তু এই পাস্তুরাইজড বা জীবাণুমুক্ত দুধ তো বোতলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভরে রাখা যায় না । ঐ জীবাণুগুলোর বীজ রয়ে যায় তো । তারাই দুধটাকে নষ্ট করে দেবে । তাই এই বীজাণুগুলোকে ধ্বংস করার দরকার । মিলকোজ তৈরি হবার আগে ক্রমাগত নির্দিষ্ট তাপমাত্রার মধ্যদিয়ে যায় । ফলে ঘটে সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্তি বা স্টেরিলাইজেশন । তাই দিনের পর দিন দোকানে বা বাড়িতে পড়ে থাকলেও নষ্ট হয় না মিলকোজ । কিন্তু এত কথা বলেও তোমাদের মন ভেজাতে পারলাম না তো ?

দুধের গন্ধটা তোমাদের আসল আপত্তির কারণ । তবে শুনে রাখো । মিলকোজের গন্ধটা একদম মালাইয়ের । নাকের কাছে আনলেই খেতে ইচ্ছে করবে । আর রঙ ? সেটা অনেকটা চা বা কফির মত । কি ? এবার মিলকোজ খেতে কোনও আপত্তি নেই তো ?

ও আর একটা কথা । মিলকোজ যাঁরা তৈরি করেন সেই বাঙালী যুবকরা আরও একটা কোম্পানি খুলেছেন । সেখানে তৈরি হয় আইসক্রিম সোডা, অরেঞ্জ এসব ঠাণ্ডা পাণীয় । নাম থ্রি চীয়ার্স । দারুণ খেতে । একবার চেখে দেখ শুধু যে আবার খেতে ইচ্ছে করবে তা নয় । গলা ছেড়ে জয়গান করতে ইচ্ছে করবে থ্রি চীয়ার্স এর । আর তোমাদের যদি ভোটের অধিকার থাকত তো সবাই এক বাক্যে ভোট দিতে থ্রি চীয়ার্সকে ।

তাই : সবাই মিলে শ্লোগান দাও ।
থ্রি চীয়ার্সকে ভোট দাও ॥

আলেবো বলল, "ওটা হল যুবকদের ডরমিটরি। অনেক সময় বাইরের অতিথিদেরও সেখানে থাকতে দেওয়া হয়। ঐ ঘরকে আঙ্গামি ভাষায় ডেকাচাং বলে। মরংও বলে অনেকে।"

মরং শুনে গোগোলের আরও ভয় হল। মরংয়ের সঙ্গে মরাই তো মিলে যাচ্ছে! আসলে গোগোলও এখন বোকা হয়ে গিয়েছে। নাগা ভাষার সঙ্গে বাংলা শব্দের যে কোনো মিল নেই তা ও ভাবতেই পারছে না। ইতিমধ্যে সেই ছেলেটিও ওদের পাশে এসে গিয়েছে, যে ল্যামচনের খবর নিয়ে এসেছিল। আলেবো ওকে আঙ্গামি ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের ভাষায় জবাব দিল। গোগোল ছুটতে ছুটতে জিজ্ঞেস করল, "ও কী বলছে?"

"আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও নিজের চোখে ল্যামচন আর চিক্কুসকে দেখেছে কি না।" আলেবো বলল, "ও বলছে, হ্যাঁ, নিজের চোখেই দেখেছে। ল্যামচন সেই ঘরটায় যখন ঢুকছিল, তখনই ও দেখেছে। ল্যামচনের হাতে ছোট দা'ও ছিল।"

গোগোলের আশার প্রাণে আবার ভয়ের বিদ্যুৎ খেলে গেল। চিক্কুসকে নিয়ে ল্যামচনের ঘরে ঢোকার মানে কী? ও জিজ্ঞেস করল, "সেই ঘরে নিশ্চয় লোক আছে?"

"তা থাকলে ল্যামচন ও ঘরে ঢুকবে কেন?" আলেবো বলল, "ডেকাচাংয়ের ছেলেরা নিশ্চয় চাষের মাঠে গেছে। সে-ঘর খালি বলেই ল্যামচন সেখানে ঢুকেছে।"

শেষ মুহূর্তে এসে গোগোলের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। ল্যামচন চিক্কুসকে মারার জন্য একটা নিরিবিলি খালি ঘর নিশ্চয় খুঁজছিল। কিন্তু তা কী করে হবে। ল্যামচনের নিজের বাড়িই তো খালি ছিল। বউ ছেলেরা কেউ ঘরে ছিল না। তবে এমন কি হতে পারে না, ও সেখানে থাকতে সাহস পায়নি?

"এসে গেছি।" আলেবো হাত তুলে দেখাল, "ওইটা ডেকাচাং।"

গোগোল দেখল বিরাট একটা ঘর। যার পিলারগুলো সবই এবড়ো-খেবড়ো পাথরের। চার দিকে বাঁশ পুঁতে খাড়া করা। ঘরটার চাল থেকে সাদা চুলের জটার মতো, অনেকগুলো লম্বা জটা ঝুলছে। ল্যামচন কি এখনও ঐ ঘরের মধ্যে আছে? জ্যান্ত আছে চিক্কুস?

ওরা ঘরটার সামনে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই, ল্যামচন বেরিয়ে এল। ফ্যাকাসে লাল শালটা এখন ওর কাঁধে ঝুলছে। হাতে সাদা লোমের দলার মতো চিক্কুস। বেঁচে আছে কি না, বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর হাতে দা নেই। আর ওর মুখটা হাঁ করা, জিভ বেরিয়ে পড়েছে। ওদের দেখেই ল্যামচন লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে, বাঁ দিকে ছুটল। সেদিকে উঁচু একটা টিনের-চাল-ঢাকা দাওয়া। আলেবো ছেলেটাকে আঙ্গামি ভাষায় কিছু বলল। ছেলেটা বাঁ দিকে না গিয়ে ডান দিকে ছুটল। আলেবো আর গোগোল বাঁ দিকে।

ল্যামচন সেই উঁচু-দাওয়া চালাটার সামনে একবার দাঁড়াল। আলেবো চিৎকার করে কিছু বলল। ল্যামচন শুনল বলে মনে হল না। ও উঁচু-দাওয়া চালাটার পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। আলেবো বলল, "ও সংকুংয়ে উঠে পড়ল।"

"সংকুং কী?" গোগোল ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল।

আলেবো বলল, "ড্রাম। গেলেই দেখতে পাবে। কিন্তু ও ওখানে উঠল কেন?"

গোগোলের গায়ে যেন নতুন জোর এল। ও সকলের আগে সেই চালার কাছে গিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল। আলেবো চিৎকার করে উঠল, "গোগোল, সাবধান, ও-বোকা পাগলটাকে কিছু বিশ্বাস নেই।"

কিন্তু ল্যামচন কোথায়? গোগোল দেখল, বিরাট ঢেঁকির মতো একটা মোটা কাঠ। কাঠের ফ্রেমের ওপর দাঁড় করানো। গোগোল সেটার ওপরে উঠে, উঁকি দিতেই দেখল, ল্যামচন মাথা নিচু করে বসে আছে। হাতে সেই সাদা লোমের ড্যালা। ও কিছু ভাবতে পারল না। এক লাফে ল্যামচনের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ল্যামচন বোধহয় ঠিক এমনটা আশা করেনি। যথেষ্ট শক্ত শরীর হলেও, গোগোলের শরীরের ধাক্কায় সে কাত হয়ে পড়ে গেল। আর চিক্কুস ডেকে উঠল, "কেঁউ!"

চিক্কুস বেঁচে আছে! গোগোলের গা'টা আনন্দে শিউরে উঠল। ও চিক্কুসকে চট করে দু হাতে তুলে নিল। ইতিমধ্যে আলেবো আর সেই ছেলেটিও এসে গেছে। পাছে ল্যামচন উঠে, আবার চিক্কুসকে কেড়ে নেয়, সেই ভয়ে গোগোল চিক্কুসকে আলেবোর হাতে দিয়ে দিল। আলেবো সেই বিরাট ঢেঁকির ওপাশ থেকে, চিক্কুসকে তুলে নিয়েই চিৎকার করে উঠল, "চিক্কুস্ বেঁচে আছে!"

অন্য ছেলেটি সেই ঢেঁকি টপকে, লাফিয়ে পড়ল ল্যামচনের ওপর। ল্যামচন সেই যে কাত হয়ে পড়েছে, আর উঠবার নাম নেই। ইতিমধ্যে কেবল সিসটার উজেইলি আর পঞ্চায়েত-সদস্যই নন, তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে সেখানে এসে গিয়েছেন।

গোগোল তখন সেই ঢেঁকিটা টপকাবার চেষ্টা করছে। প্রথমে বেশ সহজেই টপকাতে পেরেছিল। এখন কষ্ট হচ্ছে। বলল, "আলেবো, এখানে এই ঢেঁকিটা কিসের?"

"ওটা ঢেঁকি নয়, সংকুং—মানে ড্রাম।" আলেবো বলল, "এটা একটা বড় গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি, ভেতরটা ফাঁপা করা। ডিজাইনটা অনেকটা নৌকোর মতো, ভাল করে দেখলে বুঝবে। ওটার মাঝখানে মোটা কাঠের হাতুড়ির মতো জিনিস দিয়ে বাজালে দুম্ দুম্ শব্দ হয়। বহুদূর থেকে শোনা যায়।"

গোগোল কোনোরকমে সংকুং ডিঙিয়ে এপারে এল। চিক্কুসকে কোলে তুলে নিল। চিক্কুসের সেই ফুর্তি বা লাফঝাঁপ নেই। কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। কেবল একবার কোনোরকমে গোগোলের গাল চেটে দিল। গোগোল সিসটার উজেইলিকে বলল, "সিসটার, এখনই চিক্কুসকে একটু জল আর দুধ না দিলে বোধহয় মরে যাবে।"

সিসটার উজেইলি একজনকে কী যেন বললেন। সে তৎক্ষণাৎ ছুটল। তিনি বললেন, "গোগোল, তুমি আর আলেবো নীচে নেমে এসো।"

ওরা দুজনেই নীচে নেমে এল। সিসটার একবার চিক্কুসের গায়ে হাত দিলেন। তাঁর চোখে জল। তিনি দুই কাঁধে ও কপালে আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, "হে খ্রীষ্ট, তোমার অপার করুণায় এই ছোট জীবটি রক্ষা পেয়েছে।"

গোগোল নিজেই জানে না, ওর চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে। আলেবোর চোখও শুকনো নেই। ইতিমধ্যে সেখানে শত শত লোক জমতে আরম্ভ করেছে। আর চিৎকার করছে। সংকুংয়ের চালায় সেই ছেলেটি ল্যামচনকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

একজন একটা পাত্রে জল নিয়ে এল। চিক্কুসের সামনে ধরতেই, ও চুকচুক করে জল খেতে লাগল। সবাই আনন্দে হেসে উঠল, আর নিজেদের ভাষায় কিছু বলতে লাগল। পঞ্চায়েত-সদস্য সংকুংয়ের উঁচু দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালেন। সমবেত মহিলা পুরুষ ছোট ছেলে মেয়েদের উদ্দেশে তিনি চিৎকার করে কিছু বলতে লাগলেন।

সিসটার উজেইলি বললন, "গোগোল, এখানে দুধ পাওয়া একটু মুশকিল আছে। জল খেয়ে ও বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। জলে ভিজিয়ে ওকে একটা বিস্কুট খাওয়ালে কেমন হয়?"

গোগোল বলল, "ভালই হয়।"

সিসটারের হাতেই ছিল বিস্কুটের সেই প্যাকেট। তিনি বিস্কুট বের করে দিলেন। গোগোল জলে ভিজিয়ে বিস্কুট ধরল মুখের কাছে। চিক্কুস ওর লাল ছোট জিভ আর দাঁত দিয়ে তাই খেতে লাগল। পঞ্চায়েত-সদস্য তখনও চিৎকার করে বলে চলেছেন। সবাই তখন সংকুং ঘিরে ফেলেছে। সবাই চিৎকার করছে। গোগোল তার মধ্যে কেবল ল্যামচন আর তেরহমের নামটা বুঝতে পারছে। তেরহম হলেন সেই অপরাধীর প্রাণবধকারী ঈশ্বর।

পঞ্চায়েত-সদস্য সিসটার উজেইলিকে কিছু বললেন। আলেবো তখন গোগোলকে বলছে, "পঞ্চায়েত-সদস্য বলছেন, আগেকার দিনের মতো শাস্তি দিয়ে লাভ নেই। তাহলে সাত বছরের জন্য ল্যামচনের গ্রামে ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হত। কিন্তু ওর তাতে কিছুই হবে না। তাই ঠিক হয়েছে, গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে, ল্যামচনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে, আর বলা হবে, ওকে যেন সাত বছর জেলে রাখা হয়।"

গোগোল দেখল, ল্যামচন যেন একটা কাঠের পুতুল। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চেরা চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না, ও কিছু দেখছে কি না। কিন্তু ওর দা'টা কোথায় গেল? গোগোলের এই ভেবেও অবাক

লাগছে, এতক্ষণ ও চিক্কুসকে মারেনি কেন ?

সিসটার উজেইলি বললেন, "গোগোল, তুমি আর আলেবো সংকুংয়ের কাছে গিয়ে উঠে দাঁড়াও। তুমি সবাইকে কিছু বলো, আলেবো তা আঙ্গামি ভাষায় তর্জমা করে দেবে। তবে তার আগে, সবাই ল্যামচনের মুখ থেকে তার অপরাধ স্বীকার করা শুনতে চায়।"

গোগোলরা ওঠবার আগেই, ল্যামচন বিড়বিড় করে কী বলল। সেই ছেলেটি চিৎকার করে সবাইকে তা শোনাল। এক সঙ্গে বহু লোক রাগত স্বরে চিৎকার করে উঠল। আলেবো হাসতে হাসতে বলল, "গোগোল, ল্যামচন কী বলছে জানো ? ও নাকি চিক্কুসকে খাবার জন্য আনেনি। ওকে মারতেও চায়নি। ও নাকি চিক্কুসকে খুব ভালবেসে ফেলেছে, তাই ওকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে এসেছে।"

গোগোল ল্যামচনের দিকে তাকাল। ওর কথা কি বিশ্বাস করা যায় ? ও তো বোকা আর লোভী। বোকা আর লোভী কি এরকম মিথ্যে তৈরি করতে পারে ? কিন্তু ল্যামচনের মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। গোগোল সংকুংয়ের দিকে যেতে যেতে আলেবোকে জিজ্ঞেস করল, "ল্যামচনের কথা শুনে সবাই কী বলছে ?"

"সবাই ওর কথা শুনে রেগে যাচ্ছে।" আলেবো বলল, "গ্রামের সবাই বলছে, ও একটা মিথ্যুক, আমাদের গ্রামের নাম ডুবিয়েছে।"

গোগোল জিজ্ঞেস করল, "তোমার কী মনে হয় ? ল্যামচন মিথ্যে কথা বলছে ?"

"নিশ্চয়ই।" আলেবো জোর দিয়ে বলল, "শাস্তি পাবার ভয়ে ও এখন মিথ্যে কথা বলছে।"

গোগোলের কোলে চিক্কুস। জল বিস্কুট খেয়ে এখন অনেকটা তাজা হয়েছে। মাঝে-মাঝেই মুখ তুলে গোগোলের গলা চিক্কুস চেটে দিচ্ছে। থাবা দিয়ে বুক ঘষে দিচ্ছে। গোগোল বলল, "কিন্তু একটা কথা আলেবো। ল্যামচন এতক্ষণ চিক্কুসকে হাতে পেয়েছিল। ইচ্ছে করলে, রাস্তায় আসতে আসতেই ও চিক্কুসের গলা টিপে মেরে ফেলতে পারত। দা দিয়ে এতক্ষণ কেটে ফেলতেও পারত। সেই ভয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। ও কিন্তু তা করেনি।"

"তুমি কী বলতে চাও ?" আলেবো অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, "ল্যামচন সত্যি কথা বলছে ? চিক্কুসকে ভালবাসে বলে, ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ?"

গোগোল বলল, "তা আমি জানিনে। আমার খালি এটাই মনে হচ্ছে, ল্যামচন ইচ্ছে করলে চিক্কুসকে মেরে ফেলতে পারত। অথচ মারেনি। তুমি বলবে, ও গ্রামের লোকের ভয়ে মারেনি। বোকাদের ভয়ও নেই, সত্যিকারের সাহসও নেই। ও যে চিক্কুসকে মারেনি, এতেই আমি যেন ল্যামচনকে ভালবেসে ফেলছি।"

আলেবো অবাক চোখে গোগোলের দিকে তাকিয়ে রইল। সিসটার উজেইলি এসে ওদের সংকুংয়ের সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "তোমরা তাড়াতাড়ি যাও। সবাই তোমাদের কথা শুনতে চাইছে।"

গোগোল আর আলেবো পাথরের সিঁড়ি ভেঙে সংকুংয়ের উঁচু দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। ওদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন পঞ্চায়েত-সদস্য। সংকুংয়ের পিছনে ল্যামচন আর সেই ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে। গোগোলের সঙ্গে ল্যামচনের চোখাচোখি হল। ল্যামচন হাসল।

গোগোল সামনে তাকিয়ে দেখল, রাস্তার ওপরে, বাড়িগুলোর ধারে-ধারে কেবল মানুষের মাথা। সকলেই ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। গোগোল কথা বলতে গেল। কিন্তু ওর গলা দিয়ে কথা বেরোল না। এত লোক কী করে ওর কথা শুনতে পাবে ? অথচ ওর খুব আনন্দও হচ্ছে। ও চিক্কুসকে দু হাতে তুলে ধরে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, "আমি চিক্কুসকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সব থেকে আনন্দের কথা।"

আলেবো চিৎকার করে গোগোলের কথাগুলো আঙ্গামি ভাষায় বলল। সবাই হাসতে হাসতে হাততালি দিয়ে উঠল। ঠিক এই সময়েই একটা জিপ আর একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি গ্রামের জনতার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। দেখা গেল মিঃ ও মিসেস হারালু, বাবা মা, জটুমামা, কুমভো আর তোশিলি, সব গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। গ্রামের লোকেরা সেদিকে একবার দেখল। আবার গোগোলের দিকে তাকাল।

গোগোল চিৎকার করে বলল, "আপনাদের মতো ভদ্র আর ভাল মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। আপনাদের ভালবাসার কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।"

আলেবো চিৎকার করে গোগোলের কথাগুলো আবার অনুবাদ করে বলল। সকলে এবার আরও জোরে চিৎকার করে, হেসে হাততালি দিল। গোগোল দেখল মিঃ হারালুর পিছনে বাবা মা সবাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছেন। গোগোল আবার বলল, "আপনাদের জন্যই আমি চিক্কুসকে ফিরে পেয়েছি।"

আলেবো অনুবাদ করে কথা বলতে না বলতেই আবার চিৎকার হাসি ও হাততালি। সবাই থামবার পরে গোগোল আবার বলল "আপনারা ল্যামচনকে শাস্তি দিতে চান। কিন্তু আপনাদের আমি একটা কথা বলতে চাই। ল্যামচন সত্যি চিক্কুসকে ভালবাসে কি না জানিনে। তবে সে ইচ্ছে করলে চিক্কুসকে মেরে ফেলতে পারত। তা সে মারেনি।"

আলেবো গোগোলের কথাগুলো আঙ্গামি ভাষায় চিৎকার করে বলল। সকলেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু করে দিল। বোঝা যাচ্ছে, কথাটা সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে। আর নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কও করছে। পাশ থেকে পঞ্চায়েত-সদস্য চিৎকার করে কিছু বললেন। আলেবো গোগোলকে বলল, "উনি বলছেন, গোগোল তা হলে কী বলতে চায়, আমরা সেটাই শুনি।"

গোগোল আবার দু হাতে চিক্কুসকে তুলে ধরে চিৎকার করে বলল, "আপনাদের চেষ্টাতে চিক্কুসকে ফিরে পাওয়া গেছে। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা ল্যামচনকে ক্ষমা করুন।"

এই কথা বলবার সময় গোগোলের চোখে জল এসে পড়ল। বিরাট জনতা রেগে চিৎকার করে কিছু বলতে লাগল। এই সময়ে, সিসটার উজেইলি ছুটে সংকুংয়ের দাওয়ায় উঠে এলেন। সবাই চুপ করে গেল। সিসটার উজেইলি চিৎকার করে আঙ্গামি ভাষায় বেশ কয়েকটি কথা বললেন। আলেবো সেটা গোগোলকে অনুবাদ করে শোনাল, "উনি বলছেন, আমি মনে করি গোগোল ছেলেমানুষ হলেও, ও ঠিক কথাই বলেছে। চিক্কুসকে যখন ফিরে পাওয়া গেছে, তখন ল্যামচনকে ক্ষমা করাই উচিত। ক্ষমাই মানুষের ধর্ম। তবে আমি বলব, ল্যামচন সমস্ত গ্রামবাসীর সামনে ওর অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবে।"

জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কেউ কেউ চিৎকার করেও কিছু বলল। সিসটার উজেইলি ল্যামচনকে কাছে এগিয়ে আসতে বললেন। ল্যামচন এগিয়ে এল। দু হাত তুলে চিৎকার করে যা বলল, আলেবো গোগোলকে তা অনুবাদ করে শোনাল, "ল্যামচন বলছে, আমি অন্যায় করেছি। আর কখনো এমন অন্যায় করব না। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।"

জনতা চিৎকার করে কিছু বলতে লাগল আর হাসতে লাগল। সিসটার উজেইলি গোগোলের গাল টিপে আদর করে বললেন, "গোগোল, ভগবান যিশু তোমার ভাল করুন। তুমি খাঁটি মানুষের কথা বলেছ।"

মিঃ হারালুর পিছনে বাবা মা সবাই এসে সংকুংয়ের নীচে দাঁড়িয়েছেন। মা হাসছেন, কিন্তু তাঁর চোখে জল। বাবা অনেকটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। মিঃ আর মিসেস হারালুও তাই। সিসটার উজেইলি গোগোল আর আলেবোকে ধরে নীচে নেমে এলেন। জনতা ওদের চারপাশে এসে জমা হল। মা একবার চিক্কুসের গায়ে হাত ছোঁয়ালেন। জনতা তখন একসঙ্গে চিৎকার করে কী বলছে।

আলেবো বলল, "ওঁরা বলছেন, গোগোল আলেবো দীর্ঘজীবী হোক। চিক্কুস দীর্ঘজীবী হোক।"

জটুমামা বললেন, "গোগোল, তোমার জবাব নেই। নাগাল্যাণ্ডে এসেও একটা কাণ্ড করে গেলে।"

জনতা তখনও সেই কথা বলে চলেছে। আর আনন্দে হাসছে। চিক্কুস গোগোলের কোল থেকে ছটফট করে মায়ের কোলে গেল, আর ডেকে উঠল, "কেঁউ।"

সাধু দেবকুমারের আজব কাহিনী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মহাসাধু দেবকুমার তখনও সাধুসন্ত কোনওটাই নন। কিছুদিন হল বিয়েশাদি সেরে নববধূসহ মধুযামিনী করতে বেরিয়েছেন। চাকরি-বাকরি কিছুই করেন না। দাদাবৌদির হোটেলে সবলে আছেন। সবলে কথাটার পিছনে কিছু বলবান উপাখ্যান আছে।

তিরিশের মধ্যে বয়েস। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারা। পেশীপুষ্ট। পরোপকারী যুবা। যে-কোনও ঝামেলায় মহড়া নিতে সদাআগুয়ান। আখড়ায় ফি-দিন কুস্তি লড়েন। ছোরাখেলা, লাঠিখেলা—সবেতেই নং ১। এমনকী কয়েকবার মহাপরাক্রমশালী দারা সিংকেও চিত করেছেন। জুনিয়র বকসিং-এ পর পর দু বছর চ্যাম্পিয়নও ছিলেন। তবে, এগুলোর মধ্যে তো আর দোষের কিছু ছিল না। দোষ একটিই। তা হল, প্রতিদিন এক-আধটি ঘটনা বাধানো। আর সে ঘটনাগুলির নায়ক স্বয়ং দেবকুমার। এক ঘুষিতে কারো চোয়াল খুলে গেল, কারো বা একপাটি দাঁত খসে পড়ল টগর ফুলের মতো। প্রত্যেকটা খবর কানে আসত আর দাদা বেধড়ক পিটতেন। দেবকুমার মাথা নিচু করে জানাতেন, লোকটা খারাপ বা ওরা এককাট্টা হয়ে বুড়ো পুরুতমশাইকে শেষ করে দিচ্ছিল। আমি দেখতে পেয়ে···

কথা শেষ হয় না। খিলের বাড়ি পিঠে আরো উপর্যুপর নেমে আসে। দেশের ভাল করার দায়িত্ব তোমায় কে দিয়েছে? সমাজশাসক! কে আমার রবিনহুড এলেন!

এভাবেই বছরের পর বছর তিতিবিরক্ত হতে-হতে দাদাবৌদি দেবকুমারের বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। ভাবলেন, বদল হবে। হলও তাই। ওঁদের প্রেস্ক্রিপশন সমূহ কার্যকর হল। এছাড়াও হাতে কিছু থোক টাকা দিয়ে বললেন, যে-কোনও একটা ব্যবসা করো। খাবে বাড়িতেই। তবে, তোমার হাতখরচ আজ থেকে বন্ধ। মাসে দুজনের টুকিটাকি খরচ চালিয়ে নিতে হবে। আমি দিতে পারি, কিন্তু, দেব না। স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করো। বয়েস হয়েছে।

পিতৃতুল্য দাদার কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে নিলেন দেবকুমার। কলেজ স্ট্রিটে একটা বই-এর দোকান করলেন। মূলধন ছাড়াও, অন্যতম প্রধান সম্পদ ছিল সততা। দিনে-দিনে একটা চলনসই জীবন কাটাবার ব্যবস্থা হল। দেবকুমার সদাসুখী, নিয়তপ্রফুল্ল। বউকেও তেমন করে গড়ে নিলেন।

কিন্তু, আমাদের গপ্‌পো এহেন দেবকুমারের সাধু হওয়া নিয়ে।

ঘুরে বেড়িয়ে, ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে দেবকুমার ও দেবকুমারীর দিন কেটে যাচ্ছিল। খুব-একটা তেল-তেল ফুল-ফুল দিন না কাটলেও, কেটে যাচ্ছিল।

দেবকুমারের তখন মাথাভর্তি জটা। একগাল কাপালিক-দাড়ি। পরনে গেরুয়া রঙে ছোপানো কুর্তা আর লুঙ্গি। পায়ে খড়ম। হাতে একটা বেলকাঠের সাদাটে লাঠি। পাহাড়-টিলায় ওঠার জন্যে। কমণ্ডলু নেই। সাধু তো আর নন!

দেবকুমারীকে গৌহাটিতে এক বন্ধুর বাড়ি রেখে আগরতলায় এসেছেন। উঠেছেনও

রাজার ছেলে

সরল দে

দিচ্ছে হামা রাজার ছেলে
খাচ্ছে মুড়ি খামচে,
সোনার খাটে থাকছে না সে—
হুমড়ি খেয়ে নামছে।
ঝিনুক-বাটি উল্টে ফেলে
পিঁপড়ে ধরে খায় সে ছেলে,
রাজার তাতে প্রেশার বাড়ে
রানীর বাড়ে ভাবনা।
এবার ছেলে খাবলে না খায়
গোরু-মোষের জাবনা !

রাজার ঘরে জন্মে খোকার
বিকার কেন নানান প্রকার ?
খড়ি পাতেন গণকঠাকুর
দেখেন তিনি হস্ত,
বলেন, "অতি সূক্ষ্ম ভুলে
সমস্যা যে মস্ত।
ব্যাপার তো নয় সহজ সোজা
বাড়ছে ক্রমে ভুলের বোঝা,
হচ্ছে রানীর এ-হয়রানি
রাজার মাথা ঘামছে।
জন্মকালে ছিল না এর
মুখে রুপোর চামচে !"

দিনরাতের ছড়া

আরতি দাস

সূয্যিমামার দেশে
সকাল হল হেসে।

ঠা-ঠা রোদের দুপুর
আগুনতাতে ফুটপাথে মুখ,
ধুঁকছে নেড়িকুকুর।

দিন ফুরোল, এলোমেলো
হাওয়ায় ধুলোর গন্ধ,
ছেঁড়া কাগজ, পাতার ঠোঙা
উড়ল, কী আনন্দ।

রাত হল যেই, আঁধার।
লোডশেডিংয়ের ছাড়া-গোরু
লোক নেইকো বাঁধার।

এক বন্ধুর বাড়ি। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বাসে-ট্রাকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন জলে-জঙ্গলে। মনের আনন্দে। সেই বন্ধুর জিপে চড়ে গোটা এলাকা তোলপাড় করে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু, সেই গেরুয়া রং, সেই জটাজূট তাঁকে ইতিমধ্যেই দ্রষ্টব্য করে তুলেছিল। খুবই স্বাভাবিক। কেউ ভাবছিল, তিনি সন্ন্যাসী। কেউ ভাবছিল মঠমন্দিরের সন্ত। কেউ বা ভাবছিল কোনও বিশেষ সংঘপ্রতিষ্ঠানের বাবাজি। গুরুঠাকুর। কিন্তু, তেমন কেউ, তখনও পর্যন্ত তাঁর কাছে ঘেঁষেনি।

শুধু একটি ঘটনা, তাঁকে একদিনে মোহন্ত সাধু বানিয়ে দিল। সে-গপপেই আসছি।

তেমন কোনও কথা ছিল না, হঠাৎই দেবকুমার ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন। তখন ভরদুপুর। রোদ্দুরে চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। পায়ে সেই খড়ম, তেমনি গেরুয়া পরনে। হাতে লাঠিটি শুধু নেই। কাঁধে এক আজানুলম্বিত কাঁধ-ব্যাগ।

দেবকুমার হেঁটে চলেছেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে। বন্ধু আজ দুদিন যাবৎ কাজে বাইরে। সুতরাং, একা দেবকুমার, কী আর করেন, মন্দিরদর্শনে চললেন।

বিশাল সেই রাজার মন্দির। বহু পুরনো। চণ্ডীমণ্ডপ পেরিয়ে বিশালাকার এক বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভ্রূকুটি করলেন বুঝি। মা মা করে দুবার বজ্রকণ্ঠ ধ্বনির পর হাঁটু মুড়ে বসলেন। গড় করলেন। যখন উঠলেন, তাঁর দুই চোখ জবালাল। হয়তো রোদ্দুর লেগে এই রক্তাভা। কিন্তু, দেবকুমারের মনের ভিতর কী এক অনাস্বাদিত তোলপাড় হতে থাকল, যার মানে তিনি কখনও খুঁজে পাননি।

বৃদ্ধ রাজপুরোহিত সামনে এসে দাঁড়ালে দেবকুমার এক বিচিত্র স্বরে তাঁকে আদেশ দিলেন, "দরজা খুলে দাও। মা আমাকে ডেকেছেন। তাই এসেছি। আজ বিশ বছর বাদে মা আমাকে ডেকেছেন।"

পুরোহিত বললেন, "নিয়ম নেই। রাজার আদেশেও এই বন্ধ দরজা এখন আর খুলবে না। অসম্ভব।"

সেই লোহার বলটু লাগানো বিশাল দারুদরজার দিকে মুখ করে দেবকুমার বসেই রইলেন। ঠিক কতক্ষণ ছিলেন, খেয়াল নেই।

ইতিমধ্যে মন্দিরচত্বরে যে দু-চারজন ছিলেন, কৌতূহলবশবর্তী কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবকুমারের কোনোদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি চোখ মুদে মার উদ্দেশে ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন, তোর ডাক শুনে এলাম আর তুই দরজা বন্ধ করে নিদ্রা যাচ্ছিস ! এ কেমন ব্যবহার মা ? ছেলের প্রতি এ কী মায়ের ব্যবহার ! ঠিক আছে, আমি ফিরে যাচ্ছি। বহু বছর বাদে তোর ডাকে ফিরে এসেছিলাম। ফিরেই যাচ্ছি। আর কোনও দিন দেখা হবে না। যেমন ত্যাজ্যপুত্র ছিলাম, তেমনই ত্যাজ্য হয়ে ফিরে চললাম।

"সে যে কী ঘোর লেগেছিল, আজ অবধি তার কোনও ব্যাখ্যা পাইনি। সে কি গেরুয়ার ঘোর ! জানি না।"

স্বাভাবিক দেবকুমার সেদিনের সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা বলতে-বলতে শিউরে ওঠেন। দুটি হাত সামনে বাড়িয়ে দেখান কেমন রোম খাড়া হয়ে উঠেছে !

"তারপর বড় বড় লোহার দুটো তালার ফাঁকে দু লাইন খসখস করে 'মা কি এমন ব্যবহার করতে পারে ছেলের প্রতি ? চললাম'—লিখে দুটো তালার ফাঁকে চিরকুটটা গুঁজে দিলুম। দিয়েই পিছন ফিরেছি—অমনি ঐ দুই ভারী দরজা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে খুলে গেল।

"সেই ফাঁকা দরজা দিয়ে মন্দিরস্থ ভয়ংকর কালোর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে ফেললাম। প্রচণ্ড ভয় করতে লাগল। এ কী হল ? এমন তো চাইনি !

"আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ-পূজারী আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। 'আমার অন্যায় হয়েছে, ঘাট হয়েছে। আমি তোমায় চিনতে পারিনি বাবা।'

"উনি তো সাষ্টাঙ্গ, ওঁর সঙ্গে আশেপাশে যারাই ছিল, সবাই পায়ে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এর এই প্রার্থনা, ওর ওই—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। প্রত্যেককে বরাভয় দিয়ে, যেভাবে এসেছিলাম, তার চেয়ে অন্যভাবে পালিয়ে বাঁচলাম।

"কিন্তু, বাঁচা কি যায় ? তখন তো ধরা পড়ে গেছি। প্রায় সবাই পিছু নিয়েছে। অলৌকিক এক বাবার কথা গোটা শহরে রটে গেছে আগুনের মতো। আমার ঐ বন্ধুর বাড়ি তখন বাবার আশ্রম। লাইন করে সবাই বিপদভঞ্জন বাবার সামনে।

"আর আমারও মুখ দিয়ে অমোঘ সমাধান বেরিয়ে আসছে। কী বলছি কোনও খেয়াল নেই।

"এই করে দুদিন কাটলে, আমার বন্ধু সপরিবার এসে যখন গভীর রাতে আমার সামনে করজোড়ে বসল, আমার চেতনা ফিরল।

"বললুম, 'গোপেন্দু কাল ভোরের ফ্লাইটেই যাবার ব্যবস্থা করো। নইলে তোমারও বাস উঠবে এখান থেকে এবং আমারও গায়ের চামড়া গায়ে থাকবে না। ভক্তেরা চামড়া খুলে নেবে।'"

আমরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি, "ব্যাপারটা হল কী করে ? অবিশ্বাস্য !"

দেবকুমার ভাসতে-ভাসতে কুটো ধরার মতো বললেন, "মনে হয় ঠিকমতো তালা লাগান হয়নি। তালার ফাঁকে চিরকুট ঢোকাতে গিয়ে দরজায় চাপ পড়ে থাকবে।

"ভোরবেলা জন্মের মতো গেরুয়া ছেড়ে প্লেনে উঠলাম।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রিকেটের প্রবাদ-পুরুষ

রাজু মুখোপাধ্যায়

১৯২৬ সাল। ১ ডিসেম্বর। আজ বোম্বাইয়ের জিমখানা মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্নিপরীক্ষা। ভোর থেকেই মাঠের চারপাশে জড়ো হয়েছেন হাজার-হাজার মানুষ। সারা শহরে তুমুল উত্তেজনা। আগের দিন আর্থার গিলিগ্যানের নেতৃত্বে প্রথম অফিসিয়াল এম.সি.সি. দল ৩৬৩ রান করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর মাত্র ১৬ রানে কেড়ে নিয়েছে হিন্দু দলের একটি উইকেট। সকলের মুখে মুখে এখন একটি কথাই ঘুরে বেড়াচ্ছে: আজ ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবেন তো!

খেলা শুরু হল। দেখতে-দেখতে রানের সংখ্যা দাঁড়াল ৮৪। কিন্তু ততক্ষণে তিন-তিনজন সেরা ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়ানে ফিরে গেছেন। বিখ্যাত মিডিয়াম ফাস্ট বোলার মরিস টেটের দুর্ধর্ষ বোলিংয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো এখন আর কেই বা আছেন ভারতীয় শিবিরে!

অন্তত একজন যে আছেন, সে-প্রমাণ দিতে মাঠে নামলেন সি.কে.নাইডু। দর্শকরা তখন নামী বিদেশী বোলারদের নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। মাঠে নেমেই এই দীর্ঘকায় সুপুরুষ খেলোয়াড়টি সবাইকে চমকে দিলেন। প্রথম দুটি বল নিতান্ত অবহেলার ভঙ্গিতে ঠেকালেন। পরের বল। গুলিবিদ্ধ বাঘের মতো তেড়ে গেলেন বলের দিকে। ব্যাটের বাড়ি খেয়ে বল শূন্যে উঠে পাশের বিশাল বট গাছের মাথা টপকে একেবারে রাস্তায়। এম.সি.সি. দলের খেলোয়াড়রা তাজ্জব। মাথা খারাপ নাকি লোকটার! জানে না কাদের সঙ্গে খেলছে। সেই ওভারেই একটি সূক্ষ্ম লেট কাট বাউণ্ডারিতে পাঠিয়ে সি.কে. বুঝিয়ে দিলেন সাহসে ও শক্তিতে তো বটেই, বুদ্ধি আর ব্যাটিং-নৈপুণ্যেও তিনি কারও চেয়ে কম নন।

ভারতীয় ক্রিকেটের একটি স্মরণীয় ইনিংসের সেই শুরু। হিন্দু দল ছয়-সাত রানের জন্য প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে রইল বটে, কিন্তু সেদিন সি.কে. যে অসাধারণ দাপটের সঙ্গে খেললেন, তার কোনো তুলনা নেই। মাত্র ১১৫ মিনিট ক্রিজে থেকে তাঁর ১৫৩ রান ভারতীয় খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। সি.কে.র সেই চোখ-ধাঁধানো ১১টি ছক্কা হাঁকানোর দুর্দান্ত ইনিংসটির কথা এ-দেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরকালের মতো লেখা হয়ে গেল।

ভারতের ভাগ্যে সরকারি টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগ জোটে ১৯৩২ সালে। পরাধীন দেশের পক্ষে সেটা ছিল মস্ত সম্মানের ব্যাপার। তখনকার দিনে ইংরেজদের সঙ্গে যে-কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল আত্মমর্যাদার সংগ্রাম। এইরকম এক পরিবেশে ১২ জুলাই ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠে ফিল্ড করতে নামল ভারতীয় দল। শুরুতেই ভারত সকলকে অবাক করল। সফরকারী দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন পোরবন্দরের মহারাজা। আর সহ-অধিনায়ক লিমডির যুবরাজ। কিন্তু দলীয় স্বার্থে দুজনেই নিজেদের সরিয়ে রেখে সি.কে. নাইডুর হাতে দল-পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিলেন। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এ ধরনের নজির আগে কখনও দেখা যায়নি।

সি. কে. (বোলারের মোকাবিলায় তৈরি)

খেলার শুরুতেই সি. কে. নাইডু আক্রমণাত্মক ফিল্ড সেট করে ওয়ালি হ্যামণ্ড, ফ্র্যাঙ্ক উলির মতো অসাধারণ ব্যাটসম্যানদের রীতিমত বেকায়দায় ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী ইংল্যাণ্ড জিতে যায় ঠিকই, তবে ইংলিশ ক্রিকেট-সমালোচকরা বিশেষত নেভিল কার্ডাস, সি. কে. নাইডুর অসাধারণ নেতৃত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ওই ম্যাচ খেলার সময় তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছেছে। কিন্তু তিনি অনায়াসে ৪০ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস দর্শকদের উপহার দেন। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন কম-কথার মানুষ। তিনিও সি. কে.র কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, "আমার মতে সি. কে.র ব্যাট করার কৌশল ও দক্ষতা আমাদের ফ্র্যাঙ্ক উলির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।" মনে রাখতে হবে, তখনকার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক উলি ছিলেন অন্যতম। অধিনায়ক ও
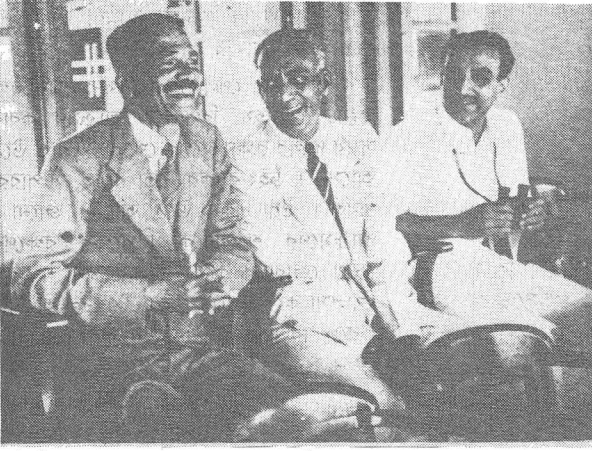
বাঁ দিক থেকে অধ্যাপক দেওধর. সি কে মার্চেন্ট

ব্যাটসম্যান হিসেবে সি. কে. নাইডু ছিলেন ভীষণ আক্রমণাত্মক। তিনি মনে করতেন, চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলতে না পারলে ক্রিকেটার বলে নিজের পরিচয় দেওয়া ঠিক নয়। তোমরা অনেকেই হয়তো ভাবছ, নাইডু তা হলে শুধু ছয় আর চারের উপরই নির্ভর করতেন। না, এটা ভুল ধারণা। চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট মানে শুধু ছয় হাঁকানো নয়। দলের প্রয়োজনে দাঁতে দাঁত চেপে ঘন্টার পর ঘন্টা দুর্দান্ত বোলারদের মোকাবিলা করার মতো দুর্দান্ত ক্রিকেট আর কী হতে পারে? অফের বল লেগে ঘোরানো, লেগের বল সরে এসে অফ সাইডে পাঠানো, ফিল্ডারদের মাথার উপর দিয়ে বল লিফট করাই ছিল তাঁর ব্যাটিংয়ের বিশেষত্ব। আবার চোখের পলকে শর্ট রান নেওয়াও ছিল তাঁর প্রতিভার আর-এক নিদর্শন।

১৮৯৫ সালের ৩১ অকটোবর নাগপুরে সি. কে. নাইডুর জন্ম। স্কুলে পড়ার সময়ই নাইডুর অসামান্য খেলোয়াড়ি দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে-কোনো খেলাতেই তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কিন্তু ক্রিকেটকেই তিনি ভালবাসতেন সবচেয়ে বেশি। কিশোর বয়েস থেকেই সি. কে. নাইডু ছিলেন রক্ষণাত্মক ব্যাটসম্যান। একদিন সি. কে.র বাবা তাঁর কেমব্রিজের বন্ধু 'রণজি'কে নিয়ে এলেন ছেলের ব্যাট করা দেখাতে। চমৎকৃত রণজি মাথা নাড়লেন, "যার এত তীক্ষ্ণ চোখ, চমৎকার ফুটওয়ার্ক, লম্বা রিচ, সে কেন বল মারে না বলতে পারো?"

সেই থেকে শুরু হল কনটাইয়া কনকাইয়া নাইডুর ব্যাটিং-পদ্ধতির পরিবর্তন। বুদ্ধিমান কিশোর সেদিনই রণজির সহজ সরল আর সত্য উপদেশটি খেলোয়াড়-জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে তাঁর মনে গেঁথে রাখলেন। আর তারপরই শুরু হল অমানুষিক অনুশীলন-পর্ব। তখনকার দিনে ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের মধ্যে ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের প্রচলন বড় একটা ছিল না, এমন-কী, বিদেশী টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যেও নয়। কিন্তু নাইডু আজ থেকে সত্তর বছর আগেও বুঝেছিলেন এর প্রয়োজনীয়তা। অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন, চিন্তাভাবনা করতেন, ক্রিকেট সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য যোগাড় করতেন, বিখ্যাত খেলোয়াড়দের উপদেশ শুনতেন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং হয়ে দাঁড়াল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান। সাহস, শক্তি, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা—কোনো কিছুরই ঘাটতি ছিল না। সব মিলিয়ে সি. কে. নাইডু ভারতীয় ক্রিকেটের এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন।

১৯১৫ সালে হঠাৎ একদিন তাঁর ডাক পড়ল হিন্দু দলের হয়ে কোয়াড্রাঙ্গুলার খেলতে। য়ুরোপীয় দলের বিখ্যাত অস্ট্রেলীয় বোলার ফ্র্যাঙ্ক ট্যারান্ট হিন্দু দলকে কোণঠাসা করলেন। প্যাভিলিয়ানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন যুবক সি. কে.। ট্যারান্টের প্রথম তিনটি বলে আলতো ব্যাট রেখে ফিরিয়ে দিলেন। চতুর্থ বল সোজা উড়ে গিয়ে লাগল বোলারের পিছনে সাইট স্ক্রিনে। সবাই হতভম্ব। কিছুক্ষণের মধ্যেই চমৎকার ডিফেন্স, চোস্ত ড্রাইভ আর সূক্ষ্ম লেট কাট সবাইকে বুঝিয়ে দিল, সি. কে. নাইডু আসলে কোন্ জাতের খেলোয়াড়।

সেবার মুসলিম দলের বিরুদ্ধে খেলা। ম্যাটিং উইকেটে দীর্ঘকায় ফাস্ট বোলার মহম্মদ নিসার হিন্দু দলের ব্যাটসম্যানদের উইকেট আর মন ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছিলেন। ব্যাট হাতে এগিয়ে এলেন সি কে। মুখে মৃদু হাসি। নিসার রেগে গিয়ে বাম্পার দিলেন। দারুণ সাহস আর চমৎকার ফুটওয়ার্কের সাহায্যে সি. কে. বল পাঠিয়ে দিলেন স্কোয়ার লেগ সীমানার বাইরে। নিসারও ছাড়ার পাত্র নন। আবার বাম্পার। বল এসে লাগল সি. কে.র পাঁজরে। ফিল্ডাররা ছুটে এলেন সাহায্য করতে। সি. কে. হাত নেড়ে সকলকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি ঠিক আছি, খেলা চলুক।" পরের বল স্কোয়ার কাট করলেন বাউণ্ডারিতে। তারপর বাম্পারের পর বাম্পার, হুক আর পুল করে সি কে প্রমাণ করলেন ক্রিকেট তাঁর কাছে নিছক খেলাই নয়, রীতিমত যুদ্ধও।

১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার বিল ভোস আর গাবি অ্যালেন ওভালের বিপজ্জনক পিচে সি. কে.র বুকে একাধিক বার বল লাগান। সি. কে. দমবার পাত্র নন। তিনি তাঁর অসাধারণ ক্রীড়াচাতুর্য দিয়ে ইংরেজ দর্শকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পরাধীন ভারতবাসীর সাহস এবং মনোবল তাঁদের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। এই ইনিংসে তাঁর ৮১ রানই তাঁর ১৪টি সরকারি টেস্ট ইনিংসের সর্বোচ্চ রান। ১৯৩৩ সালে উইজডেন সি. কে. নাইডুকে বছরের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হিসেবে সম্মানিত করে।

অধিনায়ক হিসেবে সি. কে নাইডুর সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তিনি কখনও চাইতেন না ভারতীয়রা ইংরেজদের অনুকরণ করে নিজস্ব প্রতিভা নষ্ট করুক। "আমরা কেন অন্যদের ধাঁচের খেলোয়াড় হব! আমাদের শক্তি, আমাদের চোখ, কব্জি, ফুটওয়ার্ক—এসবই তো আমাদের বড় অস্ত্র।" দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় ক্রিকেট সি. কে. নাইডুর প্রকৃত পরামর্শ এবং উপদেশ মেনে নেয়নি। সত্যি কথা বলতে কী, আজও ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে দু'একজন ছাড়া আর কারুর প্রাণবন্ত খেলা দেখতে পাই না। এতে যে ভারতীয় ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সন্দেহ নেই।

বোলার হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। প্রয়োজন হলে নতুন বলে সুইং করাতেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অফ ব্রেক করতেন। ১৯৩৬ সালে একটি কাউন্টি ম্যাচে ভিজির জায়গায় সি. কে. অধিনায়কত্ব করেন। সে বছর ভারতীয় দল ভিজির গাফিলতির জন্য খুব খারাপ খেলছিল। কিন্তু সি. কে.র প্রেরণায় ভারত এই ম্যাচে কাউন্টি দলকে বিপাকে ফেলে। বল করার দায়িত্ব নিয়ে সি. কে. একাই সেবার ছয়টি উইকেট দখল করে নিজের দলকে জিততে সাহায্য করেছিলেন।

ফিল্ডার হিসেবেও সি. কে. নাইডু অসাধারণ। স্লিপ, গালি, শর্ট একস্ট্রা ছিল ওঁর প্রিয় জায়গা। ১৯২৬ সালে আর্থার গিলিগ্যানের দল কলকাতায় টেস্ট খেলতে এসেছিলেন। খ্যাতিসম্পন্ন ওপেনার অ্যানডি ম্যানধাম লেট কাট করে রান নেবার জন্য সবে এক পা এগিয়েছেন। হঠাৎ স্লিপ থেকে ডাইভ দিয়ে সি. কে. শুধু বলই আটকালেন না, তিনি ওই অবস্থাতেই উইকেট না দেখে বল ছুঁড়ে উইকেট ফেলে দিলেন। হতবাক ম্যানধাম ঘাড় নাড়তে নাড়তে মাঠ ছাড়লেন।

সি. কে. নাইডু প্রায় তিরিশ বছর ধরে কোয়াড্রাঙ্গুলার আর পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হিন্দু দলের হয়ে খেলেছেন। রণজি ট্রফিতে প্রথমে তিনি ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়ান স্টেটস দলের হয়ে খেলতেন, তারপর হোলকারের মহারাজার আমন্ত্রণে চাকরি নিয়ে হোলকারে চলে যান। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে হোলকার দলের ভাগ্য নির্ভর করেছে কর্নেল নাইডুর উপর। সি. কে. নাইডু আর তাঁর দলকে দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শক ছুটে আসতেন।

সি. কে.র নামের সঙ্গে আসলে জড়িয়ে ছিল এক আশ্চর্য জাদু। সেই জাদুর গুণেই তিনি হাজার-হাজার লোককে মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। পঞ্চাশ বছর বয়সেও তিনি রণজি ট্রফিতে ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। এই বয়সেই মিডিয়াম ফাস্ট বোলার দাতু ফাদকারকে সোজা সাইট স্ক্রিনের উপর ছক্কা মেরেছিলেন, মিড উইকেটে সপাটে হুক করেছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের এই প্রবাদপুরুষ সারা জীবন দাপটের সঙ্গে খেলেছেন, কোথাও কখনও মাথা নিচু করেননি।

এশিয়াড ও বিশ্বকাপ

ভাস্কর গাঙ্গুলি

আমি পড়েছি মহা মুশকিলে। যেখানে, যার সঙ্গেই দেখা হয়, সেই বলে—কী, সামনেই তো মস্ত পরীক্ষা। এশিয়ান গেমস। জিততে পারবে তো?

হ্যাঁ, সামনে এশিয়ান গেমস। আর কটা দিন পরেই। কিন্তু তার পরের প্রশ্নটাই তো সাংঘাতিক। জিততে পারব কি না? ভবিষ্যতের কথা কে কবে আগের থেকেই জানতে পেরেছে? পৌরাণিক যুগে মুনি-ঋষিরা ধ্যানে ভবিষ্যৎ জানতে পারতেন। কিন্তু আমি কী করে জানব বলো তো? আমরা একটা আন্দাজের কথা বলতে পারি। এখন সেটাও বলা ঠিক হবে না। বিরাশির বিশ্বকাপ যা শিক্ষা দিয়ে গেছে, তাতে আমি বাপু স্পিকটি-নট। বিশ্বকাপ নিয়ে নানা দেশে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। ফাইনালে কে জিতবে, তাই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা! কোন্ দেশের এক মস্ত জ্যোতিষী গুনে-টুনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—বাপু হে, আমি তো দেখছি পেলের দেশেরই জয়জয়কার।

এ তো গেল মানুষের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। গণকযন্ত্র পর্যন্ত এ কাজে ফেল মেরে গেছে। কম্প্যুটার যে দুটো দেশ ফাইনালে খেলবে বলে জানিয়েছিল, তাদের কেউই শেষ পর্যন্ত ফাইনালে যেতে পারেনি। আমাদের সবাইকে অবাক করে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য শেষ লড়াই করেছে ইতালি আর পশ্চিম জার্মানি। যেদিন ব্রাজিল হেরে গিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল, সেদিন থেকেই ঠিক করেছি, হার-জিত নিয়ে আর একটা কথাও নয়। আগ বাড়িয়ে বলা-কওয়া একেবারে বন্ধ।

আন্তর্জাতিক মানের ম্যাচ খেলার আগে, আমার মতে, বেশি করে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। নইলে যে-সমস্ত দেশ ওইজাতীয় ফুটবল খেলে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে না কিছুতেই। তাদের খেলার ধাঁচ-ধরন কেমন, এসব না জানলে তাদের সঙ্গে লড়াই করা যাবে কী করে? ধরনগুলো জানতে হলে বিদেশী দলগুলোর সঙ্গে বেশি করে খেলা দরকার। যতই ওদের খেলা দেখা যাবে, ততই ওরা কী ধারায় অভ্যস্ত, তা বোঝা যাবে পরিষ্কারভাবে। খেলতে খেলতে, কড়া নজর রেখে, বুঝতে হবে বিপক্ষের ত্রুটি কোথায়। তারপর মওকামতো আসল জায়গায় ঘা দিলেই, ব্যস্, কাজ হাসিল। উলটো দিকে আমাদের কোথায় কোথায় গলদ, সেটাও বোঝা যাবে স্পষ্টভাবে। ওদের খেলোয়াড়দের গতিবিধি লক্ষ করলেই সেটা বুঝতে কষ্ট হবে না। কারণ, আমাদের যেটা দুর্বল জায়গা, সেটাতেই তো ওরা আঘাত করবে বারবার। সেই সমস্ত ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে নিজেদের আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। কাজেই বাইরে ম্যাচ খেলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কিংস কাপ, নেহরু গোল্ড কাপ আর প্রেসিডেন্টস কাপে আমরা বেশ কিছু বিদেশী দলের বিরুদ্ধে খেলেছি। এতে আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। তারপর মারডেকা। তাতে খেলে আমাদের অভিজ্ঞতার পুঁজি আরও বেড়েছে। কিন্তু এতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমার ইচ্ছে, আমরা আরও অনেক বেশি ম্যাচ খেলি।

বিশ্বকাপের খেলায় নজর করে দেখেছ নিশ্চয়ই, যে-কোনো দলের আক্রমণ শুরু হয় গোলকিপার থেকে। আমাদের দেশে সেটা কিন্তু হয় না। আমাদের আক্রমণ তৈরি করেন মূলত হাফ-লাইনের খেলোয়াড়রা। এই
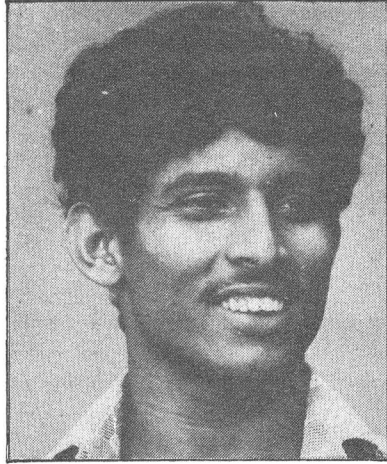
গোলকিপার দিয়ে আক্রমণ শানানোর একটা চমৎকার যুক্তি আছে। গোলকিপার হচ্ছেন দলের লাস্ট লাইন অব ডিফেন্স। আবার তিনিই ফার্স্ট ম্যান অব অ্যাটাক। গোলকিপার এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন যেখান থেকে গোটা মাঠটাকে পরিষ্কার দেখা যায়। অর্থাৎ খেলোয়াড়রা কোথায় কোথায় এবং কীভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তাই বিপক্ষের দুর্গে কোন্ দিক দিয়ে হানা দিলে সুবিধে হবে, সেটা তিনি চমৎকার বুঝতে পারেন। আর সেইভাবেই বল পাঠান দলীয় খেলোয়াড়ের কাছে। অনেকেরই ধারণা আছে, গোলকিপার থেকে আক্রমণ শুরু করাটা সাম্প্রতিক কৌশল। আসলে কিন্তু তা নয়। উনিশশো চুয়াত্তর সালের বিশ্বকাপ ফুটবলের কিছু খেলা যদি কখনও দেখার সুযোগ পাও, লক্ষ করে দেখবে, সেখানেও খেলা এই ছকেই হয়েছে। আমাদের দেশেও এই ধরনের খেলার রেওয়াজ আস্তে আস্তে এসে যাচ্ছে। কৌশলটাকে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারলে এশিয়ান গেমসে আমরা ভাল ফল পাব বলে আমার ধারণা।

বিশ্বকাপের খেলাগুলো দেখার সময় লক্ষ করেছ বোধহয়, বিপক্ষকে আক্রমণ করার সময় দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রাও উঠে আসেন। উইং-ব্যাকরা তো বটেই, স্টপাররা পর্যন্ত। ওঁরা কেন উঠে আসেন জানো? আক্রমণের শক্তিটাকে বিপক্ষের রক্ষণের চেয়ে জোরদার করে তোলার জন্য। একটু খোলসা করে বলছি। ধরো, 'এ' দল অ্যাটাক করছে 'বি' দলকে। চারজন ফরোয়ার্ড আর দুজন হাফ, এই নিয়ে 'এ' দলের মোট ছ'জন খেলোয়াড় বিপক্ষের ডিফেন্সে ঢুকতে যাচ্ছেন। 'বি' দলেরও ছ'জন খেলোয়াড় নীচে নেমে আসবেন এই আক্রমণকে বাধা দিতে। পুরো ব্যাক-লাইনটাকে এক্ষেত্রে সাহায্য করতে নেমে আসবেন হাফের খেলোয়াড়রা। অতএব ব্যাপারটা দাঁড়াল, ছ'জনকে বাধা দিচ্ছেন ছ'জন। কিন্তু আক্রমণভাগের একজন উইং-ব্যাক যদি হঠাৎ খুব দ্রুতগতিতে উঠে এসে সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেন, তবে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ডিফেন্সের ছ'জন যদি ঢুকে-পড়া ছ'জনকে রুখেও দেন, তবু একজন অরক্ষিত থেকে যাচ্ছেন। আক্রমণটা জোরদার হবেই।

আচমকা ঢুকে পড়ার ঘটনাও অনেক ঘটেছে। ব্রাজিলের একটা আক্রমণের কথা মনে পড়ছে। জিকো, সক্রেটিস, সারজিনো প্রমুখ খেলোয়াড়রা বিপক্ষের গোলের প্রায় বিশ-বাইশ গজের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। ডান দিক থেকে ছোট সেণ্টার করে সারজিনোকে বল দিলেন জিকো। সারজিনো অনেক আগেই দেখেছেন, বাঁ দিক দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসছেন সেরেজো। তিনি একজনকে কাটিয়ে নিয়ে বাঁ দিকে বলটা থামিয়ে দিয়েই ছিটকে সরে গেলেন। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ে এসে গেলেন সেরেজো। এসেই থামানো বলে মারলেন এক দুরন্ত শট। বলটা হাত-দুয়েকের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সবাই হাঁ।

আমাদের খেলোয়াড়দেরও সেইভাবে তৈরি হতে হবে। ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে শুধু মিডফিল্ডার নয়, ডিফেণ্ডাররাও সহায়তা করবে। তাহলেই নিশ্চিতভাবে, এশিয়ান গেমসে আমরা প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাতে পারব। উইং-ব্যাকদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, শুধু রক্ষণে সহায়তা করাই নয়, আক্রমণেও তাঁদের অনেক বড় ভূমিকা আছে। দায়িত্বটা গুরুতর।

অনেকগুলো দেশ এশিয়ান গেমসে অংশ নিতে আসছে। ফুটবলে পাঁচ-ছটা বাঘা-বাঘা দল খেলবে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমরা তীব্র অনুশীলন চালাচ্ছি। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে কঠিন অনুশীলন করেছি। এখনও করছি। গোটা ভারতবর্ষের বাছাই-করা ফুটবলাররা দিনরাত খাটছেন এশিয়ান গেমসে ভাল ফল করার জন্য।

Santanu Dutta
c/o P. G. Dutta
44, Khattar Gali Lane
Bombay - 400 002

IRIS

কলকাতা
৪.৬.৮২

ভাই নন্তু,
তোরা তো কলকাতা ছেড়ে বোম্বে চলে গেলি। আমার যে কি খারাপ লাগে
কি বলব / মন্টা, দিলো দিলওয়ার মানু সবারই এক অবস্থা।
তোর পাঠান রুবিক কিউবটা দারুণ। আমি কিন্তু ৫ মিনিটে
~~সকাল বেলা~~ সব কটা দিক মেলাতে করতে পারিনি।
একটা মজার খবর। আমি বাবা ~~আমার~~ আর মা এবার পুজোর
ছুটিতে বম্বে গোয়া পুনা এসব জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি। এলিফ্যান্টা
গুহাও দেখব / তোতে আমাতে মিলে।
আমরা তো প্রতি বছর বেড়াতে যাই। বাবাকে জানিস তো
কেমন ভেবেচিন্তে কাজ করেন। বহু আগে থেকেই পিয়ারলেসে
টাকা জমিয়ে এমন ব্যবস্থা করে ~~রেখে দিয়েছেন~~ রেখেছেন যাতে
প্রতিবছর একবার বেড়ান যায়।
তোর তো বিলেত গিয়ে মস্ত ইঞ্জিনীয়র হবার সখ। আমি
ডাক্তার হব। বাবা পিয়ারলেসের খাতে ব্যবস্থা করে রেখেছেন ও
মা বলছিলেন। তুইও মেসোমশাইকে বলে পিয়ারলেসের মাধ্যমে
ব্যবস্থাটা করে ফেল। একা একা সাহেবদের দেশে কি ক'রে থাকব
বলত তা না হলে। ও খানে তো শুনি বাচ্চারাও ইংরেজীতে
কথা বলে। তুই থাকলে একটু তবু বাংলা বলতে পারব।
আর ক'দিন পরেই আমাদের দেখা হবে।
উঃ। যা ভাল লাগছে না ভাবতে!

ইতি
বীরু

পুঃ- মেসোমশাইকে পিয়ারলেসের কথাটা বলতে ভুলিব না।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চিরামবুরুর গুপ্তধন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফাঁপরে পড়েছি। হঠাৎ দেখি, ইয়া বড় এক কেঁদো বাঘ হালুম করে সামনে দাঁড়াল। পা দুটো মাটিতে সেঁটে গেছে ভয়ের চোটে। তারপর দেখি, বাঘটা আদতে বাঘই নয়, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার! তিনি কেন বাঘ হয়ে গেছেন বুঝলুম না। খুশি হয়ে বললুম, "হ্যালো মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান! হাউ ডু ইউ ডু?" কর্নেল হাঁউমাউ করে কেঁদে বললেন, "ভাল না ডার্লিং! আমার লেজ হারিয়ে গেছে।" এ বয়সে লেজ হারানোর চেয়ে অপমানজনক কিছু নেই! কর্নেলের লেজ হারানোর কথা শুনে আমিও দুঃখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললুম!...

তারপরই টের পেলুম আমি মশারির ভেতর শুয়ে আছি। আশ্চর্য, আমার চোখ দুটো যেন ভিজে স্যাঁতসেতে। ধুড়মুড় করে তক্ষুনি উঠে বসলুম এবং খিকখিক করে হাসতে থাকলুম। কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা!

টেবিলের সামনে ঝুঁকে বসে কী-সব নাড়াচাড়া করছিলেন যিনি, তাঁর মাথায় তখনও প্রাতঃভ্রমণের নীলচে টুপি। সেই টুপি ও তাঁর সাদা গোঁফদাড়িতে তখনও জঙ্গলের শুকনো পাতার কুচি, কাঠকুটো, পাখির বিষ্ঠা, মাকড়সার জালের ছেঁড়া অংশ, এমনকী দু-একটা পোকামাকড়ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। না ঘুরেই সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।"

মশারি থেকে বেরিয়ে বললুম, "হাসছি কেন, জিজ্ঞেস করলেন না?"

"হাসছিলে নাকি? তুমি তো খুঁঃ খুঁঃ করে কাঁদছিলে মনে হল।"

"কাঁদছিলুম আপনার দুঃখে।" একটু চটে গিয়ে বললুম। "আপনার লেজ হারানোর কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি আমায় জাগিয়ে দেননি। লেজটা আপনারই ছিল।"

"আমার লেজ!" বলে কর্নেল নিজের পশ্চাদ্দেশে হাত বুলিয়ে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "ডার্লিং! সত্যি যদি মানুষের লেজ থাকত, ব্যাপারটা কত সুখের হত বলো তো! লেজ দিয়ে পিঠ চুলকোনো, মাছি তাড়ানো, আবার দরকার হলে কাউকে লেজের বাড়ি মারা—কত কাজ হত। তাছাড়া, কারুর ওপর রাগ হলে মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও চলত। লেজ খাড়া হলেই সে টের পেত আমি রেগেছি। ব্যাপারটা কি সভ্য মানুষের পক্ষে ভদ্রতাসম্মত হত না ডার্লিং? আরও ভেবে দ্যাখো, লেজ থাকলে তারও পোশাক দরকার হত। নিত্যনতুন ডিজাইনের লেজ-ঢাকা তৈরি করত টেলাররা—নাম দিত টেলেক্স। আর মহিলাদের বেলায় টেলেক্সি। ম্যাক্সির মতো।"

আমার এই বৃদ্ধ বন্ধু একবার মুখ খুললে সহজে বন্ধ করেন না। বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। আধ ঘণ্টা পরে বেরিয়ে দেখি, তখনও তেমনি বসে আছেন। পাশে অবশ্য ব্রেকফাস্টের ট্রে রেখে গেছে বাংলোর চৌকিদার। বললুম, "লেজ সম্পর্কে আরও কথা থাকলে এবার বলতে পারেন। এখন আমি ফ্রি।"

কর্নেল কতকগুলো ছবি দেখছিলেন। ছবিগুলো সদ্য প্রিন্ট করা। এখনও ভিজে রয়েছে। বললেন, "লেজ মুখের শ্রম কমিয়ে দিত, জয়ন্ত। তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সম্পাদক মশাইয়ের সামনে গিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করলেই তিনি খুশি হতেন। রিপোর্টিংয়ে ভুল বেরুলে লেজটা শিথিল করে মেঝেয় ফেলে রাখতে। তারপর লেজটা গুটিয়ে সম্পাদকের চেম্বার থেকে বেরুতে। সাতখুন মাফ!"

হাসতে হাসতে একটা ছবি তুলে নিয়েই আমি অবাক। "এ কী! এও যে লেজ!"

"হ্যাঁ, লেজ। আমার জাদু-ক্যামেরার রাতের ফসল, জয়ন্ত!" কর্নেল মুচকি হেসে বললেন।

"অবিশ্বাস্য! মানুষের কখনও লেজ হয়?" ছবিটা ভাল করে দেখে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। "কর্নেল! এ নিশ্চয় কোনো প্রাণী—মানুষের মতো দেখতে এই যা।"

কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিয়ে আওড়ালেন, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! জয়ন্ত, পাশের ঘরের ভদ্রলোক—নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র আমায় এরকম একটা আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কানে নিইনি। কাল সন্ধ্যায় গোপনে একখানে ক্যামেরা পেতে এসেছিলুম। উদ্দেশ্য তো জানো! জন্তুদের জল খাওয়ার সময় ছবি তোলা। ভোরে ক্যামেরা আনতে গিয়ে জলার ধারে বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম। অবাক লাগল। খুব বদনাম আছে জলাটার। বাগাদা আদিবাসীদের ওটা তীর্থক্ষেত্র ছিল প্রাচীন যুগে। কিন্তু গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে ওখানে তারা যায় না। দেবতার অভিশাপ লেগেছে নাকি। তো পায়ের ছাপ কাদের তা দেখতেই পাচ্ছ।"

এই সময় দরজার বাইরে ডঃ মহাপাত্রের সাড়া পাওয়া গেল। "আসতে পারি কর্নেল?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "আসুন, আসুন!" তারপর ট্রেটা তুলে ছবিগুলোর ওপর রাখলেন। বুঝলুম, কোনো কারণে ব্যাপারটা নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে জানাতে চান না কর্নেল। কাজেই আমাকেও মুখ বুজে থাকতে হবে।...

বিবর্তনবাদ ও কার্টুন

ডঃ মহাপাত্র কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "কাল আপনাকে বাগাদা ট্রাইবের কথা বলছিলুম। বাংলার বাগদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চেহারা ও পেশায় কী আশ্চর্য মিল! এরাও মাছ ধরে। আবার একসময় এরাও সেকালের বাঙালি বাগদি গোষ্ঠীর মতো লাঠিয়ালি, ডাকাতিতেও পটু। এখনও এরা শক্ত গাছের ডাল থেকে তৈরি লাঠি ব্যবহার করে। ধাতুর ব্যবহার এদের মধ্যে অচল। কাজেই একই ট্রাইবের দুটি গোষ্ঠী দু জায়গায় বাস করছে। আরও মজার কথা, এই মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে বাউরি ট্রাইব রয়েছে। মোটামুটি ফর্সা বা তামাটে গায়ের রঙ। আশা করি, বাঙালি বাউরি সম্প্রদায়ের কথা আপনি জানেন, কর্নেল। তো কথা হল—এরা ভারতের আদিম বাসিন্দা। অস্ট্রিক জাতির একটা শাখা।"

বনজঙ্গলে বেড়াতে এসে এসব কচকচি কার বা ভাল লাগে? রাগ হল দেখে যে, গোয়েন্দাপ্রবর দাড়ি নেড়ে সায় দিচ্ছেন এবং প্রশংসাসূচক উক্তিও করছেন। 'এক্সিউজ মি' বলে সোজা বাইরে চলে গেলুম। এপ্রিলে চিরামবুরু পাহাড় ও জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন। যতদূর চোখ যায়, অসংখ্য টিলা ও পাহাড়। সবুজ, খয়েরি, লাল, সাদা কত রঙের বাহার! একটা টিলার গায়ে এই বাংলো। লনের ঘাসে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর দেখি, কথা বলতে বলতে দুই পণ্ডিত বেরুচ্ছেন।

"হ্যাঁ, মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরের একটা দ্বীপে লেজওয়ালা মানুষ দেখার কথা বলেছেন। পনেরো শতকের কথা। তো লেজ নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই, কর্নেল! আমাদের শিরদাঁড়ার শেষপ্রান্তে যেটা ককসিক্স বা পিকচঞ্চু বলা হয়—কোকিলের ঠোঁট আর কী—সেটাই লেজের প্রমাণ। বিবর্তনের একটা পর্যায়ে লেজ খসে গিয়েছিল। কারণ হল ভাষা। মানুষের ভাষাই যখন ভাবপ্রকাশে সমর্থ, তখন লেজের দরকারটা কী?"

কর্নেল বললেন, "ঠিক, ঠিক। তবে ধরুন, হাতের নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ক্ষমতাও বেড়েছিল। লেজের কাজ হাতেও আরও ভালভাবে করা যায়। কাজেই..."

হঠাৎ কথা থামিয়ে কর্নেল কান খাড়া করে কী শুনলেন। তারপর দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। ডঃ মহাপাত্র হকচকিয়ে গেছেন দেখলুম। একটু পরে কর্নেল বাইনোকুলার নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর দৌড়ে বাংলোর গেট পেরিয়ে ঢালুতে বড় বড় পাথর আর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কোথায় একটা পাখি ডাকছিল টু টু টুইক! টু টু টুইক!

ডঃ মহাপাত্রের কাছে গিয়ে বললুম, "ওঁর ওই বাতিক। পাখি প্রজাপতি ঘাসফড়িং পোকামাকড় নিয়ে থাকেন।"

"ও! উনি একজন ন্যাচারালিস্ট তাহলে! আমি ভেবেছিলুম শিকারি।"

একটু হেসে বললুম, "প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তো ডঃ মহাপাত্র, কর্নেলের কাছে কি লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা দেখলেন?"

ডঃ মহাপাত্র চোখ বড় করে বললেন, "অ্যাঁ! ছবি! কোথায় ছবি! কিসের ছবি?"

অমনি বুঝলুম, ভুল করেছি। ঝটপট বললুম, "মানে একটা কার্টুন আর কী! বিলিতি পাঞ্চ পত্রিকার।"

ডঃ মহাপাত্র একটু হেসে বললেন, "তাই বলুন। তবে কর্নেল কার্টুন দেখাননি আমায়। প্লিজ, আপনি নিয়ে আসুন না ওটা, দেখি। পাঞ্চের কার্টুনের কোনো তুলনা হয় না। নিশ্চয় ডারউইন-শতবার্ষিক উপলক্ষে বেরিয়েছে!"

বেগতিক দেখে বললুম, "দুঃখিত ডঃ মহাপাত্র! কর্নেলের জিনিসপত্রে আমার হাত দেওয়াটা ঠিক হবে না!"

"তাও ঠিক।" বলে ডঃ মহাপাত্র মুখ গোমড়া করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ওঁর মুখে সন্দেহের ছাপ রয়ে গেল। বুঝলুম, আমার কথাটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু ওঁকে কর্নেল ওই অদ্ভুত ছবিটা কেন দেখাতে চাইছেন না কে জানে! নাকি কর্নেল নিজেই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে লেজওয়ালা মানুষ আবিষ্কারের গৌরব পেতে চান?...

জঙ্গলের বিপদ-আপদ

কর্নেল সেই যে পাখির পেছনে দৌড়ুলেন, তো আর ফেরার নাম নেই। দুপুর পর্যন্ত বনেজঙ্গলে একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে ছিল। একা যেতে সাহস পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম, নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে ডাকব নাকি?

কিন্তু উনি নিশ্চয় চটে আছেন আমার ওপর। অগত্যা একা বেরিয়ে পড়লুম। জঙ্গলে রাস্তা না-হারানোর সহজ উপায় হল, চলার সময় কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে রাখা। আমি অবশ্য রাস্তা ধরে যাচ্ছিলুম না। কখনও পাথুরে জমির ওপর দিয়ে, কখনও ঝোপঝাড়ের ভেতর ফাঁকা জায়গা দিয়ে, কখনও বা উঁচু গাছপালার ভেতর দিয়ে। খেয়ালখুশি মতো হেঁটে যাওয়া। একটা করে গাছের ডাল ভেঙে চিহ্ন রাখছিলুম। ফেরার সময় চিহ্নগুলো কাজে লাগবে।

একসময় থমকে দাঁড়ালুম। হাতি-বাঘ-ভালুকের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে কেন যে ছাই রাইফেলটা নিতে ভুলে গেলুম! এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। এখানটা বেশ উঁচু জায়গা। ঘন ঘাস আর বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা একরকম গাছ গজিয়ে রয়েছে। তারপর ঢালু হয়ে মাটিটা নেমে গিয়ে একটা গভীর শালবনে ঢুকেছে। ডাইনে একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো পাথর, তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা রুনিগাছ। পাথরটা ঢেকে লতার ঝালর। ঝালরে চোখ-ঝলসানো ফুলের সাজ। ফুলগুলো কাছে থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেলুম। রুনিগাছটার তলায় গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছি, কালো পাথরটা থেকে কালো কুচকুচে একটা প্রাণী ঝুপ করে গড়িয়ে হাত-দশেক তফাতে মানুষের মতো দু'ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর কানে-তালা-ধরানো এক ডাক ছাড়ল, "আঁ-আঁ-ক্!"

সর্বনাশ! এ তো দেখছি একটা ভালুক। ইংরিজিতে এদের বলা হয় শ্লথ বিয়ার। মারাত্মক হিংস্র জানোয়ার। দিশেহারা হয়ে দৌড়তে থাকলুম। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ভালুকটার তীক্ষ্ণ নখে আমার পিঠ ফালা-ফালা হয়ে যাবে।

মেকুর

আশা দেবী

বাদুড়ঝোলা ট্রামের সাথে
হঠাৎ গেল লটকে
আমাদেরই ফট্‌কে।
বললে, "দাদা, একটু সরো
পায়ের কাছে বেড়ালছানা
হঠাৎ যাবে চটকে।
'ম্যাও'—মেকুর—ডা।
সামাল সামাল বেড়ালছানা
সরো রে ভাই করছি মানা
পায়ের কাছে দিচ্ছে হানা
শিটকে বেড়ালছানাটা—"
এই না বলে চট করে সে
বসল এসে আমার পাশে
মেকুর কোথায়, ফট্‌কেটা তো
ডাকছে জোরে 'ম্যাও' করে।

দারুণ চটে যাত্রীরা সব
ধরল চেপে কানটা।
ফট্‌কে বলে, "ছাড়ুন ছাড়ুন,
কানটা কী সয় এত জুলুম
একটুখানি বসার তরে
নেবেন কি মোর জানটা?"

ছবি : দেবাশিস দেব

শালবনের ভেতর দিয়ে বহু দূর দৌড়ে যাবার পর ফাঁকা ঘাসজমিতে পৌঁছুলুম। জমিটাতে অসংখ্য পাথর ছড়ানো। কতবার যে আছাড় খেলুম, প্যান্টশার্ট ছিঁড়ে গেল কাঁটা ঝোপে, তারপর সামনে পড়ল নলখাগড়ার জঙ্গল। জঙ্গল ফুঁড়ে গিয়ে ধুড়মুড় করে জলে পড়লুম। ভালুকটাকে এতক্ষণ একবারও ঘুরে দেখার সাহস পাইনি। এবার জলাটার মাঝ-অবধি একবুক জলে এগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম। কোথায় ভালুক?

ভালুকটার সঙ্গে নিশ্চয় রেসে জিতে গেছি। জলাটা তত বেশি বড় নয়। ওপারে বালিয়াড়ি দেখা যাচ্ছিল। খুব সাবধানে জলের ভেতর পা ফেলে এগোতে হচ্ছিল। কাদার মধ্যে পাথর রয়েছে প্রচুর। জল কোথাও এককোমর, কোথাও একবুক। বালির তটে পৌঁছে দু-পা ছড়িয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। নিজের বোকামির জন্য রাগ হচ্ছিল খুব। তেষ্টাও পেয়েছিল। কিন্তু জলটা খাওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্তিটা চলে গেল। তখন উঠে দাঁড়ালুম। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে চমকে উঠলুম। কর্নেল কি এই জলার ধারেই কোথাও ক্যামেরা পেতে রেখেছিলেন? সেই লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা এখানকার বলেই তো মনে হচ্ছে। ভালুকের চেয়ে লেজওয়ালা মানুষ কতটা বিপজ্জনক কে জানে! এখান থেকে ঝটপট কেটে পড়াই ভাল।

বালিয়াড়ির পর প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ সার-সার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাঁক গলিয়ে যাব কি না ভাবছি, হঠাৎ বাঁ দিকের স্তূপটার আড়াল থেকে একটা বিদঘুটে চেহারার লোক বেরিয়ে এল। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। কোমরে এক টুকরো লাল ন্যাকড়া জড়ানো। গলায় একগুচ্ছের লাল পাথরের মালা। দুহাতেও ওই রকম লাল পাথরের মালা জড়ানো। মুখভর্তি দাড়িগোঁফ। থ্যাবড়া নাক। কপালে লাল রঙের কয়েকটা আঁকিবুকি। তার মাথায় একরাশ জটাচুল। তার হাতে বেঁটে কাঠের লাঠি। লাঠিটায় বিকট সব মুখ খোদাই করা আছে। সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে চেঁচিয়ে উঠল, "কে তুমি? এখানে কী জন্য এসেছ? মরার সাধ হয়েছে তোমার?"

এবার আরও চমকে উঠলুম তার লেজ দেখে। হ্যাঁ, লেজ। ছবিতে ঠিক যেমনটি দেখেছি—কতকটা হনুমানের লেজের মতো দেখতে, কিন্তু বেশ মোটা। তত লম্বা নয় অবশ্য। তাছাড়া ঠিক এই লোকটাকেই তো ছবিতে দেখেছি।

সেই ভোরবেলা থেকে টানা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? চোখ রগড়ে নিয়ে তাকালুম। তারপর দেখলুম, ওর লেজটা খাড়া হচ্ছে। তারপর সেই লেজওয়ালা লোকটা আচমকা কাঠের লাঠিটা তুলে আমার মাথায় মারল। টের পেলুম, ভূমিকম্প হচ্ছে এবং আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার চোখের সামনে অন্ধকার।

ডঃ মহাপাত্রের দুরবস্থা

চোখ মেলে দেখি, আলো জ্বলছে এবং আমি বাংলোর খাটে শুয়ে আছি। তাহলে আগাগোড়া সবটাই লেজঘটিত দুঃস্বপ্ন। ওঠার চেষ্টা করতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলুম, "উঁহু, নড়ো না, নড়ো না!"

একটু তফাতে বসে আছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। একটা-কিছু করছেন। মাথাটা চিনচিন করছিল। হাত দিয়ে টের পেলুম ব্যাণ্ডেজ রয়েছে। কর্নেল একটু হেসে পাশে এসে বসলেন। বললেন, "বনেজঙ্গলে গোঁয়ার্তুমি ভাল না ডার্লিং! তোমায় কতবার পইপই করে বলেছি। ভাগ্যিস, আজ একটু সকাল-সকাল জলাটার ধারে ক্যামেরা পাততে গিয়েছিলুম। ধরেই নিয়েছিলুম তুমি ডঃ মহাপাত্রের সঙ্গে বরমডির আদিবাসী মেলায় গেছ। চৌকিদার সঠিক কিছু বলতে পারল না। তাকে তুমি বা ডঃ মহাপাত্র কিছু বলে যাওনি।"

আমার শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল। কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। তারপর গরম দুধ নিয়ে ফিরলেন। বললেন, "দুধটা খেয়ে নাও। রাত মোটে সাড়ে-আটটা। সাতটার সময় একবার জ্ঞান হয়েছিল তোমার। তখন ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়েছি। কী-সব ভুল বকছিলে—লেজওয়ালা মানুষের কথা বলছিলে।" কর্নেল হাসতে লাগলেন।

জোর করে উঠে বসলুম। "ভুল বকিনি। আমি ঠিক আছি। জলার ধারে একটা লেজওয়ালা বিদঘুটে মানুষ আমার মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিল। আপনার ছবির সেই কিম্ভূত প্রাণীটাই।"

"বলো কী! আমি ভেবেছিলুম পাথরের স্তূপে উঠে পা হড়কে গেছ এবং মাথায় চোট লেগেছে।"

"না।" বলে আগাগোড়া যা ঘটেছিল, সব বললুম কর্নেলকে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে একবার টাকে একবার দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে বললেন, "হুম্! কিন্তু আমাদের নৃবিজ্ঞানী গেলেন কোথায়? বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।"

এ-রাতে ঘুমটা স্বভাবত গভীর হয়েছিল। দুঃস্বপ্ন দেখিনি। দেখিনি লেজঘটিত কোনো দৃশ্যও। মশারির ভেতর থেকে আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে কালকের মতোই আপন কাজে মগ্ন দেখলুম। কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে রইল। কাল ওই বিপদসংকুল জলার ধার থেকে এই শক্তিমান বুড়োমানুষটি আমায় কাঁধে করে অতটা পথ বয়ে এনেছেন। ছেঁড়া নোংরা পোশাক বদলে দিয়েছেন। স্নেহশীল পিতার মতো আচরণ করেছেন। আস্তে বললুম, "গুড মর্নিং মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান!"

কর্নেল 'মর্নিং' বলে উঠে এসে মশারি তুলতে থাকলেন। তড়াক করে উঠে বসে বললুম, "থাক্। আর সেবার দরকার নেই। আপনার রাতের ক্যামেরায় কী ফসল তুললেন

সাজানো বাঘ

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ব্যাঘ্রশিকার করতে গেল
একটি ডজন শিকারি,
তার মধ্যে রাজাও ছিলেন
এবং ছিল ভিখারি।
রাজার হুকুম, বাঁধা হল
একটি বড় মাচান,
ভিখারিটা হঠাৎ বলে,
"প্রভু, আমায় বাঁচান।
অত উঁচু বাঁশের মাচা
চড়তে পারব না তো!"
রাজা বলেন ভীষণ রেগে,
"বাঘের পেটে যা তো!"
টোপ হিসেবে বাঁধা হল
নধর ছাগলছানা
মাচায় বসে খান মহারাজ
সুস্বাদু রাজখানা।
এদিকে বাঘ আসেই না যে
মারছে উঁকি ভোর,
রাজা রেগে সবাইকে কন,
"মুণ্ডু নেব তোর,
শিগগিরি এক বাঘ এনে দে
কেঁদো, বড় মাপের,
তা না হলে ঘটবে কারণ
তোদের মনস্তাপের!"
মন্ত্রিমশাই কয়েকজনের
সঙ্গে গুজুর গুজুর
করেই বলেন, "দেখুন চেয়ে,
বাঘ এসেছে, হুজুর!"
সত্যি একটা বাঘ এসেছে
রোগা ও লিকলিকে,
রাজা বলেন, "গায়ের ডোরা
লাগছে যেন ফিকে!"
বলেই তিনি বন্দুকে তাঁর
দেগে দিলেন গুলি,
'হালুম' কোথায়, বাঘের মুখে
'বাঁচাও, বাঁচাও' বুলি।
রাজন্যকে করতে খুশি
রাগ জুড়োতে তাঁর
ভিখিরিটার ওপর ছিল
বাঘ সাজবার ভার।

ছবি: দেবাশিস দেব

দেখি।"
টেবিলের একটা ছবি তুলে দেখে হকচকিয়ে গেলুম। জলার ধারে সেই পাথরের স্তূপ বলেই মনে হচ্ছে। একটা স্তূপের কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে আছেন নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র। হাতে শাবলজাতীয় কিছু।
"কী কাণ্ড!" অবাক হয়ে বললুম। "নৃবিজ্ঞানী দেখছি প্রত্নবিজ্ঞানীর মতো খননকার্যে লিপ্ত হয়েছেন। কর্নেল, ওখানে কি প্রাচীন সভ্যতা লুকিয়ে আছে নাকি?"
কর্নেল একটু হেসে বললেন, "প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য রাতদুপুরে লুকিয়ে কেউ করে না, ডার্লিং—যদি না তুতান-খামেনের মতো কোনো সম্রাটের গুপ্তধন পোঁতা থাকে।"
"মাই গুডনেস! ডঃ মহাপাত্র কি গুপ্তধন খুঁজছেন ওখানে?"
"জানি না।" বলে কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিলেন। বললেন, "শিগগির বাথরুম সেরে এসো। বেরুব।"
বাথরুম থেকে ফিরে জিজ্ঞেস করলুম, "ডঃ মহাপাত্র রাতের খাটুনির পর নিশ্চয় এখনও বিশ্রাম নিচ্ছেন? গুপ্তধন পেলেন কি না ওঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য মন ছটফট করছে।"
"উনি ফেরেননি।"
"সে কী!"
কর্নেল কোনো কথা না বলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন। আমি কফিটুকু ঝটপট গিলে নিলুম। এইসময় বাইরে মোটর-গাড়ির গর গর শব্দ শোনা গেল। দুজনে বেরিয়ে দেখি, বন দফতরের অফিসার সূর্যপ্রসাদ রাও জিপ থেকে গেটের কাছে নামছেন। হন্তদন্ত এসে বললেন, "কর্নেল! সাংঘাতিক ব্যাপার। বাগাদা আদিবাসীরা ডঃ মহাপাত্রকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। ভাগ্যিস ফরেস্ট গার্ডরা ভোরবেলা ওদের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওঁকে উদ্ধার করে আমাকে খবর দেয়। আমি গিয়ে ওঁকে বরমডি হাসপাতালে রেখে এলুম। বাঁচবেন কি না বলা কঠিন।"
কর্নেল বললেন, "বাগাদা বস্তিতে কেন গিয়েছিলেন ডঃ মহাপাত্র?"
মিঃ রাও বললেন, "ওদের দেবতার থান আছে জঙ্গলের ভেতর একটা ছোট্ট লেকের ধারে। ওখানে বাইরের কোনো লোকের যাওয়া বারণ। ওরা বলল, এই লোকটা তাদের পবিত্র থানের অপমান করেছে। ওদের বুঝিয়ে বললুম, ভদ্রলোক না জেনে দৈবাৎ ওখানে বেড়াতে গিয়ে থাকবেন। ওদের বোঝানো বৃথা। তাছাড়া গভর্নমেন্ট এখন ট্রাইবালদের ব্যাপারে খুব সতর্ক। বস্তার এলাকার বিদ্রোহের কথা তো জানেন।"
"হুম্। তাহলে ডঃ মহাপাত্রকে ওরা দেবতার থান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলুন!"
"ঠিক বলেছেন।" বলে মিঃ রাও ডঃ মহাপাত্রের ঘরের তালা খুললেন। বললেন, "ওঁর পকেটে চাবিটা ছিল। ওঁর জিনিসপত্র কী-সব আছে, হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।"...

লেজ তুলে পলায়ন

মিঃ রাও চলে গেলে কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, সঙ্গে রাইফেল নাও তোমার। সেই ভালুকটার মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিংবা ধরো, দৈবাৎ সেই লেজওয়ালা মানুষটা এসে পড়লে ব্ল্যাংক ফায়ার করে তাকে ভয় দেখাবে।"
কর্নেল হাসছিলেন। রাইফেল কাঁধে নিয়ে পা বাড়িয়ে বললুম, "আমরা যাচ্ছি কোথায়?"
"গুপ্তধন খুঁজতে।"
সারা পথ আর মুখ খুললেন না গোয়েন্দাপ্রবর। সতর্কভাবে সেই জলার ধারে পৌঁছে পাথরের স্তূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "খোঁড়ার জায়গাটা বাগাদারা বুজিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছে আগের মতো। যাই হোক, তুমি চারদিকে লক্ষ রাখো। বাগাদারা যে-কোনো সময় এসে হামলা করতে পারে। আমি এমন-কিছু অনুমানই করিনি। নইলে কোন্ সাহসে এখানে ক্যামেরা পাততে আসব?"
একটা পাথরের স্তূপের গায়ে খাঁজে কী-একটা তোলা রয়েছে। কর্নেল সেটা তুলে নিয়ে বললেন, "আরে! এটা দেখছি ডঃ মহাপাত্রের নোটবই। এখানে রেখে গুপ্তধন খুঁড়ছিলেন নাকি?"
নোটবইটা ছোট। প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। স্তূপগুলোর গায়ে অদ্ভুত সব আঁকিবুকি চোখে পড়ছিল। কর্নেল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইসময় হঠাৎ আমার পিছনে চাপা শব্দ হল। ঘুরে দেখি, কালকের সেই লেজওয়ালা। লাঠিটা যেই তুলেছে, আমিও রাইফেল তাক করেছি। ধমক দিয়ে বললুম, "ফ্যাল্ হতচ্ছাড়া হনুমান! ফেলে দে লাঠিটা! নইলে গুলি করে মারব।"
লাঠিটা ফেলে সে পিঠটান দেবার জন্য ঘোরা মাত্র কর্নেল তীরের মতো এসে ওর লেজ ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন। লেজটা খুলে এল। সে অজানা ভাষায় চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পড়ি-কি-মরি করে পালিয়ে গেল।
কর্নেল লেজটা দেখতে দেখতে বললেন, "একটা চমৎকার ট্রাইবাল আর্টের নিদর্শন! যাই হোক, জয়ন্ত! আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলো, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কেটে পড়ি। বাংলোতে পৌঁছেই ঝটপট সব গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে হবে।"
কর্নেল হন্তদন্ত এগোলেন। আমি পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললুম, "আমিই বা ট্রাইবাল আর্টের এ-নিদর্শন হাতছাড়া করব কেন? বিশেষ করে এটা আমার একটা স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে—মার খাওয়ার।"
বিদঘুটে বেঁটে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে কর্নেলের সঙ্গ ধরলুম।...

বাদশাহি সোনাদানা

চিরামবুরু-বরমডি রোডে একটা কাঠবোঝাই ট্রাক পেয়ে গিয়েছিলুম। বরমডিতে কর্নেলের সামরিক জীবনের বন্ধু মেজর অর্জুন সিংয়ের বাড়ি। ওখান থেকেই আমরা চিরামবুরু জঙ্গলে গিয়েছিলুম। মেজর অর্জুন সিং আমাদের দেখে হকচকিয়ে গেলেন। "কী ব্যাপার? এত শিগগির চলে এলেন যে জঙ্গল থেকে!"
কর্নেল বললেন, "পরে বলছি সব। এখন ভীষণ খিদে-তেষ্টায় ভুগছি।"
মেজর অর্জুন সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচুর খাদ্য এল টেবিলে। খেতে-খেতে কর্নেল চিরামবুরুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।
মেজরসাহেব বললেন, "আপনাকে তো বলেইছিলুম মশাই, বাগাদা ট্রাইবের ওঝা সবসময় লেজ পরে থাকে। ওদের বিশ্বাস, রামায়ণের হনুমানজির অবতার ওদের ওঝা।"
কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আসার সময় ট্রাকে বসে ডঃ মহাপাত্রের নোটবইটা পড়ে ফেলেছি। ওতে মোগল আমলের এক ঐতিহাসিক মির্জা মেহেদি খানের বই থেকে একটা উদ্ধৃতি আছে। পড়ে শোনাচ্ছি।"
নোটবইটা বের করে কর্নেল পড়তে থাকলেন:
"...দাক্ষিণাত্য থেকে বাদশাহ আলমগিরের পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ বিদ্রোহ দমন করে ফিরে যাবার সময় সঙ্গে বিস্তর ধনরত্ন নিয়ে যান। পথিমধ্যে সিরামবোরাত নামক ভীষণ অরণ্যে শাহজাদার পশ্চাদ্‌বর্তী দলটি জংলিদের কবলে পড়ে। জংলিরা রাতের অন্ধকারে তাদের অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। পরে অগ্রবর্তী দলের নায়ক মর্দান খাঁ জংলিদের ওপর প্রতিশোধ নেন। আমি মর্দান খাঁয়ের জামাতা সেহাবুদ্দিনের কাছে শুনেছি, জংলিদের অস্ত্র বলতে শুধু কাঠের লাঠি ছিল। তাদের দলপতির নাকি বানরের মতো লেজ ছিল। মর্দান খাঁ জংলিদের বন্দী করেন। কিন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্নের সন্ধান পাননি। জংলিরা বলে, সব জিনিস তাদের লেজওয়ালা দলপতি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। মর্দান খাঁ জঙ্গল তল্লাশ করে তার সন্ধান পাননি। ফলে ক্রোধের বশে তিনি জংলিদের হত্যা করেন।"
কর্নেল বললেন, "এর তলায় ডঃ মহাপাত্রের নোট রয়েছে। লিখেছেন, বাগাদাদের নিয়ে গবেষণার সময় ওদের একটি লোক-কথায় মির্জা মেহেদি খানের বর্ণিত ঘটনার সূত্র রয়েছে। বাগাদা ওঝারা নাকি বংশপরম্পরা সেই ধনরত্নের সন্ধান জানে। এই ওঝাদের কিন্তু কৃত্রিম লেজ থাকে।"
ডঃ অর্জুন সিং অভ্যাসমতো হো-হো করে হেসে বললেন, "লোক-কথা? লোক-কথা মানেই গালগল্প!"

দাদুর বাগান

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর উদ্যান, উদ্যান হল মানবের সৃষ্টি।"

"কোন্ নেতা আবার এই জ্ঞানটি দিলেন ?"

দাদুর মুখ খবরের কাগজের আড়ালে। পায়ের ওপর পা। এক পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। মৃদু-মৃদু নাচছে। উলটো দিকের সোফায় বসে আছেন মেজদাদু। থাকেন দেরাদুনে। অনেক দিন পরে কাল এসেছেন। ইচ্ছে, রিটায়ার করার সময় হয়েছে, দেরাদুনের পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে আসবেন। মেজদাদুর স্বভাবই হল মানুষকে উশকে দিয়ে মজা করা। মা দু'জনের সামনে দু'কাপ চা রেখে গেছেন। মেজদাদু দু'চার চুমুক চা চালিয়েছেন। বড়দাদু কাগজ থেকে মুখ তোলার অবসর পাচ্ছেন না। মাথা ডান থেকে বাঁ, বাঁ থেকে ডানে টানা পাখার মতো ঘুরেই চলেছে।

বড়দাদু কাগজের আড়াল থেকে বললেন, "এ সব কথা নেতাদের বলার ক্ষমতা নেই। তাঁরা বলবেন, চলছে চলবে। এ হল আমার কথা।"

"হঠাৎ তোমার এই রকম একটা জ্ঞানোদয় হল কেন ?"

"পৃথিবী একটা পাঠশালা। চোখ-কান খোলা রাখলে প্রতিমুহূর্তে মানুষ কিছু-না-কিছু শিখতে পারে। আর তোর মতো চোখ বুজে থাকলে পৃথিবী ঘুরেই যাবে, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে।"

"তুমি বোধহয় আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারলে না দাদা! কাগজ পড়তে-পড়তে পৃথিবী, ঈশ্বর, উদ্যান তিনটে একসঙ্গে এসে গেল কী ভাবে ? দ্যাখো, কৌতূহল না থাকলে মানুষের জ্ঞানলাভ হয় না। শিশুদের কৌতূহল বেশি বলে তারা ঝটপট অনেক কিছু শিখে নিতে পারে।"

"তুমি যদি নিজেকে শিশু মনে করে থাকো, তা হলে আমার অবশ্য কিছুই বলার থাকে না।"

"আমি শিশু কি না নিজেই দ্যাখো। এই দ্যাখো, আমার একটাও দাঁত নেই।"

মেজদাদুর দু'পাটি বাঁধানো দাঁত শোবার ঘরে এক গেলাস জলে এখনও ভিজছে।

বড়দাদু বললেন, "কাগজে আজ একটা বিজ্ঞাপন রয়েছে, কলকাতার উপকণ্ঠে বাগানসহ বাড়ি বিক্রয়। তুই তো বলছিস দেরাদুনের পাট তুলে দিবি। এই বাগানবাড়িটা কিনে নিলে কেমন হয় ?"

"উঃ, ফাটাফাটি হয়ে যায়। ইউ আর গ্রেট দাদা! অ্যালফ্রেড দি গ্রেটের মতো, তুমি আমার দাদা দি গ্রেট। কাগজটা একবার দাও না।"

"উত্তেজিত হোসনি। সাফল্যের মূলে থাকে ধৈর্য।"

মেজদাদু সোফায় এলিয়ে পড়ে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, "তোমার চা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।"

"যাক। চা আমি ঠাণ্ডা করেই খাই। গরম চা খেলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়।"

"আরে, আমি তো চিরকাল গরমই খাই। তুমি তো আগে বলোনি। তাই আমার গায়ের রঙটা কেমন যেন মাজা-মাজা হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ, এই নে তোর কাগজ।"

বড়দাদু কাগজটা মেঝেতে ফেলে দিলেন। মেজদাদু কাগজটা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। কাগজও তো মা সরস্বতী। দেশবিদেশের কত খবর থাকে! আমাকে বললেন, "চশমাটা শোবার ঘর থেকে নিয়ে এসো তো। আমার দুটো চশমা, যেটার মাথা কাটা, সেটাকে বলে রীডিং গ্লাস, তুমি সেইটা আনবে।"

ছবি: দেবাশিস দেব

বড়দাদু বললেন, "হাফ চশমাটা।"

শোবার ঘরের আলনায় গোটা কুড়ি বিভিন্ন ধরনের ছড়ি ঝুলছে। মুসৌরির পাহাড় থেকে মেজদাদু কিনে এনেছেন। বৃদ্ধদের উপহার দেবেন। বড়দাদুকে একটা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি এখনও বৃদ্ধ হইনি। এখনও আমি যুবক।"

চশমা চোখে দিয়ে মেজদাদু বিজ্ঞাপনটা জোরে জোরে পড়লেন।

"দাদা, একটা ফোন নম্বর রয়েছে। একবার ফোন করে দেখলে হয় না? শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণম্।"

"উহুঁ, ধৈর্য। চা শেষ করে আমি আবার একবার বিজ্ঞাপনটা পড়ব। দু'বার পড়ব, তিনবার পড়ব।"

"কেন? এটা কি তোমার পরীক্ষার পড়া? অতবার পড়ার মানে?"

"সে তুই বুঝবি না রে মানু! দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে রে! ম্যাপ দেখে জায়গাটা চিনতে হবে।"

"কী যে বলো তুমি! সারা জীবন তিলকে তাল করে এলে। এ কি তোমার কুমেরু অভিযান নাকি যে, ম্যাপ দেখে জায়গা চিনতে হবে! চব্বিশ পরগনার আবার ম্যাপ কিসের!"

"সে তুমি বুঝবে না ছোকরা! থাকো বিদেশে। যুগ কীরকম পালটেছে সে খবর রাখো?"

"খুব রাখি।"

"অশ্বডিম্ব রাখো। সারা জীবন তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কাটালে। বাঘ, ভাল্লুক, বন্দুক, পাইনগাছ, এই তো তোমার জগৎ।"

"কেন, কেন? সতীদাহ বন্ধ হয়ে গেছে, এ খবর আমি রাখি। জাতিভেদ-প্রথা উঠে গেছে, এ খবরও রাখি। ধুতি পাঞ্জাবি পরা উঠে গেছে, সে-খবরও রাখি। দেশে দু'রকমের ইস্কুল আছে, ইংলিশ আর বেঙ্গলি মিডিয়াম।"

"ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সে খবর রাখো?"

"তুমি কি আমাকে সত্যিই সদ্যোজাত শিশু ভাবলে? সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগাস্ট, এ রেড লেটার ডে।"

"স্বাধীনতার মানে জানো?"

"অফকোর্স, স্বাধীনতার মানে ফ্রীডম।"

"কিসের ফ্রীডম?"

"কেন, শাসনের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, কাজ করার স্বাধীনতা।"

"অকাজ করার স্বাধীনতার কথা শুনেছ?"

"না।"

"দুষ্কর্ম করার স্বাধীনতার কথা শুনেছ?"

"সে আবার কী?"

"ওই তো মানুচন্দ্র, আকাশ থেকে পড়লে মানিক! এ-দেশে যে-কেউ যা-খুশি করতে পারে! চারটে লোক চেপে ধরে তোমার মাথাটা কামিয়ে দিয়ে যেতে পারে।"

"যাঃ, তা কখনও হয়?"

"হয় মানিক। ইট মেরে তোমার জানলার সব কাচ ভেঙে দিয়ে যেতে পারে। তোমার বাগানের সব গাছ উপড়ে নিয়ে যেতে পারে।"

"রাইফেল চালাব, ডালকুত্তা লেলিয়ে দোব।"

"খুনের দায়ে পড়বে। শেষ জীবনটা জেলে কাটবে। তোমার বাগানে বাস্তু-ঘুঘু চরবে।"

"সে কী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনকাল পালটে গেছে ভাই। সেই শান্তশিষ্ট বাঙালির যুগ আর নেই। সব সময় কাড়ানাকাড়া, আর দামামা বাজছে মানুষের রক্তে। সাধে ভদ্রলোক বাড়ি আর বাগান বেচতে চাইছেন?"

"তুমি যখন জানোই, তখন আমাকে শুধু-শুধু নাচিয়ে দিলে কেন? আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়।"

"হতাশ হয়ো না। আমাকে একটু তলিয়ে দেখতে দাও। ধ্যানে সব ধরা পড়বে।"

"সে আবার কী?"

"সে তুমি বুঝবে না।"

"তার মানে তুমি ভূত নামাবে?"

"ভূত ছাড়তেও পারি।"

"তার মানে, তোমার কিছু পোষা ভূত আছে?"

"ধরো, সেই রকমই।"

"তার মানে, তুমি মহাদেব?"

"পাঁচজনে তো সেই রকমই বলে।" বড়দাদু বললেন, "ভুতো, টেলিফোন ডাইরেক্টারিটা নিয়ে আয়।"

আমার এক একদিন এক এক নাম। কাল ছিল গজা, আজ হয়েছে ভুতো। কৃষ্ণের শতনামের মতো, আমার সহস্র নাম।

দাদু বলেন, "তুই আমার নামাবলী। মাঝে মাঝে আসল নামটাই ভুল হয়ে যায়।" দাদু জিজ্ঞেস করেন, "তোর আসল নামটা কী ছিল রে গবা?" আমাকে তখন মায়ের কাছে ছুটতে হয়। স্কুলে, মাঝেমধ্যেই এই নাম ভুলে যাবার জন্যে পিটুনি খেতে হয়। সকাল থেকে যার নাম চলেছে অ্যাটলাস কি হটেনটট, সে বারোটার সময় অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের পিণ্টু ডাকে সাড়া দিতে দু'চার মিনিট দেরি করলে কিছু বলার আছে? হয়তো আছে, তা না হলে ডাস্টার-পেটা খেতে হবে কেন?

দাদু ফোনে অবনীকে ডাকলেন। "শোনো হে অবনী।"

অবনীর ঘাড়ে একগাদা কাজ চাপল। গোয়েন্দাগিরি করতে হবে। যেমন, জায়গাটা কোন্ দলের এলাকা? আশেপাশে কী আছে? কলকারখানা আছে? বস্তি আছে? চায়ের দোকান আছে? ক্লাব আছে? নর্দমা কত দূর দিয়ে গেছে? পাকা, না কাঁচা? বড় রাস্তা কতদূরে। এলাকায় ছোট ছেলের সংখ্যা বেশি, না যুবকের সংখ্যা, না বৃদ্ধ? স্কুল কত দূরে!

দাদু এক-একটা ফিরিস্তি বের করছেন, আর মেজদাদু তারিফ করে উঠছেন, "বাহবা, বাহবা!"

পাক্কা আধঘণ্টা লাগল টেলিফোন শেষ করতে।

মেজদাদু বললেন, "কবে নাগাদ তোমার খবর আসবে?"

"কালই এসে যাবে। অবনী কাজ ফেলে রাখার ছেলে নয়। তার নীতি হল, কাজ সেরে বসি, শত্তুর মেরে হাসি।"

দাদু বললেন, "যাও টমেটম, ডাইরেক্টারিটা যথাস্থানে রেখে এসো, তোমার ফাদার আবার এখুনি চেঁচাতে শুরু করবে। বড় মেথডিক্যাল মানুষ। আর হবে না কেন? মেথডিক্যাল না হলে জীবনে অত উন্নতি হয়! এই যেমন আমার কাজের ধারা দ্যাখো। সব আটঘাট বেঁধে ধীরে-ধীরে এগোই। তোর মতো অমন হালুম করে লাফিয়ে পড়ি না। সব সময় মনে রাখতে হবে, আমরা বাঘ নই, মানুষ।"

"তোমার কি মনে হয়, হালুম করে লাফিয়ে পড়ে বলে বাঘের কোনও ক্ষতি হয়? বাঘ কত বড় প্রাণী জানো? তুমি সামনাসামনি বাঘ দেখেছ?"

"বাঘ দেখিনি? কী বলিস রে? ওই ব্যাটাকে নিয়ে প্রত্যেক বছর শীতকালে আমরা চিড়িয়াখানায় যাই।"

"হ্যাঃ, চিড়িয়াখানার বাঘ আবার বাঘ! ও তো এক একটা শেয়াল। বাঘ দেখেছি আমি। কুমায়ুনের মানুষখেকো। যেমন তার রঙ, তেমনি তার ব্যবহার। আহা!"

"খুব ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার?"

"আরে না না, ভদ্র-অভদ্রের কথা আসছে কী করে? বাঘ কি ভদ্রলোক? বাঘের ব্যবহার বাঘের মতো। এক একটা লাফ কী! এই এ পাড়া থেকে ও পাড়া। হালুম করে মারলে লাফ, মাথার ওপর দিয়ে কোথায় যে চলে গেল!"

"মানে ওভারবাউণ্ডারি! ফীলডিং ভাল না হলে, সব বলই ওভারবাউণ্ডারি হবে। ক্যাচ মিস করা আমাদের ইণ্ডিয়ান টীমের একটা রোগ। এ সব প্লেয়ারদের দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত।"

"নাঃ দাদা, সত্যি তোমার বয়েস হয়েছে। হচ্ছে বাঘের কথা, টেনে আনলে ক্রিকেট। বাঘ কি ক্রিকেট-বল যে লাফিয়ে উঠে ক্যাচ ধরব, আর আম্পায়ার আঙুল তুলে বলবেন, হাউজ দ্যাট? তুমি রোজ একটা করে ভিটামিন খাও।"

"ভিটামিন তুই খা। আমি রোজ পুঁইশাক খাই। শিকারির হাতে রাইফেলটা কী জন্যে থাকে। সেইটা দিয়ে দুম্ করে মারা যায় না?"

"আজ্ঞে না, যায় না। তুমি শিকারের কিছুই বোঝো না।"

"একটা রাইফেল দে না, দেখিয়ে দিচ্ছি, শিকারের কী বুঝি আর না বুঝি।"

"এখন আর তেমন বাঘ নেই, থাকলেও মারা যাবে না।"

"কেন নেই ?"

"নেই তাই নেই।"

"তোমার মাথা। ওই গর্দভের মতো হালুম-লাফ মেরে-মেরেই জাতটা শেষ হয়ে গেল। বাঘের যদি আটঘাট বেঁধে কাজে নামার বুদ্ধি থাকত, তাহলে তোমাকে আর এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়তে হত না, বাঘের পেটে স্বর্গে যেতে।"

"তুমি যাই বলো, বাঘ মানুষের চেয়ে ঢের বড়।"

"বড় হলেই মানুষ হয় না। মানুষ বাঘের চেয়ে ঢের ঢের ঢের বড়। তিন ঢের বড়।"

"বাঘ তা হলে ছ ঢের বড়।"

"মানুষ তা হলে বারো ঢের।"

"বাঘ তা হলে চব্বিশ।"

"মানুষ তা হলে আটচল্লিশ।"

"বাঘ ছিয়ানব্বই।"

"মানুষ তা হলে একশো বিরানব্বই।"

বাঃ, এ যেন নিলাম হচ্ছে ! কার দর কোথায় ওঠে ! নাঃ, ব্যাপারটা ফয়সালা হল না। মা এসে পড়ল। মা এলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। কোনও গোলমাল দেখলেই মা ছুটে আসবে। সেই বলে না, শান্তির শ্বেত পারাবত, দু' দেশের নেতা এক জায়গায় হলেই যা দু'হাতে আকাশে ওড়ান আর বলতে থাকেন, ভাই, ভাই। মা'কে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত।

মা ঘরে ঢুকেই বললে, "তোমাদের কোনও কাজ নেই ?"

দু' দাদু এক সঙ্গে বললেন, "না, আমাদের আবার কাজ কী ! সংসারের সব কাজ আমরা শেষ করে বসে আছি ! আমরা এখন রিটায়ার্ড।"

মা মেজদাদুর দিকে তাকিয়ে বললে, "তোমার দাঁত মাজা হয়েছে ?"

মেজদাদু হেহে করে হেসে বললেন, "দাঁত, আমার দাঁত নিজেই নিজেকে মাজছে। সে হল স্বাধীন, আমার তোয়াক্কাই করে না।"

মা বড়দাদুর দিকে তাকিয়ে বললে, "বাবা, তোমার বেড়ানো হয়ে গেছে ?"

"আজ আবার বেড়ানো কিসের ? আজ তো রবিবার। আমরা এখন বাঘ মারব।"

"দাঁড়াও, তোমাদের বাঘ মারা আমি বার করছি।" মা গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন, "পুষ্প, পুষ্প, এই ঘরটা আগে ঝাঁট দিয়ে মুছে নে।"

দাদু বললেন, "উঠে পড়ো ভায়া, ঝেঁটিয়ে বিদায় করার প্ল্যান। ঝগড়া না করে তুই যে এক জায়গায় চুপ করে বসতে পারিস না ! বয়েস হচ্ছে, স্বভাবটা পাল্টা না !"

"বাঘের অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। বাঘ ইজ এ বাঘ ইজ এ বাঘ।"

পুষ্পদি ফুলঝাড়ু, বালতি আর ন্যাতা নিয়ে নেতার মতো ঘরে ঢুকল।

সন্ধের দিকেই অবনীবাবু এসে গেলেন। ন্যাড়া মাথায় ক্রিকেট টুপি। টাইট প্যান্ট, জামা ভেতরে গোঁজা। স্বাস্থ্য বেশ ভালই। দরজার সামনে আমাকে দেখে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে খোকা, ইহা কি গঙ্গাধরবাবুর বাড়ি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। গেটের বাইরেই তো নাম লেখা আছে।"

"ছোটখাটো জিনিস আমার চোখে পড়ে না।"

"আমার দাদু ছোটখাটো মানুষ ?"

"আচ্ছা আড়বোঝা ছেলে তো ! দাদু বাড়ি আছেন ?"

"হ্যাঁ, আছেন।"

"গিয়ে বলো অবনী এসেছে।"

"এসেছে নয়, এসেছেন।"

"সে তো তুমি বলবে, আমি বলব কেন ? কুকুর আছে ?"

"হ্যাঁ আছে।"

"তিনি কোথায় ?"

"তিনি নয়, সে।"

"ওই হল রে, বাবা। সব কথায় অত ভুল ধরো কেন ? সেই কুত্তাটা এখন কোথায় ?"

"কুত্তা নয়, কুকুর।"

"খাতির করলেও ভুল ধরবে, খাতির না-করলেও ভুল ধরবে। এ ছেলে বড় হলে দেখছি নির্ঘাত স্কুলমাস্টার হবে।"

"কুকুর এখন ছাতে দাদুর সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছে আর গান গাইছে।"

"গান গাইছে নয়, ন্যাজ নাড়ছে। এইবার তোমার ভুল ধরেছি।"

"আমাদের কুকুর গানও গায়।"

আমাকে আর যেতে হল না, দাদুই এসে গেলেন। "কার সঙ্গে বক বক করছিস রে হুলো ? ও, অবনী এসে গেছ ! এসো এসো, ভেতরে এসো।"

সেই অদ্ভুত অবনীবাবু হাতজোড় করে দাদুর পেছন-পেছন বসার ঘরে ঢুকে গেলেন। ভাল সোফায় না বসে একটা চেয়ারে বসলেন। দাদু বললেন, "ওখানে বসলে কেন ?"

"আজ্ঞে, যার যেমন জায়গা। ও সব বড় মানুষের জন্যে। আমাদের জন্যে এই ভাল।"

"তুমি কি ছোট মানুষ ?"

"আরেব্বাপ, কী বলছেন আপনি ? আমার কোনও এজুকেশন নেই। আপনি বাঁচিয়েছিলেন বলে জেলের বাইরে আছি, করে খাচ্ছি !"

"তুমি আমাকে ভালবাসো ?"

"আরেব্বাপ, জিন্দেগিতে আমি একজনকেই ভালবাসি, সে হল আপনি।"

ভদ্রলোক কী ভাবে কথা বলছেন ! কী রকম ভয়ে-ভয়ে বসে আছেন জড়সড় হয়ে !

মেজদাদুর শুকনো কাসি হয়েছে। খক্ খক্ করতে-করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। বড়দাদু প্রশ্ন করার আগে মেজদাদুই শুরু করলেন, "হ্যাঁ, তা হলে কী বুঝলেন ?"

বড়দাদু বললেন, "তুমি একদম নাক গলাবে না। চুপ করে বোসো। খক্ খক্ করে কাসাও চলবে না।"

"যদি কাসি পায় ?"

"বাইরের বাগানে চলে যাবে। ঝাউগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেসে আসবে।"

অবনীবাবু বললেন, "তা হলে আমি স্টার্ট করি।"

"না, আমার একটা প্রশ্ন আছে। তোমার কি কেউ মারা গেছেন ?"

"কই, না তো !"

"তা হলে মাথা মুড়িয়েছ কেন ?"

"আজ্ঞে, চুলের চিকিৎসা চলেছে। ভুশভুশ করে সব চুলে উঠে যাচ্ছে। দু'বার ন্যাড়া হয়েছি, আরও দু'বার ন্যাড়া হব।"

"এবার তা হলে একটা টিকিও রাখ। ইলেকট্রিসিটি খেলবে, খাড়া-খাড়া চুল বেরোবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব। তা হলে বলি।"

মেজদাদু বাধা দিলেন। "চুলের বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে। মাথা যখন মুড়িয়েছেন, তখন আর-একটা কাজ করুন, রোজ সকালে মাথায় গরম গোবর লেপে দিন। পনেরো দিনের মধ্যে কচি-কচি চুল বেরিয়ে যাবে।"

"গরম গোবর আমি পাব কোথায় ?"

"একটা গোরু কিনে ফেলুন। পেটে দুধ, মাথায় গোবর।"

"অবনী।" বড়দাদু কড়া গলায় ডাকলেন, "বড় বাজে বকছ হে নাও শুরু করো। জানো আমার সময়ের দাম আছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, চারপাশ ফাঁকা।"

"কোথায় ফাঁকা ?"

"ওই যে, বাগানবাড়িটা যেখানে। চারপাশে ধুধু মাঠ, অচেনা পথঘাট। কাছাকাছি একটা নদী আছে। নাম, ইছামতী।"

মেজদাদু বললেন, "ব্যাস, ব্যাস, আর আমার কিছু চাই না। নদী,

বাগানবাড়ি। বহুদিনের ইচ্ছে, শেষ জীবনটা লিখে কাটাব। জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রথম বইটার নাম হবে 'ভদ্রলোক বাঘ, অভদ্র মানুষ'। দ্বিতীয় বইটার নাম, 'সাহসী চিতা'।"

বড়দাদু বললেন, "আমি আগেই বলে রাখছি, তোমার ওই সব রাবিশ আমি পড়তেও পারব না, ভূমিকাও লিখতে পারব না।"

"কে বলছে তোমাকে ভূমিকা লিখতে? আমি বিলেত থেকে জেরাল্ড ডারেলকে দিয়ে ভূমিকা লিখিয়ে আনব।"

"তাই এনো? অবনী, তুমি বলে যাও।"

"আজ্ঞে, আশেপাশে যখন মানুষই নেই, তখন ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতীর প্রশ্নই আসে না। আসে কি?"

"না, আসে না। রাস্তাঘাট?"

"পিচের রাস্তা থেকে আর-একটা পিচের রাস্তা নেমেছে। সেই রাস্তা থেকে আর-একটা সরু রাস্তা, সেটা থেকে আর-একটা। ঘুরপাক খেতে-খেতে সেই বাড়ি।"

"কতটা হাঁটতে হবে?"

"মাইল দুয়েক।"

"চলবে না। ক্যানসেল।"

মেজদাদু বললেন, "ক্যানসেল কেন?"

"অতটা কে হাঁটবে?"

"সাইকেল কিনব।"

অবনীবাবু বললেন, "আপনারা অন্তত একবার দেখে আসবেন চলুন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বাগানে খুব ভাল-ভাল গাছ আছে। পাখির ডাক কী, কানের কাছে যেন সারেঙ্গি বাজছে সারাদিন।"

"বেশ, তাই হোক। চলো, কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ি।"

মেজদাদু বললেন, "খুউব ভাল কথা।"

বড়দাদু বললেন, "তুমি চুপ করো। ভাল কথা কি খারাপ কথা, সে আমি বুঝব। অবনী, তুমি আজ রাতে এখানেই থাকবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু ছাতে শোব।"

"তাই শুয়ো!"

"মাংসর ঝোল দিয়ে ভাত খাব।"

"কেন, মাংস কেন?"

"বড় লোভ হয়েছে।"

"আচ্ছা, তাই হবে।"

"একটু চাটনি।"

"তাও হবে।"

"শেষ পাতে একটু দই।"

"ব্যাস, ওইতেই শেষ।"

"হ্যাঁ, আর না, শুধু এক খিলি পান।"

"এক খিলিতে তোমার হবে না বাপু, দুখিলি পাবে।"

মেজদাদু বললেন, "জর্দা চলে নাকি?"

"আজ্ঞে, সে ব্যবস্থা আমার পকেটে আছে।"

"আমার স্ত্রীর কাছে লাখনোর এক নম্বর জিনিস আছে। তোমাকে দেব।"

"আচ্ছা, আমি তাহলে একটু বেড়িয়ে-টেড়িয়ে আসি।"

"হ্যাঁ, এসো, বুঝতেই পেরেছি, অনেকক্ষণ ধূমপান হয়নি।"

"আজ্ঞে, ধরেছেন ঠিক।"

সকাল না-হতেই বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বাথরুম থেকে বড়দাদু বেরোন তো মেজদাদু ঢোকেন। মেজদাদু বেরোন তো বড়দাদু ঢোকেন। ওঁদের এই ঘনঘন আনাগোনা দেখে মা রেগে-রেগে উঠছে। বাবা বললেন, "তুমি আর আগুনে কাঠ গুঁজো না। দু'জনেই নার্ভাস ডায়েরিয়ায় ভুগছেন, পারো তো ঘুমের ওষুধ খাওয়াও।"

"যাবেন বাগানবাড়ি দেখতে, অত ভয়ের কী আছে বাপু? সঙ্গে অমন ছেলে যাচ্ছে!"

অবনীবাবু এক-রাতেই আমার দাদা হয়ে গেছেন। অবনীদা বুকটা একবার ফুলিয়ে নিলেন। বাবা বললেন, "দুই বৃদ্ধকে নিয়ে আজ তোমার বরাতে খুব দুঃখ আছে।"

"আজ্ঞে, দুঃখই তো জীবন।"

"হ্যাঁ, বুঝবে ঠ্যালা। তখন এই কথাটা তোমার মনে থাকলে হয়।"

বড়দাদু বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন, মেজদাদু ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, "তোমার কী হল বলো তো দাদা। এতবার যাচ্ছ আর আসছ!"

অবনীদা বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, আজ আর আপনারা যেতে পারবেন না। আমি বরং কাল সকালে আসি।"

"আরে না না। এটা আমাদের বংশগত রোগ। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে না দিলে, এ চলতেই থাকবে।"

"আজ্ঞে, ধাক্কা দেবার কেউ নেই? এদিকে তো নটা প্রায় বাজল।"

"ধাক্কা কে দেবে বল, আমরা যে বড্ড বড় হয়ে বসে আছি।"

"তা হলে নিজেরাই এবার নিজেদের ধাক্কা দিন।"

"হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। আমি মেজকে দোব, মেজ আমাকে দেবে।"

যাক, দশটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। দাদুর ব্যাপারে আমাকে সঙ্গে থাকতেই হবে। মা'ও তাই চায়। বাইরে একা একা বেরোলে দাদু ভীষণ চানাচুর খান। সেবার দুশো গ্রাম চানাচুর খেয়ে ভীষণ কাণ্ড করেছিলেন। আমরা চলেছি টানা ট্যাকসিতে। মেজদাদুর গা থেকে ভুর ভুর করে চন্দনের গন্ধ বেরোচ্ছে। অবনীদার মুখ থেকে জর্দার।

হু-হু করে গাড়ি ছুটিয়ে প্রায় বারোটা নাগাদ আমরা সেই বাগানবাড়ির সামনে এসে পৌঁছলুম। মেজদাদু নেমেই বললেন, "আহা, স্বর্গ!"

বড়দাদু ধমক দিলেন, "তুমি একটাও বাজে কথা বলবে না। স্বর্গ কি নরক সে আমরা বুঝব।"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বললেন, "ঠিক বলেছেন দাদু, বেশি লাফালাফি করলেই চড়া দাম হাঁকবে।"

বড়দাদু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার ওই দাদু ডাকটা বদলানো যায় না! লেখাপড়া তো করেছ, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, বুড়োকে বুড়ো বলতে নেই, এ-শিক্ষাটা হয়নি?"

"আজ্ঞে, তাহলে কী বলব?"

"কিছুই বলবে না। না বলেও তো বলা যায়।"

মেজদাদু যোগ করলেন, "যেমন না-বলা বাণী!"

"আবার বাজে বকছ?"

"যাব্বাবা, একটা কথাও বলা যাবে না?"

"না, যাবে না। কোন্ কথায়, কী কথা বেরিয়ে আসে, কে বলতে পারে!"

গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল। আমরা আবার ফিরে যাব।

বাগানটা সত্যিই বিশাল। বহু ধরনের গাছ। আমগাছে বোল এসেছে। গন্ধে মাত। মৌমাছি ভ্যান-ভ্যান করছে।

বড়দাদু আপন মনে বললেন, "অ্যাসেট। এমন জিনিস কি কেউ ছাড়বে! কে জানে!"

মেজদাদু বললেন, "এবার কী হল দাদা! তুমি যে প্রশংসা করলে! দাম বেড়ে যাবে না?"

"তুমি ছাড়া কেউ শুনেছে?"

"আমি যখন স্বর্গ বলেছিলুম, তুমি ছাড়া কেউ শুনেছিল?"

"তুই বড় তর্ক করিস।"

"হ্যাঁ, সত্যি কথা বললেই তর্ক হয়ে যায়!"

"তোর বাড়ি তুইই তাহলে বোঝ, আমি তোর কোনও ব্যাপারে থাকতে চাই না। ফিরে চললুম।"

বড়দাদু সত্যিসত্যিই গাড়ির দিকে ফিরে চললেন। অবনীদা এক হাত ধরেছেন, মেজদাদু আর এক হাত, আমি জাপটে ধরেছি কোমর।

মেজদাদু বলছেন, "তুমি চট করে বড় রেগে যাও।"

অবনীদা বলছেন, "নিজেদের মধ্যে অশান্তি ঠিক নয়।"

গাড়ির চালক বলছেন, "ওই করেই বাঙালি জাতটা শেষ হয়ে গেল।"

বড়দাদু বললেন, "আমরা বাঙালি নই। দেখবে আমাদের একতা? চল্ মেজ, চল্।"

হাওয়া সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে গেল। বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই। তুমি
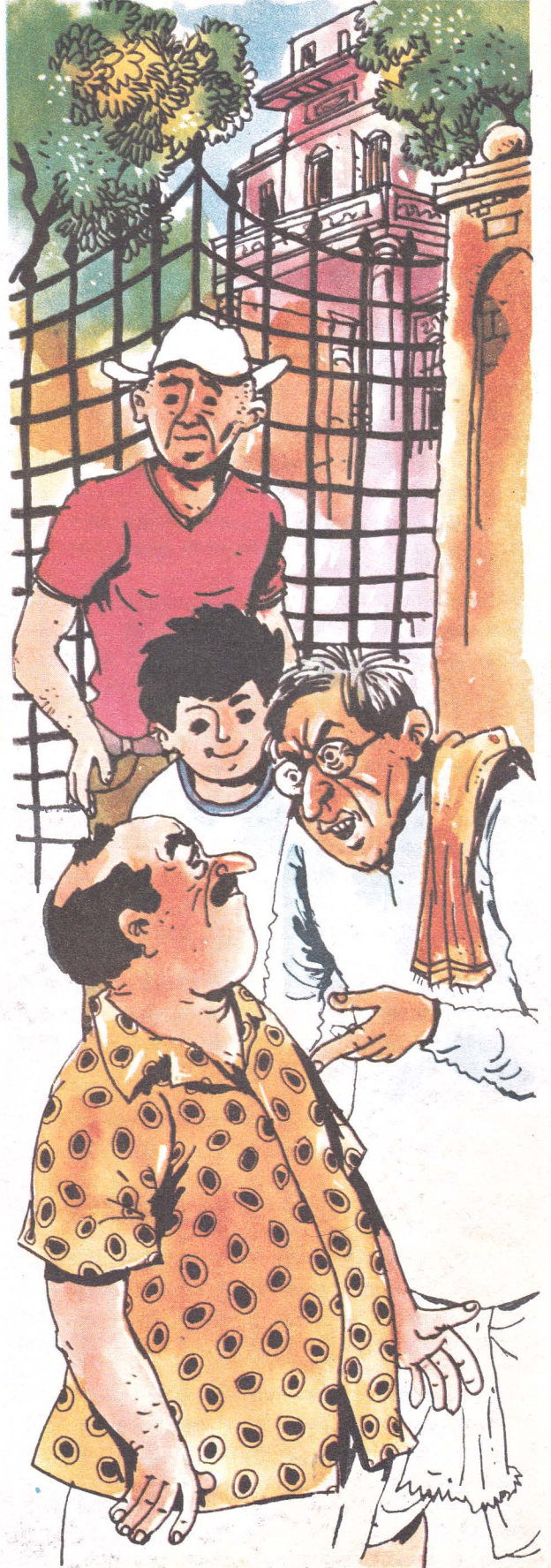
আসল খবরটাই নাওনি অবনী।"

"কালও তো আমি লোক দেখে গেছি। দাঁড়ান, একবার দেখি!"

অবনীদা গেটের লোহায় তালা বাজাতে লাগলেন। কী তার শব্দ!

অনেক দূর থেকে কে একজন হেঁকে বললেন, "মেরে তক্তা করে দোব। আবার ফিরে এসেছিস!"

অবনীদা চিৎকার করে বললেন, "আমরা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি স্যার।"

বড়দাদু মৃদু ধমক দিলেন, "স্যার বলছ কেন? আমরা কি চাকরি চাইতে এসেছি? আমরা কিনতে এসেছি। সেই ভাবে ডাঁটে কথা বলো অবনী।"

অবনীদা আবার চিৎকার করলেন, "আমরা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি মশাই।"

"মাথা কিনে নিয়েছেন!" উত্তর এল জবরদস্ত।

অবনীদা বড়দাদুর দিকে করুণ মুখে চেয়ে বললেন, "এর উত্তরে কী বলব?"

"কিচ্ছু বলবে না। বড় মাছ তুলতে গেলে একটু খেলাতে হয়। এখন স্রেফ সুতো ছেড়ে যাও।"

ঢলঢলে সাদা প্যান্ট আর হাফ-হাতা জামা পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। সামনে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ঝুলছে। দেখলেই হাসি পায়। কোথাও কিছু নেই, এতখানি একটা দাড়ি। চোখে মোটা চশমা। গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বললেন, "সব কিছুর একটা সভ্যতা আছে।"

বড়দাদু বললেন, "আমরা তো কোনো অসভ্যতা করিনি।"

"সভ্যতা, অসভ্যতার বোধটাই তো আপনাদের নেই। গেটে তালা বাজাচ্ছিলেন কেন? এটা কি আফ্রিকান বাদ্যযন্ত্র? আপনারা কি কনসার্ট পার্টি?"

"আজ্ঞে না।"

"তবে?"

"কী ভাবে তাহলে ডাকব? কলিংবেল নেই যে।"

"ডাকবেন না। গেটে তালা মানেই দেখা করার সময় চলে গেছে। সকাল নটা থেকে এগারোটা, বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা।"

"কই, কাগজে লেখেননি তো?"

"সব কথা কি লেখা যায়! বিজ্ঞাপনের খরচ জানেন? সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু জিনিস বুঝে নিতে হয়।"

মেজদাদু বললেন, "অলিখিত আইনের মতো!"

"দ্যাটস রাইট।"

বড়দাদু বললেন, "আমরা তাহলে কী করব এখন? ফিরে যাব?"

"সে আপনাদের ইচ্ছে। ফিরেও যেতে পারেন, আশেপাশে ঘোরাঘুরিও করতে পারেন, তিনটে বাজলে আসবেন। হ্যাঁ, যাবার আগে একটিন রঙের দাম দিয়ে যেতে হবে।"

"সে আবার কী!"

"এই যে তালা ঠুকে এই জায়গার রঙ চটিয়েছেন।"

বড়দাদু বললেন, "প্রমাণ আছে?"

"তার মানে?"

"ওটা যে চটেই ছিল না তার কোনও প্রমাণ আছে?"

"আমি বলছি, এই তো যথেষ্ট প্রমাণ।"

"তা হলে আদালতেই ফয়সালা হবে। এই নিন আমার কার্ড।"

বড়দাদু গেটের এপাশ থেকে ওপাশে ভদ্রলোককে একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন। আমি জানি কী লেখা আছে, দাদুর নাম, এম এ, এল এল বি, অ্যাডভোকেট, ক্যালকাটা হাইকোর্ট। নাও, এবার বোঝো ঠ্যালা। আমার দাদুকে না চিনেই বড় বড় কথা।

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি আইন ব্যবসায়ী?"

"কী মনে হচ্ছে? একটা মানহানির মামলা তা হলে ঠুকে দি?"

মেজদাদু বললেন,"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠুকে দাও দাদা। মেরে তক্তা করে দোব বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনি কে? অ্যাডিং ফিউয়েল টু দি ফায়ার?"

"আজ্ঞে, আগুনটা জ্বেলেছে কে? এইবার বুঝুন ঠ্যালা। আমি উত্তরপ্রদেশের কনজারভেটার অব ফরেস্ট, বহু বাঘ মেরেছি জীবনে, বড় বড় বাঘ, বড় বড় বাঘ।"

"আমি কে জানেন?"

"আপনি? আপনি একজন অভদ্রলোক।"

"তা হলে এই নিন আমার কার্ড।"

উঃ, দারুণ জমেছে! কার্ডের খেলা চলেছে। তাস খেলা। টেক্কার ওপর টেক্কা পড়ছে।

বড়দাদু কার্ডটা উলটে-পালটে দেখলেন। মেজদাদু পাশ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছেন। আমি আর অবনীদা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

বড়দাদু বললেন, "আপনি ডক্টর ভবেশ মহাপাত্র? আমার বিশ্বাস হয় না।"

মেজদাদু বললেন, স্পেস সাইনটিস্ট ভবেশ মহাপাত্র, যিনি মহাশূন্যে রকেট ওড়ান? তাঁর তো এখন ফ্লোরিডায় থাকার কথা।"

"আঃ, তুমি চুপ করো। সব কথায় কথা বলো কেন? ফ্লোরিডা কি না জানি না, তবে ভারতে থাকার কথা নয়। বড় বড় লোকেরা সব ভারতের বাইরে থাকেন।"

ভবেশবাবু বললেন, "আমি ফিরে এসেছি। আমি ফিরে এসেছি। সবাই বলছে, আমার মাথাটা নাকি একটু খারাপ হয়েছে।"

"প্রমাণ আছে?"

"পাগলের প্রমাণ পাগলামি!"

"যেমন?"

"আমার বিশ্বাস ঢেঁকি স্বর্গে যেতে পারে। আমি সেই ঢেঁকির খোঁজে ভারতে এসেছি।"

"আমিও বিশ্বাস করি। নারদ যে ঢেঁকি চড়ে আসা-যাওয়া করতেন, সেই বিশেষ ধরনের ঢেঁকিটি খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষের কোথাও-না-কোথাও অবহেলায় পড়ে আছে।"

"আফগানিস্থানেও থাকতে পারে।"

"এ আপনি কী বলছেন, ঢেঁকি হল ভারতবর্ষের জিনিস, বিশেষত বাংলার।"

"আরে মশাই, ঢেঁকি যে সময় বাহন ছিল, সেই সময় বিশাল আর-একটা মহাদেশ ছিল, ভারত, আফ্রিকা-টাফ্রিকা নিয়ে।"

"আপনি কিস্যু জানেন না।"

"আপনি কিস্যু জানেন না, এ আপনার হাইকোর্ট নয়।"

"আপনি ঘোড়ার ডিম জানেন।"

"ঘোড়ারও যে ডিম হয়, তাই তো আপনি জানেন না।"

"তাই নাকি? কোন্ ঘোড়ার, আপনার ঘোড়ার?"

"আজ্ঞে না, পক্ষীরাজের। আমার কাছে আছে, দেখতে চান?"

"বাড়িতে ঢুকতেই দিচ্ছেন না তো ডিম দেখা!"

"এইবার দোব, আপনি আমার মনের মানুষ, তবে একটা শর্ত। ঢেঁকি শুধু বাংলা দেশেই খুঁজলে হবে না, এলাকা বাড়াতে হবে। ওদিকে এশিয়া মাইনর, এদিকে আফ্রিকা।"

"বেশ, তাই হবে।"

ঝলঝলে জামার পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে তিনি তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। একবার এ চাবি ঢোকান, একবার ও চাবি ঢোকান। তালা কিন্তু খোলে না। কী করে খুলবে! তালা একটা, চাবি পঞ্চাশটা। আমার দাদুর দেরাজ খোলার অবস্থা। ভুল চাবিটাই বারে-বারে ঘুরে ঘুরে আসে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তিনি করুণ মুখে বললেন, "কী হবে, চাবি যে মিলছে না! আপনারা গেট টপকে ঢুকতে পারেন না? আমার ছেলে ঢোকে।"

"আজ্ঞে না, সে-বয়েস আর নেই। ছেলেবেলায় টিফিন আওয়ারের পর স্কুলে ঢুকেছি গেট টপকে, যৌবনে যাত্রা দেখে বাড়ি ঢুকেছি পাঁচিল টপকে।"

"আমার এই তালাটা মাঝে মাঝে বড় ভোগায়। একটা কাজ করলে হয়, যখন খুলবে তখন যদি ঢোকেন।"

"তার মানে?"

"মানে খুব সহজ, বাইচান্স, এক সময় চাবি লাগবেই, তালা খুলবেই, সে ধরুন আজও হতে পারে, কালও হতে পারে, তখন টুক

করে ঢুকে পড়বেন।"

"তার মানে, সেই দুর্গ অবরোধের মতো সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমরা বাইরে বসে থাকব দিনের পর দিন, বছরের পর বছর! মামার বাড়ি আর কী?"

"তা হলে আপনারা চেষ্টা করুন।"

রাগ করে ভদ্রলোক চাবির থোলোটা আমাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

দাদু বললেন, "অবনী, চেষ্টা করো।"

অবনীদা একের পর এক চাবি লাগাচ্ছেন আর খুলছেন। বিশাল দু' মানুষ উঁচু গেট। সহজে টপকানো যাবে না। মাথার দিকে খোঁচা-খোঁচা বর্শার ফলা। বেশ জম্পেশ গেট। অবনীদা ঘেমে উঠেছেন। এতক্ষণ আমরা লক্ষ করিনি, পেছনে আর এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন, "ব্যর্থ চেষ্টা, ওই চাবির মধ্যে তালার চাবি নেই। চাবি আমার কাছে। এই দেখুন।"

সুন্দর চেহারার যুবক। এক মাথা এলোমেলো চুল। চোখে রঙিন চশমা। দু' আঙুলে চাবিটি তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভবেশবাবু চিৎকার করে বললেন, "ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, ও হল বিদেশী এজেন্ট, আমার গবেষণার শত্রু, তোমাকে আমি মেরে তক্তা করে দোব। তোমাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করে দিয়েছি, আবার এসেছ, আবার এসেছ!"

ভদ্রলোক করুণ মুখে বললেন, "আপনারা, আমার বাবাকে ক্ষমা করুন। সম্প্রতি ওঁর মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে। দূর থেকে এসেছেন, আপনাদের বাড়ির ভেতরে সাদরে নিয়ে যেতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন।"

ভবেশবাবুর পেছনে এক বিদেশী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোক বললেন, "আমার স্ত্রী লরা। লরা, তুমি ওঁকে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো।"

সেই বিদেশী মহিলা, অসীম স্নেহে দেশী বিজ্ঞানীকে মেয়ের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলেকে যে ভাবে ভোলাতে থাকে, সেই ভাবে ভোলাতে লাগলেন।

ভবেশবাবু চিৎকার করে বললেন, "উড়ন্ত ঢেঁকি ছিল, এখনও আছে, এ-কথা আপনারা বিশ্বাস করেন কি না!"

দাদু বললেন, "না, করি না, ও হল গল্প-কথা, রূপক। আসলে ঢেঁকি হল রকেট।"

"ইউ আর অল লায়ারস, ফরেন এজেন্টস।"

ভদ্রমহিলা ভবেশবাবুকে ভেতরে নিয়ে চলেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে বলছেন, 'তোমরা দেশের শত্রু।'

বড়দাদু বললেন, "ভেরি স্যাড, খুবই দুঃখের।"

ভবেশবাবুর ছেলে বললেন, "ভেরি স্যাড।"

দাদু বললেন, "উড়ন্ত ঢেঁকি কিন্তু থাকতে পারে। একবার খোঁজপাত করে দেখলে হয় না?"

"মরেছে, পাগলামি দেখছি ছোঁয়াচে। আপনারা এখুনি এঁকে নিয়ে চলে যান। তা না হলে আমার বাবার মতো অবস্থা হবে। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঢেঁকি কিনে ফেলেছেন। এই বাগানবাড়ি বেচে সারা পৃথিবীর ঢেঁকি কিনতে চান।"

দাদু বললেন, "পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কারকই প্রথম দিকে পাগল বলে পরিচিত হতেন। হঠাৎ একটা কিছু হয়ে গেলে, তোমরাই তখন এঁকে মাথায় তুলে নাচবে। পরশপাথর কি সত্যিই ছিল না? পক্ষীরাজ কি নিছক কল্পনা? নাগপাশ কি গাঁজাখুরি? পুষ্পক রথ কি গল্পকথা?"

অবনীদা ফিসফিস করে বললেন, "যাঃ, হয়ে গেল! আর একটা উইকেট পড়ে গেল!"

আমি বললুম, "পরশপাথর কিন্তু সত্যিই আছে।"

অবনীদা বললেন, "যাঃ, আরো একটা উইকেট পড়ে গেল!"

মেজদাদু বললেন, "আমার কেমন মনে হয়, কামধেনু এখনও হয়তো আছে। কল্পতরুও থাকতে পারে।"

অবনীদা বললেন, "যাঃ, হোল ফ্যামিলি আউট!"

আকাশ থেকে ঝাঁপ

আশিস দেবরায়

কলকাতার আকাশে একটা এরোপ্লেনে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ যদি গড়ের মাঠে তোমার নেমে পড়তে ইচ্ছে হয়, তা কি সম্ভব? তোমার জন্যে পাইলট কিন্তু প্লেন নামাবে না, তাকে বিমান-বন্দরে ফিরে যেতেই হবে। এদিকে এরোপ্লেন থেকে গড়ের মাঠে সরাসরি ঝাঁপ দেওয়াও তো সম্ভব নয়। ঘন্টায় প্রায় ১৯০ কিলোমিটার বেগে অত উঁচু থেকে মাটিতে পড়লে তোমার অবস্থা কী হতে পারে তা তো বুঝতেই পারছ। কিন্তু এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দেবার সময় তুমি যদি শরীরে একটা প্যারাশুট লাগিয়ে নাও, তা হলে তোমার নিম্নমুখী গতিবেগ প্রতিহত হতে-হতে কমে যাবে, এবং তুমি ধীরেসুস্থে বাতাসে ভাসতে ভাসতে খোশমেজাজে ময়দানের বুকে নেমে আসবে। যদি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে এসে পড়ো, তাহলে সেখানে যারা বেড়াতে এসেছে, সবাই হাঁ করে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর যদি ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের মাঠে ফুটবল-খেলার মাঝখানে নেমে আসো, তা হলে কী হবে ভাবো তো! হয়তো উত্তেজনার মাথায় মাথায় তোমাকে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরতে হবে।

তার আগে এসো, প্যারাশুট জিনিসটা কী একটু জেনে নেওয়া যাক। অনেক উঁচু থেকে নিরাপদে মাটিতে নামার জন্যে ছাতার মতো ছড়ানো একটি জিনিসের নাম প্যারাশুট। বাংলায় 'অবতরণছত্র' বলা যেতে পারে। প্যারাশুটের জন্ম ফ্রান্সে। দুটি ফরাসি শব্দ 'পেরের' এবং 'শুট', যাদের অর্থ যথাক্রমে 'এড়ানো' ও 'ভূপতিত হওয়া'— মিলিয়ে 'প্যারাশুট' শব্দের সৃষ্টি। ১৭৭৭ সাল নাগাদ বেলুনে শূন্যে ভ্রমণকারী জোশেফ মঁ্যাগলফিয়ে নামে ফরাসি ভদ্রলোক প্যারাশুটে একটি জীবন্ত ভেড়া বেঁধে বহু উঁচু আকাশ থেকে ফেলে দেন, এবং ১৭৮৫ সালে জে.পি. ব্লঁশার নামে আর-একজন ফরাসি একটি কুকুরকে ঠিক তেমনিভাবে প্যারাশুটে বেঁধে বেলুন থেকে নামিয়ে দেন। দুটি জন্তুই নিরাপদে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। ইতিমধ্যে ১৭৮৩ সালে এল.এস. ল্যানর্মাঁ নামে এক ফরাসি ভদ্রলোক প্যারাশুটের সাহায্যে আকাশ থেকে মাটিতে নামতে সমর্থ হন। একটা কথা বলে রাখা দরকার। পৃথিবীবিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কিন্তু এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রায় আড়াইশো বছর আগে প্যারাশুটের একটি মডেল এঁকেছিলেন। তাঁর ছবিতে একটি লোককে লিনেনে-তৈরি পিরামিডের আকারের তাঁবুতে চারটে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। আঁদ্রে জাক্ গার্নেরাঁ নামে আর-এক ফরাসির চেষ্টায় সর্বপ্রথম নিয়মিতভাবে প্যারাশুটে পৃথিবীতে নেমে আসা শুরু হয়। ১৭৯৭ সালের ২২ অক্টোবর ২০০০ ফুট উঁচু থেকে প্যারাশুটের সাহায্যে তিনি প্যারিস শহরে নেমে আসেন। তিনিই আবার ১৮০২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডে ৮০০০ ফুট উঁচু থেকে মাটিতে নেমে এসে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। ক্রমশ দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য শূন্যে ভাসমান বেলুন থেকে প্যারাশুটের সাহায্যে পৃথিবীর বুকে নেমে আসাটা একটি জনপ্রিয় ক্রীড়ার পর্যায়ে এসে দাঁড়াল।

প্লেন থেকে ঝাঁপ দেওয়ার আগে তোমাকে শরীরের সঙ্গে প্যারাশুট ভালভাবে বেঁধে নিতে হবে। আধুনিক প্যারাশুট নাইলন দিয়ে তৈরি; এর চাঁদোয়ার ব্যাস খোলা অবস্থায় ৫-৬ মিটারের মতো বড় হয়। সবকিছু মিলিয়ে ওজন হবে দশ কিলোগ্রামের মতো। প্যারাশুট ঠিকভাবে লাগিয়ে নিয়ে এবার প্লেন থেকে ঝাঁপ দাও। কয়েক সেকেণ্ড নীচে নামার পর প্যারাশুটের দড়ির নির্দিষ্ট জায়গায় টান মেরে তা খুলে ফেলতে হবে। আস্তে আস্তে প্যারাশুট খুলতে শুরু করবে, এবং যতই তাতে বাতাসের ধাক্কা লাগবে, ততই চাঁদোয়াটা সম্পূর্ণ খুলে আসবে। শূন্য আকাশে, খোলা বাতাসে ধীরে-ধীরে বুক ফুলিয়ে পৃথিবীর বুকে তুমি নেমে আসছ। কী রোমাঞ্চকর ব্যাপার! ১৯১২ সালে এরোপ্লেন

থেকে সর্বপ্রথম প্যারাশুটের সাহায্যে পৃথিবীতে নামা হয়। তার আগে ১৯০৮ সালে এ.এল. স্টিভেন্স নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক একটি প্যারাশুট তৈরি করেন, যেটা সহজেই বোঁচকার মতো ভাঁজ করা যায় এবং প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে কিছুটা নেমেই দড়ি টেনে খোলা যায়। ১৯১৮ সালে ফ্লয়েড স্মিথ নামে একজন আমেরিকান এমন এক প্যারাশুট তৈরি করেন যা প্যাক করে রাখা যায়। তবে আধুনিক প্যারাশুট তৈরির ইতিহাসের সঙ্গে লেসলি আরভিনের নামই সবচেয়ে বেশি জড়িত।

এরোপ্লেন থেকে প্যারাশুটের সাহায্যে যে-কোনো স্থানে সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র নামানো সম্ভব হওয়ার ফলে যুদ্ধের কৌশলও অনেক পাল্টে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্র প্যারাশুটের সাহায্যে এরোপ্লেন থেকে বিশেষ-বিশেষ জায়গায় সৈন্য নামিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করার কৌশলকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগায়। ফিনল্যাণ্ডের উপরে আক্রমণ চালাবার সময়ে রাশিয়াও ব্যাপকভাবে প্যারাশুট ব্যবহার করেছিল। একই কৌশলে জার্মানিও ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে নরওয়ে এবং মে মাসে নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গ দখল করে। এইসব দেশের নাগরিকেরা কিছু বোঝার আগেই জার্মান সৈন্যবাহিনী হঠাৎ এরোপ্লেন থেকে প্যারাশুটের সাহায্যে ওদের দেশে নেমে এসে আক্রমণ শুরু করে।

প্যারাশুটের সাহায্যে আজকাল বিপন্ন এরোপ্লেনের বৈমানিক ও যাত্রীদেরও রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। পালিয়ে গিয়ে প্যারাশুটের সাহায্যে শত্রুভূমিতেই নেমে জীবনরক্ষা করার এক অভূতপূর্ব ঘটনার কথা বলছি শোনো। স্থান জার্মানি, সময় ১৯৪১ সালের ১০ মে। নাৎসি জার্মানির তৃতীয় স্থানাধিকারী নেতা রুডলফ হেস জার্মানি থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। স্ত্রী, শিশু ও মাকে জার্মানিতে রেখে তিনি গভীর রাত্রে এক এরোপ্লেনে উঠে স্কটল্যাণ্ডে পালিয়ে আসেন। অন্ধকারে এরোপ্লেন নামানো সম্ভব হবে না ভেবে তিনি তাঁর জীবনে প্রথম শরীরে প্যারাশুট বেঁধে অন্ধকারের মধ্যেই প্লেন থেকে ঝাঁপ দিলেন। মাটিতে নেমে আসার সময় তাঁর পায়ে চোট লেগেছিল ; কিন্তু তিনি নিজের জীবনরক্ষায় সমর্থ হয়েছিলেন।

ও হ্যাঁ, আর একটা জরুরি কথাই বলা হয়নি। শূন্য থেকে যখন মাটিতে নেমে আসছ, তখন প্যারাশুটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার পুরো দায়িত্ব কিন্তু তোমার। তোমার প্যারাশুট যদি হুগলি নদীর দিকে বা চৌরঙ্গির বিরাট অট্টালিকার দিকে ছুটে যায়, তাহলে দড়ির গোছা সুবিধেমতো টেনে গতি পরিবর্তন করে নাও। যাঁরা প্যারাশুটের সাহায্যে মাটিতে নামায় অভিজ্ঞ, তাঁরা এইভাবে মোটামুটি নির্দিষ্ট স্থানে নামতে পারেন।

যা বলছিলাম। সাধারণ নাগরিকেরা যে প্লেনে চলাচল করে, তার পাইলটকে কিন্তু প্যারাশুট দেওয়া হয় না। বিপদ এড়াবার জন্য পাইলট যদি যাত্রীদের মহাশূন্যে ছেড়ে দিয়ে নিজেই প্যারাশুট নিয়ে নেমে পড়েন, তাহলে কী হবে কল্পনা করো। বিপদের মুখে তাই তাঁকে সাহসে ভর দিয়ে, যাত্রীসহ বিমান মাটিতে নামিয়ে আনতে সব রকমের চেষ্টা করতে হবে।

ভূমিকম্প বা বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় খাদ্যসামগ্রী, ওষুধপত্র, এমন-কী ডাক্তার, নার্স ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারেও প্যারাশুটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল আবার যুদ্ধে-ব্যবহৃত অতি-দ্রুতগামী উড়োজাহাজ রানওয়েতে থামানোর জন্য প্যারাশুট ব্যবহার করা হয়। মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে তার পেছনে প্যারাশুট খুলে গিয়ে অনেকটা ব্রেকের মতো কাজ করে। শাবাশ্, তুমি যে দেখছি সুন্দরভাবে একেবারে ইডেনের মাঠে নেমে এলে। আমার ইচ্ছে করছে পাশেই আকাশবাণী ভবনে ঢুকে তোমার এই কৃতিত্বের সংবাদ সবাইকে জানিয়ে দি।

আকাশে ঝাঁপ দিয়ে প্যারাশুটিস্ট মাটিতে নেমেছেন

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

উপন্যাস

আঁধার রাতের অতিথি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নিতাই ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "ও ঠাকুর, ঐ দ্যাখো ! ওরে বাপ রে বাপ্ ! এবার বুঝি প্রাণটা গেল !" বিশু ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, নিতাইয়ের কথা শুনে চমকে মুখ তুলে তাকালেন । নিতাই আর কালু শেখকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মিশমিশে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসছিলেন । বিকেলবেলা তিনি গিয়েছিলেন মল্লিকপুরের হাটে । ফিরতে-ফিরতে সন্ধে হয়ে গেল । গল্প করতে-করতে কখন তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলেছেন ।

শীতকাল বলে সাপখোপের ভয় নেই অবশ্য । জঙ্গল নয়, মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠ, তাই বাঘ আসবার সম্ভাবনা কম । তবে মাঝে-মাঝে নেকড়ে আর বাঘডাসা নামে বাঘেরই মতন কিন্তু একটু ছোট এক রকমের হিংস্র প্রাণী এসে পড়ে গ্রাম থেকে হাঁস কিংবা ছাগল চুরি করবার জন্য । অবশ্য বিশু ঠাকুর আর অন্য দু'জনেরই হাতে আছে শক্ত বাঁশের লাঠি । নেকড়ে বা বাঘডাসা এসে পড়লে তাঁরা পিটিয়ে শেষ করে দিতে পারবেন ।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কিন্তু নিতাই ভয় পেয়েছে একটা আলো দেখে।

বিশু ঠাকুর দেখলেন, মাঠের মধ্যে অনেক দূরে একটা সাদা আলো নিয়ে কে যেন লাফাচ্ছে। লণ্ঠন বা মশালের আলো এরকম সাদা রঙের হয় না।

বিশু ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কী রে, নিতাই ?"

নিতাইয়ের তখন উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই। তার দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ঠক্‌ করে শব্দ হচ্ছে আর সে সেই অবস্থাতেই বলে যাচ্ছে "রাম-রাম-রাম-রাম-রাম···"

কালু শেখের অবস্থা ততটা খারাপ না হলেও সে এর মধ্যে মাটিতে বসে পড়েছে। সেই অবস্থায় বলল, "ও ঠাকুর মশায়, আজ বুঝি মলাম। শিগগির চক্ষু ঢাকো! শিগগির!"

বিশু ঠাকুর তখনও বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা। তাঁর সঙ্গী দু' জনের এরকম অবস্থা হল কেন শুধু একটা আলো দেখে ?

তিনি বললেন, "আরে তোদের কী হল ? কে ওখানে আলো নিয়ে নাচানাচি করছে ?"

নিতাই তখনো বলে চলেছে, "রাম-রাম-রাম-রাম···"

কালু শেখ বলল, "এখনো চক্ষু ঢাকোনি ? তোমার রক্ত চুষে খেয়ে নেবে। ও হল আউলো ডাকিনি!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "আউলো ? তার মানে কি আলেয়া ? ছোটবেলায় বাবার মুখে অনেক গল্প শুনেছি বটে, কিন্তু আগে কখনো দেখিনি। কী করে ঐ আলেয়া ?"

কালু শেখ বলল, "ও হল মায়াবিনী সর্বনাশিনী। মানুষকে আগে ঘুরোয়ে ঘুরোয়ে মেরে ফেলে, তারপর তার বুকের রক্ত চুষে খায়।"

বিশু ঠাকুর এবার হেসে বললেন, "হ্যাঃ! রক্ত চুষে খাওয়া অত সোজা! কেন, আমাদের হাতে লাঠি আছে না ?"

কালু শেখ বলল, "ও ঠাকুর, তুমি কও কী ? তুমি লাঠি দিয়ে পেত্নির সঙ্গে লড়তে চাও! এমন অলুক্ষুনে কথা মনেও এনোনি। হে বাবা মানিকপির, হে বাবা কালীগঞ্জের মুর্শেদ, বাঁচায়ে দাও, আমাদিকে এবারের মতন বাঁচায়ে দাও!"

বিশু ঠাকুর দুই চোখ তীক্ষ্ণ করে আবার সামনের দিকে দেখলেন। এবার আলোটাকে সত্যিই যেন মনে হল একটা মেয়ের মূর্তি। সাদা রেশমের কাপড় পরা একটি মেয়ে, সে তিড়িং তিড়িং করে নাচছে।

তিনি বললেন, "তোরা এখানে বোস্, আমি কাছ থেকে ভাল করে দেখে আসি।"

নিতাইচরণ আর কালু শেখ যতই ভয় পাক, তারা বিশু ঠাকুরকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে। এই বিশু ঠাকুর পর্তুগিজ জলদস্যুদের হাত থেকে তাদের প্রাণে বাঁচিয়েছে।

তারা দু'জনে সঙ্গে-সঙ্গে দু' দিক থেকে বিশু ঠাকুরের দু' হাত ধরে বলে উঠল, "না, ঠাকুর, তুমি যেতে পারবা না, কিছুতেই যেতে পারবা না!"

বিশু ঠাকুর বেশ বিরক্ত হলেও তাঁর এই অনুগত ভক্তদের ওপর তিনি রাগ দেখালেন না। জোর করে হেসে বললেন, "আরে, তোরা এরকম শিশুর মতন আচরণ করছিস কেন ? আমি হলুম গে শিব ঠাকুরের পুজারি, আমায় কখনো ভূত-প্রেত কোনো ক্ষতি করতে পারে ? বললুম তো, তোরা বোস এখেনে, আমি একটু কাছে গিয়ে দেখে আসি।"

নিতাই আর কালু শেখ একেবারে কেঁদে ফেলল এবারে। তারা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বিশু ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "না, তুমি যেতে পারবা না! তুমি কিছুতেই যেতে পারবা না! ও ঠাকুর, তোমার এ কী দুর্বুদ্ধি হল। আউলোর কাছে গেলে কেউ বাঁচে না!"

কিন্তু তারা গায়ের জোরে বিশু ঠাকুরের সঙ্গে পারবে কেন ? বিশু ঠাকুরের শরীরে অসুরের মতন শক্তি। তিনি এক ঝটকায় ওদের দু'জনকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, "বললুম না, তোরা এখেনে বসে থাক। আমি ঝটিতি ঘুরে আসছি।"

তিনি লাঠিটা বাগিয়ে ধরে দৌড় লাগালেন।

বিশু ঠাকুর পরে আছেন মালকোঁচা-মারা ধুতি আর একটা আলোয়ান। খালি পা। মাথায় চুল নেই, শুধু মোটা এক গোছা টিকি। দৌড়োবার সময় আলোয়ানটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল বলে তিনি ভাল করে জড়িয়ে নিলেন।

একটুখানি দৌড়োবার পরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, জলকাদার মধ্যে এসে পড়েছেন। অল্প-অল্প জল, তার নীচে নরম কাদা। তবু তিনি না থেমে সোজা সেই আলোয় গড়া মেয়েটির দিকে ছুটলেন।

সেই মেয়েটিও ক্রমশই দূরে যাচ্ছে। এখন আর সে নাচছে না, লাফিয়ে-লাফিয়ে পালাচ্ছে যেন। বিশু ঠাকুর মনে মনে বললেন, পালাবে কোথায় ? আমি ওকে ঠিক ধরব। দেখতে হবে, ও কেমন ডাকিনী!

আলেয়া-ডাকিনী একবার ডান দিকে, একবার বাঁ দিকে সরে গিয়ে ছলনা করছে বিশু ঠাকুরের সঙ্গে। বিশু ঠাকুর এক একবার স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মেয়েটিকে। তার মুখের কাছে যেন রক্তের দাগ। একবার যেন তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ খিলখিল হাসির শব্দও শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, এই ডাকিনী যদি সত্যিই মানুষের রক্ত শুষে খায়, তবে তো আজই একে ঠাণ্ডা করে দেওয়া দরকার!

যেতে যেতে হঠাৎ বিশু ঠাকুর এক জায়গায় ভুল করে প্রায় কোমরজলে নেমে গেলেন, তাঁর পা দুটো গেঁথে গেল কাদায়।

আর সঙ্গে-সঙ্গে দপ্ করে আলেয়ার আলোও নিভে গেল।

এতক্ষণ বাদে শরীরটা ছমছম করে উঠল বিশু ঠাকুরের। এমন অন্ধকার হয়ে গেল যে, নিজেকে পর্যন্ত দেখা যায় না। বিশু ঠাকুর বুঝতে পারলেন না, আলোটা হঠাৎ একেবারে নিভে গেল কী করে! জোর হাওয়াও তো বইছে না! এইরকম ভাবেই কি আলেয়া-ডাকিনী মানুষের রক্ত শুষে খায় ?

তিনি সেই কাদা থেকে ওঠবার চেষ্টা করছেন কিন্তু আরও বেশি করে পা গেঁথে যাচ্ছে। এখানকার কাদায় বিচ্ছিরি পচা-পচা গন্ধ। তিনি এখন ইচ্ছে করলেও পালাতে পারবেন না। তিনি দু' হাত তুলে গলা ঢেকে রইলেন, যেন হঠাৎ কেউ গলা টিপে ধরতে না পারে।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু কেউ এল না।

তারপর এক সময় তিনি আবার আস্তে-আস্তে জল থেকে উঠে আসবার চেষ্টা করলেন। নরম ভুশভুশে কাদায় বেশি নড়াচড়া করলেই বিপদ। হাতের লাঠিটাও গাঁথা যাচ্ছে না, অনেক দূর নেমে যাচ্ছে।

কোনো রকমে একটা পা টেনে তুলে খুব সন্তর্পণে পেছন দিকে সেই পা-টা রাখলেন। তারপর অন্য পা তোলার চেষ্টা করলেন।

এই রকম ভাবে অনেকক্ষণের চেষ্টায় বেশ কিছুটা উঠে এসেছেন, এমন সময় তাঁর খুব কাছেই হুশ করে আলোটা আবার জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল একটা ভয়ংকর রকমের হি-হি-হি-হি হাসি।

বিশু ঠাকুর দারুণ চমকে গেলেন, তাঁর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন সেই আলোর মধ্যে একটি সতেরো-আঠেরো বছরের মেয়ে জ্বলন্ত চোখে হিংস্রভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু কয়েক পলক মাত্র। তারপরই সেই আলো মিলিয়ে গেল। আবার সেই নিদারুণ অন্ধকার। আর কোনো শব্দও নেই।

বিশু ঠাকুর প্রথমে ভাবলেন, এইবার সেই ডাকিনী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দু' হাতে লাঠিটা ধরে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন তাঁর মাথা ঘিরে। সেইভাবে কতক্ষণ ধরে তিনি ঘোরালেন তার খেয়াল নেই। সেই আলো আর জ্বলল না, কেউ এলও না।

তখন লাঠি ঘোরানো থামিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে ওখানে ? কে আলো জ্বেলেছিল ?"

কোনো উত্তর নেই।

আবার তিনি চড়া গলায় জানতে চাইলেন, "কে ? কে লুকিয়ে আছ অন্ধকারে ? উত্তর দাও! কোনো ভয় নেই!"

এই রকম ভাবে কয়েকবার চেঁচিয়েও তিনি কোনো সাড়াশব্দ পেলেন না। এতক্ষণ পরে তাঁর মনের জোর চলে গেল। তিনি খুব ক্লান্ত বোধ করলেন। এখন যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে তাঁর গোড়ালি পর্যন্ত জল। তবু তাঁর ইচ্ছে করল ঐ জলের মধ্যেই বসে পড়ে একটু বিশ্রাম নিতে।

সেই জলের মধ্যে বসে পড়ার পরও তাঁর মনে হল, এতেও ভাল লাগছে না। এখন শুয়ে পড়লেই সবচেয়ে আরাম হবে।

তিনি সত্যি-সত্যি শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সময় শুনতে পেলেন দূর থেকে কারা যেন ডাকছে, "ঠাকুর মশায়, ও ঠাকুর মশায়—"

তখন তাঁর মনে পড়ল, তিনি তো নিতাইচরণ আর কালু শেখকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে এসেছেন।

তিনি তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন। খুব অবাক হয়ে ভাবলেন, তিনি এ কী করতে যাচ্ছিলেন ? এরকম জায়গায় কেউ শোয় ? এ-ও কি ডাকিনীর মায়া ?

তিনি খুব জোরে উত্তর দিলেন, "নি-তা-ই রে ! ও কা-লউ শে-খ ! তো-রা কো-থা-য় ?"

ওদিক থেকে উত্তর এল, "ঠা-কু-র ম-শা-য় ! আ-প-নি কো-ন্ দি-কে ?"

আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে সেই শব্দ শুনে বিশু ঠাকুর দিক বুঝে নিলেন। তারপর সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোলেন সেই দিকে।

গায়ের আলোয়ানটা জল-কাদা মেখে ভারী হয়ে গেছে। শীতের কাঁপুনিও লাগছে। তবু সেই অবস্থায় কয়েক পা গিয়েও বিশু ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কী যেন ভেবে তাঁর হাতের লাঠিটা কাদার মধ্যে গেঁথে দিলেন ভাল করে। লাঠিটাকে সেই অবস্থায় রেখে দিয়ে তিনি এগুতে লাগলেন নিতাইচরণ আর কালু শেখের দিকে।

নিতাইচরণ আর কালু শেখ কিন্তু এক পাও এগোয়নি। যেখানে বসে ছিল, সেইখান থেকেই হাঁকডাক করছে। ওরা নাকি সেই প্রথম থেকেই একটানা ডেকে চলেছে। কিন্তু বিশু ঠাকুর এতক্ষণ ওদের গলার আওয়াজ শুনতে পাননি।

যাই হোক, বিশু ঠাকুরকে ফিরে পেয়ে ওরা আনন্দে একেবারে কেঁদে ফেলল।

নিতাই বলল, "ঠাকুর, তুমি সত্যি বেঁচে আছ ? তোমায় ডেকে ডেকে আমার গলা কাঠ হয়ে গেল। এমনভাবে ভগবানকেও কোনোদিন ডাকিনি। তুমি অনেক পুণ্য করেছ ঠাকুর, তাই আউলো ডাকিনী তোমার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারেনি !"

কালু শেখ বলল, "ঠাকুর, তুমি সত্যি-সত্যি আউলো ডাকিনীরে দ্যাখলা ? সে তোমার রক্ত চুষে খেতে ধেয়ে আসেনি ?"

বিশু ঠাকুর এখন কিন্তু ওদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করতে পারলেন না। চিন্তিতভাবে বললেন, "হ্যাঁ রে, সত্যিই দেখলুম যেন মনে হল। ওরকম ফটফটে সাদা রঙের আলো তো রাতের অন্ধকারে আগে দেখিনি। তার মধ্যে একটা মেয়ের মুখ, বড় রাগী, কটমট করে তাকাল আমার দিকে। কেন বুঝলুম না।"

কালু শেখ বলল, "তোমার সাতপুরুষের ভাগ্যি যে তুমি বেঁচে গেছ। ওর সামনে গেলে কেউ কোনোদিন বাঁচে বলে শুনিনি।"

নিতাই বলল, "ঠাকুর, তোমার শিবপূজা করা সার্থক। ভূত-পেরেত-ডাকিনী-পিশাচিনী সবই শিবের চেলা-চামুণ্ডা। তাই তোমাকে দেখে চিনতে পেরে পিছু হটে গেছে। নইলে ওরা কারুকে ছাড়ে না।"

কালু শেখ বলল, "আমার এক চাচারেই তো সারা রাত ধরে মাঠের মধ্যে ঘুরোয়ে-ঘুরোয়ে মেরে ফেলেছে। বেয়ানে (সকালে) যখন তারে পাওয়া গেল, তখন তার গলা আর বুকের কাছে খাবলা-খাবলা মাংস নাই।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তা হলে তো বড় চিন্তার কথা। জ্যান্ত মানুষের রক্ত-মাংস খেয়ে নেবে, ভূত-প্রেতের এ অত্যাচার তো সহ্য করা যায় না।"

নিতাই বলল, "তা বলে তুমি কি ভূতের সঙ্গে লড়াই করবে নাকি ? ও সব কথা মনেও স্থান দিও না। দেখলে না তোমার মতন মানুষকেই কী নাজেহালটাই না করলে। তোমার শরীরের অবস্থা দেখেছ ?"

কালু শেখ বলল, "এ অলুক্ষুনে জায়গায় আর থাকা ঠিক না। চলো, আমরা হাঁটা দিই।"

বিশু ঠাকুর দূরের অন্ধকারের দিকে আর একবার তাকালেন। কিন্তু আর সেই আলোটা দেখা গেল না।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "চল্।"

২

দুর্দান্ত জলদস্যু গঞ্জালেসকে আর তার দলবলকে বন্দী করে মুঘল সেনাপতির হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন বিশু ঠাকুর। সেই জন্য মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ খুশি হয়ে বিশু ঠাকুরকে এক বিশাল জায়গির উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিশু ঠাকুর নেননি। তিনি সবিনয়ে জানিয়েছিলেন যে, তিনি সামান্য একজন ব্রাহ্মণ পুজারি, তিনি অত বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কী করবেন !

আসলে বিশু ঠাকুর মনে মনে খুব অহংকারী। তিনি কারুর কাছ থেকে দান গ্রহণ করেন না।

আবার তিনি ফিরে এসেছিলেন নিজের গ্রামে।

কিন্তু সেখানে এসেও তিনি কিছুটা মুশকিলে পড়লেন। গ্রামের লোকরা ঘোঁট পাকিয়ে বলল, বিশু ঠাকুর এতদিন বোম্বেটেদের জাহাজে কাটিয়েছেন, তাদের হাতের জল ও খাবার খেয়েছেন, সুতরাং তাঁর জাত গেছে। অতএব তিনি আর মন্দিরের পুজারি হতে পারবেন না।

এ-কথা শুনে বিশু ঠাকুর তো একেবারে হতবাক। পর্তুগিজ জলদস্যুরা এই সব গ্রামের মানুষদের ধরে-ধরে ক্রীতদাস হিসেবে চালান দিত। বিশু ঠাকুরের জন্যই তা বন্ধ হয়েছে, অথচ এই তার প্রতিদান ? মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয় ?

আসলে তখন মানুষের মনের মধ্যে বড় অন্ধকার। দলাদলি আর কুসংস্কারের জন্য বাঙালি জাতি সেই সময় দিন-দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়াবার মতন মনের জোরও হারিয়ে ফেলেছে।

সেই গ্রামে বিশু ঠাকুরের বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। জলদস্যুরা বিশু ঠাকুরকে ধরে নিয়ে যাবার পর অনেক দিন তিনি ছেলের কোনো খবর না পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মরেই গেলেন একদিন। তাঁর ছেলে যে কত বড় সাহসের কাজ করে কত মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে, সে-কথা তিনি জানতেও পারলেন না।

পৃথিবীতে বিশু ঠাকুরের আর আত্মীয় বলতে কেউ নেই। গ্রামের লোকদের ঐরকম কথা শুনে এক সময় তিনি রাগে-দুঃখে ঠিক করেছিলেন এই গ্রাম ছেড়ে চিরকালের মতন চলে যাবেন। আর কোনোদিন এদের মুখ দেখবেন না।

তারপর আবার ভাবলেন, কোথায়ই বা যাবেন। সব জায়গাতেই তো একই অবস্থা। অন্য কোথাও গেলে তাঁকে পরিচয় গোপন করে থাকতে হবে। কিন্তু কেন তিনি নাম বদলাবেন, তিনি তো কোনো অপরাধ করেননি !

বিশু ঠাকুর যে ফিরিঙ্গিদের খাবার একদিনও মুখে তোলেননি, সে-কথা তিনি বললেন না। তিনি গ্রামের লোকদের জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ঐ শিব-মন্দিরেই থাকবেন, আগের মতন রোজ তিনিই পুজো করবেন। দেখা যাক কে তাঁকে সেখান থেকে হঠাতে পারে।

সেই গ্রামে আর কোনো ব্রাহ্মণ নেই। এতদিন এই মন্দিরে পুজোই হয়নি। বিশু ঠাকুর শুরু করে দিলেন পুজো। সেই মন্দিরই হল তাঁর ঘরবাড়ি।

গ্রামের লোকদের মধ্যে কারুর অবশ্য এত সাহস নেই যে, বিশু ঠাকুরকে সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তা ছাড়া স্বয়ং মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ যাঁকে খাতির করেন, তাঁর গায়ে হাত তোলাও বিপজ্জনক।

গ্রামের লোক কেউ আর সেই মন্দিরে আসে না। দূর থেকে শুধু বিশু ঠাকুরের নিন্দে করে।

পর্তুগিজ জাহাজ থেকে যে-সব ক্রীতদাসদের বিশু ঠাকুর মুক্তি দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন কিন্তু বিশু ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়েনি। তারা রোজ আসে বিশু ঠাকুরের কাছে। তারা থাকে কাছাকাছি গ্রামে, তাদেরও একই অবস্থা। ফিরিঙ্গি ছুঁয়েছিল বলে তাদের জাত গেছে। তাদের একঘরে করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামের কোনো লোক তাদের নেমন্তন্নও করবে না, কেউ তাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে আসবেও না। শুধু তাই নয়, যে-পুকুর থেকে গ্রামের লোক জল নেয়, সেই পুকুরের জল এরা ছুঁতে পারবে না।

নিতাই এসে বিশু ঠাকুরের কাছে বলেছিল, "ঠাকুর, আমাদের কী দোষ বলো তো? আমরা কি ইচ্ছে করে পর্তুগিজদের হাতে ধরা দিয়েছিলুম, না নিজে থেকে মেঙে (চেয়ে) খাবার খেয়েছি? কোনো রকমে তোমার দয়ায় প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি, সেটাও শেষে দোষ হল? কই, মুসলমানদের মধ্যে তো জাত যায় না। আমাদের কেন জাত যাবে?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "দ্যাখ, আমি তো কিছু পুঁথি-পত্তর পড়েছি, আমাদের শাস্ত্রও কিছু পড়েছি। কোথাও তো জাত যাবার কথা লেখা নেই। রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেজন্য কি তাঁর জাত গিয়েছিল?"

নিতাই বলেছিল, "রামচন্দর তো ভগবান, তাঁর আবার জাত যাবে কী করে? আমরা হলুম গে সামান্য মানুষ—"

বিশু ঠাকুর বললেন, "ভগবানই তো মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাই না? তা হলে আমরা সবাই ভগবানের ছেলে। ভগবানের যদি জাত না যায়, তবে তাঁর ছেলেদের কেন জাত যাবে? শোন্, প্রায় শ'খানেক বছর আগে নদিয়া জেলায় এক মস্তবড় মহাপুরুষ জন্মেছিলেন। অনেকে বলে, তিনিও ভগবানের একজন অবতার। তাঁর নাম নিমাই ঠাকুর, পরে তাঁর নাম হয়েছিল চৈতন্য ঠাকুর। তিনি বলতেন, বামুন, মুসলমান, কায়স্থ, শূদ্র, ডোম, সবাই মানুষ, সবাই সমান। তিনি সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। অতবড় মহাপুরুষ কি ভুল বলতে পারেন?"

দারুক নামে একজন বলল, "ঐ চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্যদের আমি দেখেছি। তাদের বলে বোষ্টম। তাদের মাথা ন্যাড়া হয়। গাজিপুরের হাটে দেখেছিলুম, কয়েকজন বোষ্টম খোল-কর্তাল বাজিয়ে গান গাইছে। আহা, বড় সুন্দর গান। একটা গানের কথা এখনো আমার মনে আছে, 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'।"

চরণদাস নামে আর-একজন বলল, "আ-হা-হা! কী চমৎকার কথা, শুনলে চোখে জল এসে যায়। সব মানুষ সমান! জমিদারবাবুও মানুষ, আমিও মানুষ, আমাদের মধ্যে কোনো ফারাক নেই!"

নিতাই বলল, "কিন্তু ঠাকুর, তুমি ব্রাহ্মণ, আর আমি শুদ্দুর, তুমি আর আমি সমান হতে পারি? তুমি কত লেখাপড়া জানো, তোমার কত বুদ্ধি, আর আমরা তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ...."

বিশু ঠাকুর বললেন, "শোন, অবস্থার দোষে কিংবা চেষ্টার অভাবে অনেকে মুখ্যু থাকে। নিজের চেষ্টায় বড় হতে হয়। আমি কিছুদিন এক মৌলবি সাহেবের কাছে পড়াশুনো করেছিলুম। সেই মৌলবি সাহেব আমাকে কতকগুলো বড় আশ্চর্য ইতিহাস শুনিয়েছিলেন। অনেককাল আগে সেকেন্দার শাহ নামে এক মহা শক্তিশালী গ্রিক রাজা আমাদের এই হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছিলেন। সব দেশটাই দখল করে নিতেন, কিন্তু পুরু নামে এক ছোট রাজা যুদ্ধে খুব সাহস দেখিয়ে তাঁকে আটকে দিলেন। তবেই দ্যাখ, মনের জোর থাকলে ছোট হয়েও বড়র সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। আরও আশ্চর্য কথা, সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন মহাশক্তিশালী মানুষ গ্রিকদের তাড়িয়ে দেশের রাজা হলেন। সেই চন্দ্রগুপ্ত নাকি ছিলেন দাসীর ছেলে।"

নিতাই বলল, "বলো কী ঠাকুর, দাসীর ছেলে হল রাজা?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "শুধু রাজা নয় রে, সম্রাট!"

দারুক বলল, "মহাভারতের গল্পে শুনিছি, কর্ণকেও তো সবাই ছুতোর মিস্তিরির ছেলে বলে জানত! তবু মহাবীর বলে তেনাকে মান্যগণ্য করত সবাই!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তা হলেই বুঝলি, কতকগুলো মুখ্যু গাঁয়ের লোকের কথামতন মানুষের জাত যায় না! আর জাতের জন্যই মানুষ বড়-ছোট হয় না!"

দারুক বলল, "তবে একটা কী কথা জানো ঠাকুর। এই যুগটাই পড়েছে অন্যরকম। এখন ধর্মকথা কেউ শোনে না। এখন জোর যার মুল্লুক তার। গ্রামের লোক যদি এককাট্টা হয়ে আমাদের মেরে তাড়াতে আসে?

বিশু ঠাকুর বললেন, "সেজন্য আমাদেরও শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। আমরা শক্তিশালী হলে দেখবি সবাই আমাদেরও ভয় পাবে।"

সেই থেকে নিতাই, দারুক আর তাদের দলবল এই শিব-মন্দিরের সামনের চাতালে প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা লাঠি, বল্লম, শড়কি চালানো শেখে। এখন তাদের দলে প্রায় পঞ্চাশজন লোক জুটেছে। ঐ সব খেলার সময় তাদের হা-রে-রে-রে চিৎকার শুনলে দূর থেকেও মানুষের বুক কাঁপে।

গ্রামের লোকেরা আর ভয়ে কেউ সে-তল্লাটে যায় না। অনেকে বলে, বিশু ঠাকুর ডাকাতের দল খুলেছে।

আসলে ব্যাপারটা তার ঠিক উলটো। বিশু ঠাকুর যখনই খবর পান কাছাকাছি কোনো গ্রামের নিরীহ, গরিব মানুষের ওপর কেউ অত্যাচার করছে অমনি তিনি দলবল নিয়ে হাজির হন, আর দুষ্ট-বদমাসদের পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দেন।

দেশে এখন বড় অরাজক অবস্থা। দিল্লির বাদশা এখন ঔরঙ্গজেব, তিনি নিজেই সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে খুব ব্যস্ত, এত দূর-দেশের দিকে নজর দেবার সময় পান না। তা ছাড়া তিনি বাংলা মুল্লুককে খুব একটা পছন্দও করেন না। নেহাত তাঁর সম্মানে ঘা লেগেছে বলেই তিনি তাঁর সেনাপতি শায়েস্তা খাঁকে পাঠিয়েছেন পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করবার জন্য।

বিশু ঠাকুর জলদস্যুদের সর্দার গঞ্জালেস টিবাওকে তার কয়েকখানি জাহাজ সমেত শায়েস্তা খাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে যে, সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ সেই জলদস্যুদের বন্দী করে কোনো শাস্তি না দিয়ে তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। ঢাকা শহরের ফিরিঙ্গি বাজারে থাকবার জায়গা দিয়েছেন তাদের সবাইকে, তাদের খাওয়া-দাওয়ারও কোনো রকম অসুবিধে রাখেননি।

আসলে শায়েস্তা খাঁ-র মূল উদ্দেশ্য হল আরাকান রাজ্য আক্রমণ করা। কারণ, আরাকানের রাজা বাদশা ঔরঙ্গজেবের পলাতক ভাই শাহ সুজাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সেইটাই তো ঔরঙ্গজেবের অত রাগের কারণ।

কিন্তু আরাকান যেতে হবে জলপথে। মোগলরা জলপথ তেমন চেনেও না, জলযুদ্ধে পটুও নয়। সেইজন্যই শায়েস্তা খাঁ চান পর্তুগিজ জলদস্যুদের কাজে লাগাতে। দস্যুসর্দার গঞ্জালেস টিবাও-ও শায়েস্তা খাঁর ভাল ব্যবহারের বিনিময়ে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

শিবগঞ্জ থেকে ঢাকা শহর অনেক দূরে। এই সব গাঁয়ের মানুষ কেউ অত দূরে যায় না। দেশের শাসনব্যবস্থা খুব দুর্বল বলে চোর ডাকাত খুনে আর ঠ্যাঙাড়েদের উৎপাত এত বেড়েছে যে, সাধারণ মানুষ নিজের নিজের গ্রাম থেকে আর বেরুতেই চায় না।

তবু মাছ ধরার নৌকোগুলো পথ হারিয়ে প্রায়ই অনেক দূরে দূরে চলে যায়, তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার ছ'মাস ন'মাস পরে ফিরেও আসে। ব্যবসায়ীরাও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করে। এই সব মানুষের মুখে কিছু কিছু খবরও পাওয়া যায়।

ভয়ংকর দস্যুসর্দার গঞ্জালেস টিবাও-এর কোনো শাস্তি হয়নি, বরং সে স্বাধীন ভাবেই এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে শুনে নিতাইচাঁদ আর কালু শেখরা ভয় পায়। তাদের ধারণা, বিশু ঠাকুর গঞ্জালেসকে যে অপমান করেছেন, তা সে কখনো ভুলবে না। সে যে-কোনো উপায়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেই। জলদস্যুর প্রতিহিংসা অতি সাঙ্ঘাতিক। এই নিয়ে কত গল্প-কথা আছে!

বিশু ঠাকুর এ-কথা শুনে হাসেন। তিনি বলেন, "আরে না, না। গঞ্জালেস আবার এত দূরে আসবে? সে সাহস তার নেই।"

মাঝে-মাঝে তিনি ঠাট্টা করে তাঁর সঙ্গীদের বলেন, "তা হলে একবার ঢাকা শহর ঘুরে আসি, কী বল্? দেখি গিয়ে আমার হাতের আরও দু'একটা চড়-চাপড় খাওয়ার শখ হয়েছে নাকি গঞ্জালেসের!"

সে-কথা শুনে নিতাইরা ভয়ে বিশু ঠাকুরের হাঁটু চেপে ধরে বলেন, "খবর্দার ঠাকুর, ওরকম কথা মনে স্থানও দিও না! গঞ্জালেস আর একবার তোমায় হাতে পেলে কিছুতেই ছাড়বে না!"

এইরকম ভাবে প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। এখন বিশু ঠাকুরের দলের নাম শুনলেই চোর-ডাকাত অত্যাচারীরা ভয়ে থরথর করে কাঁপে। আশ-পাশের প্রায় কুড়ি-পঁচিশখানা গ্রামে এখন শান্তি বিরাজ করছে। সব জায়গায় এখন আর বিশু ঠাকুরকে দল নিয়ে যেতেও হয় না। কোনো গ্রামে হয়তো ডাকাত পড়েছে, এমন সময় গ্রামের কিছু

লোক এমনি এমনি চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঐ বিশু ঠাকুর আসছেন ! আর ভয় নেই !'

সেই কথা শুনেই ডাকাতেরা চোঁ-চাঁ করে দৌড়ে পালায়।

বিশু ঠাকুরের গ্রামের যে-সব লোক তাঁর জাত গেছে বলেছিল, তাঁকে একঘরে করতে চেয়েছিল, এখন তারাই এসে হাত কচলে বলে, "ঠাকুর, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা ! তুমি না থাকলে আমাদের কী হত ! তুমি আমাদের ধনেপ্রাণে রক্ষা করেছ !"

তাই শুনে বিশু ঠাকুর মুচকি হেসে বলেন, "আমি সাক্ষাৎ দেবতা ? তা বেশ তো ! আজ তোমরা তা হলে এই দেবতার প্রসাদ খেয়ে যাও ! বদন মিঞা আর বংশী ডোম আজ খিচুড়ি রান্না করছে। সেই খিচুড়ি আমি প্রসাদ করে দেব, তোমরাও সকলের সঙ্গে বসে খাবে।"

সেই কথা শুনে বোকা গ্রামবাসীরা এক পা এক পা করে পিছিয়ে তারপর দৌড় মারে। দু'একজন থেকেও যায়। গ্রামের সাধারণ ঘরের সাহসী ছেলেরা একজন দু'জন করে এসে বিশু ঠাকুরের দলে যোগ দেয়।

এইরকম ভাবে দিন বেশ ভালই কাটছিল এক রকম। কিন্তু সেদিন হাট থেকে ফেরার পথের ঘটনাটা বিশু ঠাকুরকে খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোর অনেক গল্প শুনেছেন, কিন্তু নিজের চোখে কখনো কিছু দেখেননি। মাঝে-মাঝে শোনা যায় বটে যে পেত্নিতে কার গলা মুচড়ে দিয়েছে কিংবা কাদের বাড়ির বাগানে এক ব্রহ্মদৈত্য এসে বেলগাছের ডাল ভেঙে দিয়ে গেছে। কালু শেখও কয়েকবার মাছখেকো ভূতের কথা শুনিয়েছে। সন্ধেবেলা ছিপ দিয়ে মাছ ধরলেই বাড়ি ফেরার পথে কয়েকটা বেঁটে বেঁটে ভূত পেছন-পেছন আসে আর বলে, 'মাঁছ দেঁ না ! মাঁছ দেঁ না !'

বিশু ঠাকুর এসব গল্প কখনো ঠিক বিশ্বাস করেননি।

কিন্তু সেদিন তিনি নিজের চোখে যা দেখলেন, তা অবিশ্বাস করবেন কী করে ? ফাঁকা মাঠের মধ্যে ধপধপে সাদা রঙের গোল ধরনের আলো আপনা-আপনি জ্বলে উঠল কী করে ? ওরকম অদ্ভুত আলো তো তিনি আগে কখনো দেখেননি ! তা ছাড়া ঐ আলোর মধ্যে তিনি মাঝে-মাঝে একটি মেয়ের মুখও দেখতে পাচ্ছিলেন, বেশ রাগী ধরনের মুখ। একবার হি-হি-হি-হি হাসিও শুনতে পেলেন। তারপর সব কিছুই অদৃশ্য হয়ে গেল। এ আবার কী রকম ব্যাপার !

যতই তিনি ভাবেন, ততই তিনি এ-রহস্যের কোনো কূলকিনারা খুঁজে পান না। অন্য কেউ এরকম একটা কাহিনী শোনালে তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এবার যে তাঁর নিজের চোখে দেখা।

এর মধ্যে একদিন কার্তিকপুর গ্রাম থেকে একটা খবর এল। সে গ্রামের দু'জন লোক এসে কেঁদে বলল, তাদের গ্রামে হঠাৎ খুব বাঘের উপদ্রব হয়েছে। দু'তিনটে বাঘ প্রায়ই গ্রামে ঢুকে পড়ে গরু-ছাগল টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এমন-কী মানুষও মারছে। এ পর্যন্ত সাতজন গ্রামবাসী গেছে বাঘের পেটে। এখন বিশু ঠাকুর রক্ষা না করলে তাদের আর কোনো উপায় নেই।

বিশু ঠাকুর বেশ বিরক্ত হলেন কথাটা শুনে। লোক দুটিকে ধমক দিয়ে বললেন, "তোদের গায়ে কি মানুষের রক্ত নেই ? বাঘ পড়েছে বলেও তোরা আমাদের সাহায্য চাইতে এসেছিস ? কেন, তোরা গ্রামের লোক সবাই মিলে বাঘ তাড়াতে পারিস না ?"

লোক দুটি বলল, "ঠাকুর, আমাদের গেরামে কারুর তরোয়াল-বন্দুক নেই, আমরা খালি হাতে বাঘ মারব কী করে ?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তরোয়াল-বন্দুক নেই, কিন্তু গ্রামে বাঁশঝাড় তো আছে ? তোদের লাঠি নেই ? তিরিশ-চল্লিশজন লোক একসঙ্গে লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলে বাঘ-সিংহ তো ছেলেমানুষ, ব্রহ্মদৈত্য পর্যন্ত পালাবে !"

লোক দুটি তবু বোকার মতন কুঁই-কুঁই করে কাঁদতে থাকে।

বিশু ঠাকুরের দল এ পর্যন্ত কখনো বাঘের সঙ্গে লড়াই করেনি। সেইজন্যই নিতাই আর কালু শেখ উৎসাহের সঙ্গে বলল, "চলো ঠাকুর। আমরা বাঘ মেরে আসি।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "না রে। এভাবে চললে তো হবে না ! গ্রামের লোকরা যদি নিজেরা দল বেঁধে শত্রু তাড়াতে না শেখে, তা হলে আমরা আর কত সাহায্য করব ? লোকে ভাববে, বিপদে পড়লে তো বিশু ঠাকুরের দল এসে বাঁচাবেই, সুতরাং আমরা খাই-দাই আর ঘুমোই ! উঁহু ! এ ঠিক নয়, আমাদের এত কী দায় পড়েছে ! এর পর দেখবি কোনো গ্রামে শিয়ালের উৎপাত হলেও লোকে আমাদের কাছে ছুটে আসবে !"

কার্তিকপুর গ্রামের লোক দুটি বলল, "ঠাকুর, চোর-ডাকাতদের সঙ্গে তবু লড়াই করা যায়। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ যে সাক্ষাৎ যম ! তাদের ডাক শুনলেই পিলে চমকে যায়, হাত-পা একেবারে অবশ হয়ে পড়ে। ঐ বাঘের সঙ্গে লড়াই করার সাধ্য আমাদের নেই।"

বিশু ঠাকুর রাগ করে বললেন, "সাধ্য নেই তো বাঘের পেটে যাও ! আমি কী করব ?"

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিশু ঠাকুরকে যেতেই হল। তাঁর দলের লোকজনদেরই উৎসাহ বেশি।

বিশু ঠাকুর তখন ঠিক করলেন, তাঁর দল থেকে মাত্র চারজন লোককে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কার্তিকপুর গ্রামের লোকদেরও লাঠিসোঁটা নিয়ে যেতে হবে তাঁর সঙ্গে। তাদের গ্রামের শত্রু তাড়াবার জন্য তাদেরও লড়াই করা শিখতে হবে।

কার্তিকপুর গ্রামখানি মাতলা নদীর ধারে। শিবগঞ্জ থেকে একবেলার পথ। বিশু ঠাকুর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দুপুর-দুপুর পৌঁছে গেলেন কার্তিকপুরে।

গ্রামখানি মাঝারি ধরনের। শ-দেড়েক পরিবারের বাস। অধিকাংশ লোকই মাছ ধরে কিংবা চাষবাস করে। গ্রামের ডান দিকে ঘন জঙ্গল, কিন্তু এতদিন সেখানে বাঘ ছিল না। মাতলা নদী পেরিয়ে দুটো বাঘ এসে সেখানে আস্তানা গেড়েছে।

গ্রামের লোকজনদের মধ্য থেকে বেছে-বেছে পঁচিশজন স্বাস্থ্যবান ছেলেকে একটা আলাদা জায়গায় দাঁড় করালেন বিশু ঠাকুর। তারপর তাদের বললেন, "শোনো, তোমাদের প্রত্যেককে লাঠি ধরতে হবে। আর বাঘ যখন আসবে, তখন শুধু একটা কথা মনে রাখলেই চলবে। প্রত্যেকে ঠিক করে রাখবে, তাকে একবার অন্তত লাঠির ঘা বসাতেই হবে বাঘের গায়ে। প্রত্যেকে একবার করে মারলেই আমার চলবে। যে মারতে পারবে না, সে পুরুষ মানুষ নয়। কী, মনে থাকবে ?"

সবাই একবাক্যে বলল, "হ্যাঁ !"

আগের দিন রাত্রেই বাঘ গ্রাম থেকে একটা মোষ টানতে টানতে নিয়ে গেছে জঙ্গলের কিনারায়। সেখানে আধ-খাওয়া অবস্থায় সেটাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। বিশু ঠাকুর আগে একা সেই মোষটাকে দেখে এলেন। বাঘের স্বভাব-চরিত্র তিনি খানিকটা জানেন। একবার শিকার করা পশুর মাংস সবটা শেষ না করা পর্যন্ত বাঘ সাধারণত নতুন শিকার ধরে না। সুতরাং এই মোষটাকে খাবার জন্য বাঘ আবার এখানে ফিরে আসবে।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই বিশু ঠাকুর সবাইকে নিয়ে চলে এলেন জঙ্গলের প্রান্তে। আধখানা চাঁদের আকারে তিনি লোকজনদের বসিয়ে দিলেন সেই মোষটাকে ঘিরে। ছোটখাটো ঝোপঝাড়ের আড়ালে প্রত্যেকে লুকিয়ে রইল।

বিশু ঠাকুর বলে দিলেন, বাঘ দেখা মাত্র যেন কেউ উঠে না দাঁড়ায়। বাঘ অতি সতর্ক প্রাণী। একটু সন্দেহ হলেই সে আর আসবে না। চার ধার না- দেখেশুনে সে মাংসে মুখও দেবে না। সেইজন্য সবাইকে একেবারে মুখ বুঁজে, গাছপালার মতন নিথর হয়ে থাকতে হবে। বিশু ঠাকুর যখন সংকেত দেবেন, তখন সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে গেল, তারপরই চাঁদ উঠল। এখন পূর্ণিমা চলছে। শীতের আকাশ খুব পরিষ্কার। জ্যোৎস্না একেবারে ফটফট্ করছে দিনের আলোর মতন।

সবাই একটুও নড়াচড়া না করে ঠায় বসে আছে। এরকম ভাবে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে। হয়তো বাঘ আজ আর এদিকে আসবেই না।

কিন্তু রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ না হতেই বাঘ এল। একটা নয়। দুটো। ঠিক যেন খেলা করছে এই রকম ভাবে ছুটোছুটি করতে করতে বাঘ দুটো বেরিয়ে এল ঘন জঙ্গল থেকে, যেন খাবার কথা ওদের মনেই

নেই। এই ভাবে একজন গড়াগড়ি দিল মাটিতে, আর-একজন যেন শুড়শুড়ি দিতে লাগল তার পেটে।

তারপর কী মনে হতেই একটা বাঘ গ্রামের দিকে মুখ করে, মাটিতে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ডেকে উঠল প্রচণ্ড জোরে।

তাতেই সব বানচাল হয়ে গেল। সেই ডাক শুনে ভয়ে কেঁপে উঠে গ্রামের সব বীরপুরুষরা উঠে দাঁড়িয়েই 'ওরে বাবা রে, মা রে' বলে লাগাল দৌড়। একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

এরকম অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায় না। বিশু ঠাকুর চিৎকার করে উঠলেন, "কেউ পালাবে না। মারো, সবাই একসঙ্গে মারো!"

তিনি নিজে সবচেয়ে প্রথমে তেড়ে গেলেন লাঠি নিয়ে। কে এল আর কে এল না তা তিনি গ্রাহ্যও করলেন না।

প্রথম যে বাঘটিকে তিনি সামনে পেলেন, তার ঠিক মুখের ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি মারলেন লাঠির ঘা। সুন্দরবনের বাঘও তেমন সাহসী, পালাবার চেষ্টা না করে সে পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে মারল সামনের দিকে এক লাফ। সেই উড়ন্ত অবস্থাতেই বিশু ঠাকুর বাঘের ঠিক চোখ লক্ষ করে আর একবার লাঠি চালালেন।

তারপর হুড়মুড় করে কী যেন পড়ল তাঁর ঘাড়ের ওপর।

বিশু ঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

৩

বিশু ঠাকুর চোখ মেলে দেখলেন, নিতাই, কালু শেখ ও আরও কয়েকজন দারুণ উৎকণ্ঠিত ভাবে বসে আছে তাঁর মাথার কাছে।

তিনি প্রথমে ভাবলেন, বোধহয় তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে, সেই জন্য এরা শোক করছে। তবে কি তাঁর আত্মাটা শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এসব দেখছে?

তিনি দু' তিনবার চোখের পাতা ফেলতেই শুনতে পেলেন, ওরা ডাকছে, "ঠাকুর, ঠাকুর?"

তখন তিনি বুঝলেন, তাহলে তিনি এখনো পুরোপুরি মরে যাননি। কী যেন হয়েছিল? একটা বাঘ তাঁর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছিল না? কিন্তু একবার বাঘে ছুঁলে তো আর বাঁচবার আশা থাকে না!

তিনি উঠে বসবার চেষ্টা করে বললেন, "আমার কী হয়েছে রে? বাঘে আমার কতখানি খেয়েছে? আমার হাত দু'খানা আর পা দু'খানা ঠিক আছে তো?

নিতাই বলল, "তুমি উঠো না, ঠাকুর। শুয়ে থাকো। তোমার সব ঠিকঠাক আছে।"

বিশু ঠাকুর তবু উঠে বসে নিজের হাত-পাগুলো ভাল করে দেখলেন। সবই তো ঠিক আছে। তাহলে বাঘ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পরেও ছেড়ে দিল?

তখন নিতাই, কালু শেখরা জানাল যে, বাঘটা বিশু ঠাকুরের ঘাড়ে পড়তে পারেনি। বাঘটা যখন লাফ দেয় সেই সময় দারুকও ছুটে এসেছিল বাঘটার দিকে। বাঘটার মুখের মধ্যে সে কুড়ুল চালিয়ে দেয়, তারপর ঝোঁক সামলাতে না পেরে দারুকও পড়ে গিয়েছিল বিশু ঠাকুরের ওপর।

বিশু ঠাকুর খুব অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, "বাঘ নয়? দারুক পড়েছিল আমার ওপর? তাতেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম? এ যে বড় তাজ্জব কথা। আর দারুকের কী হল? বাঘ তাকে জখম করেছে?"

জানা গেল যে, দারুকও বেঁচে গেছে খুব অল্পের ওপর দিয়ে। দারুক ও বিশু ঠাকুর এক সঙ্গে মাটিতে পড়ে যাবার পর বাঘটা তাদের ডিঙিয়ে একটু দূরে আছড়ে পড়ে। বিশু ঠাকুরের লাঠির ঘায়ে বাঘটা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর দারুকের কুড়ুলের ঘায়ে তার চোয়াল ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় সে উঠে দাঁড়াবার আগেই কালু শেখ বর্শা দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলে।

দ্বিতীয় বাঘটা এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে আর সঙ্গীকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেনি। বড় বড় লাফ মেরে পালিয়ে গিয়ে সে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীর জলে। সোজা সাঁতরে ওপারে চলে গেছে।

বাঘের সঙ্গে লড়াইতে শেষ পর্যন্ত বিশু ঠাকুরের দলের জয়ই হয়েছে।

বিশু ঠাকুর তবু খুশি হলেন না।

তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, "কিন্তু দারুকের মতন একটা রোগা-পাতলা লোক একটা ঠ্যালা মারল, আর তাতেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম? আমার শরীরের শক্তি-টক্তি সব নষ্ট হয়ে গেছে?"

নিতাই বলল, "দারুক রোগা? সে তো রীতিমতন একটা হুমদো জোয়ান।"

কালু শেখ বলল, "আসল কথা কী জানো, ঠাকুর? তুমি সেই যে সেদিনকে আউলো ডাকিনীর পাল্লায় পড়েছিলে, সে নির্ঘাত তোমার খানিকটা রক্ত চুষে নিয়েছে। তাই তুমি কম-জোরি হয়ে পড়েছ।"

নিতাই তাকে ধমক দিয়ে বলল, "চুপ, ওরকম অলুক্ষুনে কথা বলবিনি! ডাকিনীটাই তো ঠাকুরকে দেখে ভয়ে পালাল। আসলে গত বচ্ছর খানেক ধরে ঠাকুর তো একদিনের তরেও বিশ্রাম নেননি। সমানে খাটতেছেন। মানুষের শরীরে কি এত সহ্য হয়?"

বিশু ঠাকুর কালু শেখকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেই ডাকিনী তো আমাকে ছোঁয়নি, ধারেকাছেও আসেনি, তবু সে আমার রক্ত শুষে নেবে কী করে?"

কালু শেখ বলল, "ওরা পারে। চক্ষের দৃষ্টি দিয়েই মানুষের লহু চুষে খেয়ে নেয়।"

নিতাই আবার ধমক দিয়ে বলল, "ফের ঐ কথা? চুপ মার! ঠাকুর, আমি বলি কী, তুমি এখন কয়েকটা দিন বিশ্রাম নাও। শরীলটার একটু যত্ন করো। তোমার ওপর দিয়ে তো কম ধকল যায়নি! ওরে বাপ রে বাপ, জলদস্যুগুলো তোমায় কী মার মেরেছে। ওরকম মার খেলে অন্য যে-কোনো মানুষ দশবার মরে যেত!"

কালু শেখ বলল, "ঐ জলদস্যুগুলোনরে শায়েস্তা খাঁ ঢাকায় বসিয়ে জামাই-আদর করতেছেন, এ-কথা ভাবলেই আমার মাথায় খুন চড়ে যায়। ইচ্ছে করে এখুনি ছুটে গিয়ে ঐ ইব্‌লিশের (শয়তানের) বাচ্চাগুলোর টুঁটি চেপে ধরি।"

নিতাই ঠাট্টা করে বলল, "অত সোজা, না? তখন তো সবাই ভয়ে মরছিলি? বিশু ঠাকুর না থাকলে ফিরিঙ্গি ডাকাতদের হাত থেকে আমাদের কেউ বাঁচাতে পারত না।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তা হলে কিছুদিন বিশ্রাম নিই, কী বল?"

নিতাই বলল, "সেই কথাই তো বলতেছি। কিন্তু তুমি বিশ্রাম নেবেই বা কী করে। রোজই তো মানুষজন এসে তোমায় জ্বালাবে। একে তো জমিদারের পেয়াদাদের অত্যাচার, তার ওপর লেগেই আছে চোর-ডাকাতের উৎপাত। লোকে এখন বিপত্তারণ ঠাকুর হিসেবে তোমাকেই এসে ধরে। আজও তো পলাশখালি গ্রাম থেকে দু'জন লোক এসে বসে আছে।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তা হলে এক কাজ করি বরং। কুড়ানিকে অনেকদিন দেখিনি। কুড়ানি* আর ওর বাবাকে দেখে আসি। ওরা তো থাকে মোল্লাখালিতে।"

নিতাই আর কালু শেখ মহা উৎসাহের সঙ্গে বলল, "সেই ভাল. চলো, আমরা সবাই মোল্লাখালি থেকে ঘুরে আসি।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "তোরা যাবি কোথায়? তোরা গেলে আর আমার ঘোড়ার ডিম বিশ্রাম হবে। সব সময়েই বকবক করতে হবে তোদের সঙ্গে। তোরা এখানে থেকে কয়েকটা দিন একটু সামাল দে, আমি বেড়িয়ে আসি।"

নিতাই একেবারে চুপসে গিয়ে বলল, "তুমি একা যাবে? আমাদের নেবে না? পথে কত রকম বিপদ হতে পারে—"

বিশু ঠাকুর বললেন, "একা মানুষের আবার বিপদ কী?"

নিতাই বলল, "ঠাকুর, গঞ্জালেসের চরেরা যদি তোমায় দেখতে পায়, তা হলে এবার আর ছাড়বে না। প্রথমেই জানে মেরে ফেলবে।"

বিশু ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "আমায় চিনবে কী করে? আমি বোষ্টম সেজে গ্রামে গ্রামে গান গাইতে গাইতে চলে যাব। বরং সুযোগ হলে একবার ঢাকা পর্যন্ত ঘুরে আসব। দেখে আসব ডাকাতেরা কী রকম জামাই-আদরে আছে।"

** কুড়ানি আর দস্যুসর্দার গঞ্জালেসের কাহিনী আছে এই লেখকের 'জলদস্যু' উপন্যাসে।*

বিশু ঠাকুর আর ওদের কোনো ওজর-আপত্তিই শুনলেন না। পরদিনই তিনি যাত্রা করবেন ঠিক করলেন।

পরদিন সকালেই তিনি একটা পুঁটলিতে সামান্য কিছু জিনিসপত্র বেঁধে নিলেন। কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বৈষ্ণব সাজলেন, গলায় ঝোলালেন একটা হরীতকীর মালা। অবশ্য কোমরে একটা ছুরিও লুকিয়ে রাখলেন।

পাকা রাস্তা তো কিছু নেই, মাঠের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথ। শিবমন্দিরের পেছন দিক দিয়ে গিয়ে, বড় পুকুরটার পাশ দিয়ে এগিয়ে, একটা ছোট্ট জঙ্গল পেরিয়ে তারপর বিশু ঠাকুর মাঠের পথ ধরলেন।

শীত এবারে বেশ ভালভাবেই পড়েছে। দিনের বেলাতেই একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। এই রকম ঠাণ্ডায় রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটতেও ভাল লাগে। নিতাইরা বলে দিয়েছে যে, বিকেল পর্যন্ত হাঁটলেই তিনি গোবিন্দপুর নামে একটা বেশ বড় গ্রাম পেয়ে যাবেন। রাত্তিরটা কাটাবেন সেখানেই। গ্রামের যে-কোনো লোকের বাড়িতেই অতিথি বলে পরিচয় দিলে আশ্রয় পাওয়া যায়। তারা যত্ন করে খাবারও খেতে দেয়

বিশু ঠাকুরের অবশ্য গোবিন্দপুরে রাত কাটাবার ইচ্ছে নেই। তার উদ্দেশ্য অন্য।

সকাল থেকে একটানা হাঁটতে হাঁটতে সূর্য যখন মাথার ওপর পৌঁছল, তখন তিনি বিশ্রাম নেবার জন্য থামলেন একা বটগাছের নীচে। পাশেই একটা বেশ বড় পুকুর। সুন্দর, টলটলে জল, ধারে-ধারে নারকেল গাছ আর কলাগাছ। পুকুরের জল ঝকঝক করছে রোদে।

বিশু ঠাকুর তাঁর পুঁটলিটা খুললেন। তার মধ্যে রয়েছে দুটো মাটির সরা আর কিছু চিঁড়ে, গুড় আর নারকোলের নাড়ু। খানিকটা চিঁড়ে আলাদা করে একটা সরায় নিয়ে তিনি পুকুরের কাছে গিয়ে জলে ভিজিয়ে আনলেন। তারপর অপেক্ষা করলেন খানিকক্ষণ। চিঁড়েগুলো ভিজে গিয়ে বেশ ডুমো-ডুমো হবার পর তিনি গুড় দিয়ে মেখে ফেললেন। তারপর একটা একটা গেরাস পাকিয়ে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে তাঁর মনে হল, এর সঙ্গে একটা কলা দিয়ে মাখলে আরও স্বাদ হত। পুকুরধারের কলাগাছে এক ছড়া বেশ পাকা কলা রয়েছে। কিন্তু কার না কার গাছ, তাই তিনি সেই কলাগাছটার দিকে পেছন ফিরে বসলেন। তারপর কয়েকটা নারকোল-নাড়ু খেয়ে নিয়ে আবার নেমে গেলেন পুকুরের ধারে। সরাটা ভাল করে ধুয়ে তাতে করেই জল খেয়ে নিলেন অনেকটা।

এবারে তিনি পুঁটলিটা আবার বেঁধে রেখে দিলেন মাথার কাছে। তারপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। মুগার চাদরটা টেনে দিলেন গায়ে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, বটগাছটার ডালে একটা ময়না আর একটা দোয়েল ডাকছে পাল্লা দিয়ে। বড় আরাম লাগল বিশু ঠাকুরের। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন শীতকালের পরিষ্কার নীল আকাশ। একটুক্ষণের মধ্যেই তাঁর চোখ জুড়ে ঘুম এসে গেল।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোলেন বিশু ঠাকুর। একটা তক্ষকের ডাকে তাঁর ঘুম ভাঙল। তক্ষক এক রকমের সাপ, কিন্তু বড় গিরগিটির মতন চেহারা। ওরা 'তক্‌খো', 'তক্‌খো' করে বেশ জোরে জোরে ডাকে। এই বটগাছের কোনো কোটরে লুকিয়ে থেকে তক্ষক সাপটা ডাকল ঠিক সাতবার।

তক্ষক সাপ যদি মাথায় কামড়ায় তা হলে আর বাঁচার আশা থাকে না। কিন্তু এই তক্ষক সাপটা বিশু ঠাকুরকে সাবধান করে দেবার জন্যই বোধহয় ডেকে উঠেছিল।

বিশু ঠাকুর উঠে বসে চোখ রগড়ে দেখলেন, বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে ম্লান আলো। তিনি ইচ্ছে করেই এতক্ষণ ঘুমিয়েছেন, কেননা, আজ বোধহয় তাঁকে রাত জাগতে হবে।

তারপরই চোখ তুলে দেখলেন, একটু দূরে দু' জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বেশ বলিষ্ঠ চেহারা, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, খালি গা। দু' জনেরই হাতে দু'খানা লাঠি।

একজন বলল, "অচেনা মানুষ দেখছি। মনে হচ্ছে এ গাঁয়ের কেউ নয়।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "ঠিকই ধরেছ। আমি ভিন্ গাঁয়ের এক পথিক।"

অন্যজন বলল, "এই সোনারং গ্রামে চেনাশুনো কেউ আছে ?"

বিশু ঠাকুর দু' দিকে মাথা নেড়ে জানালেন, না।

ওরা দু'জন আরও কাছে এগিয়ে এল। একজন মাথা ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঐ পুঁটলিটায় কী আছে ? খোলো তো দেখি।"

বিশু ঠাকুর অবাক হয়ে বললেন, "আমার পুঁটলি তোমাদের দেখাতে যাব কেন বাপু ?"

একজন বলল, "তুমি কোনো চোরাই জিনিস নিয়ে যাচ্ছ কি না দেখব।"

আর একজন বলল, "চুপ করে বসে থাকো। নইলে লাঠির বাড়ি মেরে মাথা ফাঁক করে দেব।"

বিনা অনুমতিতেই পুঁটলিটা একজন তুলে নিয়ে খুলে ফেলল। তার মধ্যে চিঁড়ে, গুড়, নারকোল-নাড়ু ছাড়া রয়েছে একখানা ধুতি আর একখানা চাদর, একটা মুর্শিদাবাদি কাঁসার ঘটি আর দু'খানি আকবরি মোহর।

সেই লোকটি বলল, "এ তো দেখছি মহাকৃপণ। রাস্তায় বেরিয়েছে, অথচ সঙ্গে বিশেষ কিছুই নেই। যাক গে, বউনির সময়, যা পাওয়া যায় তাই লাভ। চল্।"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "এখন একে কী করব ? একে খতম করে দেব না ছেড়ে দেব ?"

প্রথম লোকটি বলল, "ও যদি চুপচাপ চলে যায়, তা হলে আর রক্তারক্তি করার দরকার কী, ওহে, তুমি পেছন ফিরে একেবারে মুখটি বুজে চলে যাও !"

বিশু ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "বা রে, তোমরা তো বড় মজার লোক। আমার জিনিস কেড়ে নিচ্ছ, আবার আমায় বলছ চুপ করে থাকতে। তা কখনো হয় ? দাও, আমার পুঁটলিটা ফেরত দাও !"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "ওরে, এর যে দেখছি মরবার শখ হয়েছে।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "উঁহু ! আমার মোটেই মরবার শখ নেই। আমার আরও ঢের দিন বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে। আমি নিরীহ মানুষ, আমার পুঁটলিটা ফেরত দাও, চলে যাই !"

দ্বিতীয় লোকটা বলল, "তবে তুই মর !"

বলেই সে সাঁ করে লাঠি চালাল বিশু ঠাকুরের মাথা লক্ষ করে। বিশু ঠাকুর লোকটার চোখে চোখ রেখেছিলেন। সে লাঠি চালাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথা নিচু করে ঠিক বাতাসে সাঁতার কাটবার মতন ভঙ্গিতে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির পেটে মারলেন একটা প্রচণ্ড ঢুঁ। সে সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেল।

অন্য লোকটা লাঠি তোলবার আগেই তিনি এক হাতে তার লাঠি চেপে ধরে অন্য হাতে ঠাস করে তার গালে এক চড় মেরে বললেন, "বেল্লিক কোথাকার !"

এর কাছ থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন আরেক জনের দিকে। সে ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বিশু ঠাকুর বললেন, "দেখি, কেমন লাঠি ধরতে শিখেছিস। মার আমাকে।"

সেই লোকটার লাঠির সঙ্গে বিশু ঠাকুরের লাঠির ছোঁয়ায় তিনবার মোটে ঠক্ঠক্ শব্দ হল। তারপরই সেই লোকটার হাত থেকে লাঠি উড়ে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

সব ব্যাপারটাই ঘটে গেল প্রায় চোখের কয়েকটা পলক ফেলার মধ্যে।

এবারে লোকদুটিকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বিশু ঠাকুর তাঁর কোমর থেকে ছুরিটা বার করলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "এবারে তোদের পেট ফাঁসিয়ে দু'জনের নাড়িভুঁড়িতে গিঁট বেঁধে দেব। সেই হবে তোদের উচিত শাস্তি।"

লোকদুটো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আপনি নিশ্চয়ই কোনো দেবতা কিংবা ব্রহ্মদৈত্যি। আমাদের ঘাট হয়েছে। এবারকার মতন আমাদের মাপ করে দিন।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "দেবতা নই, আমি ব্রহ্মদৈত্য। এবার তোদের রক্ত খাব। দেশের এমন অবস্থা হয়েছে যে, আমার মতন একজন গরিব লোকও নিশ্চিন্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে পারবে না ?"

লোক দুটি প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, "হুজুর, এবারকার মতন দয়া করুন। আমরা আর কোনো দিন এমন কাজ করব না।"

বিশুঠাকুর বললেন, "আমার এত দয়া-টয়া নেই। যারা আমার মতন নিরীহ, দুর্বল লোকের জিনিস কেড়ে নেয়, তাদের ওপর আমার একটুও দয়া করতে ইচ্ছে করে না।"

কান্না থামিয়ে ওদের একজন চোখ বড় বড় করে বলল, "আপনি দুর্বল ? চোখের নিমেষে আমাদের দু'জনকে ঘায়েল করে দিলেন !"

বিশুঠাকুর ছুরিটা আবার কোমরে গুঁজে দু'হাতে লোক দুটির ঘাড় চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, "আমি গরিব বামুন, আমার জিনিস কেড়ে নিতে তোদের লজ্জা করল না ? তোদের কী শাস্তি দেব তাই ভাবছি। নাড়িভুঁড়ি ফাঁসাব, না পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে দেব—"

ওদের একজন বলল, "বামুন ঠাকুর, আমরা নাক-কান মলছি, আর কোনো দিন এই কাজ করব না। আমাদের ঢের শিক্ষা হয়ে গেছে, এবারকার মতন আমাদের ছেড়ে দিন।"

"ঠিক বলছিস ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভগবানের দিব্যি নিয়ে বলছি।"

"তোদের ভগবানের দিব্যিতে কে বিশ্বাস করে ? এতদিন ভগবানকে ভয় পাসনি। আজই হঠাৎ ভগবানের ওপর ভক্তি হল ? ঠিক আছে, আমি এক মাস বাদে এই পথ দিয়ে ফিরব। তখনও যদি শুনি তোরা চুরি-ডাকাতি করছিস.... তোদের নাম কী ?"

"জগাই আর মাধাই।"

"হুঁ ! নাম দুটি তো বেশ। এক চৈতন্য ঠাকুর একবার জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন, আমিও তোদের উদ্ধার করলুম। মনে রাখিস, আমার নাম বিশ্বেশ্বর ঠাকুর !"

"অ্যাঁ ? আপনিই বোম্বেটে বিশু ঠাকুর ?"

এইবার বিশুঠাকুর হেসে ফেললেন। তিনি বললেন, "আমি বোম্বেটে কেন হব ? আমি শিবঠাকুরের পুজো করি। একবার বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়াই করেছিলুম বটে—"

"ঠাকুর, আপনার পায়ের ধুলো দিন, ধন্য হয়ে যাই।"

"আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। তোরা যে পাপ করেছিস তা ধুয়ে ফেলার জন্য পুকুরে স্নান করে আয়।"

লোক দুটো আবার ভয় পেয়ে চোখ গোল গোল করে বলল, "অ্যাঁ ?"

শীতের বিকেল, শন্শন্ করে হাওয়া দিচ্ছে। এখন জলের নাম শুনলেই শরীরে চমক দেয়।

কিন্তু বিশুঠাকুর ছাড়লেন না। আঙুল উঁচিয়ে কড়া গলায় বললেন, "যা। শিগগির নাম্ পুকুরে। ঐ যে ভগবানের নামে দিব্যি নেওয়ার কথা বলছিলি, এখন পুকুরে তিনবার ডুব দিয়ে তারপর সেই দিব্যি নে—"

ওরা তখনও ইতস্তত করছে দেখে বিশুঠাকুর ওদের চুলের মুঠি ধরে ঠকাস করে মাথা ঠুকে দিলেন। তারপর বললেন, "তোরা জলে নামবি, না আমি তোদের পেট ফাঁসিয়ে নাড়িভুঁড়িতে গিঁট বাঁধব ?"

লোক দুটো এক পা এক পা করে নামতে লাগল জলে। বিশুঠাকুর চেঁচিয়ে বললেন, "মনে রাখিস, আমি আবার এক মাস বাদে এই পথ দিয়েই ফিরব।"

তারপর লোক দুটো ঝুপ করে জলের মধ্যে একবার ডুব দিতেই তিনি পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন।

গ্রামের মধ্যে না ঢুকে বাইরের মেঠো রাস্তা ধরেই হাঁটতে লাগলেন বিশু ঠাকুর। আস্তে আস্তে সন্ধে হয়ে এল। এরপর রাস্তা চেনাই মুশকিল হবে। বিশুঠাকুর যেখানে যেতে চান, মনে হচ্ছে যেন তার কাছাকাছিই এসে পড়েছেন।

একটু বাদে তিনি গোরুর গলায় ঘন্টার টুং টাং শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন। এক পাল গোরু নিয়ে আসছে দু'জন রাখাল। তারা কাছে এসে পড়বার পর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ গো, আগুনমারীর জলাটা কোন্ দিকে বলতে পারো ?"

একজন রাখাল পেছন ফিরে বলল, "ঐ যে ডান দিকের তালগাছটা দেখতেছ, ওর পশ্চিম দিকে চলে যাও, তা হলেই পেয়ে যাবে।"

একটু থেমে সে আবার বলল, "এখন ওদিকে কেন যাবে ঠাকুর ? রাতের বেলা তো ওদিকে কেউ যায় না।"

বিশুঠাকুর বললেন, "যাই দেখি, একটু কাজ আছে।"

সেই তালগাছটা লক্ষ করে সোজা চললেন তিনি। আকাশে এখনো একটু একটু আলো আছে। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে যাবার আগেই তিনি ওখানে পৌঁছতে চান। তাই শেষ পর্যন্ত ছুট লাগালেন।

তালগাছের গোড়ায় পৌঁছে তিনি পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন- শেষ-সূর্যের আলোয় চকচক করছে আগুনমারীর জলা। এইখানেই তিনি আগের দিন সেই আলেয়া ডাকিনী দেখতে পেয়েছিলেন। এখানেই কোথাও তিনি পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন তাঁর লাঠিটা। সেটাকে খুঁজতে লাগলেন তিনি। খানিকটা ঘোরাঘুরি করে সেটা তিনি পেয়েও গেলেন।

এদিকে এরকম বড় বড় বিল আর জলাভূমি অনেক রয়েছে। তবে এখন শীতকাল বলে আগুনমারীর জলায় জল বেশি নেই। মাঝে মাঝে জল শুকিয়ে গিয়ে ডাঙা জেগে উঠেছে, সেখানে ঝোপ-ঝাড়ও গজিয়েছে। আবার মাঝে-মাঝে জল। এখানে দিনের বেলা জেলেরা মাছ ধরতে আসে। কিন্তু সন্ধের পর আর কেউ আসে না।

একটা শুকনো জায়গা বেছে নিয়ে বিশু ঠাকুর বসলেন। আগের বার রাত্রির প্রথম প্রহরেই তিনি আলেয়া ডাকিনীর দেখা পেয়েছিলেন। আজ সে কখন আসবে কে জানে।

এখান থেকে চার দিকে তাকালে শুধু দূরে দূরে দুটো একটা গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যতদূর চোখ যায় একেবারে ফাঁকা।

খানিকবাদেই পুরোপুরি সন্ধে হয়ে গেল, কিন্তু বিশুঠাকুর একটু নিরাশ হলেন। সন্ধে হলেও পুরোপুরি অন্ধকার হল না। আকাশে দেখা দিল চাঁদ। আগের দিন অমাবস্যা ছিল। চাঁদের আলো থাকলে কি ওরা আসে ?

বিশুঠাকুর সারা রাত জেগে থাকবেন ঠিক করলেন। এক সময় না এক সময় অন্ধকার হবেই।

আরও খানিকটা বাদে একটা শব্দ শুনে বিশুঠাকুর চমকে উঠলেন। তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। শব্দটা কী রকম যেন মেয়েলি গলায় হি-হি-হি-হি হাসির মতন। আগের দিনও তিনি এই রকম হাসি শুনেছিলেন। একেই লোকে বলে পেত্নির হাসি। কিন্তু আজ বিশুঠাকুরের মনে হল, এক ধরনের মাছরাঙা পাখিও এই রকম শব্দ করে। দিনের বেলা এই রকম মাছরাঙার ডাক সবাই শোনে, কিন্তু রাত্তিরবেলা শুনলেই অন্য রকম মনে হয়। অবশ্য, বেশির ভাগ পাখিই তো রাত্তিরে ডাকে না !

পাখিটা আর একবার হি-হি-হি-হি করে ডেকে ওঠবার পরই দপ্ করে জ্বলে উঠল আলেয়া।

বিশু ঠাকুর একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। তিনি বোঝবার চেষ্টা করলেন ঐ আলোর মধ্যে কোনো মেয়ের মুখ দেখা যায় কি না। তা তিনি আজ দেখতে পেলেন না। যদিও আলোটা নিজে নিজেই লাফাচ্ছে।

আলোটা জ্বলে ওঠা মাত্র বিশুঠাকুরের ইচ্ছে হয়েছিল ঐ দিকে ছুটে যেতে। কিন্তু তিনি মনের জোর এনে চুপ করে বসে রইলেন। তিনি অনেকের কাছে শুনেছেন যে, আলেয়াকে ধরবার জন্য ছুটোছুটি করেই অনেকে রাস্তা ভুলে যায়। শেষ পর্যন্ত মারা যায়। দেখাই যাক না। ঐ আলেয়া কী করে !

আলেয়ার আলো একবার ছোট হয়, একবার বড় হয়। তাতে তার চেহারাও বদলে যায়। এক-এক সময় মনে হয় একটা মেয়ের মতন, এক-এক সময় মনে হয় একটা জ্বলন্ত গাছ।

আলোটা খানিকক্ষণ ঘুরে-ঘুরে যেন নাচ দেখাল বিশুঠাকুরকে। বিশু ঠাকুর ভাবলেন, এই আলোটা যেখান থেকেই আসুক, একে তো ভয় পাবার কিছু নেই। কোনো ডাইনি বা পেত্নি তো ওর মধ্য থেকে উঁকি মারছে না। আগের বার তিনি প্রথম দেখে ওকে ধরবার জন্য ছুটেছিলেন, তাতেই তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

একটু পরে সেই আলেয়ার আলো একটা নির্দিষ্ট গতিতে লাফাতে লাগাল। ডান দিকের একটা কোণের দিকে লাফাতে লাফাতে গিয়ে এক জায়গায় থামে, আবার কাছে ফিরে আসে। এই রকম দু' তিনবার
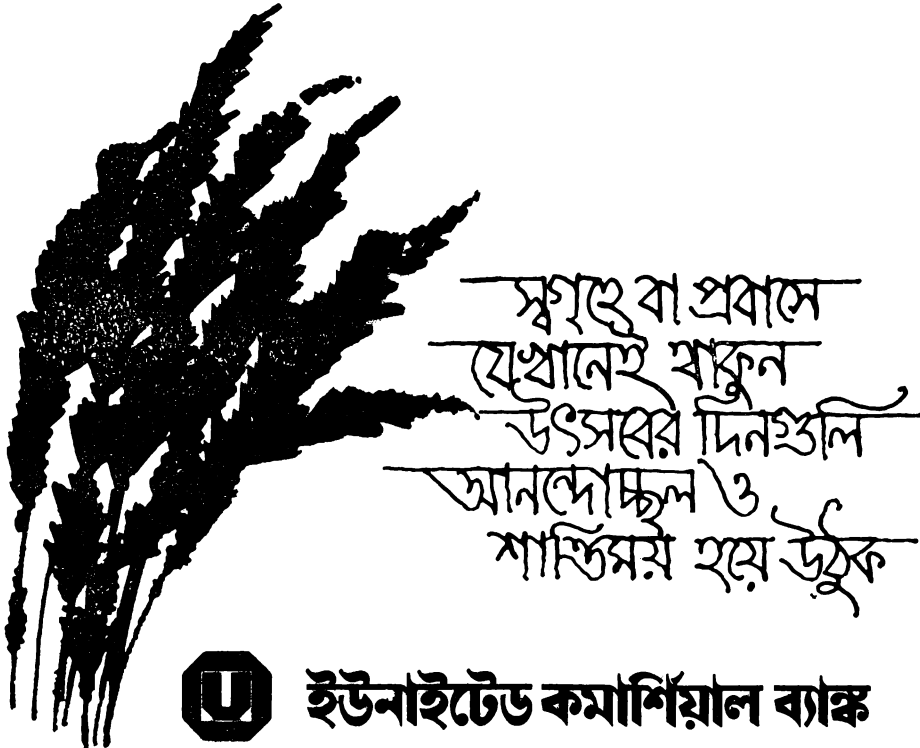
হবার পর বিশুঠাকুর শুনতে পেলেন একটি মেয়ের কান্নার আওয়াজ।

এবার তিনি সিধে হয়ে বসলেন। এ তো আর কোনো পাখি-টাখির ডাক নয়, সত্যি কোনো মেয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ডান দিকের কোণে যেখানে গিয়ে আলেয়াটা থামছে, কান্নার আওয়াজটা আসছে সেখান থেকে।

বিশুঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। ব্যাপারটা তো দেখতে হয়। আলেয়ার আলোও যেন তাঁকে ঐ দিকে যেতেই ইশারা করছে।

তিনি আলেয়াকে লক্ষ করে এগোলেন। শুকনো জায়গা ছেড়ে তাঁকে নামতে হল জলে। ঠাণ্ডা কনকনে জল। অবশ্য এখানে হাঁটু-জলের বেশি গভীর নয়, তা তিনি আগেই দেখে নিয়েছেন।

তবু জলে নামবার পর তাঁর মনে হল, শেষ পর্যন্ত সেই তাঁকে আলেয়ার পেছনেই ছুটতে হল।

৪

খানিকটা জলা পেরিয়ে আসার পর বিশু ঠাকুর দেখলেন আর-একটা শুকনো জায়গায় শুয়ে আছে একটি মেয়ে। লাল শাড়ি পরা, সে উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। আলেয়ার আলো দপ্‌দপ্ করছে তার মাথার কাছে।

বিশুঠাকুর সেখানে উপস্থিত হতেই আলেয়া দূরে গেল। বিশুঠাকুর দারুণ অবাক হয়ে ভাবলেন, এখানে এই মেয়েটি এল কী করে ? যখন পুরোপুরি অন্ধকার ছিল, তখন তিনি সব দিক ভাল করে দেখে নিয়েছিলেন, কোনো মানুষের চিহ্ন তো চোখে পড়েনি। এই অন্ধকারের মধ্যে মেয়েটি এল কী করে আর কেনই বা কাঁদছে ? কিন্তু একটি মেয়ে সত্যিই শুয়ে আছে, এ তো আর চোখের ভুল নয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে মা ?"

মেয়েটি অমনি ধড়ফড় করে উঠে বসল। বিশুঠাকুর দেখলেন, মেয়েটির বয়েস চোদ্দ-পনরো বছর হবে, ফর্সা ফুটফুটে মুখ, মাথা ভর্তি অনেক চুল।

বিশুঠাকুরকে দেখে মেয়েটির মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে হাত দুটো নাড়তে-নাড়তে বলতে লাগল, "না, না। আমায় মেরো না। আমায় মেরে ফেলো না!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আমি তোমায় মারব কেন ?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছ। তুমি আমায় মেরে ফেলবে!"

"কেন, আমি তোমায় মারব কেন ? আমি তো তোমায় চিনিই না।"

"তা হলে তুমি কে ?"

"আমি একজন পথিক। কিন্তু এরকম জায়গায় তুমি একা একা শুয়ে কাঁদছ কেন ?"

"আমার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই, কোনো আত্মীয়-স্বজন বেঁচে নেই। তাই আমি মনের দুঃখে কাঁদছি।"

"তোমার বাড়ি কোথায় ?"

"আমার বাড়ি নেই।"

"তা বলে এরকম জায়গায় তো তোমার থাকা ঠিক নয়। এখানে কত রকম বিপদ হতে পারে।"

তারপর খানিক দূরে দপদপ করতে থাকা আলেয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ঐ আলেয়া দেখে তোমার ভয় করেনি ?"

মেয়েটি বলল, "ওকে ভয় পাব কেন ? ও তো আমার সই। ওর নাম জবাফুল।"

"আলেয়ার নাম জবাফুল ? তা হলে আলেয়া কি মানুষ ?"

যে মেয়েটি একটু আগে অমন ফুঁপিয়ে কাঁদছিল, এবারে সে হঠাৎ হি হি হি হি করে হেসে উঠে বলল, "ও মা, আলেয়া আবার মানুষ হয় নাকি ? যেমন তুমি হচ্ছ মানুষ, গাছ হচ্ছে গাছ, পাখি হচ্ছে পাখি, সেই রকম আলেয়া হচ্ছে আলেয়া।"

বিশুঠাকুর কিছুই বুঝতে পারলেন না।

এই সময় দারুণ জোরে ঘর্ঘর-ঘর্ঘর শব্দ উঠল, যেন আকাশ দিয়ে একটা রথ যাচ্ছে। মাটি কেঁপে উঠল। শাঁ-শাঁ করে ঝড়ের মতন হাওয়া বইল।

তারপর শোনা গেল ঘোড়ার খুরের কপ্‌কপ্ কপাকপ্ শব্দ। সেই শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকেই।

বিশুঠাকুর বিস্ফারিত চক্ষে দেখলেন, দুধের মতন ধপধপে সাদা রঙের দুটি ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি এসে থামল তাঁর খুব কাছে।

সেই গাড়ির ওপরে বসে আছে সহিস, তার গায়ে জরির পোশাক, মুখে মস্ত বড় গোঁফ, মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ি। তার মুখখানা যেন পাথর দিয়ে তৈরি, চোখের পলক পড়ছে না।

জুড়িগাড়ির পেছন থেকে একটা কালো, রোগা লিকলিকে লোক ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। গাড়ি থেকে নামল একজন বিশাল চেহারার পুরুষ, ধুতি আর বেনিয়ান পরা, মাথায় বাবরি চুল, দু' কানে মাকড়ি, হাতে একটি ছড়ি। দেখলেই মনে হয় কোনো জমিদার।

তাকে দেখেই মেয়েটি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল। বলে উঠল, "বাবা! আমি আর কোনোদিন আপনাকে ছেড়ে যাব না।"

জমিদারের মতন চেহারার লোকটি কটমট করে চেয়ে রইল বিশুঠাকুরের দিকে।

বিশুঠাকুর মহাবিস্ময়ে ভাবছেন, চতুর্দিকে জল, সব জায়গাটাই একটা জলাভূমি, এর মধ্যে দিয়ে এই ঘোড়ায় টানা জুড়ি গাড়ি এল কী করে ?

মেয়েটি বলল, "বাবা, বাবা, এই লোকটি আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল!"

বিশুঠাকুর আবার কৌতূহলের সঙ্গে মেয়েটির দিকে তাকালেন। এইটুকু মেয়ে, কিন্তু দারুণ বিচ্ছু তো! একটু আগে বলছিল, ওর মা-বাবা কেউ নেই। এখন আবার বাবাকে জড়িয়ে ধরে আর-একটা মিথ্যে কথা বলছে।

জমিদারের মতন চেহারার লোকটি এবার মেঘ-ডাকার মতন গম্ভীর গলায় বলল, "তোমার নাম বিশুঠাকুর না ? এসো আমাদের সঙ্গে।"

বিশুঠাকুর বললেন, "আপনি কে ? আপনি আমায় চিনলেন কী করে ?"

লোকটি হুকুমের সুরে বলল, "ওসব কথা পরে হবে। এখন ওঠো গাড়িতে!"

বিশুঠাকুর বললেন, "কেন আমি আপনার সঙ্গে যাব ? আগে বলুন, আপনি কে ?"

লোকটি হাতের ছড়িটা তুলে বলল, "যেতে তোমাকে হবেই। শুধু শুধু দেরি করে লাভ নেই। চটপট গাড়িতে উঠে পড়ো। বেশিক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা যাবে না।"

এবার বিশুঠাকুরের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কারুর কাছ থেকে এরকম হুকুম শোনা তিনি পছন্দ করেন না।

তিনি বললেন, "আমায় যেতে হবেই ? তার মানে ? আমার ইচ্ছে না থাকলেও আমায় যেতে হবে ?"

লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "কেন, আমার সঙ্গে যেতে তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি ? তবে যে শুনেছি, তুমি খুব সাহসী ?"

"সাহসী কি ভিতু সে কথা পরে হবে। আগে বলুন আপনি কে? এই মেয়েটিই বা এখানে একা বসে কাঁদছিল কেন ? এই জলা জায়গা দিয়ে আপনার গাড়ি এল কেমন করে ?"

"তুমি যাবে, না তোমায় জোর করে তুলে নিয়ে যেতে হবে ?"

"জোর-জারি আমি একদম পছন্দ করি না। তাছাড়া, আমি নিরীহ পথিক, আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবেনই বা কেন ?"

"তোমায় নিতেই তো আমি এসেছি।"

"আমার এত বড় সৌভাগ্য কী করে হল যে এরকম একটা মস্ত বড় গাড়ি এনেছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য ? আমি অতি সামান্য লোক, এরকম গাড়িতে জীবনে কখনো চড়িনি। আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চান ?"

"অত কথার দরকার কী ? সহিস, এই লোকটাকে দুটো রদ্দা দিয়ে ঘায়েল করো তো!"

গাড়ির ওপর থেকে এবারে নেমে এল সহিস। কোনো কথা না বলে সে বিশুঠাকুরের সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখের পলক পড়ে না, দৃষ্টি একেবারে স্থির।

বিশুঠাকুর বললেন, "আবার বলছি, আমার গায়ে কেউ হাত

ছোঁয়ালে আমার একটুও পছন্দ হয় না। আমার রাগ হয়ে যায়।"

লোকটি তবু বিশুঠাকুরকে আঘাত করবার জন্য হাত তুলল।

বিশু ঠাকুর সেই হাতটা চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, লোকটিকে শূন্যে তুলে তিনি একটা আছাড় মারবেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটির হাত ধরে তিনি একচুলও নড়াতে পারলেন না। যেন একটা লোহার স্তম্ভ!

লোকটি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল বিশুঠাকুরের ঘাড়ে। তিনি ছিটকে পড়ে গেলেন।

ব্যথা লাগার চেয়েও বিশুঠাকুর অবাক হলেন বেশি। এর গায়ে এত জোর? চেহারা দেখলে তো বোঝা যায় না। বিকেলবেলা বিশুঠাকুর যে-দুটো চোরকে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়েছেন, তাদের চেহারা তো এর চেয়ে অনেক বেশি গাঁট্টাগোট্টা ছিল।

লোকটা আর একবার মারবার জন্য নিচু হতেই বিশুঠাকুর গড়িয়ে দূরে গেলেন। আবার ওরকম মার খেলে আর তাঁর হাড়গোড় আস্ত থাকবে না।

কিন্তু এই সময় আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল।

কোথা থেকে একদল ছোট ছোট পাখি চিকচিক চিকচিক করতে করতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। অনেক পাখি, শত শত পাখি। অত শক্তিশালী লোকটিও সেই পাখিদের দেখে ভয় পেয়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল, তারপর টলতে টলতে চলে গেল গাড়ির দিকে। জমিদারের মতন চেহারার লোকটিও পাখির আক্রমণে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে! পালা! পালা!"

বিশুঠাকুর মাটি থেকে উঠে বসলেন।

উঠেই দেখলেন, তাঁর ঠিক সামনেই সেই মেয়েটি বসে আছে। মুখে তার দুষ্টু-দুষ্টু হাসি।

সে বলল, "চলো, শিগগির পালিয়ে যাই এখান থেকে। শুধু তুমি আর আমি।"

বিশুঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায়?"

মেয়েটি বলল, "এইখানে!"

বলেই সে এক মুঠো ধুলো ছুঁড়ে মারল বিশুঠাকুরের চোখে বিশুঠাকুর জগৎ অন্ধকার দেখলেন। তারপরই তাঁর জ্ঞান চলে গেল

৫

বিশুঠাকুরের যখন জ্ঞান হল, তখন বেশ রোদ উঠে গেছে। চোখ মেলেই তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

তিনি সেই জলাভূমির মধ্যেই একটা ছোট দ্বীপের মতন জায়গাতে রয়েছেন। কাছেই একটা ছোট খেজুরগাছ, তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। সে একদৃষ্টে তাঁর দিকেই চেয়ে আছে লোকটা পরে আছে একটা অতি ময়লা ধুতি, খালি গা, মুখভর্তি দাড়ি খেজুর গাছের পাতা দিয়ে একটা মুকুটের মতন জিনিস বানিয়ে সে মাথায় লাগিয়ে রেখেছে।

বিশুঠাকুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল, "হুঁ!"

বিশুঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?"

লোকটি সুর করে বলল:

"ভাবিলাম তুমি বুঝি গিয়াছ মরিয়া
আলেয়ায় তব প্রাণ নিয়াছে হরিয়া!"

বিশুঠাকুর বললেন, "না, মরিনি। বেঁচেই তো আছি মনে হচ্ছে। তবে কী যে ব্যাপার হল, কিছুই বুঝলাম না। তা তুমি এখানে এলে কোথা থেকে?

লোকটি আবার একই রকম সুর করে বলল:

"তবে কী ব্যাপার হল যে বোঝে না তাই
সে কভু মনুষ্য নয়, কলুদের গাই।"

বিশুঠাকুর বললেন, "তা আমাকে গোরু বলো আর যাই বলো, আমায় খুব বোকা বানিয়েছে বটে। মাথার মধ্যে যেন সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কী যে দেখলাম সব কাল রাতে। তুমি ভাই আমায় কিছু বুঝিয়ে দিতে পারো?"

লোকটি ফিক করে হাসল। তারপর বলল:

"রাতে যাহা দেখো তুমি, দিনে সব ভুল,
আলেয়া যাহার নাম সে-ই জবাফুল।"

বিশুঠাকুর এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওসব হেঁয়ালি ছাড়ো তো। সোজা কথা কও। এই বিজন জায়গায় তুমি একা-একা কী করছ? কোথা থেকে এসেছ? কোন্ গাঁয়ে তোমার বাস?"

"কুম্ভীরের পেটে থাকে ছাগলের ছানা,
বাঁশবনে যে গিয়াছে সে-ই ডোমকানা।"

বিশুঠাকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দূর! এ যে দেখছি বদ্ধ পাগল। এর কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না।"

বিশুঠাকুরের ঘাড়ে ব্যথা, মাথাটা খুব ভারী লাগছে, চোখ দুটো কড়কড় করছে। সারা রাত এই শীতের রাত্রে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকার জন্য তাঁর গা ম্যাজম্যাজ করছে আর কাসি আসছে।

তিনি হাঁটুর ওপর থুতনি দিয়ে ভাবলেন, কাল রাতে সত্যিই কি ঐসব ঘটেছিল, না তিনি স্বপ্ন দেখেছেন? এই জলা জায়গায় ঘোড়ায় টানা গাড়ি আসবে কী করে? তারা গেলই বা কোথায়? রাত্তিরে অত পাখিই বা এল কেন? রাতে তো পাখি ওড়ে না। তবে কি ওগুলো চামচিকে? অথবা পুরোটাই স্বপ্ন?

কিন্তু ঘাড়ে ব্যথা রয়েছে, সেই লোকটা মেরেছিল। চোখ কড়কড় করছে, সেই মেয়েটা ধুলো ছুঁড়ে দিয়েছিল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় তিনি চমকে গিয়ে দাড়িওয়ালা পাগলটার দিকে তাকালেন। এই পাগলটা একবার বলল, 'আলেয়া যাহার নাম সে-ই জবাফুল'। কাল রাত্তিরে সেই দুষ্টু মেয়েটাও বলেছিল যে, আলেয়ার নাম জবাফুল। তা হলে এই পাগলটাও কি মেয়েটাকে দেখেছে?

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে, তুমিও কি কোনোদিন একটি মেয়েকে এখানে কাঁদতে দেখেছিলে? আলেয়ার সঙ্গে যে-মেয়েটির ভাব আছে?"

দাড়িওয়ালা লোকটি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন চিন্তা করল। থুতনিতে আঙুল ঠেকাল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল:

"চক্ষু আছে তবু অন্ধ, কান আছে, কালা,
বক্ষে ধরিলাম সর্প, এ যে গুঞ্জামালা !"

বিশুঠাকুর বললেন, "ওরে বাপ রে,এ যে দেখি স্বভাবকবি। তা, তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে কী ভাবে ? আহার কোথায় পাও ?"

লোকটি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে আবার ফিক করে হাসল। মেয়েদের মতন লজ্জায় মুখটা ঘুরিয়ে নিল। তারপর হঠাৎ জলে নেমে ছপ্‌ছপ করে দৌড়ে গিয়ে আর একটা দ্বীপের মতন জায়গায় উঠে পড়ল। সেখানেও সে দাঁড়িয়ে রইল বিশুঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

বিশুঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কোন্ দিকে যে গ্রাম তা তিনি ঠাহর করতে পারলেন না। তবে বেশ খানিকটা দূরে তিনি দেখতে পেলেন দু' তিনজন মানুষকে। তারা জাল ফেলে মাছ ধরছে।

বিশুঠাকুর সেদিকেই যেতে লাগলেন। কখনো জল ভেঙে, কখনো শুকনো ডাঙার ওপর দিয়ে। কোনো একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে কথা বলবার জন্য তিনি খুব ব্যাকুলতা বোধ করছেন।

দাড়িওয়ালা লোকটিও একটু দূরে দূরে থেকে তাঁকেই অনুসরণ করছে।

জেলেরা দু'জন বয়স্ক লোক আর একটি বাচ্চা ছেলে। তারা বিশুঠাকুরকে দেখে বেশ চমকে উঠল। বাচ্চা ছেলেটি মাছের খালুই রেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে একজন বয়স্ক লোকের পেছনে দাঁড়াল।

সেই লোকটি জল থেকে খুব আস্তে আস্তে জাল টেনে তুলছিল। কোনো জেলে এই রকম সময় কথাও বলে না, জাল তোলাও থামায় না। এই লোকটি থামিয়ে দিয়ে মুখ তুলে কড়া গলায় বলল, "তুমি কে ?"

অন্য বয়স্ক লোকটি একটা মাছ-মারা বল্লম তুলে নিল হাতে।

বিশুঠাকুর বললেন, "আমি একজন পথিক। পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছি। আমি এক ব্রাহ্মণ পূজারি।"

ব্রাহ্মণ শুনেই লোক দুটি হাত জোড় করে প্রণাম জানাল।

তারপর একজন জিজ্ঞেস করল, "বামুনঠাকুর, তোমার মুখে ও কী হয়েছে ?"

বিশুঠাকুর সঙ্গে-সঙ্গে নিজের মুখে হাত দিলেন। তাঁর হাতে রক্ত লেগে গেল।

তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে আমার মুখে বলো তো ?"

একজন জেলে বলল, "তোমার সারা মুখ কে যেন ফালা-ফালা করে চিরেছে মনে হয়।"

বিশুঠাকুর বললেন, "কী জানি ! কাল রাতে তো এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর কী হয়েছে জানি না !"

জেলে দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর একজন বলল, "তুমি কাল রাতের বেলা এখানে ছিলে ? আর একটু এগিয়ে এসো। দেখি তো তোমার গোড়ালি কোন্‌দিকে। জলে তোমার ছায়া পড়ে কি না।

বিশুঠাকুর ওদের কথামতন কাছে এগিয়ে এলেন।

জেলে দু'জন ভাল করে দেখে বলল, "হুঁ, বড় আশ্চর্য ! সবই তো ঠিক আছে দেখছি ! দ্যাখো ঠাকুর, এই জলায় রাত কাটালে কেউ জিয়ন্ত থাকে না। দিনের বেলাতেও বেশি কেউ আসে না এদিকে। যে দু'চারজন আসে, তাদের আমরা চিনি। সেইজন্যই তোমার মতন একজন অচেনা মানুষকে দেখে প্রথমটা আমরা একটু চেতিয়ে গেস্‌লাম।

"কেন, এ জায়গায় বেশি লোক আসে না কেন ?"

"জায়গাটার অনেক দোষ আছে। রাত্তিরবেলা শুধু তেনাদের রাজত্ব। রাতে কেউ পথ ভুলে এদিকে এসে পড়লে তার আর নিস্তার নেই। তুমি বেঁচে আছ বলেই আমরা বড় তাজ্জব হয়েছি।"

"ঐ দাড়িওয়ালা লোকটি কে ?"

"ও একটা পাগল। ও তোমারই মতন একজন ভিন্‌দেশী পথিক, একদিন এদিকে পথ ভুলে এসে পড়েছিল। প্রাণে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু মাথাটি একেবারে গোল্লায় গেছে। ও এখানেই ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। আমরাই ওকে খেতে পরতে দিই।"

"এখানে এসে কেউ কেউ মারাও যায় বলছ ?"

"প্রায়ই তো দেখি একজন না একজন হাত-পা খিঁচিয়ে পড়ে আছে। ঘাড় ভাঙা। এই তো এই আদিত্যবারের আগের আদিত্যবারেও একজন মরেছে। আহা, বড় ফুটফুটে চেহারা ছিল তেনার। নিশ্চয়ই কোনো ভাল বংশের ছেলে।"

"কে মারে এই সব লোকদের, তা তোমরা খোঁজ নাও না ?"

"এ তো সবাই জানে। মারে আলেয়ায়। বেভুল পথিক এ তল্লাটে এলেই আলেয়ার খপ্পরে পড়বে।"

"তবু তোমরা যে এদিকে আসো, তোমাদের ভয় করে না ?"

"দিনের বেলা তো কেউ কোনোদিন আলেয়া দেখেনি। কোনো ভূত-প্রেতও দিনের আলোয় দেখা যায় না। ওনাদের কারবার শুধু অন্ধকারে। যে-সব দিনে মেঘ ঘনিয়ে আঁধার হয়, সে সব দিনে আমরা শিগগির শিগগির বাড়ি চলে যাই।"

বিশুঠাকুর আর কথা বাড়ালেন না। তাঁর শরীর বেশ দুর্বল লাগছে, দাঁড়িয়ে থাকতেও ভাল লাগছে না। কাছাকাছি গ্রাম কোন্ দিকে সেই সন্ধান জেনে নিয়ে তিনি আবার হাঁটতে লাগলেন।

কিন্তু তিনি গ্রামে গেলেন না। খানিকদূর এসে একটা বেশ নিরিবিলি গাছ দেখে তিনি থামলেন। বিলের জলেই হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে তিনি বসলেন আহ্নিক করতে।

তারপর আহ্নিক সারা হয়ে গেলে তিনি তাঁর পুঁটলি খুলে চিঁড়ে-গুড় আর নাড়ু খেলেন। এরপর ভাবতে বসলেন যে, এবার কী করবেন।

অন্য যে-কোনো লোক হলেই এরপর চলে যেত এই অঞ্চল ছেড়ে অনেক দূরে। এখানে যা সব কাণ্ড ঘটছে, গায়ের জোর দিয়ে তা আটকাবার কোনো উপায় নেই। বিশুঠাকুরের মতন শক্তিমান লোককেও সেই সহিস এক কিল মেরে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল। হঠাৎ ছোট-ছোট পাখি বা চামচিকেগুলো এসে না পড়লে তিনি বোধহয় আর প্রাণে বাঁচতেন না।

এখানে রাত্তিরবেলা কোনো মানুষ এলে হয় সে মরে, অথবা পাগল হয়ে যায়। একজন পাগলকে তো তিনি নিজের চোখেই দেখলেন। লোকটা বোধহয় আগে কোনো যাত্রাদলে গান গাইত।

কিন্তু হার স্বীকার করে ফিরে যাবার মতন মানুষ নন বিশু ঠাকুর। ঘোড়ার গাড়ির সহিস তাঁকে অমনভাবে মারল, এর শোধ নিতে না পারলে তিনি কোনোদিন শান্তি পাবেন না।

সারাদিন তিনি সেখানেই ঠায় বসে রইলেন।

দিনের বেলা এ জায়গা দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কয়েক ক্রোশ জুড়ে এই জলাভূমি একেবারে শান্ত, নিস্তব্ধ। জলের মধ্যে এখানে-সেখানে ফুটে আছে শাপলার ফুল, সেগুলোর কাছে ঝাঁক-ঝাঁক ফড়িং ঘুরঘুর করে। কোথাও পাড়ের কাছে এক পা তুলে তপস্বীর মতন চোখ বুজে বসে আছে সাদা ধপধপে বক। মাঝে-মাঝে এক একটা মাছরাঙা পাখি কি-রি-কি-রি করে ডাকতে ডাকতে ঝুপ করে পড়ে যাচ্ছে জলে।

বিশুঠাকুর ভাবলেন, কাল যে ছোট-ছোট কালো রঙের অসংখ্য পাখি দেখেছিলেন, সেগুলো কোথায় গেল ? তাদের তো একটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতের বেলা যে-পাখি ওড়ে, দিনের বেলা তাদের দেখা যায় না, এ তো বড় বিচিত্র কথা।

একবার তিনি দেখলেন, জল থেকে একটা গো-সাপ উঠে আসছে তাঁর দিকে। বিশুঠাকুর নড়া-চড়া করলেন না, ব্যস্ত হলেন না, একই জায়গায় বসে রইলেন চুপ করে।

গো-সাপদের দেখতে বেশ ভয়ঙ্কর হয় বটে, কিন্তু আসলে তারা নিরীহ প্রাণী। ড্যাবডেবে চোখ মেলে সেটা চেয়ে রইল আর চড়াত চড়াত করে লম্বা জিভ বার করতে লাগল। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এল সামনে।

বিশুঠাকুর বললেন, "এই, এদিকে আসিস না ! যাঃ, যাঃ !"

মানুষের গলার আওয়াজ পেয়েই গো-সাপটা ভিতুর মতন হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল জলে।

বিকেল হতে না হতেই সেই জেলেরা তাদের জাল গুটিয়ে ফিরে গেল গ্রামে। পাগলটিকে বিশুঠাকুর আর দেখতে পেলেন না।

তারপর সন্ধে নামল।

আজ যেন শীত একটু বেশি। মাঝে-মাঝে জোলো হাওয়া দিচ্ছে আর গা একেবারে কনকন করছে। কাল রাতে বিশুঠাকুরের গায়ের চাদরটা জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। সকালে তিনি সেটা কেচে দিয়েছিলেন, সারাদিন ধরে শুকিয়েছে। এবারে তিনি সেই চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে।

কাল তিনি যেখানে আলেয়া দেখেছিলেন, আজ তিনি তার থেকে অনেক দূরে বসে আছেন। তবে আলেয়ার আলো এমন জোরালো যে, অনেক দূর থেকেও দেখতে পাওয়ার কথা।

আকাশে আজ বেশ ভাল রকম একটা চাঁদ আছে। সেইজন্য ঘুটঘুটে অন্ধকার নয়। দূরের গাছগুলোও আবছা-আবছা দেখা যায়।

প্রথমে তিনি দেখতে পেলেন কয়েকটা জোনাকি। এলোমেলো ভাবে উড়ছে। ঠিক যেন বাতাসের গায়ে তারা আঁকবার চেষ্টা করছে কোনো ছবি। সত্যি এক সময় জোনাকিরা কাছাকাছি এসে গেল, তাদের আলোতে গড়ে উঠল একটি মেয়ের মুখ।

বিশুঠাকুর ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই তাঁর চোখের ভুল।

জোনাকিগুলো আবার ছিটকে যেতে সেই মুখের ছবি ভেঙে গেল। বেশ জোর একটা দমকা হাওয়া এসে তাদের উড়িয়ে নিয়ে গেল অনেক দূরে।

তারপরই কে যেন বিশুঠাকুরের গায়ের চাদরটা ধরে টান দিল।

তিনি চমকে উঠে 'কে, কে' বলে উঠলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না, চাদরটা খুলে গেল তাঁর গা থেকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সেটা ধরবার চেষ্টা করলেন। তার আগেই চাদরখানা উড়ে গিয়ে পড়ল জলে।

চারদিকে তাকিয়ে বিশুঠাকুর কারুকে দেখতে পেলেন না। তবু তাঁর দারুণ রাগ হয়ে গেল। চাদরটা কে টেনে নিল ? বাতাস ? এই শীতের মধ্যে ভিজে চাদরটা তো আর গায়ে দেবার কোনো উপায়ও রইল না। জলে না নেমে তিনি লাঠি দিয়ে চাদরটাকে টেনে আনলেন কাছে।

এবার গাছের ওপর থেকে ছড় ছড় করে জল পড়তে লাগল তাঁর গায়ে। কে যেন এক কলসি জল উপুড় করে দিয়েছে ওপর থেকে গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে যেমন লাগে, ঠাণ্ডার সময় গায়ে হঠাৎ জল পড়লেও সেই রকম বোধ হয়।

তিনি ওপরে মুখ তুলে কড়া গলায় বললেন, "কে ? কে ওখানে ? আমার সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে ?"

কেউ সাড়া দিল না।

তিনি ভাবলেন, এ নিশ্চয়ই সেই পাগলটার কাজ। কখন চুপি-চুপি এসে গাছের ওপর উঠে বসে আছে।

তিনি গাছের গুঁড়িটা ধরে নাড়া দিতে দিতে বললেন, "নেমে আয় বলছি ! নইলে এই গাছসুদ্ধু উপড়ে ফেলে দেব।"

কেউ নেমে এল না। তিনি ভাল করে দেখলেন, গাছের ওপর কেউ নেই।

বিশুঠাকুরের শরীর দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল গাছের ওপর কেউ নেই, তবু জল পড়ল তাঁর গায়ে। তা হলে কি সত্যিই...

একটা গলা-খাঁকারি শুনে তিনি চমকে পাশে তাকাতেই দেখলেন দু'জন লোক তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে একজনের চেহারা বেশ ঘি-দুধ খাওয়া নাদুস-নুদুস ধরনের, কোঁচানো ধুতি আর জরিদার রেশমের ফতুয়া পরা, মুখখানা হাসি-হাসি

অন্য লোকটি রোগা-প্যাংলা, কুচকুচে কালো রং, একটু মালকোঁচা-মারা ধুতি পরা, খালি গা। মুখখানা গোমড়া। চোখ দুটো পিটপিট করছে অনবরত।

এরকম দু'জন লোককে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কীরকম যেন অস্বাভাবিক লাগে। অবশ্য রাত্তিরবেলায় নির্জন জল জায়গায় দু'জন লোককে হঠাৎ দেখতে পাওয়া আরও অস্বাভাবিক ব্যাপার।

বিশু ঠাকুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই নাদুস-নুদুস লোকটি বলল, "এই যে, বিশু, তুমি আজও এখেনে রয়েছ দেখছি। তা বেশ, বেশ

বিশুঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কে ?"

লোকটি অমায়িক ভাবে হেসে বলল, "দ্যাখো বাপু, আমাদের একটা নিয়ম আছে। প্রথম থেকেই পষ্টাপষ্টি বলে দেওয়া ভাল। আমাদের কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। তার কোনো জবাব পাবে না। আমরা যা জিজ্ঞেস করব, তার তুমি চটপট উত্তর দেবে। বুঝলে ?"

বিশুঠাকুর ঠাট্টার সুরে বললেন, "এটা আপনাদের নিয়ম। তা, এ নিয়ম যে আমাকেও মানতে হবে তার কোনো মানে আছে ?"

লোকটি আগের মতনই বেশ সন্তুষ্টভাবে হেসে বলল, "তা বাপু তোমাকে মানতেই হবে। আমাদের কর্তাবাবুর এই হুকুম।"

"আপনাদের কর্তাবাবু কে ?"

"সেই প্রশ্ন করলে তো ? বললাম না, কোনো প্রশ্নের উত্তর পাবে না। বরং, তুমি বলো তো, তুমি পরপর দু'রাত এখেনে কী করছ ?"

"আপনি জানলেন কী করে যে আমি কালও এখানে ছিলাম ?"

"আবার প্রশ্ন ? বলছি না উত্তর পাবে না।"

"এ তো ভারী মজা। আপনি নিজে প্রশ্ন করে যাবেন, আর আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারব না ? শুনুন মশাই, লোকের হুকুম শোনার অভ্যেস আমার নেই।"

"ওহে বিশু, শুধু-শুধু মাথা গরম কোরো না।"

"আপনি আমায় 'বিশু বিশু' বলে ডাকছেন, আর 'তুমি' বলে কথা বলছেন কেন ? আমিই বা তা হলে আপনি বলতে যাব কেন ? আমি তুই বলব। তুই কে রে ব্যাটা ?"

"হে হে হে হে ! এ লোকটা দেখছি নাছোড়বান্দা। উত্তর পাবে না, তবু প্রশ্ন করে চলে। ওহে নিধি, একে নিয়ে কী করা যায় বলো তো ?"

রোগা-প্যাংলা গোমড়ামুখো লোকটি বলল, "ছোটকর্তা, আপনি অযথা সময় নষ্ট করতেছেন। কাজ শুরু করে দিন না !"

নাদুস-নুদুস লোকটি বলল, "সেই ভাল ! সময় বেশি নেই। কখন যে ওরা এসে পড়বে, তার ঠিক নেই তো ! ওহে বিশু, তুমি নাকি বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছ ? আমি এই যে নিধিরাম সর্দারকে এনেছি, তুমি ওর সঙ্গে লড়াই করো তো একটু দেখি !"

বিশুঠাকুর অনেক ভেবে-ভেবেও কিছু কূলকিনারা পাচ্ছেন না। এরা কারা, হঠাৎ কী করে এখানে এল, কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি।

লোকটির কথা শুনে খুব বিরক্তভাবে তিনি বললেন, "আমার গায়ের চাদর খুলে নিয়েছে কে ? আমার গায়ে জল পড়ল কী করে ? এই লোকটার সঙ্গে আমি লড়াই করতেই বা যাব কেন ?"

লোকটি জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, "বিশু, তুমি কে, কী, কেন ছাড়া আর কোনো কথা জানো না ? তুমি নিধিরামের সঙ্গে লড়াই করতে চাও কি না বলো দেখি চটপট ?"

নিধিরাম সর্দার বলল, "ছোটকর্তা, অত কথার দরকার কী ? এই লোকটাকে পট্‌কে দিই ?"

রোগা-প্যাংলা লোকটার স্পর্ধা দেখে বিশুঠাকুর হতবাক হয়ে গেলেন।

তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, "তোরা যে-ই হোস না কেন, আপদ দূর হয়ে যা। আমি বেশি রেগে গেলে কিন্তু তোদের কপালে দুঃখ আছে।"

দুটি লোকই একসঙ্গে হিহি হিহি করে হেসে উঠল। নিধিরাম সর্দার তার রোগা লিকলিকে একটা হাত বিশুঠাকুরের কাঁধে রেখে বলল, "কী রে ছেলে, তোর খুব তেজ, তাই না ?"

বিশুঠাকুর আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলেন না। তিনি নিধিরামের টুঁটি চেপে ধরে ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাইলেন। কিন্তু ওকে তিনি এক চুল নড়াতে পারলেন না। বরং নিধিরাম সর্দারই এক হাতে একটা বেড়ালছানার মতন বিশুঠাকুরকে শূন্যে তুলে ধরল। তারপর চারদিক ঘুরিয়ে বিশুঠাকুরকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলের মধ্যে।

দু'তিনবার ডুব দিয়ে বিশুঠাকুর ভেসে ওঠবার পর শুনতে পেলেন চর্তুদিকে খুব জোর ঢাকের শব্দ হচ্ছে। বাতাস বইছে খুব জোরে। আকাশের তারারা জায়গা পালটা-পালটি করছে।

তিনি বুঝলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় এসে গেছে। আর কোনো আশা নেই। এই লোক দুটো মানুষ নয়, এরা পিশাচ। এদের হাতেই অচেনা পথিকেরা এখানে এসে মরে। তিনিও ওদের সঙ্গে পারবেন না।

কিন্তু একটা কথা তিনি বুঝতে পারলেন না। এরা মানুষ মারে কেন ? তাতে এদের কী লাভ ?

কনকনে ঠাণ্ডা জলে বিশুঠাকুরের শরীর প্রায় জমে যাচ্ছে। তবু তিনি অন্য কোনো দিকে পালাবার চেষ্টা করলেন না। জল ভেঙে ভেঙে সেই শুকনো ডাঙাতেই ফিরে এলেন।

লোক দুটি এখন আর দাঁড়িয়ে নেই, বসে আছে মাটিতে উবু হয়ে।

বিশু ঠাকুরকে দেখে নাদুস-নুদুস লোকটি বলল, "বা বা বা বা ! তুমি মরোনি তা হলে, বেঁচে আছ ? বেশ, বেশ, তোফা ! তোমায় দিয়ে কাজ হবে।"

রোগা-প্যাংলা লোকটি বলল, "ছোটকর্তা, এ ছেলেটার বেশ এলেম আছে বলতে হবে। জান্ বেশ কড়া। একে নিয়ে গেলে কর্তাবাবু খুশি হবেন।"

ছোটকর্তা বলল, "একে নিয়ে যাবার জন্যই তো এসেছি। একটু বাজিয়ে দেখছিলাম। নিধি, তুই ওর হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।"

নিধিরাম সর্দার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এসো গো, ছেলে। আমার হাত ধরো। আর যেন বেগড়বাঁই করতে যেও না, তা হলে আর একবার জলের মধ্যে নাকানি-চুবোনি খাবে। চলো আমার সঙ্গে।"

বিশুঠাকুর আর কোনো প্রতিবাদ করলেন না। তিনি লোকটির পিছু-পিছু চলতে লাগলেন।

নাদুস-নুদুস লোকটি বলল, "কই গো, জবাফুল, একটু বাতি দেখাও !"

অমনি দপ্ করে জ্বলে উঠল আলেয়া। খুব কাছেই। ঠিক যেন নেচে নেচে সেই আলো তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

শুকনো ডাঙা ছেড়ে তাদের নামতে হল জলকাদার মধ্যে। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না।

এক জায়গায় এসে সেই আলেয়ার আলো একটা অত্যন্ত লম্বা মানুষের হাতের আরতির ধুনুচির মতন ঘুরতে লাগল চারদিকে। সেই আলোয় বিশুঠাকুর দেখলেন একটা মস্ত বড় রাজপ্রাসাদ। তার দেউড়িতে দু'জন দারোয়ান, ভেতরে একটা জুড়িগাড়ি আর একটা পাল্কি।

ধাপ ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়িটির সামনের দিকে। সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে অতি বৃদ্ধ একজন মানুষ।

নিধিরাম সর্দার বলল, "ওহে ছেলে, ঐ যে আমাদের কর্তাবাবু। ওনার সামনে গিয়ে কিন্তু গড় কোরো। জেদ দেখিয়ে ঘাড় উঁচু করে থেকো না, তা হলে ঘাড়টি ভেঙে দেব। তুমি বামুন হতে পারো, কিন্তু আমাদের কর্তাবাবুও বামুন।"

বিশুঠাকুর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেলেন। জলে পড়ার সময় তিনি যে প্রবল ঢাকের শব্দ শুনেছিলেন, সেই রকমই আবার যেন শত শত ঢাক বেজে উঠল একসঙ্গে। বিশুঠাকুরের বুকের মধ্যেও যেন ঐ রকম একটা ঢাক বাজছে।

কয়েক পা এগোবার পরই হঠাৎ থেমে গেল ঢাকের শব্দ। তার ফলে অসম্ভব চুপচাপ হয়ে গেল চার দিক। বাতাসেরও যেন কোনো শব্দ নেই।

নিধিরাম যাকে কর্তাবাবু বলল, সেই লোকটির বয়েস সত্তরের কাছাকাছি হবে। খুবই শুকনো চেহারা। বয়েসের ভারে শরীরটা একটু বেঁকে গেছে। এই শীতের মধ্যেও তার গায়ে একটা ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের বেনিয়ানের মতন জামা, আর কোঁচানো ধুতি। বৃদ্ধটি এক হাতে কোঁচার খুঁট ধরে আছে, অন্য হাতে একটি ছড়ি। ছড়িটি সোনা-বাঁধানো।

বৃদ্ধটি ছড়ি তুলে বিশুঠাকুরকে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা বলা হল না।

এই সময় হঠাৎ চিকচিক চিকচিক শব্দ হল। আর কোথা থেকে উড়ে এল অসংখ্য ছোট ছোট কালো রঙের পাখি।

সেই পাখিদের আক্রমণে বৃদ্ধটি, নাদুস-নুদুসটি আর নিধিরাম সর্দার এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওরে বাবা রে, মা রে, ছেড়ে দে রে !"

এমনকী আলেয়া পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিশুঠাকুর মৃদু জ্যোৎস্নায় দেখলেন, সেখানে রাজপ্রাসাদ নেই, সেই লোকগুলি নেই, কিছু নেই, কেউ নেই। শুধু আছেন তিনি আর কয়েক-শো পাখি।

পাখিগুলো কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করল না। তাঁকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেল কয়েকবার। তারপর বিদ্যুৎ-গতিতে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই গিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সেই জলাভূমির মধ্যে হঠাৎ আবার সম্পূর্ণ একলা হয়ে যাওয়ায় তাঁর সারা শরীর কেঁপে উঠল। তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না, কোনো দিক ঠিক না করেই দৌড়োতে শুরু করলেন।

তিনি আর একবারও এদিকে তাকালেন না। যদিও সব সময়ই মনে হচ্ছে, তাঁর পেছনে কে যেন তাড়া করে আসছে। মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড ঢাকের শব্দ। তাতে আকাশ দুলে উঠছে, পায়ের তলার মাটিও দুলে উঠছে।

৬

গ্রামটির নাম মুকুন্দধাম। এখানে শুধু বৈষ্ণবরা থাকে। সকাল আর সন্ধ্যায় প্রত্যেক বাড়িতে নামগান হয়। সেই গানের সময় ছেলে-বুড়ো সবাই এক সঙ্গে দু'হাত তুলে নাচে।

এই গ্রামে বিষ্ণুচরণ দাস নামে এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন বিশুঠাকুর। এ-বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। সুন্দর আল্পনা দেওয়া সব মাটির দেওয়াল। বাড়ির দু'দিকে দুটো পুকুর, সেই পুকুরের জল কাকের চোখের মতন টলটলে। পুকুরের ধারে ধারে বাগান।

অতিথিদের এরা খুব খাতির করে। বিশুঠাকুরকে একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজেই রান্না করে খান। খুব চিকন আতপ চালের ফেনা ভাত আর ঘি। সেই সঙ্গে বাড়ির গোরুর দুধ, বাগানের কলা আর নিজস্ব খেজুরগাছের গুড়।

বিশুঠাকুর এই গ্রামে পৌঁছেছিলেন দারুণ ক্লান্ত আর রক্তাক্ত শরীর নিয়ে। জলার মধ্যে দৌড়োবার সময় তাঁর পা শামুক-ঝিনুকে কেটে গেছে। তাঁর মুখে নখ দিয়ে চেরা দাগ। তাঁর গায়ের চাদরটি গেছে, পুঁটলিটিও কখন কোথায় পড়ে গেছে তার ঠিক নেই। তিনি এখন নিঃসম্বল।

মুকুন্দধামে দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে ও ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করে তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এরপর যে তিনি কী করবেন, তা এখনো ঠিক করে উঠতে পারেননি।

এ-বাড়ির একটি ছেলে এর মধ্যেই বেশ ন্যাওটা হয়ে উঠেছে বিশুঠাকুরের। ছেলেটির নাম মনোহর, চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েস। সে সব সময় বিশুঠাকুরের কাছে এসে বসে থাকে।

তৃতীয় দিন সকালে বিশুঠাকুর মনোহরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম দেখতে বেরুলেন। গ্রামটি ছোট, মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস। সকলেই বেশ সুখে শান্তিতে আছে বলে মনে হয়। বিশুঠাকুরকে দেখে গ্রামের অনেক লোক "জয় গুরু' 'জয় গুরু' বলে অভিবাদন জানাতে লাগল। বিশুঠাকুর বৈষ্ণবদের বিষয়ে কিছু কিছু জানেন। তিনিও উত্তর দিতে লাগলেন, 'জয় গৌর! জয় নিত্যানন্দ!'

ক্রমশ গ্রামটি ছাড়িয়ে তাঁরা এসে পড়লেন বাইরের দিকে। এখানে একটা ছোট নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। তার ওপরে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলেন তিনি।

সেখানেও একটা গ্রাম ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু একটাও মানুষজনের চিহ্ন নেই। সমস্ত বাড়ি পোড়া-পোড়া। অনেক ঘরেরই ছাদ নেই, অনেক দেওয়াল ভেঙে পড়েছে, তাতে কালো কালো দাগ। মনে হয়, কোনো এক সময় বিধ্বংসী আগুনে সেই গ্রামটা একেবারে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

বিশুঠাকুর মনোহরকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঐ গ্রামের এই রকম অবস্থা হল কী করে? কবে হল?"

মনোহর বলল, "আমি তো আমার জন্মকাল থেকেই এরকম দেখছি। ওখানে আমরা কেউ যাই না।"

বিশুঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

মনোহর ভয় পেয়ে বলল, "চলো ঠাকুর, আমরা অন্য দিকে যাই। ও-গ্রামের দিকে তাকালেও ভয় করে। ও-গ্রামে যে-ই গেছে, সে-ই মুখে রক্ত তুলে মরেছে।"

"বটে? আমি যদি যাই, আমিও মুখে রক্ত তুলে মরব? একবার গিয়ে দেখি তো!"

"না, না, ঠাকুর। খবর্দার, ওরকম কথা চিন্তাও কোরো না। আমার নিজের ছোটমামা এই করতে গিয়ে মরেছে।"

মনোহর বিশুঠাকুরের হাত চেপে ধরল।

বিশুঠাকুর হেসে বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন যাব না। কিন্তু ঐ গ্রামটায় এ অবস্থা হল কী করে তা-ও তুমি জানো না?"

"জানব না কেন। মুকুন্দধামের সবাই জানে। সে আমার জন্মের আগেকার কথা। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি, একরাতে জমিদারের পেয়াদারা এসে ঐ গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়। পেয়াদারা গ্রামের চারপাশ ঘিরে রয়েছিল, একটা লোককেও বেরুতে দেয়নি। সবাই পুড়ে মরেছে। ঐ গ্রামটা ছিল অনেক বড়, আমাদের গ্রামের চেয়ে অনেক বড়।"

"জমিদারের লোক গোটা গ্রামের মানুষকে পুড়িয়ে মারল! কেন?"

"ও গ্রামের কে যেন জমিদারের মেয়েকে চুরি করে এনেছিল। অনেক চোর-ডাকাত থাকত কিনা ঐ গ্রামে!"

"এক গ্রামের সবাই তো আর চোর-ডাকাত হয় না। দু'এক জন হয়। সেই দু'এক জনের অপরাধে গোটা গ্রামের লোককে মরতে হল! এ যে বড় অন্যায় কথা।"

"অন্যায় বলে অন্যায়। জবর অন্যায়।"

"সেই জমিদারের লোকরা তোমাদের গ্রামে কোনো অত্যাচার করেনি?"

"না। আমরা তো বোষ্টম। আর সে জমিদারও ছিল বোষ্টম। আর নদীর ওপারের ঐ গাঁটা ছিল কৈবর্তদের।"

"বৈষ্ণব-জমিদার কৈবর্তদের গ্রাম পুড়িয়ে শত শত লোককে মেরে ফেলল? এ আবার কী রকম বৈষ্ণব? বৈষ্ণবদের তো সকলকেই ভালবাসার কথা।"

"আমার বাবা-কাকারাও সেই কথা বলেন।"

"সে জমিদার কোথায় থাকে? ইচ্ছে করছে, এখুনি একবার সেই জমিদারের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"সে জমিদার তার পাপের শাস্তি পেয়ে গেছে অনেক আগেই। তারা আর কেউ নেই, একেবারে নির্বংশ হয়ে গেছে। এই গাঁটা যেমন এক রাতে পুড়ে ছারখার হয়েছিল, সেইরকম সেই জমিদার-বাড়িতেও ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা এসে এক রাতে সবাইকে শেষ করে দিয়েছে।"

"ফিরিঙ্গি বোম্বেটে? এটা কবেকার কথা?"

"তা তো আমি বলতে পারব না। তুমি আমার পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞেস কোরো। আমার তো সবই শোনা কথা। সন্ধের পর আমাদের গ্রামে কেউ বাইরে বার হয় না। তবু যদি কেউ কখনও সন্ধের পর এখানে হঠাৎ চলে আসে, সে শুনতে পায় একটা মেয়ের কান্নার শব্দ। সেই যে মেয়েটিকে কৈবর্তরা চুরি করে এনেছিল, সে এখনো কাঁদছে। ঐ দিকে আরও অনেক দূরে যে একটা জলা আছে, সেখানেও নাকি কেউ কেউ সেই মেয়েটিকে কাঁদতে দেখেছে।"

"সেই জলাতে তুমি কখনও গেছ, মনোহর?"

"ওরে বাবা, আমার তো সেই জলার নাম শুনলেই ভয় করে! আমরা বোষ্টম, ভূত-প্রেত আমাদের সহ্য হয় না।"

বিশুঠাকুর মনোহরের কাঁধে হাত দিয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, "ওরকম সব সময় ভয় পেতে নেই। তা হলে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে বাঁচা যায় না। তুমি আমার সঙ্গে ঐ জলায় যাবে?"

ভয়ে মনোহরের মুখখানা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল। সে বলল, "ওরে বাবা, ওখানে কেউ সাধ করে যায়? ঠাকুর, তুমি নতুন লোক, তাই তুমি কিছু জানো না। ঐ জলায় আছে আলেয়া ও পেত্নি, তার দেখা পেলে আর কেউ বাঁচে না। যে-জমিদারের কথা বললাম, তাঁর নাম ছিল মহাপ্রাবৃট্ সেন। তাঁর ছিল দুই মেয়ে। এক মেয়েকে এই কৈবর্তরা ধরে নিয়ে এসেছিল, আর এক মেয়ে আলেয়া হয়ে যায়। সেই দু'জনকেই এখনো দেখা যায় ঐ জলায়।"

বিশুঠাকুর ভুরু কুঁচকে বললেন, "মহাপ্রাবৃট্ সেন ? এ নাম তো আমি শুনেছি। খুব দুঁদে জমিদার ছিলেন। তা তিনি তো মারা গেছেন অনেক কাল আগে।"

"বললাম তো, এসব আমার জন্মের আগেকার কথা।"

"শুধু তোমার জন্ম কেন, মনোহর, এ তো আমারও জন্মের আগের ব্যাপার। সেই অতকাল আগের এক জমিদার এই কৈবর্তদের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এখানে আর জনবসতি হয়নি ?"

"না।"

"আশ্চর্য, ভারী আশ্চর্য ব্যাপার ! এরকম কখনো শুনিনি।"

"চলো ঠাকুর, এখান থেকে যাই। তোমায় বরং গোঁসাইমহল দেখিয়ে আনি।"

"সেখানে কী আছে ?"

"সে এক বড় সুন্দর জঙ্গল। কতরকম ফুল ফোটে, ফল ফলে থাকে। সে জঙ্গলে হরিণ আছে। দু' চারটে বাঘও আসে মাঝে-মাঝে।"

"এদিকের জঙ্গলে বাঘ আসে ? সে বাঘ কখনো কখনো গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে না ?"

"তা পড়ে বইকী। তবে আমাদের কোনো ক্ষতি করে না। আমরা তো বোষ্টম, তাই আমরাও বাঘ মারি না, বাঘও আমাদের মারে না।"

বিশুঠাকুর হা হা করে জোরে হেসে উঠলেন। হাসি সামলাতে গিয়ে বিষম খেলেন দু'বার।

একটু পরে বললেন, "বৈষ্ণব বলে বাঘে খায় না। বাপ রে বাপ। এই দুনিয়ায় কত আজব জিনিসই আছে। বাঘ বোধহয় জেনে ফেলেছে যে, বৈষ্ণবদের মাংস নিরামিষ, তাই না ? তা হলে, মনোহর, বাঘ দেখে তোমরা ভয় পাও না ?"

"না। বাঘ দেখে আমরা ভয় পাই না।"

"তবে যে খানিক আগে বললে, এ গ্রামের কেউ সন্ধের পর বাড়ির বাইরে যায় না ? কেন যায় না ? কিসের ভয়ে ?"

"বাবু, রাত্তিরবেলা যে সেই ভুতুড়ে পাখিগুলো আসে ?"

"ভুতুড়ে পাখি ?"

"হ্যাঁ। কোথা থেকে যেন আসে ঝাঁক-ঝাঁক ছোট ছোট পাখি, কালো কুচকুচে রং। ঠিক চামচিকের মতন। কিন্তু চামচিকে নয়। সে পাখিগুলোকে মারা যায় না। মারতে গেলেই তাদের গা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়। আর সেই পাখিগুলো যদি কারুকে ছোঁয়, অমনি তার শরীরের সেইখানটায় ঘা হয়ে যায়। বড় সাংঘাতিক পাখি।"

বিশুঠাকুর ভুরু কুঁচকে বললেন, "সেই পাখি তা হলে এখানেও আসে ! তাদের দিনের বেলা কখনো দেখা যায় না ?"

"না। সেই জন্যই তো ওগুলোকে ভুতুড়ে পাখি বলে। ঠাকুর, তুমিও ঐ পাখিগুলো দেখেছ নাকি ?"

বিশুঠাকুর কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন।

সেদিন সন্ধের সময় মনোহরদের বাড়িতে যথারীতি গানের আসর বসল। প্রথমে একজন সুর করে পড়ে শোনাতে লাগলেন চৈতন্য-চরিতামৃত। বিশুঠাকুর বসে ছিলেন এক কোণে। এক সময় তিনি টুক্ করে উঠে পড়লেন। কারুকে কিছু না বলে চলে এলেন বাড়ির বাইরে।

জ্যোৎস্না-মাখা রাত, কিন্তু গ্রামের পথ একেবারে নির্জন। একটাও মানুষ নেই।

কাছেই সুন্দরবন। গুলবাঘ আর চিতাবাঘ তো যখন-তখন দেখা যায়। বড় বড় মানুষখেকো বাঘ, বুনো মোষ, এমনকী দু'একটা গণ্ডারও মাঝে মাঝে ছিটকে চলে আসে গ্রামের দিকে। এমনিতেই এসব দিকে গ্রামের লোকেরা রাত্তিরে পথ চলতে ভয় পায়। তা বলে কি এপাড়া ওপাড়ায় লোক যায় না ? বিশুঠাকুরের নিজের গ্রামেই তো লোকেরা মশাল জ্বালিয়ে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যায়।

কিন্তু এই গ্রামটি যেন রূপকথার সেই নিঝুম পুরী। সবাই দরজা জানলা এঁটে বসে আছে।

বিশুঠাকুর ভাবলেন, পাখিগুলো যদি ভুতুড়ে পাখিই হয়, তবে কি

তারা বাড়ির মধ্যেও ঢুকে পড়তে পারে না ? ঐটুকু-টুকু পাখি তো যে-কোনো জায়গাতেই যেতে পারে।

বিশুঠাকুর দু'বার ঐ পাখির ঝাঁক দেখেছেন। কিন্তু পাখিরা তাঁর কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। জলাভূমির রহস্যময় মানুষগুলো ঐ পাখিদের দেখে আর্তনাদ করেছিল প্রাণভয়ে। তা হলে নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে।

বিশুঠাকুর আপন মনে হাঁটতে লাগলেন গ্রামের রাস্তা দিয়ে। দু'তিনদিন বিশ্রাম নিয়ে শরীর আবার বেশ তাজা হয়ে উঠেছে। শরীরে জোর থাকলে তাঁর মনে কোনো ভয়-ডর থাকে না।

গ্রামের সমস্ত বাড়িরই জানলা-দরজা বন্ধ। অবশ্য শীতকাল এখন। কিন্তু এরা গ্রীষ্মকালে কী করে ? দু'একটা বাড়ি থেকেই মাত্র গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর সবাই এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়।

মস্ত বড় একটা গোল চাঁদ উঠেছে আকাশে। পূর্ণিমা বোধহয় কাছাকাছি। হাওয়া দিচ্ছে শিরশিরে। মনোহরের বাবা বিশুঠাকুরকে একটা মোটা কম্বল দিয়েছিলেন, সেটাই তিনি জড়িয়ে নিয়েছেন গায়ে, তবু যেন শীত মানছে না। এ বছর যেন শীতটা একটু বেশি।

হাঁটতে-হাঁটতে অনেক দূর চলে এলেন বিশুঠাকুর। কোথাও পাখি-টাখি কিচ্ছু নেই। একটা শান্ত নির্জন রাত। এই রকম রাতে বেড়াতে ভাল লাগে। আগে যখন বিশুঠাকুর শুধুই মন্দিরের পুজারি ছিলেন, সে সময়ও তিনি রাত্তিরবেলা একা একা ঘুরে বেড়াতেন।

এক সময় তিনি এসে পৌঁছোলেন সেই ছোট নদীটার পাশে। নদীটি ছোট হলেও বেশ স্রোত আছে। শোনা যাচ্ছে তার জলের শব্দ। রাত্তিরবেলা নদীর কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে বড় মধুর লাগে।

অন্য সব কিছু ভুলে সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি নদীর দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে গেলেন।

এরকম ভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ একটা শব্দে তিনি সচকিত হলেন। কুকুরের মতন কী যেন একটা জন্তু ছুটে গেল তাঁর পাশ দিয়ে। তিনি চমকে তাকিয়ে দেখলেন, সেটা কুকুর নয়, একটা

শেয়াল।

শেয়ালটাও বিশুঠাকুরকে দেখে একটু দূরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল তারপর অদ্ভুত সুর করে ডাকল, ফে-উ-উ !

সেই ডাক শুনে কেঁপে উঠলেন বিশুঠাকুর। এটা শেয়ালের স্বাভাবিক ডাক নয়। শেয়াল যখন এরকম ফেউ ডাকে তখন বুঝতে হবে যে, কাছাকাছি বাঘ আছে। সর্বনাশ !

হাতে কোনো অস্ত্র নেই, এমন-কী, একটা লাঠি পর্যন্ত নেই। খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করার কথা চিন্তাও করা যায় না। কেউ কেউ অবশ্য পারে, কিন্তু বিশুঠাকুর সে-রকম পালোয়ান নন।

এখন কী উপায় ? এদিকে কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর নেই। বাঘ যদি কাছাকাছি এসে থাকে, তা হলে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করা চরম নির্বুদ্ধিতা।

মনোহর বলেছিল, এ গ্রামের বৈষ্ণবদের বাঘে খায় না। কিন্তু বিশুঠাকুর তো বৈষ্ণব নন, বাঘ কি তাঁকে ছেড়ে দেবে ? বাঘের ওপর এতখানি বিশ্বাস রাখতে পারবেন না তিনি।

সুন্দরবনের বাঘ অতি ধূর্ত। মানুষ দেখলে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না। অতি নিঃশব্দে হাঁটে। খুব কাছে এসে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একটু দূরেই আর একবার ফেউ ডাকতেই তিনি আর দ্বিধা করলেন না। গায়ের কম্বলটা খুলে ফেলেই তিনি লাফ দিলেন নদীর জলে

প্রায় পরের মুহূর্তেই তাঁর ছেড়ে যাওয়া কম্বলের ওপর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল একটা চিতাবাঘ।

নদীর জল অসম্ভব ঠাণ্ডা। বাঘও বোধহয় সেই ঠাণ্ডা জলকে ভয় পায়, তাই সে আর নদীতে নামল না। বিশুঠাকুর ডুবসাঁতার দিয়ে উঠলেন অনেকটা দূরে। মাথা ঘুরিয়ে একবার চিতাবাঘটাকে দেখেই আবার দিলেন ডুব।

মুখের সামনে থেকে এমন একটা শিকার ফশকে যাওয়ায় বাঘটা এবার একটা রাগের হুংকার দিল।

ডুবসাঁতার দিতে দিতেই বিশুঠাকুর পৌঁছে গেলেন নদীর অন্য পারে। এখানেই সেই কৈবর্তদের পুড়ে যাওয়া গ্রাম।

শীতে বিশুঠাকুর ঠকঠক করে কাঁপছেন। এখন কোথাও একটু আগুন পেলে তিনি শরীরটাকে সেঁকে নিতে পারতেন। কিন্তু এ গ্রামে তো জন-মানুষ নেই।

বাঘেরা বেশ ভালই সাঁতার জানে। চিতাবাঘটা যদি নদী পার হয়ে তাড়া করে আসে। এই ভেবে বিশুঠাকুর ছুটতে লাগলেন। ছুটলে তবু একটু গা গরম হয়। পুড়ে যাওয়া বাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে দৌড়োতে লাগলেন তিনি, বেশ কয়েকবার হোঁচট খেলেন। এতবড় গ্রামটায় মানুষ তো নেই-ই, কোনো জন্তু-জানোয়ারই নেই, কোনো প্রাণের চিহ্নই নেই।

বেশ খানিকটা যাবার পর বিশুঠাকুর থামলেন। মুকুন্দধাম গ্রাম থেকে তিনি অনেক দূরে চলে এসেছেন। এবারে তিনি বুঝলেন, সন্ধে হতে না হতেই কেন ঐ গ্রামের সবাই দরজা জানলা বন্ধ করে থাকে ভুতুড়ে পাখির ভয়টা আসল নয়, আসল হল বাঘের উপদ্রব। বৈষ্ণবরা বাঘ না মারতে পারে, বাঘেরা কিন্তু বৈষ্ণবদের দেখলেও ছাড়বে না

বিশুঠাকুর এখুনি আর ওদিকে ফিরতে চাইলেন না। বাঘের মুখে প্রাণ দেবার ইচ্ছে তাঁর নেই।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, অনেক দূরে, মাঠের মধ্যে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। ওখানে কিসের আগুন ? আগুন যখন আছে তখন মানুষও আছে নিশ্চয়ই।

তিনি এগোতে লাগলেন সেদিকে। কিছুদূর যাবার পর তাঁর মনে হল, সেই আগুন ঘিরে তিন-চার জন লোক বসে আছে। বিশুঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন।

রাত্তিরবেলা মাঠে বসে যারা আগুন পোহায়, তারা তো সাধারণ লোক হতে পারে না ! এমনিতে কে এখন বাড়ির বাইরে থাকবে ? ডাকাত বা ঠ্যাঙাড়ে হওয়াই সম্ভব।

বিশুঠাকুর আবার ভাবলেন, এমনও হতে পারে, ওটা একটা শ্মশান। ওখানে লোকেরা মড়া পোড়াতে এসেছে।

যাই হোক, ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য বিশুঠাকুর এগোলেন

সেদিকে। এদিকে আর বাড়িঘর নেই। শ্মশান থাকে নদীর ধারে, তা হলে কি ওদিকে আর একটা নদী আছে?

অনেকটা এগিয়ে যাবার পর তিনি আগুনটা আর দেখতে পেলেন না। অথচ আগুন লক্ষ করেই তিনি এগোচ্ছিলেন। তা হলে কি মাঝখানে গাছটাছ কিছু পড়ল?

সত্যিই সামনে একটা বেশ বড় ঝাঁকড়া গাছ। আর একটু হলেই বিশুঠাকুর সেই গাছে ধাক্কা খেতেন।

গাছটা পেরিয়ে যাবার পর তিনি আগুনটা আবার দেখতে পেলেন। এবারে যেন আগুনটা অনেক দূরে সরে গেছে। তবে সেই একই রকম আগুন, সেই তিন-চারজন লোক আগুন ঘিরে বসে আছে।

তবে কি তাঁর চোখের ভুল হয়েছিল? অবশ্য ফাঁকা মাঠের মধ্যে দূরত্ব ঠিক বোঝা যায় না। যাই হোক না কেন, ঐ আগুনের কাছে পৌঁছোবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আবার তাঁর খুব শীত করছে। ধুতিটা জবজবে ভিজে। আগুনের কাছে গেলে সেঁকে শুকিয়ে নিতে পারবেন।

এবারে সেই আগুন ও মানুষগুলো ক্রমশ বড় হতে লাগল। বেশ কাছাকাছি পৌঁছোবার পর সেই আগুনের রং হয়ে গেল ধপধপে সাদা।

বিশুঠাকুর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ও তো আগুন নয়, আলেয়া। নিয়তি! নিয়তিই তাঁকে টেনে এনেছে এখানে। নিয়তি কি বাঘের ছদ্মবেশে তাঁকে তাড়া করেছিল, যেজন্য তিনি নদীতে ঝাঁপ দিলেন? নইলে আজ রাতে তো তাঁর এদিকে আসার কোনো কথা ছিল না।

এখনো ফিরে যাওয়া যায়। তিনি দাঁড়িয়ে একটু দোনোমনা করছিলেন, এমন সময় যেন মাটি ফুঁড়ে একটা লোক উঠে এল। রোগা লিকলিকে চেহারা আর মস্ত বড় গোঁফ। দেখেই চিনলেন, এ সেই নিধিরাম সর্দার।

নিধিরাম চোখ ঘুরিয়ে বলল, "চলো হে! ঐ দিকে।"

বিশুঠাকুর বুঝলেন, এর হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আগের দিনই তিনি এই রোগা প্যাংলা লোকটির শক্তির পরিচয় পেয়েছেন।

তিনি এগিয়ে গেলেন আলেয়ার দিকে। সেখানে বসে আছে আগের দিনের সেই নাদুসনুদুস মানুষটি, তারও আগের দিন দেখা সেই ঘোড়ার গাড়ির মালিক আর তার পাথরের মূর্তির মতন সহিস।

সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে বিশুঠাকুরকে দেখল।

নিধিরাম সর্দার বলল, "এই যে ছোটকর্তা, নিয়ে এসিছি।"

নাদুসনুদুস লোকটি বলল, "এই যে বিশুঠাকুর, এসে গেছ? চলো।"

বিশুঠাকুর বললেন, "কোথায়?"

লোকটি বলল, "এখনো তোমার প্রশ্ন করার অভ্যেস গেল না? বলেছি না, আমরা উত্তর দিই না?"

বিশুঠাকুর বললেন, "কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে প্রশ্ন টগবগ করছে। আপনারা কি আমার অপেক্ষাতেই বসে আছেন? কী করে জানলেন যে, আজ আমি এখানে আসব?"

লোকটি একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসল। তারপর বলল, "দু'চার ঘা খেলেই ওসব প্রশ্ন ঘুচে যায়। নিধিরামকে বলব নাকি একটু দলাই-মলাই করে দিতে?"

বিশুঠাকুর বললেন, "থাক। তার আর দরকার নেই। চলুন কোথায় যেতে হবে!"

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে অন্যদের দিকে চেয়ে বলল, "আলেয়া আর তোমরা এখানে থাকো। পাখিগুলোকে সামলাও। আমরা একে নিয়ে যাচ্ছি। ধর রে নিধিরাম, ওর হাত ধর।"

নিধিরাম বিশুঠাকুরের হাত ধরেই ঝড়ের বেগে ছুটতে লাগল। প্রায় যেন উড়ে চলেছে। বিশুঠাকুর দু'তিনবার মাটিতে পড়ে গিয়ে ছেঁচড়াতে লাগলেন, নিধিরাম তবু তাঁর হাত ছাড়ল না।

৭

অনেকক্ষণ দৌড়োবার পর এক জায়গায় এসে থামল নিধিরাম। বিশুঠাকুর তাকিয়ে দেখলেন, সামনেই একটা বাড়ির অংশ। কোনো জমিদারের বাড়ি বলেই মনে হয়। কিন্তু শুধু একটা ঘর দেখা যাচ্ছে, বাকি অংশ অন্ধকারে ঢাকা। আকাশে এখনো ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, তবু এই অন্ধকার কোথা থেকে এল কে জানে!

নিধিরাম সর্দার বিশুঠাকুরের কানে কানে ফিসফিস করে বলল, "ভেতরে বড়কত্তা বসে আছেন, তাঁকে যেন পেন্নাম করতে ভুলে যেও না!"

নাদুসনুদুস লোকটিও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পৌঁছে গেল। তারপর দু'জনে দু'পাশ থেকে বিশুঠাকুরকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে।

সেখানে একটা সিংহাসনে বসে আছে একজন ছোট্টখাট্টো মানুষ। খুবই বুড়ো। পরনে একটা গরদের ধুতি আর পাতলা সিল্কের চাদর। মাথার চুল ধপধপে সাদা, কিন্তু চোখদুটি দারুণ উজ্জ্বল। হাতে একটা সোনা-বাঁধানো লাঠি।

বৃদ্ধটি বিশুঠাকুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে লাগলেন। বিশুঠাকুরও দেখতে লাগলেন ওঁকে।

ঠিক যেমন লোকে গাছের ডাল নোয়ায় সেই রকম ভাবেই নিধিরাম সর্দার বিশুঠাকুরের ঘাড়টা ধরে নিয়ে এল সেই বৃদ্ধটির পায়ের কাছে। সে এমনই বজ্র আঁটুনি যে, বিশুঠাকুর কোনো রকম বাধাই দিতে পারলেন না।

আবার মাথা উঁচু করে বিশুঠাকুর সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে?"

বৃদ্ধটি অবাক হয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী হে, এ যে প্রশ্ন করে! একে শিখিয়ে-পড়িয়ে আনোনি? এ ছোকরা পারবে?"

নাদুসনুদুস বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, পারবে। ছোকরার এলেম আছে। সহিস ওকে তুলে আছাড় মেরেছে, নিধিরাম ওকে জলে ছুঁড়ে ফেলেছে, তাও ও জ্ঞান হারায়নি। ভয়ও পায়নি। তবে ওর ঐ এক দোষ, বড় প্রশ্ন করে।"

বৃদ্ধ বললেন, "তবু আমি তো একটু পরীক্ষা না করে সন্তুষ্ট হতে পারি না। দেখে তো বামুন বলে মনে হচ্ছে। শাক্ত না বৈষ্ণব?"

বিশুঠাকুর বললেন, "আমি শিবের পূজা করি।"

"শৈব! ঠিক আছে, তাতে চলবে। লেখাপড়া শিখেছ কিছু? বলো দেখি মহাপ্রাবৃট্ মানে কী?"

"প্রাবৃট্ মানে বর্ষা। কথাটা এসেছে বৃষ্ থেকে।"

"মানুষের কখন তিনটে মাথা হয়?"

"মানুষ যখন আপনার মতন বুড়ো হয়। আপনিই তা হলে জমিদার মহাপ্রাবৃট্ সেন? কিন্তু আপনি তো মারা গেছেন অনেক দিন আগে।"

"এটা বোঝার জন্য বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। এবার তোমার একটু শক্তি পরীক্ষা করার দরকার। নিধিরাম, এর পা দুটো ধরে উল্টো করে ঝোলা, মাথাটা নীচে থাকবে। দেখি কতক্ষণ সেরকম থাকতে পারে।"

নাদুসনুদুস লোকটিকে তিনি বললেন, "তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া। দ্যাখ, কৈবর্তগুলো এসে পড়ে কি না।"

সেই লোকটি বলল, "আলেয়ার কাছে অন্য দু'জনকে রেখে এসেছি। কৈবর্ত পাখিগুলো এলে ওদের দিকেই যা[illegible]।"

"তবু তুই দ্যাখ। ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। জ্বালি[illegible]য় মারল!"

এর মধ্যে নিধিরাম বিশুঠাকুরের পা দুটি ধরে উল্টো করে ঝুলিয়ে ফেলেছে। বিশুঠাকুরের মুখখানা লাল হয়ে গেছে রাগে অপমানে। কিন্তু কিছুই করবার নেই।

জমিদার মহাপ্রাবৃট্ সেন জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বাড়িতে কে আছে? বিয়ে-থা করেছ? কারণ তোমায় যে কাজে পাঠাব, সেখান থেকে বেঁচে না-ও ফিরতে পারো।"

বিশুঠাকুর বললেন, "শুধু আপনিই প্রশ্ন করবেন, আমি প্রশ্ন করতে পারব না? তা হলে আমি আর কোনো উত্তরও দেব না।"

"আমাদের বংশে কেউ কখনো অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। তবে ঐ নিধিরাম তো ছোটলোক, ওকে যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারো। কিন্তু সময় বেশি নেই। এই রকম ঝুলে থাকা অবস্থায় যা জানবার জেনে নাও!"

বিশুঠাকুর প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, "কৈবর্ত-পাখি মানে কী? ঐ পাখিগুলোকে তোমরা ভয় পাও কেন?"

নিধিরাম বলল, "এ তল্লাটে একটা কৈবর্তদের গ্রাম ছিল। এক ব্যাটা কৈবর্ত আমাদের মেজকর্তার এক মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যায়। তাকে মেরেই ফেলেছিল। সেই রাগে বড়কর্তা সেই গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে সব ব্যাটা কৈবর্তকে পুড়িয়ে মেরেছেন।"

"একজন কে মেয়ে চুরি করেছিল, সেই দোষে অতগুলো লোককে পুড়িয়ে মারা হল?"

বড়কর্তা বললেন, "বেশ করেছি! ও সব বাজে কথা বন্ধ রেখে কাজের কথা কিছু থাকে তো বলো!"

"সেই কৈবর্তরা সব এখন পাখি হয়েছে? আপনারা তাদের ভয় পান?"

নিধিরাম বলল, "বড়কর্তাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। যা বলবার আমায় বলো। হ্যাঁ, সেই কৈবর্তগুলো এখন পাখি হয়েছে। ওদের জ্বালায় আমরা বেশিক্ষণ চেহারা ধরে থাকতে পারি না। আমরা চেহারা ধরলেই ওরা তেড়ে আসে। ওদের ছোঁয়া লাগলেই আমাদের সারা গা জ্বলে যায়, ঠিক যেন বিছুটি লাগার মতন, তখন আর আমরা থাকতে পারি না।"

"বেশ হয়েছে, তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।"

"মাটিতে মাথাটা ঠুকে দেব? ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে!"

"এবার বলো, আমায় তোমরা এত কষ্ট দিচ্ছ কেন? এতে তোমাদের কী লাভ? আমি তো তোমাদের ক্ষতি করিনি কোনো! ঐ জলাভূমিতে রাত্তিরের দিকে কেউ এলে তাদেরই বা তোমরা মেরে ফেলো কেন?"

"আমরা কারুকে মারি না। ভয়েই সব মরে যায়, কিংবা পাগল হয়ে যায়। আমরা শুধু কার কতটা সাহস তাই একটু বাজিয়ে দেখি!"

বড়কর্তা বললেন, "এবারে নামিয়ে দে। এ ছেলেটার শক্তি আছে, তা স্বীকার করতেই হবে। এতক্ষণ ঝুলে রইল, তবু কান্নাকাটি করল না। এর নামডাক যা শুনেছি, তা দেখছি ঠিকই।"

নিধিরাম বিশুঠাকুরকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিল। বিশুঠাকুর মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন, নিধিরামই আবার ধরে ফেলল তাঁকে।

বড়কর্তা বললেন, "বোসো। মাটিতে বোসো। তোমায় আমি এখন কাজের কথা বলি। মাঝখানে কিন্তু কোনো বাধা দেবে না! শুধু শুনে যাও। তোমার নাম বিশুঠাকুর। তুমি পর্তুগিজ বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়েছ, তাও জানি। তোমাকে আমাদের দরকার। বহুদিন ধরেই আমরা একজন জ্যান্ত মানুষ খুঁজছি। তাকে দিয়ে একটা কাজ করাব। কিন্তু আজ অবধি একটাও মানুষ পাইনি। যার সঙ্গেই কথা বলতে যাই, সেই আমাদের দেখে ভয়ে ভিরকুট্টি যায়। হয় জ্ঞান হারায়, নয় মরে, নয় পাগল হয়ে যায়। এই হয়েছে দেশের অবস্থা! যাই হোক, শেষ পর্যন্ত তোমায় পাওয়া গেল। এখন—"

বিশুঠাকুর বললেন, "কিন্তু আমি যে এখানে আসব, তা জানলেন কী করে?"

বড়কর্তা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আবার প্রশ্ন! ওঃ, নিধিরাম, জবাব দে!"

নিধিরাম বলল, "তোমার ওপর আমাদের নজর ছিল। তুমি সে-ই একদিন হাট থেকে ফিরছিলে, তোমায় সেদিন আলেয়া দেখানো হল, যারা একবার আলেয়া দেখে, তারা ঠিক ফিরে আসে। তুমি যদি না আসতে, তা হলে তোমাকে সেই শিবমন্দির থেকেই ধরে আনা হত।"

বড়কর্তা বললেন, "এবারে শোনো। একেবারে মুখ বুঁজে থাকবে। যে-কোনো সময়ে কৈবর্তরা এসে পড়তে পারে। তাই সংক্ষেপে সারি। আমাদের মস্ত বড় জমিদারি ছিল। লোকে আমায় রাজা বলত। পর্তুগিজ বোম্বেটেরা আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। আমার বংশ নাশ করে দিয়েছে!"

মনে হল যেন দুঃখে বড়কর্তার গলাটা ধরে এল। তিনি মাথা হেলান দিলেন সিংহাসনে। বিশুঠাকুর দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন যে, বড়কর্তার চোখ দিয়ে জলের বদলে বেরুচ্ছে একটু একটু ধোঁয়া।

আবার সোজা হয়ে তিনি তেজের সঙ্গে বললেন, "তা বলে ভেবো না, আমাদের শক্তি ছিল না, আমরা লড়াই করতে জানতুম না! এই যে নিধিরাম, ও ঢাল-তরোয়াল ছাড়াই খালি হাতে একশো-দুশো লোকের সামাল দিতে পারত। কিন্তু বোম্বেটেরা নিয়ে এসেছিল বন্দুক আর

কামান। আগুন নিয়ে লড়াই করতে আমরা এখনো শিখিনি। ফিরিঙ্গিরা ঐ আগুনের জোরেই জিতে যায়। যাই হোক, তোমায় কী করতে হবে, বলি। ঐ বোম্বেটেরা আমার একমাত্র ছেলেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি তাকে উদ্ধার করে আনার।"

বিশুঠাকুর বলে উঠলেন, "সে কী! এ সব তো বহুকাল আগেকার কথা। আপনার ছেলেকে আমি এখন উদ্ধার করে আনব মানে? সে কি আজো বেঁচে আছে?"

বড়কর্তা হাঁক দিলেন, "নিধিরাম!"

নিধিরাম বলল, "আরে সে বেঁচে থাকলে তো কোনো মামলাই ছিল না। তাকে তো ফিরিঙ্গিরা মেরে ফেলেছে, তা ধরো গে, অন্তত পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু ফিরিঙ্গিরা তাকে মেরে পুঁতে রেখেছে মাটির তলায়। আমরা হিন্দু, আমাদের দেহ না পোড়ালে আত্মার মুক্তি হয় না। তাই সে বেরুতে পারেনি। আমাদের সঙ্গে তার দেখা হয় না। আহা রে, মাটির তলায় আমাদের সোনামণির আত্মাটা ছটফট করতেছে রে!"

বড়কর্তা আবার বললেন, "গঙ্গার ধারে ফিরিঙ্গিদের একটা গড় আছে। সেই গড়ের মধ্যে এক জায়গায় মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে আমার বাপধনকে। তোমাকে সেই গড়ের মধ্যে আমরা পৌঁছে দেব। তুমি মাটি খুঁড়ে হাড়গোড়গুলো তুলে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। তা হলেই তোমার কাজ শেষ। তখন আমরা আবার বাপধনকে ফিরে পাব, সে আমাদের সাথে সাথে থাকবে!"

বিশুঠাকুর নিধিরামের দিকে ফিরে বললেন, "তা এ-কাজ তোমরা নিজেরাই করছ না কেন? তোমাদের তো কত সুবিধে, যখন-তখন অদৃশ্য হতে পারো।"

নিধিরাম বলল, "তুমি বামুনঠাকুর হয়ে এই কথা বললে? এই তোমার বুদ্ধি? অদৃশ্য হলে কি মাটি খোঁড়া যায়? তার জন্য চেহারা ধরতে হয়!"

"তবে চেহারা ধরে সেখানে গেলেই পারো! তাতেই বা ক্ষতি কী? তোমরা তো একবার মরে গেছ, দ্বিতীয়বার তো কেউ আর তোমাদের মারতে পারবে না? নাকি সেখানেও কৈবর্ত-পাখিরা তোমাদের তাড়া করে যায়?"

"ফিরিঙ্গিদের কাছে আমাদের জারিজুরি খাটে না। ওরা তোমাদের মতন আমাদের ভয় পায় না। আমাদের দেখলেই আগুন ছুঁড়ে মারে। আমরা আগুন একেবারে সহ্য করতে পারি না। ভূত-প্রেত-শাঁকচুন্নি-মামদো- কেরেস্তানি-ব্রহ্মদৈত্য আর আমাদের মতন অসুখী আত্মা, আগুন হল আমাদের যম। শুধু আগুন কেন, জোরালো আলো পড়লেই ঝুরঝুর করে আমাদের চেহারা ভেঙে পড়ে। তোমার জ্যান্ত জাতভাইরা, যারা আমাদের দেখে ভয় পায়, তাদের এটা জানিয়ে দিতে পারো। ফিরিঙ্গিরা এটা ভাল করেই জানে।"

হঠাৎ বড়কর্তার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল আর আবার ধোঁয়া বেরুতে লাগল চোখ দিয়ে।

তিনি অতি কষ্টে বললেন, "আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, আর চেহারা ধরে থাকতে পারছি না। ওরে নিধিরাম, তুই তা হলে এই ছোকরাকে ফিরিঙ্গিগড়ে পৌঁছে দিয়ে আয়!"

বিশুঠাকুর বললেন, "দাঁড়ান দাঁড়ান! অত সহজ নাকি! ফিরিঙ্গিদের গড়ে আমি একলা ঢুকলে ওরা তো আমায় মেরে ফেলবে। আমি মানুষ, আমায় মেরে ফেলা সহজ। আপনাদের এ কাজ করতে আমি রাজি হব কেন?"

বড়কর্তা বললেন, "ওরে নিধি, বুঝিয়ে দে।"

নিধিরাম বলল, "তুমি রাজি না হলে তো তোমায় আমরা এখানেই জলে চুবিয়ে মেরে ফেলব। সুতরাং তুমি ফিরে যেতে তো পারছ না! তবু বরং ফিরিঙ্গিগড়ে গেলে নিজের বুদ্ধিতে আর চেষ্টায় তুমি বেঁচে যেতে পারো। অবশ্য কাজ হাসিল না হলে আমরা তোমায় আবার পাঠাব। পঁচিশ বছর ধরে খুঁজে খুঁজে আমরা একটাও সেরকম তেজী লোক পাইনি। এতদিন পর তোমায় পেয়েছি, আর কি ছেড়ে দেব! সুতরাং কাজটা চুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করাই তোমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।"

বিশুঠাকুর বললেন, "আমাকে প্রাণের ভয় দেখিও না। সবাইকে মরতে হবে, আজ না হয় আর একদিন। তা বলে মরার ভয়ে আমি অন্যায় কাজ করতে যাব কেন? তোমরা যখন বেঁচে ছিলে, তখন নিরীহ কৈবর্তদের পুড়িয়ে মেরেছ। আরও যে কত প্রজার সর্বনাশ করেছ তা কে জানে? এখনো তোমরা মানুষদের ওপর অত্যাচার করো, তাদের ভয় দেখাও, মেরে ফেলো। তোমাদের দ্বারা কারুর কোনো উপকার হয় না, তা হলে আমি তোমাদের উপকার করব কেন? থাক তোমাদের জমিদারের ছেলে মাটির তলায় পোঁতা! আমি তুলব না তাকে! আমাকে এবার মারো ধরো যা খুশি করো।"

বড়কর্তার সারা গা থেকেই ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখন। হাত দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি অতি কষ্টে বললেন, "আর চেহারা ধরে রাখতে পারছি না। বয়েস হয়েছে তো অনেক। ঐ নিধিটিধি ওরা এখনো অনেকক্ষণ পারে! তুমি তোমার কাজের বিনিময়ে কী চাও। গুপ্তধন চাও?"

বিশুঠাকুর বললেন, "আমায় লোভ দেখাচ্ছেন? দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, আমি টাকাপয়সার তোয়াক্কা করি না। আমার শুধু একটি জিনিস চাই। আমি এরপর যা প্রশ্ন করব, তার সরাসরি উত্তর দিতে হবে আপনাকে।"

নিধিরাম বিশুঠাকুরের ঘাড় ধরে বলে উঠল "তবে রে বেল্লিক! তোর এত বড় আস্পর্ধা! বড়কর্তাকে প্রশ্ন করবি? তোর আমি ঘাড় ভাঙব!"

বড়কর্তা বললেন, "ছাড়, ছাড়, ওরে নিধি, ছেড়ে দে! এ ছোকরার এত সাহস, তবে বোধ হচ্ছে একে দিয়ে কাজ হবে। যদি সত্যিই আমার বাপধনকে ফিরে পাই তার জন্য আজ আমি বংশের নিয়ম ভাঙব। কী জিজ্ঞেস করবে, চটপট বলো।"

"আপনি সত্যিই জমিদার মহাপ্রাকৃৎ সেন?"

"হ্যাঁ। সত্যি। ছিলাম। তাই ছিলাম।"

"আমি যদি আপনার ছেলের হাড়গোড় ফিরিঙ্গিগড় থেকে তুলে আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারি, তা হলে আপনি আর আপনার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোনোদিন মানুষের ক্ষতি করবেন না বলুন? কারুকে ভয় দেখাবেন না। রাত্তিরবেলা কারুর সামনে হাজিরও হতে পারবেন না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কথা দিলাম। যদি আমার বাপধনকে মুক্তি দিতে পারো, তবে তাকে নিয়ে আমরা সকলে প্রেতলোকে চলে যাব। আর কখনো চেহারা ধরে এখানে ফিরে আসব না। মানুষ আর কোনোদিন আমাদের দেখা পাবে না। আমাদের দ্বারা আর কারুর কোনো ক্ষতি হবে না।"

"ঠিক?"

"ঠিক, ঠিক, ঠিক। এই তিন সত্যি করলুম।"

"তা হলে আমি রাজি!"

"তোমার জয় হোক! নির্বিঘ্নে কাজ উদ্ধার করে ..."

"বড়কর্তা আর বাকি কথাটা বলতে পারলেন না। তাঁর শরীরটা কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। তারপর ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বিশুঠাকুরের চোখের সামনেই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেলেন।

৮

বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের আমলে সুবে বাংলায় মোগল-শাসন খুবই ঢিলে হয়ে পড়ে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজরা এসে ভিড় করেছে এখানে, মধুর লোভে মৌমাছির মতন। এদের কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের ছুতো করে দেশটাকে লুটেপুটে নিচ্ছে, কেউ কেউ করছে সোজাসুজি ডাকাতি। এদের আছে কামান বন্দুক আর বড় বড় জাহাজ, তাই এদের সঙ্গে স্থানীয় জমিদাররা পেরে ওঠে না। সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই।

এদের সাহস এমনই বেড়ে গেছে যে, এরা গঙ্গার ধারে ধারে কয়েকটা দুর্গও বানিয়ে ফেলেছে। লুঠ করা জিনিসপত্র এখানে রাখে। এখান থেকে ক্রীতদাসদের চালান দেয়। হঠাৎ কোনো মুঘল সুবেদার এদিকে এসে পড়লে দুর্গ থেকে কামান দেগে তাদের শেষ করে দেয়।

বাদশাহ ঔরঙ্গজেব সেই জন্যই তাঁর সেনাপতি শায়েস্তা খানকে শেষ পর্যন্ত পাঠিয়েছেন বাংলায়। শায়েস্তা খান এসে অবস্থা খানিকটা

সামলেছেন বটে। পর্তুগিজ দস্যুদের প্রধান সর্দার সিবাস্টিয়ান গঞ্জালভেস টিবাও তাঁর কাছে ধরা পড়ায় তিনি ভেবেছেন যে, জলদস্যুরা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর কেউ উৎপাত করবার সাহস পাবে না।

শায়েস্তা খান এখন বসে আছেন ঢাকায়। তিনি এখন বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করবার ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

এদিকে জলদস্যুরা সবাই ধরাও পড়েনি, পালিয়েও যায়নি। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালভেস টিবাও ধরা পড়ার ফলে তারা একটু ভয় পেয়েছে বটে, কিন্তু তারা এ-কথাও জানে যে, মুঘল সেনাপতি শায়েস্তা খান এখানে বেশিদিন থাকবেন না। বড় বড় সেনাপতিরা কেউ রাজধানী থেকে বেশিদিন দূরে থাকে না, থাকলেই তাদের ক্ষমতা চলে যায়। বিদেশী দস্যুরা জানে, শায়েস্তা খান তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে গেলেই তাদের সুদিন আবার আসবে। সেই জন্য এখন তারা নানান কোণে-ঘুপচিতে লুকিয়ে আছে। কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছে দুর্গে।

গঙ্গার ধারে এইরকমই একটা দুর্গ এখনো বেশ আস্ত অবস্থায় টিকে আছে। শায়েস্তা খান আসছেন এই খবর পেয়েই দুর্গটিকে রাতারাতি গির্জা বানিয়ে ফেলা হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে অস্ত্রশস্ত্র সবই লুকনো আছে।

দুর্গটি অবশ্য পর্তুগিজদের নয়, ওলন্দাজদের। তবে পর্তুগিজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের মোটামুটি ভাব আছে। অনেক সময় ক্রীতদাস বা লুটের মাল ওরা ভাগাভাগি করে নেয়।

এই দুর্গেই খুব গোপনে এসে লুকিয়ে আছে গঞ্জালভেসের ভাই আন্তনিও দে রেগো। আন্তনিও তার দাদার চেয়ে কম নিষ্ঠুর নয়, কিন্তু তার দলটি ছোট। আরাকানের রাজার ভাই আনাপুরমকে খুন করে আন্তনিও চট্টগ্রামের দিকে যেতে গিয়ে তার দলবল সমেত আর একটু হলেই ধরা পড়ে যাচ্ছিল শায়েস্তা খানের সৈন্যবাহিনীর হাতে। গঞ্জালভেসকে ধরার পর মুঘল সৈন্যরা যখন উৎসব করছিল, সেই সুযোগে আন্তনিও তার কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী সমেত পালিয়ে আসে হুগলির দিকে। দিনেমার বন্ধুরা তাকে আশ্রয় দিয়েছে এই দুর্গে।

এখানে সে ধর্মযাজকের পোশাক পরে ছদ্মবেশে থাকে।

এই দুর্গের ভেতরকার আমবাগানেই মাঝরাত্তিরে বিশুঠাকুরকে নামিয়ে দিয়ে গেল নিধিরাম।

বিশুঠাকুর একেবারে নিঃসাড়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন একটা আমগাছের ওপরে।

যে গঞ্জালভেসকে তিনিই ধরিয়ে দিয়েছেন শায়েস্তা খানের হাতে, তারই ভাই আন্তনিও যে এখানে লুকিয়ে আছে, তা তিনি জানেন না। আন্তনিও বিশুঠাকুরকে চেনে। একবার যদি দেখতে পায় তা হলে আর রক্ষে নেই।

ভারতবর্ষের লোকেরা বেশি রাত জাগে না। কিন্তু পর্তুগিজ-ওলন্দাজরা সকালে অনেকক্ষণ ঘুমোয় আর সারারাত ধরে ওদের ফুর্তি চলে। তা ছাড়া এখন দিনের বেলা ওরা গির্জার সাধু সেজে থাকে বলে রাত্তিরেই চলে হৈ-হল্লা। দুর্গের মাঝখানের চত্বরে রয়েছে অনেক তাঁবু আর ছোট ছোট খড়ের ঘর। বিশুঠাকুর দেখলেন, সেই সব তাঁবু ও ঘরের মধ্যে এখনো লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি ও গান করছে। ঘর বা তাঁবুগুলোর সামনে জ্বলছে একটা করে মশাল।

এরা কোনো সময়েই এদের দুর্গ অরক্ষিত রাখে না। অন্যরা আনন্দ-ফুর্তি করলেও দু'জন সৈন্য চত্বরের দু'পাশ দিয়ে অনবরত হেঁটে চলেছে। একজন একদিকে যাচ্ছে, আর একজন অন্যদিকে।

বিশুঠাকুর অনেকক্ষণ ধরে এসব লক্ষ করলেন। তিনি যেন মনে মনে একটু হতাশ হয়ে পড়েছেন। এখান থেকে কিছু উদ্ধার করা তো দূরের কথা, একটা মাছি গলে যাবারও উপায় নেই মনে হয়। তিনি বাঘের মুখ থেকে বেঁচেছেন, ভূতদের কাছ থেকে বেঁচেছেন, কিন্তু এবার এই দস্যুদের কাছ থেকে নিস্তার পাবার আর বোধহয় কোনো পথ নেই। তবু শেষ চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে।

প্রায় শেষ রাত্তির পর্যন্ত বিশুঠাকুর বসে রইলেন সেই গাছের ওপরেই। আস্তে আস্তে গান-বাজনা ও উৎসবের হৈ-চৈ কমতে কমতে একসময় থেমে গেল। সবাই শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হয়। কিন্তু সৈন্য দু'জন ঠিক পাহারা দিয়ে চলেছে।

বিশুঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দিনের আলো ফুটে গেলে তিনি আর কিছু করতে পারবেন না। তখন ধরা পড়তেই হবে।

বিশুঠাকুর গাছের ডাল বদল করে করে একেবারে ধারের দিকে চলে এলেন। তারপর ওত পেতে রইলেন। একজন সৈনিক সেই গাছতলায় আসতেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। লোকটিকে তিনি টুঁ শব্দও করতে দিলেন না, তার আগেই তার গলাটা মুচড়ে দিয়ে অজ্ঞান করে ফেললেন।

ওর কোমর থেকে তিনি খুলে নিলেন তলোয়ারটা। একটা কিছু অস্ত্র হাতে পেয়ে তবু তিনি কিছুটা ভরসা পেলেন।

অজ্ঞান সৈন্যটিকে তিনি টানতে টানতে নিয়ে এলেন গাছতলায়। তার জামাটা খুলে বিশুঠাকুর নিজে গায়ে দিলেন। তারপর লোকটির প্যাণ্টটাও খুলে ফেলে তিনি পরে নিলেন তাঁর ধুতির ওপরেই। লোকটির বিশাল চেহারা, তার পোশাক বিশুঠাকুরের ঢিলেঢালা হল। তিনি ভাবছিলেন যে, পর্তুগিজ সৈন্যর ছদ্মবেশ ধরে তিনি কিছুক্ষণ হাঁটবেন। যাতে অন্য সৈন্যটি কোনো সন্দেহ না করতে পারে।

কিন্তু জুতো ? বিশুঠাকুর কোনোদিন জুতো পরেননি। সাহেবদের জুতো তিনি কিছুতেই পরতে পারবেন না। তা ছাড়া সাহেবদের হাঁটাও অন্য ধরনের। তিনি সেই রকম হাঁটতে গেলেই ধরা পড়ে যাবেন। তবু যতক্ষণ এর পোশাক পরে অন্যদের চোখে ধুলো দেওয়া যায়।

অজ্ঞান সৈন্যটির দু' পায়ের মোজা টেনে খুলে ফেললেন তিনি। একটা মোজা ভরে দিলেন ওর মুখে। তারপর ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে অন্য মোজাটি দিয়ে বেঁধেও দিলেন হাত।

এবার তিনি তলোয়ারটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আকাশের অন্ধকার পাতলা হতে শুরু করেছে। ভোর হতে আর দেরি নেই। অন্যদিকের প্রহরীটির দেখা নেই। বিশুঠাকুর এতক্ষণ ধরে ওপরে বসে লক্ষ করেছেন, মাঝে একজন প্রহরী একটু দেরি করে আসে। বোধহয় সে একটু বিশ্রাম নেয়। সুতরাং এর মধ্যেই যা করবার করে নিতে হবে। প্রথমেই তাঁকে উদ্ধার করতে হবে বড়কর্তার ছেলের হাড়গোড়। তারপর এখান থেকে পালাবার পথ খুঁজতে হবে।
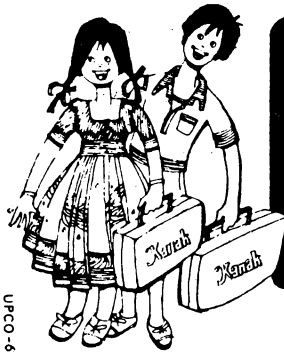
এমনি-এমনি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলেও কোনো লাভ নেই। তা হলে নিধিরাম আবার বিশুঠাকুরকে ধরে এই দুর্গের চত্বরে ফেলে দিয়ে যাবে। সেরকমই শর্ত হয়েছে।

এই আমবাগানের মধ্যেই কবর-স্থান। বিশুঠাকুর সেখানে এসে দেখলেন, পরপর অন্তত আট-দশটা কবর রয়েছে পাশাপাশি। এই দুর্গটা যত পুরনো, সেই তুলনায় আরও অনেক বেশি কবর থাকা উচিত ছিল। কিন্তু জলদস্যুদের বেশির ভাগই মারা যায় জলে অথবা অন্য কোনো গ্রাম-জনপদ আক্রমণ করার সময়। সেসব মৃতদেহ আর বয়ে আনা হয় না।

পরপর আট-দশটা কবর দেখে বিশুঠাকুর দমে গেলেন। এর মধ্যে কোন্‌টা বড়কর্তার ছেলের? বড়কর্তার ছেলের হাড়গোড় যে এখানে আছে, তারই বা প্রমাণ কী? এরা শুধু খ্রিষ্টানদেরই কবর দেয়। বড়কর্তার ছেলেকে খুন করে যদি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে থাকে?

অবশ্য নিধিরাম বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে, বড়কর্তার ছেলের হাড়গোড় এখানেই পোঁতা আছে।

সময় বেশি নেই, বিশুঠাকুর দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। এইসব দস্যু সঙ্গে কোনো বালক কিংবা স্ত্রীলোক রাখে না। পুরুষগুলোর সব দৈত্যের মতন চেহারা। সুতরাং কোনো কবর খুঁড়ে যদি ছোটখাটো একটা মাথার খুলি আর সেইরকম হাত-পায়ের হাড় পাওয়া যায়, তা হলেই ধরে নিতে হবে যে, সেটাই বড়কর্তার ছেলের। সেই ছেলেটির বয়স ছিল বারো বছর।

কবরগুলির গায়ে ছোট ছোট পাথরে বিদেশী ভাষায় কী সব লেখা আছে। কিন্তু বিশুঠাকুর বাংলা আর সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষা পড়তে পারেন না।

বিশুঠাকুর খুঁড়তে শুরু করলেন কবর। তলোয়ার দিয়ে কি সহজে মাটি খোঁড়া যায়! একটা কোদাল বা শাবল পেলে অনেক সুবিধে হত, কিন্তু সে আর কোথায় পাওয়া যাবে!

বিশুঠাকুর কবর খুঁড়তে খুঁড়তে অন্যদিকে চোখ রাখছেন। অন্য প্রহরীটি এসে পড়ে কি না দেখবার জন্য। কিন্তু তার পাত্তা নেই।

কবরগুলির গর্ত খুব গভীর নয়। একটু খুঁড়তেই কফিন পাওয়া গেল। সেই কফিনের ডালা খুলেই বিশুঠাকুর আঁতকে উঠলেন। একটি একেবারে টাটকা মৃতদেহ, এখনো যেন জ্যান্ত রয়েছে। চোখ দুটো খোলা। যেন কটকট করে তাকিয়ে আছে বিশু ঠাকুরের দিকে। বোধহয় দু' তিন দিন আগে কবর দেওয়া হয়েছে। বিকট দুর্গন্ধ যেন ধাক্কা দিল বিশুঠাকুরের নাকে।

তাড়াতাড়ি কফিনের ডালাটা বন্ধ করতে গিয়ে বেশ জোরে শব্দ হল। বিশুঠাকুর দৌড়ে গিয়ে লুকোলেন একটা আমগাছের আড়ালে।

কিন্তু কেউ এল না।

বিশুঠাকুর ভাবলেন, টাটকা কবর যদি এদিকে থাকে, তা হলে পুরনো কবর অন্যদিকে থাকাই স্বাভাবিক। কোথায় যেন একটা কাক ডেকে উঠল। তা হলে আর সূর্য উঠতে দেরি নেই। যে-করেই হোক বড়কর্তার ছেলের কবর তাঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।

তিনি উল্টো দিকে চলে গিয়ে আবার একটা কবর খোঁড়া শুরু করে দিলেন। প্রথম কবরটি খোঁড়া তবু যেটুকু সহজ হয়েছিল, এখানে পুরনো কবর খুঁড়তে গিয়ে বোঝা গেল মাটি অনেক শক্ত হয়ে গেছে। তবু আর একটা কফিন খুলতে পারলেন তিনি। এখানে রয়েছে খুব লম্বা একটা মানুষের কঙ্কাল, তার গায়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া পোশাক।

ধৈর্য হারালে চলবে না। সেই কফিন বন্ধ করে আবার ধরলেন পাশেরটাকে। এবার মনে হল তাঁর ভাগ্য ভাল। এই তৃতীয় কফিনটার মধ্যে রয়েছে একটা ছোটখাটো কঙ্কাল, বাচ্চা ছেলের বলেই মনে হয়।

দম নিতে নিতে তিনি ভাবলেন, সত্যিই এটা বড়কর্তার ছেলের কফিন? নাকি সবটাই পণ্ডশ্রম? এক হিন্দু জমিদারের ছেলেকে ধরে এনে যদি এরা খুন করে, তবে তাকে এরা কষ্ট করে কবর দেবে কেন? নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই তো পারত। এক হতে পারে, জমিদারের ছেলেকে এরা ধরে এনে ক্রিশ্চান করেছিল। তারপর কোনো কারণে ছেলেটা মরে যায়। তা হলে ওরা ছেলেটাকে কবর দিতে পারে।

যাই হোক, অত আর চিন্তা করার সময় নেই। বিশুঠাকুর সেই

শব্দসন্ধান

রঞ্জন

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য এক ঋষি। (৩) ছোট পাহাড়। (৫) বিখ্যাত রুশ লেখকের নামে বাংলা সাহিত্যের এক কিশোর চরিত্র। (৭) সমাসে যার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয় তাকে কী বলে? (১০) একটি দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী। (১১) অপ্রস্তুত হলে কী খাও? (১৪) কোন্‌ ইন্দ্রিয় একটি মহাকাশ-প্রকল্প? (১৬) ক্ষত্রিয় জাতি। (১৭) হরিণ। (১৯) গ্রাম্য চিকিৎসক, যারা বিশেষ ধরনের রোগ সারাতে ঝাড়ফুঁক প্রয়োগ করে। (২০) কী সমান হলে সমকোণী ত্রিভুজ হয়? (২১) গোরুর খাদ্য। (২৩) নিষ্পাপ। (২৪) সুরসপ্তকের মধ্যে কোন্‌ জন্তুর নাম পাওয়া যায়? (২৬) বিদ্যুৎ। (২৮) অনুকরণকারী। (৩১) ভারতের একটি বিখ্যাত শহর। (৩২) সম্ভবত। (৩৪) সাহসের বিপরীতার্থক। (৩৫) অল্পস্বল্প খাবার। (৩৬) লাঙলের ফলক।

উপর-নীচ : (২) বাতি-বিশেষ। (৩) নিশানা। (৪) তিব্বতের বৌদ্ধ পুরোহিত। (৬) তাসবিশেষ। (৭) মঙ্গলধ্বনি-বিশেষ। (৮) নাকের গয়না। (৯) সিংহ। (১০) ফুলকো এবং গরম হলেই খেতে ভাল। (১২) তীরভূমি। (১৩) দুই পক্ষের হারজিতের গান। (১৪) জল। (১৫) সমাপ্ত। (১৭) কোকিলের ডাক। (১৮) নক্ষত্রবিশেষ। (২০) শিবাজি যে-অস্ত্র ব্যবহার করতেন। (২২) সহৃদয়। (২৩) পাশা। (২৪) শূন্যস্থান পূরণ করো : ঠাকুরদাদার তোবড়া —। (২৫) — ভানতে শিবের গীত। (২৭) কদমফুল বা গাছ। (২৯) ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রাজ্য। (৩০) পাখি। (৩১) বিনাশ বা মৃত্যু। (৩৩) চমৎকার।

(সমাধান ২৮৩ পৃষ্ঠায়)

কফিনের মধ্যে নেমে পড়ে দ্রুত হাতে হাড়গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন ওপরে। গন্ধে তাঁর পেটের নাড়িভুঁড়ি প্রায় উল্টে আসছে, তিনি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলেন।

কাজ সেরে তিনি ওপরে উঠেই দেখলেন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অন্য প্রহরীটি।

একটা মস্ত তামার বাটি সে ধরে আছে দু' হাতে। বোধহয় সে তার সঙ্গীর জন্য কোনো খাবার আনতে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা কবরের ভেতর থেকে হাড় ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে দেখে সে অবাক হয়ে এখানে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমে সে পোশাকের জন্য বিশুঠাকুরকে সন্দেহ করল না। নিজেদের ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল।

আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। বিশুঠাকুর ভাবছেন কী করবেন। তাঁর তলোয়ারটা পড়ে আছে একটু দূরে এক তাল মাটির নীচে। সেখান থেকে তলোয়ারটা তুলতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। এই লোকটার চেহারা বিশাল, একটা দৈত্যের মতন, খালি হাতে লড়তে গেলে ...

আর সময় নেই। লোকটা তাঁকে চিনে ফেলেছে। মরিয়া হয়ে বিশুঠাকুর ওর বুকে একটা ঢুঁ মারার জন্য মাথাটা নিচু করলেন। কিন্তু তিনি এগোবার আগেই লোকটি সেই বিরাট তামার বাটিটা দিয়ে খুব জোরে মারল বিশুঠাকুরের মাথায়।

সেই একটা আঘাতই যথেষ্ট। বিশুঠাকুরের মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল। তিনি ঘুরে পড়ে গেলেন মাটিতে।

দ্বিতীয় সৈন্যটি এবার পা দিয়ে ঠেলে বিশুঠাকুরের দেহটা ফেলে দিল খোলা কবরটার মধ্যে। তারপর সে নিজের সঙ্গীকে খুঁজতে লাগল। একটু দূরে আমগাছের তলায় সে দেখতে পেল হাত-মুখ বাঁধা প্রথম সৈন্যটিকে। সে তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসতেই বেজে উঠল বিউগল্। পরপর তিনবার।

এই বিউগল্ ভোর হবার সঙ্কেত। এই সময় প্রহরীও বদল হবে। সেই আওয়াজ শুনেই দ্বিতীয় প্রহরীটি উঠে দাঁড়াল। এখন তার ছুটি, সে এখন আর কোনো কাজ করবে না। সে প্রথম সৈন্যটিকে মুক্ত করল না পর্যন্ত। সে গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেল দুর্গের সামনের দিকে।

নতুন দু'জন প্রহরী আসছে সেদিক থেকে। এই প্রহরীটি সংক্ষেপে তাদের ঘটনাটা জানিয়েই ছুটতে শুরু করল নিজের ঘরের দিকে। ওই বিউগলের শব্দ শোনামাত্র তার ঘুম পায়। এক্ষুনি শুয়ে না পড়লে তার চলবে না।

এই দুর্গের অধিপতির নাম ভ্যান হেংক। দারুণ রাগী মানুষ। প্রায় সারা রাত নেশা ও আমোদ করে সে ঘুমিয়েছে ভোর রাতে। একটা মোটে কবরখানার চোরের জন্য তাঁকে এত সকালে জাগালে তিনি রেগে যাবেন খুবই। সেই জন্যই নতুন প্রহরী দু'জন কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে বিশুঠাকুরের দেহটা উঁকি মেরে দেখে নিল একবার। তারপর কফিনের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়ে তারা বলল, "যাক, ঐ লাশটা এখন ওখানেই থাক।"

ভ্যান হেংক যখন জাগল তখন সূর্য প্রায় মাথার ওপরে এসে গেছে। মুখ হাত ধোবার পর ভ্যান হেংক তার অতিথি আন্তনিও দে রেগোর সঙ্গে প্রাতরাশ খেতে বসল। হাতে গড়া রুটি, ঝলসানো শুয়োরের মাংস আর বুলেপঞ্জ নামে সুরা।
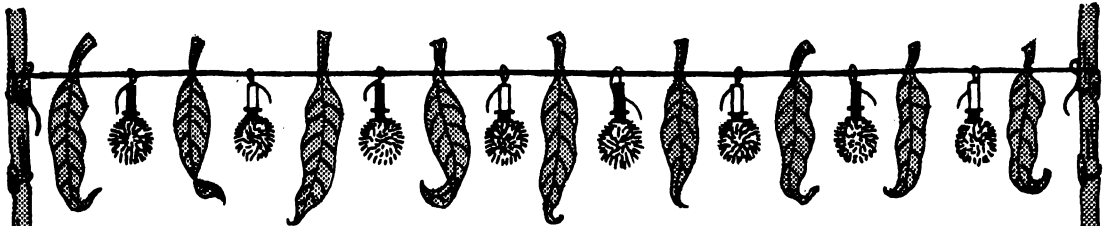
সবে মাত্র খাওয়া শুরু হয়েছে, এমন সময় নতুন প্রহরীদের একজন এসে রাত্তিরের ঘটনাটা জানাল।

ভ্যান হেংক এক ধমক দিয়ে বলল, "যাও, এখন যাও এখান থেকে! খেতে বসেছি, আর এর মধ্যে তোমরা কবর আর লাশের গল্প শোনাতে এসেছ! আর সময় পেলে না?"

কিন্তু আন্তনিও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী? কী বললে? একটা লোক ঢুকে পড়েছিল এই দুর্গে? রাত্তিরে সে কী করে ঢুকল? সে একা, না দলে আরও কেউ আছে?"

ভ্যান হেংক বলল, "আরে বন্ধু, আগে খাওয়াটা শেষ করো না, তারপর দেখা যাবে।"

আন্তনিও তাকাল ভ্যান হেংকের দিকে। এই ওলন্দাজরা একটু
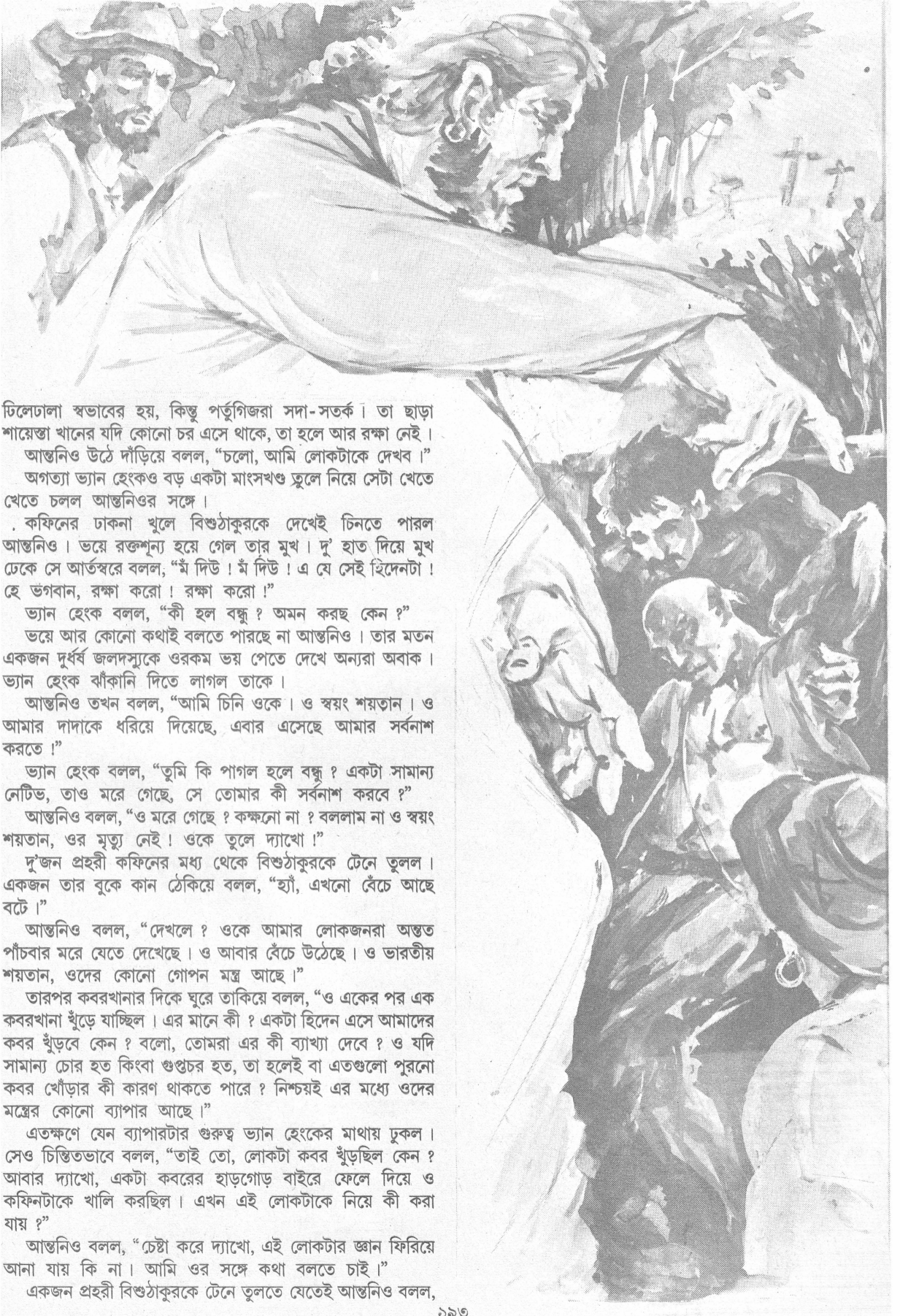
ঢিলেঢালা স্বভাবের হয়, কিন্তু পর্তুগিজরা সদা-সতর্ক। তা ছাড়া শায়েস্তা খানের যদি কোনো চর এসে থাকে, তা হলে আর রক্ষা নেই।

আন্তনিও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলো, আমি লোকটাকে দেখব।"

অগত্যা ভ্যান হেংকও বড় একটা মাংসখণ্ড তুলে নিয়ে সেটা খেতে খেতে চলল আন্তনিওর সঙ্গে।

. কফিনের ঢাকনা খুলে বিশুঠাকুরকে দেখেই চিনতে পারল আন্তনিও। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেল তার মুখ। দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে আর্তস্বরে বলল, "মঁ দিউ! মঁ দিউ! এ যে সেই হিদেনটা! হে ভগবান, রক্ষা করো! রক্ষা করো!"

ভ্যান হেংক বলল, "কী হল বন্ধু? অমন করছ কেন?"

ভয়ে আর কোনো কথাই বলতে পারছে না আন্তনিও। তার মতন একজন দুর্ধর্ষ জলদস্যুকে ওরকম ভয় পেতে দেখে অন্যরা অবাক। ভ্যান হেংক ঝাঁকানি দিতে লাগল তাকে।

আন্তনিও তখন বলল, "আমি চিনি ওকে। ও স্বয়ং শয়তান। ও আমার দাদাকে ধরিয়ে দিয়েছে, এবার এসেছে আমার সর্বনাশ করতে!"

ভ্যান হেংক বলল, "তুমি কি পাগল হলে বন্ধু? একটা সামান্য নেটিভ, তাও মরে গেছে, সে তোমার কী সর্বনাশ করবে?"

আন্তনিও বলল, "ও মরে গেছে? কক্ষনো না? বললাম না ও স্বয়ং শয়তান, ওর মৃত্যু নেই! ওকে তুলে দ্যাখো!"

দু'জন প্রহরী কফিনের মধ্য থেকে বিশুঠাকুরকে টেনে তুলল। একজন তার বুকে কান ঠেকিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এখনো বেঁচে আছে বটে।"

আন্তনিও বলল, "দেখলে? ওকে আমার লোকজনরা অন্তত পাঁচবার মরে যেতে দেখেছে। ও আবার বেঁচে উঠেছে। ও ভারতীয় শয়তান, ওদের কোনো গোপন মন্ত্র আছে।"

তারপর কবরখানার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, "ও একের পর এক কবরখানা খুঁড়ে যাচ্ছিল। এর মানে কী? একটা হিদেন এসে আমাদের কবর খুঁড়বে কেন? বলো, তোমরা এর কী ব্যাখ্যা দেবে? ও যদি সামান্য চোর হত কিংবা গুপ্তচর হত, তা হলেই বা এতগুলো পুরনো কবর খোঁড়ার কী কারণ থাকতে পারে? নিশ্চয়ই এর মধ্যে ওদের মন্ত্রের কোনো ব্যাপার আছে।"

এতক্ষণে যেন ব্যাপারটার গুরুত্ব ভ্যান হেংকের মাথায় ঢুকল। সেও চিন্তিতভাবে বলল, "তাই তো, লোকটা কবর খুঁড়ছিল কেন? আবার দ্যাখো, একটা কবরের হাড়গোড় বাইরে ফেলে দিয়ে ও কফিনটাকে খালি করছিল। এখন এই লোকটাকে নিয়ে কী করা যায়?"

আন্তনিও বলল, "চেষ্টা করে দ্যাখো, এই লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা যায় কি না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

একজন প্রহরী বিশুঠাকুরকে টেনে তুলতে যেতেই আন্তনিও বলল,

"সাবধান, সাবধান ! ও কিন্তু মটকা মেরে পড়ে থাকতে পারে। ওকে বিশ্বাস নেই। ও একেবারে সাক্ষাৎ কোব্‌রা সাপ !"

তখন দু'জন সৈন্য খোলা তলোয়ার হাতে দু' দিকে দাঁড়াল, আর একজন সৈন্য বিশুঠাকুরের টিকির গোছা ধরে টেনে তুলল।

তামার বাটির ঘায়ে বিশুঠাকুরের মাথার পেছন দিকটা অনেকখানি থেঁতলে গেছে। রক্ত থকথক করছে সেখানে। তাঁর যে জ্ঞান নেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভ্যান হেংক বলল,"যেমন ভাবে পারো, ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করো। মাথার ক্ষতটা পরিষ্কার করে দাও !"

তারপর আন্তনিওকে নিয়ে ভ্যান হেংক আবার ফিরে এল খাবার টেবিলে। কিন্তু আন্তনিওর খাওয়ার রুচি চলে গেছে। মুখখানা আমসি করে বলল, "লক্ষণ বড় খারাপ হে, হেংক ! আমি যে এখানে আছি তা কেউ জানে না। তবু ঐ শয়তানটা খুঁজে খুঁজে এই গড়ে এল কী করে ? ও কি একা এসেছে ? এই গড়ের আনাচে-কানাচে আর কেউ লুকিয়ে আছে কি না।"

ভ্যান হেংক হেসে বলল, "স্থানীয় লোকেরা কেউ ভয়ে এদিকে আসে না ! আর কেউ আসেনি, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি !"

আন্তনিও রেগে উঠে বলল, "কেউ আসতে সাহস পায় না, তবু একজন তো এসেছে ? আর নিশ্চয়ই ও বাইরে খবর পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা রেখেছে।"

ভ্যান হেংক বলল, "ঠিক আছে, আমি আমার লোকদের হুকুম দিচ্ছি। এই গড়ের ভেতরে আর বাইরেও সব জায়গায় খুঁজে দেখে আসবে।"

বলাই বাহুল্য, তন্নতন্ন করে খুঁজেও আর কারুকে পেল না ওরা। আর সারা দিনের মধ্যে বিশুঠাকুরের জ্ঞানও ফিরল না। কাছাকাছি আর একটি গির্জার পাদরি এদিককার ইউরোপিয়ানদের চিকিৎসা করেন, ডেকে আনা হল তাঁকে। সেই পাদরি অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন।

সেই ঘরের সামনে সারাক্ষণ উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে লাগল আন্তনিও। মাঝে-মাঝে সে শুধু গড়ের পাঁচিলের কাছে এসে গঙ্গার দু'দিকে দেখে যাচ্ছে, কোনো জাহাজ আসছে কি না। যদিও দশজন রক্ষীকে এখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে নজর রাখবার জন্য।

সন্ধের দিকে বিশুঠাকুর চোখ মেলে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঠোঁট ফাঁক করে ঢেলে দেওয়া হল তীব্র আরক। তার ফলে একটা বিষম খেয়ে বিশুঠাকুর মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলেন।

কাবরু ডোম নামে একজনকে আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল। কাবরু ডোম এই গড়ের নর্দমা পরিষ্কার করে। কিছুদিন আগেই সে ক্রিশ্চান হয়েছে। ফিরিঙ্গিদের ভাষা সে একটু একটু বোঝে। আন্তনিওর দাদা গঞ্জালভেস বাংলা বেশ ভালই জানে, কিন্তু আন্তনিও অনেকদিন গোয়াতে ছিল বলে সেখানকার স্থানীয় ভাষা কিছু শিখেছিল, বাংলা সে জানে না। সে কাবরু ডোমের মাধ্যমে কথা বলবে।

সে কাবরু ডোমকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ওকে জিজ্ঞেস কর, কে ওকে এখানে পাঠিয়েছে ? এখানে কেন এসেছে ? কোনো রকম মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করলে ওকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেব।"

বিশুঠাকুর চোখ খুলে তাকিয়েছেন বটে কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। আন্তনিওর বিশাল মুখখানা তাঁর সামনে ঝুঁকে আছে। কিন্তু তাকে তিনি চিনতে পারলেন না। মাথার মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ ঝাপটা মারছে।

বিশুঠাকুর কোনো উত্তর দিচ্ছেন না বলে আন্তনিও অস্থির ভাবে বলল, "ওকে আরক খাওয়াও ! ওকে চাঙ্গা করে তোলো !"

ভ্যান হেংক বলল, "ওর হাত-পায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দাও, তা হলেই ও ঠিক কথা বলবে !

সুতরাং দু'রকমই ব্যবস্থা হল। দু'জন জোর করে বিশুঠাকুরের মুখে ঢেলে দিল আরক, আর দু'জন পল্‌তে জ্বালিয়ে ছ্যাঁকা দিতে লাগল
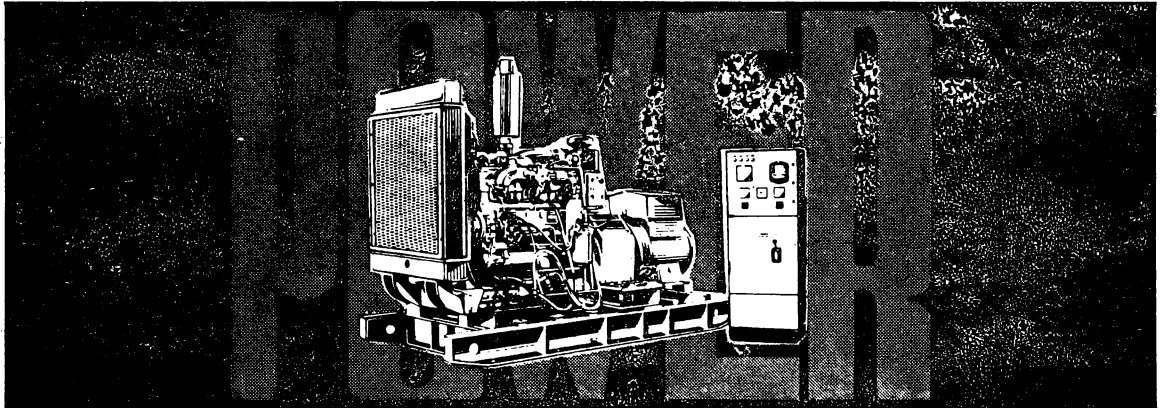
তাঁর হাতে আর পায়ে।

বিশুঠাকুর চমকে চমকে উঠতে লাগলেন। তাঁর মাথা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। এখনো তিনি মনেই করতে পারছেন না যে, তিনি কোথায় আছেন, এই লোকগুলোই বা কে?

কাবরু ডোম তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বারবার বলছে, "তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন এসেছ?"

কী বলছেন তা না বুঝেই একবার বিশুঠাকুর বিড়বিড় করে বললেন, "আমার নাম বিশ্বেশ্বর ঠাকুর। আমি শিবমন্দিরে পূজা করি।"

এই উত্তর শুনে কাবরু ডোম ভয় পেয়ে গেল। যদিও সে নতুন ক্রিশ্চান হয়েছে, তবু শিবঠাকুরকে সমীহ করে।

সে চোখ বড় বড় করে বলল, "সাহেব, ইনি তো ব্রাহ্মণ! সাধারণ চোর-ডাকাত তো নন। শিবঠাকুরের পূজা করেন বলছেন।"

পূজা শুনেই আঁতকে উঠে আন্তনিও বলল, "পূজা! পূজা! মন্ত্র! মন্ত্র! আমি বলেছিলাম না এই লোকটা মন্ত্র জানে! এ শয়তানের চেলা!"

ভ্যান হেংক বলল, "আমিও শুনেছি ওদের শিবঠাকুর হল ভূত-প্রেতদের নেতা। তবে তো এই লোকটা শয়তানের চেলাই বটে। ও এখানে কেন এসেছে, জিজ্ঞেস কর্। শিগগির বলতে বল্। ও এসে আমাদের গির্জা আর গড় অপবিত্র করে দিয়েছে।"

কাবরু ডোম আবার বিশুঠাকুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগল, "ঠাকুর, তুমি কেন এখানে এসেছ? এ ম্লেচ্ছদের জায়গায় তো তোমার আসার কথা নয়। কেন এসেছ? কে পাঠিয়েছে?"

প্রায় অচেতনভাবেই বিশুঠাকুর আবার বিড়বিড় করে বললেন, "আমায় বড়কর্তা পাঠিয়েছে...জমিদার...তার ছেলেকে এখানে কবরে পুঁতে রেখেছে, আমি সেই হাড়গোড় নিতে এসেছি..."

কাবরু ডোম এ-কথার মানে কিছুই বুঝতে পারল না। বামুনঠাকুর হাড়গোড়ের কথা কী বলছেন। হাড়গোড় তো তার মতন ডোমরাই শুধু ছোঁয়।

আন্তনিও ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করল, "কী বলল? কী বলল?"

কাবরু ডোমের মুখে কথাগুলো শুনে আন্তনিওর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। সে বলল, "এ সব কী? কোড নিশ্চয়! এর মানে বার করতে হবে। জমিদারের ছেলের হাড়গোড়...এর প্রত্যেকটি কথার নিশ্চয় আলাদা অর্থ আছে। গুপ্তচররা এরকম ভাষা ব্যবহার করে!"

ভ্যান হেংক বলল, "অত্যাশ্চর্য! অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য! সত্যিই একবার এক হিন্দু জমিদারের সন্তানকে এখানে ধরে আনা হয়েছিল...ফুটফুটে চেহারা... আমার খুল্লতাত ছেলেটিকে পছন্দ করে ক্রিশ্চান করে পোষ্যপুত্র হিসেবে রাখতে চান...কিন্তু ছেলেটি কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত-আমাশয়ে মারা যায়...কিন্তু সে তো বহুকাল আগের কথা....অন্তত পঁচিশ বছর....এ জানল কী করে?"

আন্তনিও বলল, "এ সবই এই শয়তানের শয়তানি! আমাদের বোকা বানাতে চায়।"

ভ্যান হেংক বলল, "আর বেশি কথায় কাজ কী, একে এখন শেষ করে দিলেই তো হয়!"

কাবরু ডোম বলল, "সাহেব, বামুন পুজারিকে এমনভাবে মারতে নেই। তাতে আপনাদের অকল্যাণ হবে। ইনি তো আর বাঁচবেনই না মনে হচ্ছে। এঁকে বরং জলে ভাসিয়ে দিন।"

হেংক গর্জন করে বলল, "চুপ কর! হিদেনের মতন কথা বললে তোরও মুণ্ড কেটে ফেলব।"

আন্তনিও বলল, "এর কাছ থেকে তো কোনো কথাই বার করা গেল না। লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না। আমি কাল ভোরেই এখান থেকে চলে যেতে চাই। রাত্তিরের মধ্যেই জাহাজ সাজিয়ে ফেলতে হবে। আমার বরং গোয়ার দিকে চলে যাওয়াই ভাল।"

হেংক বলল, "একে বরং তাহলে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও!"

আন্তনিও বলল, "ঠিক বলেছ। একে পেছনে ফেলে রেখে যেতে আমি ভরসা পাব না। মধ্যসমুদ্রে এর হাত-পায়ে পাথর বেঁধে ফেলে দেব। দেখব, তখন এর শয়তানি কীভাবে খাটে।"

বিশুঠাকুর আবার জ্ঞান হারিয়েছেন। হাত-পায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েও তাঁর জ্ঞান ফেরানো গেল না আর। আন্তনিওর নির্দেশে তাঁর হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা হল। তারপর তাঁর ঘরের সামনে একটা মশাল জ্বেলে একজন প্রহরীকে বসিয়ে রাখা হল সেখানে।

আজ রাতে আর এই গড়ে কোনো ফুর্তির হৈ-চৈ হল না।

আন্তনিওর দু'খানা জাহাজ একটা সরু খালের মধ্যে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে রাখা ছিল। হাল-মাস্তুলও খুলে রাখা হয়েছিল সব। সেগুলো আবার সব ঠিকঠাক করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল অনেকে। আন্তনিও নিজে সব তদারক করতে লাগল। ঠিক হল যে, ভ্যান হেংকও আন্তনিওর সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন আরব সাগরের কিনারে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে।

মধ্যরাত্রিরও পরে বিশুঠাকুরের জ্ঞান ফিরল। এখনো তিনি সব কথা মনে করতে পারছেন না। তাঁর মাথার এমন জায়গায় সেই তামার বাটিটা দিয়ে মেরেছে যে, মাথার ভেতরটাই যেন গোলমাল হয়ে গেছে।

তিনি একটু উঠে বসতেই হাত-পায়ের শিকলগুলো ঝনঝন করে উঠল। অমনি বাইরে থেকে প্রহরীটি এসে উঁকি মেরে দেখল ঘরের মধ্যে।

বিশুঠাকুর অস্ফুট গলায় বললেন, "জল! আমায় একটু জল দাও!"

প্রহরীটি শুধু জল কথাটার মানে বুঝল। সে বিদ্রূপের সঙ্গে বলল, "দূর, শয়তান, তোকে কে জল খাওয়াবে! সমুদ্রের তলায় ডুবে তখন পেট ভরে জল খাবি। তার আগে নিজের থুতু ফেলে চেটে খা।"

আবার প্রহরীটি গিয়ে বসল বাইরে।

হাত আর পায়ে জ্বালা করছে, মাথাতেও অসহ্য ব্যথা। বিশুঠাকুর প্রাণপণে বোঝবার চেষ্টা করলেন তিনি কোথায় আছেন। কারা তাঁকে মেরেছে।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে তাঁর খানিকটা চেতনা ফিরে এল। আস্তে-আস্তে মনে পড়ল সব কথা। তখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর হাত আর পা শিকলে বাঁধা। তাঁর শরীর এমনই দুর্বল যে, মুক্তি পাবার কোনো উপায়ই নেই।

ঘরের দরজা খোলা। তিনি দেখলেন বাইরে এখানে-সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। কিন্তু মানুষজন দেখা যাচ্ছে না বিশেষ। বাইরের প্রহরীটিরও আর সাড়াশব্দ নেই। তৃষ্ণায় তাঁর যেন বুক ফেটে যাচ্ছে।

তিনি আবার বললেন, "জল। কেউ একটু জল দেবে?"

কেউ কোনো সাড়া দিল না।

তিনি উঠে দাঁড়াতে গেলেন। কিন্তু শিকল দিয়ে এমন ভাবে পা বাঁধা যে, ওঠবারও উপায় নেই। তাঁকে ঐ একভাবেই থাকতে হবে।

ঠিক সেইসময় সামনে উপস্থিত হল একটি রোগা, লম্বা মূর্তি। বিশুঠাকুর চিনতে পারলেন, এ হল নিধিরাম সর্দার।

নিধিরাম বিশুঠাকুরের পাশে বসে পড়ে কাতর গলায় বলল, "ওঃ, কী কষ্ট করে যে এসেছি, তা তুমি বুঝবে না। দিনের বেলা চেহারা ধরতে পারি না, আর রাতে এরা এত মশাল জ্বালিয়ে রাখে যে, ধারেকাছে ঘেঁষতে পারি না। আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। ওঠো, তোমার কাজ শুরু করো!"

বিশুঠাকুর বললেন, "আজ আর আমি কিচ্ছু করতে পারব না। আমার শরীরে এক বিন্দু শক্তি নেই!"

নিধিরাম বলল, "তা বললে কি হয়, তোমায় পারতেই হবে। আমি খুলে দিচ্ছি তোমার শিকল। এতগুলো মশালের আগুনের মধ্য দিয়ে এসেছি, আমি বোধহয় এক্ষুনি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাব। উঃ মাগো, কী ব্যথা!"

এই অবস্থার মধ্যেও বিশুঠাকুর হাসবার চেষ্টা করলেন। নিধিরামেরও যদি গায়ে ব্যথা হয়, তা হলে তিনি আর নিজের ব্যথার কথা কী বলবেন!

নিধিরাম বলল, "এই তো আমি তোমার শেকল খুলছি, আমার হাত পিছলে যাচ্ছে। নাও, হয়েছে বোধহয়। এবার দ্যাখো তো, উঠে দাঁড়াতে পারো কি না।"

বিশুঠাকুর বললেন, "নিধিরাম, আমায় একটু তুলে ধরো। আমি নিজে দাঁড়াতে পারছি না।"

নিধিরাম বলল, "তোমায় ধরব কী, আমার নিজেরই যে আর শক্তি নেই। বিশুঠাকুর, তুমি আমাদের বাঁচাও! বড়কর্তার ছেলেটার আত্মাকে মুক্তি দাও, তারপর আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। আর পারি না। তার ওপর কৈবর্ত-পাখিগুলোর অত্যাচার, বেশিক্ষণ সুস্থির থাকতে দেয় না। আজও আমায় তাড়া করেছিল...ওঃ গেলাম, গেলাম! আর থাকতে পারছি না!"

নিধিরাম অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে বিশুঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর টলতে টলতে এলেন দরজার কাছে। প্রহরীটি হাঁটুতে মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছে। পাশেই জ্বলছে একটা মশাল।

মশালটা তুলে নিয়ে বিশুঠাকুর সর্বশক্তি দিয়ে সেটা দিয়ে মারলেন প্রহরীটির মাথায়। ঝোঁক সামলাতে না পেরে তিনি নিজেও পড়ে গেলেন ওর ওপরে। তাঁর মুখেও কিছুটা আগুনের ছ্যাঁকা লেগে গেল।

আবার উঠে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন প্রহরীটি অজ্ঞান হয়ে গেছে, তার মাথার চুলে আগুন ধরে গেছে। তিনি হাত চাপড়ে চাপড়ে সেই আগুন নেভালেন। তারপর প্রহরীটির পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন খানিকটা দূরে। অতবড় লোকটাকে টেনে আনতে তাঁর দম বেরিয়ে গেল প্রায়।

আবার তিনি মশালটা তুলে নিয়ে ফিরে এসে আগুন লাগিয়ে দিলেন তার ঘরটায়। খড়ের চাল, আগুন ধরতে দেরি হল না। তারপর তিনি আগুন ধরালেন আর-একটি ঘরে।

সে-ঘরটিতে মানুষ ছিল, আগুন একটু জ্বলে উঠতেই তারা জেগে উঠল। বিশুঠাকুর ততক্ষণে সরে গিয়ে মশালটা ছুঁড়ে দিয়েছেন আর একটা তাঁবুর ওপরে।

শুরু হয়ে গেল লোকজনের ছুটোছুটি ও চিৎকার। শীতকাল, আগুনের তেজ খুব বেশি হয় এ সময়, একবার ধরলেই লকলক করে জ্বলে ওঠে।

বিশুঠাকুরের যেন আর কোনো ভয়ই নেই। ধীরে-সুস্থে হেঁটে তিনি এলেন সেই আমগাছগুলোর কাছে। খোলা কফিনের পাশে ছোট ছেলের মাথার খুলি ও কঙ্কাল এখনো পড়ে আছে। সেগুলো তুলে নিয়ে তিনি একটা একটা করে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন সেই সব জ্বলন্ত ঘরের দিকে।

শেষ হাড়টা ছোঁড়ার সময় কয়েকজন প্রহরী তাঁকে দেখতে পেল। তারা যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সকলেরই ধারণা বন্দীর ঘরে আগে আগুন লেগেছে বলে সে সেখানেই পুড়ে মরেছে। তার হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা, তার বেরুবার কোনো উপায় নেই।

এখন বিশুঠাকুরকে আমগাছতলায় নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

একজন শুধু সাহস করে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ল তাঁর দিকে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার নিশানা ঠিক হল না, বিশুঠাকুরের গায়ে লাগল না গুলি।

ওদের আরও ভয় দেখাবার জন্য বিশুঠাকুর হেসে উঠলেন হা-হা করে।

তারপর তিনি দেয়ালের কাছাকাছি একটা বড় আমগাছে উঠে পড়লেন। কোথা থেকে যেন একটা অলৌকিক শক্তি এসেছে তাঁর শরীরে। একেবারে মগডালে উঠে তিনি উঁকি মেরে দেখলেন অনেক নীচে গঙ্গা।

এর মধ্যে প্রহরীদের ঘোর কেটে গেছে। তারা দল বেঁধে মশাল হাতে ছুটে এল আমগাছের দিকে। বিশুঠাকুর আর দ্বিধা না করে ভগবানের নাম স্মরণ নিয়ে লাফ দিলেন।

জল থেকে আবার ভেসে উঠবার পর বিশুঠাকুর ভাবলেন, তিনি কি সত্যি বেঁচে আছেন, না তিনিও এখন ঐ বড়কর্তা আর নিধিরামদের মতন!

ছাই-ছাই

অরুণ বাগচী

পাসিঘাট থেকে কয়েকটা গোরু কিনে এনেছেন মেজকাকা। প্রতিবছরই আনেন। পাসিঘাট তো বলতে গেলে কাছের জায়গা। কোন্ দূর পাঞ্জাব থেকে, মহীশূর থেকে, তাঁর কেনা গোরু এসে চবর-চবর করে দানাপানি গেলে আমাদের বাড়ির পিছনের বাগানে। তারপর শহর থেকে মাইল তিনেক দূরের খামারবাড়িতে চলে যায় দল বেঁধে কুমারীশকাকার তত্ত্বাবধানে। মাথায় দেহাতি পাগড়ি বেঁধে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে কুমারীশকাকা চলাফেরা করেন। কে বলবে তিনি বীরভূমের সিংহবাড়ির ছেলে, দেখে মনে হবে যেন বিহারের কোনও গ্রাম থেকে এসেছেন আসামে চাকরি করতে। নামে তিনি খামারবাড়ির ম্যানেজারবাবু, আসলে এক গোরু চরানো বাদ দিলে আর সব কাজই নিজের হাতে করতে ভালবাসেন। বিশেষত গোরুদের দলাইমলাই করতে, তাদের খাওয়াতে। দশাসই যে ষণ্ড-মহারাজকে দেখলে, যার ফোঁসফোঁসানি শুনলে—আমরা তো বাচ্চা—স্বয়ং দারা সিং বা ব্রুস লী চমকানো পিলে নিয়ে ভোঁ-দৌড় লাগাবেন, সেটাও কুমারীশকাকার কাছে যেন বাচ্চা বেড়াল।

পাসিঘাট থেকে কাকাই নিয়ে এসেছেন নতুন গোরুগুলো। তার মধ্যে একটাকে দেখে আমাদের ভাইবোনদের আর চোখের পাতা পড়ে না। কী নধর চিক্কণ চেহারা। ছোটখাটো, কিন্তু দারুণ সপ্রতিভ। কেমন দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে, যেন নিজের সাম্রাজ্য দেখছে। অরুণাচলের বন পেরিয়ে, ব্রহ্মপুত্র নদী পেরিয়ে এতটা পথ ঠেলে অচেনা জায়গায় এসেছে, ভ্রূক্ষেপই নেই তার। মাঝে মাঝে মুখ তুলে আমাদের দেখছে—মোহিত হয়ে যেতে হয়।

টুকলি বললে, "কী সুন্দর রঙ দ্যাখ্ সেজদি, নীল-নীল সাদা-সাদা!" নীলা ধমক দিয়ে ওঠে, "তুই চুপ কর তো বোকাটা। ওটার রঙ নীলও না, সাদাও না। ছাই-ছাই।" কুমারীশকাকা বললেন, "দি আইডিয়া। ওটার নাম রাখলাম ছাই-ছাই।"

ইতিমধ্যে সুবীর কখন গুটিগুটি গোরুটার দিকে এগিয়ে গেছে। মতলব ওটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করবে; মাথা নামিয়ে পটলের মতো কচি শিং দুটো বাগিয়ে ঝাঁ করে তাড়া করে এল ছাই-ছাই। কুমারীশকাকা চট করে সুবীরকে কোলে তুলে না নিলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড একটা ঘটত। হাতের শিকার ফসকাতে দেখে চটে গিয়ে গোরুটা আমাদের দিকে দৌড়ে এল। আমরা কি আর বোকার মতো অপেক্ষা করব? বাগান পেরিয়ে দে চম্পট। বেশ কিছুটা এগিয়ে এসে ছাই-ছাই থমকে দাঁড়াল। ইতস্তত করল। তারপর নাক দিয়ে বিশ্রী ঘুঁতঘুঁত একটা আওয়াজ তুলে নিজের ঝাঁকে আবার ফিরে গেল। বারান্দার নিরাপদ উচ্চতায় দাঁড়িয়ে দাদা ঘোষণা করলেন, "গোরুটা তো মহা ইয়ে···"

কিন্তু থাক ওসব কথা। গোরুর গল্প বলতে তো বসিনি। আমরা বলে তখন ফুটবলের চিন্তায় কাতর হয়ে আছি। দুদিন বাদে ঢেলিয়া শিল্ড ফাইনালের খেলা। এই প্রথম আমাদের স্কুল মস্ত মস্ত গাঁট ডিঙিয়ে ফাইনালে উঠেছে। জর্জ স্কুল, ইণ্ডিয়া ক্লাব, ডিবরুগড় ইয়ং মেন্স অ্যাসোঃ, আর গতবারের বিজয়ী ডিগবয় স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফাইনালে পুলিশ ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী খেলুড়েরা বয়সে সবাই আমাদের ডবল। তদুপরি বিষম মারকুটে। বলে দুটো লাথি ঝাড়ে তো প্রতিপক্ষের হাঁটু গোড়ালি লক্ষ করে দমাদ্দম চারটে কিক্। তাতেও অবশ্য আমরা ঘাবড়াইনি। কারণ আমাদের ক্যাপটেন নারু। ও বলতে গেলে একাই দলকে টেনে তুলেছে ওপরে। বাঁ পা ডান পা সমান চলে তার। বেতের মতো ছিপছিপে অথচ পেশল শরীর, দৌড় হরিণের নাগাল ধরা। একা নারুকে আটকাতে হিমশিম খেয়ে যায় বিপক্ষের ডিফেনস। রুখতে পারেও না শেষ পর্যন্ত। গোল নারু দেবেই। শিল্ড-এর সব-কটা খেলায় দিয়েছে। পুলিশকেও দিত।

ডিগবয়কে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার খেলাটা কোনোদিন ভুলব না। দুটো হাফেই সর্বক্ষণ বলতে গেলে ডিগবয় আমাদের চেপে রাখল। সেদিন আবার দলের রেগুলার গোলকিপার শৈলেন্দু পায়ে চোট লাগায় নামেনি। একরঙা হলুদ জার্সি চাপিয়ে বলির পাঁঠার মতো আমি পোস্ট সামলাচ্ছি। ওদের আক্রমণ হচ্ছিল জোরালো, কিন্তু সুযোগসন্ধানী শট করনেওলা কম থাকায় কোনোমতে মান বেঁচে যাচ্ছিল আমার। মেরুদণ্ড জেলি বানিয়ে দেওয়া গোটাকতক শট বুলেটের গতিতে পোস্টের ওপর দিয়ে চলে গেল। আমি হাতে-বলে করতে না পেরে তিড়িং তিড়িং নাচলাম আর ক্রমাগত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করে গেলাম। এর মধ্যেই একবার কী করে হঠাৎ বল নিয়ে এগিয়ে গেল নারু। বিপক্ষের তিনটে লোককে বুদ্ধু বানিয়ে টুক করে পাস দিলে বাঁ দিকে প্রদ্যোতকে। প্রদ্যোত এগিয়ে দিলে আউটে রঙ্গলালকে। রঙ্গলাল করলে সেণ্টার। মাঠের ওপার থেকে আমি দেখতে পেলাম চমৎকার একটা ছবি। আকাশ থেকে টুপ করে মস্ত বড় বৃষ্টির ফোঁটার মতো পড়ল বলটা। একসঙ্গে মাটি থেকে লাফিয়ে উঠল গোটা কয়েক শরীর। সবার ওপরে গোলকিপারের হাত এগিয়ে চলেছে বলের দিকে। হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলক—চুলে ভরা একটা চেনা মাথা—মোক্ষম একটা হেড। তারপর দারুণ দারুণ গো-ও-ল। সবটাই যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখলাম। খেলাশেষের বাঁশি বাজল একটু বাদেই। দৌড়ে গিয়ে আমরা নারুকে কাঁধে তুলে নিলাম।

পরে শুনলাম খেলার মাঠেই রাশভারী হেডস্যারের সঙ্গে তর্ক করে ফেলেছেন ভূগোলের প্রতুলবাবু। হেডস্যার বলেছিলেন, "গ্র্যাণ্ড, গ্র্যাণ্ড খেলেছে ছেলেটা। ও একদিন মোহনবাগানে খেলবে।" বরিশালের সন্তান প্রতুলবাবু বলে ওঠেন, "কী যে বলেন তার আগামাথা নাই। নারুর গায়ে যে জার্সি মানাবে তা হল হলুদ-লাল!"

হুকুম মানে না

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিণের দৌড়ানো
বাঘেদের গজরানো
ষাঁড়েদের হুংকার
শেয়ালের চিৎকার
ঘোটকগুলোর ছোটা
গণ্ডারদের গোঁ-টা
হাতির চলার ঢঙ
চিতার ছালের রঙ
ক্যাঙারুর লাফানোটা
জিরাফের জোরে ছোটা
কালো ভালুকের রোঁয়া
আর, কয়লার ধোঁয়া
শেয়ালের ডাক ছাড়া
কুকুরের ল্যাজ-নাড়া
আরো আছে কত কী যে
খুঁজলে পাবেই নিজে
এরা হুকুম মানে না কারো
যতই ধমক মারো

ছবি : অনুপ রায়

সেই নারু, আমাদের বিপত্তারণ ক্যাপটেন বিছানা নিয়েছে। প্রচণ্ড জ্বর। এলিয়ে পড়েছে একেবারে। তার মধ্যেই শূন্যে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে গোল দিয়ে যাচ্ছে। লেফট-হাফ নীহার কাল সারারাত জেগে রোগশয্যার পাশে ছিল। চোখ বড় করে শোনাচ্ছিল আমাদের, "উঃ কী শট ভাই। ওর একটাও আটকাবার সাধ্যি হত না পুলিশের গোলকিটার।" সবই তো বোঝা গেল। কিন্তু বিছানা থেকে করা গোলে তো আর ম্যাচ জেতা যায় না। মাত্র দুদিন বাদেই খেলা। কী যে উপায় হবে ভেবে কূলকিনারা পাই না। ক্লাসে ক্লাসে ফার্স্ট বয়রা সরল অঙ্ক কষতে গিয়ে ঘায়েল হয়ে যাচ্ছে। শিবাজির নৌবাহিনী ছিল কি ছিল না, আনাটানানারিভো কোন্ দেশের রাজধানী, প্রোপোরশনেট ভোটপদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়, উপপদ তৎপুরুষের লাগসই উদাহরণ কী, সুপিরিয়র দ্যান কথাটা কেন ভুল—কেউ ঠিকঠাক মনে করতে পারছে না। হেডমাস্টারমশায় পর্যন্ত এত বিমর্ষ যে একটাও ক্লাস নিচ্ছেন না। স্টাডিরুমে বসে সুপুরি চিবুচ্ছেন।

রাত্রে পাশের খাটে শুয়ে নাক ডাকাবার আগে কুমারীশকাকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে টিটু, তুই অমন ফিলজফার সেজেছিস কেন রে? কোনোদিকে মন নেই। প্রশ্ন করলে বোকা হয়ে যাচ্ছিস। হরিণের মাংসের অমন তোফা কাটলেট দাঁতেই কাটলি না। বলি কাণ্ডটা কী?"

বলেই ফেললাম দুঃখের কাহিনী। শুনেটুনে কুমারীশকাকা দিব্যি ঘুমিয়ে গেলেন। খুব রাগ হল। এতই যদি উদাসীন তবে অত আন্তরিকতা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করার দরকার তো ছিল না। হারুক আমাদের স্কুল। তাতে কার কী? রোম পুড়ে যাক, আর মহানন্দে নাকের বাদ্যি বাজান কুমারীশকাকা। পৃথিবীটা বড় নির্মম।

সকালবেলা দাঁতন করার সময় গলা দিয়ে যত বিশ্রী শব্দ তুলে একফাঁকে কুমারীশকাকা বললেন, "তোরা কর্তাদের বলে-টলে ম্যাচটা পিছিয়ে দিতে পারিস না?" বললাম, "সে চেষ্টা করে দেখেছি কাকু। একজন খেলোয়াড়ের অসুখ, সেজন্য খেলা পেছোনো নাকি যায় না। ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প ধর্মঘট রায়ট—এসব হলে তবেই বাঁচা যাবে। মাঝপথে খেলা ভ্যাস্তা হলেও অন্তত সাত দিন পিছিয়ে যাবে। তার মধ্যেই নারু...।" কুমারীশকাকা নিমের কাঠি নাড়তে নাড়তে মন্তব্য করলেন, "তোরা একদম বোগাস। যাকে বলে যাচ্ছেতাই। খেলতে যাস কেন ফুটবল? ডাংগুলি খেলগে যা! একজন খেলুড়ে চিত, তো দল-কে-দল চিত। ছো ছো ছো ছো ক্যা শরম কা বাত!" রাগ করে আমি পড়ার ঘরে চলে গেলাম। নারুকে 'এক'জন খেলুড়ে বলা যায় না—নারু একাই একশো। যে বোঝে সে বোঝে! ছাড় তো ফালতু কথা—

আমাদের সব প্রার্থনা দেবতা নাকচ করে দিলেন। ঝড় হল না, ভূমিকম্প না। আসামে তুমুল বৃষ্টি যে-কোনও সময় নামে। কিন্তু খেলার দিনে কী রোদ্দুর কী রোদ্দুর! চমৎকার আবহাওয়ায় স্কুল খেলতে নামল। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ দল শুরু করল ফাউল। রাইট স্টপার শক্তি আহত হয়ে মাঠের বাইরেই চলে যেতে বাধ্য হল। হাফটাইমের বাঁশি যখন বাজল তখন খেলা গোলশূন্য অবস্থায়। এই অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হয়েছিল আমাদের দলের মরিয়া ভাবের জন্য। আর তিন-তিনটে অবধারিত গোল বাঁচিয়ে দিয়েছিল শৈলেন্দু। সবাই কিন্তু বুঝতে পারছিলাম দ্বিতীয়ার্ধে বাঁচা শক্ত হবে। কারণ দলের আদ্দেক লোক অল্পবিস্তর আহত।

খেলা শুরু হতেই আমরা চেপে ধরলাম বিপক্ষকে। সুলতানের মাটি ঘেঁষা শট বারে লেগে ফিরে এল। ব্যাড লাক আর কাকে বলে। তারপরই পুলিশ চলে এল আমাদের গোলের মুখে। ওদের কর্তার সিং পায়ে বল পেতেই রেফারি হাঁকলেন অফসাইড। ব্যস, তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে লেগে গেল তিন-চারজন পুলিশের খেলুড়ে।

মাঝমাঠ বরাবর ওদিকে হইচই। একপাল গোরু মার্চ করে চলেছে। পাঁচন-হাতে তিনটে রাখাল তাদের সামলাচ্ছে। হাঁটু পর্যন্ত তোলা কাপড়, মাথায় ইয়া পাগড়ি, মস্ত গোঁপ চুমরোতে চুমরোতে চলেছেন কুমারীশকাকা। নির্বিকার। খামারবাড়ি যাবার জনতা-পথ ওই মাঠের মাঝখান দিয়েই। ওখানে খেলা হচ্ছে হোক। তা বলে কাজকর্ম সব বন্ধ থাকবে নাকি?

তারপরই দেখা গেল সেই ছাই-ছাই গোরুর কেরামতি। কী তার নর্তনকুর্দন। এতগুলো ঢুঁস দেবার মানুষ নাগালের মধ্যে দেখে তার আর ফুর্তি ধরে না। একবার এদিকে তাড়া করে, একবার ওদিকে। মুহূর্তে মাঠ ফাঁকা। সবাই যেন দৌড়বাজিতে নাম লিখিয়েছে। জোরে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে রেফারি হ্যাঁচরপ্যাঁচর করে উঠে পড়লেন কাছের একটা গাছে। ওখানে একটা সিট তবু ছিল। অন্য সব গাছে মানুষ, একটা ফল ধরবার জায়গা নেই। সব ভর্তি।

সবটাই যেন ভোজবাজি। এই দেখা গেল ফাঁকা মাঠে ছাই-ছাই গোরু বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরমুহূর্তে কুমারীশকাকা তাঁর গোটা দল নিয়ে কর্পূরের মতো উবে গেলেন।

খেলা দশ দিন পিছিয়ে গেল। জয় মা দুর্গা! পুলিশ থেকে দাবি তোলা হয়েছিল নিদেনপক্ষে ছাই-ছাই গোরুটাকে গ্রেফতার করার জন্য। জেলার শাসনকর্তা, এস পি, দুজনেই ধমক লাগালেন। "লজ্জা করে না তোমাদের? স্কুলের বাচ্চাদের সঙ্গে মারপিট করো! একটা গোরুর ভয়ে সব ইঁদুরের মতো পালাও। খেলার মাঠে ডাকাত পড়লে কী করতে? কেস ডিসমিস!"

ছবি : অনুপ রায়

নাচ শেখা

রত্নেশ্বর হাজরা

বয়েস আটের পিঠে চার—আছে লেখা
তবুও থামেনি নাচ শেখা
কখনো পেরুতে হলে গলি
একটু প্র্যাকটিস করে নেয় কথাকলি—
তাল তাল ফাঁক তাল—সম্
তিন তালে বাজে মৃদঙ্গম্—

বয়েস বেড়েছে আরো পাঁচ
তবুও ছাড়েনি শেখা নাচ—
একদা রাজপথে হল শখ
একটু প্র্যাকটিস করে নেয় কত্থক।
হঠাৎ ফুরিয়ে গেল দম
বেজে যায় বেজে যায় খালি মৃদঙ্গম্—

ছুছুন্দর-বধ

সুশান্ত বসু

মধ্যরাতে বন্ধ সেদিন রান্নাঘর
কাণ্ড শোনেন করল কী এক ছুছুন্দর!
নর্দমার ঐ রন্ধ্রপথে গলিয়ে নাক
যেই ঢুকেছে তক্ষুনি এক বিশ্রী হাঁক
পেড়ে হঠাৎ গর্জে ওঠে কুকুরদল—
সামনে ছিল বালতি-বোঝাই গঙ্গাজল
ঘাবড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে সেই টাবটাতে
সাঁতার কাটেন মূষিকপ্রবর মাঝরাতে!
এমনি করেই গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল তাঁর,
ছুছুন্দর এই বধের কাব্য শোনেন সার!

ছড়া গরম

দেবাশিস বসু

বিশ্রী যদি বিচ্ছিরি
মিছরি কি নয় মিচ্ছিরি?
ভাবতে গিয়ে ধুত্তোরি
কেবল কথার খুঁত ধরি
পানসুপুরিচুনখয়ের
দুপুরে ঘুম খুব ভয়ের
দুপুর কাটে নামতাতে
আমাদের এই সামতা-তে
রাগতে গিয়ে ধুত্তোরি
পিঁপড়েগুলোর খুঁত ধরি
পিঁপড়ে চিনির ভক্ত তাই
শিশির ছিপি শক্ত চাই
শক্ত ছিপি টাইট করি
ঘুমের সঙ্গে ফাইট করি
ভাদ্দরের এই গরমটাই
খেপিয়ে আমায় তুলছে ভাই
কাশ্মীরে যাই, পর্বতের
বরফ মেশাই শরবতে
মেঘের টুপি; পাশবালিশ
পাই যদি তো নেই নালিশ॥

ছবি: অহিভূষণ মালিক

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে, রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা কি ভাবে কাজ করে:

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।
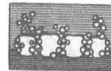
কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু, দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন...
দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

Colgate DENTAL CREAM

STOPS BAD BRE

দাঁতের পুরোপুরি যত্ন নেবার জন্যে
কোলগেট ট্রাইগার্ড টুথব্রাশ ব্যবহার করুন...
এতে দাঁতের তিন গুণ ভালো সুরক্ষা হয়

1 দাঁতের এনামেল সুরক্ষা করে।
2 দাঁতে কোনও ময়লা জমতে দেয় না।
3 মাড়ির সুরক্ষা করে।

DC-G-73 BN

পাপি সুইমিং স্কুল

তারাপদ রায়

আজ কয়েকদিন হল কাঞ্চনেরা একটা খুব বড় বাড়িতে এসেছে। কাঞ্চনের বাবা যেখানে কাজ করেন, সেই কোম্পানিরই সাবেক আমলের কোয়ার্টার এটা। এত বড় যে, আজকাল কেউই তাতে থাকতে চায় না। চারদিকে বাগান, সেগুলো এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। চওড়া বারান্দা ধুলোয় ছেয়ে আছে, দেয়ালে অতিকায় মাকড়শার জাল। পুরনো মরচে-ধরা লোহার গেট খুললে এক কিলোমিটার দূর থেকে তার আর্তনাদ শোনা যায়। শহর কলকাতার ঠিক মাঝখানে এরকম একটা বাড়ি, তেঁতুল ও বাদাম গাছের ছায়ার নীচে প্রাচীন একটা আধা-প্রাসাদ থাকতে পারে, সেটা সত্যিই ভাবা কঠিন।

তবু বাড়িটি আছে, এবং গত কয়েকমাস এখানে কেউ আসেনি। আগের বাসিন্দা যিনি ছিলেন, কাঞ্চনের বাবার উপরওলা, তিনি সাতমাস আগে রিটায়ার করার পর এই বাড়ি ফাঁকাই পড়ে ছিল। কাঞ্চনরা থাকত খুব ছোট একটা বাড়িতে, কাঞ্চনের বাবার অফিসের কর্তৃপক্ষ একদিন কার্তিকবাবুকে, মানে কাঞ্চনের বাবাকে, বললেন, "তুমি তো অনেকদিন বাড়ি-বাড়ি করছ, এই কোয়ার্টারটায় যাও না, খুবই লম্বা-চওড়া, বেশ হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবে।"

কার্তিকবাবু এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। এতদিন বড় অসুবিধার মধ্যে ছিলেন। যদিও প্রায় পোড়ো বাড়ি, তবু খোলামেলা আর খুবই বিশাল, একটু ভাঙাচোরা, তাতে কিছু আসে যায় না। তিনদিনের মধ্যে দুটো ট্রাক ভর্তি করে মালপত্র নিয়ে, সঙ্গে ট্যাক্সিতে কাঞ্চনের মা, কাঞ্চনের কাকা আর কাঞ্চন, কার্তিকবাবু নতুন কোয়ার্টারে চলে এলেন।

আসবার পরের দিনই কাঞ্চনের মা কার্তিকবাবুকে বললেন,"দ্যাখো, তুমি আর ঠাকুরপো অফিস চলে গেলে এই শুনশান বাড়িতে ঐটুকু কাঞ্চনকে নিয়ে কেমন ভয়-ভয় করে। একটা কুকুর এনে দাও, পুষি।"

কার্তিকবাবু বললেন, "কেন, এটা তো প্রায় অফিস-পাড়া, সামনের রাস্তায় সারা দুপুর হই-হই করে গাড়ি-ঘোড়া যাচ্ছে।"

কাঞ্চনের মা একটু রেগে গিয়ে বললেন, "সে তো রাস্তায়, এত বড় নিঝুম পুরীর মধ্যে রাস্তার কোনো শব্দই আসে না। কেউ এসে আমাদের গলা টিপে মেরে গেলেও কেউ জানতে পারবে না।"

এরপরে আর আলোচনায় না গিয়ে কার্তিকবাবু বললেন, "ঠিক আছে, কুকুর এনে দিচ্ছি। কিন্তু বড় কুকুর তো আনা যাবে না, একটা কুকুরছানা নিয়ে আসছি, দু মাস ভাল করে পোষো, দেখবে বিরাট হয়ে যাবে।"

কলকাতার গঙ্গার ধার বিদেশী জাহাজ, শীতল বাতাস এবং মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু এ সবের চেয়েও অনেক জীবন্ত একটি চিত্র গঙ্গার ঘাটে প্রায়ই দেখা যায়। সে হল অজস্র কুকুরছানা, ছাগলের মতো দড়ি দিয়ে সেগুলি খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, তাদের কারো রঙ বাদামি, কেউ সাদা, কেউ কুচকুচে কালো, কিন্তু প্রত্যেকের লেজ ফোলা, ঝোলা কান, নরম ঠাণ্ডা কালো নাক আর ভোর-রাতের আকাশের মতো ফিকে নীল চোখ। তারা কেউ লাফাচ্ছে, কেউ আপনমনে খেলছে, কেউ বা পাশের সঙ্গীর সঙ্গে ছদ্ম লড়াই করছে। দু'একজন ঘুমোচ্ছে, একটু কুঁকুঁ করে কাঁদছে এক-আধ জন। এর বাইরে এপাশে-ওপাশে একটি কি দুটি আছে যারা নরম কিশোরকণ্ঠে ঘেউঘেউ করে নিজেদের বীরত্ব জাহির করছে। একদিন সকালবেলা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে এই রকমই ঘেউঘেউকারী একটি বীর কুকুরছানাকে কার্তিকবাবু বেছে নিলেন। কালো রঙের কুকুরছানাটি, যার গলা ও পেটের নীচে ঝকঝকে সাদা, কার্তিকবাবু কাছে যেতেই সে পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে চিত হয়ে আম-আঁঠির ভিতরের কুচির মতো সাদা ও নরম জিব বার করে, জিবের ডগা দিয়ে বারবার জুতোর ফিতে ছুঁতে লাগল। কাঞ্চন সঙ্গে ছিল। সে বলল, "বাবা, ও অমন করছে কেন?"

কার্তিকবাবু বললেন, "ও বলছে, আমাকে নিয়ে চলো, আমি তোমাদের।"

এরা সবাই হল পাহাড়ি কুকুরের ছানা। একদল যাযাবর শ্রেণীর লোক বাচ্চাগুলো কলকাতায় নিয়ে আসে বেচার জন্যে। এই সাদা-কালো কুকুরছানাটি, যার নাম ইতিমধ্যে কার্তিকবাবু মনে মনে রেখেছিলেন দাবা, তার মালিক একটু দূরেই একটা মেহগনি গাছের গুঁড়িতে মাথা রেখে অর্ধেক চোখ বুজে একটা বিরাট লম্বা বিড়ি খাচ্ছিল। সে হঠাৎ জোড়াসন হয়ে বসে বলল, "বাবু, কুকুরটাকে নিয়ে যাও।"

কার্তিকবাবু পাকা লোক। প্রথমে দামদর না করে কিছুতেই দুর্বলতা দেখাবেন না। ইতিমধ্যে কাঞ্চন কিন্তু কুকুরছানাকে কোলে তুলে নিয়েছে, তবুও কার্তিকবাবু যথাসাধ্য
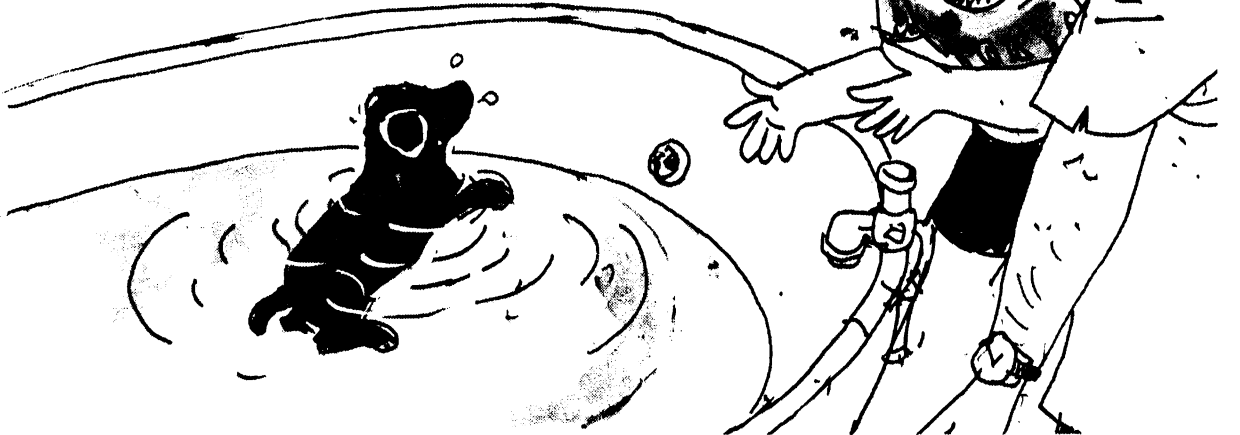
নির্লিপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দাম দিতে হবে?" তারপর শুরু হল এক অবিশ্বাস্য প্রতিযোগিতা। কুকুরওলা বলল, "আটশো। হাজার টাকাই দাম, তোমার জন্যে দুশো টাকা কমিয়ে দিচ্ছি। কুকুরটাও তোমাকে পছন্দ করেছে।" কার্তিকবাবুও একরকম, তিনি বললেন, "এই রকম জংলি কুকুরছানার দাম পঁচিশ টাকার বেশি হতেই পারে না।"

"ঠিক আছে, পাঁচশো টাকা দাও।" কুকুরওলা বলল।

"তিরিশের বেশি এক পয়সাও নয়।" কার্তিকবাবু কাঞ্চনের হাত ধরে টানলেন। তারপর আধঘন্টা ধরে :

"সাড়ে চারশো।"

"বত্রিশ।"

"তিনশো।"

"চল্লিশ"

"দুশো।"

"পঞ্চাশ।"

এইভাবে যখন সাড়ে সাতান্ন টাকায় রফা হল, তখন সদ্য দাবা-নামপ্রাপ্ত কুকুরছানাটি কাঞ্চনের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কুকুরছানা বাসায় এল। কাঞ্চনের মা, কাঞ্চনের কাকা সবাই তাকে দেখে মুগ্ধ। প্রথম দু'একদিন একটু কাঁদাকাটি করেছিল, কিন্তু আস্তে-আস্তে দাবার আচার, আচরণ, বুদ্ধি ইত্যাদি দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। বিশেষ করে 'নিজের লেজ নিজে ধরো' নামে যে নতুন খেলাটি দাবার জন্যে কাঞ্চন আবিষ্কার করেছে, যে খেলায় দাবা নিজেরই চারদিকে চক্রাকারে মিনিটের পর মিনিট মুখ দিয়ে লেজ ধরার জন্যে ঘুরতে থাকে, সেরকম কাঞ্চনের বাড়ির লোকেরা কখনো কোথাও দেখেনি।

তবু কুকুর পোষার বিস্তর ঝামেলা। শিকল চাই, বকলস চাই, ডগ-সোপ চাই, জলাতঙ্কের প্রতিষেধক টিকা অবশ্যই চাই। আর সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার হল : যেখানে শিকল পাওয়া যায় সেখানে শিকল ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এক এক জিনিস এক এক জায়গায়। আর ইঞ্জেকশান দেওয়ানো, সে কি সোজা কথা! অনেক ঘুরে ঘুরে শিকল-বকলস, এমন-কী কুকুরের সাবান, দুধ খাওয়ার বাটি, শোবার কম্বল সব কিনে আনলেন কাঞ্চনের বাবা। একটা কথা জানা গেল, ছ মাস না হলে কুকুরছানার, ইঞ্জেকশান লাগে না।

কাঞ্চনদের এই নতুন বাড়িটার সবচেয়ে মজা হল : প্রত্যেকটা ঘরের সঙ্গে একটা করে অতিকায় বাথরুম। আর সেই বাথরুমগুলিতে একটি করে চমৎকার পুরনো আমলের বাথটব। বাইরের ঘরের বাথরুমটা বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। ঠিক হল দাবাকে ওখানেই স্নান করানো হবে। দাবা থাকবে শোবার ঘরের মধ্যে। হয়তো বিছানায়-টিছানায়ও উঠবে। সুতরাং কুকুরছানাকে যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

কুকুরের ডাক্তারবাবুকে ফোন করে কাঞ্চনের বাবা জেনে নিয়েছিলেন, ছোট কুকুরছানাকে সপ্তাহে একদিনের বেশি স্নান করানো ঠিক হবে না। তাই স্থির করা হল প্রত্যেক রবিবার দাবাকে দুপুরবেলায় ডগ-সোপ মাখিয়ে খুব ভাল করে স্নান করানো হবে।

প্রথম রবিবারেই হৈ চৈ কাণ্ড। লোডশেডিংয়ের জন্যে কলে জল বেশি পাওয়া যায় না। তবু এরই মধ্যে অনেকটা জল ধরে বাইরের ঘরের বাথটবটা আধা-আধি ভরে রেখেছে কাঞ্চন। তার মধ্যে নিয়ে দাবাকে কাঞ্চনের কাকা নামিয়ে দিলেন। দাবার এখন উচ্চতা ছয়-সাত ইঞ্চি, আর বাথটবের জলের গভীরতা প্রায় এক ফুট। কাঞ্চন ভয় পেয়ে গেল। চেঁচাতে লাগল, "কাকা, ডুবে যাবে, ডুবে যাবে।" কাঞ্চনের চেঁচানি শুনেই হোক অথবা জল দেখে ভয়েই হোক দাবাও কেঁউ-কেঁউ করে কেঁদে উঠল। কাঞ্চনের কাকা কিন্তু কিছু না ভেবে নির্বিকার ভাবে দাবাকে জলের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। দাবা একটু ডুবে গিয়েই ভেসে উঠল, তারপর জলের উপর মাথা উঁচু করে সারা টবময় ঘুরে-ঘুরে সামনের দুটো খুদে পা দিয়ে জল কেটে কেটে সাঁতরাতে লাগল এবং তার মুখ দেখে বোঝা গেল সে জলের ব্যাপারটা খুব অপছন্দ করছে না।

দাবার সাঁতার কাটা দেখে হতভম্ব কাঞ্চন হাততালি দিয়ে উঠল। সে নিজেও একটা সাঁতারের স্কুলে যাচ্ছে আজ দেড় মাস হল, কিন্তু বিশেষ কিছুই শিখতে পারেনি, আর দাবা প্রথমদিনেই সাঁতার কাটছে।

অবাক কাঞ্চন কিছুক্ষণ গোল-গোল চোখে এই দৃশ্য দেখে তারপর দাবাকে জল থেকে তুলে একটা পুরনো তোয়ালে দিয়ে তাকে মোছাতে মোছাতে কাকাকে জিজ্ঞাসা করল, "কাকা, ও সাঁতার শিখল কোথায়?"

কাকা বললেন, "কুকুরছানারা আবার সাঁতার শিখবে কী! ওটা ওরা একা-একাই পারে।" ব্যাপারটা কিন্তু কাঞ্চনের মাথার মধ্যে ঢুকে গেল। একটি সাদা ঝকঝকে পোর্সেলিনের টবের জলে একটি সাদাকালো কুকুরছানা টুকটুক করে সাঁতার কাটছে, চোখ বুজলে চোখ খুললে কাঞ্চন শুধু এই ছবিটাই দেখতে পাচ্ছে। কত লোককে যে কাঞ্চন তার সাঁতারু কুকুরছানার কথা বলেছে তার ইয়ত্তা নেই, তারা সবাই যে ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে তা নয়। অনেকে শুধু 'তাই নাকি, তাই নাকি' করেছেন, সেটা যে নিতান্তই মনভোলানো কথা, সেটা বুঝতে কাঞ্চনের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু তাতে সে একেবারেই দমে যায়নি।

তার অবশ্য একটা বিশেষ কারণ আছে। কাঞ্চনের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা দেখা দিয়েছে যে, শুধু দাবার মতো প্রতিভাবান কুকুরছানার পক্ষেই সম্ভব একা-একা সাঁতারের মতো অতি কঠিন বিষয় আয়ত্ত করা, এবং জীবনে প্রথম দিনই জলে নেমে মাত্র একবার ডুবে সাঁতার কাটা। কাঞ্চন তার নিজের সাঁতারের স্কুলের কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে জানে, সাঁতার ব্যাপারটা অত সোজা নয়, ছেলের হাতের মোয়া নয়। আর দশটা কুকুরছানাকে ঐ ভাবে টবের মধ্যে ফেলে দিলে ডুবেই মরে যাবে, এ-বিষয়ে কাঞ্চনের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কাঞ্চন অনেক ভাবল, অনেক রকম ভাবল। আস্তে আস্তে তার বুদ্ধি খুলতে লাগল। সে ঠিক করল সে একটা কুকুরছানাদের সাঁতারের ইস্কুল করবে। ঐ বাইরের ঘরের বাথটবে তাদের সাঁতার শেখানো হবে, দাবা হবে এই সাঁতার-বিদ্যালয়ের ট্রেনার আর কাঞ্চন হবে সেক্রেটারি।

এই কলকাতা শহরে কত কুকুরছানা থাকে লেকের কাছে, পুকুরের কাছে, গঙ্গার কাছে। সাঁতার শেখা তাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। আর তা ছাড়া বর্ষার সময় কলকাতার প্রায় সব গলিই তো আজকাল নদী হয়ে ওঠে। সুতরাং কুকুরছানাদের জলে-ডোবা থেকে বাঁচতে গেলে সাঁতার শিখতেই হবে। সবচেয়ে বড় কথা, জলে নেমে সাঁতরানো শিখলে কুকুরছানারা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকবে—গায়ে ঘা হবে না, পোকা-মাকড় হবে না।

কাঞ্চনের এই অকল্পনীয় প্রস্তাবে, মানে কুকুরছানাদের সাঁতারের স্কুল করার পরিকল্পনায় কাঞ্চন সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেল তার কাকার কাছ থেকে। কাঞ্চনের বাবা মুচকি হাসলেন, কিছু মন্তব্য করলেন না। শুধু কাঞ্চনের মা আধো প্রতিবাদ জানালেন, "অত জল ঘাঁটলে কাঞ্চনের জ্বর হয়ে যাবে।"

তিনদিনের মধ্যে কাঞ্চনের কাকা তাঁর অফিসের কাছ থেকে একটা চমৎকার সাইনবোর্ড তৈরি করিয়ে নিয়ে এলেন। সাইনবোর্ডটা যে খুব বড় তা নয় কিন্তু সুন্দর কালো বার্নিশ করা কাঠের ফ্রেম দিয়ে ঘেরা, তার মধ্যে সবুজ জমিতে উজ্জ্বল সাদা হরফে বেশ বড়-বড় করে গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায় লেখা :

PUPPY SWIMMING SCHOOL

কুকুরছানাদের সাঁতার শিক্ষালয়

এখানে কুকুরছানাদের বিনামূল্যে টবের জলে সুশিক্ষিত সাঁতারু কুকুরছানা দ্বারা নিয়মিত সাঁতার শেখানো হইয়া থাকে।

অনুসন্ধান করুন

পরের দিন সকালবেলা অফিস যাওয়ার আগে কাঞ্চনের কাকা বাড়ির সামনের লোহার গেটটায় সাইনবোর্ডটা টাঙিয়ে দিয়ে গেলেন। রাস্তা দিয়ে যারা যায়, তারাই এই আশ্চর্য সাইনবোর্ড দেখে থমকে দাঁড়ায়, একটু অবাকও হয়। দুপুরে টিফিনের সময়ে

অফিসবাবুদের রীতিমত ভিড় জমে গেল কাঞ্চনদের বাড়ির সামনে। কাঞ্চন তাই দেখে উত্তেজিত হয়ে মাকে ডেকে আনল, "মা, দ্যাখো কত লোক আমাদের সাইনবোর্ড পড়ে যাচ্ছে। কাল নিশ্চয় ওরা ওদের কুকুরছানা নিয়ে আসবে আমাদের এখানে স্নান করানোর জন্যে।" কাঞ্চনের মা কিছু বললেন না, শুধু একটু হাসলেন।

তারপর আরও সাতদিন চলে গেছে। মজার খবর চাপা থাকে না। লোকমুখে কুকুরছানার সাঁতার শেখার স্কুলের গল্প নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা বড় খবরের কাগজে এ-বিষয়ে চমৎকার সংবাদ বেরিয়েছে, তাঁদের রিপোর্টার কাঞ্চনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ; দাবার ছবিও ছাপা হয়েছে অন্য একটি পত্রিকায় শিশুদের পাতায়। ফলে অনতিবিলম্বে দাবা হয়তো সিমলিপালের খৈরির মতো কিংবা আলিপুর চিড়িয়াখানার হাতি বিজলীর মতো বিখ্যাত হয়ে পড়বে। প্রতিদিন সারা দুপুর লোক উপচে পড়ছে বাড়ির দরজায়। কাঞ্চনের মা আর বড় বাড়িতে একা থাকার ভয়ে কম্পিত নন। বরং সদর-দরজার ভিড় সামলাতেই তাঁর সারা দুপুর কেটে যায়। কাঞ্চনের কিন্তু মনে আনন্দ নেই। এখন পর্যন্ত একজন লোকও তার কুকুরছানা কাঞ্চনদের সাঁতার শিক্ষালয়ে স্নান করাতে নিয়ে আসেনি। দাবার তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে নেচে-কুঁদে, লাফিয়ে, লেজ নেড়ে, জলের টবে সাঁতার কেটে সাঁই-সাঁই করে বড় হয়ে যাচ্ছে। সদর-দরজায় সাইনবোর্ডটার সামনে লোকের ভিড় বেশি হলে সে ঘেউঘেউ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। লম্বাও হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, এরই মধ্যে সে নয় ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেছে। কিন্তু দাবা তো মানুষ নয়। কাঞ্চন মানুষ, সে এত তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে না। তার বড় হতে অনেক সময় লাগবে। সে এখন দেখছে, দিনের বেলায় লোকজন সরে গেলে সন্ধ্যার দিকে এ পাড়ার কয়েকটা রাস্তার কুকুর তাদের সদর-দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো-কখনো তারা গেটের মধ্যে দিয়ে তাকায়, কখনো-কখনো তারা সাইনবোর্ডটার দিকেও তাকায়। কাঞ্চন জানে, এই পরের তাকানোটাই সত্যি। মানুষেরা যাই করুক, এই কুকুরেরা, যখন তাদের ছানাগুলি জন্মাবে একটু বড় হলেই তাদের নিয়ে আসবে কাঞ্চনের কাছে সাঁতার শেখানোর জন্যে। 'পাপি সুইমিং স্কুল'-এর বাথটব একদিন ভরে যাবে কুকুরছানায়, আর তাদের মায়েরা অপেক্ষা করবে কাঞ্চনদের বাড়ির উঠোনে। কুকুরের মায়েরা কেউ যদি সাইনবোর্ডের ভাষা না বুঝতে পারে, তাই কাঞ্চন খুব যত্ন করে একটা বড় ছবি এঁকে সাইনবোর্ডের নীচে টাঙিয়ে দিল। ছবিটা আর কিছুই নয়, একটা বাথটবের জলের মধ্যে অনেকগুলো কুকুরছানা প্রাণের আনন্দে জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে।

ছবি : দেবাশিস দেব

ব্যাঙের গান

সুরজিৎ ঘোষ

বৌবাজারের ব্যাঙ্কে ছিল সোনা ব্যাঙের লকার রাখা
আধখানা তার ভর্তি ছিল, বাকিটুকু বেবাক ফাঁকা।
তার মানে কি এই বুঝেছ, ব্যাঙের ছিল অনেক টাকা—
ঘটে তোমার বুদ্ধি কি নেই, মাথায় কেবল ঘুঁটের ঝাঁকা ?

সবাই জানে ব্যাঙের থাকে একটি কেবল আধুলি
তাই দিয়ে সে গয়না গড়ায়, নয়তো বানায় মাদুলি।
সেই দেমাকেই যখন-তখন পায়ের উপর পা তুলি
আকাশজোড়া হাঁ করে গায় খেয়াল নয়তো গজলই।

কিন্তু যেদিন ভাঙল সে ব্যাঙ্ক গণ্ডাচারেক ডাকাতে,
লাভ হল না দোরের কাছে দরোয়ানের থাকাতে—
সেদিন কি আর কেউ পেরেছে ব্যাঙের দিকে তাকাতে
গানের গলা চেপ্টে গেছে দুর্ভাগ্যের চাকাতে।

ভগ্নহৃদয় সেই সোনাব্যাঙ আছেন আমার বাড়িতেই।
খাওয়ার মধ্যে হালুয়া খান, জোর নেই আর মাড়িতে,
পুজো এলে কাজকর্ম চুকিয়ে তাড়াতাড়িতে
একটু কেবল গাইতে বসেন তেমন বাড়াবাড়ি নেই।

সোনার পাথরবাটি

সামসুল হক

গগনমামা ফুল দিয়েছে তারার মতন ফোটা
মামি বলল, অলীক বনের আকাশকুসুম ওটা।

কাকু বলল, ভাইপো আমার মস্ত বড় বার্ণিক
কাকি বলল, তার কাকুটি অবশ্য বকধার্মিক।

রুইকাতলা কানপাতলা নেই তো তাদের কানকো
গুঁফো রাঘববোয়াল-দাদুর গোঁফ কেটেছে সাঙ্কো।

এক যে ছিল দুমুখো সাপ বুদ্ধি ভীষণ সূক্ষ্ম
বাবা বলল, তোর কাকুটা আস্ত হস্তিমূর্খ।

খুঁটির জোরে বুঝতে হবে এসব খুঁটিনাটি
পাশ করলে কাকু দেবে সোনার পাথরবাটি।

ছবি : অনুপ রায়
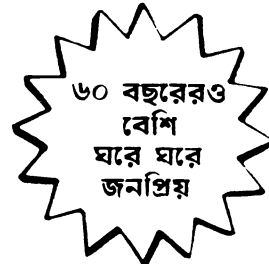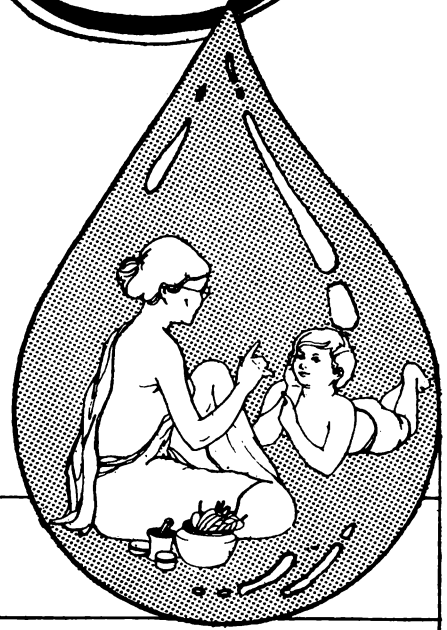
ছবি : মদন সরকার

ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

আনন্দ বাগচী

ঠিক যেন গল্পের বইয়ের পাতা থেকেই এইমাত্র ওরা লাফিয়ে নামল, রিকশা থেকে না। কোনো অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর চারটি চরিত্র, ওরা চার বন্ধু।

মাথার ওপরে তখন উত্তরবাংলার গনগনে বিকেল। তুলোট মেঘের ওপরে রঙের খেলা সেতারের তারের মতো। গমগম করছে। পায়ের কাছে পুরু ঘাসের ওপর ওদের মালপত্র টুকিটাকি ছড়ানো। খালি রিকশা-দুখানা এখনো চোখের আড়ালে চলে যেতে পারেনি, ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে যাচ্ছে যেন। চালক দুজন থেকে থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে।

আড়মোড়া ভেঙে হাত-পায়ের সাড় ফেরাতে ফেরাতে মনোজ পিকলুকে জিজ্ঞেস করল, "এই বাড়িটাই তো ? কোনো ভুল হয়নি চিনতে ?"

লালু সামান্য বিরক্ত হয়ে বলল, "এই নিয়ে তিনবার হল, মনু ! আরে বাবা, পিকলু তো আর আমাদের মতো প্রথম আসছে না ! ওর দাদুর বাড়ি, ভুল করবে কেন ?"

পিকলু বলল, "স্টেশন থেকে চোখ বেঁধে দিলেও আমি তোদের ঠিক এখানে নিয়ে আসতে পারতাম। তোর বড় সন্দেহবাতিক।"

মনোজ ওদের কথা শুনে খুশি হল না। বলল, "সন্দেহের কথা আসছে কেন। কিছু বললেই তোদের ওই ! রিকশাঅলা দুটো কেমন চোরের মতো তাকাচ্ছিল দেখলি না। তাই ভাবলাম, সেই কোন্ ছেলেবেলায় এসেছিস, যদিই কোনোভাবে...নাঃ আমার ঘাট হয়েছে।"

বড় বড় গাছে ভর্তি কম্পাউণ্ডের পেছনে লালরঙের বাংলোবাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। নিখিল এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, "বাড়িটা কী রকম নির্জন দেখেছিস। এরকম জায়গায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে গেলে মনে হবে এক মাস থেকে গেলাম।"

ওরা কেউ কথা বলল না। খিদেয় ক্লান্তিতে কথা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কয়েক শো মাইল একটানা ট্রেন জার্নির পর বোধ হয় এই রকমই হয়। ট্রেন থেকে নামলেও ট্রেন আর মগজ থেকে নামতে চায় না, তার দুলুনি, তার চাকার আওয়াজ যেন লেগেই থাকে। ওদের গা টলছিল, মাথার মধ্যে একখানা পুরনো রেকর্ড ঝিকঝিক ঝমঝম করে ঘুরেই চলেছে টের পাওয়া যাচ্ছিল। না-দেখা নতুন জায়গার কী রকম একটা গন্ধ থাকে যা ওদের কিছু সময়ের জন্য আবিষ্ট করে রাখল।

এই প্রথম ওরা একা-একা এতদূরে বেড়াতে এল। মনোজের ভাষায় ফরেন-এ। তা ঠিক। উত্তর-কলকাতার ছেলে চলে এসেছে উত্তরবাংলার এক প্রান্তিক শহরে। মানচিত্র যাই বলুক, এটা ওদের কাছে বিদেশ ছাড়া আর কী ! পিকলু ছাড়া বাকি তিনজনেরই দৌড় বলতে গেলে বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর আর ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত। সত্যি তাই। আসলে হায়ার সেকেণ্ডারি এমনই একটা পরীক্ষা যার পরে মানুষ রাতারাতি বড় হয়ে যায়। তাই পরীক্ষার পরে যখন সামনে তেপান্তরমাঠের মতো ধু-ধু ছুটি তখন হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। বাড়ির সবাই রাজি হয়ে গেলেন এক বাক্যে। অনেক দিন কোনো খবর না পেয়ে পিকলুর মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই পিকলু যাচ্ছে তার দাদুকে দেখতে। দাদু মানে মায়ের এক কাকা। সিভিল সার্জেন ছিলেন, রিটায়ার করে এখন পৈতৃক বাড়িতে একা থাকেন। শিকারি হিসেবেও নামডাক ছিল এক সময়। সে-সব গল্প পিকলুর বন্ধুরা অনেক শুনেছে। তাই প্রস্তাব আসতেই ওরা সঙ্গে জুটে গেল। দিন-সাতেক কাটিয়ে এলে মন্দ হয় না।

মিনি বেডিং, ফোমের স্যুটকেস আর কাঁধের ঝোলা তুলে নিয়ে ওরা এগোল। কাঠের ফটক খুলে ভেতরে পা দিয়েই হাওয়াবদল বুঝতে পারল। দুপুরবেলা পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে যেমন চমক লাগে। স্থির থেমে থাকা জলও কীরকম গা মিলিয়ে রকমারি ঠাণ্ডা গরম। কম্পাউণ্ডের মধ্যেও তেমনি। যেন কেমন ঠাণ্ডা ড্যাম্প ধরা এয়ার পকেটের মধ্যে ওরা এসে পড়েছে।

মনোজ পিকলুর কানে কানে বলল, "তোর দাদুর বাগানটা এয়ার-কণ্ডিশন করা নাকি র‍্যা ?"

দাদুর জন্যে পিকলুর মনটা কী-রকম ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, মনোজের ঠাট্টাটা সে গায়ে মাখল না। তবে হাওয়াটা যেন স্যাঁতসেতে, বন্ধ ঘরের মধ্যে আটকে থাকা, কেমন বাসী-বাসী। সেও অনুভব করছিল। যত এগিয়ে যাচ্ছিল, শীতল গা-সিরসির ভাবটা টের পাওয়া যাচ্ছিল স্পষ্ট করে। আসলে উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলটা ভিজে জায়গা, কলকাতার মতো নয়, গড় বৃষ্টিপাত এখানে অনেক বেশি। গাছপালার দিকে তাকালেই সেটা টের পাওয়া যায়। মাটির অফুরন্ত রসে ওদের চেহারাই এখানে অন্যরকম। খরা রাজ্যের কি ডাঙার দেশের

চেনা গাছপালার বদলে ভিন্ন জাতের গাছ এখানে সমাজ বেঁধেছে। গাছের গায়ে সবুজ ভেলভেটের মতো মস, আর বহুরূপী অর্কিড। সাদা পায়রার মতো বড় বড় ফুল ম্যাগনোলিয়া। ধুতরোর ঝোপে এক-দেড় হাত লম্বা চোঙার মতো ফুল। সবই অদ্ভুত। জল হাওয়া মাটি—সব কিছু।

বারান্দায় উঠে নক করবার আগেই দরজা খুলে গেল। দাদু। হাসি-হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বোধ হয় জানালা দিয়ে আগেই দেখতে পেয়ে গিয়েছিলেন। বাংলোর ভেতরটা গোধূলির মরা আলোয় আবছায়া হয়ে আছে। চারপাশ বন্ধ, ঘষাকাচের জানালা দিয়ে আর কত আলো আসবে। তবু দাদুকে খুঁটিয়ে দেখতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।

এই ক'বছরে দাদুর মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। লম্বা ছিপছিপে চেহারাটাও সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকেছে। বাদবাকি সব ঠিক আছে। মায় ঠোঁটের হাসি আর দিনরাত্তির কামড়ানো পাইপটা। নিবুক জ্বলুক লাগাতার। অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। হালকা-সবুজ রঙ চশমার কাচের ওপিঠে দুটো ছটফটে বে-আন্দাজ চোখের তারা, বাঁ রগ থেকে কপাল তক সরু কেঁচোর মতো তিড়বিড়নো শিরাটা যেমন ছিল। পাজামা-গেঞ্জির ওপর সেই হাঁটু-ডুবোনো সাহেবি আলখাল্লা, কোমরের কাছে সিল্কের দড়ি দিয়ে বাঁধা। পায়ে চটি-মোজা। ভাঁজ করা ইংরেজি খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে দাদু উঠে এসেছিলেন। হেসে ফেলে বললেন, "ওয়েলকাম টু ইউ দাদুজ। দাদুভাইসকল. স্বাগতম্। ভেতরে এসো। আমি জানতাম তোমরা আসবে, তাই অপেক্ষা করছিলাম।"

পিকলুর গলায় অভিমান ভারী হল, "শুধু অপেক্ষা করলেই দায়িত্ব খালাস আর দোষ ফুরিয়ে যায় বুঝি! চিঠি লেখা তো ছেড়েই দিয়েছ, চিঠি দিলেও কোনো উত্তর দেওয়া হয় না কেন শুনি?"

পিকলুর দাদু ঠোঁটের কোণে যেমন হাসছিলেন তেমনিই হাসতে হাসতে বললেন, "দাদুভাইয়ের আমার মেজাজ বড্ডই খারাপ হয়ে আছে! এসো, সবাই ঘরে এসো।"

ওরা ভেতরে ঢুকে মালপত্র নিয়ে ইতস্তত করার আগেই দাদু আঙুল দিয়ে ঘরের একপাশ দেখিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ বাজখাঁই গলায় এমন একটা হুঙ্কার দিলেন যে মনে হল সমস্ত বাড়িটার পিলে চমকে গেল, কাচের দরজা-জানালা ঝনঝন করে কেঁপে উঠল। সেই সঙ্গে ওরাও। নিখিল এমনিতেই শান্ত আর ভিতু টাইপের। ওর হাত থেকে স্যুটকেসটা পড়ে গেল। ও একেবারে অপ্রস্তুত। কাচুমাচু মুখে তাকিয়ে দেখল দাদু সেই আগের মতোই মুচকি মুচকি হাসছেন। মাথা নেড়ে নিচু গলায় বললেন, "ব্যাটা চোর, একের নম্বরের ফাঁকিবাজ, নিশ্চয় কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। দাদুর হুঙ্কারের লক্ষ্য তারা নয়, হতেই পারে না, এটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু কে? পিকলু তার মালপত্র নামাতে নামাতে বলল, "চাকর-বাকর কাউকে ডাকছেন। অনেক আগে দেখেছি, একটা নেপালি বুড়ো ছিল।"

"অ্যাই ভূত! অ্যাই ভূতের বাচ্চা! শুনছিস—এই দেড়েল!"

দাদু আর-একবার গর্জন করে উঠলেন। এইবার বোঝা গেল দাদুর হুঙ্কারের তলায় একটা কৌতুকের ভাব, একটা উছলে ওঠা হাসি চাপা রয়েছে। এবং তার থেকেও স্পষ্ট করে বোঝা গেল, ওদের পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক একটা দমকা হাওয়ার মতো, তার পায়ের আওয়াজ কান এড়িয়ে গেলেও নিশ্বাসের সাঁই সাঁই শব্দটা হেঁপো রুগির মতো, পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

আসলে ঘরের চাপা আলো আর ছায়ার মধ্যে ওই ডোরা-কাটা পোশাক পরা লোকটা এক পলকের ধাঁধার মতো ওদের অন্যমনস্ক চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। সদরটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘরের ভেতরে আলোটা এখন আর-এক পর্দা কম, তবে কাজ চলে যায়। ওরা সবাই দেখল তালপাতার সেপাইয়ের মতো লোকটা হাত জোড় করে সামনের দিকে এক হাত ঝুঁকে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। একমুখ দাড়ি আর পাগড়িসুদ্ধু মাথাটা এমন ভাবে গর্দান বাড়িয়ে নুইয়ে রেখেছে যে মনে হয় যে-কোনো হুকুম এবং দণ্ড শিরোধার্য করতে ও প্রস্তুত। অবিশ্যি হুকুম পেলেই যে ওই অত্তোবড় মাথাটা ওই লগবগে ঘাড়ের ওপর আর খাড়া হতে পারবে সেটা সন্দেহজনক।

এই বিনয়ের অবতারটিকে সামনে পেয়ে গিয়ে দাদুর রাগ জল হয়ে গেল। পিকলুদের স্নান খাওয়া বিশ্রামের বন্দোবস্ত করতে বলে বললেন, "এরা আমার নিজের লোক মনে রাখবে। কোনো রকম চালাকির চেষ্টা যেন না হয়। যাও, মালপত্রগুলো ওদের ঘরে তুলে দাও।"

লোকটা কোনো কথা বলল না। শুধু জবাবে আরও আধ হাত মাথা নুইয়ে চলে গেল। সেকেণ্ড তিন-চার পরে ওরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল লোকটা নেই, সেই সঙ্গে ওদের মালপত্রগুলোও ভ্যানিশ হয়েছে।

পিকলু অবাক হয়ে বলল, "এই চিজটিকে আবার তুমি কোত্থেকে যোগাড় করলে, দাদু? তোমার সেই আগের বুড়োটাকে তো দেখছি না।"

দাদু মুখভঙ্গি করে বললেন, "আর বলিস না, সেটার কী যে হল, পালাল। সে যাবার পরেই এটা এসে জুটেছে। আমার নতুন রিক্রুট বলতে পারিস। বরাবরের অভ্যেস একা থাকতে পারি না, কী আর করি। আর এই আফিমখোর ব্যাটাও দিনরাত্তির বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করছিল দেখে বললাম, থাক হতভাগা, থেকে যা। তুইও একা আমিও একা। কিন্তু বুঝলে পিকলুইভাই, লোকটার স্বভাব-চরিত্তির ভাল না। কেন ভাল না? একটু হাতটান আছে। সুযোগ পেলেই সরায়।"

দাদুর বলার ভঙ্গিতে পিকলু হেসে ফেলল; বলল, "বুঝেছি, লোকটা একটু চোট্টা আছে। সুযোগ পেলেই তোমার পয়সাকড়ি খাবার-দাবার হাপিস করে দেয়। ওর ও-রকম হ্যাংলা চেহারা দেখেই আমরা বুঝেছি।"

"না না, সে সব না। সে সব কিছু না। লোকটা আসলে সময় চুরি করতে ওস্তাদ. সুযোগ পেলেই খানিকটা সময় বেমালুম হাতিয়ে নেবে। তা নিক, আমার তো অঢেল সময়, খরচ করার লোক নেই। তবে ঐ যে বলছিলাম আজব, চোখের পলকে কাজ করে. চোখের পলকে ঘুমোয়। এক সঙ্গে কুঁড়ে আর চটপটে হয় বলে কখনো শুনেছ?"

"তা হোক, অচেনা একটা লোককে এভাবে এক কথায় বাড়িতে জায়গা দেওয়া ঠিক হয়নি। শেষে কোন্ দিন টাকা পয়সার লোভে তোমাকে খুন করে পালাবে। তোমার বয়স হয়েছে, একা থাকো। নাঃ, কাজটা বোধ হয় ভাল করনি।"

লালু বলল, "হ্যাঁ, আজকাল তো ও-রকম ঘটনা আকচার ঘটছেই। কাগজে প্রায়ই থাকে।"

"খুন! আমাকে খুন করবে ওই বুদ্ধু ভূতটা?" দাদু হাঃ হাঃ করে হাসলেন মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে, "ওটা একটা পাক্কা ইডিয়েট। সেই কবিতার কেষ্টার মতো. পড়োনি? ভূতের মতন চেহারা যেমন নির্বোধ অতি ঘোর! ওটা তাই। আচ্ছা ভাইসব. তোমরা জিরিয়ে নাও, পরে গপ্পোসপ্পো হবে. আমি এখন একটু ঘুরে আসি। যা দরকার হুকুম করে চেয়ে নেবে, কেমন?"

দরজার পাশ থেকে ছড়িটা তুলে নিয়ে বগলে খবরের কাগজ আর মুখে পাইপ গুঁজে দাদু বেরিয়ে গেলেন। লালু আর পিকলুও দাঁড়াল না, স্নান করে ফ্রেশ হয়ে নেবার জন্যে ওরা ভেতরে চলে গেল। বাইরে হলঘরে তখন শুধু মনোজ আর নিখিল। অবেলায় নতুন জায়গার জল নিখিলের সহ্য হয় না, সে একটু সুখী টাইপের। সোফার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

মনোজ কটাক্ষ করে বলল, "তোর শুধু ওই, সুযোগ পেলেই বডি ফেলে দিস। ওর সঙ্গে জমবে ভাল। যাই দেখে আসি গে, উনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন কি না।"

নিখিল বুঝল মনোজের মতলবটা কী। ওর মতো পেট-কাতুরে খুব কমই আছে। একেবারে জলজ্যান্ত খাই-খাই একটা। হেসে ফেলে বলল, "হ্যাঁ যাও, তোমারও শুধু ওই।"

"আমি একার জন্যে যাচ্ছি না।" মনোজ বলে হাসল।

একা হতেই নিখিল প্রথম তামাকের গন্ধটা পেল। কেউ যেন তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। অথচ দাদু যতক্ষণ পাইপ মুখে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন নিখিল গন্ধটা

পায়নি। কেমন গা-ছমছম করছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসল। রাগ হল মনোজের ওপর। খিদে সকলেরই পেয়েছে, তা বলে তোর মতো কেউ ছটফট করে বেড়াচ্ছে না।

এমন সময় মনোজ ফিরে এল। চোখ-মুখের চেহারা কেমন উদভ্রান্ত। নিখিলের পাশে ধপ করে বসে পড়ে বলল, "যাঃ বাবা। এটা বাংলোবাড়ি না গোলকধাঁধা ?"

"কেন, কী হল ?"

"বাপস্ ! কটা ঘর রে এ-বাড়িতে ?"

"কত আর। তিন-চার খানা হবে। কেন বল তো ?"

বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে মনোজ বলে, "তাই তো হওয়ার কথা, আমি তো সেই রকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু কিচেন খুঁজতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললাম। যত এগোই দেখি দরজা আর ঘর, দরজা আর ঘর। ঘরেরও শেষ নেই দরজারও না। এক দরজা দিয়ে ঢুকে আর-এক দরজা দিয়ে বেরোনো। বড় বড় আয়নাগুলোয় এই দরজাগুলোর ছায়া পড়ে আরও গোলমেলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময় টের পেলাম ঘুরে ঘুরে আমি শুধু একটা ঘরের মধ্যেই প্রতিবার এসে দাঁড়াচ্ছি। মাথাটা কী-রকম ঘুরে যেতেই ফিরে এলাম। অথচ লোকটা খুব কাছেই কোথাও ছিল। থেকে-থেকে আমি ডিমভাজার ইন্টিমেট গন্ধটা পাচ্ছিলাম।"

নিখিল বলল, "আমি জানতাম এ-রকম হবে।"

"কী হবে ?"

"তোর মাথার গোলমাল।"

"কেন ?" সন্দেহের বশে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মনোজ জিজ্ঞেস করে।

"দু দিন চান করিসনি। তার ওপর এত মাইল ট্রেন জার্নি। তার ওপর খিদের মুখে ডিমভাজার গন্ধ। এতে ভালমানুষ কোন-না পাগল হয়ে যাবে, তা তুই। তোর তো একটু আছেই ! নেই ?"

মনোজ উত্তেজিত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎই মুখ খুলেও থেমে গেল। সেই পাগড়িসর্বস্ব দেড়েল লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে প্রকাণ্ড ট্রে, তাতে ওমলেট, কাজু আর কফি। চারজনের জন্যেই এসেছে। বর্তমান অবস্থায় লোভনীয়। লোকটা চোখ তুলে বোধ হয় আর দু'জনকে খুঁজল।

মনোজের তর সইছিল না। বলল, "রেখে যাও। ওরা চান করতে গেছে, এই এল বলে।"

লোকটা সেন্টার টেবিলের ওপরে কাপ আর প্লেটগুলো নিঃশব্দে নামাল। তারপর খালি ট্রে-টা নিয়ে গজগজ করতে করতে চলে গেল। যেমন এসেছিল তেমনি। যেন সুতোয় ঝোলানো তালপাতার সেপাই। পায়ে কোনো শব্দ নেই। মহাজাতি সদনে একবার পুতুল নাচ দেখেছিল, মনে পড়ল নিখিলের।

"লোকটা কী বলতে বলতে গেল রে ?" মনোজ শুধোল।

"ভাল শুনতে পেলাম না। অসন্তুষ্ট হয়েছে বোঝাই যায়। এক টুকরো কথা শুধু কানে এল। ভূতের ব্যাগার খেটে খেটে—না কী যেন বলছিল। নিশ্চয় পিকলুর দাদুকে মিন্ করে—"

"তা ভাই, সব সময় ও-রকম সম্বোধন শুনলে কে আর খুশি হয় ? চান-টান বুঝলি পরে হবেখন।" মনোজ আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার ডিশের ওপর ঝুঁকে পড়ল। নিখিল জবাবে কী যেন বলল, সেকথা আর ওর কানে ঢুকল না।

দেওয়ালে একটা বারশিঙা হরিণের মুণ্ড দেওয়ালগিরির আলোয় মায়াময় দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল শিঙের ডালপালার মধ্যে বনের জ্যোৎস্না আটকে আছে। জ্বল-জ্বলে চোখে প্রাণীটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে বাতাসের ঘ্রাণ নিচ্ছে। শুকনো ডাল কারো অসাবধান হাতে নীচে পড়ে কচি ছেলের আঙুল মটকানোর মতো শব্দ হয়েছে বোধ হয় এক বিন্দু। অরণ্যের গোপন সংকেত। নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় উৎকর্ণ হয়ে থেমে আছে বারশিঙা।

সকলকে চমকে দিয়ে নিখিলই প্রথম কথা বলল, "ভূত কি সত্যিই আছে ?"

ঘরজোড়া ঢালাও বিছানায় শুয়ে রাতের খাবারের ডাকের জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা। কেউ ঘুমোয়নি। সারা দিনের ক্লান্তিতে কেমন একটা নিঝুম ভাব এসেছিল শরীরে। তাই কেউ কথা বলছিল না। আধবোজা চোখ থেকে-থেকে তন্দ্রার বুড়ি ছুঁয়ে ফিরে আসছিল ছেঁড়াখোড়া চিন্তার জালের মধ্যে।

লালু কয়েক সেকেণ্ড পরে উত্তর দিল, "এই বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যখন মহাশূন্যের পরদা সরিয়ে গ্রহে গ্রহে উঁকি মেরে বেড়াচ্ছে তখন এই ধরনের কুসংস্কার ভাবাই যায় না। এটা আমাদের দেশেই সম্ভব যেখানে বাটি চালান আর জেট প্লেন চালান সমান তালে চলেছে। আরে বাবা, তাবিজ কবচ আর ভূত প্রেতের দিন পঞ্চাশ বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে।"

মনোজ দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করল, "তা হলে কি তুই বলতে চাস প্ল্যানচেট ব্যাপারটাও বুজরুকি ? আত্মার ব্যাপারটা বাজে কথা ?"

পিকলু বলল, "আমি এমন সব অলৌকিক গল্প শুনেছি যা অবিশ্বাস করা শক্ত। যাঁদের মুখে শুনেছি তাঁরা মিথ্যে কথা বলার লোক না।"

লালু জোর গলায় বলল, "ও সব গপ্পো ! মন যখন দুর্বল হয় তখন জলপড়া তেলপড়াতেও বিশ্বাস হয়। আমি প্রুফ চাই। কেউ প্রমাণ দিতে পেরেছে আজ পর্যন্ত ?"

নিখিল আবার সবাইকে চমকে দিয়ে বলল, "ভূত আছে। আমি তার গন্ধ পেয়েছি। এখনো পাচ্ছি।"

লালু ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল, "তাই বল, নিখিল আমাদের ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছে। ভূতের গায়ে কী-রকম গন্ধ, অ নিখিল ?"

নিখিল কিছু বলার আগেই হঠাৎ দপ করে ঘরের আলো নিবে গেল।

যেন আলো নয়, তাদের তর্কটাই উত্তেজনার চূড়ায় উঠতে গিয়ে পা হড়কাল। দেওয়ালে তেলের বাতি দিব্যি জ্বলছিল। একটা দমকা হাওয়া না, তেল ফুরোনোর ওয়ার্নিং না, ঠিক বিজলী বাতি চলে যাওয়ার মতো চোখের পলকে আলো গেল। শুধু এই ঘর নয়, সমস্ত বাড়িটাই বুঝি ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে ডুবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নাকে সেই গন্ধটা, সেই সুঘ্রাণ তামাক পোড়ার গন্ধ, যেন এক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে কেউ পাইপ টানছে। আর এবার কেবল নিখিল নয়, চারবন্ধুই এক সঙ্গে চমকে উঠল। আর ওদের মনের সেই চমক ছুঁয়েই কেউ ঘরের মধ্যে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। কেউ নয়, দাদু ! এ-গলা সকলেরই চেনা।

"গন্ধটা এই রকম, তাই না, অ নিখিল ?" দাদু নাটুকে গলায় লালুর মুহূর্ত আগের কথাটা নকল করে যেন ফিরিয়ে দিলেন।

পিকলু চেঁচিয়ে উঠল, "ভারী অন্যায় ! তুমি কিন্তু আমাদের ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে দাদু !"

"কিসের ভয়।"

"ভূতের !" মনোজ বলল, "কখন ফিরলেন ?"

"এই তো।" দরজার ফ্রেমের মধ্যে দাদুর চেহারাটা একটা অন্ধকার আউটলাইনে ফুটে উঠল। আসলে চোখ সয়ে গেলে চারপাশের অন্ধকার যেমন কিছুটা জ্যালজেলে হয়ে যায়, খোলা দরজার কাছটা এখন সেই রকম। "তোমাদের গৃহযুদ্ধের কোলাহল শুনে দেখতে এলাম। তা আলোটা নেবাল কে ?"

ওরা সবাই বিছানার ওপর উঠে বসেছিল।

লালু যেন মনোজ আর নিখিলকে খোঁচা মেরে কথাটা বলল, "ভূতে।"

মেঝেতে বারকয়েক ঠুকঠুক শব্দ হল। ছড়ি ঠুকে-ঠুকে বিছানা আন্দাজ করে দাদু এগিয়ে এলেন। মনে হল ওদের থেকে খানিকটা তফাতে বিছানার ওপর বসেও পড়লেন।

"কিন্তু তুমি তো ভূতে বিশ্বাস কর না !"

"না, করি না।" লালু কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গেই জবাব দিল, "যা চোখে দেখা যায় না, আমার কছে তার অস্তিত্বই নেই।"

লালুর কথা শুনে দাদু হেসে উঠলেন শব্দ করে, "আমাকেও তো এখন দেখতে পাচ্ছ না, তাহলে ?"

এরকম একটা যুক্তি দেখানো হবে লালু যেন জানত, তাই বিছানার পাশ থেকে টর্চলাইটটা নিয়ে সে তৈরি হয়েই ছিল। আলো জ্বেলেই সে বলে উঠল, "কেন, এই তো আপনি—"

লালুর শেষ কথাটা টর্চের উজ্জ্বল আলোয় একটা আর্তনাদের মতো মোচড় খেয়ে থেমে গেল। বিছানার এক পাশে দাদুর ছড়ি আর ভাঁজকরা খবরের কাগজখানা শুধু পড়ে রয়েছে। দাদু নেই।

লিমেরিক

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

কেনারাম পেশকার, ভাঁজে রাগ দেশকার।
সকলে ভাবে দফারফা হবে শেষ কার?
হেঁকে বলে কেনারাম,
"সাধনার কী বা দাম,
হতে যদি না-ই পারি লতা মংগেশকার?"

২

রেলের গাড়ি চড়তে গিয়ে পিছলিয়ে পা আলুর দম,
প্ল্যাটফর্মেই কুমড়ো-গড়ান গড়ালেন শ্রীঅরিন্দম।
ধুলো ঝেড়ে বলেন হেসে,
"এ-সংসারে সব একপেশে,
নইলে কেন মিষ্টি পানে চুনটা ছিল বড্ড কম?"

খাপ্পায়ন

মৃণালকান্তি দাশ

আসুন, বসুন অবলাকান্ত,
সকালে আপনি লেবু-চা খান তো?
কফি হতে পারে আপনি চান তো।
ওরে হরি, ছুটে পাখাটা আন তো।
রাত্রে এখনও ঠুংরি গান তো?
আগের মতোই শ্রোতাও পান তো?
আপনি মশাই ভাগ্যবান তো।
সব-ই উপরঅলার দান তো।
পুলিশ খুঁজছে? আগে কে জানত!
পরে কফি হবে, বাড়ি পালান তো।
এখনও আমার মেজাজ শান্ত—
পিটটান দিন ভালটি চান তো।
পুলিশ ঢুকলে যাবেই মান তো—
আমি ভাল লোক মধু সামন্ত।

রোজনামচা

রাখাল বিশ্বাস

একটি সে ভোর ভোরবেলাতেই
দরজা খুলে ডাকলে পরে
মিষ্টি আলো যায় ছড়িয়ে
বইয়ের পাতায়, পড়ার ঘরে।
একটি দুপুর দুপুর রোদে
ঝলসে ওঠে মুখের কোণে
পথগুলো সব ছুটছে ফাঁকা
নেইকো রে গান মনের বনে।
একটি বিকেল বিকেল আনে,
চড়ুইভাতি, নাগরদোলা
একজোড়া চোখ সঙ্গে আছে
তাই ছুটে যাই যেদিক খোলা।
সন্ধ্যা এলেই ঘুমপরিরা
নাচ জুড়ে দেয় চোখের চুড়োয়
আর তখনই দেখছি দাদুর
অল্প কথার গল্প ফুরোয়।।

ছবি: অহিভূষণ মালিক

ছবি : দেবাশিস দেব

উপন্যাস

নৃসিংহ রহস্য

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সকালবেলায় দুধ দিতে এসে গয়লা রামরিখ বলল, "এ-রাজ্যিতে আর থাকা যাবে না মা। কাল রাতে গয়েশবাবু খুন হয়েছে। লাশটা নদীতে ভাসছে। মুণ্ডুটা ঝুলছে সতুবাবুদের পোড়োবাড়ির পিছনে একটা শিমুলগাছে। সেই গাছটা থেকেই রোজ গহিন রাতে দুটো সাদা ভূত নেমে এসে আমার ছেলে রামকিশোরকে ভয় দেখায়। সেই দুটো ভূতই রোজ আমার দুটো গোরু আর একটা মোষের দুধ আধাআধি দুয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে। রোজ আজকাল তাই দুধ কম হচ্ছে। গাহেক ঠিক রাখতে তাই কিছু-কিছু জল মিশাতে হয় দুধে। দোষ ধরবেন না। তা ছিল দুটো ভূত। গয়েশবাবুকে নিয়ে হবে তিনটে। কাল থেকে দুধ আরো কমে যাবে। আরো জল মিশাতে হবে। তার চেয়ে আমি ভাবছি, গোরু-মোষ বেচে দিয়ে দেশে চলে যাব।"

রামরিখের কথাটা খুব মিথ্যেও নয়। আবার পুরোপুরি সত্যিও নয়। সাণ্টুর মা কুমুদিনী দেবী দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে দেখলেন, দুধে আজ জলটা কিছু বেশিই। গয়েশবাবুর ভূত এখনো দুধ খেতে শুরু করেনি বোধহয়। কিন্তু রামরিখ আগাম সাবধান হচ্ছে।

দুধ জ্বালে বসিয়ে কুমুদিনী দেবী বাড়ির সবাইকে ঠেলে তুললেন। "ওরে ওঠ তোরা, তুমিও ওঠো গো! কী সব্বোনেশে কাণ্ড শোনো। গয়েশবাবু নাকি খুন হয়েছেন।"

বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সাণ্টুর বাবা সুমন্তবাবু খুন শুনে বিছানা থেকে নামার সময় মশারিটা তুলতে ভুলে গেছেন। মশারি সুদ্ধ যখন নামলেন তখন তাঁর জালে-পড়া বোয়ালমাছের মতো অবস্থা। মশারি জড়িয়ে কুমড়ো-গড়াগড়ি খাচ্ছেন মেঝেয়।

সাণ্টুর দিদি কমলা "ওরে মা রে" বলে ভাল করে লেপে মুখ ঢেকে চোখ বুজে রইল।

ঠাকুমা ঠাকুরঘরে জপের মালা ঘোরাচ্ছিলেন। তিনিই শুধু শান্তভাবে বললেন, "গণেশ চুন খেয়েছে, এটা আর এমন কী একটা খবর! সাতসকালে চেঁচামেচি করে বউমা আমার জপটাই নষ্ট করলে।"

সাণ্টু বাবা আর মায়ের মাঝখানে শোয়। ঘুম ভেঙে সে দেখল, বাবা পুরো মশারিটা টেনে নিয়ে মেঝেয় পড়ে কাতরাচ্ছে। দৃশ্যটা তার খুব খারাপ লাগল না। খবরটাও নয়। আজ সকালে বাবা তার জ্যামিতির পরীক্ষা নেবেন বলে কথা আছে। গোলেমালে যদি সেটা হরিবোল হয়ে যায়।

বাইরের দিকের ঘরে সাণ্টুর জ্যাঠতুতো দাদা মঙ্গল ঘুমোয়। সে কলেজে পড়ে, ব্যায়াম করে, আর দেশের কাজ করতে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাবে বলে বাড়ির সবাইকে মাঝে-মাঝে শাসায়। সে সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "বড়কাকা, যদি ভাল চাও তো এ-শহর ছেড়ে কলকাতায় চলো। এখানে একে-একে সবাই খুন হবে। তুমি আমি সবাই। গয়েশবাবু তিন নম্বর ভিকটিম।"

মশারির জাল থেকে বেরিয়ে সুমন্তবাবু গোটাকয় বুকডন আর বৈঠক দিয়ে নিলেন। এক কালে ব্যায়াম করতেন। বহুকাল ছেড়ে দিয়েছেন। খুন শুনে হঠাৎ ঠিক করলেন, শরীরটাকে মজবুত রাখা চাই। সাণ্টুকেও তুলে দিলেন, "ওঠ, ওঠ। ব্যায়ামে শরীর শক্তিশালী হয়, শয়তান-বদমাশদের টিট রাখা যায়। ওঠ, ব্যায়াম কর।"

জ্যামিতির বদলে ব্যায়াম সাণ্টুর তেমন খারাপ বলে মনে হল না। সে উঠে পড়ল।

বাড়িতে খবরটা দিয়ে কুমুদিনী বেরোলেন পাড়ায় খবরটা প্রচার করতে। দারুণ খবর। সকলেই অবাক হয়ে যাবে।

পাশের বাড়ির আগড় ঠেলে ঢুকতেই দেখেন মুখুজ্যে-বাড়ির বুড়ি ঠাকুমা রোদে বসে নাতির কাঁথা সেলাই করতে করতে বকবক করছেন আপনমনে।

কুমুদিনী ডাকলেন, "ও ঠাকুমা, খবর শুনেছেন?"

ঠাকুমা মুখ তুলে একগাল হেসে বলেন, "গয়েশের খবর তো! সে-খবর বাছা সেই কাকভোরেই ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়েটা এসে বলে গেছে। কী কাণ্ড! গয়েশের মুণ্ডুটা নাকি—"

"হ্যাঁ, সতুবাবুদের পোড়োবাড়ির শিমুলগাছে।"

"আর ধড়টা—।"

"নদীতে ভাসছে।"

মুখুজ্যে-ঠাকুমা বিরক্ত হয়ে বলেন, "আঃ, আজকালকার মেয়ে তোমরা বড্ড কথার পিঠে কথা বলো। বুড়ো মানুষের একটা সম্মান নেই? কথাটা শেষ করতে দেবে তো।"

কুমুদিনী দেবীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। খবরটা তাহলে সবাই পেয়ে গেছে!

বাড়িতে ফিরে এসে কুমুদিনী দেখেন, দুধ পুড়ে ঝামা। সুমন্তবাবু আর সাণ্টু বুকডন আর বৈঠকির পর এখন মশারির দড়ি খুলে নিয়ে স্কিপিং করছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তত্ত্বাবধান করছে মঙ্গল। কমলা লেপ মুড়ি দিয়ে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে। রেগে গিয়ে ভারী চেঁচামেচি করতে লাগলেন কুমুদিনী দেবী। "একটা মিনিট চোখের আড়ালে গেছি কি দুধ পুড়ে ঝামা হয়ে গেল! বলি এতগুলো লোক বাড়িতে, কারো কি চোখ নেই, নাকি নাকে পোড়া গন্ধটাও যায় না কারো!"

এই সময়ে ঝি পদ্ম কাজ করতে আসায় কুমুদিনী থেমে গেলেন। পদ্ম চোখ কপালে তুলে বলল, "ও বউদি, শুনেছ?"

কুমুদিনী একগাল হেসে বললেন, "শুনিনি আবার! গয়েশবাবুর মুণ্ডুটা—"

"হ্যাঁ গো, সতুবাবুদের শিমুল গাছে ঝুলছে।"

"আর ধড়টা—।"

"হ্যাঁ গো, নদীতে ভাসছে।"

কুমুদিনী বিরক্ত হয়ে বলেন, "তোমাদের জ্বালায় বাপু কথাটা শেষ করার উপায় নেই। 'ক' বলতেই তোমরা কেষ্ট বোঝো। নাও তো, মেলা বেলা হয়েছে, কাজে হাত দাও।"

সুমন্তবাবু সাণ্টু আর মঙ্গলকে নিয়ে সরেজমিনে ঘটনাটা দেখতে বেরোলেন। রাস্তায় বেরিয়েই বললেন, "হাঁটবে না। দৌড়োও। দৌড়োলে একসারসাইজ হয়, তাড়াতাড়ি পৌঁছনোও যায়। কুইক! রান!"

তিনজন দৌড়োতে থাকে। মাঝে-মাঝে থেমে সুমন্তবাবু দুহাত চোঙার মতো মুখের কাছে ধরে টারজানের কায়দায় হাঁক মারেন, "গয়েশবাবু খু-উ-ন!" খবরটা প্রচারও তো করা চাই।

২

সকালবেলাতেই কবি সদানন্দ মহলানবিশ এসে হাজির। বগলে কবিতার খাতা। ডান হাতে মজবুত একটা ছাতা। বাঁ হাতে বাজারের ব্যাগ।

কবি সদানন্দকে দেখলে সকলেই একটু তটস্থ হয়ে পড়ে। মুশকিল হল, সদানন্দর কবিতা কেউ ছাপতে চায় না। কিন্তু না ছাপলেও কবিতা যাকে একবার ধরেছে তার পক্ষে কি আর কবিতা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব? সদানন্দও তাই কবিতা লেখা ছাড়েনি। একটু বুঝদার লোক বলে যাকে মনে হয় তাকেই ধরে কবিতা শুনিয়ে দেয়। ফুচুর জ্যাঠামশাই বলেন, "সদাটার আর সব ভাল, কেবল কবিতা শোনানোর বাতিকটা ছাড়া।"

সকালে কাছারি-ঘরে বসে ফুচুর জ্যাঠামশাই পাটের গুছি পাকিয়ে গোরুর দড়ি তৈরি করছিলেন। সদানন্দকে দেখে একটু আঁতকে উঠে বললেন, "ঐ যাঃ, একদম ভুলেই গেছি, আজ সকালে আমার একবার সদাশিব কবরেজের বাড়ি যেতে হবে। গোপালখুড়োর এখন-তখন অবস্থা। নাঃ, এক্ষুনি যেতে হচ্ছে।"

সদানন্দ কবি হলেও কবির মতো দেখতে নয়। রীতিমত ঘাড়ে-গর্দানে চেহারা। শোনা যায় কুস্তি আর পালোয়ানিতে একসময়ে খুব নাম ছিল। তার মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গায়ে মোটা কাপড়ের একটা হাফ-হাতা শার্ট, পরনে ধুতি। চোখের দৃষ্টি খুব আনমনা। আজ তাকে আরো আনমনা দেখাচ্ছে। মুখটা একটু বেশি শুকনো। চোখে একটা আতঙ্কের ভাব। ফুচুর জ্যাঠামশাইয়ের দিকে চেয়ে সদানন্দ ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে, "ব্যস্ত হবেন না। গোপালখুড়ো আজ একটু ভাল আছে। সদাশিব কবিরাজ গেছে ভিনগাঁয়ে রুগি দেখতে। আর—আর আমি আজ আপনাকে কবিতা শোনাতে আসিনি।"

ফুচুর জ্যাঠামশাই গঙ্গাগোবিন্দ একটা আরামের শ্বাস ফেলে বলেন, "তাই নাকি? তা-তাহলে বরং—"

"হ্যাঁ, একটু বসি। আপনি নিশ্চিন্তে দড়ি পাকাতে থাকুন। আমি এসেছি একটা সমস্যায় পড়ে।"

"কী সমস্যা বলো তো!"

"আপনি তো সায়েন্সের ছাত্র শুনেছি।"

"ঠিকই শুনেছ। বঙ্গবাসীতে বি এসসি পড়তাম। স্বদেশী করতে গিয়ে আর পরীক্ষাটা দিইনি। তবে আই এসসি-তে রেজাল্ট ভাল ছিল। ফার্স্ট ডিভিশন, উইথ দুটো লেটার।"

"বাঃ। তাহলে আপনাকে দিয়ে হবে। আচ্ছা, আলোকবর্ষ কথাটার মানে কী বলুন তো।"

"ও, ওটা হল গিয়ে ইয়ে," বলে ফুচুর জ্যাঠামশাই একটু ভাবেন।

তারপর বলেন, "আমাদের আমলে সায়েন্সে রবিঠাকুর পাঠ্য ছিল না।"

কবি সদানন্দ বিরক্ত হয়ে বলে, "এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসছে কোত্থেকে ? আলোকবর্ষ কথাটার মানে জানতে চাইছি।"

"ডিকশনারিটা দেখলে হয়। তবে মনে হচ্ছে যে-বছরটায় বেশ আলো-টালো হয় আর কী, আই মিন এ গুড ইয়ার।"

সদানন্দ বিরস মুখে বলে, "এ-শহরে কলকাতা থেকে একটি অতি ফাজিল ছেলের আমদানি হয়েছে। আমাদের পরেশের ভাগ্নে। কাল নতুন একটা কবিতা লিখলাম। পরেশকে শোনাতে গেছি সন্ধেবেলা। একটা লাইন ছিল, 'শত আলোকবর্ষ পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল হে বিধাতা ...'। ছোকরা সঙ্গে-সঙ্গে হাঃ হাঃ করে হেসে বলে উঠল, আলোকবর্ষ কোনো বছর-টছর নয় মশাই, ওটা হল গিয়ে দূরত্ব।"

জ্যাঠামশাই দড়ি পাকানো বন্ধ রেখে চোখ পাকিয়ে বলল, "বলেছে ?"

"বলেছে। অনেকক্ষণ ছোকরার সঙ্গে তর্ক হল। রাত্তিরে গেলুম হাইস্কুলের চণ্ডীবাবুর কাছে। সায়েন্সের টীচার। খবর-টবর রাখেন। তা তিনিও মিনমিনিয়ে যা বললেন তার অর্থ, ছোকরা নাকি খুব ভুল বলেনি। আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল ..."

"আমাদের আমলে বিরাশি ছিল। এখন তাহলে বেড়েছে।" ফুচুর জ্যাঠামশাই গম্ভীর হয়ে বলেন।

"তা বাড়তেই পারে। চাল-ডালের দাম বাড়ছে, মানুষের নির্বুদ্ধিতা বাড়ছে, আলোর গতি বাড়লে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সেই গতিতে ছুটে এক বছরে আলো যতটা দূরে যায় ততটা দূরত্বকেই নাকি বলে আলোকবর্ষ।"

"বাব্বাঃ ! পাল্লাটা তাহলে কতটা দাঁড়াচ্ছে ?"

"সাতানব্বই হাজার সাতশ একষট্টি কোটি ষাট লক্ষ মাইল।"

ফুচুর জ্যাঠামশাই একটু ভাবিত হয়ে বলেন, "উহুঁ উহুঁ ! অত হবে না। আমাদের আমলে আরও কিছু কম ছিল যেন ! ষাট নয়, বোধহয় চুয়ান্ন লক্ষ মাইল।"

সদানন্দ খেঁকিয়ে উঠে বলে, "ছ' লক্ষ মাইল না হয় ছেড়েই দিলাম মশাই, কিন্তু প্রশ্নটা তো তা নয়। কবিতাটার কী হবে ?"

"ওটা তো ভালই হয়েছে। আলোর দৌড়ের সঙ্গে কবিতার কী সম্পর্ক ?"

"কথাটা কি তাহলে ভুল ? শত আলোকবর্ষ পরে কি দেখা হওয়াটা অসম্ভব ? আলোকবর্ষ যদি টাইম ফ্যাকটরই না হয়, তাহলে তো খুবই মুশকিল।"

ফুচুর জ্যাঠামশাই একটু ভেবে বলে ওঠেন, "এক কাজ করো। ওটা বরং 'শত আলোকবর্ষ ঘুরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল হে বিধাতা ...' এরকম করে দাও। ল্যাঠা চুকে যাবে, কেউ আর ভুল ধরতে পারবে না। সায়েন্সও মরল, কবিতাও ভাঙল না।"

হঠাৎ সদানন্দর মুখ উজ্জ্বল হল। বলল, "এই না হলে সায়েন্সের মাথা ! বাঃ, দিব্যি মিলে গেছে। শত আলোকবর্ষ ঘুরে ...বাঃ !"

ঠিক এই সময়ে নাপিতভায়া নেপাল ফুচুর জ্যাঠামশাইয়ের দাড়ি চাঁচতে এল। মুখ গম্ভীর। জল দিয়ে গালে সাবান মাখাতে-মাখাতে খুব ভারী গলায় বলল, "ঘটনা শুনেছেন ? ওঃ কী রক্ত ! কী রক্ত ! গয়েশবাবু ! বুঝলেন ! আমাদের তেলিপাড়ার গয়েশবাবু—"

ঠিক এই সময়ে পাশের রাস্তা দিয়ে তিনটে ছোট-বড় মূর্তি দৌড়ে এল। নেপাল ক্ষুর হাতে একটু আঁতকে উঠেছিল। মূর্তি তিনটে থেমে গেল। একজন মোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "গয়েশবাবু খু-উ-ন ! গয়েশবাবু খু-উ-ন !" তারপর আবার দৌড়ে চলে গেল।

"গয়েশ খুন হয়েছে ? অ্যাঁ !" ফুচুর জ্যাঠামশাই গঙ্গাগোবিন্দ হাঁ করে রইলেন। গয়েশ তাঁর দাবার পার্টনার ছিল যে !

নেপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সে নাহয় হল। কিন্তু সুমন্তবাবুর আক্কেলটা দেখলেন। একটা গুহ্য খবর আস্তে আস্তে ভাঙছি, উনি হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে চলে গেলেন।"

৩

কিন্তু মুশকিল হল, গয়েশবাবুর লাশটা নদী থেকে তোলার পর দেখা গেল, সেটা মোটেই গয়েশবাবু বা আর কারো লাশ নয়। সেটা একটা গোড়াকাটা কলাগাছ। আর সতুবাবুদের গা-ছমছমে পোড়োবাড়িটার পিছনের জঙ্গলে-ছাওয়া বাগানে শিমুলগাছের ডালে যেটা ঝুলে ছিল, সেটাও গয়েশবাবুর মুণ্ডু নয়। ভাল গাছ বাইতে পারে বলে ফুচুকেই সবাই ঠেলে তুলেছিল গাছে। সে অনেক আগাছা, লতানে গাছ আর শিমুলের পাতার আড়াল ভেদ করে মগডালের কাছাকাছি পৌঁছতেই গোটাকয় মৌমাছি তেড়ে এসে হুল দিল। ফুচু বড়-বড় চোখে চেয়ে দেখল, ডাল থেকে গয়েশবাবুর মুণ্ডু তার দিকে চেয়ে দাঁত খিচোচ্ছে না, বরং লম্বা দাড়িওলা শান্ত একটা মুখের মতো ঝুলে আছে একটা মৌচাক।

তাহলে গয়েশবাবুর হল কী ?

লোকে গয়েশবাবুকে জানে অতি শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট মানুষ বলে। তিনি শান্ত লোক ছিলেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর ব্যবহারও ছিল অতি শিষ্ট। কিন্তু তাঁর লেজ নিয়ে মতান্তর আছে। অনেকেই বলে, "গয়েশবাবুর লেজ আছে। আমার ঠাকুর্দার নিজের চোখে দেখা। সন্ধেবেলা ঘরের দাওয়ায় নিরিবিলিতে বসে তিনি লেজ দিয়ে মশা তাড়ান।" আবার অনেকের ধারণা—লেজের কথাটা স্রেফ গাঁজা, ছেলেবেলায় খুব দুষ্টু ছিলেন বলে মাস্টারমশাইরা তাঁর লেজ কল্পনা করেছিলেন, সেই থেকে কথাটা চালু হয়ে গেছে।

কিন্তু এখন গয়েশবাবুও নেই, তাঁর লেজও দেখা যাচ্ছে না।

বানর থেকে মানুষের যে বিবর্তন, সেই ধারায় একটা শূন্যস্থান আছে। নৃতত্ত্ববিদরা সেই শূন্যস্থানের নাম দিয়েছেন মিসিং লিংক। কলেজের বায়োলজির অধ্যাপক মৃদঙ্গবাবুর খুব আশা ছিল, গয়েশবাবুকে দিয়ে সেই মিসিং লিংক সমস্যার সমাধান হবে। হয়তো বা লেজবিশিষ্ট মানুষের প্রথম সন্ধান দিয়ে তিনিই নোবেল প্রাইজ পেয়ে যাবেন।

মৃদঙ্গবাবু প্রথমে খুনের খবরটা পেয়ে হায় হায় করে বুক চাপড়াতে লাগলেন। এমন-কী এই শীতে গয়েশবাবুর লাশ তুলতে তিনিই প্রথম নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঝাঁপিয়ে পড়ার পর তাঁর খেয়াল হল, ঐ যাঃ ! তিনি যে সাঁতার জানেন না ! যখন বিস্তর জল ও নাকানি-চোবানি খাওয়ার পর তাঁকে তোলা হল তখনো গয়েশবাবুর জন্য তিনি শোক করছিলেন। পরের জন্য মৃদঙ্গবাবুর এমন প্রাণ কাঁদে দেখে সকলেই তাঁর খুব প্রশংসা করছিল আজ। যাই হোক, ধড় বা মুণ্ডু কোনোটাই গয়েশবাবুর নয় জেনে মৃদঙ্গবাবু বাড়ি ফিরে গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়েছেন।

সমস্যাটা মৃদঙ্গবাবুকে নিয়ে নয়, গয়েশবাবুকে নিয়ে। এই শান্তশিষ্ট এবং বিতর্কিত-লেজবিশিষ্ট মানুষটির নিকট-আত্মীয় বলতে কেউ নেই। পশ্চিম ভারতের কোথাও তিনি চাকরি করতেন। মেলা টাকা করেছেন। অবশেষে একটু বয়স হওয়ার পর দেশের জন্য প্রাণ কাঁদতে থাকায় চলে এসে পৈতৃক আমলের বাড়িটায় একাই থাকতে লাগলেন। খুব বাগানের শখ ছিল। জ্যোতিষবিদ্যে জানা ছিল। ভাল দাবা খেলতে পারতেন। ছোটখাটো ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি ছিল। তবে মাঝে-মাঝে কোনো লোককে দেখে অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে ফেলতেন। কিন্তু অদ্ভুত শোনালেও কথাগুলির গূঢ় অর্থ আছে বলে অনেকের মনে বিশ্বাস আছে।

এলাকার বিখ্যাত ঢোলক-বীর হল গোবিন্দ। তার ভাই জয়কৃষ্ণ ভাল ঢাক বাজায়। ফলে গোবিন্দর নাম হয়ে গেছে ঢোলগোবিন্দ আর জয়কৃষ্ণকে আদর করে ডাকা হয় জয়ঢাক বলে। সেবার ঈশানী কালীবাড়িতে বিরাট করে কালীপুজো হচ্ছে। কালীর গায়ে খাঁটি সোনার একশো আট ভরি গয়না। সকাল বেলা দেখা গেল একটা মটরদানা হার আর একজোড়া রতনচূড় নেই। হৈ-চৈ পড়ে গেল চার ধারে। দারোগা-পুলিশে ছয়লাপ। মণ্ডপের সকলকে ধরে সার্চ করা হল। পাওয়া গেল না। লোকজন কিছু সরে গেলে গয়েশবাবু ঢোলগোবিন্দের কাছে গিয়ে ভারী নিরীহ গলায় বললেন, "ঢোলের

আকাশ-পাতাল ভাবলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, আগের রাতে যে কবিতাটা লিখেছেন, তাতে এক জায়গায় আশীবিষের সঙ্গে কিসমিস মিল দিয়েছেন। মিলটা দেওয়ার সময় মনটায় খটকা লেগেছিল ঠিকই, কিন্তু তখন ওটা গোঁজামিল বলে ধরতে পারেননি। গয়েশবাবুর ইঙ্গিতে ধরতে পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ কিসমিস কেটে সে-জায়গায় অহর্নিশ বসিয়ে কবিতার খাতা বগলে নিয়ে ছুটলেন গয়েশবাবুর বাসায়।

মৃদঙ্গবাবুকেও একবার জব্দ করেছিলেন গয়েশবাবু। হয়েছে কী, গয়েশবাবুর লেজের কথা কানাঘুষোয় শুনে মৃদঙ্গবাবু প্রায়ই রাস্তাঘাটে তাঁর পিছু নিতেন। অবশ্য খুবই সন্তর্পণে এবং গোপনে। যদি হঠাৎ কখনো লেজটার কোনো আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একদিন হরিহরবাবুর চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় দুজনে একসঙ্গেই যাচ্ছিলেন। অভ্যাসবশে মৃদঙ্গবাবু মাঝে-মাঝে গয়েশবাবুর লেজ খুঁজতে আড়চোখে চাইছেন। এমন সময় গয়েশবাবু হঠাৎ থমকে গিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "মৃদঙ্গবাবু! আছে! আছে!"

"আছে?" বলে মৃদঙ্গবাবু স্থানকালপাত্র ভুলে "হুররে" বলে লাফিয়ে উঠলেন।

গয়েশবাবু তখন আরো চাপা স্বরে বললেন, "কাউকে বলবেন না কথাটা।"

মৃদঙ্গবাবু আহ্লাদের গলায় বললেন, "আরে না, না। তবে একবারটি যদি চোখের দেখা দেখিয়ে দেন তবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়।"

মধ্যেই গোল হে।" তারপর জয়ঢাকের কাছে গিয়ে এক গাল হেসে বললেন, "ঢাকেই যত ঢাকগুরগুর।" এ-কথায় দুই ভাই খুব গম্ভীর আর মনমরা হয়ে গেল হঠাৎ। ঘন্টা দুই বাদে ঈশানীকালীর সিংহাসনের পিছনে খোয়া-যাওয়া গয়না ফিরে এল। সকলেই বুঝল, গয়েশবাবুর কথা এমনিতে অর্থহীন মনে হলেও যার বোঝার সে ঠিকই বুঝেছে আর ভয় খেয়ে গয়নাও ফেরত দিয়েছে।

একদিন বাজারের রাস্তায় গয়েশবাবু কবি সদানন্দকে বলেছিলেন, "কাজটা ভাল করেননি।"

"কোন্ কাজটা?"

"কাজটা ঠিক হয়নি সদানন্দবাবু। এর বেশি আমি আর ভেঙে বলতে পারব না।"

গয়েশবাবুর এ-কথায় সদানন্দ মহা মুশকিলে পড়ে আধবেলা ধরে

গয়েশবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "দেখাব? না, না, তাহলে সবাই টের পেয়ে যাবে। দেখানোর দরকার নেই। শুধু জেনে রাখুন, লোকটা এখানেই আছে।"

"লোকটা? লোকটা না লেজটা? ঠিক করে বলুন তো আর একবার গয়েশদা। ছেলেবেলায় একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলুম। সেই থেকে বাঁ কানে একটু কম শুনি।"

"লেজ!" গয়েশবাবু আকাশ থেকে পড়ে বলেন, "লেজ কোথায়? লেজের কথা বলিনি। সেই লোকটার কথা বলছি। সে-ই যে লোকটা।"

কিন্তু তখন মৃদঙ্গবাবুর কৌতূহল নিভে গেছে। কোনো লোক নিয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। লোকেরা সব বেয়াদব, বেয়াড়া, বিচ্ছিরি। তবে হ্যাঁ, লেজওয়ালা কোনো লোক পেলে তাকে তিনি মাথায় করে রাখতে রাজি। মৃদঙ্গবাবু তাই নিস্তেজ গলায় বললেন, "কোন্ লোকটা?"

গয়েশবাবু মিটমিট করে একটু হাসছিলেন। বললেন, "সে-কথা পরে। কিন্তু আগে বলুন তো, লেজের কথাটা আপনার মাথায় এল কেন? কিসের লেজ?"

মৃদঙ্গবাবু লজ্জা পেয়ে আমতা-আমতা করতে লাগলেন, খোলাখুলি কথাটা বলাও যায় না। গয়েশবাবু চটে যেতে পারেন। তাই তিনি ভণিতা করতে লাগলেন, "আসলে কী জানেন গয়েশদা, কিছুদিন যাবৎ আমি লেজের উপকারিতা নিয়ে ভাবছি। ভেবে দেখলাম, লেজের মতো জিনিস হয় না। বেশির ভাগ জীবজন্তুরই লেজ আছে, শুধু মানুষের লেজ না থাকাটা ভারী অন্যায়। লেজ দিয়ে মশা-মাছি তাড়ানো যায়, নিজের পিঠে সুড়সুড়ি দেওয়া যায়, লেজে খেলানো যায়, লেজ গুটিয়ে পালানো যায়। ভেবে দেখুন, আজ মেয়েদের কত এক্সট্রা গয়না পরার স্কোপ থাকত লেজ হলে।"

গয়েশবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "খুব খাঁটি কথা। তা আমি যে-লোকটার কথা বলছি, কী বলব আপনাকে, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, সেই লোকটারও লেজ আছে। শুধু আছে নয়, সে রীতিমত আমাকে লেজে খেলাচ্ছে বেশ-কিছুদিন ধরে।"

মৃদঙ্গবাবু "অ্যাঁ?" বলে চোখ বিস্ফারিত করেন। "বলেন কী দাদা, তাহলে কি উলটো বিবর্তন ঘটতে শুরু করল নাকি? জনে-জনে লেজ দেখা দিলে তো—"

এরপর গয়েশবাবু আর কথা বাড়াতে চাননি। মৃদঙ্গবাবুর বিস্তর চাপাচাপিতেও না।

কিন্তু মৃদঙ্গবাবু খুব ভাবিত হয়ে পড়লেন। শুধু এই ছোট গঞ্জ-শহরেই যদি দু'দুটো লেজওলা লোকের আবির্ভাব ঘটে থাকে, তবে পৃথিবীতে না জানি আরো কত লক্ষ লোকের লেজ দেখা দিয়েছে এতদিনে। বিবর্তনের চাকা উলটো দিকে ঘোরে না বড়-একটা। তবে ইংরিজিতে একটা কথা আছে, হিস্টরি রিপিটস ইটসেলফ। সুতরাং কিছুই বলা যায় না। তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

লেজের কথা আর কিছু জানা যায় না।

তবে গয়েশবাবু একদিন সন্ধেবেলায় দাবা খেলার সময় ফুচুর জ্যাঠামশাই গঙ্গাগোবিন্দকে বলেছিলেন, "রুইতনটা দেখলেই বোঝা যায়।"

গঙ্গাগোবিন্দ গয়েশবাবুর একটা বিপজ্জনক আগুয়ান বোড়েকে গজ দিয়ে চেপে দিতে যাচ্ছিলেন। থেমে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, "রুই ? তা কত করে নিল ?"

"রুই নয়। রুইতন।"

গঙ্গাগোবিন্দ শশব্যস্তে দাবার ছকের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, "রুইতন ? বলো কী ? এতক্ষণ তবে কি আমরা বসে-বসে তাস খেলছি ? দাবা নয় ? এঃ, সেটা এতক্ষণ বলোনি কেন ?"

গয়েশবাবু একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "না, আমরা দাবাই খেলছি। কিন্তু রুইতনের কথাটা ভুলতে পারছি না।"

গঙ্গাগোবিন্দ দাবা খেলতে বসলে এতই মজে যান যে, দুনিয়ার কিছুই আর মনে থাকে না। খেলার পরেও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। আর যতক্ষণ তা ফিরে না আসে, ততক্ষণ তিনি লোকের কথাবার্তার অর্থ বুঝতে পারেন না, জল আর দুধের তফাত ধরতে পারেন না, তারিখ মাস বা দিন পর্যন্ত মনে পড়ে না তাঁর। তাই তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, "ভুলতে পারছ না ! কী মুশকিল !"

গয়েশবাবু মোলায়েম স্বপ্নে বললেন, "রুইতন বটে, তবে তাসের রুইতন নয়। একটা লোকের বাঁ হাতের তেলোয় মস্ত একটা রুইতন আছে। দেখলেই চিনবেন। পাঞ্জাব থেকে পিছু নিয়েছিল। মোগলসরাইতে চোখে ধুলো দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঠিক খুঁজে বের করেছে আমাকে।"

গঙ্গাগোবিন্দ চোখ বুজে বললেন, "আর একবার বলো। বুঝতে পারিনি।"

গয়েশবাবু আবার বললেন।

গঙ্গাগোবিন্দ চোখ খুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আজকাল চারদিকে ভাল-ভাল লোকগুলোর কেন যে মাথা বিগড়ে যাচ্ছে।"

গয়েশবাবু আর একটাও কথা বললেন না। শুধু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এখন গয়েশবাবু গায়েব হওয়ার পর সেইসব কথা সকলের মনে পড়তে লাগল।

৪

পরদিন দারোগা বজ্রাঙ্গ বোস তদন্তে এলেন। খুবই দাপুটে লোক। লম্বা-চওড়া চেহারা। প্রকাণ্ড মিলিটারি গোঁফ। ভূত আর আরশোলা ছাড়া পৃথিবীর আর কাউকেই ভয় পান না। তিনি এ-অঞ্চলে বদলি হয়ে আসার আগে এখানে চোর আর ডাকাতদের ভীষণ উৎপাত ছিল। কেলো, বিশে আর হরি ডাকাতের দাপটে তল্লাট কাঁপত। গুণধর, সিধু আর পটলা ছিল বিখ্যাত চোর। এখন সেই কেলো আর বিশে বজ্রাঙ্গ বোসের হাত-পা টিপে দেয় দু'বেলা। হরি দারোগাবাবুর স্নানের সময় গায়ে তেল মালিশ করে। গুণধর কুয়ো থেকে জল তোলে, সিধু দারোগাবাবুর জুতো বুরুশ করে আর পটলা বাগানের মাটি কুপিয়ে দেয়।

বজ্রাঙ্গ বোস গয়েশবাবুর বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখলেন। বিরাট বাড়ি। সামনে এবং পিছনে মস্ত বাগান। তবে সে-বাগানের যত্ন নেই বলে আগাছায় ভরে আছে। নীচে আর ওপরে মিলিয়ে দোতলা বাড়িটাতে খান আষ্টেক ঘর। তার বেশির ভাগই বন্ধ। নীচের তলায় শুধু সামনের বৈঠকখানা আর তার পাশের শোবার ঘরটা ব্যবহার করতেন গয়েশবাবু। বৈঠকখানায় পুরনো আমলের সোফা, কৌচ, বইয়ের আলমারি, একটা নিচু তক্তপোশের ওপর ফরাস পাতা, তার ওপর কয়েকটা তাকিয়া। শোবার ঘরে মস্ত একটা বাহারি খাট, দেওয়াল আলমারি, জানালার ধারে লেখাপড়ার জন্য টেবিল চেয়ার। জল রাখার জন্য একটা টুল রয়েছে বিছানার পাশে। খাটের নীচে গোটা দুই তোরঙ্গ। সবই হাঁটকে-মাটকে দেখলেন বজ্রাঙ্গ। তেমন সন্দেহজনক কিছু পেলেন না।

গয়েশবাবুর রান্না ও কাজের লোক ব্রজকিশোর হাউমাউ করে কেঁদে বজ্রাঙ্গর মোটা-মোটা দু'খানা পা জড়িয়ে ধরে বলে, "বড়বাবু, আমি কিছু জানি না।"

বজ্রাঙ্গ বজ্রাদপি কঠোর স্বরে বললেন, "কী হয়েছিল ঠিক ঠিক বল।"

ব্রজকিশোর কাঁধের গামছায় চোখ মুছে বলল, "আজ্ঞে, বাবু রাতের খাওয়ার পর একটু পায়চারি করতে বেরোতেন। হাতে টর্চ আর লাঠি থাকত। সেদিনও রাত দশটা নাগাদ বেরিয়েছিলেন। বাবু ফিরলে তবে আমি রোজ শুতে যাই। সেদিনও বাবুর জন্য বসে ছিলাম। সামনের বারান্দায় বসে ঢুলছি আর মশা তাড়াচ্ছি। করতে-করতে রাত হয়ে গেল। বড় ঘড়িতে এগারোটা বাজল। তারপর বারোটা। আমি ঢুলতে-ঢুলতে কখন গামছাখানা পেতে শুয়ে পড়েছি আজ্ঞে। মাঝরাতে কে যেন কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, 'এখনো ঘুমোচ্ছিস আহাম্মক ? গয়েশবাবুকে যে কেটে দুখানা করে ধড়টা নদীর জলে ভাসিয়ে দিল আর মুণ্ডুটা ঝুলিয়ে দিল গাছে।' সে-কথা শুনে আমি আঁতকে জেগে উঠে দেখি সদর দরজা খোলা। বাবু তখনো ফেরেনি। তখন ভয় খেয়ে আশপাশের লোকজন ডেকে দু'চারজনকে জুটিয়ে বাবুকে খুঁজতে বেরোই। ভোররাতের আলোয় ভাল ঠাহর পাইনি বড়বাবু, তাই নদীর জলে যা ভাসছিল সেটাকেই বাবুর ধড় আর গাছের ডালে যেটা ঝুলছিল সেটাকেই বাবুর মুণ্ডু বলে ঠাহর হয়েছিল আমাদের। কিন্তু বাবুর যে সত্যি কী হয়েছে তা জানি না।"

বজ্রাঙ্গ ধমক দিয়ে বলেন, "টর্চ আর লাঠির কী হল ?"

ব্রজকিশোর জিব কেটে নিজের কান ছুঁয়ে বলল, "একেবারে মনে ছিল না আজ্ঞে। হ্যাঁ, সে দুটো আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি, টর্চটা নদীর ধারে পড়ে ছিল, লাঠিটা সেই অলক্ষুনে শিমুলগাছের তলায়।"

"আর লোকটা নিরুদ্দেশ ?"

"আজ্ঞে।"

কথাবার্তা হচ্ছে সামনের বারান্দায়। বজ্রাঙ্গ চেয়ারের ওপর বসা, পায়ের কাছে ব্রজকিশোর। পুলিশ এসেছে শুনে বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে সামনে। রামরিখ, সুমন্তবাবু, সান্টু, মঙ্গল, মৃদঙ্গবাবু, নেপাল, কে নয় ? বজ্রাঙ্গ তাদের দিকে চেয়ে একটা বিকট হাঁক দিয়ে বললেন, "তাহলে গেল কোথায় লোকটা ?"

বজ্রাঙ্গের হাঁক শুনে ভিড়টা তিন পা হটে গেল।

বজ্রাঙ্গ কটমট করে লোকগুলোর দিকে চেয়ে বললেন, "নিরুদ্দেশ হলেই হল ? দেশে আইন নেই ? সরকার নেই ? যে যার খুশিমতো খবরবার্তা না দিয়ে বেমালুম গায়েব হয়ে গেলেই হল ? এই আপনাদের বলে দিচ্ছি, এরপর থানায় ইনফরমেশন না দিয়ে কারো নিরুদ্দেশ হওয়া চলবে না। বুঝেছেন ?"

বেশির ভাগ লোকই ঘাড় নেড়ে কথাটায় সম্মতি জানাল।

শুধু পরেশের ভাগ্নে কলকাতার সেই ফাজিল ছোকরা পল্টু বলে উঠল, "বজ্রাঙ্গবাবু, খুন হলেও কি আগে ইনফরমেশন দিয়ে নিতে হবে ?"

বজ্রাঙ্গবাবুর কথার জবাবে কথা কয় এমন সাহসী লোক খুব কমই আছে। ছোকরার এলেম দেখে বজ্রাঙ্গবাবু খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন। পরেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাতজোড় করে বলে, "আমার ভাগ্নে এটি। সদ্য কলকাতা থেকে এসেছে, আপনাকে এখনো চেনে না কিনা।"

এ-কথায় বজ্রাঙ্গবাবুর বিস্ময় একটু কমল। বললেন, "তাই বলো। কলকাতার ছেলে। তা ওহে ছোকরা, খুনের কথাটা উঠল কিসে ? কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ খুন - খুন করে গলা শুকোচ্ছ কেন ?"

পল্টু ভালমানুষের মতো বলল, "খুনের কথা ভাবলেই আমার গলা শুকিয়ে যায় যে ! তার ওপর অপঘাতে মরলে লোকে মরার পর ভূত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেদিন রাত্রে—থাক, বলব না।"

বজ্রাঙ্গবাবু কঠোরতর চোখে পল্টুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কেউ যদি "সেদিন রাত্রে—" বলে একটা গল্প ফাঁদবার পরই "থাক, বলব না" বলে বেঁকে বসে তাহলে কার না রাগ হয়। বজ্রাঙ্গবাবুরও হল। গাঁক করে উঠে বললেন, "বলবে না মানে ? ইয়ার্কি করার আর জায়গা পাওনি ?"

পল্টু কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, "আপনারা বিশ্বাস করবেন না। বললে হয়তো হাসবেন। কিন্তু সেদিন রাত্রে—উরেব্বাস—!"

বজ্রাঙ্গবাবু ধৈর্য হারিয়ে একজন সেপাইকে বললেন, "ছেলেটাকে

জাপটে ধরো তো! তারপর জোরসে কাতুকুতু দাও।"

এতে কাজ হল। পল্টু তাড়াতাড়ি বলতে লাগল, "সেদিন রাত্রে আমি গয়েশবাবুকে দেখেছি।"

"দেখেছ? তাহলে সেটা এতক্ষণ বলোনি কেন?"

"ভয়ে। আপনাকে দেখলেই ভয় লাগে কিনা।"

একথা শুনে বজ্রাঙ্গবাবু একটু খুশিই হন। তাঁকে দেখলে ভয় খায় না এমন লোককে তিনি পছন্দ করেন না। গোঁফের ফাঁকে চিড়িক করে একটু হেসেই তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাত তখন ক'টা?"

"নিশুতি রাত। তবে ক'টা তা বলতে পারব না। আমার ঘড়ি নেই কিনা। মামা বলেছে বি-এ পাশ করলে একটা ঘড়ি কিনে দেবে। আচ্ছা দারোগাবাবু, একটা মোটামুটি ভাল হাতঘড়ির দাম কত?"

গম্ভীরতর হয়ে বজ্রাঙ্গবাবু বললেন, "ঘড়ির কথা পরে হবে। আগে গয়েশবাবুর কথাটা শুনি।"

"ও হ্যাঁ। তখন নিশুত রাত। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, একটা লোক নিজের কাটা মুণ্ডু হাতে নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই দেখে ভয়ে—"

বজ্রাঙ্গবাবুর মুখটা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভূত তিনি মোটেই সইতে পারেন না। সামলে নিয়ে বললেন, "দ্যাখো ছোকরা, বেআদবি করবে তো তোমার মুণ্ডুটাও—"

"আচ্ছা, তাহলে বলব না।" বলে পল্টু মুখে কুলুপ আঁটে।

বজ্রাঙ্গবাবু একটু মোলায়েম হয়ে বলেন, "বলবে না কেন? বলো। তবে ওইসব স্বপ্নের ব্যাপার-ট্যাপারগুলো বাদ দেওয়াই ভাল। ওগুলো তো ইররেলেভ্যান্ট।"

পল্টু মাথা নেড়ে বলে, "আপনার কাছে ইররেলেভ্যান্ট হলেও আমার কাছে নয়। স্বপ্নটা না দেখলে আমার ঘুম ভাঙত না। আর ঘুম না ভাঙলে গয়েশবাবুকেও আমি দেখতে পেতাম না।"

"আচ্ছা বলো।" বজ্রাঙ্গবাবু বিরস মুখে বলেন।

"আমি শুই মামাবাড়ির ছাদে একটা চিলেকোঠায়। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমার আর ঘুম আসছিল না। কী আর করি? উঠে সেই শীতের মধ্যেই ছাদে একটু পায়চারি করছিলাম। তখন হঠাৎ শুনি, নীচের রাস্তায় কাদের যেন ফিসফাস কথা শোনা যাচ্ছে। উঁকি মেরে দেখি, গয়েশবাবু একজন লোকের সঙ্গে খুব আস্তে-আস্তে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন।"

"লোকটাকে লক্ষ করেছ?"

"করেছি। রাস্তায় তেমন ভাল আলো ছিল না। তাই অস্পষ্ট দেখলাম। তবে মনে হল লোকটা বাঁ পায়ে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে।"

"কতটা লম্বা?"

"তা গয়েশবাবুর মতোই হাইট হবে।"

"চেহারাটা দেখনি? মুখটা?"

"প্রথমটায় নয়। ওপর থেকে মনে হচ্ছিল, লোকটার হাইট স্বাস্থ্য সবকিছুই গয়েশবাবুর মতো।"

"তাদের কথাবার্তা কিছু কানে এসেছিল?"

"আজ্ঞে না। তবে মনে হচ্ছিল তাঁরা দুজন খুব গুরুতর কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন। গয়েশবাবুকে দেখে আমি ছাদ থেকে বেশ জোরে একটা হাঁক দিলাম, গয়েশকাকা-আ-আ..."

পল্টু এত জোরে চেঁচাল যে, বজ্রাঙ্গ পর্যন্ত কানে হাত দিয়ে বলে ওঠেন, "ওরে বাপ রে! কানে তালা ধরিয়ে দিলে!"

পল্টু ভালমানুষের মতো মুখ করে বলে, "যা ঘটেছিল তা হুবহু বর্ণনার চেষ্টা করছি।"

"অত হুবহু না হলেও চলবে বাপু। একটু কাটছাঁট করতে পারো। যাক, তুমি তো ডাকলে। তারপর গয়েশবাবু কী করলেন?"

"সেইটেই তো আশ্চর্যের। গয়েশবাবুর সঙ্গে আমার খুব খাতির। উনি আমাকে নিয়ে প্রায়ই বড় ঝিলে মাছ ধরতে যান, চন্দ্রগড়ের জঙ্গলে আমি ওঁর সঙ্গে পাখি শিকার করতেও গেছি। ইদানীং দাবার তালিম নিচ্ছিলাম। যাঁর সঙ্গে এত খাতির, সেই গয়েশবাবু আমার ডাকে সাড়াই দিলেন না।"

"কানে কম শুনতেন নাকি?"

"মোটেই না। বরং খুব ভাল শুনতেন। উনি তো বলতেন, গহিন রাতে আমি পিঁপড়েদের কথাবার্তাও শুনতে পাই।"

"বলো কী! পিঁপড়েরা কথাবার্তা বলে নাকি?"

"খুব বলে। দেখেননি দুটো পিঁপড়ে মুখোমুখি হলেই একটু থেমে একে অন্যের খবরবার্তা নেয়? পিঁপড়েরা স্বভাবে ভারী ভদ্রলোক।"

"আচ্ছা, পিঁপড়েদের কথা আর-একদিন শুনিয়ে দিও। এবার গয়েশবাবু...?"

"হ্যাঁ। গয়েশবাবু তো আমার ডাকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আমার কেমন মনে হল, আমি ভাল করে গয়েশবাবুর হাঁটাটা লক্ষ করলাম। আমার মনে হল, উনি খুব স্বাভাবিকভাবে হাঁটছেন না, কেমন যেন ভেসে-ভেসে চলে যাচ্ছেন।"

"ভেসে-ভেসে?"

"ভেসে-ভেসে। যেন মাটিতে পা পড়ছে না। শুনেছি অনেক সময় লোকে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হাঁটে। সে হাঁটা কেমন তা আমি দেখিনি। কিন্তু গয়েশবাবুকে দেখে মনে হল, উনি বোধহয় ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই হাঁটছেন, তাই আমার ডাক শুনতে পাননি। আমি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম।"

"পড়লে?"

"উপায় কী বলুন? ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে হাঁটা তো ভাল অভ্যাস নয়। হয়তো খানাখন্দে পড়ে যাবেন, কিংবা গাছে বা দেয়ালে ধাক্কা খাবেন।"

"সঙ্গে একটা খোঁড়া লোক ছিল বলছিলে যে!"

"ছিল। কিন্তু দুজনেরই হাঁটা অনেকটা একরকম। দুজনেই যেন ভেসে-ভেসে যাচ্ছেন। দুজনেই যেন ঘুমন্ত।"

"গুল মারছ না তো?" বজ্রাঙ্গ হঠাৎ সন্দেহের গলায় বলেন।

"আজ্ঞে না। গুল মারা খুব খারাপ। কলকাতার ছেলেরা মফস্বলে গেলে গুল মারে বটে, কিন্তু আমি সে-দলে নই।"

"আচ্ছা বলো। তুমি তো বাড়ি থেকে বেরোলে—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। বেরিয়েই আমি দৌড়ে গয়েশবাবুর কাছে পৌঁছে গিয়ে ডাক দিলাম, গয়েশকা—"

"থাক থাক, এবার আর ডাকটা শোনাতে হবে না।"

পল্টু অভিমানভরে বলে, "কাছে গিয়ে তো চেঁচিয়ে ডাকিনি। আস্তে ডেকেছি।"

"ও। আচ্ছা, বলো।"

"ডাকলাম। কিন্তু এবারও গয়েশবাবু ফিরে তাকালেন না। তখন আমার স্থির বিশ্বাস হল, গয়েশবাবু জেগে নেই। আমি তখন ওঁদের পেরিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দাঁড়িয়ে যা দেখতে পেলুম তা আর বলার ভাষা আমার নেই। ওঃ...বাবা রে..."

বজ্রাঙ্গ নড়েচড়ে বসে পিস্তলের খাপে একবার হাত ঠেকিয়ে বললেন, "কাতুকুতু দিতে হবে নাকি?"

"না না, বলছি। ভাষাটা একটু ঠিক করে নিচ্ছি আর কী। দেখলাম কী জানেন? দেখলাম, খোঁড়া লোকটাও গয়েশবাবু, না-খোঁড়া লোকটাও গয়েশবাবু।"

"তার মানে?"

"অর্থাৎ দুজন গয়েশবাবু পাশাপাশি হাঁটছে।"

ফের গাঁক করলেন বজ্রাঙ্গ, "তা কী করে হয়?"

"আমারও সেই প্রশ্ন। তা কী করে হয়। আমি চোখ কচলে গায়ে চিমটি দিয়ে ভাল করে তাকিয়ে আবার দেখতে পেলাম, চোখের ভুল নয়। দুজনেই গয়েশবাবু। এক চেহারা, এক পোশাক, শুধু দুজনের হাঁটাটা দুরকম।"

"ঠিক করে বলো। সত্যি দেখেছ, না হ্যালুসিনেশান?"

"আপনাকে ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি। একেবারে জলজ্যান্ত চোখের দেখা।"

"তুমি তখন কী করলে?"

"আমি তখন বহুবচনে বললাম, গয়েশকাকারা, কোথায় যাচ্ছেন এই নিশুত রাত্তিরে? কিন্তু তাঁরা তবু ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আমাকে যেন দেখতে পাননি এমনভাবে এগিয়ে আসতে লাগলেন।"

"আর তুমি দাঁড়িয়ে রইলে?"

"পিছোনোর উপায় ছিল না। রাস্তা জুড়ে আমার পিছনে একটা মস্ত ষাঁড় শুয়ে ছিল যে! আমি বললাম, কাকারা, থামুন। আপনারা ঘুমের

মধ্যে হাঁটছেন। কিন্তু তাঁরা আমাকে পাত্তাই দিলেন না। সোজা হেঁটে এসে আমাকে ভেদ করে চলে গেলেন।"

"ভেদ করে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেদ করা ছাড়া আর কী বলা যায়? আমার ওপর দিয়েই গেলেন কিন্তু এতটুকু ছোঁয়া লাগল না। গয়েশবাবু খোঁড়া গয়েশবাবুকে তখন বলছিলেন....."

অস্ফুট একটা 'রাম-রাম' ধ্বনি দিয়ে বজ্রাঙ্গ হুহুংকারে বলে উঠলেন, "দ্যাখো, তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি, সরকারি কাজে বাধার সৃষ্টি করা রাজদ্রোহিতার সামিল।"

পল্টু অবাক হয়ে বলে, "আমি আবার সরকারি কাজে কখন বাধা দিলাম?"

বজ্রাঙ্গ চোখ পাকিয়ে বললেন, "এই যে ভূতের গল্প বলে তুমি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ এটা সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? আমি ভয় পেয়ে গেলে তদন্ত হবে কী করে?"

সকলেরই একটু-আধটু হাসি পাচ্ছে, কিন্তু কেউ হাসতে সাহস পাচ্ছে না। পল্টু করুণ মুখ করে বলল, "ঘটনাটা ভৌতিক নাও হতে পারে। হয়তো ও দুটো গয়েশকাকুর ট্রাই ডাইমেনশনাল ইমেজ।"

বজ্রাঙ্গ হুংকার দিলেন, "মানে?"

পল্টু ভয়ে-ভয়ে বলে, "ত্রিমাত্রিক ছবি।"

"ছবি কখনো হেঁটে বেড়ায়? ইয়ার্কি করছ?"

"কেন, সিনেমার ছবিতে তো লোকে হাঁটে।"

বজ্রাঙ্গ দ্বিধায় পড়ে গেলেন বটে, কিন্তু হার মানলেন না। ঝড়াক করে একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে। তোমার স্টেটমেন্ট আর নেওয়া হবে না।"

পল্টু মুখখানা কাঁদো - কাঁদো করে বলে, "আমি কিন্তু গুল মারছিলাম না। বলছিলাম কী, ঘটনাটা আরো ভাল করে ইনভেসটিগেট করা দরকার। এর পিছনে হয়তো একটা বৈজ্ঞানিক চক্রান্ত আছে।"

কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়ে বজ্রাঙ্গ চতুর্দিকে বার কয়েক চোখ বুলিয়ে ভ্রুকুটি করে হুংকার ছাড়লেন, "আর কারও কিছু বলার আছে? কিন্তু খবর্দার, কেউ গুলগপ্পো ঝাড়লে বিপদ হবে।"

কারও কিছু বলার ছিল না। সুতরাং আর একবার কটমট করে চারদিকে চেয়ে বজ্রাঙ্গ বিদায় নিলেন।

৫

বজ্রাঙ্গ বোস বিদায় নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পল্টুও সুট করে কেটে পড়েছিল।

গয়েশবাবুর নিরুদ্দেশ হওয়ার তদন্ত যে এখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠবে, তা ভেবে খুব হাসি পাচ্ছিল তার। কিন্তু শহরে একটা প্রায় শোকের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় প্রকাশ্য স্থানে দম ফাটিয়ে হাসাটা উচিত হবে না। লোকে সন্দেহ করবে। তাই সে গয়েশবাবুর বাড়ির পিছন দিককার জলার মধ্যে হোগলার বনে গিয়ে ঢুকে পড়ল। জায়গাটা বিপজ্জনক। একে তো বরফের মতো ঠাণ্ডা জল, তার ওপর জলে সাপখোপ আছে, জোঁক তো অগুনতি, পচা জলে বীজাণুও থাকার কথা। কিন্তু হাসিতে পেটটা এমনই গুড়গুড় করছে পল্টুর যে, বিপদের কথা ভুলে সে হোগলার বনে ঢুকে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগল।

কিন্তু আচমকাই হাসিটা থেমে গেল তার। হঠাৎ সে লক্ষ করল, চারদিকে লম্বা লম্বা হোগলার নিবিড় জঙ্গল। এত ঘন যে, বাইরের কিছুই নজরে পড়ে না। সে কলকাতার ছেলে। এইরকম ঘন জঙ্গল সে কখনো দেখেনি। হাঁটু পর্যন্ত জলে সে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু পায়ের নীচে নরম কাদায় ধীরে-ধীরে পা আরো ডেবে যাচ্ছে তার। চারদিকে এই দুপুরেও অবিরল ঝিঁঝি ডাকছে। দু-একটা জলচর পাখি ঘুরছে মাথার ওপর। বাইরের কোনো শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

পল্টু একটু ভয় খেল। যদিও দিনের বেলা ভয়ের কিছু নেই, তবু কেমন ভয়-ভয় করছিল তার। জলকাদা ভেঙে সে ফিরে আসতে লাগল।

কিন্তু ফিরে আসতে গিয়েই হল মুশকিল। নিবিড় সেই হোগলাবনে কোথা দিয়ে সে ঢুকেছিল, তা গুলিয়ে ফেলেছে। যেদিক দিয়েই বেরোতে যায়, সেদিকেই শুধু জলা আর আরও হোগলা। আর জলাটাও বিদঘুটে। এতক্ষণ হাঁটুজল ছিল, এখন যেন জলটা হাঁটু ছাড়িয়ে আরও এক বিঘত উঠে এসেছে। পায়ের নীচে পাঁক আরও আঠালো।

কলকাতার ছেলে বলে পল্টুর একটু দেমাক ছিল। সে চালাক চতুর এবং সাহসীও বটে। কিন্তু এই হোগলাবনে পথ হারিয়ে সে দিশাহারা হয়ে গেল। পাঁকের মধ্যে পা ঘেঁষে পাঁকাল মাছ বা সাপ গোছের কিছু সড়াত করে সরে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে, আর চমকে উঠছে পল্টু। হোগলার বনে উত্তরের বাতাসে একটা হুহু শব্দ উঠছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে সে লোকালয়ের শব্দ শুনবার চেষ্টা করল। কোনো শব্দ কানে এল না।

পল্টু চেঁচিয়ে ডাকল, "মামা! ও মামা!"

কারও সাড়া নেই।

পল্টু আরও জোরে চেঁচাল, "কে কোথায় আছ? আমি বিপদে পড়েছি।"

তবু কারও সাড়া নেই। এদিকে জলার জল পল্টুর কোমর-সমান হয়ে এল প্রায়। কাদা আরও গভীর। ভাল করে হাঁটতে পারছে না পল্টু। হোগলার বন আরও ঘন হয়ে আসছে। দিনের বেলাতেও নাড়া খেয়ে জলার মশারা হাজারে হাজারে এসে ছেঁকে ধরেছে তাকে। পায়ে জোঁকও লেগেছে, তবে জোঁক লাগলে কেমন অনুভূতি হয় তা জানা নেই বলে রক্ষা। দু' পায়ের অন্তত চার জায়গায় মৃদু চুলকুনি আর সুড়সুড়ির মতো লাগছে। কিন্তু সেই জায়গাগুলো আর পরীক্ষা করে দেখল না পল্টু।

পল্টু প্রাণপণে হোগলা সরিয়ে সরিয়ে এগোতে থাকে। জঙ্গল ভেঙে হাঁটা ভারী শক্ত। পায়ের নীচে থকথকে কাদা থাকায় হাঁটাটা দুগুণ শক্ত হয়েছে। পল্টু এই শীতেও ঘামতে লাগল। কিন্তু থামলে চলবে না। এগোতে হবে।

পল্টু যত এগোয় তত জল বাড়ে। ক্রমে তার বুক-সমান হয়ে এল। সে সাঁতার জানে বটে, কিন্তু এই হোগলা-বনে সাঁতার জানলেও লাভ নেই। হাত-পা ছুঁড়ে তো আর জলে ভেসে থাকা সম্ভব নয়।

সূর্য প্রায় মাথার ওপর থাকায় দিক-নির্ণয়ও করতে পারছিল না সে। এই সময়ে উত্তরের হাওয়া বয়। হোগলাবনেও সেই হাওয়ার ঝাপট এসে লাগছে বটে, কিন্তু কোন্ দিক থেকে আসছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না।

জল যখন প্রায় গলা অবধি পৌঁছে গেছে, তখন থেমে একটু দম নিল পল্টু। এরকম পঙ্কিল ঘিনঘিনে পচা জলে বহুক্ষণ থাকার ফলে তার সারা গা চুলকোচ্ছে। তার সঙ্গে মশা আর জোঁকের কামড় তো আছেই। শামুকের খোল, ভাঙা কাচ, পাথরের টুকরোয় তার দুটো পায়েরই তলা ক্ষতবিক্ষত। ভীষণ তেষ্টায় গলা অবধি শুকিয়ে কাঠ। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। মাথা ঝিম-ঝিম করছে, শরীরটা ভেঙে আসছে পরিশ্রমে।

হঠাৎ সে হোগলা-বনে একটা সড়সড় শব্দ শুনতে পেল। সেই সঙ্গে জল ভাঙার শব্দ। কেউ কি আসছে?

পল্টু কাতর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "আমি বড় বিপদে পড়েছি। কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন?"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা গম্ভীর গলা জবাব দিল, "যেখানে আছ সেখানেই থাকো। আমি আসছি।"

পল্টু তবু বলল, "আমি এখানে।"

"তুমি কোথায় তা আমি জানি। কিন্তু নোড়ো না। তোমার সামনেই একটা দহ আছে। দহে পড়লে ডুবে যাবে।"

পল্টু একটা নিশ্চিন্তির শ্বাস ফেলল।

হোগলা-পাতার ঘন বনে কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু শব্দটা যে এগিয়ে আসছে তার দিকে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। খুব কাছেই গাছগুলোর ডগা নড়তে দেখল সে। উৎসাহের চোটে দু-তিন পা এগিয়ে গেল সে। চেঁচিয়ে বলল, "এই যে আমি।"

কিন্তু এবার আর সাড়া এল না।

আস্তে আস্তে গাছগুলো ঠেলে একটা সরু ডিঙির মুখ এগিয়ে আসে তার দিকে। খুব ধীরে ধীরে আসছে।

পল্টু অবাক হয়ে দেখল, ডিঙিটায় কোনো লোক নেই। নিতান্তই ছোট্ট ডিঙি লম্বায় তিন হাতও বোধহয় হবে না। আর ভীষণ সরু। ব্যাপারটা অদ্ভুত। লোকছাড়া একটা ডিঙি কী করে এই ঘন হোগলাবনে চলছে? ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি?

গম্ভীর স্বরটা একটু দূর থেকে বলে উঠল, "ভয় নেই, উঠে পড়ো। সাবধানে ওঠো। ডিঙি ডুবে যেতে পারে। সরু ডগার দিকটা ধরে যেভাবে লোকে ঘোড়ার পিঠে ওঠে, তেমনি করে ওঠো।"

কাণ্ডটা ভুতুড়ে হোক বা না হোক, সেসব বিচার করার মতো অবস্থা এখন পল্টুর নয়। সে বার কয়েকের চেষ্টায় ডিঙির ওপর উঠে পড়তে পারল। একটু দুলে ডিঙিটা আবার সোজা এবং স্থির হল।

পল্টু প্রথমেই দেখতে পেল, তার পায়ে অন্তত দশ-বারোটা জোঁক লেগে রক্ত খেয়ে ঢোল হয়ে আছে। ভয়ে সে একটা অস্ফুট চিৎকার করে উঠল। আঙুলে চেপে ধরে যে জোঁকগুলোকে ছাড়াবে সেই সাহসটুকু পর্যন্ত নেই। গা ঘিনঘিন করতে লাগল তার। পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, জলে ভিজে স্যাঁতা হয়ে কুঁচকে গেছে গায়ের চামড়া। আর ভেজা পোশাকে শীতের হাওয়া লাগতেই ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে।

কিন্তু তারপর যা ঘটল তাতে ভয়ে তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা। ডিঙিটায় উঠবার মিনিটখানেক বাদে আচমকাই সেটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলতে লাগল।

"ভূত! ভূত!" পল্টু চেঁচাল।

হাত দশেক দূর থেকে সেই কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "ভূত নয় পল্টু। ভয় খেও না। তোমার ডিঙিটা দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে আর একটা নৌকোর সঙ্গে।"

পল্টু ঝুঁকে দেখল, কথাটা মিথ্যে নয়। ডিঙিটার নীচের দিকে একটা লোহার আংটা লাগানো। তাতে দড়ি বাঁধা। দড়িটা টান-টান হয়ে আছে। অর্থাৎ কেউ টেনে নিচ্ছে ডিঙিটাকে।

সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

জবাবে পাল্টা একটা প্রশ্ন এল, "আগে বলো কাল রাত্রে তুমি সত্যিই গয়েশবাবুকে দেখেছিলে কি না।"

পল্টু একটু চমকে উঠল। এখন আর মিথ্যে কথা বলার মতো অবস্থা তার নয়।

পল্টু ভয়ে-ভয়ে বলল, "দেখেছি। তবে দারোগাবাবুকে যা বলেছি

তা ঠিক নয়।"

"তুমি একটু ফাজিল, তাই না?"

পল্টু চুপ করে রইল। হোগলাবনের ভিতর দিয়ে তার ডিঙি ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারছে না সে। সামনের নৌকোয় কে রয়েছে, বন্ধু না শত্রু, তাই বা কে বলে দেবে?

গয়েশবাবুর খুন বা নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনাটা যে খুব এলেবেলে ব্যাপার নয়, তা একটু একটু বুঝতে পারছিল পল্টু। বুঝতে পেরে তার শরীরের ভিতর গুড়গুড়িয়ে উঠছিল একটা ভয়। জলার মধ্যে হোগলাবনের গোলকধাঁধা থেকে কোন্ অশরীরী তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে?

হোগলাবনটা একটু হালকা হয়ে এল। এর মধ্যে নৌকো চালানো খুব সহজ কাজ নয়। যে নৌকোটা তার ডিঙিটাকে টেনে নিচ্ছে, তার চালকের এতক্ষণে হাঁফিয়ে পড়ার কথা।

বন ছেড়ে জলার মাঝ-মধ্যিখানে ক্রমে চলে এল পল্টুর ডিঙি। ফাঁকায় আসতেই সে সামনের নৌকোটা দেখতে পেল। মাত্র হাত দশেক সামনে বাইচ খেলার সরু লম্বা নৌকোর মতো একটা নৌকো। খুব লম্বা, সাদা। তাতে একটিই লোক বসে আছে, আর পল্টুর দিকে মুখ করেই। গায়ে একটা লম্বা কালো কোট। কিন্তু মুখটা? পল্টুর শরীরে একটা ঠাণ্ডা ভয়ের সাপ জড়িয়ে গেল। বুকটা দমাস-দমাস করে শব্দ করতে লাগল।

লোক নয়। কোট-পরা একটা সিংহ।

পল্টু হয়তো আবার জলায় লাফিয়ে পড়ত।

কিন্তু সামনের নৌকো থেকে সেই সিংহ গম্ভীর গলায় বলল, "ভয় পেও না। আমার মুখে একটা রবারের মুখোশ রয়েছে।"

পল্টুর গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না। অনেক কষ্টে সে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"আমার মুখটা দেখতে খুব ভাল নয় বলে।"

কথাটা পল্টুর বিশ্বাস হল না। ভয়ে ভয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করল, "দেখতে ভাল নয় মানে?"

নৃসিংহর দু হাতে দুটো বৈঠা। খুব অনায়াস ভঙ্গিতে নৃসিংহ তার লম্বা নৌকোটাকে জলার ওপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোনো ক্লান্তি ব কষ্টের লক্ষণ নেই। এমন-কী তেমন একটা হাঁফাচ্ছেও না। স্বাভাবিক গলায় বলল, "আমার মুখে একবার অ্যাসিড লেগে অনেকখানি পুড়ে যায়। খুব বীভৎস দেখতে হয় মুখটা। সেই থেকে আমি মুখোশ পরে থাকি।"

"সিংহের মুখোশ কেন?"

"আমার অনেক রকম মুখোশ আছে। যখন যেটা ইচ্ছে পরি। তুমি অত কথা বোলো না। জিরোও।"

পল্টু জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"জলার ওদিকে।"

"ওদিকে মানে কি শহরের দিকে?"

"না। উল্টোদিকে।"

"কেন?"

"একজনের হুকুমে।"

"কিসের হুকুম?"

"তোমাকে তার কাছে নিয়ে হাজির করতে হবে।"

"তিনি কে?"

"তা বলা বারণ। অবশ্য আমিও তাকে চিনি না।"

"আপনি কে?"

"আমি তো আমিই।"

"আমি যাব না। আমাকে নামিয়ে দিন।"

"এই জলায় কুমির আছে, জানো?"

"থাকুক। আমি নেমে যাব। আমাকে নামতে দিন।"

"তুমি ভয় পেয়েছ। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই।"

"আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। মামা ভাবছে। আমি বাড়ি যাব।"

"যেখানে যাচ্ছ সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তোমার মামা এতক্ষণে তোমার খবর পেয়ে গেছে। ওসব নিয়ে ভেবো না। আমরা কাঁচা কাজ করি না।"

"আমাকে নিয়ে গিয়ে কী করবেন?"

"কিছু নয়। বোধহয় তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা হবে। তারপর ছাড়া পাবে।"

"কিসের প্রশ্ন?"

"বোধহয় গয়েশবাবুকে নিয়ে। কিন্তু আর কথা নয়।"

পল্টু শুনেছে জলার মাঝখানে জল খুব গভীর। কুমিরের গুজবও সে জানে। আর জলায় ভূত-প্রেত আছে বলেও অনেকের ধারণা। সেসব বিশ্বাস করে না পল্টু। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে, জলাটা খুব নিরাপদ জায়গা নয়।

ধুধু করছে সাদা জল। শীতকালেও খুব শুকিয়ে যায়নি। তবে এখানে-ওখানে চরের মতো জমি জেগে আছে। তাতে জংলা গাছ। প্রচুর পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ছে, ছোঁ মেরে মাছ তুলে নিচ্ছে জল থেকে। ভারী সুন্দর শান্ত চারদিক। আলোয় ঝলমলে। তার মাঝখানে বাচ-নৌকোয় ওই নৃসিংহ লোকটা ভারী বেমানান। তেমনি রহস্যময় তার এই নিরুদ্দেশ-যাত্রা।

গলা খাঁকারি দিয়ে পল্টু জিজ্ঞেস করল, "আর কত দূর?"

"এসে গেছি। ওই যে দেখছ বড় একটা চর, ওইটা।"

চরটা দেখতে পাচ্ছিল পল্টু। খুব বড় নয়। লম্বায় বোধহয় একশো ফুট হবে। তবে অনেক বড় বড় গাছের ঘন জঙ্গল আছে। বেশ অন্ধকার আর রহস্যময় দেখাচ্ছিল এই ফটফটে দিনের আলোতেও। কোনো লোকবসতি নেই বলেই মনে হয়।

পল্টুর ভয় খানিকটা কেটেছে। একটু মরিয়া ভাব এসেছে। সে জিজ্ঞেস করল, "ওখানেই কি তিনি থাকেন?"

"থাকেন না, তবে এখন আছেন।" বলতে বলতে লোকটা তার লম্বা নৌকোটাকে বৈঠার দুটো জোরালো টানে অগভীর জলে চরের একেবারে ধারে নিয়ে তুলল। জলের নীচের জমিতে নৌকোর ঘষটানির শব্দ হল। লোকটা উঠে এক লাফে জলে নেমে বলল, "এসো।"

দড়ির টানে পল্টুর ডিঙিটাও বাচ-নৌকোর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়িয়ে
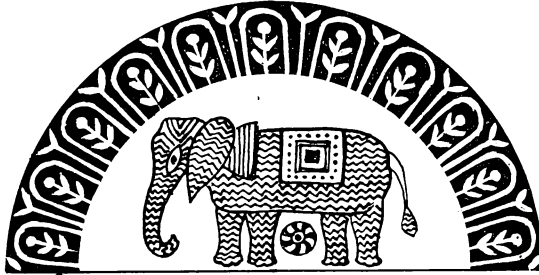
পড়ে। পল্টু নেমে দেখল, জল সামান্যই। এদিকে হোগলাবন নেই। জল টলটলে পরিষ্কার এবং একটু স্রোতও আছে। সে শুনেছে এদিকে বড় গাঙের সঙ্গে জলার একটা যোগ আছে। সম্ভবত তারা সেই গাঙের কাছাকাছি এসে গেছে।

নৃসিংহ খাড়াই পার বেয়ে ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য। লোকটা খুব লম্বা নয় বটে, তবে বেশ চওড়া। গায়ে কোট থাকলেও বোঝা যাচ্ছিল, লোকটার স্বাস্থ্য ভাল এবং পেটানো, হওয়াই স্বাভাবিক। এতটা রাস্তা দুটো বৈঠার জোরে দু'খানা নৌকো টেনে আনা কম কথা নয়।

পল্টু ধীরে-ধীরে ওপরে উঠে এল। লোকটা তার কাছ থেকে একটু তফাতে সরে গিয়ে জঙ্গলটার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, "এগিয়ে যাও।"

"কোথায় যাব?"

"সোজা এগিয়ে যাও, ওখানে লোক আছে, নিয়ে যাবে।"

একটু ইতস্তত করল পল্টু। জঙ্গলের দিকে কোনো রাস্তা নেই। বিশাল বড় বড় গাছ, লতাপাতা, বুক-সমান আগাছায় ভরা। শুধু পাখির ডাক আর গাছে বাতাসের শব্দ। জঙ্গলটা খুবই প্রাচীন। কিন্তু লোকবসতির কোনো চিহ্ন নেই। এই জঙ্গলে কে তার জন্য অপেক্ষা করছে? কী প্রশ্নই বা সে করতে চায়? গয়েশবাবু সম্পর্কে তার জানার এত আগ্রহই বা কেন?

দোনোমোনো করে পল্টু এগোল। একবার নৃসিংহের দিকে আচমকাই ফিরে তাকাল সে। অবাক হয়ে দেখল, নৃসিংহের হাতে একটা কালো রঙের বল। লোকটা ধীরে-ধীরে হাতটা ওপরদিকে তুলছে।

এত অবাক হয়ে গিয়েছিল পল্টু যে, হাঁ করে তাকিয়ে রইল, মুখে কথা এল না। বল কেন লোকটার হাতে?

লোকটা ধমকে উঠল, "কী হল?"

"বল নিয়ে আপনি কী করছেন?"

"কিছু নয়। যা বলছি করো। এগোও।"

পল্টু মুখ ফিরিয়ে জঙ্গলটার দিকে তাকাল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই মাথার পিছনে দুম করে কী একটা এসে লাগল।

সেই বলটা? ভাবতে-না-ভাবতেই তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল সে। পেটে চিনচিনে খিদে; শীত আর ভয়ে এমনিতেই তার শরীর কাঁপছিল। মাথায় বলটা এসে লাগতেই শরীরটা অবশ হয়ে পড়ে যেতে লাগল মাটিতে। হাত বাড়িয়ে শূন্যে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করল পল্টু। কিছু পেল না।

অজ্ঞান হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

৬

দুপুরে খেতে বসে সুমন্তবাবু বললেন, "ব্যায়াম। ব্যায়াম। ব্যায়াম ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই। ব্যায়াম না করে করেই বাঙালি শেষ হয়ে গেল। বিকেল থেকে পাঁচশো স্কিপিং শুরু করো সাণ্টু। মঙ্গল, তুমি ব্যায়ামবীর বটে, কিন্তু ফ্যাট নও। শরীরে কেবল মাংস জমালেই হবে না, বিদ্যুতের মতো গতিও চাই। গতিই আর একটা শক্তি। আজ বিকেল থেকে তুমি গতি বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করবে। কমলা, তুমি আর তোমার মা'কে নিয়েই আমার প্রবলেম। তোমরা কপালগুণে মেয়েমানুষ। শাস্ত্রে মেয়েদের ব্যায়ামের কথা নেই। কিন্তু শহরে বিপদ দেখা দিয়েছে, সকলেরই খানিকটা শক্তিবৃদ্ধি দরকার। আমাদের ঢেঁকিটা আজকাল ব্যবহার হয় না। আমার মা ওই ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে-দিয়ে বুড়ো বয়স পর্যন্ত শুধু বেঁচেই আছেন যে তাই নয়, খুবই সুস্থ আছেন। একবার আমাদের বাড়িতে দু'দুটো চোরকে ধরে তিনি মাথা ঠুকে দিয়েছিলেন। সুতরাং আজ থেকে তুমি আর তোমার মা ঢেঁকিতে পাড় দিতে শুরু করো। ওফ্, কাঁকালে বড় ব্যথা।" বলে সুমন্তবাবু যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন।

কুমুদিনী দেবী বললেন, "তা না হয় হল, কিন্তু ব্যায়াম করে গায়ে জোর হতে তো সময় লাগে। ততদিনে যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়ে যায়? তার চেয়ে আমি বলি কী, একটা কুকুর পোষো।"

সুমন্তবাবু বললেন, "সেটা মন্দ বুদ্ধি নয়। বজ্রাঙ্গবাবুর সঙ্গে কথা বলে যা বুঝলাম, গয়েশবাবু খুনই হয়েছেন। লাশটা হয়তো জলায় ফেলে দিয়েছে। গয়েশবাবু খুন হলেন কেন তা পরে জানা যাবে। আমার ধারণা, গয়েশবাবুর লেজটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। আমাদের লেজ নেই বটে, কিন্তু অন্যরকম ডিফেক্ট থাকতে পারে। সাণ্টুর নাকটা লম্বা, মঙ্গলের কপালের দু'দিকটা বেশ উঁচু, অনেকটা শিং-এর মতো, আমার অবশ্য ওরকম কোনো ডিফেক্ট নেই, তাহলেও..."

"আছে।" গম্ভীরভাবে কমলা বলল।

"আছে?" বলে অবাক হয়ে সুমন্তবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন।

"তোমার গায়ে মস্ত-মস্ত লোম। বনমানুষের মতো।"

সুমন্তবাবু তাড়াতাড়ি ভাত মাখতে-মাখতে বললেন, "যাক সে কথা। বজ্রাঙ্গবাবু বলেছেন দি কিলার উইল স্ট্রাইক এগেন। আমাদের সতর্ক থাকা দরকার।"

ঠিক এই সময়ে বাইরে একটা হৈ-চৈ শোনা গেল। কে যেন ঢোল বাজাচ্ছে আর চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কী বলছে।

সাণ্টু লাফিয়ে উঠে বাইরে ছুটল। পিছনে সুমন্তবাবু, মঙ্গল, কমলা, কুমুদিনী।

দেখা গেল, নাপিত নেপাল সুমন্তবাবুর ফটকের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, "দুয়ো দুয়ো, হেরে গেল।"

সুমন্তবাবু হেঁকে বললেন, "কে হেরে গেল রে ন্যাপলা! বলি ব্যাপারখানা কী?"

নেপাল ঢোল থামিয়ে একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে এবার আর আমার সঙ্গে পারবেন না। একেবারে কাকের মুখ থেকে খবর নিয়ে এসেছি। সকালবেলা খুব জব্দ করেছিলেন আজ। গয়েশবাবুর খবরটা সবে গঙ্গাগোবিন্দবাবুকে দিতে যাচ্ছিলুম সেই সময় আপনি এমন হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন যে, আমি একেবারে চুপসে গেলুম। কিন্তু এবার আমি মার দিয়া কেল্লা।"

সুমন্তবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেন, "বলছিস কী রে ন্যাপলা? আবার কিছু ঘটেছে নাকি?"

নেপাল ঢোলে চাঁটি মেরে চাটিস-চাটিস বোল বাজিয়ে কিছুক্ষণ নেচে নিয়ে বলল, "ঘটেছে বই-কী। এই একটু আগে পল্টুকে পরীরা ধরে নিয়ে গেছে।"

"পরীরা ধরে নিয়ে গেছে কী রে।"

"তবে আর বলছি কী, আমার পিসশ্বশুরের স্বচক্ষে দেখা। পল্টু দারোগাবাবুর সামনে সাক্ষী দিয়ে জলার ধারে গিয়েছিল। সেখানে ঠিক সাতটা মেয়ে-পরী এসে তাকে ছেঁকে ধরে। আমার পিসশ্বশুর জলায় মাছ ধরতে গিয়েছিল। নিজের চোখে দেখেছে, সাতটা পরী পল্টুকে ধরে নিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে মেঘের দেশে।"

সুমন্তবাবু এঁটো হাত ঘাসে মুছে নিয়ে শশব্যস্তে বললেন, "তাহলে তো খবরটা সবাইকে দিতে হচ্ছে।"

একগাল হেসে নেপাল বলে, "আজ্ঞে সে-কাজ আমি সেরেই এসেছি। কারও আর জানতে বাকি নেই।"

সুমন্তবাবু বাস্তবিকই একটু দমে গেলেন। এত বড় একটা খবর, সেটা তিনি কিনা পেলেন সবার শেষে! কিন্তু কী আর করেন। দাঁত কিড়মিড় করে শুধু বললেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে।"

কী দেখা যাবে, কী ভাবে দেখা যাবে তা অবশ্য বোঝা গেল না। তবে সুমন্তবাবু আর খেতে বসলেন না। গায়ে জামা চড়িয়ে, পায়ে একজোড়া গামবুট পরে এবং মাথায় চাষিদের একটা টোকলা চাপিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সাণ্টু আর মঙ্গল আবার খেতে বসে গিয়েছিল। কুমুদিনী দেবী একটু নিচু গলায় তাদের বললেন, "ওরে, ওই দ্যাখ, বাড়ির কর্তার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। এই দুপুরে বিকট এক সাজ করে কোথায় যেন চললেন। তোরাও একটু সঙ্গে যা বাবারা। কোথায় কী ঘটিয়ে আসেন বলা যায় না।"

সাণ্টু আর মঙ্গল শেষ কয়েকটা গ্রাস গপাগপ গিলে উঠে পড়ল। সাণ্টু তার গুলতি আর মঙ্গল একটা মাছ মারার ট্যাঁটা হাতে নিয়ে সুমন্তবাবুর পিছনে দৌড়োতে থাকে।

জলার ধারে পৌঁছে খুবই বিরক্ত হলেন সমন্তবাব। এমনিতেই

জলাটা নির্জন জায়গা, তার ওপর ভূতপ্রেত আছে বলে সহজে লোকে এদিকটা মাড়ায় না। কিন্তু আজ জলার ধারে রথযাত্রার মতো ভিড়। বোঝা গেল, নেপাল ভালমতোই খবরটা চাউর করেছে। জেলেদের যে কটা নৌকো ছিল, সব জলে দাবড়ে বেড়াচ্ছে। বহু লোক হোগলাবনে কোমরসমান জলে নেমে গাছ উপড়ে ফেলছে।

কবি সদানন্দ একটু হাসি-হাসি মুখ করে সুমন্তবাবুকে বললেন, "ছেলেটা খুব ডেঁপো ছিল মশাই। আমার কবিতায় ভুল ধরেছিল। তখনই জানতাম, ছোকরা বিপদে পড়বে।"

"কার কথা বলছেন ? পল্টু ?"

"তবে আর কে ! আলোকবর্ষ নাকি বছর-টছর নয়। তা নাই বা হল, তা বলে মুখের ওপর ফস্ করে বলে বসবি ? আর তোর চেয়ে সায়েন্স-জানা লোক কি এখানে কম আছে ? এই তো গঙ্গাগোবিন্দবাবুই রয়েছেন। উনিই তো বললেন, আলোর গতি মোটেই সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল নয়। বেশ কিছু কম।"

বলতে বলতেই গঙ্গাগোবিন্দ এগিয়ে এলেন। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "আহাহা, এখন আবার ওসব কথা কেন ?"

সুমন্তবাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। আলোকবর্ষ বা আলোর গতির প্রসঙ্গটা ধরতে পারছিলেন না। একটু সামলে নিয়ে বললেন, "পল্টুর ঠিক কী হয়েছে জানেন আপনারা ?"

গঙ্গাগোবিন্দ মাথা নেড়ে বললেন, "না। কয়েকজন লোক তাকে জলার দিকে আসতে দেখেছে। তারপর কী ঘটেছে, তা অনুমান করা যায় মাত্র। কলকাতার ছেলে, সাঁতার জানত না, মনে হয় ডুবেই গেছে।"

"সর্বনাশ !" বলে সুমন্তবাবু এগিয়ে গেলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, পল্টু এমনি-এমনি গায়েব হয়নি। গয়েশবাবুর সম্পর্কে সে কিছু গুরুতর তথ্য জানতে পেরেছিল। গয়েশবাবুকে যারা খুন বা গুম করেছে, সম্ভবত তারাই পল্টুকেও খুন বা গুম করেছে।

জলার ধারে লোকজনের ভিড় হওয়াতে কয়েকজন দিব্যি ব্যবসা ফেঁদে বসে গেছে। হরিদাস পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেচে-নেচে তার বুলবুলভাজা বিক্রি করছে, কানাই তার ফুচকার ঝুড়ি নামিয়েছে একটা শিমুলগাছের তলায়, চিনেবাদাম বিক্রি করতে লেগেছে ষষ্ঠীপদ। ওদিকে জেলেরা বেড়াজাল ফেলে জলায় পল্টুর মৃতদেহ খুঁজছে। দারোগাবাবু একটা আমগাছের তলায় ইজিচেয়ারে বসে নিজে তদারক করছেন।

সুমন্তবাবু বুঝলেন, এই ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে কোনও লাভ হবে না। তিনি সাণ্টু আর মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার মনে হয় রহস্যের উত্তর গয়েশবাবুর বাড়ির মধ্যেই পাওয়া যাবে। আমি গোপনে বাড়ির মধ্যে ঢুকছি, তোরা চারদিকে নজর রাখিস।"

গয়েশবাবুর বাড়িটা আজ বড়ই ফাঁকা। সদর দরজায় তালা লাগিয়ে চাকরটা পর্যন্ত জলার ধারে গিয়ে মজা দেখছে। সুতরাং সুমন্তবাবুর ধরা পড়ার ভয় বড় একটা নেই।

বাড়িতে ঢোকা খুব একটা শক্ত হল না। পুরনো বাড়ি বলে অনেক জানালা-দরজাই নড়বড় করছে। সুমন্তবাবু একটা আধখোলা জানালার গরাদহীন ফোকর দিয়ে গামবুট এবং টোকলাসহই ঢুকে পড়লেন ভিতরে।

নীচে এবং ওপরে অনেকগুলো ঘর। তার সবগুলোই ফাঁকা পড়ে আছে। গয়েশবাবু শুধু সামনের দিকের দুখানা ঘর ব্যবহার করতেন। বাকি ঘরগুলোয় তালাও দেওয়া নেই। ডাঁই-করা কিন্তু ভাঙা আসবাব, তোরঙ্গ আর হাবিজাবি জিনিস রয়েছে। মাকড়সার জাল, ধুলো, ইঁদুর আর আরশোলার নাদিতে ভরতি।

সুমন্তবাবু প্রথম ঘরটায় ঢুকেই চারদিকে চেয়ে বুঝলেন, এ ঘরে বহুকাল লোক ঢোকেনি। মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ।

কিন্তু সুমন্তবাবু লক্ষ করলেন, ধুলোর ওপর নির্ভুল একজোড়া জুতোর ছাপ রয়েছে। রবারসোলের জুতো। লাঠিটা শক্ত হাতে চেপে ধরে তিনি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললেন। ওপাশে আর একটা ঘর। অনেক-দেরাজওলা একটা মস্ত চেস্ট রয়েছে। ভাঙা আলনা। একটা লোহার সিন্দুক। সুমন্তবাবু দেরাজগুলো খুলে দেখলেন, তাতে পুরনো খবরের কাগজ আর কিছু লাল হয়ে যাওয়া চিঠিপত্র ছাড়া কিছুই নেই। সিন্দুকটা খুলতে পারলেন না। তালা লাগানো। পরের ঘরটাতে একটা মস্ত কাঠের বাক্স। সেটা খুলে দেখলেন, রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা কাপড় আর ভাঙা বাসন। পরের ঘরটায় কয়েকটা বইয়ের আলমারি। পাল্লা খুলে কয়েকটা বই একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন সুমন্তবাবু। ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলেন সুমন্তবাবু। গুপ্তহিরার রহস্য। দস্যুসর্দার কালোমানিক সুবর্ণগড় থেকে বিখ্যাত গুপ্তহিরা লুঠ করে নিয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ অবধি গোয়েন্দা জীমূতবাহন তা উদ্ধার করে। কিন্তু কালোমানিক তাকে হুমকি দিয়েছিল, শোধ নেবে। জীমূতবাহন যখন এক রাত্রে ঘুমোচ্ছিল তখন জানালায় শব্দ হল টক। জীমূত জানালা খুলে দেখে, কাঠের পাল্লায় একটা তীর গেঁথে আছে। তীরের ফলায় গাঁথা চিঠি : "শিগগিরই দেখা হবে। কালোমানিক।" 'গুপ্তহিরার রহস্য' প্রথম খণ্ড সেখানেই শেষ। অনেক চেষ্টা করেও বইটার দ্বিতীয় খণ্ড যোগাড় করতে পারেননি সুমন্তবাবু। কিন্তু এতকাল পরে গয়েশবাবুর বাড়িতে আলমারি খুলে তাঁর নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। দ্বিতীয় তাকে কোণের দিকে তৃতীয় বইখানাই 'গুপ্তহিরার রহস্য' (দ্বিতীয় খণ্ড)।

সুমন্তবাবু বইটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে কোঁচা দিয়ে ধুলো ঝেড়ে একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করলেন। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। কালোমানিক আবার ফিরে আসছে। পড়তে পড়তে সুমন্তবাবুর বাহ্যজ্ঞান রইল না।

যদি বাহ্যজ্ঞান থাকত তাহলে তিনি ভিতর দিককার দরজার পাল্লায় ক্যাঁচ শব্দটা ঠিকই শুনতে পেতেন। কিন্তু পেলেন না।

দরজার আড়াল থেকে একজোড়া চোখ তাঁকে লক্ষ করল। তারপর ছায়ামূর্তির মতো একটা লোক নিঃশব্দে ঢুকল দরজা দিয়ে।

সুমন্তবাবু মাথার টোকলাটা খুলতে ভুলে গেছেন। গামবুটও পায়ে রয়েছে। ছায়ামূর্তি পিছন থেকে তাঁকে জ্বলজ্বলে চোখে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

সুমন্তবাবু তেরো পৃষ্ঠা পড়ে পাতা উল্টে চৌদ্দ পৃষ্ঠায় গেছেন মাত্র। সুবর্ণগড়ের রাজবাড়ির বিশ হাত উঁচু দেয়াল টপকে একজন লোক কাঠবেড়ালির মতো লাফ দিয়ে আমগাছের ডাল ধরে ঝুল খেয়ে মাটিতে নামল।

ঠিক এই সময়ে পিছন থেকে লোকটা লাফিয়ে পড়ল তাঁর ঘাড়ে।

ভাগ্যিস টোকলাটা মাথা থেকে খোলেননি। যেরকম জোরে তিনি চেয়ার থেকে মাটিতে ছিটকে পড়েছিলেন তাতে মাথা ফেটে যাওয়ার কথা। ফাটল না টোকলাটার জন্যই। বুকের ওপর একটা লোক চেপে বসে বলছে, "হুঁ হুঁ বাছাধন, এবার ?"

সুমন্তবাবুর সারা গায়ে ব্যথা। অনভ্যাসের ব্যায়াম করলে যা হয়। তবু তিনি ঝটকা মেরে উঠতে গেলেন এবং দুজনে জড়াজড়ি করে মেঝেয় গড়াতে লাগলেন। সুমন্তবাবুর মনে হচ্ছিল, একটু ভুল হচ্ছে। ভীষণ ভুল।

আগন্তুক লোকটাও যেন তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

হঠাৎ লোকটা বলে উঠল, "সুমন্তবাবু না ?"

সুমন্তবাবুও বলে উঠলেন, "আরে ! মৃদঙ্গবাবু যে !"

গা-হাত ঝেড়ে উঠে মৃদঙ্গবাবু বললেন, "আর বলেন কেন ! এসেছিলাম গয়েশবাবুর ছেলেবেলার কোনো ফোটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি না তা খুঁজে দেখতে।"

"ফোটোগ্রাফ ? তা দিয়ে কী হবে ?"

"গবেষণায় লাগবে। গয়েশবাবুর লেজ-সংক্রান্ত গুজবটা সত্যি কি না তা আজ অবধি ধরতে পারলাম না। অথচ বেশ জোরালো গুজব ! যদি সত্যি হয় তবে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে একটা মস্ত ওলটপালট ঘটে যাবে। তাই দেখছিলাম যদি গয়েশবাবুর একেবারে ছেলেবেলার কোনো ছবি থাকে, আর তাতে যদি লেজের প্রমাণ পাওয়া যায়। লোকটাকে তো আর পাওয়া যাবে না।"

সুমন্তবাবু একটু উত্তেজিত গলায় বললেন, "শহরে এতবড় একটা বিপর্যয় চলছে, আর আপনি খুঁজছেন গয়েশবাবুর লেজ ! জানেন

পল্টুকে গুম করা হয়েছে?"

মৃদঙ্গবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "জানি। কিন্তু গয়েশবাবুর লেজটাও কিছু কম গুরুতর ব্যাপার নয়।"

সুমন্তবাবু খুব উত্তেজিত গলায় বললেন, "তাহলে আমার কাছে শুনুন। গয়েশবাবুর মোটেই লেজ ছিল না।"

মৃদঙ্গবাবুও উত্তেজিত গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আপনি তা জানলেন কী করে?"

দুজনের যখন বেশ তর্কাতর্কি লেগে পড়েছে ; তখন হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা বাজ পড়ার মতো শব্দ হল। "কী হচ্ছে এখানে? অ্যাঁ! কী হচ্ছে?"

দুজনেই চেয়ে দেখেন, দরজায় বজ্রাঙ্গবাবু দাঁড়িয়ে। দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি, দাঁত কিড়মিড় করছেন। সুমন্তবাবু আর মৃদঙ্গবাবু সঙ্গে-সঙ্গে মিইয়ে গিয়ে আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

বজ্রাঙ্গ অত্যন্ত কটমট করে দুজনের দিকে চেয়ে বললেন, "অনধিকার প্রবেশের জন্য আপনাদের দুজনকেই অ্যারেস্ট করছি।" বলেই পিছু ফিরে হুংকার দিলেন, "এই, কে আছিস?"

সুমন্তবাবু চোখের পলকে দৌড় দিলেন। খোলা জানালা গলে এক লাফে বাগানে নেমে ছুটে গিয়ে হোগলাবনে ঢুকে ঝিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পড়ার পর খেয়াল হল, তিনি একা নন। মৃদঙ্গবাবুও জলে ঝাঁপ দিয়েছেন।

সুমন্তবাবুর পাশাপাশি কোমরজলে দাঁড়িয়ে মৃদঙ্গবাবু বললেন, "আমি সাঁতার জানি না।"

"আমি জানি।"

"তাতে আমার কী লাভ?"

"আপনার লাভের কথা তো বলিনি। বলেছি আমি সাঁতার জানি।"

"আমি ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস জানি।"

"তাতে আমার কী?"

"আপনার কথা তো বলিনি। বললাম, আমি জানি।"

"আমি কূর্মাসন জানি।"

"আমি ইভোলিউশন থিওরি জানি।"

"আমি হাঁফানির ওষুধ জানি।"

"আমি ব্যাঙের মেটাবলিজম জানি।"

এ সময়ে অদূরে একটা বজ্র-হুংকার শোনা গেল, "পাকড়ো! জলদি পাকাড়কে লাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন হোগলাবনের আড়ালে ঝিলের পার থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

সুমন্তবাবু প্রমাদ গুনে তৎক্ষণাৎ গভীর জলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জোরে সাঁতার দিতে লাগলেন।

পিছন থেকে করুণ গলায় মৃদঙ্গবাবু বললেন, "সুমন্তবাবু, আমি রয়ে গেলাম যে।"

সুমন্তবাবু বললেন, "আপনি পুলিশকে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস আর ব্যাঙের মেটাবলিজম বোঝাতে থাকুন।"

মৃদঙ্গবাবু করুণতর স্বরে বললেন, "আমাদের বংশে যে কেউ কখনো পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। আমি পড়লে বংশের কলঙ্ক হবে যে!"

"আমার বংশেও কেউ পড়েনি।"

"আপনি ভীষণ স্বার্থপর।"

"আপনিও খুব পরোপকারী নন।"

হোগলাবন চিরে সিপাইটা এগিয়ে আসছে। কিন্তু মৃদঙ্গবাবুর কিছুই করার নেই। তিনি লজ্জায় চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। পুলিশের হাতে নিজের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনাটা তিনি স্বচক্ষে দেখতে পারবেন না।

টের পেলেন পুলিশটা এসে তাঁর হাত ধরল। মৃদঙ্গবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "চলো বাবা সেপাই, শ্রীঘরে ঘুরিয়ে আনবে চলো।"

মৃদুস্বরে কে যেন বলল, "চলুন।"

গলাটা পুলিশের বলে মনে হল না। সাবধানে চোখটা একটু খুলে
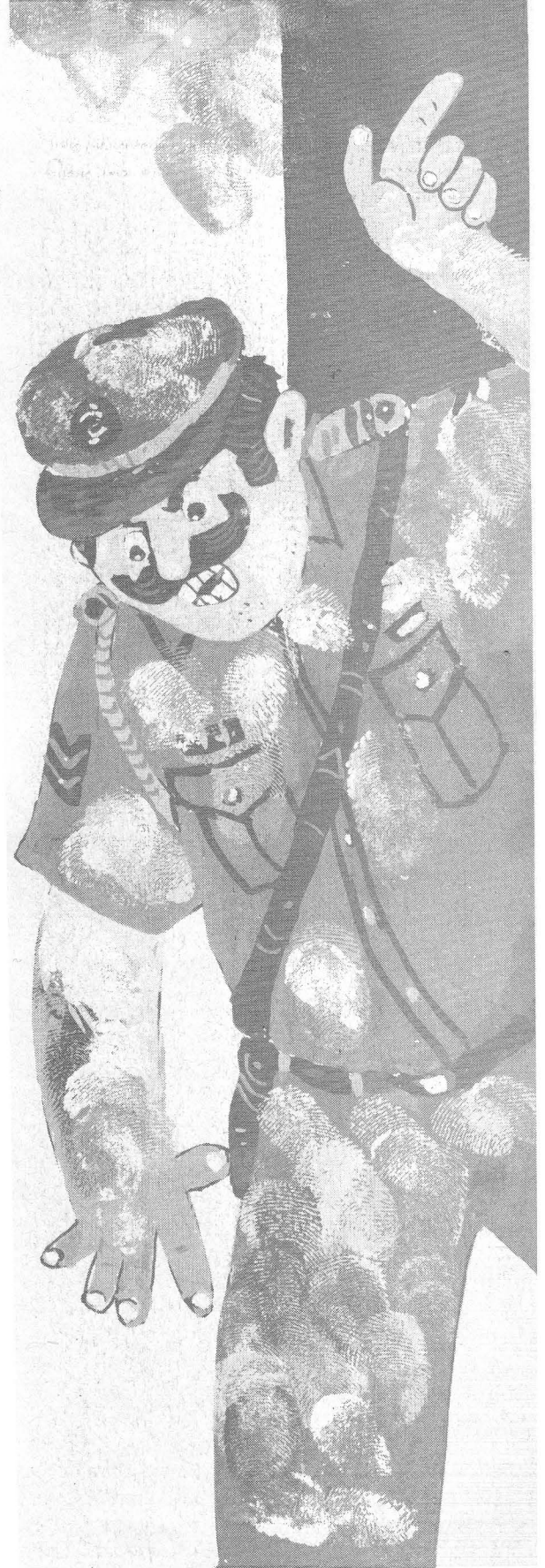
মৃদঙ্গবাবু দেখলেন। দেখেই কিন্তু ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। গোঁগোঁ করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। লোকটাই ধরে দাঁড় করিয়ে রাখল।

ঠিক লোক নয়। নৃসিংহ অবতার। শরীরটা মানুষের মতো বটে, কিন্তু মুখটা সিংহের।

মৃদঙ্গবাবু চিঁচিঁ করে বললেন, "আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন।"

নৃসিংহ অবতার গম্ভীর গলায় বলল, "বাঁচতে চাইলে আমার সঙ্গে চলুন। নইলে পুলিশের হাত এড়াতে পারবেন না। আপনার বংশের মুখে কালি পড়বে।"

কথাটা অতি সত্যি। মৃদঙ্গবাবু সভয়ে বললেন, "আপনি কে ?"

"আমি যেই হই, সেটা বড় কথা নয়। তবে আপনাকে চুপিচুপি বলে রাখি গয়েশবাবুর কিন্তু সত্যিই লেজ ছিল।"

"বলেন কী !"

"প্রমাণ চান তো আমার সঙ্গে চলুন। আমার মুখোশটাকে ভয় পাবেন না। আমার মুখটা দেখতে ভাল নয় বলে মুখোশ পরি। এখন চলুন।"

মৃদঙ্গবাবু উত্তেজিত গলায় বললেন, "চলুন।"

"এই দিকে আসুন।" বলে নৃসিংহ অবতার মৃদঙ্গবাবুর হাত ধরে কোমরজল ভেঙে উত্তরদিকে এগোতে লাগল।

লোকটা ঘাঁতঘোঁত জানে। দিব্যি লোকজনের চোখের আড়াল দিয়ে, পুলিশের নাগাল এড়িয়ে জল ভেঙে একটা নিরিবিলি জায়গায় এনে ডাঙায় তুলল।

জায়গাটা মৃদঙ্গবাবু চেনেন। এক সময়ে এখানে নীলকুঠি ছিল। ভাঙা পোড়ো একখানা মস্ত বাড়ি আজও আছে। বিশাল বিশাল বটগাছ ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে চারধার। পারতপক্ষে লোকে এখানে আসে না। এখানে নাকি ভীষণ বিষাক্ত সাপের আড্ডা।

ডাঙায় তুলে লোকটা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে বলল, "এবার জিনিসটা দিয়ে দিন।"

মৃদঙ্গবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "মানে ?"

"ন্যাকামি করবেন না মৃদঙ্গবাবু। গয়েশবাবুর বাড়িতে যে-জিনিসটা পেয়েছেন, সেটা দিয়ে দিন।"

"কিছু পাইনি তো !"

লোকটা হঠাৎ জামার ভেতর থেকে একটা পিস্তল বের করে বলল, "বেশি কথা বললে খুলি উড়ে যাবে।"

মৃদঙ্গবাবু জীবনে কখনো বন্দুক পিস্তলের মুখোমুখি হননি। আতঙ্কে 'আঁ আঁ' করে উঠলেন।

লোকটা বলল, "গয়েশবাবুর যে লেজ ছিল, সে-প্রমাণ আমার কাছে আছে। যদি সেটা চান তো জিনিসটা দিয়ে দিন।"

মৃদঙ্গবাবু হাঁ করে লোকটার দিকে চেয়ে ছিলেন। হাঁ-মুখের মধ্যে একটা মাছি ঢুকে মুখের ভিতরে দিব্যি একটু বেরিয়ে আবার বার হয়ে এল।

"কই, দিন।" লোকটা তাড়া দেয়।

"কী রকম জিনিস ?"

"একটা লকেট। তেমন দামি জিনিসেরও নয়। পেতলের।"

"মা-কালীর দিব্যি, লকেটটা আমি পাইনি।"

"ন্যাকামি হচ্ছে ?"

"না না। তবে আমার মনে হয়, লকেটটা সুমন্তবাবু পেয়েছেন।"

"ঠিক জানেন ?"

"জানি। উনিও ওসময়ে ঘুরঘুর করছিলেন।"

"উনি কোথায় ?"

"পালিয়েছেন। জলে নেমে সাঁতার দিয়ে পালিয়েছেন। পালানোর ভঙ্গি দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিছু একটা হাতিয়ে এনেছেন গয়েশবাবুর বাড়ি থেকে।"

"আচ্ছা, সুমন্তবাবুর সঙ্গেও মোলাকাত হবে। এখন আপনি যেতে পারেন।"

"যাব ?" ভয়ে ভয়ে সুমন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।
"যান। কিন্তু পুলিশের কাছে কিছু বলবেন না।"
"না না। পুলিশের সঙ্গে আমার দেখাই হবে না। আমি এখন দিশেরগড়ে মাসির বাড়ি যাব। মাসখানেকের মধ্যে আর ফিরছি না।"
এই বলে মৃদঙ্গবাবু তাড়াতাড়ি রওনা হলেন। কিন্তু দশ পা'ও যেতে হল না তাঁকে। পিছন থেকে কী যেন একটা এসে লাগল মাথায়।

মৃদঙ্গবাবু উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। নৃসিংহ অবতার এগিয়ে এল। মৃদঙ্গবাবুর মাথার কাছেই ঘাসের ওপর পড়ে থাকা বলটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরল। তারপর দ্রুত হাতে মৃদঙ্গবাবুর শরীর তল্লাশ করতে লাগল।
যা খুঁজছিল, তা পেয়েও গেল লোকটা। তারপর হোগলার বনে নেমে জলের মধ্যে চোখের পলকে মিলিয়ে গেল।

৭

সুমন্তবাবু প্রথমটায় প্রাণপণে সাঁতরে ঝিলের অনেকটা ভিতর দিকে চলে গেলেন। পুলিশের ভয়ে সাঁতারটা একটু তেজের সঙ্গেই কেটেছেন। ফলে বেদম হয়ে হাঁফাতে লাগলেন।
সাঁতার জিনিসটা খারাপ নয়, তিনি জানেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সাঁতার হল শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। কিন্তু ব্যায়ামেরও তো একটা শেষ আছে। আজ সকালেই সুমন্তবাবু অনেকটা দৌড়েছেন, ওঠবোস করেছেন, বৈঠকি মেরেছেন। তার ওপর এই সাঁতার তাঁর শরীরের জোড়গুলোয় খিল ধরিয়ে দিল। জলও বেজায় ঠাণ্ডা।
ঝিলের মাঝমধ্যিখানে পৌঁছে সুমন্তবাবু একবার পিছু ফিরে দেখে নিলেন। না, নিশ্চিন্তি। অনেকটা দূরে চলে এসেছেন। এত দূর থেকে ঝিলের পারটা ধু-ধু দেখা যায়, কিন্তু লোকজন চেনা যায় না।
সুমন্তবাবু সাঁতার থামিয়ে চিত হয়ে ভেসে রইলেন কিছুক্ষণ। মৃদঙ্গবাবুর কী হল তা বুঝতে পারছেন না। লোকটা বায়োলজির পণ্ডিত সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনে বায়োলজিটাই তো সব নয়। সাঁতার জানলে আজ পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হত না।
চোখে প্রখর সূর্যের আলো এসে পড়ছে। সুমন্তবাবু চোখ বুজলেন। জলে চিত হয়ে ভেসে থাকাও যে খুব সহজ কাজ তা নয়। একটু-আধটু হাত-পা নাড়তে হয়। কিন্তু সুমন্তবাবুর হাত-পা ভীষণ ভারী হয়ে এসেছে।
একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন সুমন্তবাবু, ডাঙা অনেক দূর। ভয়ে সাঁতার দিয়ে এত দূর চলে এসেছেন বটে, কিন্তু ফের এতটা সাঁতরে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। যদিও ফিরে যেতে পারেন, তাহলেও লাভ নেই। পুলিশে ধরবে।
সুমন্তবাবু ধীরে-ধীরে ফের সাঁতরাতে লাগলেন। তিনি শুনেছেন, জলার মাঝে-মাঝে দ্বীপের মতো জায়গা আছে। তার কোনো একটাতে বসে যদি একটু জিরিয়ে নিতে পারেন তাহলে সন্ধের মুখে ধীরে-সুস্থে ফিরে যেতে পারবেন। কপাল ভাল থাকলে একটা জেলে-নৌকোও পেয়ে যেতে পারেন।
কিন্তু কিছুক্ষণ সাঁতার দেওয়ার পরই সুমন্তবাবুর দম আটকে আসতে লাগল। হাত-পা লোহার মতো ভারী। শরীরটা আর কিছুতেই ভাসিয়ে রাখতে পারছেন না। দুপুরে ভাল করে খাওয়াও হয়নি। শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে।
সুমন্তবাবু গলা ছেড়ে হাক দিলেন, "বাঁচাও! বাঁচাও! আমি ডুবে যাচ্ছি!"
কিন্তু কেউ সে ডাক শুনতে পেল না।
এর চেয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই বুঝি ভাল ছিল। সুমন্তবাবু মনে মনে মৃদঙ্গবাবুকে একটু হিংসেই করতে লাগলেন। সাঁতার না শিখেই তো লোকটা বেঁচে গেল।
হঠাৎ একটা ছপছপ বৈঠার শব্দ হল না ? নাকি ভুল শুনছেন ?
সুমন্তবাবু ঘাড় ঘোরালেন। বুকটা আনন্দে ধপাস ধপাস করতে লাগল। ভুল শোনেননি। বাস্তবিকই একটা নৌকো তাঁর দিকে আসছে। ছোট্ট নৌকো।
"বাঁচাও!" বলে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন সুমন্তবাবু।
নৌকো থেকে একটা লোক মোলায়েম গলায় বলল, "আপনাকে বাঁচাতেই তো আসা।"
"বটে!" বলে সুমন্তবাবু নৌকোর গলুইটা ধরতে হাত বাড়ালেন। অমনি একটা বৈঠা এসে খচাত করে বসে গেল বাঁ কাঁধে। সুমন্তবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাপ রে!"
নৌকো থেকে একটা লোক মোলায়েম গলায় বলল, "অত তাড়াহুড়ো করবেন না। আমার দু-একটা কথা আছে।"
ব্যথায় সুমন্তবাবু চোখে অন্ধকার দেখছিলেন। ককিয়ে উঠে বললেন, "আমি যে ডুবে যাচ্ছি।"
"বৈঠাটা ধরে ভেসে থাকুন।"
মন্দের ভাল। সুমন্তবাবু বৈঠাটা চেপে ধরলেন। বললেন, "কী কথা ?"
"গয়েশবাবুর বাড়িতে চোরের মতো ঢুকেছিলেন কেন ?"
সুমন্তবাবু অবাক হয়েও সামলে গেলেন। নৌকোর নীচে থেকে লোকটার মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না। সূর্যের আলোটাও চোখে এসে পড়ছে সরাসরি। তবু মনে হল নৌকোর ওপরে যে লোকটা বসে আছে তার মুখটা মানুষের মুখ নয়। মনে হচ্ছে যেন একটা মানুষের মতো হাত-পা-বিশিষ্ট সিংহ বসে আছে।
সুমন্তবাবু ভয় খেলেন। নির্জন ঝিলের জলে তাঁকে মেরে ডুবিয়ে দিলেও সাক্ষী কেউ নেই, কাঁপা গলায় বললেন, "ঠিক চোরের মতো নয়, চোরের মতো ঢুকেছিলেন মৃদঙ্গবাবু।"
"উনি কেন ঢুকেছিলেন জানেন ?"
"বললেন তো গয়েশবাবুর লেজ খুঁজতে ?"
"লেজ কি পেয়েছেন উনি ?"
"তা বলতে পারি না। গয়েশবাবুর যদি লেজ থেকেও থাকে তবু সেটা তিনি ফেলে যাওয়ার লোক নন।"
"আপনি কেন ঢুকেছিলেন ?"
সুমন্তবাবু অম্লান বদনে বললেন, "আমি ঠিক ঢুকিনি। পল্টুর খোঁজে লোক জড়ো হয়েছে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। দেখলাম, মৃদঙ্গবাবু চুপি-চুপি গয়েশবাবুর বাড়িতে ঢুকছেন। তাই ওঁকে ফলো করে আমিও ঢুকে পড়ি। তারপর একটা ঘরে বসে বই পড়তে থাকি। হঠাৎ আমাকে চোর বলে সন্দেহ করে মৃদঙ্গবাবু আমার ওপর লাফিয়ে পড়েন।"
সিংহের মুখটাকে ভাল করে লক্ষ করছিলেন সুমন্তবাবু। তাঁর সন্দেহ হল, ওটা মুখ নয়, মুখোশ। তবে খুব নিখুঁত মুখোশ। একেবারে সত্যিকারের সিংহের মুখ বলেই মনে হয়।
লোকটা বলল, "বৈঠাটা শক্ত করে ধরুন।"
সুমন্তবাবু কাতর স্বরে বলেন, "নৌকোয় উঠব না ?"
"না, ডাঙা অল্প দূরেই। আমি সেখানে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে যাব।"
"আমি বাড়ি যাব। আমার যে খিদে পেয়েছে।"
"খিদে আমারও পেয়েছে। তাতে কী ?"
"খিদে পেলে আমি ভীষণ রেগে যাই।"
"তা যান না। রাগ তো পুরুষের লক্ষণ।"
সুমন্তবাবুর বাস্তবিকই রাগ হচ্ছিল। কোনোক্রমে নিজেকে সংযত করে তিনি বললেন, "আপনি কে ?"
"আমি নৃসিংহ অবতার।"
সুমন্তবাবু আর কথা বললেন না। তাঁর মনে হল, তিনি আসল অপরাধীর পাল্লায় পড়েছেন। উচ্চবাচ্য করা উচিত হবে না।

নৌকোটা তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একটা বৈঠা তিনি ধরে আছেন, আর লোকটা আর-একটা বৈঠা মেরে নৌকোটাকে নিপুণ ভাবে নিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, লোকটা চমৎকার নৌকো বায়।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আচমকা সুমন্তবাবু পায়ের নীচে জমি পেয়ে গেলেন। এবং উঠে দাঁড়ালেন।
লোকটাও নৌকো থামিয়েছে। বলল, "এবার আসুন তাহলে। সামনেই ডাঙা জমি।"
সুমন্তবাবু দেখলেন জঙ্গলে-ছাওয়া একটা পুরনো চর। অনেকটা দ্বীপের মতোই। তবে জনমনিষ্যি নেই।

সুমন্তবাবু কোমরসমান জলে দাঁড়িয়ে দ্বীপটা একটু দেখলেন। বৈঠার ডগাটা এখনও হাতে ধরা।

লোকটা একটু হেসে বলল, "রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে দিন। ভোরবেলা সাঁতার শুরু করলে দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবেন বাড়িতে।"

সুমন্তবাবুর মাথাটা চড়াক করে উঠল রাগে। একে পেটে খিদে তার ওপর এসব টিপ্পনী তাঁর সহ্য হওয়ার নয়। তিনি হঠাৎ এক ঝটকায় বৈঠাটায় একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মোচড় মারলেন।

ব্যায়ামের আশ্চর্য সুফল। লোকটা সেই টানে বেসামাল হয়ে নৌকোর মধ্যেই উপুড় হয়ে পড়ল।

সুমন্তবাবু একলাফে নৌকোয় উঠে লোকটার ঘাড়ে সামিল হয়ে দুটো প্রচণ্ড রদ্দা কষালেন।

কিন্তু মুশকিল হল, জলে ভিজে এবং নানারকম ব্যায়ামের ফলে তাঁর শরীরে আর সেই শক্তি নেই,। উপরন্তু নৃসিংহ অতিকায় বলবান লোক। কোনোরকম গা-জোয়ারির মধ্যেই গেল না। শুধু টপ করে উঠে বসল।

তার পিঠ থেকে পাকা ফলের মতো খসে ফের জলে পড়ে গেলেন সুমন্তবাবু।

লোকটা বৈঠা তুলে নিয়ে এক ঠেলায় নৌকোটা গভীর জলে নিয়ে ফেলল। তারপর মোলায়েম গলায় বলল, "ডাঙায় উঠে পড়ুন সুমন্তবাবু। জলায় কুমির আছে।"

সুমন্তবাবু দুই লাফে ডাঙায় উঠে কোমরে হাত দিয়ে বেকুবের মতো চেয়ে দেখলেন, নৃসিংহ অবতার নৌকো নিয়ে ক্রমে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সুমন্তবাবু এবার চারদিকটা ভাল করে দেখলেন। দ্বীপটায় বড় গাছ নেই বললেই হয়। আগাছাই বেশি। ফলমূল খেয়ে যে খিদে মেটাবেন, সে উপায় নেই।

ভেজা গায়ে বাতাস লেগে খুব শীত করছিল সুমন্তবাবুর। গরম বালির ওপর বসে শীতটা খানিক সামাল দিলেন। বেলা আর খুব বেশি অবশিষ্ট নেই। জেলে-নৌকোর টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং এই দ্বীপেই রাতটা কাটাতে হবে।

দিনের আলো থাকতে-থাকতেই দ্বীপটা ঘুরে দেখবেন বলে ক্লান্ত শরীরেও সুমন্তবাবু উঠে পড়লেন।

জায়গাটা খুব বড় নয়। জলের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে হাঁটতে-হাঁটতে লক্ষ করে যাচ্ছিলেন তিনি।

হঠাৎ আতঙ্কে থমকে দাঁড়ালেন সুমন্তবাবু। সামনেই বালির ওপর একটা, দুটো, তিনটে, চারটে কুমির চুপচাপ শুয়ে আছে। ভারী নিরীহ দেখতে। কিন্তু সাক্ষাৎ যম।

সুমন্তবাবু খুব দ্রুতপায়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। বুকটা ধকধক করছে ভয়ে। পায়ে গোটাকয়েক কাঁটা ফুটল প্যাট-প্যাট করে। তবু শব্দ করলেন না। কুমির যদি ধেয়ে আসে?

কিন্তু ঝোপজঙ্গলগুলোও খুব বেশি নিরাপদ মনে হচ্ছিল না তাঁর। এই ছোট দ্বীপে বাঘ-ভালুক বা হায়না-নেকড়ে নেই ঠিকই, কিন্তু অন্যবিধ প্রাণী থাকতে পারে। বিপদের কথা ভাবতে-ভাবতে আপনা থেকেই সুমন্তবাবু কয়েকটা বুকডন আর বৈঠকি দিয়ে ফেললেন। কিন্তু ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বেদম শরীরের হাড়গুলো সেই অনাবশ্যক ব্যায়ামে মটমট করে উঠল, পেশীগুলো 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়তে লাগল। সুমন্তবাবু নিরস্ত হয়ে মাটিতে বসে হাঁফাতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর কাঁধের ওপর একটা গাছের ডগা খুব ধীরে ধীরে নেমে এল। বাঁ কাঁধে একটা হিমশীতল স্পর্শ পেলেন। চমকে উঠে তাকাতেই তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। সবুজ রঙের একটা সরু সাপ খুব স্নেহের সঙ্গে তার হাত বেয়ে খানিকদূর এসে মুখের দিকে যেন অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে।

লাউডগা সাপ বিষাক্ত কি না তা তিনি ভাল জানেন না। কিন্তু এত কাছে, একেবারে নাকের ডগায় সাপের মুখোমুখি তিনি কখনো হননি।

"বাঁচাও! বাপ রে!" বলে একটা বুকফাটা আর্তনাদ করে সুমন্তবাবু মূর্ছা গেলেন।

৮

পল্টু ধীরে ধীরে চোখ খুলল। মাথার পিছন দিকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা. শরীরটা ভারী কাহিল। চোখ খুলে সে চারদিকে চেয়ে যা দেখল, তা মোটেই খুশি হওয়ার মতো নয়। পিছনে জঙ্গল, সামনে জল। দুপুর পেরিয়ে সূর্য একটু হেলেছে। বাড়ি ফেরার কোনো উপায় নেই।

নিজের অবস্থাটা বুঝবার একটু চেষ্টা করল পল্টু। ধীরে ধীরে উঠে বসল। যে লোকটা তাকে এখানে এনে মাথায় মেরে অজ্ঞান করে ফেলে রেখে গেছে, সে খুবই বুদ্ধিমান। পল্টুকে সে ইচ্ছে করেই খুন করেনি। কারণ জানে, এই নির্জন জনমানবশূন্য জায়গায় পড়ে থেকে না-খেতে পেয়েই সে মরবে। নইলে বুনো জন্তু-জানোয়ার বা সাপখোপ তো আছেই।

মাথাটা ঝন ঝন করছে বটে, তবু পল্টু উঠে ধীরে-ধীরে জলের কাছে নেমে এসে প্রথমে ব্যথার জায়গাটায় ঠাণ্ডা জল চাপড়াল। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিল। খানিকটা খেয়েও নিল।

একটু সুস্থ ও স্বাভাবিক বোধ করার পর সে আস্তে আস্তে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগল। লোকটা বলেছিল ওই জঙ্গলের মধ্যেই পালের গোদাটি আছে। পল্টুকে সে-ই আনিয়েছে এখানে। কিন্তু কথাটা পল্টুর এখন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

জঙ্গল-টঙ্গল দেখে তার অভ্যাস নেই। তবু যদি বাঁচতে হয় তবে এই জঙ্গলই এখন একমাত্র ভরসা। যদি কিছু ফল-টল পাওয়া যায় তো খেয়ে বাঁচবে। আর যদি কাঠ-টাঠ দিয়ে একটা ভেলাটেলা বানানো যায় তো জলাটা পেরোনো যাবে। যদিও দ্বিতীয় প্রস্তাবটা তার সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না।

জঙ্গলে ঢোকার এমনিতে কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে পল্টু একটা সরু শুঁড়িপথ দেখতে পেল। আগাছার মধ্যে যেন একটা ফোকর। নিচু হয়ে ঢুকতে হয়। সামনেটা যেন আধো অন্ধকার একটা টানেল।

পল্টু সাহস করে ঢুকল, এবং হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে নানারকম অদ্ভুত শব্দ। কখনো অদ্ভুত গলায় কোনো পাখি ডেকে ওঠে, পোকামাকড় ঝিঁ-ঝিঁ বোঁ-বোঁ কটরমটর নানারকম আওয়াজ দেয়। মাঝে মাঝে পায়ের তলা দিয়ে সাঁত করে যেন কী সরে যায়।

খানিকটা এগোনোর পর হঠাৎ জঙ্গলটা একটু ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। সে চারধারে চেয়ে দেখল, অনেকগুলো বড় বড় গাছ কাটা হয়েছে। চারদিকে গাছের গুঁড়ি আর কাঠের টুকরো ছড়িয়ে আছে। পল্টুর বুক আনন্দে কেঁপে ওঠে। এখানে কাঠুরিয়ারা আসে।

জায়গাটা পেরিয়ে আবার এগোয় পল্টু। আচমকাই তার চোখে পড়ে চমৎকার একটা পেয়ারা গাছ। ফলে ঝেঁপে আছে। সে কলকাতার ছেলে, গাছ বাইতে শেখেনি। কিন্তু এ গাছটা বেশ নিচু এবং ফলগুলো হাত বাড়িয়েই পাড়া যায়।

গোটাকয়েক পেয়ারা খেয়ে পল্টুর গায়ে আবার জোর-বল ফিরে এল। চারদিকে তাকিয়ে জঙ্গলটা দেখছিল সে। তেমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে না আর জায়গাটাকে। গাছ থেকে নেমে সে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখল। মনে হচ্ছিল, এ-জায়গাটা একটু অন্যরকম। চারদিকে ভাঙা ইঁট পড়ে আছে। একটা পুরনো পাথুরে ফোয়ারা কাত হয়ে পড়ে আছে। এখানে নিশ্চয়ই কারো বাড়িঘর ছিল।

পায়ে পায়ে আর-একটু এগোতেই পল্টু দেখতে পেল বাড়িটা। ঠিক বাড়ি নয়, ধ্বংসস্তূপ। তবে কয়েকটা খিলান খাড়া আছে এখনো। ধ্বংসস্তূপটার পাশেই একটা খোড়ো ঘর দেখে পল্টু অবাক হয়ে গেল। এখানে কি কেউ থাকে? কিন্তু কে? সেই পালের গোদা লোকটা নয় তো?

ঘরটা দেখে একই সঙ্গে পল্টু আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বোধ করতে থাকে। শেষ অবধি আকর্ষণই জয়ী হয়। দেখাই যাক না।

খোড়ো ঘরটার দরজা নতুন কাঁচা কাঠের তৈরি। কোনো হুড়কো-টুড়কো নেই। ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একধারে দুটো কুড়ুল বেড়ার গায়ে দাঁড় করানো। অন্য ধারে তক্তা দিয়ে বানানো একটা চৌকির মতো জিনিস। তাতে একটা মাদুর

পাতা। ঘরে কেউ থাকে বা বিশ্রাম নেয়। কিন্তু এখন সে নেই।

পল্টু কুড়ুল দুটোর একটা হাতে তুলে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল, মনে হয়, ঘরে যে থাকে সে কাঠুরিয়াই। তবে আত্মরক্ষার জন্য হাতের কাছে কুড়ুলটা রাখা ভাল।

তক্তপোশটার ওপর বসে পল্টু পকেট থেকে আর একটা পেয়ারা বার করে খেতে লাগল।

কোথাও কোনো শব্দ হয়নি! আচমকাই দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল।

পল্টু চিৎকার করার জন্য হাঁ করেছিল। কিন্তু শব্দ বেরোল না। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটা দৈত্য-বিশেষ। তালগাছের মতো ঢ্যাঙা, বিপুল স্বাস্থ্য, দুই ঘন ভ্রূর নীচে কঠিন একজোড়া চোখ।

কয়েকটা মুহূর্তকে যেন কত যুগ বলে মনে হচ্ছিল পল্টুর কাছে।

হঠাৎ লোকটা খুব নরম ভদ্র গলায় বলল, "ভয় পেও না। তুমি কে?"

পল্টু শ্বাস ছেড়ে কাঁপা গলায় বলল, "আমি পল্টু।"

"শহরে থাকো?"

"হ্যাঁ।"

"কার বাড়ি?"

"পরেশ রায় আমার মামা।"

লোকটা বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল। গায়ে একটা হাতকাটা জামা, পরনে ধুতি, পায়ে টায়ার কেটে বানানো চপ্পল। লোকটার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল পল্টু।

লোকটা হাতের টাঙ্গি গোছের জিনিসটা বেড়ার গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বলল, "এখানে এলে কী করে? নৌকোয়?"

"আমি ইচ্ছে করে আসিনি। একটা মুখোশধারী লোক আমাকে এখানে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে।"

লোকটা অবাক হয়ে বলল, "ঘটনাটা কি আমায় খুলে বলবে?"

পল্টুর ভয় কেটেছে একটু। লোকটার চেহারা যেমন, স্বভাব হয়তো তেমন খারাপ নয়। সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল।

আগাগোড়া দরজায় গায়ে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে লোকটা সব শুনল। কোনো কথা বলল না। পল্টুর গল্প শেষ হওয়ার পর মিনিট দুয়েক চুপ করে কী ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গয়েশবাবুর সঙ্গে আগের রাতে কি সত্যিই তোমার দেখা হয়েছিল?"

পল্টু মাথা নেড়ে বলল, "হয়েছিল। উনি আমার কাছে এসেছিলেন।"

ভ্রূ কুঁচকে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"একটা জিনিস আমাকে রাখতে দিতে এসেছিলেন।"

"জিনিসটা কী?"

"কাগজে জড়ানো একটা প্যাকেট। আমি দোতলার ঘরে থাকি। মাঝরাতে আমার জানালায় ঢিল পড়ে। আমি জানালা খুলে দেখি, নীচে উনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে হাতছানি দিয়ে নীচে ডাকলেন। আমি নীচে গিয়ে দরজা খুলতেই উনি প্যাকেটটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "খুব সাবধানে এটা তোমার কাছে লুকিয়ে রেখো। আমি কদিন পরে এসে নিয়ে যাব।"

"তুমি প্যাকেটটা খুলেছিলে?"

"না। গয়েশবাবুর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। উনি আমাকে বিশ্বাস করতেন।"

লোকটা আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল, "প্যাকেটটা কি খুব ভারী?"

"খুব। সিঁড়ি দিয়ে ওটা নিয়ে উঠবার সময় আমার ভীষণ কষ্ট হয়েছে।"

লোকটা আবার মাথা নাড়ল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পল্টু কাঠুরিয়া কখনো দেখেনি ঠিকই, কিন্তু এই লোকটার হাবভাব গেঁয়ো বা অশিক্ষিত লোকের মতো যে নয়, তা সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল। তাই ফশ করে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

"আমি কাঠুরিয়া।"

"কিন্তু আপনাকে দেখে কাঠুরিয়া বলে মনে হয় না।"

লোকটা একটু হাসল। বলল, "যে কাঠ কাটে তাকে তো কাঠুরিয়াই বলে।"

পল্টুর সন্দেহ গেল না। তবে সে কথাও আর বাড়াল না।

লোকটা কী যেন ভাবছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আপনমনে বলল, "ব্যাপারটা বড্ড জট পাকিয়ে গেছে।"

"কোন্ ব্যাপারটা ?"

"তুমি যে ব্যাপারটার কথা বললে।"

"আমি কি বাড়ি ফিরে যেতে পারব আজ ?"

লোকটা কী যেন ভাবছে। ভাবতে ভাবতেই বলে, "পারবে। এ জায়গাটা এমন কিছু দুর্গম নয়। প্রায়ই লোকজন যাতায়াত করে। কাঠুরিয়া আসে, মউলিরা আসে, জেলেরা আসে।"

"আপনি কি এখানেই থাকেন ?"

"মাঝে-মাঝে থাকতে হয়।"

"ভয় করে না ?"

"না। ভয় কিসের ? জঙ্গলে যেমন বিপদ আছে, শহরেও তেমনি আছে। বরং বেশিই আছে।"

"আপনি কি শুধু কাঠই কাটেন ? আর কিছু করেন না ?"

"করি। আমাকে চারধারে নজর রাখতে হয়।"

"তার মানে ?"

লোকটা কথাটার জবাব দিল না। আবার ভাবতে লাগল। মুখখানা খুব গম্ভীর।

দূরে একটা ঘুঘু পাখি ডাকছিল। লোকটা হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা শুনে নিয়ে পল্টুর দিকে চেয়ে বলল, "আমি একটু আসছি। তুমি কোথাও যেও না।"

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?"

"একটা ঘুঘু ডাকছে। ঘুঘুটা আমার পোষা। কেন ডাকছে দেখে আসি।"

লোকটা বেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে।

পল্টু এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করেই লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গেল দরজায়। পাল্লাটা একটু ফাঁক করে দেখল, লোকটা ধ্বংসস্তূপটা পার হয়ে লম্বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে।

পল্টু বুঝতে পারছিল না, লোকটা কে বা কেমন। তবে এ যে কাঠুরিয়া নয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুখোশধারী বলেছিল তাদের সর্দার এই দ্বীপে থাকে। এই লোকটা সত্যিই সেই সর্দার নয় তো ! ব্যাপারটা জানা দরকার।

পল্টু গাছের আড়াল-আবডাল দিয়ে লোকটার পিছনে চলতে লাগল। কিন্তু লোকটা জঙ্গলে চলাফেরায় অভ্যস্ত। পল্টু নয়। উপরন্তু তাকে গা ঢাকা দিয়ে চলতে হচ্ছে। বারবার লোকটাকে হারিয়ে ফেলছিল পল্টু। তবে বেশিদূর যেতে হল না। মিনিট দুয়েক হাঁটার পরেই পল্টু দেখল সামনেই খাঁড়ি। দৈত্যের মতো লোকটা একটা গাছের ধারে থেমেছে। খাঁড়িতে একটা সবুজ রঙের ছোট্ট মোটরবোট থেকে একজন লোক ডাঙায় নেমে লোকটার দিকে উঠে আসছে।

লোকটার মুখ দেখে পল্টুর বুকের মধ্যে রেলগাড়ির পোল পার হওয়ার মতো গুম্ গুম্ শব্দ হতে লাগল। চোখের পলক পড়ল না। লোকটার মুখে সিংহের মুখোশ।

পল্টুর ভিতর থেকে আপনাআপনিই একটা আতঙ্কের চিৎকার উঠে আসছিল। মুখে হাতচাপা দিয়ে সে চিৎকারটাকে আটকাল। একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে দেখল, মুখোশধারী কাঠুরিয়ার সঙ্গে কী যেন কথা বলছে।

খুব সামান্যক্ষণই কথা বলল তারা। মুখোশধারী আবার মোটরবোটে ফিরে গেল। তারপর বোটের মুখ ঘুরিয়ে জল কেটে চলে গেল কোথায়। বোটটার মোটরে খুব সামান্য একটু শব্দ হচ্ছিল। বোধহয় খুবই দামি মোটরবোট।

কাঠুরিয়া কয়েক সেকেণ্ড মোটরবোটটার গমনপথের দিকে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগল।

আর এবারই হঠাৎ ভয় পেল পল্টু। দারুণ ভয়। সে বুঝতে পারল, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সে মুখ ঘুরিয়ে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়োতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে জানে না। কী হবে জানে না। শুধু মনে হচ্ছে, পালানো দরকার। এক্ষুনি পালানো দরকার।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে দৌড়োনো সহজ নয়। পদে পদে অজস্র বাধা, কাঁটাগাছ, লতা, ঝোপঝাড়, কী নেই। বার-দুই পড়ে গেল পল্টু।

পিছন থেকে একটা হেঁড়ে গলার হাঁক শোনা গেল হঠাৎ, "পল্টু ! পল্টু ! পালিও না। ভয় নেই।"

পল্টু আরো আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে দৌড়োতে গিয়ে দিক হারিয়ে ফেলল। হঠাৎ দেখল, সামনে তার পথ আটকে সেই কাঠুরিয়া দাঁড়িয়ে।

পল্টুর গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। নিষ্পলক আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রইল লোকটার দিকে।

কাঠুরিয়া একটা হাত বাড়িয়ে বলল, "অত ভয় পেলে কেন ? মুখোশধারীকে দেখে ? ওকে ভয়ের কিছু নেই। যে তোমাকে এখানে এনেছে, সে ও লোকটা নয়।"

"তাহলে ও কে ?"

"ও আমার বন্ধু। এসো, কিছু ভয়ের নেই।"

"আমি যাব না।"

লোকটা হেসে ফেলল। সরল হাসি। বলল, "তোমার মতো ছোট্ট একটু ছেলেকে ইচ্ছে করলেই তো আমি মেরে ফেলতে পারি, যদি আমার সেই মতলব থাকে। তাই না ? তবু যখন মারছি না তখন নিশ্চয়ই আমার সে মতলব নেই।"

"তাহলে ?"

"তাহলে কিছু নয়। আমার সঙ্গে এসো, সব বলছি।"

পল্টু লোকটার হাত ধরল। লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তাকে বলল, "এই দ্বীপটার একধারে নদী, অন্যধারে বড় ঝিল। নদী থেকে ঝিলে ঢুকবার পথ আছে। আমি এখানে সেই পথটা পাহারা দিই।"

"কেন ?"

"লক্ষ করি কারা ওই পথে যাতায়াত করে।"

"আর ওই মোটরবোটের লোকটা ?"

"ও লোকটাও পাহারা দেয়। সারাক্ষণ তো একজনের পক্ষে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। ও আমাকে সাহায্য করে।"

"আপনি তাহলে কাঠুরিয়া নন ?"

"কাঠুরিয়াও বটে। তবে শুধু কাঠুরিয়া নই।"

"আপনি কি পুলিশের লোক ?"

"অনেকটা তাই।"

"পাহারা দেন কেন ?"

"কিছু দুষ্টু লোক এই পথ দিয়ে আনাগোনা করে।"

"ওই মুখোশওলা লোকটা কি সত্যিই আমাকে এখানে আনেনি ?"

"না। ও তোমাকে চেনেও না। তবে যে তোমাকে এখানে এনেছে সে খুব চালাক লোক।"

"কেন ?"

"সে জানে যে, তুমি মরবে না। শহরে ফিরেও যাবে। গিয়ে বলবে যে, একজন সিংহের মুখোশ-পরা লোক তোমাকে চুরি করে এনেছিল। তখন দোষটা গিয়ে পড়বে আমার ওই বন্ধুটির কাঁধে। কারণ এই অঞ্চলে যে-সব কাঠুরিয়া, জেলে আর মউলি যাতায়াত করে তারা সবাই আমাকে আর আমার বন্ধুকে চেনে, তারা জানে আমার বন্ধু একটা মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়।

"আপনার বন্ধু মুখোশ পরে কেন ?"

"এমনিতে কোনো দরকার নেই। খানিকটা শখ বলতে পারো। আর একটা উদ্দেশ্য হল, যেসব দুষ্টু লোক এখান দিয়ে আনাগোনা করে তারা যাতে ওকে চিনে না রাখতে পারে।"

"কিন্তু মুখোশ দেখলে তো লোকের সন্দেহ আরো বাড়বে।"

কাঠুরিয়া খুব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। বলল, "বাঃ ! তোমার তো খুব বুদ্ধি ! কথাটা ঠিক বলেছ। তবে আমার ওই বন্ধুটির মুখটা দেখতে বিশেষ ভাল নয়। ছেলেবেলায় আগুনে পুড়ে মুখটা একটু বীভৎস হয়ে গেছে। ফলে ও মুখোশ ছাড়া বেরোতে চায় না। ওর

অবশ্য নানারকম মুখোশ আছে। তবে সিংহের মুখোশটাই ও সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে।"

তারা খোড়ো ঘরটার কাছে পৌঁছে গেল হাঁটতে হাঁটতে।

কাঠুরিয়া ঘরে ঢুকে বলল, "চুপচাপ বসে বিশ্রাম নাও। আমার বন্ধুটি ফিরে এলে তোমাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে।"

"আপনার বন্ধু কোথায় গেল ?"

"একজন জেলে আমার বন্ধুকে খবর দিয়েছে, সিংহের মুখোশ-পরা একটা লোক একটা নৌকোয় করে জলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু আগেও তাকে দেখা গেছে পশ্চিম ধারের একটা দ্বীপের কাছে। আমাদের মনে হয়, লোকটা ওখানেই কোনো কীর্তি করে এসেছে। আমার বন্ধু সেখানে গেল দেখে আসতে।"

"তাহলে মুখোশধারী দু' নম্বর লোকটা কে ?"

"সে নিশ্চয়ই আমাদের বন্ধু নয়।"

"আপনি তাকে চেনেন না ?"

"কী করে চিনব ? তবে আমার ধারণা, লোকটা খুব অচেনাও নয়।"

"সে এসব করছে কেন ?"

"বললাম যে, সে আমাদের বিপদে ফেলতে চায়। পুলিশ যখনই খবর পাবে যে, একজন মুখোশধারী একটা বাচ্চা ছেলেকে গুম করে এখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছিল, তখনই খোঁজখবর এবং তল্লাশ শুরু হবে। আমাদের হদিস পেতে পুলিশের মোটেই দেরি হবে না। তারা এসে আমাদের ধরে নিয়ে যাবে।"

"কিন্তু আপনারাও তো পুলিশের লোক !"

"তা অনেকটা বটে। কিন্তু আমরা সাধারণ পুলিশ নই। আমাদের কাছে আইডেনটিটি কার্ড বা কোনো প্রমাণপত্র থাকে না। কাজেই ধরতে এলে আমরা প্রমাণ করতে পারব না যে, আমরা অপরাধী নই।"

"তাহলে কী হবে ? আপনাদের জেল হবে ?"

কাঠুরিয়া হেসে মাথা নেড়ে বলল, "তা অবশ্য হবে না। ধরা পড়ার পর আমরা আমাদের হেড কোয়ার্টারে ব্যাপারটা জানাব। সেখান থেকে আমাদের আইডেনটিফাই করা হলে পুলিশ আমাদের ছেড়েও দেবে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে যাবে।"

"কী হবে ?"

"মুখোশধারী কিছুক্ষণের জন্য আমাদের এখান থেকে সরাতে চাইছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যও যদি আমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই ফাঁকে সে মস্ত একটা কাজ হাঁসিল করে নেবে।"

"কী কাজ হাঁসিল করবে ?"

"সেইটে জানার জন্যই তো আমরা এখানে বেশ কিছুদিন হয় থানা গেড়ে বসে আছি।"

"পুলিশ কি আপনাদের ধরবেই ?"

কাঠুরিয়া আবার হাসল, "তাই তো মনে হচ্ছে।"

"আমি ফিরে গিয়ে না হয় কিছু বলব না।"

কাঠুরিয়া মাথা নেড়ে বলল, "তুমি না বললে কী হয় ! দ্বিতীয় মুখোশধারী বোকা লোক নয়। সে যা করেছে তা দিনের আলোতেই করেছে। নিজেকে খুব একটা গোপন রাখেনি। জলায় সর্বদাই জেলেদের নৌকো ঘোরে। তাদের চোখে পড়বেই। তুমি না বললেও তারা বলে দেবে। সুতরাং পুলিশ যে আসবেই তাতে সন্দেহ নেই।"

হঠাৎ আবার আগেকার মতোই দূরে ঘুঘুর ডাক শোনা গেল। লোকটা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। তারপর পল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো।"

পল্টু উঠে পড়ল। বলল, "কিছু পাওয়া গেছে ওই দ্বীপে ?"

"মনে তো হচ্ছে। চলো দেখি।"

খাঁড়ির মুখে এসে তারা দেখে, মুখোশধারী মোটরবোট থেকে পাঁজাকোলা করে একটা লোককে নামিয়ে আনছে। লোকটাকে দেখে পল্টু চেঁচিয়ে উঠল, "আরে ! এ যে সান্টুর বাবা !"

কাঠুরিয়া বলল, "চেনো তাহলে !"

"খুব চিনি।"

মুখোশধারী সুমন্তবাবুকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, "একটুর জন্য লোকটাকে সাপে কামড়ায়নি। কিন্তু লোকটা একটু অদ্ভুত। অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, হাতে একটা লাউডগা সাপ বাইছিল। সাপটাকে তাড়িয়ে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতেই উঠে বসল। তারপর কথা নেই বার্তা নেই দুম করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুষি চালাতে লাগল। তাই বাধ্য হয়ে আমি লোকটার চোয়ালে একটা ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিই। তারপর নিয়ে আসি।"

কাঠুরিয়া পল্টুর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, "বুঝলে ?"

"না।" বলেই পল্টু আবার তাড়াতাড়ি বলল, "বুঝেছি। আপনার বন্ধুকে সুমন্তবাবু আমার মতো সেই দ্বিতীয় মুখোশধারী বলে মনে করেছিল।"

"ঠিক বলেছ। দু নম্বর মুখোশধারী খুব কাজের লোক।"

পল্টু উদ্বেগের সঙ্গে বলে, "আচ্ছা, গয়েশবাবুকেও কি মুখোশধারীই সরিয়ে দিয়েছে ?"

"খুব সম্ভব।"

"উনি কি বেঁচে আছেন ?"

"সেটা বলা শক্ত।"

"লোকে বলছে ওঁকে খুন করা হয়েছে।"

কাঠুরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "সেটাই স্বাভাবিক। গয়েশবাবুর ঘটনাটাই সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়েছে।"

কাঠুরিয়ার মুখোশধারী বন্ধু খাঁড়ি থেকে একটা মগে করে জল এনে সুমন্তবাবুর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিচ্ছিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সুমন্তবাবুর চোখ পিটপিট করতে লাগল।

কাঠুরিয়া মৃদুস্বরে বলল, "বিনয়, তুমি সামনে থেকো না। তোমাকে দেখলেই আবার ভায়োলেন্ট হয়ে উঠবে।"

মুখোশধারী বোধহয় মুখোশের আড়ালে একটু হাসল। তারপর নেমে গিয়ে তার মোটরবোটের মুখ ঘুরিয়ে আবার জলায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমন্তবাবু চোখ পিটপিট করে কাঠুরিয়াকে একটু দেখে নিয়েই হঠাৎ "তবে রে !" বলে একটা হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। কাঠুরিয়া একটুও নড়ল না। সুমন্তবাবু দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে নিজেই বসে পড়লেন। তারপর হঠাৎ পটাং পটাং করে কয়েকটা বৈঠক এবং বুকডন দিয়ে নিতে লাগলেন।

এবার আত্মপ্রকাশ করা বিধেয় ভেবে পল্টু এগিয়ে গিয়ে মিষ্টি করে বলল, "কাকাবাবু, কোনো ভয় নেই। ইনি আমাদের শত্রু নন।"

সুমন্তবাবু একটা বুকডনের মাঝখানে থেমে হাঁ করে পল্টুর দিকে চেয়ে রইলেন।

কাঠুরিয়া তাঁকে ধরে তুলল। তারপর বলল, "আমি কখনো মারপিট করিনি। আপনি মারলে আমার খুব ব্যথা লাগত। আমি তো শত্রু নই, বন্ধু।"

৯

ফের সেই খোড়ো ঘরটায় ফিরে এল তারা। সঙ্গে সুমন্তবাবু। কাঠুরিয়া তাঁকে শুকনো একটা ধুতি আর একখানা কম্বল দিল গায়ে দেওয়ার জন্য। কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে চিঁড়ে, গুড়, মর্তমান কলা দিয়ে খাওয়াল। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকেই ঘটনাটা বলে গেলেন সুমন্তবাবু।

কাঠুরিয়া চুপ করে শুনল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "মৃদঙ্গবাবুর কী হল সে খবর কি জানেন ?"

সুমন্তবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "না। বোধহয় পুলিশে ধরেছে।"

কাঠুরিয়া চুপ করে ভাবতে লাগল।

বাইরে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। পাখিরা ফিরে আসছে নিজেদের বাসায়। তাদের কিচির-মিচির শব্দে বনভূমি মুখর। সন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা বাড়তে লাগল। জলার জল ছুঁয়ে উত্তুরে বাতাস এল হু-হু করে। শীতে সুমন্তবাবু আর পল্টু কাঁপতে লাগল। কিন্তু কাঠুরিয়া নির্বিকার।

অন্ধকার হয়ে আসার পর কাঠকুটো জেলে ঘরের মধ্যে একটা চমৎকার আগুন তৈরি করল কাঠুরিয়া। তারপর পল্টুকে বলল, "আমার বন্ধু একটা জরুরি কাজ সেরে আসতে গেছে। তোমাকে সে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারত, কিন্তু তার আর দরকার নেই। খবর পেয়েছি, পুলিশ এখানে আসছে। তারা এলে তুমি তাদের সঙ্গেই ফিরে

যেতে পারবে।"

"আর আপনি ?"

কাঠুরিয়া একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার পালিয়ে যাওয়ার পথ আছে। কিন্তু পালিয়ে লাভ নেই।"

"কেন ?"

"পালালে পুলিশের হাত এড়াতে পারব বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে পাহারার কাজেও ফাঁক পড়বে। দু' নম্বর মুখোশধারী আমাকে বুদ্ধির খেলায় হারিয়ে দিয়েছে।"

"কেন, আমি পুলিশকে বলব যে, এ কাজ আপনার বন্ধু করেনি।"

কাঠুরিয়া মাথা নেড়ে বলল, "তোমার কথা তারা বিশ্বাস করবে না। কারণ আমার ধারণা, মৃদঙ্গবাবুও সেই মুখোশধারীর পাল্লায় পড়েছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই পুলিশকে জানিয়েছেন।"

"তাহলে উপায় ?"

"কোনো উপায় দেখছি না। কয়েক ঘণ্টার জন্য পাহারার কাজে ফাঁক পড়বেই।"

হঠাৎ সুমন্তবাবু একটা হুংকার দিলেন, "না, পড়বে না।"

কাঠুরিয়া অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বলল, "তার মানে ?"

"আমি পাহারা দেব। কী করতে হবে শুধু বলুন।"

কাঠুরিয়া একটু হাসল। বলল, "কাজটা খুব শক্ত, ভীষণ শক্ত। তাছাড়া আপনার বাড়ির লোকও তো আপনার জন্য ভাবছেন।"

সুমন্তবাবু ম্লান মুখে বললেন, "তা ভাবছে বটে। কিন্তু আমার বাড়ি ফেরার উপায় নেই। গয়েশের বাড়িতে আনঅথরাইজড অনুপ্রবেশের দরুন বজ্রাঙ্গ আমাকে ধরবেই। আমাদের বংশে কেউ কখনো পুলিশের খাতায় নাম লেখায়নি মশাই। তার চেয়ে বরং গুণ্ডা বদমাসদের সঙ্গে লড়াই করে জীবন বিসর্জন দেওয়াও শ্রেয়। না, আমিই পাহারা দেব। কী করতে হবে শুধু বলুন।"

পল্টুর বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। সেও বলে উঠল, "আমিও বাড়ি ফিরব না। পাহারা দেব।"

কাঠুরিয়া চিন্তিতভাবে সুমন্তবাবুকে বলে, "আপনি আর পল্টু দুজনের কারোই এসব বিপজ্জনক কাজে অভিজ্ঞতা নেই। যদি শেষ অবধি আপনাদের কিছু হয় ?"

সুমন্তবাবু খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটা বৈঠক দিয়ে বুকডন মারতে মারতে বললেন, "মরার চেয়ে বেশি আর কী হবে মশাই ?"

কাঠুরিয়া বলে, "মরলেই তো হবে না, কাজটাও উদ্ধার করা চাই।"

"কাজটার কথাই বলুন। আমাদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে না।"

কাঠুরিয়া জিজ্ঞেস করল, "আপনি মোটরবোট চালাতে পারেন ?"

সুমন্তবাবু বললেন, "না, তবে নৌকো বাইতে পারি।"

"তাহলেও হবে। আপনি নদী আর ঝিলের মাঝখানকার খাঁড়িটা নিশ্চয়ই চেনেন !"

"খুব চিনি মশাই, এখানেই তো জীবনটা কাটল।"

কাঠুরিয়া বলল, "লোকটা ওই খাঁড়ি দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়বে। নদীতে পড়লে তাকে ধরা মুশকিল হবে। সে বোধহয় খুবই ভাল নৌকো চালায়।"

"লোকটা যাবে কোথায় ?"

"লোকটা নদীর স্রোতে পড়লে অনেকদূর অবধি ভাঁটিতে চলে যাবে। তারপর সম্ভবত কোনো মোটরলঞ্চ বা ছোট্ট স্টিমার তাকে তুলে নেবে।"

"আপনি তাহলে পুরো ষড়যন্ত্রটাই জানেন ?"

"ঠিক জানি না। তবে আন্দাজ করছি। গয়েশবাবুকে খুন করার পিছনে উদ্দেশ্য একটাই। লোকজনকে বিভ্রান্ত করে দেওয়া। সকলের মনোযোগ এখন গয়েশবাবুর দিকে। আজ সারা রাত ধরে জেলেরা জলায় তাঁর লাশ খুঁজবে। সেই ফাঁকে একটা ছোট্ট নৌকো খাঁড়ি বেয়ে নদীতে পড়ল কিনা কে অত নজর রাখে ! আর রাখবেই বা কেন ? কিন্তু লোকটা জানে, আর কেউ নজর না রাখলেও আমরা রাখছি। তাই আমাদের সরিয়ে দেওয়ার চমৎকার একটা প্ল্যান করেছে সে। এখন শুধু নজর রাখছে কখন পুলিশ আমাদের ধরে নিয়ে যায়।"

সুমন্তবাবু হঠাৎ বললেন, "জলপথেই বা সে পালাবে কেন ? স্থলপথও তো আছে। ট্রেনে উঠে যদি পালায় ?"

"তাহলে তার লাভ নেই। জলপথে যত সহজে স্বদেশের সীমা ডিঙোনো যায় স্থলপথে তত নয়। তাছাড়া স্থলপথে নজর রাখারও লোক আছে। কিন্তু সে সেদিক দিয়ে পালাবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন। ওই খাঁড়িটাই তার একমাত্র পথ। আমাদের একটা ডিঙিনৌকোও আছে। আপনি আর পল্টু সেটা নিয়ে খাঁড়ির মুখটা পাহারা দেবেন, পারবেন ?"

"পারব। কিন্তু লোকটাকে চিনব কী করে ?"

"সম্ভবত তার মুখে এবারও সিংহের মুখোশ থাকবে। যদি তা না থাকে তবে কী করবেন তা বলতে পারব না। তবে নজর রাখবেন। ওই বোধহয় পুলিশের নৌকো এল।"

বাস্তবিকই দূরে অনেক লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। জঙ্গল ভেঙে ভারী পায়ের এগিয়ে আসার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

কাঠুরিয়া উঠে পড়ল। বলল, "ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা বাঁ দিকে এগিয়ে যান। দশ মিনিট হাঁটলেই খাঁড়ি।"

কাঠুরিয়া কুলুঙ্গি থেকে একটা টর্চ আর একটা বেতের লাঠি নামিয়ে সুমন্তবাবুকে দিয়ে বলল, "পল্টুকে দেখবেন।"

"ঠিক আছে। চলি।"

সুমন্তবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি-কি-মরি করে বাঁ দিকে হাঁটতে লাগলেন। সঙ্গে পল্টু। পিছনে পুলিশের তীব্র টর্চের আলো জঙ্গল ভেদ করে এদিকে-সেদিকে পড়ছে। দুজনে আরো জোরে হাঁটতে থাকে।

জঙ্গলের এবড়ো-খেবড়ো জমিতে টক্কর খেতে খেতে দুজনে খাঁড়ির ধারে পৌঁছে গেল। নদীতে ভরা জোয়ার। খাঁড়ি দিয়ে তীব্র স্রোত হুহুংকারে ঝিলের মধ্যে ঢুকছে। সেই স্রোতের ধাক্কায় মোচার খোলার মতো একটা ডিঙি-নৌকো দোল খাচ্ছে তীরে।

দুজনে নেমে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ডিঙিটায় উঠে পড়ল।

"জয় দুর্গা ! জয় দুর্গতিনাশিনী !" বলে একটা হুংকার ছাড়লেন সুমন্তবাবু।

পল্টু সতর্ক গলায় বলল, "কাকাবাবু ! আস্তে। বজ্রাঙ্গবাবু শুনতে পেলে—"

সুমন্তবাবু ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি দু' হাত জড়ো করে কপালে আর বুকে ঘন ঘন ঠেকাতে ঠেকাতে বিড়বিড় করে বললেন, "জয় বজরঙ্গবলী। জয় রাম। জয় অসুরদলনী।"

দুজনে চুপ করে বসে রইলেন নৌকোয়। কুয়াশা আজ বেশ পাতলা। তার ভিতর দিয়ে দূরে দূরে জেলে-নৌকোর বহু আলো দেখা যাচ্ছে। এখনো গয়েশবাবুর লাশের খোঁজ চলছে।

খাঁড়ির মুখ পাহারা দেওয়া এমনিতে শক্ত নয়। মাত্র পঞ্চাশ হাতের মতো চওড়া জায়গাটা। তবে এখন জোয়ারের সময় জলের তোড় কিছু বেশি। কোনো নৌকোকে নদীতে যেতে হলে বেশ কসরত করতে হবে। কিন্তু দুজনেই জানে, দু নম্বর মুখোশধারী নৌকো বাওয়ায় দারুণ ওস্তাদ লোক। এই স্রোত ঠেলে নৌকো নিয়ে নদীতে পড়তে তার বিশেষ অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া অন্ধকার মতো আছে কুয়াশা আছে। মুখোশধারী নিশ্চিত আলো জ্বেলে আসবে না। কাজেই দুজনে খুব তীক্ষ্ণ চোখে নজর রাখতে লাগল।

প্রচণ্ড শীত। তার ওপর মাঝে মাঝে ডিঙির গায়ে ঢেউ ভেঙে জল ছিটকে আসছে গায়ে। সুমন্তবাবু আপাদমস্তক কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছেন। পল্টু খোলের মধ্যে খানিক সেঁধিয়ে হিহি করে কাঁপছে।

ধীরে ধীরে সময় কেটে যেতে লাগল। জোয়ারের স্রোতটাও যেন ধীরে ধীরে কমে এল একটু।

সুমন্তবাবু বললেন, "শীতে জমে গেলাম রে পল্টু ! আয়, একটু গা গরম করি।"

"কী-ভাবে কাকু ?"

"নৌকো বেয়ে।" বলে সুমন্তবাবু পারে নেমে খুঁটি থেকে ডিঙির দড়িটা খুলে দিয়ে উঠে বৈঠা হাতে নিলেন।

নৌকো সুমন্তবাবু ভালই চালান। স্রোত ঠেলে দিব্যি বারদুই খাঁড়ির এপার-ওপার হলেন। তারপর বললেন, "নাঃ ; আজ আর হতভাগা আসবে না।"

হঠাৎ চাপাস্বরে পল্টু বলল, "আসছে।"

"বলিস কী ?" বলেই সুমন্তবাবু বৈঠা রেখে নৌকোর মধ্যেই গোটা দুই বৈঠকি দিয়ে নিতে গেলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নৌকোটা বোঁ-বোঁ করে চরকির মতো দুটো পাক খেল।

"বাবা গো !" পল্টু ভয় খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

সুমন্তবাবু চোখের পলকে আবার বৈঠা তুলে নৌকো সামাল দিয়ে বললেন, "কোথায় রে ? কই ?"

"আপনি সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছেন কাকু। ওই তো দূরে। ওই যে !"

বাস্তবিকই কিছু দূরে একটা কালো বস্তুকে জলে ভেসে আসতে দেখা গেল।

সুমন্তবাবু সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "তোর গলা শুনেছে ?"

পল্টু ফিস ফিস করে বলল, "কে জানে ? তবে বাতাস উল্টোদিকে বইছে। নাও শুনতে পারে।"

"জয় মা !" বলে কপালে বারকয়েক হাত ঠেকালেন সুমন্তবাবু।

নৃসিংহ-অবতার নৌকোর ভেলকি দেখাতে পারে। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল, ছোট্ট নৌকোটা তীরের মতো গতিতে ছুটে আসছে। খাঁড়ির স্রোত কমলেও যা আছে তাও বেশ তীব্র। সেই স্রোত ঠেলে ওরকম গতিতে চলা খুব সোজা কাজ নয়।

পল্টু বলল, "আসছে কাকু ! এসে গেল !"

"ও বাবা ! তাহলে আর দুটো বৈঠকি দিয়ে নেব নাকি ?"

"সর্বনাশ ! ও কাজও করবে না। নৌকো বানচাল হয়ে যাবে।"

সুমন্তবাবু "জয় মা, জয় মা" বলে বিড়বিড় করতে লাগলেন। বিপরীত দিক থেকে নৌকোটা বিশ হাতের মধ্যে চলে এল। বৈঠার ছলাত ছলাত শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল।

পল্টু জিজ্ঞেস করল, "কাকু, এবার কী করবেন ?"

চিন্তিত সুমন্তবাবু বললেন, "তাই তো ভাবছি। একটা বন্দুক থাকলে—"

"যখন নেই তখনকার কথা ভাবুন।"

"লাঠিটা দে।"

"লাঠি দিয়ে নাগাল পাবেন না।"

"তাহলে তুই একটা বৈঠা জলে ডুবিয়ে নৌকোটা সামলে রাখ। আমি আর একটা বৈঠা দিয়ে ঘা কতক দিই লোকটাকে।"

"পারবেন ?"

"জয় মা।" বলে সুমন্তবাবু বৈঠা নিয়ে খাড়া হলেন। কিন্তু পল্টুর অনভ্যস্ত হাতে নৌকোটা স্থির থাকছে না। টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে।

সুমন্তবাবু ঝড়াক করে খোলের মধ্যে পড়ে গেলেন। আবার উঠলেন।

তা করতে করতে নৌকোটা পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল। কিন্তু নৃসিংহ-অবতার খুবই বুদ্ধিমান। একটা নৌকো যে খাঁড়ির মুখ আগলাচ্ছে তা লক্ষ করেই আচমকা নিজের নৌকোটাকে চোখের পলকে দশ হাত তফাতে নিয়ে ফেলল সে। তারপর নদীর দিকে প্রাণপণে এগোতে লাগল।

সুমন্তবাবু বুঝলেন, সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে। পল্টুর হাত থেকে বৈঠাটা টেনে নিয়ে তিনি দু হাতে প্রাণপণে বাইতে লাগলেন। টপটপ করে ঘাম ঝরতে লাগল তাঁর এই শীতেও। ফিসফিস করে বললেন, "হ্যাঁ, একেই বলে একসারসাইজ ! এই হল একসারসাইজ !"

নৃসিংহ-অবতারের নৌকোটার কাছাকাছি এগিয়ে গেল সুমন্তবাবুদের ডিঙি। এই জায়গায় জলের স্রোত এখনো ভীষণ। দুটো ডিঙির কোনোটাই তেমন এগোতে পারছে না। তবু তার মধ্যেই নৃসিংহ-অবতারের ডিঙি কয়েক হাত এগিয়ে যেতে পেরেছে এবং আরো এগিয়ে যাচ্ছে !

সুমন্তবাবু চেঁচালেন, "খবর্দার ! থামো বলছি ! নইলে গুঁড়িয়ে দেব !"

নৃসিংহ-অবতার কোনো জবাব দিল না। কিন্তু দু হাতে চমৎকার বৈঠা মেরে নৌকোটাকে প্রায় নাগালের বাইরে নিয়ে ফেলল।

"তবে রে !" বলে সুমন্তবাবু দুই হাতে প্রায় ঝড় তুলে ফেললেন বৈঠার ঘায়ে। ছোট্ট ডিঙিটা ঢেউয়ের ওপর দিয়ে দুটো লাফ মেরে ব্যাংবাজির মতো ছিটকে নৃসিংহ-অবতারের নৌকোকে ছুঁয়ে ফেলল।

সুমন্তবাবু সঙ্গে-সঙ্গে একটা বৈঠা তুলে দড়াম করে বসালেন গলুইয়ে বসা লোকটার মাথায়।

কিন্তু কোথায় মাথা। চতুর লোকটা চোখের পলকে নৌকোটাকে একটা চরকিবাজি খাইয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছে। বৈঠা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সুমন্তবাবু টাল সামলাতে না পেরে গুপুস করে জলে গিয়ে পড়লেন।

পল্টু নিজের বিপদ আন্দাজ করে আগে থেকেই তৈরি ছিল। সুমন্তবাবুর সঙ্গে নৌকোয় চড়া যে কতটা বিপজ্জনক, তা সে অনেকক্ষণ আগেই বুঝে গেছে। সুতরাং নৃসিংহের নৌকোর গলুইতে তাদের গলুই ঠেকতেই সে টুক করে ওই নৌকোয় লাফিয়ে চলে গেছে। নৃসিংহ তখন নৌকো সামলাতে ব্যস্ত। তাই দেখেও তেমন কিছু করতে পারল না।

পল্টু দেখল, তাদের ডিঙিটা স্রোতের মুখে নক্ষত্রবেগে ওলটপালট খেতে খেতে ভেসে যাচ্ছে। তবে সুমন্তবাবু বীর-বিক্রমে সাঁতার দিয়ে আসছেন।

মুখে সিংহের মুখোশ পরা লোকটা একটা বৈঠা তুলল। সুমন্তবাবুর মাথাটাই তার লক্ষ্য সন্দেহ নেই। পল্টু আর দেরি করল না। একটা ডাইভ দিয়ে সে সোজা নৃসিংহের কোলে গিয়ে পড়ল। তারপর দুই হাতে চালাতে লাগল দমাদম ঘুষি।

কিন্তু পল্টুর ঘুষিতে কাবু হওয়ার লোক নৃসিংহ নয়। হাতের এক ঝটকায় পল্টুকে ছিটকে ফেলে লোকটা আবার বৈঠা তুলে চোখের পলকে সুমন্তবাবুর মাথা লক্ষ করে চালাল। কিন্তু সুমন্তবাবু এবার খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে টুক করে ডুব দিলেন।

নৃসিংহের নৌকোটা বৈঠার সাহায্য না পেয়ে স্রোতের মুখে একটু পিছিয়ে গেল। আর পল্টুও ফের উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল নৃসিংহের ওপর। দু'হাতে সে লোকটার গলা খামচে ধরল।

নৃসিংহ ভারী জ্বালাতন হয়ে বলে উঠল, "উঃ! ছাড়ো, ছাড়ো!"

নৌকোটা ফের একটা চক্কর মারল। আর ততক্ষণে গলুই ধরে সুমন্তবাবু ঝপাত করে নৌকোয় উঠে পড়লেন।

নৌকোটা পুরো বেসামাল হয়ে পিছন দিকে দৌড়োতে থাকে।

কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করে সুমন্তবাবু পল্টুকে সরিয়ে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন লোকটার ওপর। রাগে তাঁর গা রি-রি করছে। বৈঠাটা মাথায় লাগলে এতক্ষণে তাঁর সলিল-সমাধি হয়ে যেত। তার ওপর এই লোকটাই তাঁকে আজ সাপ আর কুমিরের মুখে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। এবং সম্ভবত এই লোকটাই গয়েশের খুনি।

সব রাগ গিয়ে লোকটার ওপর পড়ায় সুমন্তবাবুর ঘুষির জোর গেল বেড়ে। তাঁর দু-দুখানা হাতুড়ির মতো ঘুষি খেয়ে লোকটা নেতিয়ে পড়ল গলুইতে।

গোলমতো একটু চাঁদ উঠেছে আকাশে। নৌকোটা চক্কর খেতে খেতে আর পিছিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ধারের কাছে অগভীর জলে বালির মধ্যে ঘষটে থেমে গেল।

হাঃ হাঃ করে টারজানের মতো কোমরে হাত দিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসলেন সুমন্তবাবু। ভেজা খালি গা, কিন্তু যুদ্ধজয়ের আনন্দে তাঁর শীতবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ হেসে নিয়ে তিনি পল্টুর দিকে চেয়ে বললেন, "তুই ঠিক আছিস তো পল্টু?"

পল্টু সুমন্তবাবুর ধাক্কায় পড়ে গিয়ে কনুইতে বেশ ব্যথা পেয়েছে। তবু চিঁচিঁ করে বলল, "আছি।"

"আয় এবার লোকটার মুখোশ খুলে দেখি ঘুঘুটি কে।"

এই বলে সুমন্তবাবু নিচু হয়ে নৃসিংহের মুখোশটা এক টানে খুলে ফেললেন।

তারপরেই হঠাৎ তারস্বরে "ভূত! ভূত! ভূত!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এক লাফে জলে নেমে দৌড়োতে দৌড়োতে সুমন্তবাবু ডাঙায় উঠেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

পল্টুও মুখখানা দেখতে পেয়েছিল। "বাবা গো" বলে আর্তনাদ করে সেও চোখ বুজে ফেলল।

আর ঠিক এইসময়ে ভুটভুট আওয়াজ করতে করতে একটা মোটরবোট তীব্র বেগে এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে। সন্ধানী আলো এসে পড়ল পল্টুর চোখে-মুখে।

১০

সেই খোড়ো ঘরটায় আবার আগুন জ্বেলেছে কাঠুরিয়া। এবার আগুনের চারধারে গোল হয়ে বসেছে অনেকগুলো লোক। বিনয়, সুমন্তবাবু, বজ্রাঙ্গ, পল্টু, মৃদঙ্গবাবু, সান্টু, মঙ্গল, পরেশ, কবি সদানন্দ এবং কয়েকজন সেপাই। অপরাধীকে নিয়ে কয়েকজন সেপাই ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে মোটরবোটে। দ্বিতীয় খেপে এঁরা সবাই যে যাঁর বাড়ি ফিরে যাবেন।

কাঠুরিয়া বলছিল, "জ্যান্ত লোক কি কখনো ভূত হয় সুমন্তবাবু?"

"তা বলে লোকটা যে গয়েশ তা কী করে বুঝব?"

কাঠুরিয়া একটু হেসে বলল, "লোকটা যে গয়েশ তা আমরা অনেকদিন ধরেই জানি। কিন্তু এই অতি বুদ্ধিমান লোকটির বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যায়নি এতদিন। অথচ ভারতবর্ষের বিভিন্ন দামি পুরাকীর্তি ইনি অনেকদিন ধরেই বাইরে চালান দিয়ে আসছেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি এঁর কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ছিল। ইদানীং হঠাৎ একদিন টের পেলেন, এ ব্যবসা বেশিদিন চালানো অসম্ভব। অনেক এজেন্ট, অনেক লোকের কাছে পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। এরা যে-কেউ একদিন মুখ খুলবে। ব্যবসা চালানোর আর প্রয়োজনও ছিল না। লক্ষ লক্ষ টাকা হাতে এসে গেছে। তাই শেষ দাঁওটি মেরেই ব্যবসা গুটিয়ে পালিয়ে এলেন নিজের শহরে। কিন্তু এই শেষ দাঁওটিই ছিল মারাত্মক। বিজাপুরের বিষ্ণুমূর্তি। খাঁটি সোনার ওপর নানা দামি পাথর বসানো বলে এর দাম বহু লক্ষ টাকা। কিন্তু পুরাকীর্তি হিসেবে এর আন্তর্জাতিক বাজারে দাম দশ লক্ষ ডলারের কাছাকাছি। গয়েশবাবু এই অত্যধিক দামি জিনিসটা না পারছিলেন হজম করতে, না ওগরাতে। আমাদের লোক ওঁর পিছু নিয়েছিল। তিনি তাও টের পেয়েছিলেন। এদিকে বিদেশে চিঠি লেখালিখি করে একজন ভাল খদ্দেরও পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু জিনিসটা হস্তান্তর করতে পারছিলেন না। একমাত্র উপায় হচ্ছে জলপথ। গয়েশবাবু নিজের বাড়ির পিছনের জলায় নিয়মিত নৌকো বাইতেন এবং অঞ্চলটা ঘুরে ঘুরে মাল পাচার করবার নিরাপদ পথটা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ততদিনে আমি আর বিনয় এই জঙ্গলে থানা গেড়ে ফেলেছি। সিংহের মুখোশ পরা বিনয়কে গয়েশবাবু বহুবার মোটরবোটে ওঁর পিছু নিতে দেখেছেন। আমরা ওঁকে ভড়কে দেওয়ার জন্যই বেশি আত্মগোপন করতাম না। ভড়কালেই সুবিধে। মানুষ ঘাবড়ে গেলে নানারকম ভুলভ্রান্তি করে।

"উনি অবশ্য কাঁচা অপরাধী নন। অনেক ভেবেচিন্তে প্ল্যান করলেন। বিদেশের খদ্দেরকে চিঠি লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। লোকটা ওই নদীতে খুব দ্রুতগামী মোটরলঞ্চ রাখবে। ও ব্যাপারে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর নির্ধারিত দিনটিতে প্রথমে নিজে গায়েব হয়ে সকলকে সচকিত করে তুললেন। আর সেই গোলমালে সবাই যখন একদিকে তাকিয়ে আছে, তখন উনি অন্য দিকে কাজ সারতে চাইলেন। গায়েব হওয়ার রাত্রেই পল্টুর কাছে বিষ্ণুমূর্তিটা গচ্ছিত রেখে আসেন। পরদিন পল্টুকে গুম করার পর যখন তার বাড়ির লোক থানাপুলিশ করে বেড়াচ্ছে, আর ঝিলের জলে খোঁজা হচ্ছে পল্টুর দেহ, তখন তার বাড়ি থেকে বিষ্ণুমূর্তি সরিয়ে নিলেন। তার পরের ইতিহাস তো আপনাদের জানা।

"কিন্তু আমাদের কৃতিত্ব সামান্যই। গয়েশবাবুকে বমাল ধরার জন্য সব কৃতিত্ব প্রাপ্য সুমন্তবাবুর আর পল্টুর।"

সুমন্তবাবু বললেন, "কী যে বলেন! গয়েশকে কাবু করতে দুটো ঘুষি চালাতে হয়েছে সেটাই তো লজ্জার কথা। একটা ঘুষিতেই কাত হওয়া উচিত ছিল। নাঃ, কাল থেকে আরো ব্যায়াম, আরো ব্যায়াম···"

বিমর্ষ মৃদঙ্গবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সবই হল, কিন্তু আসল জিনিসটাই মাঠে মারা গেল যে।"

কাঠুরিয়া বলল, "কী সেটা?"

"গয়েশবাবুর লেজ নেই।"

সবাই হেসে উঠল। দূরে নিশুত রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে ভুটভুট করে একটা মোটরবোটের শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। গয়েশবাবুর নৌকোর পাটাতনের তলা থেকে উদ্ধার করা বিষ্ণুমূর্তিটা তক্তাপোশের ওপর রাখা। আগুনের আভায় ঝকমক করছে। যেন বিষ্ণু হাসছেন।
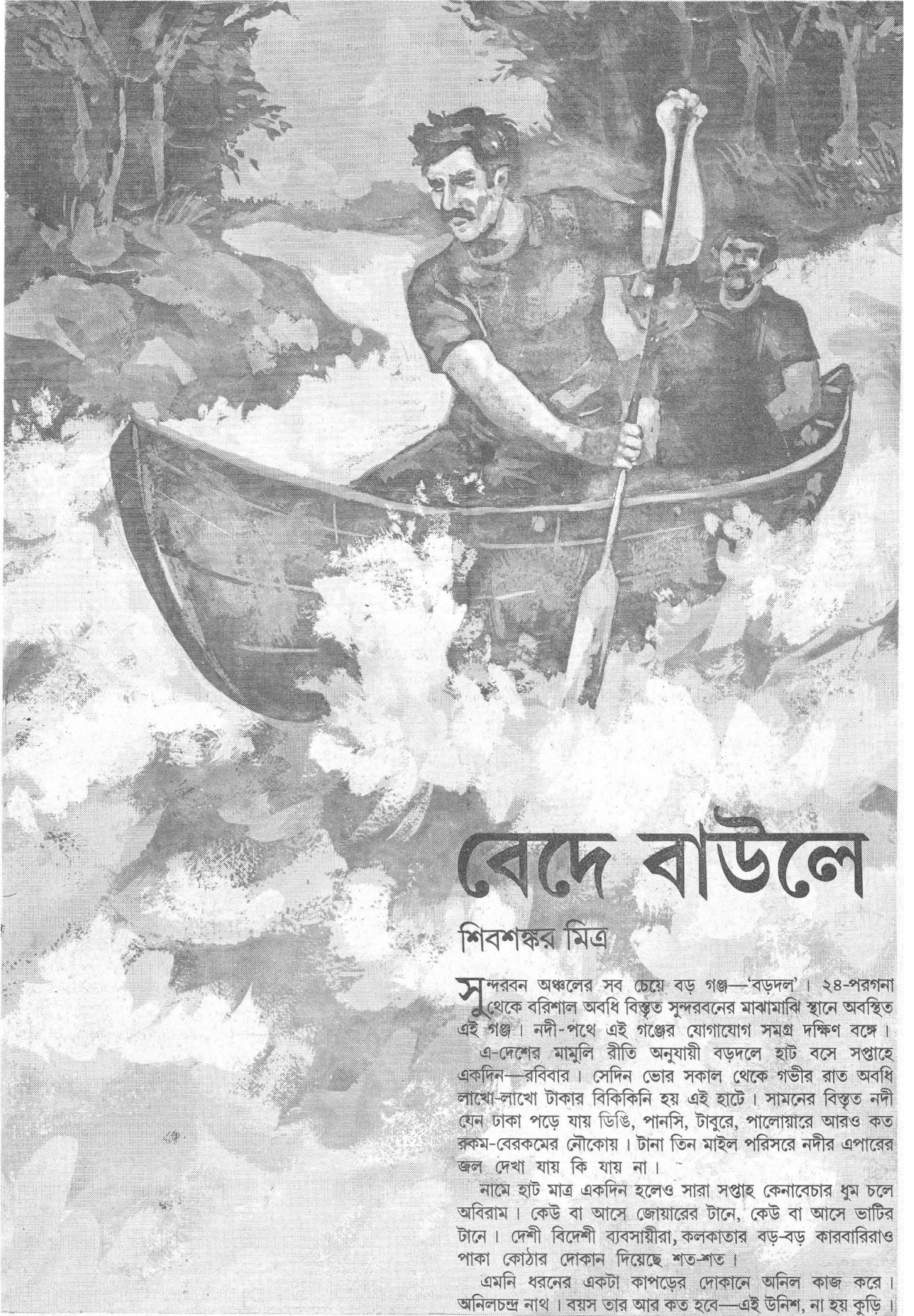
বেদে বাউলে

শিবশঙ্কর মিত্র

সুন্দরবন অঞ্চলের সব চেয়ে বড় গঞ্জ—'বড়দল'। ২৪-পরগনা থেকে বরিশাল অবধি বিস্তৃত সুন্দরবনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত এই গঞ্জ। নদী-পথে এই গঞ্জের যোগাযোগ সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে।

এ-দেশের মামুলি রীতি অনুযায়ী বড়দলে হাট বসে সপ্তাহে একদিন—রবিবার। সেদিন ভোর সকাল থেকে গভীর রাত অবধি লাখো-লাখো টাকার বিকিকিনি হয় এই হাটে। সামনের বিস্তৃত নদী যেন ঢাকা পড়ে যায় ডিঙি, পানসি, টাবুরে, পালোয়ারে আরও কত রকম-বেরকমের নৌকোয়। টানা তিন মাইল পরিসরে নদীর এপারের জল দেখা যায় কি যায় না।

নামে হাট মাত্র একদিন হলেও সারা সপ্তাহ কেনাবেচার ধুম চলে অবিরাম। কেউ বা আসে জোয়ারের টানে, কেউ বা আসে ভাটির টানে। দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীরা, কলকাতার বড়-বড় কারবারিরাও পাকা কোঠার দোকান দিয়েছে শত-শত।

এমনি ধরনের একটা কাপড়ের দোকানে অনিল কাজ করে। অনিলচন্দ্র নাথ। বয়স তার আর কত হবে—এই উনিশ, না হয় কুড়ি।

গোঁফ-দাড়ির রেখা দেখা দিয়েছে সবে। অনিলের দোহারা চেহারা শত-শত লোকের মধ্যে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে না হোক, গ্রামে গ্রামে দু-একজন যুবক থাকে—কেমন যেন তাদের দেখলেই মনে হয় কবি-কবি ভাব। অনিল তেমন দেখতে হলেও তার দেহের গড়ন কিন্তু বলে দেয়—সে শক্তিধর আর কর্মঠও বটে।

কিন্তু মা-র তো ছেলের চরিত্র বুঝতে বেগ পেতে হয় না ; তাই মা অনিলের আদুরে নাম দিয়েছিলেন 'বেদে'। রাতদিন বনে-বাগানে, না হয় মাঠে ও বিলে ঘুরে বেড়াবে। সংসারে জমি-জিরেত বিশেষ নেই। সংসারে আর কেউ সমর্থজন না থাকাতে বিধবা মা একদিন বেদেকে অনুরোধ উপরোধ করে বলেন, "কী রে! এমনি করে শুধু ঘুরে বেড়ালেই হবে! লেখাপড়া যা একটু শেখার তা তো হয়েই গেছে। কিছু আয়টায় কর। এমন ভাবে আর তো সংসার টানা যায় না!"

বেদে বেশ আত্মম্ভরিতার সঙ্গে বলে, "কেন? আমি আয় করি না? এই তো সুপুরি পাকলে কত টাকা এনে দিলাম। দিইনি?"

"তা তো দিয়েছিস! কিন্তু তাতেই কি বছর ঘোরে? যা না বড়দলে। একটা কাজ নিশ্চয়ই মিলবে।"

"তোমার যেমন মেয়েলি বুদ্ধি! গঞ্জ হলেই মনের মানুষ মেলে?"

"রাখ তোর কাব্যি। যা না নগেন দত্তের বিলেতি কাপড়ের দোকানে। অত বড় দোকান ওখানে আর একটিও নেই। একটা না একটা কাজ ওখানে মিলবেই।"

সুপুরি পেড়ে কিছু পয়সা অনিল সত্যিই তিন-চার বছর এনেছে। ভবঘুরে হয়ে ঘুরতে অনিল যেমন মজা পেত, তেমনি কথা-নেই বার্তা-নেই গাছের ডালে উঠে দোল খাওয়াও ওর নেশা ছিল।

এই নেশাই সুপুরি পাড়ার কাজে ওকে টেনে নেয় বটে, কিন্তু ওর আত্মপ্রতিষ্ঠার লোভও ওকে কম টানেনি।

যশোর, খুলনা বা বরিশালের সুপুরি-বাগান যে দেখেনি, তার পক্ষে এই নেশা বোঝা দায়। শত-শত সুপুরি গাছ একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ-পঁচিশ হাত মাথা তুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে সারা বাগান জুড়ে। অনিল কিন্তু প্রতি গাছে ওঠা-নামা করে সুপুরি পাড়ে না। দীর্ঘ বাগানে একটা গাছেই মাত্র একবার ওঠে। তারপর দে-দোল করে সে গাছের মাথা দোলাতে দোলাতে ঝুলের মাথায় চট করে আরেকটা গাছের মাথা জড়িয়ে ধরে সে গাছে চলে যায়। এমনি করে দোলার পর দোলা খেয়ে প্রায় শ'খানেক সুপুরি ভাঙার পর শেষ গাছটা আলগোছে হাতে-পায়ে জড়িয়ে ধরে সেদিনের মতো সড়-সড় করে মাটিতে নেমে আসে। বাগানের মালিক তো ব্যাপারখানা দেখে বলে ওঠে, 'শাবাশ!'

গাছ থেকে গাছের দোলানি আর এই 'শাবাশ'-টুকু পেতেই অনিল মশগুল। গুনতিতে কত পয়সা পাবে কি পাবে না, সেদিকে ওর মন থাকত না।

* * * *

এখন দোকানেই অনিল পয়সা রোজগার করছে। কিন্তু এই দোকানের কাজই ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। দোকানি বিধবা মায়ের অনুরোধ মেনেছে বটে, কিন্তু কাজ দিয়েছে মাত্র সপ্তাহে তিনদিন। অনিলকে কাজ করতে হয় শনিবার, রবিবার আর সোমবার। সপ্তাহে এই তিনদিনই দোকানে থকে মহাভিড়। শনিবার প্রস্তুতির ঝামেলা, রবিবার খদ্দেরের তাড়াহুড়ো ও হৈ-হল্লা, আর সোমবার উৎসবের শেষ-বেশ ও হিসেব-নিকেশ। তারপর চারদিন ছুটির পরিবেশ। অনিলের মতোকাব্যিক মনের পক্ষে বন-বাদাড়ের এই অঞ্চলে আমেজ উপভোগ করতে এতটুকুও বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে কাল হল একটা বন্দুক। শনিবার দোকানে যে কোণটায় বসে অনিল হিসেব-নিকেশের কাজটা করত, তারই সামনে মালেকের গদির পাশেই এই বন্দুকটা ঝুলত। যতই দিন যায় ততই এই বন্দুকটা আকর্ষণ করতে থাকে অনিলকে। আবাদি নদীর দমকা হাওয়ায় বন্দুকটি একটু নড়ে উঠলেই অনিল একবার

সেদিকে তাকাবেই তাকাবে। তেমন দোলানি হলে তো হাতের কর গুনে হিসেব করতে গড়বড় হয়ে যেত ; আবার নতুন করে কর গুনতে হত।

বন্দুক মানেই তো শুধু প্রাণ-হরণকারী যন্ত্র নয়। বনের রহস্যে আমোদিত হবার ভরসা জোগায় এই অস্ত্র। কাজেই এই বন্দুকই অনিলকে টেনে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত বনে—সুন্দরবনের বাদায়।

মালেক ঠিক নয়, মালেকের ছেলে ; নাম হলো অবিনাশ সাহা। সে নিজেই শনিবার দোকানের হিসেব-নিকেশ দেখত। ভাটি অঞ্চলের মানুষের কেমন যেন গালভরা নাম পছন্দ হয় না। 'অবিনাশ'কে সরল করে নিয়ে ওকে প্রথম প্রথম সবাই ডাকে 'বিনাশবাবু' বলে। ফাঁকা নদীর দেশে একে অপরকে হাঁক দেবার সময় শব্দ যেন ছুঁড়ে মারতে হয়। সেইজন্যই 'বিনাশবাবু' শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে 'বিলাসবাবু'।

একদিন অনিল তো কাজের ফাঁকে ঝুলন্ত বন্দুকের দিকে তাকিয়ে বলেই বসল, "তা বিলাসবাবু ! বন্দুকে তো মরচে ধরে যাবে ! চলো না একবার বনে ঘুরে আসি ?"

উঠতি বয়সের রক্ত বিলাসবাবুর গায়েও। সঙ্গী পেয়ে ঝট করে বলে, "তা কার না ইচ্ছে করে, বলো ? কিন্তু বাপে কি ছাড়বে !"

"তুমি তো আচ্ছা, বাপে জানবে কোত্থেকে ? সুন্দরবন তো এক পোনের পথ, ভাটিতে যাব আর জো-তে ফিরে আসব। সকালে যাব, বিকেলে ফিরে আসব। ধরা পড়লে, সটান বলতে বাধা কী—দোকানের বাকি-বকেয়া আদায় করতেই তো গিয়েছিলাম !"

এমনি করেই একদিন শুরু হয় ওদের সুন্দরবন অভিযান। সুন্দরবনের সংস্পর্শে এসে বিলাসবাবুর কী হয়েছিল বলতে পারব না। তবে, অনিল যেন একদম মজে যায়। সুন্দরবনের সঙ্গে বেশিদিন দেখা না হলে যেন ওর মন উসখুস করতে থাকে।

প্রথম যেদিন যায় সেদিন সঙ্গে বন্দুক ছিল বটে, কিন্তু শিকারের কথা মোটেই ভাবতে যায়নি। ভয় ছিল দুটো—প্রথমত, বাঘের; আর দ্বিতীয়ত, বনকর পেট্রলবোটের। এই দুইয়ের খপ্পরে যাতে ওদের না পড়তে হয়। অঘোষিত ভাবে সুন্দরবন তো বাঘের রাজ্য ; আর বন মানে তো শুধু বন আর বাঘ নয়, বন এক মহাসম্পদ, আর সে সম্পদের ঘোষিত রাজা হলেন বনকর অপিস। দুই-ই দুভাবে বনের রক্ষক। বনের আওতায় এলে কখন যে এরা আচমকা ছোবল মারবে, তার হদিস পাওয়া দায়।

বনের সীমানা বরাবর বড় নদী থেকে একটি খাল বনের মধ্যে সর্পিল গতিতে প্রবেশ করেছে। খালটি খুব বড়ও না, আবার খুব ছোটও না। ভাটি শেষ আর জো আগন্তুক ; জলের গতি থমকে আছে। অনিল ডিঙির মুখ খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ডিঙিতে ওরা মাত্র দুজন—পেছনের গলুইতে অনিল বোঠে হাতে, আর সামনের গলুইতে বিলাসবাবু বন্দুক হাতে। ধারে-কাছে চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেমন কোনও জীবন্ত জীব নেই, তেমনি কোনও তৃতীয় মানুষের সাড়াও নেই। নিঝুম—এত নিঝুম যে ওদের গা শিরশির করে ওঠে। ওদের কথাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। আশপাশের কাকলি যেমন মানুষকে সরব করে তোলে, নিদারুণ নির্জনতাও তেমনি মানুষের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেয় যেন। অনিলকে বোঠে চালাতেই হচ্ছে। কিন্তু বোঠে এখন জল থেকে না তুলেই চালাতে থাকে—যাতে বোঠে আর জলের আঘাতে ছপ্‌ছপ্ শব্দে ওদের আগমনবার্তা আগেভাগেই ঘোষিত না হয়ে যায়।

একটা বাঁক ঘুরতেই অনিল চমকিত এবং পুলকিতও বটে। খালের দুপারের বড়-বড় গাছগুলি যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই হেলে একে অপরকে শাখার বাহু-বিস্তারে আলিঙ্গনাবদ্ধ। একে অপরে জড়াজড়ি করে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করেছে। নীচে পলিসিক্ত শুভ্র জলধারা, আর মাথার উপর গাঢ় সবুজ পাতার ছাদ। এমন সুড়ঙ্গ-পথে এগুনো ঠিক হবে কি না, তা না ভেবেই অনিল এগিয়ে নিয়ে যায় তার ডিঙি এই মজার পরিবেশে।

আলো-আঁধারে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ-পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে। এতক্ষণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ ছিল, এবার ওদের ভয়গ্রস্ত ও আশঙ্কান্বিত হবার পালা। খাল হঠাৎ বিস্তৃত হয়ে একটা গোলাকার জলাশয় সৃষ্টি করেছে বনের গহিনে। এই ফাঁকা জলাশয় সূর্যালোকে আলোকিত। আর তাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছে ঠাসা গোল-ঝাড়ের বলয়। ডিঙির মাথা এই জলাশয়ে প্রবেশ করতেই দূরে যেন কোনও বড় জলজীব জলকে তোলপাড় করে তুলল। বড় কইভোল মাছ, না কামোট, না কুমির—তা পরখ করার অপেক্ষা না করে অনিল মুহূর্তমধ্যে ডিঙি ঘুরিয়ে দিয়ে পশ্চাৎগামী। এবার ধীরেসুস্থে নয়, ঝপ্‌ঝপ্ করে বোঠে চালাল। বিলাসবাবুও বিপদ গুনে বন্দুক রেখে ক্ষিপ্রবেগে বোঠে চালাল। যে-কোনওভাবে দ্রুত ফিরে আসতে হবে বড় নদীতে, তারপর অন্য চিন্তা।

ফিরে এল ওরা সে-বারের মতো। ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে এল। ফিরলে কী হবে, সুন্দরবনের উপকূলবাসী যুবক ভয়ের প্রথম ঝলকে সন্ত্রস্ত হলেও পিছপাও হয় না। ওরাও হয়নি।

এরপর বারবার কতবার যে ওরা দুজনে বনে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। বড়দলের হাটে কোনও শিকারির সন্ধান পেলে তো কথাই নেই ; তাকে আপন করে নিয়ে বাঘ বা হরিণ শিকারের গল্পে মেতে উঠত। বাঘ-শিকারের গল্পে ততটা উৎসাহিত হত না। কারণ, ওরা ধরেই নিয়েছিল ওটা ওদের এখন এক্তিয়ারের বাইরে শুধু নয়, সাধ্যের বাইরেও। কিন্তু কোথায় হরিণ পাওয়া যায়, কী ভাবে পাওয়া যায়, আর কীভাবেই বা শিকার করা যায়, তা জানবার জন্য ওদের ব্যগ্রতার শেষ ছিল না। শুনতে শুনতে আর বারবার বনে গিয়ে শোনা কথা পরখ করতে করতে ওদের আত্মবিশ্বাস এসে গেছে—ওরা একদিন না একদিন হরিণ শিকার করতে পারবেই। পারতেও দেরি হয়নি। এখন ওরা সুযোগ পেলেই বনে যায়, আর প্রায়ই শিকার করে নিয়ে আসে।

একবার একই দিনে এবং এক যাত্রায় দুজনে তিন-তিনটে হরিণ শিকার করে আনলে বড়দলে 'ধন্যি-ধন্যি' পড়ে যায়। তিনটির মধ্যে দুটি ছিল শিঙেল। শিং নিয়ে বড়দলের দোকানিদের মধ্যে রেষারেষি দেখা দেয়। সে যে নিজেই তিনটি হরিণ শিকার করেছিল এবং বড়দলের অনেক অনেক দোকান-ঘরে মৃগ-মাংসের ভাগ দিতে পেরেছিল—তাতেই অনিল পরম পরিতৃপ্ত। উৎসাহে তার মা-কেও টেনে নামায় ঘর-ঘর মাংস বিতরণের কাজে। 'শাবাশ' কথাটা এবার মা-র মুখ থেকেও শুনে বেদে যেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে যায়। সে নিজের জন্য কিছুই রাখেনি—মাংস, চামড়া বা শিং, কিছুই না। সবই বিলিয়ে দেয়।

বড়দলের স্থায়ী বাসিন্দাদের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আদর-আপ্যায়ন পেয়ে অনিলের দিনগুলি সহজ হয়ে এসেছিল। মা তো বেদের বিয়ে-থাতে রাজি করাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কাল হল ১৯৫০ সাল। খুলনার ১৯৫০ সালের দাঙ্গা। তার রেশ বড়দলেও পৌঁছতে দেরি হয় না। দাঙ্গা অবশ্য এখানে হয়নি। কিন্তু হিড়িক পড়েছে সরে পড়বার। ডিঙির পর ডিঙি জুটিয়ে হাঁড়িকুড়ি, বিছানা-পেট্‌রা নিয়ে জো'তে ভাসিয়ে দিচ্ছে আশাশুনি-হিংগলগঞ্জ পথে।

একে একে নয়, দলে দলে। দলে দলে বটে, তবে হৈ-হল্লা বিশেষ নেই। বিপদে-আপদে দলে দলে চলার নেশা সর্ব মানুষের। এমন অবস্থায় দেশ-ভুঁই ছেড়ে যাবার পেছনে অকাট্য যুক্তি থাকলেও, কিসে যেন ওরা ম্রিয়মাণ ! বাঘের ভয়ে নয়, বন্যার ভয়ে নয়, প্লাবনের ভয়ে নয়, মহামারীর ভয়ে নয়—এসবের বিরুদ্ধে ওরা রুখে দাঁড়াতে জানে। শেষ পর্যন্ত কিনা মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাসের আগুনে ওরা পলাতক ! ওরা যেন মাথা তুলে কথা বলে না আর। তাই হৈ-হল্লা বিশেষ ছিল না। একমাত্র ছোটদের কাছে এটা একটা মজার যাত্রা ছিল—মা-বাবা, পাড়াপড়শি সবাই একত্র চলেছে। এতেই যা একটু সরবতা দেখা দেয় এই মানুষের ভিড়ে।

হিংগলগঞ্জ পশ্চিম-বাংলার সীমানায় কালিন্দী নদীর তীরে। তারপর এক জো'তে পৌঁছে যাবে সবাই হাসনাবাদ- কলকাতার রেলপথ ধরতে। কলকাতামুখী হলে আশ্রয় নিশ্চয় মিলবে, এটা এ দেশের সবারই বদ্ধমূল ধারণা। কলকাতা মহানগরী, মহান তার আতিথ্যও।

অনিল ও তার মা ভিড়ে পড়েছে এই দলে। বিলাসবাবুই ওদের ডিঙি জুটিয়ে দিয়েছিল। বিলাসবাবুদের ডিঙির বহরও এই সঙ্গে

চলেছে। মা-র এক মহা বিশ্বাস ছিল—আর কিছু না হোক, বিলাসবাবু ওদের একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবেই দেবে।

বিলাসবাবুর বহরের পাশেই অনিলের ডিঙি। এক ফাঁকে কিছু সময়ের জন্য বিলাসবাবু সে ডিঙিতে এক লাফে এসে পাটাতনের উপর লেপ্‌টে বসে মা-র সঙ্গে গল্প করে যায়। গল্প যাই হোক্, তার মধ্যে অনিলের নানা-গুণের তারিফই ছিল বেশি। মা বিশেষ কথা বলেননি। 'হ্যাঁ' বা 'না' বলেই সব প্রশ্নের উত্তর শেষ করে দেন। শুধু বারবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন—এই ছেলেটাই আজ ওঁর ভরসার স্থল। বারবার কামনা করেছেন, বেদে যেন ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে মুহূর্তের জন্য কোনওদিন ভুলে না যায়!

বড়দল থেকে কয়েক বাঁক উত্তরে এগিয়ে ওরা আশাশুনির খাল ধরেছে। এবার সোজা পশ্চিমে চলে যাবে কালিগঞ্জ অবধি। গোটা পথটা কিন্তু একটানা যাওয়া যায় না। আশাশুনি খাল দোয়ানি ; দু'দিক থেকে জোয়ারের জল ঢোকে। এই দীর্ঘ খালপথে প্রথমার্ধ জোয়ারের টানে এগুতে হবে, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভাটির টানে কালিগঞ্জ পৌঁছতে হবে। মাঝ-পথ থেকে ভাটির টান ধরতে কিছুটা গড়িমশি করতে হয়, অথবা লগি পুঁতে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয় যাত্রীদের। দুদিকের জো'র জল ধাক্কা খেয়ে এখানে দুপাশে বিস্তৃত বিল সৃষ্টি করেছে। এখানেই যত ডাকাতের ভয়। ছিপ্ নৌকোয় তীর-বেগে এসে লুটপাট করে বিলের মাঝ দিয়ে রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। কিন্তু তেমন ডাকাতের ভয় আজ মিছে—নৌকো ও ডিঙির বহর চলেছে গায়ে গায়ে, প্রায় গোটা খালটা জুড়ে। খালটা যেন লোকে-লোকারণ্য।

বড়দল থেকে আশাশুনি অবধি অনিল যাত্রা শুরুর প্রাথমিক তোড়জোড় বা গোছগাছ নিয়েই ব্যাপৃত ছিল, মা-কেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। আশাশুনি আসতে যেমন সন্ধ্যাও নেমে এসেছে তেমনি ব্যতিব্যস্ততাও কমে এসেছে। স্থির হয়ে বসে অনিল এবার ডিঙির হাল ধরেছে। স্থির হল বটে, কিন্তু মনের মাঝে একটা বেদনাসিক্ত তোলপাড় শুরু হতে থাকে—এ কোথায় চলেছি দেশভুঁই ছেড়ে ; বনকে পেছনে ফেলে এ কোন্ ইট-পাথরের দেশে চলেছি! পাকা ঘরবাড়ি আর পাথরের রাস্তায় আমার স্থান কোথায় হবে! শেষ পর্যন্ত আমাদের ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে না নিতে হয়!

যতই এগিয়ে চলে ততই যেন অনিল পিছনের টান অনুভব করতে থাকে। কিন্তু এই টান কিসের জন্য তার কার্য-কারণ তখনকার মতো ধরতে পারে না। যুক্তি পায় না, তবুও পিছুটানকে অবজ্ঞা বা অবহেলাও করতে অপারগ হয়ে উঠেছে। এই সবুজ গাছ, এই তরতরে নদী, এই ধুধু আবাদ? না, সে তো আগেই দেখেছে কলকাতার উপকূল অবধি গাছের ওপর গাছের সবুজ ঝাড়, দেখেছে খাল ও নদীর জাল, দেখেছে ধানখেতের ফাঁকা মাঠ। তাহলে, কিসে ওকে পেছনে টেনে ধরছে!

মা তো বেদের এই ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করেন, "কীরে! তুই যে চুপ মেরে গেছিস! কী হল তোর? এধার-ওধার সবাই কত কথা বলছে, তুই যে চুপসে গেলি! আরে, তোকে অত ভাবতে হবে না। বিলাসবাবুই তো তোকে ভরসা দিয়েছে একটা কিছু বিহিত হবেই। দেয়নি তোকে ভরসা!"

বেদে মা-র কথা শুনে কেমন যেন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ভরসা !! বিলাসবাবুই তো তার ভরসায় বনে উঠত, তাই না! ...... ওর ক্ষুব্ধ মনে বনের কথা উঠতেই নিজের বেদনার মূল যেন হঠাৎ খুঁজে পায়—যে-বনে সে নিজেই অন্যের ভরসা, সেই বন ছেড়ে সে আজ কোথায় চলেছে? না, না, বন ছেড়ে কোথাও যাব না। ..... বনই আমার ভরসা। বন আছে, আর আছে আমার এই ডিঙি .. কে আমাকে জীবন-যুদ্ধে হারাবে !!

তোলপাড় করা এই আবেগ বেদের মনে এল বটে, কিন্তু মা-কে কিছুই বলতে পারে না। মা-র মনে যে ব্যথা লাগবে। বলুক, মা বলতে থাকুক। গৃহ-হারা গৃহিণীকে পাগল করে তোলা বড় বেদনাদায়ক। চুপ করেই রইল বেদে। আর বিড়-বিড় করে বলেই চললেন মা।

রাত গভীর, ভাটাও অনেকক্ষণ এসে গেছে। সামনেই কালিগঞ্জ। মাঝারি ধরনের গঞ্জ। না, ডিঙির বহর এখানে থামবে না। সোজা কালিন্দী নদীতে পড়ে ভাটি থাকতেই ওপার হিঙ্গলগঞ্জে ভাটির চরে লগি পুঁতবে। যাতে জো'র প্রথম টানেই ওরা নৌকো ভাসিয়ে দিতে পারে—উত্তরমুখো। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে প্রায় এক জো'র মুখে হাসনাবাদ—তারপরই কলকাতার পথে বা ছোট রেলগাড়িতে। কিন্তু তারপর? তার কোনও হদিস নেই। নাই বা থাকল, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তো পা দেবে ওরা!

কালিন্দী নদীতে পড়বার মুখে মা তো শেষ রাতের আবছায়া আলোতে বিলাসবাবুর ডিঙির সন্ধান হারিয়ে ফেলেছেন। বিড়বিড় করে বলেন, "হাঁ রে বেদে! সে ডিঙি তো দেখছি না!"

"রসো! এবার বড় নদীতে, সাবধানে আঁকড়ে ধরে বসো।... বিলাসবাবু.... বিলাসবাবু...!"

বেদের ঝাঁঝালো সুরে মা প্রমাদ গুনলেন। এপার হিঙ্গলগঞ্জের চরে সবাই লগি পুঁততেই ভোরের আলোয় পাটাতনে দাঁড়িয়ে বিলাসবাবুর ডিঙি খুঁজতে থাকেন। সেই ডিঙির পাশাপাশি থাকতে মা বড় ব্যস্ত।

বেদে চরে নেমে ভেড়ির ওপর দোকানগুলির দিকে হাঁটু-কাদা ভেঙে এগুতেই মা কেঁদে ওঠেন।

বেদের রুদ্ধ আবেগ এবার রুক্ষ হয়ে যেন ফেটে পড়ল, "না মা, আমি যাব না, যাব না উত্তরমুখো। এপার যখন এসেছি, ওপার আর যাব না। কিন্তু ...বন, বন আমি ছাড়ব না। বনের পাশেই আমি থাকব। যাব না ওদের সঙ্গে!"

যেমন দৃঢ়ভাবে কথাগুলি বলল, তেমনি দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটু-কাদা ভেঙে উপরে উঠে গেল।

ক্রন্দনরত মা-কে ফেলে অনিল বেশিক্ষণ বাজারে থাকতে পারে না। কোনমতে চিড়ে-বাতাসা কিনে যেন ছুটে চলে আসে ডিঙিতে।

তখনও মা ডুকরে-ডুকরে কাঁদছেন দেখে বেদে আর থাকতে পারে না। "চলো মা! তোমার যখন এতই সাধ, তোমাকে বিলাসবাবুর ডিঙিতে দিয়ে আসি। তুমি কলকাতা যাও। আমি যাব না... কিছুতেই যাব না।"

কথাগুলি শুনতেই মা-র কান্না থেমে গেছে। চুপ করে কালিন্দীর থম মারা জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বেশ আস্তে আস্তেই বললেন, "বেদে! তুই কি পাগল হয়েছিস! আমি তোকে ছেড়ে কোথায় যাব! তোর যা খুশি তাই কর।"

এবার বেদের চোখে জল আসার পালা। ভিজে চোখের পাতায় ধরা গলায় বলল, "মা, চিড়ে খাবার ব্যবস্থা করো। জো' এসে গেছে। এবার ওরা লগি তুলতে ব্যস্ত হবে। যাক্‌গে ওরা যে চুলোয় যেতে চায়। আমরা এবার চান করে খেয়েটেয়ে নি। তারপর ভাটির টানে আমরাও চলে যাব উলটো দিকে।"

শ'খানেক ডিঙি আর নৌকো-বোঝাই ভাবনায় পীড়িত মানুষের দল দেখতে দেখতে জোয়ারের টানে আর পালের হাওয়ায় 'ভাসিয়ে দিল তাদের তরী'।

* * * *

দুপুর গড়াতে না গড়াতে ভাটি এসে গেছে। কাপড় ঠেকা দিয়ে ডিঙিতে খুপরি বানিয়েছিল অনিল। গায়ে আড়মোড়া দিয়ে তারই ভিতর থেকে বাইরে উঠে এসে বলে ওঠে, "দেখেছ মা! আমরা একা নই। কত নৌকো একে একে ছাড়ছে ভাটির টানে! এরা সব নিশ্চয় এসেছিল মালপত্র নিয়ে হিংগলগঞ্জের হাটে। মালপত্র ওপার পাচার করে এরা এখন ঘরমুখো। চলো, আমরা এদের সঙ্গেই চলে যাব।"

মা এখন শান্ত। ছেলের ওপর একান্ত নির্ভরশীল। বললেন, "ভালই হল, বেদে! ওদের সঙ্গে সঙ্গেই চল। তাড়াতাড়ি লগি তোল।"

স্রোতের টানে বনের উপকূলে আসতে দেরি হয় না। বন দেখতেই অনিল যেন চিৎকার করে বলে ওঠে, "মা! মা! দেখেছ বন! তুমি তো কোনোদিন বনে ওঠোনি। এবার দেখে নাও সুন্দরবন কাকে বলে।"

মা-ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, "এগুলি কী গাছ? এ গাছ তো বড়দলে

দেখিনি।”

“দেখবে কোত্থেকে ? এ গাছ বনে ছাড়া আর কোথাও মেলা দায়। ঐ দ্যাখো গরান আর গেঁয়ো গাছের ঝাড়। বনের এই ‘ঘেরের’ নামও আমি জেনে নিয়েছি। এটা হল গিয়ে ঝিলার বন। এখানেও বেশ হরিণ পাওয়া যায়।”

কাপড়ের খুপরিতে একটু গা এলিয়ে দিতে গিয়ে মা মাদুরে মোড়া কাঁথা-বালিশ বের করতে গেছেন। বের করবেন কি ! আঁতকে উঠে চাপা গলায় যেন আতর্নাদ করলেন, “বেদে ! বেদে ! এটা কী রে ?”

“ওঃ তাইতো ! আশাশুনি বড্ড ডাকাতের ভয়। ভয়ে বিলাসবাবু ডাকাত তাড়াতে বন্দুকটা আমার হাতে দেন। আমিও ভুলে গেছি, উনিও ভুলে গেছেন নিতে। যেটা যার ভাগ্যে থাকে। যাকগে, ভালই হল।”

“ভালই হল ? ওর জিনিস তুই রেখে দিবি ? এটা কেমনধারা কথা হল ?”

“রেখে দাও ওটা কাঁথা-বালিশ চাপা দিয়ে। না হয়, পাটাতনের নীচে রেখে দাও। পিটেল-পুলিশ দেখলেই হুজ্জুত করবে। ... আরে, তোমার অত ভালমন্দ বিচার করতে হবে না।”

মায়ের বিবেককে শান্ত করতে অনিল আরও বলল, “আরে, আমরা তো পশ্চিম দিকেই যাব। কলকাতাও নিশ্চয় কাছে-পিঠে পড়বে। না-হয় একবার কলকাতায় গিয়ে বিলাসবাবুর খোঁজ করা যাবে।”

সত্যি সত্যি মা এবার শান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন, ঘুমিয়েও পড়লেন।

* * * *

অনিলের ডিঙি অনেক দূর এসে গেছে। বিশাল মাতলা নদীও পার হয়ে এসেছে। কিন্তু মাতলা পার হবার পর নৌকোর বহরও হালকা হয়ে এসেছে। এ-খাল সে-খাল ধরে যে যার বাড়িমুখো হয়েছে। তবুও ক্যানিং যাবার দলের সংখ্যাও খুব ছোট নয়। তাদের নৌকোর পাশেপাশেই অনিল এগিয়ে চলেছে।

মাঝপথে দু-একটা ছোট-বড় গঞ্জ যে পড়েনি তা নয়। কিন্তু কোনোটাই অনিলের পছন্দ হয় না। গোসাবায় ওরা যখন হাজির, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। জমজম্ করছে গোসাবা ডিঙি আর মানুষের মেলায়। অনিল ডাঙ্গায় উঠতেই যেন বড়দলের গন্ধ পায় ! চরের উপর সারি-সারি ডিঙি। নদীর ধারে রাস্তার দুপাশে দোকানের সারি। ভিতর দিকে পাকা বাড়ির মহল্লাও দেখা যায়। বড়দলের মতো স্টিমার স্টেশন নেই বটে, তবে লঞ্চ-ঘাট আছে। হঠাৎ অনিল সিদ্ধান্ত নেয়—এটাই হবে আমার আস্তানা। মা-র সম্মতি পেতেও দেরি হয় না। দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার অনেক কিছু আছে। তা থাকুক। বড়দলের ছোট ভাই এই গোসাবা।

বাদা আছে, ডিঙি আছে, আর বন্দুকও ভাগ্যক্রমে হাতে এসে গেছে। তা পাশি বা বে-পাশি বন্দুক হোক। বে-পাশি বন্দুক কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়, তার খবরাখবর আগেভাগেই অনিলের রপ্ত হয়ে আছে বড়দল থাকা কালে। কাজেই অনিলের পক্ষে গোসাবায় আস্তানা গাড়তে কোনোই বেগ পেতে হয়নি। শরণার্থী তাকে হতে হয়নি—এই গর্বেই সে গর্বিত। সে গর্ব অনিলের চোখে-মুখে সর্বত্র ফুটে থাকত।

দুটি প্রাণীর জীবিকার জন্য কোনোদিন চিন্তান্বিত হয়নি, আজও নয়। বনের অঢেল সম্পদ তো ওর নাগালের মধ্যে। সুন্দরবনের মানুষের মনে বনের সম্পদ আহরণের ব্যাপারে কোনও সংকোচ বা দংশন নেই। আইন মোতাবেক যাই হোক, এই কাজ ওরা কখনও অন্যায়ের মধ্যে ধরে না।

এবং এই কাণ্ডকারখানায় একে অপরকে সাহায্য করতে ওরা কার্পণ্যও করে না। কাজেই অনিলের জীবনটা ক'বছরের মধ্যে গোসাবায় সহজ হয়ে এসেছে।

সহজ হয়ে এলে হবে কি, অনিলের মনের দুটি আবেগ ওকে স্থির থাকতে দেয় না। ছেলেবেলার কবি-কবি ভাব এখন গোসাবার গানের আসরে আশ্রয় নিয়েছে। গান মানে ওর কাছে ভাটিদেশের ভাটিয়ালি গান। সে গানে সুরের সূক্ষ্মতা ও লহমার ওস্তাদি না থাকলে কী হবে, দীর্ঘ কপালে চন্দন-ফোঁটা টেনে হালকা বাবরি চুলের জটগুলি দোলা দিয়ে গলা ছেড়ে ঢেউয়ের দোলার মতো ভাটিয়ালির টান যখন দেয় তখন আশপাশের লোকেরাও তন্ময় না হয়ে পারে না। বিশেষ করে গোসাবার ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুকে এই গের্দের সবাই খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। সবারই তিনি প্রিয়। এই ডাক্তারবাবুই অনিলের গানের সেরা সমজদার।

তা হলে কী হবে ? ডাক্তারবাবু তো সবাই নয়। অনিল এই অঞ্চলের সর্বমানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তাদের সবার কাছেই ‘শাবাশ’ পেতে চায়। কিন্তু সুন্দরবনাঞ্চলে বনের উপর আধিপত্য না দেখাতে পারলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দায়।

তখন শীতকাল। হিমেল সন্ধ্যায় যে যার ঘরে এসে পড়েছে। বেদেও মা-র কাছে এসে গেছে। ভারী হাসিখুশি, আর কথায় কথায় ছড়া কাটছে।

“কী রে বেদে ! আজ কী হল তোর ? এত খোশমেজাজ কেন ?”

“আছে, আছে, কাল এক মজার ব্যাপার আছে।”

“কিসের মজা রে ! কেন, কাল বুঝি মেয়ে দেখতে যাবি ? ... তা দেখাদেখির আর কী আছে ! তুই তো বেদে, তোর সব মেয়েকেই ভাল লাগবে। .... আমি আর পারি না, কত কাল আর একা একা তোর হাঁড়ি ঠেলব !”

মা-কে হতাশ করে দিয়ে বেদে বলল, “কাল যাব বনভোজনে।”

“বনভোজনে !”

“না, ঠিক বনভোজন না। বাদায় কি বনভোজন হয় ! যাব হরিণ-শিকারে।”

“সেটা আর নতুন কথা কি ? সে তো তুই রোজই যাচ্ছিস।”

“না, সে-শিকার না। সে তো যাই বে-পাশি বন্দুক নিয়ে লুকিয়ে শিকার করতে। কাল যাব বিয়ের বরযাত্রীর মতো। জনা বারো যাব। ডাক্তারবাবু যাবেন, বড় ইস্কুলের মাস্টাররা যাবেন, আরও অনেকে যাবেন। সঙ্গে থাকবে তিন-তিনটে বন্দুক। তা ছাড়া আমার বন্দুক।

“আমার বন্দুক কী রে ? ও তো বিলাসবাবুর বন্দুক !”

“ঐ হল। এখন তো আমার।”

* * * *

রাত বারোটা। ভাটির টানে ওরা যাত্রা করেছে। বিরাট একখানা পানসি নৌকোয় জনা তেরো হৈ-হল্লা করে চলেছে। পানসির সঙ্গে দুখানি জালি ডিঙি। একেবারে ছোট্ট ডিঙি, কোনোমতে চারজনে চাপা যায়। সঙ্গে চারটি বন্দুক। ডাক্তারবাবুর বন্দুকটা ঠিক বন্দুক নয়, রাইফেল। হাজার হোক বাদা তো, সুন্দরবনের বাদা। বলা যায় না কখন কী হয়। মনের বাসনা, ওরা গের্দের সবাইকে হরিণের মাংস খাওয়াবে।

গন্তব্যস্থান সুধন্যখালের বনবিবির টাট্। গোসাবা থেকে দুগ্যাদোয়ানির পথে গুমোর নদীতে পড়বে। সেখান থেকে সজনেখালির দিকে যেতে ডান হাতে সুধন্যখালি। সুধন্যখালি খালও বলা যেতে পারে, নদীও বলা যায়। এই খালে তিন বাঁক এগুলে বনবিবির টাট্ তিন নম্বর পাশ-খালে। টাট্ মানে এই মালে বছর-বছর পলিমাটির চরার চত্বরে এদেশের মানুষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বনবিবির আরাধনা করে, মানত করে। এক কথায় তখন যেন নির্জন নিস্তব্ধ নিবিড় বনে শোরগোল তুলে মেলা বসিয়ে দেয়।

ওদের এই টাটে পৌঁছতে শেষ রাত হয়ে যাবে। ভোর না হতেই শিকারের তোড়জোড় করা চাই। এতগুলি লোকে জড়ো হয়েছে যেন এক উৎসবের মুখে ; কাজেই ঘুম কারো চোখেই নেই। ক'জনে মিলে লেগেছে কাঁকড়া মাছ ধরতে। শক্ত দড়িতে ‘থোপ’ দিয়ে কাঁকড়া মাছ সহজে ধরা যায়। ওরা ধরলেও প্রায় এক ঝুড়ি। শিকার হোক না হোক, আগেভাগে আগামী দিনের ভাতে উপকরণ জুটে গেলে বিনা তোড়জোড়ে।

পুবে উষার আলোর আভা দেখা দিতেই ওরা বনে উঠেছে। তিন দলে তিনটি বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেল নদী বরাবর। এক-এক দলে দুজন, আর একটি করে বন্দুক। বাকি সবাই নৌকোয় রইল ; তবে তাদের কাছেও একটি বন্দুক থাকল। কে জানে বিপদ কখন কোন্

পথে আসবে !

ছ'জনেই দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যায় । সুধন্যখাল বেশ কিছুটা দক্ষিণে এগিয়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে । এই বাঁকের মাথায় একে একে এবং বেশ দূরে দূরে অনিল দুটি দলকে কেওড়া গাছে উঠিয়ে দিল । নিজেও বেশ খানিকটা আরও এগিয়ে সঙ্গী মন্মথকে নিয়ে একটা কেওড়া গাছে ওঠে । সুন্দরবনের হরিণ গেয়োর পাতা, বানের পাতা ও ফল বা কাকড়াগাছের চাপান ফুল খায়, কিন্তু কেওড়া গাছের পাতা ও ফলই সবচেয়ে প্রিয় ওদের । কেওড়া গাছ বাছাই করার কারণও তাই ।

সবাই যে যার গাছে চুপচাপ বসে । খাল ও ওদের গাছের তলায় রোদ পড়তেই ওরা বানর ডাকা আর বানরে বানরে ঝগড়ার নকল করতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডাল-পাতা ভেঙে নীচে ফেলে । এ বিষয়ে অনিল খুবই সাবধানী—গাছের ডাল এমনভাবে ভাঙে যাতে পাতায় হাতের কোনও স্পর্শ না লাগে ।পাতায় মুখ দেবার আগে গন্ধ শুঁকে হরিণে ঠিক বুঝে নেয় কারা এই ডাল ভেঙেছে । পাতায় মানুষের হাতের গন্ধ পেলেই সোজা ছুটে পালাবে ।

একটু পরেই অনিলও হরিণের ডাক নকল করতে থাকে । দেখতে না দেখতে একটা হরিণ-শিশু এসেছে । শিশুকে দেখে অনিলের গুলি করতে মন চায় না । ডাকাও থামিয়ে দিয়েছে । এমন সময় দেখে দূরে একটা বড় শিঙেল ঝোপের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে অনিল মেয়ে-হরিণের স্তিমিত ডাক 'উ.....উ' নকল করতে শুরু করে । শিঙেল হরিণের ডাক বড় উচ্চগ্রামে । এত উচ্চগ্রামে যে অনেক সময় শিকার বুঝে ফেলে আসল না নকল । কিন্তু হরিণীর স্তিমিত ডাকে আসল কি নকল তা সহসা ধরা দায় ।

শিঙেল এগিয়ে আসতে থাকে ধাপে ধাপে অতি সন্তর্পণে । এখনও অনিলের নিজস্ব বন্দুকের আওতার মধ্যে আসেনি । ত্রিশ ইঞ্চি নলের বন্দুক, রেঞ্জ কম । অনিল চঞ্চল হয়ে উঠেছে । আর দেরি করতে ভরসা পায় না, চোট্ করে দিল । সঙ্গে সঙ্গে শিঙেল এক লাফ দিয়ে ছুটে গেল । অনিল চিন্তিত, তাহলে কি গুলি লাগাতে পারেনি !

ভাল করে তাকিয়ে দেখে, চত্বরে পলিমাটি প্রলেপের উপর গুলির চিহ্ন । কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হয় না গুলি ঠিকমত লেগেছে বলে । ইঙ্গিতে মন্মথর কাছে জানতে চাইলে সে-ও নীচের ঠোঁট উলটে জানিয়ে দেয়, সেও বুঝতে পারেনি ।

অনিল একটু ইতস্তত—নামবে কি নামবে না । মনে আশঙ্কা—নেমে এগিয়ে গেলে দূরে অন্য দুটি দলের শিকার ব্যাহত হতে পারে । দোমনাভাব কাটতে অবশ্য বিশেষ দেরি হয় না । সাঙাতদের কাছ থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসে । আওয়াজটা বাঁধা আওয়াজ ; বিদ্যুৎগতিতে ফর্‌ফর্ শব্দে ডাল-পাতা ভেদ করে যাবার আওয়াজ নয় । নিশ্চয় শিকারের দেহ ভেদ করেছে । পরপর কয়েকটি চোটের আওয়াজ ।

অনিল ও মন্মথ নেমে এল । কিছুটা এগিয়ে দেখে, ঝাঁকাল বানগাছের আড়ালে ওদের শিঙেল গলাটা লম্বা করে এগিয়ে দিয়ে মরে পড়ে আছে । ভাল করে একবার দেখে নিয়ে খুশি মনে বলে, "সাঙাত, কলজেতেই লেগেছে, তা না হলে অমন করে মরত না ! চলো যাই, এখানে দেরি কোরো না ।"

ওদিকে অন্য সাঙাতেরা সবাই নেমে জড়ো হয়েছে । অনিল সেদিকে দ্রুত এগিয়ে খুব ব্যস্তভাবেই ওদের বলে, "তোমাদের কী হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই । যাও তোমরা, শিঙেলটা বেঁধে ধরাধরি করে নিয়ে যাও, নৌকোয় আমি আর মন্মথ যাচ্ছি তোমাদের শিকারের খোঁজে ।"

মন্মথকে প্রায় হাতে ধরে টেনে নিয়ে অনিল রক্তের চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে যায় শিকার-সন্ধানে । এইভাবে আহত হরিণের পেছনে যাওয়ায় সুন্দরবনে এক মহা বিপদ আছে । বহু সময় বাঘের মুখোমুখি হয়ে পড়তে হয় । অজস্র হরিণ দলে দলে ঘোরে এই বনে । তাহলেও বাঘকে বহু মেহনত করে এদের শিকার করতে হয় । কাজেই সে এমনি ধারা সুযোগের তকেতকে থাকে । আহত হরিণকে বাগে আনতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না । অনিল এ কথা জানে । জানে বলেই ওদের না যেতে দিয়ে নিজেই এই দায়িত্ব নিয়েছে । তাছাড়া অনিলের মনটাও খুব তেজি হয়ে আছে । অত বড় শিঙেলটা যে এইমাত্র মেরে এসেছে ।

ওরা দুজনে এখন গভীর বনে । সারা পথ শিকার মাঝে মাঝে শুয়েছে আর রক্ত ঝরে পড়েছে সেখানে, আবার এগিয়ে গেছে । গুলি নিশ্চয় ওর পেটে লেগেছে, বুকে লাগেনি । সামনে একটা ছোট্ট নদী কিন্তু ভরন্ত জোয়ার । সুধন্যখালের জলে কামোট ও কুমিরের বড় দাপটি, জোয়ার হলে তো কথাই নেই । এ অঞ্চলের বনবাসী জীবেরও সে খেয়াল নিশ্চয় আছে কিন্তু নিতান্ত প্রাণে বাঁচার আশায় সটান নদী পার হয়ে ওপারে যেতে আহত হরিণ দ্বিধা করেনি ।

'খলসে' গাছের একটা মোটা ডাল পুঁতে চিহ্ন রেখে অনিল সঙ্গীকে বলে, "চল, জলে নামা ঠিক না, ডিঙিতে পার হওয়াই ঠিক । চল্, ফিরে যাই ।"

নৌকোয় ফিরে এসে দেখে, ডাক্তারবাবুর তদারকিতে কাঁকড়া মাছের শাঁস আর শিঙেলের মেটের ঝোল টগবগ করে ফুটছে । ডাক্তারবাবু বললেন, "সবাই যখন নৌকোয় এসে গেছে, তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাটটা সেরেই নাও ।"

অনিল মাথা চুলকিয়ে বলে, "কিন্তু ....।"

ডাক্তারবাবু মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "তোমার আবার কিন্তু কিসের ! না, না, আগে বাদার বনভোজন চুকে যাক, তারপর যা করার তা করা যাবে । শিকারের সন্ধানে যাবার কথা বলতে চাও তো ! তা বেশ ! আগে পেটে কিছু দাও, তারপর আমরা সবাই মিলে যাব । ওকে তো পাবই । পালাতে গিয়ে যখন বারবার শুয়ে পড়তে হচ্ছে, জাদুকে বেশিদূর যেতে হবে না !" একনাগাড়ে কথাগুলি বলেই নিজে ছইয়ের ভিতর থেকে মাটির শানুক আনতে গেলেন ।

অনিল আবার বলে ওঠে, "তা তো হল, ডাক্তারবাবু ! কিন্তু ..."

"আবার তোমার কিন্তু ! বলো, কী তোমার কিন্তু ।"

"আমার একটা আর্জি ছিল । দুটো হরিণে তো গোসাবার সব বন্ধুবান্ধবকে খাওয়ানো যাবে না । আমি বরং ডিঙি নিয়ে ... ।"

"তা বেশ ! যেতে হয় যেও, আগে শানুক পেতে বোসো তো !"

গভীর নির্জন ভয়ঙ্কর অরণ্যে পানসির পাটাতনে বসে রসাল গল্পের আর হাসি-ঠাট্টার মাঝে বনভোজন-পর্ব শেষ হতেই অনিল আর একটুও দেরি করতে চায় না । মন্মথ ও আর একজন সাঙাতকে সঙ্গে নিয়ে দুটি বন্দুক হাতে ছোট্ট ডিঙিতে বসে পড়েছে । হরিণ পেতে হলে সূর্যের রশ্মি তির্যক হবার পূর্বেই গাছে উঠতে হবে ।

অনিলের কাণ্ডকারখানা আর ভাবগতিক দেখে ডাক্তারবাবুর কী যেন একটা সন্দেহ হয় । হঠাৎ বললেন, "শিকেরি ! তোমার বন্দুকের বদলে এবার আমার রাইফেলটা নিয়ে যাও ।"

দ্বিধাগ্রস্ত মনে অনিল নিজের বন্দুকটা হাতছাড়া করতে চায় না । বে-পাশি বন্দুক, বলা যায় না, বিপদে পড়লে অন্যে হয়ত নদীগর্ভে ফেলে দিতেও কসুর করবে না ! তা হলেও যাত্রার মুখে ডাক্তারবাবুর ইচ্ছাকে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করে নিজের বন্দুকটা আলগোছে রেখে রাইফেলটাই নিয়ে গেল ।

স্রোতের টানে ওদের ডিঙি সাঁ-সাঁ করে চলে সোজা দক্ষিণে । সুধন্যখালি এখানে পুব দিকে বাঁক নিয়েছে । তারই ফলে এই ট্যাঁক । ট্যাঁক ঘুরে অনিল ডিঙি নিয়ে গেল সুন্দরবনের আরও এক-বাঁক পথ ।

মালে উঠেছে তিনজন । পছন্দসই স্থানে এসেই অনিল ফস করে এক কেওড়া গাছে উঠে গেল । গাছে উঠতে উঠতে বাকি দুজনকে ফিসফিস করে বলে, "যা, তোরা উ-ই দূরের গাছটায় উঠে বোস । দুজনেই এক গাছে, বুঝলি ।"

মন্মথ ও তার সাঙাতের সঙ্গে একটি বন্দুক । বন্দুকটি দোনলা, আর ওরা ফাঁদ পাতছে হরিণের আগমন উপলক্ষে । কাজেই ওরা নির্ভয়ে ধীর পদক্ষেপে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ।

অনিল গাছে উঠেই দেখে, পাতার ছাতির বেশ নিচুতে এক তে-ডালাতে শকুনের বাসা । অত বড় বাসা, তাতে আবার কোনও শকুন নেই দেখে অনিলের একটু আশঙ্কা জাগে । রাইফেলের নল দিয়ে নেড়ে দেখল—না, কোনও সাপ-টাপ নেই । উঠে গিয়ে পাখির বাসার উপর নিজের গামছাখানা বিছিয়ে আরাম করে পেতে ডালায় বসতে

গেছে। ... বসবে কি! থ মেরে গেছে। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখে, কালো ও হলদে রঙের লম্বা ডোরা লম্বা লম্বা শুলোর সঙ্গে মিশে আছে। তারই ডানদিকে বেশ কিছুটা দূরে। লক্ষ্য তার ঐ সাঙাতদের দিকেই। মুহূর্তের মধ্যেই অনিল যেন কেমন হয়ে যায়। হাত-পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে। কয়েক সেকেণ্ডে কাটতেই সচেতন হয়ে ভাবে—সে কি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখছে? না, তার মতিভ্রম? নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখে—না, তার চেতনা তো সজাগই। তবে! তবে আর কী!!! ... তা, ওদের গতি এত ধীর কেন? তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে পারিস না! ... বিকট চিৎকারে সাবধান করে দেব? কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়ে যায়? মরুক গে! বনে কে কাকে সাবধান করতে পারে, যার-যার 'সাবধান' তার-তার কাছে! অনিলের এক বুদ্ধিভ্রম অবস্থা।

হঠাৎ নিঃশব্দে বাঁ হাঁটু ভেঙে তে-ডালার এক ডালে চেপে বসল। ঠিক বসল না—দেহের ওজন আর শক্তি জড়ো করেছে নীচের ডালের উপর রাখা টান্-টান্ করা ডান পায়ের উপর।

... না, তার কাছে তো রাইফেল আছে। শিকারি জীব এবার গুটি মেরে গুঁড়ির আড়ালে দুই সাঙাতের দিকে কয়েক হাত এগিয়েছে। রাইফেল! রাইফেলে তো এল্ জি গুলি নেই। বুলেট, একটাই গুলি। যদি ফশকে যায়!!

রাইফেলটা ধরে হাঁটুর উপর বাঁ হাত রেখেছে। এতক্ষণে বুঝি হাতের কাঁপুনি কমে এসেছে। পরপর পাঁচবার নিরিখ করল। পাঁচবারই রোমাঞ্চিত লোমে ঢাকা বুকেই তাক হয়। ও যে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুচ্ছে। আবার ক্ষণিকের জন্য মনে হয় এই বুঝি ভীষণ বেগে ঝাঁপ দিল। না, আরও একটু এগুতে চায়। সুনিশ্চিত হতে চায়—চকিতে এবং বিদ্যুৎসম গতিবেগের এক ঝাঁপে হাতের থাবা যাতে শিকারের ঘাড়ে মারতে পারে। উবু হওয়া মানুষকে ওরা প্রথমেই এক কামড়ে শূন্যে তুলে ধরতে চায়। কিন্তু খাড়া মানুষকে ঘাড়ে থাবার আঘাতে বেহুঁশ করে মাটিতে ফেলে দেওয়াই ওদের লক্ষ্য।

সাঙাত দুজন এবার গাছে উঠতে যেতে পারে। সুন্দরবনের নরখাদক সে সুযোগ দেবে না। অনিলও আর দেরি করতে চায় না। যমদূত পেছনের পা গুটিয়ে নিয়ে এসেছে। লেজের ডগা মাটিতে বাড়ি মারার জন্য উঁচু হয়ে উঠেছে। মানুষের মতো বোধহয় ১ ২ ৩ গুনে মাটিতে লেজের আঘাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ এক হুঙ্কারে ধনুকের জ্যা থেকে মৃত্যুবাণের গতিবেগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মানুষের বেলায় যেমন সজোরে উচ্চারিত 'তিন' কথাটা দেহে এগিয়ে যাবার ধাক্কা আনে, সমভাবে ওদের লেজের ডগার সজোরে শেষ বাড়িটাও বুঝি দেহকে ঊর্ধ্বমুখী করে লাফ দিতে সাহায্য করে। সাহায্য সামান্যতম হলেও, শেষ মুহূর্তের এই সাহায্য কম কিসে! দেহের তুলনায় কান দুটি যৎসামান্যই উঁচু, কিন্তু শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে তাও হেলিয়ে দিয়েছে পেছনের দিকে এবার। না, অনিল এক মুহূর্তও আর দেরি করতে চায় না। করেওনি। বুকের নিরিখেই রাইফেলের চোট্ করে দিল।

চোট্ করার পূর্বক্ষণে রাইফেলের সেফ্ তুলবার সময় অনিলের আশঙ্কা ছিল সেই সামান্য শব্দটা বিমনা করলেও করতে পারে, আর তখন নিজেই হয়তো হয়ে পড়বে এই মৃত্যুদূতের প্রধান লক্ষ্য। না, তা হয় না। নরখাদকের এই মুহূর্তের একনিষ্ঠতা যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদের তন্ময়তার মতো। ওদের দেহ-মন, শিরা-উপশিরা যেন এই হিংস্রতম কাজের জন্য উদগ্র থাকে।

অনিল গুলি করেছে, বাঘও হুঙ্কারে লাফ দিয়েছে। বাঘের হুঙ্কার আর গুলির আওয়াজ যেন মিশে গেল। বাঘ শূন্যে লাফ দিয়েছে। লাফ দেবার মুখোমুখি গুলির আঘাতে বোধহয় একটু অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বে উঠেছে। শুধু ঊর্ধ্বে নয়, তার গতিমুখও খানিকটা ঘুরে গেছে। ঘুরে যাবি তো যা—একেবারে অনিলের গাছের বরাবর।

অনিলের চিন্তাশক্তি স্তব্ধ। জীবনের তাগিদে মাথার উপরের ডাল আঁকড়ে ধরে উঁচুতে উঠবার চেষ্টা। কিন্তু ঐ চেষ্টাই মাত্র।

লাফের পর মাটিতে পড়েই ছুট দিল একেবারে অনিলের গাছের গুঁড়ি ঘেঁষেই শুধু নয়, গুঁড়িতে ধাক্কা খেল। আর যেন চারপায়ে ছুটতে পারছে না। ছোটার গতিবেগে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে সড় সড় করে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা। দেহের ওজনে আর এগিয়ে যাবার ধাক্কায় গাছের শুলোগুলি মড়মড় করে ভেঙে যেতে লাগে। বাঘের মুখের গজরানি কিন্তু থেমেও থামতে চায় না।

নরখাদক বুঝি থমকেছে। না, ঠিক থমকায়নি। আবার খাড়া হয়ে দ্রুত কয়েক কদম টলতে টলতে ছুটে গেল ডান দিকের গরান-বনে। কিছুক্ষণ ধরে গরান-বনের আড়ালে হুড়মুড় শব্দ। তারপর শান্ত। বনও শান্ত।

অনিলের চিন্তা—গুলি লেগেছে ঠিকই, কিন্তু ঠিকমতো লেগেছে তো! ইত্যবসরে বেশ উঁচুতে মগডালে উঠে নিশ্চিন্ত হয়েছে, বাঘ ফিরে এলেও ওকে নাগাল পাবে না। রাইফেল কাঁধে ঝুলছে। এতক্ষণে আবার গুলি পুরে রাখবার খেয়াল হল।

সহসা গরান-বন থেকে দীর্ঘ একটা হাঁফ ছাড়বার ফড়-ফড় শব্দ, অনিলও হাঁফ ছাড়ল। না, তবুও বিশ্বাস নেই এই দুর্ধর্ষ জীবকে। প্রায় পনেরো মিনিট কেটে যাবার পর অনিল মতি স্থির করতে চায়। কিন্তু এক কু-ই দেবে, না, জোড়া কু-ই দেবে? পাখির ডাকের নকলে এই কু-ই দেবার রীতি, যাতে কিনা অন্য কোনো জীব সন্ত্রস্ত বা সজাগ না হয়। এক কু-ই মানে—আমিও গাছ থেকে নামলাম, তোমরাও নেমে এগিয়ে চলো। আর জোড়া কু-ই ইঙ্গিত করে—তোমরা সবাই নেমে আমার গাছের তলায় ছুটে এসো।

ইতস্তত করে অনিল জোড়া কু-ই দিয়ে বসে। দুই সাঙাত অমনি গাছ থেকে দ্রুত ছুটে এসেছে। গাছ থেকে নামতে নামতে অনিল বেশ সাহসভর করে জোরে জোরে বলে, "অত কী নীচে দেখছিস! খবরদার! দেখলেই গুলি করবি। খবরদার পিছুবি না!"

"দেখেছ! কী রক্ত! কলসখানেক রক্ত!"

"দেখেছি, আমার কথা কানে গেছে তো! দেখলেই গুলি ... দ্যাখ, দ্যাখ, ভাল করে চারদিকে দ্যাখ ... দেখলেই গুলি!"

অনিল নীচে নেমে রাইফেলের সেফ তুলে ওদের প্রায় হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেল গরান-বনের ঝোপে।

চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। এ জীবকে বিশ্বাস নেই। অনিল রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে নলের মুখটা দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে পরখ করে। এতটুকু নড়লে ট্রিগার টিপে দেবে।

ওদের এখন আনন্দ ও দাপটির কোনও সীমা নেই। নদীর ধারে গিয়ে গাছের মাথায় উঠে সবাই মিলে প্রাণপণে জোড়া কুই দিতে থাকে।

দেখতে না দেখতে নৌকো এসে হাজির। ডাক্তারবাবু তো ছইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়ছেন সুখবরটার ইঙ্গিত পেতে।

ডাঙায় নেমে ডাক্তারবাবু তো ঘোষণা করার মতো করে বললেন, "আমি তো আগেই বলেছি, অনিল বাউলে না হয়ে যায় না। তা না হলে ও আগে থাকতে জানল কী করে এখানে বাঘ আছে। সাধে কি আমি ওর হাতে রাইফেলটা তুলে দিয়েছিলাম!"

গোসাবায় ফিরে আসতে দুটি বড় বড় হরিণ আর ততোধিক বিশালকায় বাঘ গোটা গোসাবাগঞ্জকে কাঁপিয়ে তুলল, ডাক্তারবাবু তো বলেই চলেছেন, তোমরা শাবাশ দিয়ে যাও বেদে বাউলেকে। অনিলের আদুরে নাম যে 'বেদে' সে কথা অনেকে জানে ওর মা-র দৌলতে।

প্রাথমিক চমক ও উল্লাস স্তিমিত হতেই অনিল সহসা চলল ছুটে নিজ গৃহমুখো। আজ কি আর কেউ বেদেকে অমন করে চলে যেতে দেবে। বাচ্চারা তো বটেই, বড়দের একদলও চলল ওর সঙ্গে, ওর গতিপথকে স্তিমিত করে আর ওর কাহিনী সবার কাছে সবার আগে কাড়া পিটিয়ে দিতে।

হৈ-হল্লা শুনে মা এসেছেন আঙিনার হুড়কোর কাছে। পরনের থানের আঁচল বেশ আঁটোসাটো করে ফোকলা দাঁতে আধো-আধো ভাবে বললেন, "কী রে বেদে! তুই নাকি আজ বেদে বাউলে ... বেদে বাউলে!"

অনিল সামনে এগিয়ে এসেছে। মুখে হাসি নিয়ে কথা নেই বার্তা নেই টিপ করে মা-কে প্রণাম করল।

ছবি দেবাশিস দেব

মেজদার এক্সপেরিমেন্ট

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

স্থান, চৌধুরীদের সেই আমবাগান, যেখানে মেজদাকে রামছাগলে তাড়া করেছিল। সময়, শীতের শেষ এবং বসন্তের শুরু। উপরে অথৈ নীল আকাশ। বাতাসে শালফুলের সুগন্ধ ও দূরের পলাশবনের মাথায় আগুন রঙের ফুল।

মেজদার আড্ডা-শরিক আমি এবং বিল্টু। রামছাগলে তাড়া করার পর থেকে মেজদা সাধারণত চৌধুরীদের আমবাগানটা এড়িয়ে চলে। আজ বোধহয় মনের ভুলে বলে এসেছে। যাই হোক, উপস্থিত এই আড্ডায় আমরা তিনজন। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। আমি আর বিল্টু পাশ করেছি মাঝামাঝি রকমের নম্বর পেয়ে। মেজদা যথারীতি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে। অবশ্য তার জন্য মেজদার কোনো ভাবান্তর নেই। ব্যাপারটা যেন রোজকার ডালভাত খাওয়ার মতোই একটা সাধারণ ঘটনা। যেন প্রতি বার ক্লাসে ফার্স্ট হওয়াটাই মেজদার ছাত্রজীবনের একমাত্র অনিবার্য ভবিতব্য।

কিন্তু মেজদা আজ কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ। কারণটা জিজ্ঞেস করায় মেজদা বলল, "ও কিছু নয়, একটা সামান্য ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

বিল্টু বলল, "আরে কী ব্যাপার বলোই না। অত শরমাচ্ছ কেন।" অর্থাৎ লজ্জা পাচ্ছ কেন। হিন্দির চৌবাচ্চা থেকে ছেঁকে তোলা বিল্টুর স্পেশাল বাংলা।

মেজদা বলল, "এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি রে বিল্টু।"

"ভুল ?" আমি বিষম খেলাম। "তুমি ভুল করেছ ?" যেন মেজদা কোনো ভুল করতেই পারে না। যেন ভুল কথাটাই মেজদার অজানা।

মেজদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ। ভুলই করে ফেলেছি। ও- হো-হো, আমারই ভুলে একটা কৃষ্ণের জীবের সৌন্দর্য আমি চিরদিনের জন্য নষ্ট করে ফেলেছি। উফ্, ভাবা যায় না।"

কামারের হাপরের মতো ধাঁই ধাঁই দুটো দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মেজদার বুক চিরে। মেজদা একটা চোর-কাঁটার শিষ চিবোতে চিবোতে দূরের পলাশবনের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিল্টু আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, "সত্যিই বোধহয় কোনো একটা গলতি করে ফেলেছে মেজদা। ওর দিলে বড়ি চোট লেগেছে মালুম হচ্ছে।"

বাস্তবিক, আমি ভাবতে লাগলাম কী এমন ভুল করে ফেলেছে মেজদা, যার ফলে, বিল্টুর ভাষায়, ওর দিলে এতবড় চোট লেগেছে ?

মেজদা হঠাৎ হাঁউমাউ করে বলল, "ঘন্টা রে, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। সন্ন্যাসী হয়ে যাব আমি।"

"কিন্তু কেন ?" আমি বললাম।

বিল্টু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "মেজদা, যদি যেতেই চাও, তবে কিন্তু হোলির পর যেও। শুনেছি নাকি এবার হোলিতে মাতা প্রসাদজি দেওঘর থেকে অঢেল প্যাঁড়া আনাচ্ছে।"

মেজদা একটু চনমনে হয়ে বলল, "সত্যি বলছিস ?"

"না তো কি ঝুট ?"

"হ্যাঁ রে ঘন্টা ?"

"সেই রকমই তো শুনেছি।"

মেজদা বলল, "যাক তাহলে। তোরা যখন এত করে বলছিস, তখন সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াটা হোলি পর্যন্ত মুলতুবি থাক। ততদিনে আমার এক্সপেরিমেন্টটাও নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে।"

আসলে, মেজদা একটা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছে। মেজদা ওটার নাম দিয়েছে 'এক্সপেরিমেন্ট অন দ্য পারসেপশান অব দ্য লোয়ার অ্যানিম্যালস'।

"লোয়ার কেন ? হায়ার অ্যানিম্যালস নয় কেন মেজদা ?" বিল্টু শুধিয়েছিল।

মেজদা পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিল, "হায়ার অ্যানিম্যালস্ মানে ?"

বিল্টু গোবেচারির মতো বলেছিল, "এই, ধরো মানুষ।"

মেজদা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, "মানুষ আর অ্যানিম্যালস্ এক হল ? কক্ষকস্ব কোথাকার, তুই আর হারু-ধোপার গাধাটা কি এক জিনিস ?"

"তাহলে ?" আমি বললাম।

মেজদা বলল, "অ্যানিম্যালস্ মানে অ্যানিম্যালস্। ধর্ বিড়াল, কুকুর..."

বিল্টু কথাটার পাদপূরণ করল, "হাতি-ঘোড়া।"

ওর কথায় আমল না দিয়ে মেজদা বলল, "আসলে, মানুষের আর এই সব ছোটখাটো জীবজন্তুর অনুভূতির মধ্যে মিল কতখানি আর তফাত কতখানি, এই নিয়েই আমার এক্সপেরিমেন্ট।"

তারপর এক্সপেরিমেন্ট আর কত দূর এগিয়েছে, তা আমাদের আর জানা হয়নি। তাহলে কি এই এক্সপেরিমেন্টই মেজদার মনঃকষ্টের কারণ ?

আমি বললাম, "কিন্তু ভুলটা কী, তা তো তুমি বললে না মেজদা ? যার জন্য তুমি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চাইছ।"

মেজদা বলল, "শোন্ তাহলে বলি। বিড়াল মাছ পছন্দ করে। কাঁচা মাছ, ভাজা

মাছ দুই-ই। আবার মানুষও মাছ পছন্দ করে। কিন্তু ভাজা মাছ বা রান্না করা মাছ। আমি পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম ভাজা মাছ আর কাঁচা মাছের মধ্যে কোন্‌টাতে বিড়ালের আসল তৃপ্তি। পিসিমার পুষি বেড়ালটা রোজ আধসেদ্ধ খয়রা মাছ খায়। ওকে একদিন আমার ভাগের ভাজা মাছটা খেতে দিয়ে দেখলাম, ওটাতেও ওর সমান আগ্রহ। বেশ চেটেপুটেই খেল। বুঝলাম মাছ খাওয়ার ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে বিড়ালের বেশ মিল আছে। তফাত শুধু এইটুকু যে, বিড়াল কাঁচা মাছও খায়, মানুষ তা খায় না।"

"বেশ, তারপর?" মেজদার কথায় বস্তুত আমরা বেশ আগ্রহ বোধ করি।

"তারপর দ্বিতীয় এক্সপেরিমেন্ট শুরু করলাম বড়দর লোমওলা কুকুরটার ওপর। তোরা তো জানিস আমি ছোট-হাজরির সময় রুটি-মাখন খাই।"

সেই যুদ্ধের বাজারেও মেজদাদের বাড়িতে সকালের জলখাবার বরাদ্দ ছিল রুটি-মাখন। সকালের জলখাবার, অর্থাৎ প্রাতরাশকে মেজদা বলত ছোট-হাজরি।

"তা কী হ'ল মেজদা তোমাদের কুকুরের?"

"ভাবলাম এইটুকু ছোট্ট কুকুর। দেখি রুটি-মাখন খাইয়ে, যদি গায়ে-গতরে বাড়ে।"

"তারপর?"

"তারপর?" মেজদা আবার হাহা করে উঠল, "ঘন্টা রে, দুঃখের কথা কী বলব, সাত দিনের মধ্যে কুকুরটার গায়ের সব লোম ঝরে গেল। ছিল কুকুর, হয়ে গেছে এইটুকু একটা নেংটি ইঁদুর। হায় হায় রে, এ আমি কী করলাম।"

মেজদাকে এভাবে বিলাপ করতে দেখে বিল্টু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ঘাবড়াও মত্‌ মেজদা, এক্সপেরিমেন্ট তো, এতে জেরাসা গড়বড় তো হতেই পারে। দ্যাখো না, মানুষ জাতির কল্যাণের জন্য দাওয়াইয়ের কারখানায় কত শত বান্দর জান্‌ দিচ্ছে। আসলে, নয়া দাওয়াইগুলোর এক্সপেরিমেন্ট তো বান্দরগুলোর ওপরই প্রথম করা হয়।"

বান্দর, অর্থাৎ বাঁদর। মানবজাতির কল্যাণেই ওদের আত্মদান, বিল্টু তাই বোঝাতে চাইছিল।

মেজদা যেন খানিকটা বল পেয়ে বলল, "ঠিক আছে, তোরা যখন বলছিস্‌, তখন নাহয় এক্সপেরিমেন্টটা চালিয়েই যাব।"

"কিন্তু মেজদা," বিল্টু বলল, "এবার একটা বড়সড় জানবরের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করো। ছোট ছোট জানবরগুলোকে খামোখা কষ্ট দিয়ে লাভ কী?"

"বড়সড় মানে?"

"ধরো, ঘোড়া।"

"কিন্তু ঘোড়া কোথায় পাব?"

"কেন, ঋষি-ডাক্তারের ঘোড়া। ঋষি-ডাক্তার তো রোজ বিকেলবেলায় তোমার বাবার কাছে দাবা খেলতে আসে।"

"কিন্তু কী এক্সপেরিমেন্ট?"

"সেটা তুমি ভাবো। আমরা শুধু তোমাকে মদত দিতে পারি।"

মেজদা বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে আজ রাতটা তাহলে ভেবে দেখি।"

পরদিন বিকেলে মেজদা বলল, "চল্‌, ঋষি-ডাক্তারের ঘোড়ার গাড়ি আমাদের রোয়াকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কোচম্যানটাও পান খেতে গেছে। এই ফাঁকে এক্সপেরিমেন্টটা সেরে নিই।"

আমি বললাম, "কিন্তু কী এক্সপিরিমেন্ট মেজদা।"

মেজদা বলল, "সেটা পরে প্রকাশ্য।"

গাড়িটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোড়াটা ল্যাজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছিল। মেজদা পকেট থেকে একটা কাগজের পুরিয়া বার করে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। তারপর পুরিয়াটা থেকে কী যেন বার করে আলগোছে ঘোড়াটার নাকে গুঁজে দিল।

ঘোড়াটা প্রথমে অস্থির হয়ে চিঁহি চিঁহি ডাকতে ডাকতে ঘনঘন ঘাড় নাড়তে লাগল। তারপর সামনের জোড়া পায়ে দু'বার দাপিয়ে পাগলের মতো গাড়িসুদ্ধু ছুটতে লাগল।

কোচম্যানটা ততক্ষণে হৈ হৈ করতে করতে পানের দোকান থেকে ছুটে এসেছে। আমরা আড়ালে এবং নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে ঘোড়াটার গতিবিধি লক্ষ করছিলাম। ঘোড়াটা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটতে লাগল। তারপর গলির মোড়ের ডাস্টবিনটা উল্টিয়ে ল্যাম্পপোস্টে মারল একটা বোম্বাই-ধাক্কা। গাড়িটা ছিটকে নর্দমার ধারে কেতরে পড়ে রইল। ঘোড়াটাও মুক্ত বিহঙ্গের মতো ছুটতে ছুটতে মাঠ-পাথার পার হয়ে জলার ধারে জঙ্গলটার মধ্যে অদৃশ্য হল। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "ওটা কী মেজদা?"

মেজদা বলল, "নস্যি।"

ঘোড়াটার কাছে বোধহয় এরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করেনি মেজদা। মেজদাকে বেশ ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল। একফাঁকে আমরা ওখান থেকে সরে পড়লাম।

এদিকে ঋষি-ডাক্তার তখন সাংঘাতিক একটা ঘোড়ার চাল দিয়ে নিতাইজেঠুর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিলেন। ভাবখানা এই যে, এবার সামলাও।

নিতাইজেঠু টাকে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তা করছিলেন রাজাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। তখনই খবর এল ডাক্তারবাবুর ঘোড়া নিরুদ্দেশ।

ডাক্তারবাবু তখন ঘোড়ার চালের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে আসল ঘোড়ার জন্য হা-হুতাশ শুরু করলেন।

নিতাইজেঠু ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলেন, আর বলছিলেন, "আরে ডাক্তার, অস্থির হোয়ো না। ঘোড়া তো আর মানুষ নয়, যে, নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন না দিলে আর ফিরবে না।"

খানিক পরই খবর পাওয়া গেল, ডাক্তারবাবুর ঘোড়া উদ্ধার হয়েছে, এবং সেইসঙ্গে দুষ্কৃতকারীও ধরা পড়েছে। তাকে নিতাইজেঠুর কাছে বিচারের জন্য আনা হচ্ছে।

জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আমরা সেই বিচার প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

মেজদা ঘরের এককোণে গোবেচারির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঋষি-ডাক্তার ঘোড়ার খেদ ভুলে গিয়ে আবার দাবার ছকে মনোনিবেশ করেছেন। নিতাইজেঠু শুধু ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর বলছেন, "এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে, এক্সপেরিমেন্ট। এই কেউ আছিস, একগাছি জলবিছুটি নিয়ে আয় তো, এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি ওর চামড়াটা মানুষের, না গণ্ডারের।"

না, সেই এক্সপেরিমেন্ট দেখবার জন্য আমরা আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকিনি।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

হরিওকা

কবিরুল ইসলাম

মাঝে-মধ্যে ট্রেনে চড়ে,
চড়ে গরুর গাড়ি
সিউড়ি থেকে সক্কলে যাই
দূর গ্রামের বাড়ি।
তিনটি গ্রাম ত্রিভুজ যেন
একটু ধারে-কাছে :
আমলা আছে, বহেড়া আছে,
হত্তুকিও আছে।
প্রথম দু'গ্রাম স্বনামে বহাল,
তৃতীয় হরিওকা—
হত্তুকির এই রূপান্তরে
নাচছে বড় খোকা।
ভাবছে, আমি এত দিনে
পেলাম আমার সাথী
শোভন যেমন শুভঙ্কর
হয়েছে রাতারাতি।
ত্রিফলার এই একটি ফলেই
মেলেনি ফলাফল ;
নামতত্ত্বের পণ্ডিতেরা
করুক কোলাহল॥

ছবি : অহিভূষণ মালিক

চোর এসে বই পড়েছিল

শেখর বসু

এই চোরটা ভীষণ অভিমানী। কথায় কথায় ওর চোখে জল এসে যায়। কিন্তু এখানে কথা বলার কেউ নেই, দোষ দেবারও কেউ নেই। দোষ দিতে গেলে নিজেকেই দিতে হয়। চোর নিজের কপালকে দোষ দিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল লম্বা করে।

বৃষ্টি-বাদলার রাত, কনকনে হাওয়া বইছে সমানে। এইরকম দুর্যোগ মাথায় করে চুরি করতে বেরিয়েছে এই চোরটা। বেচারা এ-গলি সে-গলি করে এই বাড়িটার পেছনদিকে এসে হাজির হয়েছিল। বাড়ির পেছনে আছে একটা ভাঙাচোরা রেনওয়াটার পাইপ। সেই পাইপ বেয়ে কত কষ্ট করে উঠেছে তিনতলায়। তিনতলায় একটাই মোটে ঘর।

এই ঘরে ঢোকার আগে চোর বেচারা কত কিছু আশা করেছিল। ভেবেছিল ঘরে ঢুকেই দেখবে, ঘরের লোক ভুল করে স্টিলের আলমারির গায়ে চাবিটা লাগিয়ে রেখে ঘুমে অজ্ঞান হয়ে আছে। আলমারি খুললেই পাওয়া যাবে থরে-থরে সাজানো টাকা আর গয়না। পাশে থাকবে একটা খালি সাইডব্যাগ। টাকা আর গয়না সেই ব্যাগে ঢুকিয়ে টুক করে কেটে পড়লেই হল।

কিন্তু ঘরে পা দিতেই ওর স্বপ্ন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ঘরে একটার বদলে চার-চারটে আলমারি আছে, তবে সব কটা আলমারিই বইয়ের। একপাশে পেল্লায় একটা টেবিল আর দুটো চেয়ার। ঘরটা নেহাতই একটা পড়ার ঘর।

এই ঘরটা ছাড়া তিনতলায় আর কোনো ঘর নেই। এখান থেকে দোতলায় নামার সিঁড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তার মানে আবার সেই কষ্ট, রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে নীচে নামতে হবে। তেমন কিছু চুরি করতে পারলে এই কষ্টটা কষ্ট বলেই মনে হত না চোরের। কিন্তু পড়ার ঘর থেকে ও কী চুরি করবে?

শুকনো মুখে নীচে নামার সময় বৃষ্টি নামল তেড়ে। শীতের বৃষ্টি ছুরির মতো গেঁথে যাচ্ছিল গায়ে। চোরের আর নামা হল না, ও ছুটে এসে আবার ঢুকে পড়ল পড়ার ঘরে। এ-ঘরে কেউ নেই, এখানে আরো কিছুক্ষণ বসে বৃষ্টি ধরার জন্যে অপেক্ষা করা যেতে পারে অনায়াসে।

দরজাটা ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের আলো জ্বালল চোর। তারপর একটা চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চারদিকের বইয়ের আলমারিগুলো দেখতে লাগল। প্রতিটি আলমারিই বইপত্তরে ঠাসা। বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে গেল চোরের। ইশ্! তখন একটু মন দিয়ে পড়াশুনো করলে আজ আর এত কষ্ট করে চুরি করতে হত না!

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল। নেহাত সময় কাটাবার জন্যে চোর মাস্টার-কি দিয়ে এক-এক করে সব কটা বইয়ের আলমারির তালা খুলে ফেলল। তারপর এ-বই সে-বই টানতে টানতে হঠাৎ ওর চোখ গেল চকচকে একটা চটি বইয়ের দিকে। বইটার নাম 'তেপান্তরের মায়াকান্না'।

এই সেই বই! বইটা হাতে তুলে নিতেই ছেলেবেলার কত কথা হুড়মুড় করে মনে পড়ে গেল চোরের। দারুণ বই, কিন্তু বইটা ও শেষ করতে পারেনি। স্কুলের পড়া তৈরির সময় তেপান্তরের মায়াকান্না পড়ার জন্যে ওর বাবা ওকে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলেন। কী মার, কী মার! তারপর লুকনো বইটা ও আর কোনোদিনই খুঁজে পায়নি।

কী যেন নাম ছেলেটার? দারুণ সাহসী। মায়াকান্নার রহস্য ভেদ করার জন্যে একা-একা গিয়ে হাজির হয়েছিল তেপান্তরের মাঠে। কী সাংঘাতিক-সাংঘাতিক সব কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল সেই মাঠে, ছেলেটা কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি। দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে ছেলেটা যখন বিরাট এক চোরের দলকে ধরে ফেলেছে প্রায়, ঠিক সেই সময়েই বইটা বেহাত হয়ে গিয়েছিল।

কতকালের পুরনো সেই দুঃখটা হঠাৎ চোরের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল। আস্ত একটা গোয়েন্দা-গল্পের বই না পড়তে পারার দুঃখ একরকম, আর অর্ধেক-পড়া বই কেউ কেড়ে নিলে তার দুঃখ আর-এক রকম। বইটা তখন ও সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও উদ্ধার করতে পারেনি। এতকাল বাদে সেই বই হঠাৎ হাতে এসে যাওয়ায় পুরনো গল্পের নেশা চেপে ধরল চোরকে।

বৃষ্টি বোধহয় আরো বেড়ে গিয়েছিল। গ্যারাজের টিনের চালে শব্দ উঠছিল চড়চড় করে। জানলার ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প শীতের হাওয়া ঢুকছিল ঘরের মধ্যে। গোয়েন্দা-গল্প পড়ার আদর্শ পরিবেশ। চোর চেয়ারের ওপর আয়েশ করে বসে তেপান্তরের মায়াকান্না পড়তে শুরু করে দিল মাঝখান থেকে। মাঝখান পর্যন্ত সব ঘটনা ওর মনে আছে, বাকিটা পড়ে নিলেই হল। চটি বইয়ের অর্ধেক পড়তে কতক্ষণই বা সময় লাগবে! এর মধ্যে বৃষ্টিও ধরে যাবে নির্ঘাত।

কয়েক পাতা পড়তে না পড়তেই দুর্দান্ত সব ঘটনায় চোরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। গল্পের বইয়ের অল্পবয়েসি ছেলেটার সাহস, বুদ্ধি আর গায়ের জোর সত্যিই তারিফ করার মতো। ভয়ংকর সব চোরের ডেরায় একা ঢুকে পড়েছে ছেলেটা, পায়ে-পায়ে বিপদ। যে-কোনো মুহূর্তে ও ধরা পড়ে যেতে পারে, আর ধরা পড়লেই মৃত্যু।

জায়গাটা এত ভয়ের যে, এই চোরটাই বই পড়তে পড়তে কয়েকবার চমকে উঠে পেছন দিকে তাকাল। না, পেছনে অন্য কোনো চোর নেই। পড়ার ঘরের দরজাটা আগের মতোই ভেজানো। আগের মতোই বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝম করে।

চোর আবার গল্পের বইয়ের মধ্যে ডুবে গেল। ডোবা মানে এমনই ডোবা যে, টেরই পেল না বৃষ্টি ধরে গেছে কখন! শুধু বৃষ্টিই ধরেনি, একটু-একটু করে ভোরের আলোও ফুটতে শুরু করেছে আকাশের গায়ে।

এ-বাড়িটা টিকলুদের। টিকলু সপ্তাহে তিনদিন ভোর পাঁচটায় উঠে ব্যাডমিন্টন খেলতে যায়। ঘুম ভাঙার নিয়মটা খুব মজার। সপ্তাহে তিনদিন কোনো-এক সময়ে উঠলে বাকি তিনদিনও ঠিক সেই সময়ে ঘুম ভেঙে যায়। আজ টিকলুর ব্যাডমিন্টন খেলতে যাবার দিন নয়, কিন্তু ঠিক পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল ওর। ঘুম ভেঙে গেলে টিকলু বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে না একদম। ও দরজা খুলে বেরিয়ে এল

বারান্দায়। আর বারান্দায় বেরুতেই দেখতে পেল ছাতে যাবার সিঁড়িতে ঝকঝকে এক ফালি আলো পড়ে আছে। ছাতের ঘরটা ওর পড়ার ঘর। কাল রাত্তিরে ঠিক তাহলে ও-ঘরের আলো নেবাতে ভুলে গেছে।

মা'র বকুনির ভয়ে পড়ার ঘরের আলো নেবাতে গেল টিকলু। পড়ার ঘরের দরজাটা ভেজানো, ভেতরে আলো জ্বলছে। দরজা খুলতেই অবাক হয়ে গেল টিকলু। এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে খুব মন দিয়ে বই পড়ছেন। এতই মন দিয়ে পড়ছেন যে, পেছনে একবার তাকালেন না পর্যন্ত। কে ভদ্রলোক ? বাবার বন্ধু কি ? রাত্তিরে এখানে ছিলেন ? এইসব ভাবতে ভাবতে টিকলু পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেল। আরে! ভদ্রলোক তেপান্তরের মায়াকান্না পড়ছেন। বইটা টিকলুর দারুণ প্রিয়। পাশে দাঁড়িয়ে টিকলু ফিসফিস করে বলল, "গল্পের শেষটা বলে দেব ?"

ওর কথা শুনে চোর ভীষণ চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল। কাউকে চমকে দিতে পারলে টিকলু খুব মজা পায়। ও মজার গলায় আবার বলল, "বলে দেব গল্পের শেষটা ?"

চোর এখন গল্পের সাংঘাতিক জায়গায়। এত জমে গেছে যে, এখানে চুরি করতে ঢোকার কথা ওর আর মনেই নেই। প্রায় হাত জোড় করে টিকলুকে বলল, "লক্ষ্মীটি বোলো না। গোয়েন্দা-গল্পের শেষেই তো আসল মজা।"

টিকলু আর কিছু বলল না, কেননা এর মধ্যেই ওর চোখে পড়েছে খোলা আলমারিতে সাজানো টিনটিনের বইগুলো। টিনটিনের বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে টিকলু, কিন্তু পরীক্ষা এসে গেছে বলে এখন ওর গল্পের বই ছোঁয়া বারণ। গল্পের বইয়ের আলমারিতে তালা পড়েছে, খোলা হবে পরীক্ষার পরে। সেই আলমারি হঠাৎ খোলা দেখে টিকলু ছুটে গিয়ে টিনটিনের একটা বই তুলে নিল।

পড়ার ঘরের দুই চেয়ারে এখন দুজন পড়ুয়া। একজন পড়ছে 'তেপান্তরের মায়াকান্না' আর একজন পড়ছে 'টিনটিন ইন টিবেট'। এদিকে ভোরের আলো বাড়তে বাড়তে দিব্যি একটা সকাল হয়ে গেল।

টিকলুর মা আর বাবা উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে। একটু পরে খোঁজ পড়ল টিকলুর। কোথায় গেল ও ? টিকলুর মা একবার ভাবলেন, ও বোধহয় ব্যাডমিন্টন খেলতে গেছে। তারপরেই খেয়াল হল, আজ তো ওর ব্যাডমিন্টন খেলতে যাবার দিন নয়। তাহলে ও গেল কোথায় ?

এ-ঘর ও-ঘর খোঁজ করতে করতে টিকলুর মা উঠে এলেন ছাতে। পড়ার ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল টিকলু বই পড়ছে একমনে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে গিয়েই পিছিয়ে এলেন। আরে! এই সাত-সকালে ওর মাস্টারমশাই এসে গেছেন!

চোর দরজার দিকে পেছন ফিরে বসে তেপান্তরের মায়াকান্না পড়ছিল। টিকলুর মা তাকেই টিকলুর মাস্টারমশাই ভেবে নেমে এলেন নীচে। তারপর হাসতে হাসতে টিকলুর বাবাকে বললেন, "টিকলুর মাস্টারমশাইয়ের কাণ্ড দেখেছ, এই ভোরবেলাতেই পড়াতে চলে এসেছেন।"

টিকলুর বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। একটু হেসে বললেন, "যাক, তোমার ছেলের তাহলে পড়াশুনোয় বেশ মন বসে গেছে দেখছি। মাস্টারমশাইয়ের ক্ষমতা আছে বলতে হবে, ওইরকম বাঁদর ছেলে টুঁ শব্দ না করে পড়তে বসে গেল ভোরবেলায়।"

টিকলুর মাস্টারমশাই দারুণ ভাল ছাত্র, তবে একটু খেয়ালি। কোনোদিন একটানা তিন ঘণ্টা পড়ান, কোনোদিন আধঘণ্টা। আসার সময়ের ঠিক থাকে না কখনোই। তবে এর আগে কোনোদিন এত ভোরে পড়াতে আসেননি। এইসব ভেবে টিকলুর মা মাস্টারমশাইয়ের ওপর ভীষণ খুশি হয়ে বিশুর হাত দিয়ে মস্ত ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিলেন পড়ার ঘরে। বিশু এ-বাড়ির নতুন কাজের লোক, একটু সাদাসিধে, তবে খুব কাজের।

বিশুর পায়ের শব্দে তেপান্তরের মায়াকান্নার পাঠক আর একবার চমকে উঠেছিল, কিন্তু কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। এবার বলি, ব্রেকফাস্টে কী ছিল। কর্নফ্লেকস, দুধ, ডিমের পোচ, টোস্ট আর কলা। সবশেষে একজনের জন্যে কফি আর একজনের জন্যে চা।

চোরের বুক ধড়ফড় করছিল সমানে। বাইরে খটখটে সকাল। এ-বাড়ি সে-বাড়ির সব লোক উঠে পড়েছে। পালাবার আর কোনো পথ নেই। ধরা পড়তেই হবে। আর ধরা পড়লে কী হবে, সে-কথা যে-কোনো একটা বাচ্চা চোরও জানে।

চোরের শুধু ভয়ই করছিল না, খিদেও পেয়েছিল প্রচণ্ড, বিশেষ করে সামনে এত খাবারদাবার দেখে। কী আর করবে বেচারা ? কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়। তাই পিঠে সওয়াবার জন্যে সব খাবার খেয়ে নিল চোর। টিকলু টিনটিনের বইয়ের সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে, চোর একবার ওকে মিনমিন করে বলল, "কই, তুমি তো খাচ্ছ না।" কিন্তু সে-কথা টিকলুর কানেই গেল না।

দোতলার দৃশ্য অন্যরকম। টিকলুর বাবা তাঁর কারখানায় যাবেন বলে তৈরি হয়েছেন। টিকলুর মাও তৈরি, মা যাবেন গড়িয়াহাটে বাজার করতে। ড্রাইভার গাড়ি বার করেছে।

টিকলুর বাবা চকচকে দুটো একশো টাকার নোট একটা সাদা খামে ভরে টিকলুর মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "মাস্টারমশাইয়ের মাইনে, দিয়ে দাও।"

টিকলুর মা খামটা নিয়ে পড়ার ঘরের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকলেন, "টিকলু, এই টিকলু।"

টিকলু টিনটিনের দুর্ধর্ষ সব অ্যাডভেঞ্চারের জালে এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, মায়ের ডাক ওর কানেই গেল না প্রথমে। তারপর যখন শুনতে পেল তখন ওর বুক কেঁপে উঠল ধক্ করে। সর্বনাশ ! মা এখন ওকে টিনটিন পড়তে দেখলে মেরে শেষ করবেন। টিকলু কোনো মতে বইটা লুকিয়ে রেখে মুখ কালো করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কিন্তু মা ওকে বকার বদলে গাল টিপে আদর করে বললেন, "লক্ষ্মী ছেলে, আজ যে দেখছি পড়াশুনোয় খুব মন বসেছে ! শোনো, আমি তোমার বাবার সঙ্গে বেরুচ্ছি, বাজার করে ফিরব। শান্ত হয়ে থাকবে, আর এই খামটা মাস্টারমশাইকে দিয়ে দিও।"

মার খাওয়ার বদলে আদর খেয়ে টিকলু এতই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, মায়ের সব কথা ওর কানেই ঢুকল না ভাল করে। কিন্তু ঘরের মধ্যে যে লোকটা বসে আছে সে সব শুনে নিল।

মা চলে যেতেই টিনটিনের ভয়ংকর সব কাণ্ডকারখানা আবার ভিড় পাকিয়ে ফেলল টিকলুর মাথার মধ্যে। ও একছুট্টে ঘরে ঢুকে খামটা চোরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে টিনটিন ইন টিবেট-এ ডুবে গেল আগের মতো।

মিনিট-পনেরো বাদে চোর খামটা পকেটে ভরে 'দুগ্গা-দুগ্গা' বলে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এল। তারপর জোর পায়ে হেঁটে মিশে গেল রাস্তার ভিড়ের মধ্যে। বেশ কিছুটা দূরে যাবার পরে চোরের সে কী আনন্দ, আর কেউ ওকে ধরতে পারবে না। তার ওপর পকেটে আছে দুটো কড়কড়ে একশো টাকার নোট। মনে মনে টিকলুর মাকে অনেক ধন্যবাদ জানাল চোর। সকালে কী দারুণ খাইয়েছেন ! এত ভাল খাবার ও বহুকাল খায়নি !

ওদিকে টিকলুদের বাড়িতে আসল মাস্টারমশাই আসার পরে পুরো ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। টিকলুর মা চোখ গোলগোল করে বললেন, "কী সাংঘাতিক কাণ্ড, বাড়িতে চোর ঢুকেছিল আর তুই তার সঙ্গে অতক্ষণ ধরে দিব্যি গল্প করে গেলি ?"

টিকলু আমতা-আমতা করে বলল, "গল্প করব কেন ? ও তো বই পড়ছিল।"

"বই ! কী বই ?"

টিকলু এবার ঝলমলে মুখ করে বলল, "তেপান্তরের মায়াকান্না। দারুণ বই, বইটা তুমি পড়েছ মা ?"

মা ওকে এক ধমক লাগিয়ে বললেন, "চুপ কর্।"

তখন ধমক লাগালেও পরে কিন্তু টিকলুর মা 'তেপান্তরের মায়াকান্না' পড়েছিলেন। আহ্ ! চমৎকার বই ! এত ভাল বই নাকি চট করে পাওয়াই যায় না। খুব ভাল বই পড়লে আর কাউকে পড়াতে ইচ্ছে করে তো, টিকলুর মা তাই এখন টিকলুর বাবাকে বইটা পড়াবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছেন। টিকলুর বাবা ভীষণ ব্যস্ত মানুষ, তবে কথা দিয়েছেন, সামনের রোরবারেই বইটা পড়ে ফেলবেন।

ছবি : অনুপ রায়

লালগোলা প্যাসেঞ্জারের কামরা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা-মা'দের ব্যাপারটা তোমরা ধরতে পারো কি না, আমি ঠিক জানি না। তবে যারা ক্লাস নাইন-টেনে পড়ে কিংবা ধরো মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, সেইসব লোকেদের জিজ্ঞাসা করো, তারা বলবে তারা বোঝে না। এই তো সেদিন বাপ্পা অনেক করে সেলুনওয়ালাকে বোঝাল কীভাবে উইলিসের মতো চুল ছেঁটে দিতে হবে। হলে কী হবে, বাবা ঢুকলেন প্রায় যখন চুল ছাঁটা হয়ে গিয়েছে। ঢুকেই উঁহু উঁহু উঁহু করে তিনবার আধাগর্জন-মতো একটা শব্দ করে সেলুনওয়ালাকে বললেন, "কিস্সু ছাঁটা হয়নি, চুল ভদ্রলোকের মতো করে ছাঁটো।" যেন বব উইলিসরা ভদ্রলোক নয়।

বাড়িতে যখন জলবসন্ত শুরু হল (নাহয় বাপ্পাই শুরু করেছিল) তখন ডাক্তারবাবু প্রথমটায় বেশ খুশি-খুশি ভাবে এসেছিলেন। সরকার নাকি আসল বসন্তের কথা সঠিক জানাতে পারলে অনেক হাজার টাকা পুরস্কার দেয়। যখন দেখা গেল শুধুই জলবসন্ত, তখন বেজার মুখ করে চলে গেলেন। বাপ্পার দিদির যখন হল, বাবা তখন বললেন, "অঙ্কে যারা ৪১ পায় জলবসন্ত হলেও তাদের অঙ্ক করতে হয়।" দিদিটা একটু হাঁদা প্রকৃতির, তাই ভালভাবে কাতরাতেও পারে না। মশারির মধ্যে বসে অঙ্ক করে গেল।

বাপ্পার সমস্যা বাবা, টুম্পার সমস্যা দাদা। দাদা মানে বেশ বড়। ইউনিভারসিটিতে পড়ে। টুম্পার মোটে ক্লাস এইট। দাদাকে টুম্পা খুবই ভালবাসে, কিন্তু বোলচাল দেখে বিরক্তও হয়। একটা দাদা যদি দশ বছরের বড় হয় তাহলে কি তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা চলে। ক্রিকেট ফুটবল যা-ই নিয়ে কথা বলতে শুরু করো, দাদা ফোড়ন কাটবে। প্রশ্ন করবে, "আচ্ছা ধর গাভাসকর একটা বল খুব উঁচুতে মারল, কিন্তু বাউণ্ডারি-লাইনে ইমরান বলটা ধরে ফেলল। এদিকে রান নিতে গিয়ে প্রণব রায় তার ব্যাট দিয়ে উইকেট ভেঙে ফেলেছে। কে আউট হবে? দুজনেই? না গাভাসকর না প্রণব রায়?" কিংবা ফুটবলের ওপর কিছু বলতে গেলে বলবে, "খুব তো মোহনবাগান-মোহনবাগান করছিস, বল তো কোন্ সালে মোহনবাগান সব কটা ট্রফি জিতেছিল?" এগুলো মহাঅন্যায়। ও নিজেই বলে, "ঠাকুর্দা বলবে উমাপতি কুমার, গোষ্ঠ পাল; জেঠু বলবে শৈলেন মান্না; বাবা বলবে চুনি-জার্নেল, কাকারা বলবে পরিমল দে। আমাদের খেলোয়াড়রা যেন সব তুচ্ছ!" উনি নিজে যে বাড়িতে একটা মাত্র ছোটবোনকে সব সময় তুচ্ছ করছেন সে-বিষয়ে কোনো খেয়ালই নেই ওঁর।

বাইরে থেকে সমস্যা যা-ই হোক, আসল সমস্যা কিন্তু এই ছোট থাকার সমস্যা। বড়রা মনেই করতে পারে না যে, বাপ্পা টুম্পা বড় হয়েছে। এটা বোধহয় ঠিক বলা হল না। ধরো বিছানাটা একটু নোংরা রয়েছে, কি পড়ার টেবিলটা অগোছালো রয়েছে, তখন অবিশ্যি 'ধেড়ে' 'ধিঙ্গি' ইত্যাদি অপমানকর শব্দ অবাধে ব্যবহার চলে, কিন্তু কোথাও যেতে হলে আর এই ব্যাপারটা থাকে না। তখন, বাপ্পা একলা খেলার মাঠে যাবে কী করে? টুম্পা যাবে লোপামুদ্রার বাড়ি? সে তো অনেক দূর। না না, একলা যাওয়া চলবে না। অথচ টুম্পার স্কুলে একজন মেয়ে পড়ে, তার মা-বাবা আফ্রিকার একটা শহরে থাকেন, নাম লেগোস্। প্রত্যেক ছুটিতে সে লেগোস্ যায়। তার মামা তুলে দেয় প্লেনে, আর সে প্লেন বদল করে বাবা-মা'র কাছে যায়।

তাই যখন জামশেদপুরে গিয়ে বাপ্পার দিদিমা আর টুম্পার ঠাকুমা পা হড়কে পড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড বাধালেন, তখন ভারী মজা হল। আমাকে ভুল বুঝো না, ঠাকুমা-দিদিমার পড়ে যাওয়াটা মোটেই মজার ব্যাপার নয়। বুড়ো মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন বলে আনন্দ করবে এমন ছেলেমেয়ে বাপ্পা বা টুম্পা নয়। তবে বাবারা চলে গেলেন জামশেদপুর, তারপর কাকা-মামারা গেলেন। কলকাতায় তখন বাপ্পা খুব সহজেই একটু বেশিক্ষণ ফুটবল খেলল, টুম্পা পিউর বাড়ি নন্দনার বাড়ি ঘনঘন যেতে লাগল, এমন কী, দুদিন লোপামুদ্রার বাড়িও ঘুরে এল। ইতিহাস-বইতে পূর্ণস্বরাজ সম্বন্ধে যেসব কথা লেখা আছে তা বোধহয় খানিকটা এরকমই হবে। কিন্তু ওরা তখনও কি জানত যে, কীসব মজা বাকি আছে। ঠাকুমা-দিদিমাকে ডাক্তার দু' সপ্তাহ বিছানায় থাকতে বললেন। সেবা করার জন্য লোক দরকার। ঠিক হল টুম্পার মা আর বাপ্পার মা যাবেন সেবার কাজে। দাদার কলেজ থেকে কোথায় এক অভিযান হবে, তিনি যাবেন। কাকারা কোথা থেকে খাবার এনে খাবে। সুতরাং টুম্পা আর বাপ্পাকে নিয়ে হল মুশকিল। শেষে দাদাই বলল, দাও ওদের বড়পিসির কাছে পাঠিয়ে বহরমপুরে। প্রথমটা কেউ কথাটাকে পাত্তা দেয়নি। শেষে সকলেরই মনে হল, কথাটা মন্দ নয়। টুম্পাদের বাড়িতে কোনও কিছু ঠিক হতে গেলে অনেক রকম ফ্যাচাং ওঠে। এবারেও তাই হল। তবে শেষমেশ একটা সিদ্ধান্ত হল যে টুম্পারা যাবে বহরমপুর। তার চেয়েও যেটা পিলে-চমকানোর মতো ব্যাপার, সেটা হল বাপ্পা-টুম্পা দুজনেই শুধু যাবে। এখানে তোমরা বড়দের আরেকটা ব্যাপার

লক্ষ করে দেখতে পারো। যখন তাঁদের দরকার হয়, তখন ছোটরা আর ছোট থাকে না, বেশ বড় হয়ে যায়। শুধু অন্যসময় বলা হয়, 'বড়দের কথার মধ্যে থেকো না।' বড়রা ছাড়াই টুম্পারা যাবে। মা আর ছোটপিসি দুজনে যাবে জামশেদপুর ভোরবেলা ৬-২০ মিনিটের ইস্পাতে হাওড়া থেকে, আর টুম্পাদের গাড়ি ছাড়বে ভোর চারটে নাগাদ শিয়ালদহ থেকে। মা'রা তুলে দেবে গাড়িতে। বড়পিসি বহরমপুরে নামিয়ে নেবে। ট্রেনটার নাম লালগোলা প্যাসেঞ্জার। বাড়িতে সেজজেঠিমা যেটাকে আতান্তর বলেন সেটা কিন্তু ছোটদের ভালই লাগে, কারণ ছোটরা পড়ছে কি না মা-বাবারা অতটা লক্ষ করেন না। বাপ্পা তো দিদিমা যেদিন অসুস্থ হয়েছেন সেদিন থেকে দুধ খাওয়ার কথাটা নিয়ম করে ভুলে যাচ্ছে। টুম্পা উচ্ছেভাজা স্রেফ খাচ্ছে না।

ভোরবেলার কলকাতাটা ভারী মজার। অমন গাড়ি বাস লরি রিকশা বোঝাই রাস্তাগুলো একদম ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। এত চেনা শহরটাকে ভীষণ অচেনা লাগছিল বাপ্পা-টুম্পার। স্টেশন কিন্তু অতটা খালি নয়। তবে গাড়ি ছাড়তে বেশি দেরি নেই বলে মা'রা খুব তাড়া দিচ্ছিলেন। ওরা হাতের কাছে যে কামরাটা পেল, সেটাতেই উঠে পড়ল। একজন আধবুড়ো-মতো লোক এককোণে ঘুমোচ্ছিলেন। পিসি বলল, 'একটু এদের দেখবেন।' ঘুমোতে-ঘুমোতেই মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। মা আর পিসি (টুম্পার দিক দিয়ে, বাপ্পার দিক দিয়ে বলতে গেলে মা আর মামি। গল্প বলতে গেলে একটু গুলিয়ে যায়, তোমরা খেয়াল করে পোড়ো) বলে চললেন, 'মাথা বার করবে না, হাত বার করবে না, আজেবাজে জিনিস খাবে না, সাবধানে যাবে' ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

গাড়িটা চলতে আরম্ভ করতেই হঠাৎ সেই ঘুমন্ত ভদ্রলোক চমকে লাফিয়ে উঠলেন। "এই যাঃ, গাড়িটা ছেড়ে দিল ? একটু যে জুত করে ঘুমোব তার উপায় রাখবে রেল কোম্পানি ?" বলেই চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে গেলেন। বাপ্পা বলল, "লোকটা কুম্ভকর্ণের মামাতো ভাই। দাদাভাইটা যা ঘুমোয়।" টুম্পা যদিও দাদাভাইয়ের ওপর নানা কারণে চটা, তবু দাদাভাইয়ের কথায় বলল, "মামাতো নয়, পিস্‌তুতো। তুইও তো সারাক্ষণ ঢুলছিস্।"

বাপ্পা আর টুম্পায় খুব তাড়াতাড়ি ঝগড়া বেধে যেতে পারে। আজও যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে একপাল ছেলেমেয়ে এসে হাজির হল। খালি কামরায় এরা কোথা থেকে এল, এ-চিন্তা বাপ্পাদের মাথায় ঢুকবার আগে ছেলেমেয়েরা একটা উল্লাসধ্বনি দিল। বলল, "আজ আমরা নতুন খেলুড়ে পেয়েছি৷ তারপর ছেলেমেয়েরা এসে বাপ্পা-টুম্পাকে ঘিরে ধরল। বলল, "কী খেলা তোমরা খেলতে পারো ?"

উত্তর পাবার আগেই আরেকজন বলে উঠল, "ঘেণ্টু, তোর খেলাটা দেখিয়ে দে।"

ঘেণ্টু নামক বালকটি তখন সোজা বেঞ্চির উপর উঠে ঠেস দিয়ে বসার জায়গায় পায়ের কড়ে আঙুলে ভর দিয়ে বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল।

ব্যাপারটা টুম্পার ভাল লাগল না। চেঁচিয়ে বলল, "ওরকম কোরো না, পড়ে গিয়ে আছাড় খাবে।"

এটাতে ঘেণ্টু খুব অবাক-টবাক হয়ে বলল, "সে কী, তোমরা কোন্ দেশের লোক ? পড়ে গিয়ে কেউ কি আছাড় খায় নাকি !" বলেই ওপর দিকে একটা লাফ দিল। মাথাটা গিয়ে ঠেকল পাখার জালে, তারপর খুবই ধীরে-ধীরে নীচের দিকে নামতে লাগল।

এতক্ষণে বাপ্পারও কেমন জানি লাগছিল। ও প্রশ্ন করল, "তোমরা কে ?"

সেই ছেলেটা বলল, "আমি রনি, এ তিলক, ও মিনি, সে বুঁচি, আর ঘেণ্টুকে তোমরা তো চেনোই। আমরা এই কামরাতেই থাকি। বুড়োমানুষদের দেখলে লুকিয়ে থাকি, তবে তোমাদের মতো কাউকে দেখলে খুব স্ফূর্তি হয় আমাদের। তোমরা কোনো খেলা জানো না ?"

বাপ্পা বলল, "আমাদের সঙ্গে তো তাস নেই, থাকলে তাসের ম্যাজিক দেখাতে পারতাম।"

গাড়ি তখন দমদমে থেমেছে। রনি বলল, "দাঁড়াও, এক্ষুনি তাস আনছি।" বলেই ট্রেন থেকে নেমে গেল। গাড়ি ছাড়ার আগে এলই না। অন্য ছেলেমেয়েরা তাতে মোটেই ঘাবড়াল না। বলল, "ও এসে যাবে ঠিক।"

এসে গেলও ব্যারাকপুর স্টেশনে। জেঠু যে তাস দিয়ে ব্রিজ খেলে, সেইরকম তাস। বাপ্পা খুবই সাধারণ কয়েকটা ম্যাজিক দেখাল। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ভীষণ খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে লাফাতে লাগল। তখন মিনি বলল, "আমিও একটা তাস-খেলা জানি। এই টুম্পা, তুই একটা তাস টান তো।" বলে বাপ্পার হাত থেকে তাসের গোছাটা নিয়ে নিল। টুম্পা যে তাসটা টানল, সেটা 'ইস্কাপনের বিবি'। এ-কথাটা টুম্পার বিশেষ করে মনে আছে, কারণ টুম্পা যখন খুব সাজগোজ করে, দাদাভাই তখন বলে ওঠে, "কী সুন্দর মানিয়েছে, ঠিক যেন ইস্কাপনের বিবি।" মিনি তাসের গোছাটা এবার টুম্পার হাতে দিয়ে বলল, "তাসটা এবার এর মধ্যে ভাল করে মিশিয়ে দাও।"

টুম্পা তাও করল। মিনি এবার বলল, "আচ্ছা এবার তাসটা আবার খুঁজে বের করো।"

টুম্পা বলে উঠল, "এ আবার কেমন খেলা!"

রনি ঘেণ্টু সবাই হৈ-হৈ করে বলে উঠল, "যা বলছে, করেই দ্যাখো না।"

অগত্যা টুম্পা ইস্কাপনের বিবিটা বার করবে বলে তাস ঘাঁটতে লাগল। কিন্তু এ কী, বাহান্নটা তাসের মধ্যে একটাও ইস্কাপনের বিবি নেই। ও আবার খুঁজতে শুরু করল। নাঃ, তিনবার খুঁজেও পেল না।

মিনি বলল, "কী হল টুম্পা, দাও।"

টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "আমার তাসটা হারিয়ে গেছে।"

মিনি হেসে বলল, "হারানো কি অতই সহজ? পৃথিবীতে কোনো জিনিস হারায় না। দেখি, আমি কিছু করতে পারি কিনা।" তারপর তাসগুলো হাতে নিয়ে দু'চারবার ফেটিয়ে তাসগুলো আবার টুম্পার হাতে দিয়ে বলল, "দ্যাখো এবার তাস খুঁজে পাও কিনা।"

টুম্পা দেখে কী, সব কটা তাস-ই ইস্কাপনের বিবি হয়ে গেছে। খেলাটা টুম্পার খুব ভাল লাগল। বলল, "আমায় শিখিয়ে দেবে খেলাটা?"

মিনি বলে, "উঁহুহু, কোনো জাদুকর কি খেলা শেখায়?"

বুঁচি আর তিলক এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। এখন বলল, "টুম্পা, তুমি তো খুব সুন্দর নাচতে পারো, আমাদের নাচ দেখাবে?"

বাপ্পা-টুম্পা দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠল। এরা কারা? এতসব খবর জানে কী করে? টুম্পা বলল, "তোমরা জানলে কী করে!"

বুঁচি বলল, "আমরা ম্যাজিক জানি।" রনি বলল, "হ্যাঁ, সে বেশ মজা হবে। বাপ্পা গাইবে আর টুম্পা যদি সেইসঙ্গে নাচে তাহলে আমি তোমাদের একটা দারুণ খেলা দেখাব।"

টুম্পা নাচের জন্য একটু তৈরি হয়ে বলল, "কিন্তু এখানে নাচব কী করে?"

মিনি বলল, "যেটুকু পারো। আমাদের তো কেউ নাচ দেখায় না।"

বাপ্পা তখন গান ধরল। বাপ্পাকে দেখলে অনেকেই ধন্ধে পড়ে যায় যে, সে মানুষ না মানুষের পূর্বপুরুষ। এ-ব্যাপারে একমাত্র বড়মামার কোনো ধন্ধ নেই। তিনি নিশ্চিন্ত যে, বাপ্পা মানুষের পূর্বপুরুষ। তা বড়মামা একটি অদ্ভুত লোক। কিন্তু সেই বড়মামাও বলেন, 'বাঁদরটা গান গায় ভাল।' তারপর মা'র দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী জিনিসই নষ্ট করছিস। বাঁদরে গান গায় এটা দেখিয়ে আর শুনিয়ে কত পয়সা করতে পারতিস।' তা এখন বাপ্পার গানের তালে-তালে টুম্পার নাচ দারুণ জমে গেল। রনিরা বলল, "ভারী ভাল নাচ আর গান।"

গান শেষ হতে বাপ্পা বলল, "তুমি যে খেলা দেখাবে বলেছিলে, দেখাও।"

রনি বলল, "নিশ্চয় দেখাব, কিন্তু তার আগে তোমাদের একটু গরম পান্তুয়া খাওয়াই। সামনের স্টেশনে দারুণ পান্তুয়া পাওয়া যায়।"

এবারও খুব অল্প সময়ের মধ্যে পান্তুয়া এসে গেল। বাপ্পা টুম্পা বুঝতেই পারছিল না কোথা থেকে এসব আসছে। কিন্তু পান্তুয়া খেয়ে খুব ভাল লাগল। হাঁড়ির মধ্যে আরও পান্তুয়া দেখে বলল, "তোমরা খাবে না?"

রনি বলল, "তোমাকে আগে খেলাটা দেখিয়ে নিই। বলতে বলতে পায়রাডাঙা কি পাগলাচণ্ডী বলে একটা স্টেশনে গাড়িটা থেমে গেল। আর হৈ-হৈ করে অনেক লোক কামরাটায় উঠে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার ম্যাজিকের মতো রনি-ঘেণ্টু-তিলক-বুঁচি-মিনিরা সব উধাও। টুম্পা বাপ্পা ঢুলতে-ঢুলতে গাড়িতে চলতে লাগল। রাত থাকতে উঠেছে যে, সেটা এখন বুঝতে পারল।

বহরমপুরে গাড়ি এসে দাঁড়াতে মেসো-পিসে যখন ওদের ঘুম থেকে তুলল, তখন ওরা বুঝতে পারল, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। পরে এই নিয়ে খুব হৈচৈ হয়েছিল। সবাই বলল, অতটুকু ছেলেমেয়েদের একা ছাড়া ঠিক হয়নি। ওদের যদি না দেখতে পেত চন্দন, তাহলে কী হত। এইসব কথা।

টুম্পা দাদাভাইকে বলেছিল রনিদের কথা। রনি যে খেলা দেখাতে পারেনি, তার জন্য আপসোস করেছিল। দাদার ধারণা হয় টুম্পা বানাচ্ছে, নয় স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু বাপ্পা-টুম্পা একসঙ্গে কী করে একই স্বপ্ন দেখবে? আর ওই যে পান্তুয়ার হাঁড়ি, সেটা কোথা থেকে এল? বাপ্পা-টুম্পা বুঝতে পারে না।

ছবি : অহিভূষণ মালিক

পুজোয় চলুন

শান্তনু দাস

হাঁটব কোথায়? রাস্তাতে?
রাস্তা থুড়ি, খাস্তাতে—
ইঁটোল বিঁটোল গর্ত, খানা
জল জমেছে, নৌকো বানা,
ও নৌকো, ফিরে আয়,
দাঁড় হারাল গলুইটায়।
গলুই কোথায়, পাতাল পথ
চলবে কবে মেশিন-রথ?
তার চে ভাল ডুংরি বন
বন দেখবে শহর-জন,
রাতের বেলায় মাদলতাল
ঝাড়গ্রাম বা নৈনিতাল!
যে যাবে যাক, যাচ্ছিনে।
পাহাড় ধাপা 'পার্ক' বনে—
উঠুক আরো হোক না বড়
হরিণ, ময়ূর জলদি ছাড়ো,
ফোটো পাঠাও আরব 'শায়
'জার্সি বিলেত থাই জাভায়,
পকেট থেকে দর্শনী
কলকাতা—বিল, বন, ধ্বনি।

ছবি : মদন সরকার

দারুণ ম্যাজিক

জাদুকর তাপস বসু

জাদুকর প্রথমে তিনটি তাস দেখালেন। লাল, সাদা, ও নীল রঙের। এবার দর্শকদের কাছ থেকে একটি রুমাল চেয়ে নিয়ে, তাস তিনটিকে টেবিলের ওপর রেখে, রুমাল দিয়ে চাপা দিলেন। তারপর একটি-একটি করে তাস বার করে দর্শকদের আর-একবার দেখিয়ে, আবার রুমালের তলায় রাখলেন। এবার তিনি একটি খালি খাম সকলকে দেখালেন। তারপর রুমালের তলা থেকে লাল তাসটি আর নীল তাসটি একে-একে বার করে খামটির মধ্যে রাখলেন। এর পর তিনি একজন দর্শককে ডেকে রুমালটি তুলতে বললেন। দেখা গেল, রুমালের তলায় যে সাদা তাসটি থাকার কথা ছিল, সেটি সেখানে নেই, তার বদলে সেই তাসটি বেরুল জাদুকরের পকেট থেকে। জাদুকর প্রশ্ন করলেন, "তাসটি আমার পকেটে গেল কী করে জানেন কি ?" নিজেই জবাব দিলেন, "বাই এয়ার মেল।" বলে তিনি সাদা তাসটিকে উলটে দেখালেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল, সাদা তাসটির পেছনে একটি এয়ার মেল স্ট্যাম্প লাগানো রয়েছে।

এই দারুণ খেলাটা কিন্তু তোমরাও দেখাতে পারো। হ্যাঁ, সত্যিই পারো। শিখবে খেলাটা ? বেশ ! তাহলে এই জিনিস কটা যোগাড় করে ফেলো। চারটে পুরনো তাস। পুরনো তাস যদি বাড়িতে না পাও তাহলে কার্ডবোর্ড কেটে তাস তৈরি করে নাও। তাস ছাড়া লাগবে তিন রঙের কাগজ। একটা এয়ার মেল স্ট্যাম্প। পোস্টাপিসে পাওয়া যায়, পুরনো চিঠি থেকেও খুলে নেওয়া যায়।

খেলাটা কী করে তৈরি করবে মন দিয়ে শোনো। প্রথমে একটা তাসের দু-পিঠে সাদা কাগজ সেঁটে নাও। যে-কোনও এক পিঠে এয়ার মেল স্ট্যাম্পটি লাগিয়ে নাও। এবার এই তাসটি বুকপকেটে রেখে দাও। তাসটি এমনভাবে বুকপকেটে রাখবে যাতে তাসটি বার করার সময় এয়ার মেল স্ট্যাম্পটি পেছন দিকে থাকে। এবার আরেকটি তাস নিয়ে তার এক পিঠে সাদা অন্য পিঠে নীল কাগজ লাগাও, তাহলে তোমার দু' নম্বর তাস তৈরি হয়ে যাবে। এবার তিন নম্বর তাসটি তৈরি হবে। এটি কীভাবে তৈরি হবে, খুব মন দিয়ে শোনো। যে-দুটি তাস পড়ে আছে, সে-দুটিই লাগবে এবার। প্রথমে তার থেকে একটা তাস নাও, তাসটির দু-পিঠে লাল কাগজ লাগিয়ে ফেলো। এবার অন্য তাসটি নিয়ে তার এক পিঠে সাদা কাগজ লাগাও। এবার সাদা তাসটিকে লাল তাসটির ওপর আঠা দিয়ে আটকে দাও। কী ভাবে আটকাবে ১ নং ছবিতে দ্যাখো। বাড়তি সাদা অংশটা কেটে নিতে হবে। লাল তাসটিকে উলটে নিয়ে বরং কেটে ফেলো, কাটতে সুবিধে হবে (২ নং ছবি দ্যাখো)।

তোমাদের খেলাটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এবার দেখাবার পালা। তার আগে বলো তো তোমাদের কাছে কটা তাস আছে ? তোমাদের পকেটে আছে দু-পিঠে সাদা একটি তাস, যার পেছন দিকে এয়ার মেল স্ট্যাম্প লাগানো। আর তোমাদের হাতে আছে দুটি তাস যার একটির এক পিঠে সাদা, অন্য পিঠে নীল। আর-একটি তাস, যার এক পিঠে লাল আর অন্য পিঠে কিছুটা লাল, কিছুটা সাদা। এবার এই লাল-সাদা তাসটির ওপর নীল-সাদা তাসটি বসিয়ে এমনভাবে ধরো, যাতে করে দেখলে মনে হয় যে, তোমাদের হাতে মোট তিনটি তাস আছে। ৩ নং ছবিটা দ্যাখো। এবার এই 'তিনটি' তাস (আসলে যা দুটো) তোমাদের বন্ধুদের দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে একটা রুমাল চেয়ে নিয়ে টেবিলের ওপরে তাসগুলো রেখে রুমালটা দিয়ে চাপা দাও। বন্ধুদের এবার জিজ্ঞাসা করো, কী কী রঙের তাস আছে রুমালের তলায় ? তারা বলবে লাল, সাদা, নীল। উত্তরে বলবে, "আমি আরেকবার তাসগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে তোমরা লাল সাদা তাসটির লাল দিকটাকে বন্ধুদের দেখিয়ে রুমালের তলায় রেখে দাও। এর পর যে-তাসটির এক পিঠে নীল আর এক পিঠে সাদা, সেই তাসটির নীল দিকটি রুমালের তলা থেকে বার করে এনে বন্ধুদের দেখাও। তারপর রুমালের তলায় নিয়ে গিয়ে তাসটিকে উলটো করে ধরে ওই তাসটাকেই আবার বার করে আনো। এনে সাদা দিকটা দেখাও। বন্ধুরা এবার বিশ্বাস করতে বাধ্য যে, রুমালের তলায় তিন রঙের তিনটি তাসই আছে।

এর পরেরটুকু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। নাকি সেটুকুও বলে দিতে হবে ! এবার খালি খামটি বন্ধুদের দেখাও। তারপর রুমালের তলা থেকে লাল তাসটি (লাল দিকটি) বার করে বন্ধুদের দেখিয়ে খামের মধ্যে রাখো। আর যে-তাসটি রইল সেটির নীল দিকটি বার করে বন্ধুদের দেখিয়ে খামের মধ্যে রাখো। তারপর রুমালটা তুলে তোমাদের বন্ধুরা যখন সাদা তাসটি খুঁজে পাবে না তখন তোমরা পকেট থেকে সাদা তাসটি বার করে প্রথমে সামনের দিক, পরে আস্তে-আস্তে পিছনের দিক দেখাবে। দেখবে, কী দারুণ হাততালি পাচ্ছ।
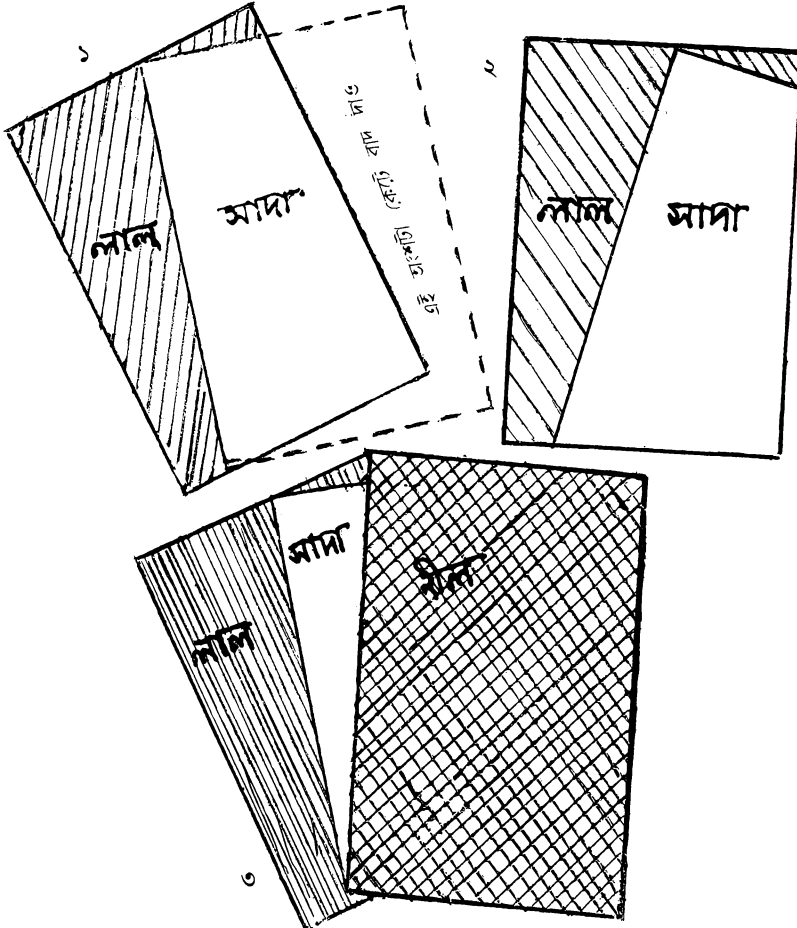
নতুন জায়গা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

সেদিন সকালবেলায় অফিস যাওয়ার সময় বাবা বিভুকে বলে গেলেন, “বিকেলবেলায় তৈরি হয়ে থেকো, আজ একটা নতুন জায়গায় যাব।”

মাধ্যমিক পরীক্ষার পর এখন লম্বা ছুটি। বিভু ভেবেছিল এই সময়টাকে সে কিছুতেই নষ্ট করবে না। সাঁতার শিখবে। আর সাইকেল চড়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা আলস্য তাকে ঘিরে ধরল যে ঐ দুটোর কোনোটাই হয়ে উঠল না। তবে বই পড়েছে বিস্তর। কিন্তু আজ সকালে ঐ-যে বাবা বলে গেলেন বিকেলবেলায় বিভুকে নিয়ে একটা নতুন জায়গায় যাবেন সেটা শোনার পর থেকেই তার মনে কী যে একটা উদ্দীপনা বয়ে যাচ্ছে।

বাবা একটু অন্যরকমের মানুষ। রাশভারী। কম কথা বলেন। খুব ছেলেবেলায় বিভু মা'কে হারিয়েছে। সে বড় হয়েছে বাড়ির আবহাওয়া থেকে দূরে। হস্টেলে।

দুপুরবেলায় দোতলার ঘরে শুয়ে-শুয়ে বিভু বই পড়ছিল। এই নিয়ে যে কতবার 'চাঁদের পাহাড়' বইটা পড়া হল, তার কি ইয়ত্তা আছে? বাবা অফিসে চলে যাবার পর তার মনে হয়েছিল, আজ এই বইটাই পড়া দরকার। কেননা বাবার কথা শোনার পর থেকেই সে নিজেকে 'চাঁদের পাহাড়'-এর শংকরের মতন কল্পনা করছে। আমার মতন সেও তো বাংলাদেশের ছেলে। দূরদূরান্ত শংকরকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। আজ বিভুকেও ডাকছে। এসব তার আজ কেন মনে হচ্ছে? ভাবতে গিয়ে দেখল এর মূলে আছেন বাবা। বাবা আজ সকালে হঠাৎ একটু অন্যরকম মানুষ হয়ে উঠলেন কেন? এই বাবাকে তো বিভু চিনত না। বাবা বরাবরই কম কথা বলেন। শান্ত। মাঝে-মাঝে হস্টেলে গিয়ে বাবা তার খবর-টবর নিতেন। পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে আলোচনা করতেন। কিন্তু কোনোদিন এইভাবে তো বলেননি, তৈরি হয়ে থেকো, আজ একটা নতুন জায়গায় যাব। নতুন জায়গাটা কী? সেটা কোথায়? আজ বিকেলে বাবা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন? বুকের ওপর 'চাঁদের পাহাড়' নিয়ে বিভু ভাবতে চেষ্টা করল বাবা তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারেন। কোনও বন্ধুর বাড়িতে? না, বাবার তো তেমন কোনো বন্ধুবান্ধব নেই। তবে কি চন্দননগরে নবীন জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে?

বাড়িটা এখন নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে-মাঝে কাক ডাকছে। বাড়িতে প্রাণী বলতে কাকা, কাকিমা, বাবা আর বিভু। কাজের লোক অর্জুন ও ময়নার-মা। বাবা অফিসে। কাকা কোর্টে। কাকিমা ঘুমোচ্ছেন। বিভুরও ঘুম পাচ্ছে। বিভু চোখ খুলে জানলা দিয়ে জামরুল গাছটা দেখতে পেল। জামরুলগাছের নীচেই গ্যারাজ। গ্যারাজের কথা ভাবতে-ভাবতে সে আবার চোখ বন্ধ করল। সে চোখ বন্ধ করে গ্যারাজের ভেতরটা স্পষ্ট যেন দেখতে পেল। দাদুর আমলের নীলরঙের ফোর্ডগাড়ি। এখনকার গাড়ির সঙ্গে এই গাড়িটার কত তফাত। এখনকার গাড়িতে তো পাদানি থাকে না। আর অমন বিদুঘুটে হর্ন। আবার মনে পড়ল শংকরের কথা। আফ্রিকার কথা। বাওবাবগাছের কথা। কিন্তু মায়ের কথা মনে পড়ল না। মা'কে তার মনেই পড়ে না। মা'র কথা উঠলেই তার মনে যে ছবিটা ফুটে ওঠে সেটি বাবার ঘরে টাঙানো আছে। এতটুকু ফুটফুটে বিভুকে কোলে নিয়ে মা ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে সেই জামরুলগাছ। এইসব ভাবতে ভাবতে বিভু আবার নীলরঙের ফোর্ডের কাছে গেল। কী উৎকট হর্ন। ভাবতে ভাবতেই হর্ন বেজে উঠল। বুড়ো মানুষের ঘঙঘঙ কাশির মতন। কে বাজাচ্ছে? বাবা ছাড়া আর কেউ তো এ-গাড়ি ব্যবহার করেন না। বিভু বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। ছুটে গেল জানলার কাছে। ঠিক, যা ভেবেছে তাই। বাবা আজ খুব তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরেছেন। অফিসের ধড়াচুড়ো ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে একেবারে রেডি। ই...শ, বোকার মতন বিভু তাহলে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল? সে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল, “তুমি রেডি? আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।” সে তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট পাল্টে ফেলল। তারপর বারান্দায় আসতেই কাকিমার গলা শোনা গেল, “বি..ভু।” বিভুর

কি আর শোনার সময় আছে ! সে তখন লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। কাকিমা আবার ডাকলেন, "বিভু, দাঁড়াও। খাবারটা খেয়ে যাও।" বিভু নামতে-নামতেই বলল, "এসে খাব। আমার এখন একদম সময় নেই।"

গ্যারাজ থেকে গাড়িটা বার করে বাবা এখন তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিভুকে ছুটে আসতে দেখে উনি মুখ তুলে হাসলেন। বিভুর আবার মনে হল বাবা সত্যিই আজ অন্যরকম। কাকিমা দোতলার বারান্দা থেকে ডাকছিলেন। বিভু আগের মতন এবারও বলল, "এখন খাওয়ার সময় নেই।" দরজা খুলে সে গাড়িতে উঠে বসল। বাবা গাড়ির মুখে একটা হ্যাণ্ডেল লাগিয়ে কয়েকটা পাক দিলেন। ইঞ্জিন গর্জে উঠল। হ্যাণ্ডেলটা সামনের সীটের নীচে রেখে গাড়িতে উঠে বসলেন। বিভু একবারও বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারল না 'আমরা কোথায় যাচ্ছি'। গাড়ি ভবানীপুরের শান্তিধাম থেকে বেরিয়ে বড়-রাস্তায় চলে এল।

বিভুর ভাল নাম বিভাবসু। নামটা বাবারই দেওয়া। বাবা বলেন মানুষের নামকরণ করা দরকার একটু ভেবেচিন্তে। ছেলেবেলা থেকেই মানুষের উচিত নিজের নামের তাৎপর্যটি জীবনের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। বাবা এমনিতে বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যখন কথা বলেন, তখন এইরকম কঠিন কঠিন কথা বলেন। বিভুর মনে হয় বাবার কথাগুলি যদি পরপর সাজিয়ে লিখে ফেলা হয়, তবে দিব্যি একটা বই হয়ে যাবে। কিন্তু আজ বাবার অন্য চেহারা। সন্ধেবেলায় তিনি খুব প্রফুল্লমনে নীলরঙের পুরনো ফোর্ডে বিভুকে নিয়ে চলেছেন একটা নতুন জায়গায়। বিভুর একটা পুরনো কথা মনে পড়ল। সে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমার নামের মানে তো সূর্য।" বাবা বলেছিলেন, "তুমি সূর্যকেই তোমার আদর্শ করবে।"

কলকাতার সব রাস্তা বিভু চেনে না। কিন্তু এসপ্ল্যানেড অচেনা নয়। ওরা এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে ঢুকে পড়ল। বিভু এবার একটা অস্বস্তি বোধ করল। মনে পড়ল বিকেলে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদে পেয়েছে। বাবাও বললেন না, 'জলখাবার খেয়ে নাও, তারপর বেরোব'। সুতরাং বিভু একরকম নিশ্চিত, আজ তারা যে নতুন জায়গাটায় যাচ্ছে সেখানে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে। পথেই একটা পাম্পিং স্টেশন থেকে পেট্রল ভরে নেওয়া হল। বড়রাস্তা ছেড়ে গাড়ি এবার একটা ঘিঞ্জি গলিতে ঢুকল। হর্ন বেজে উঠলেই বিভু লজ্জা পাচ্ছে। পুরনো গাড়ি, বিদ্‌ঘুটে হর্ন আর অন্যরকম বাবা নিয়ে বিভু জড়সড় হয়ে বসে আছে। কিন্তু মনের ভেতর এক আনন্দময় প্রতীক্ষা।

গলির বেশির ভাগ আলো জ্বলছে না। রাস্তা বড্ড সরু। দোকানে রেডিও বাজছে। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ছোটাছুটি করছে। একটা কুকুর বিভুদের গাড়িটা দেখে চটে গেল। কুকুরটা ডাকছে। কিছুক্ষণ এদের ফোর্ডের পেছনে ঘেউ-ঘেউ করতে করতে তাড়া করে এল। বাবা এবার ডানদিকের রাস্তা ধরলেন। ডানদিকে আচমকা একটা ফাঁকা মাঠ পাওয়া গেল। এখানে রাস্তাটা অনেকটা ফাঁকা। বিভুর ধৈর্যে আর কুলোচ্ছিল না। ও ঠিকই করে ফেলল বাবাকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তার আগে বাবাই কথা বললেন, "আমরা একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি। আমি জানি সেই জায়গাটা তোমার খুব ভাল লাগবে না।" বলে বাবা চুপ করলেন। বিভু বুঝতে পারল না বাবা ঠিক কী বলতে চাইছেন। বাবা গাড়ি থামালেন। একপাল মোষ আসছে। কাতারে কাতারে মোষ। দু' চারটে লোক মোষগুলোকে লাঠি দিয়ে গুঁতোচ্ছে, মারছে। যারাই দলছুট হচ্ছে, তাদের ভাগ্যে মার। "আচ্ছা বিভু, মনে করো তুমি চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছ। এমন সময় দেখতে পেলে একটি লোক রাস্তা পার হবার জন্যে ব্যস্ত। লোকটির হাতে সাদা লাঠি, চোখে কালো চশমা।"

"তখন লোকটার হাত ধরে তাকে রাস্তা পার করে দেব। কারণ লোকটি অন্ধ।"

বিভু ভেবেছিল বাবা বাহ্‌বা দেবেন। বলবেন, "ভেরি গুড।" বাবা সে সব কিছু বললেন না। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে বিভুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। "তোমার মা'কে কি মনে আছে? নিশ্চয়ই নেই। তুমি তখন খুব ছোট। তোমার মা যখন চলে-গেলেন, তখন সেই ছোট্ট তোমাকে নিয়ে খুব অসহায় বোধ করেছিলুম। সেদিন মনে হয়েছিল মানুষের দুঃখে যে তার পাশে দাঁড়ায় তার চেয়ে মহৎ আর কেউ নেই। আমি জানি বিভু, এইসব কথা তোমার ভাল লাগছে না। ভাবছ, এই রে, বাবা আবার জ্ঞান দিতে শুরু করেছেন।" বাবা চুপ করলেন। রাস্তা ফাঁকা। বাবা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। আশ্চর্য, আজ কিন্তু বাবার কথাগুলো বিভুকে উদ্দীপিত করল।...বাবা নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে এমন একটা জায়গায় যাচ্ছেন যেখানে যাওয়া আমার খুব দরকার। বিভু এইসব ভাবছিল।

বাবা এবার গাড়ি থামালেন। ওরা গাড়ি থেকে নামল। গাড়ি লক্ করে বাবা বিভুর হাত ধরে বললেন, "চলো।"

টালির ছাদ ঢাকা একটা দোতলা বাড়ি। দরজা পেরিয়েই উঠোন। বাবা ডাকলেন, "নবকেষ্ট। ও নবকেষ্ট।"

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর ধুতি-শার্ট পরা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বাবাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, "ও, আপনি। ওপরে চলে যান। ওরা সব এসে গেছে।"

বাবার হাত ধরে কাঠের সিঁড়ি পেরিয়ে বিভু দোতলায় এল। সামনে একটা ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে আট-দশ বছরের গোটা কুড়ি ছেলে বই-খাতা নিয়ে বসে আছে। বাবার হাত ধরে বিভু ঘরে ঢুকল। এবার ছেলেরা উঠে দাঁড়াল। দেওয়ালে একটা ব্ল্যাকবোর্ড। বোর্ডের কাছে টেবিল চেয়ার। টেবিলে চক্, ডাস্টার। বাবা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নাও, এবার শুরু করো।" ছেলেরা একটা গান শুরু করল। এ-গানটা বিভু কোনোদিন শোনেনি। বিভুরাও স্কুলের লনে দাঁড়িয়ে প্রেয়ার করে। এটা কি প্রেয়ার সঙ? সন্ধেবেলায় কি প্রেয়ার সঙ গাওয়া হয়? এই ছেলেরা কারা? সকালের ইস্কুলে না পড়ে এখন পড়তে এসেছে কেন? এইসব অজস্র প্রশ্ন বিভুর মনে পাক খেতে লাগল। বাবার দিকে তাকাতেই কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গেল বিভু। মনের ভেতরের প্রশ্নগুলো যেন ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা চোখ বন্ধ করে পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেরা ধীরে ধীরে গান গাইছে। বাবার চোখের কোল বেয়ে খুব শীর্ণ ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। গান শেষ হল। বাবা পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বিভুকে বললেন, "তুমি ওদের পেছনে গিয়ে বোসো।"

বাবা চক নিয়ে বোর্ডের ওপর লিখলেন : আজকের পড়ার বিষয় ইতিহাস।

বিভু ক্রমাগত অবাকই হচ্ছিল। সে জানত না বাবা এইরকম একটা নাইট স্কুল খুলেছেন। বাবা কিন্তু পড়ালেন না। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে যে-কথা বললেন তা শুনে বিভু প্রথমে চমকে উঠল। এবং তারপর আস্তে আস্তে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বাবা এবার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। বিভু উঠল। বাবা আবার ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার থেকে এই দাদাটি মাঝে-মাঝে এসে তোমাদের পড়াবে।"

বিভুকে এসে বোর্ডের সামনে দাঁড়াতে হল। তখন সে টের পেল তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। বাবা কি তার মনের কথা বুঝতে পারলেন? তিনি বললেন, "আজ প্রথমে—মিষ্টি-মুখ দিয়ে শুরু করা যাক।" বাবার কথা শেষ হতে না-হতেই নবকেষ্ট মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সকলে মিলে মেঝেতে বসে মিষ্টি খেল। এর মধ্যে কয়েকটা ছেলে জলের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর নবকেষ্ট মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিভুকে দেখতে দেখতে বললেন, "দীনবন্ধুবাবু, এই বুঝি আপনার ছেলে?" বাবা বিভুর মাথায় হাত রেখে মৃদু হাসলেন। বাবার সলজ্জ হাসির আড়ালে ভালবাসা আর গর্ব একাকার হয়ে ছিল।

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন জায়গা দেখলে বিভু?"

বিভু আস্তে আস্তে বলল, "হ্যাঁ।" তারপর সারাটা পথ বাবা চুপচাপ। বিভুর চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছিল। সেটা দুঃখের না আনন্দের, তা বিভু নিজেই জানে না।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি : শেখর রায়

উপন্যাস

খুদে যাযাবর ইসতাসি

শৈলেন ঘোষ

আমি ইসতাসি। ইসতাসি আমার নাম। এম্নন নাম তো তোমরা কোনোদিন শোনোনি! সুতরাং ভাবতে পারো, ছেলেটার এ কী অদ্ভুত নাম রে বাবা! অবিশ্যি আমার নামটা তোমার কানে অদ্ভুত ঠেকলেও, আমাকে দেখলে যে তোমার খুব খারাপ লাগবে, তা বলতে পারি না। কেননা, আমার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা এই যে লাল-নীল ডোরা-কাটা প্যান্টটা দেখছ, গায়ে রঙিন ফুল-হাতা, ফুল-কাটা জামাটা দেখছ, তার ওপর এই যে দেখছ জরির-কাজ-করা জ্যাকেটটা, বলো, এ দেখে আমাকে তোমার ভাল লাগছে না? তবুও তো টুপিটা মাথায় দিইনি। অবিশ্যি আমি দেখতেই-বা কম কী! বলতে পারো, আমার তো এখন বয়স তেমন হয়নি। সবে দশ পেরিয়ে এগারোয় পড়েছি। সুতরাং অমন রঙচঙে সাজ-পোশাক পরলে এই বয়সে বাঁদরকেও দেখতে ভাল লাগে!

ছিঃ! ছিঃ! তা বলে আমায় বাঁদর বোলো না! আমি ইসতাসি। আমি এক যাযাবরের ছেলে।

আমি জানি না, যাযাবর বললে তোমরা আমায় ঠিক চিনতে পারবে কি না! শুধু জেনো আমাদের কোনো ঠিক নেই, ঠিকানা নেই। তোমাদের মতো আমাদের না আছে মস্ত-মস্ত বাড়ি, না আছে দামি-দামি আসবাব। পথেই আমাদের ঘর। এই পথে-পথেই আমরা

দল-বেঁধে ঘুরে বেড়াই। যাই এক দেশ থেকে আর-এক দেশে। কদিনের জন্যে মাঠে-ঘাটে তাঁবু ফেলি। তারপর সময় হলেই আবার আর-এক দেশে পাড়ি দিই। বেশ লাগে। আমরা শুধু দেখে বেড়াই। নতুন-নতুন দেশে কত নতুন মানুষ। কত নতুন মুখ। কত নতুন কথা।

প্রথমেই বলে রাখি, আমার মা-বাবা কেউ নেই। কী করে যে আমি আমার মাকে, বাবাকে হারিয়েছি, সে-কথা বলতে গেলে এখনও আমার বুক কেঁপে ওঠে! তাদের কথা ভাবতে-ভাবতে আমি মাঝে-মাঝে নিজেকেও কেমন হারিয়ে ফেলি! এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তাদের। মায়ের মুখখানি এখনও আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে ওঠে। আঃ! কী সুন্দর দেখতে ছিল আমার মাকে! কী মিষ্টি গান গাইত আমার মা। আমার বেশ মনে পড়ে, মা পরত রঙিন ঘাঘরা। মায়ের পায়ে ছিল রুপোর মল। গলায় মোহর-আঁটা মালা। আর কানে ছিল এত্তো বড় দুটো চাঁদির রিং। সেজেগুজে মা যখন সন্ধ্যারাতে চাঁদের আলোয় গান গাইত, কী ভালই না লাগত। আর আমার বাবা? একটা ঢিলেঢালা প্যান্ট পরে, রঙিন ডোরা-কাটা জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় টুপি এঁটে মায়ের গানের সঙ্গে ব্যানডুররিয়া বাজাত। জ্যোৎস্নারাতে দলের সবাই যখন কাজের শেষে আমাদের তাঁবু-ঘেরা সবুজ মাঠে জমায়েত হয়ে আনন্দ করত, সেই আনন্দে মাকেও গান গাইতে হত। আমি হলপ করে বলতে পারি, সে-গান শুনলে আমার মতো তোমরাও বেবাক হয়ে যেতে!

ব্যানডুররিয়া বাজনাটা তোমরা কেউ দেখেছ কি না জানি না। এটা একটা তারের বাজনা। অনেকটা ম্যাণ্ডোলিনের মতো দেখতে। তবে, ম্যাণ্ডোলিনের পেটটা নাশপাতির মতো গোল। এটার পেট চ্যাপ্টা। গলায় ঝুলিয়ে আঙুল ছুঁয়ে এর তারে সুর তুললে আমি হলপ করে বলতে পারি, তোমার পা দুটি আপনা-আপনি নেচে উঠবে।

আমার বাবা যেমন ব্যানডুররিয়া বাজাতে পারত, তেমনি জানত মজার জাগলিং-এর খেলা। একসঙ্গে কুড়িটা বড়-বড় কাঠের বল আকাশে ছুড়ে এমন চরকি খাওয়াত যে, দেখলে তুমি হাঁ হয়ে যেতে! বাবার হাতের কায়দায় শূন্যে ঘুরতে-ঘুরতে ওই কাঠের বলগুলোকে কখনও মনে হত একটা মস্ত মালা। কখনও মনে হত একটা এত্তো বড় লাট্টু বাঁই-বাঁই করে ঘুরছে। আবার কখনও মনে হত যেন আকাশ-মুখো একটা রকেট হুস-হুস করে উড়ে যাচ্ছে। শুধু কাঠের বল কেন! লোহার চাকতি অথবা তারের রিং এমন-কী কাঠের ছোট্ট-ছোট্ট রঙচঙে টুল নিয়েও বেমালুম শূন্যে ছুড়ে নানান খেলা দেখাতে পারত আমার বাবা।

একটু-আধটু ম্যাজিকও জানত বাবা। তবে আনাতিদাদার মতো অমন নয়। আনাতিদাদা ম্যাজিক দেখাতে-দেখাতে 'ফুস' বলেই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত। উঃ! সে কী তাজ্জব ব্যাপার! তুমি এখানে খোঁজো, আর যেখানেই খোঁজো, খুঁজে আর পেতে হচ্ছে না। আমি তো প্রথম দিন খেলাটা দেখে একেবারে থ। এই খেলাটা দেখালে অনেক পয়সাও পেত আনাতিদাদা।

সে তো বটেই! পয়সা তো পেতেই হবে। নইলে চলবে কেমন করে! আমরা তো যাযাবর। আমাদের এমনি করেই দিন চলে। এমনি নাচ দেখিয়ে, গান শুনিয়ে, খেলা দেখিয়ে আর নয়তো ঘরে-হাটে সাত-সতেরো জিনিস বিক্রি করে।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, আনাতিদাদা কে? আনাতিদাদা আমাদের দলের সর্দার। আমাকে খুব, খুউব ভালবাসত। ভারী শক্ত-সমর্থ মানুষ ছিল আনাতিদাদা। এত্তোখানি চওড়া বুক। বুকভর্তি সাহস। হাতের আঙুলগুলো এমনি পুরুষ্টু! একখানি ঘুসি মারলে আর দেখতে হবে না! প্রাণ নিয়ে টানাটানি। অবিশ্যি কম-বেশি আমাদের সকলেই সাহসী। হতেই হয়। কেননা, যাদের পথে-পথেই শুধু হাঁটতে হয়, জানে না, আজকের হাঁটা-পথ কালকে কোথায় গিয়ে থামবে, তাদের জীবনে পদে-পদে বিপদ যে! এই সাহস আর শক্তি দিয়েই তো সে-বিপদ রুখতে হয়!

এই ছোট্ট বয়েসেই, বাবার হাতে ওই ব্যানডুররিয়াটা বাজতে দেখলেই, আমারও হাত নিশপিশ করত। মনে হত, আমিও যদি বাবার মতো ব্যানডুররিয়া বাজাতে পারতুম। ছেলেমানুষি বুদ্ধি তো! তবু, বাবাকে ফাঁকি দিয়ে, মাঝে-মাঝেই ওই ব্যানডুররিয়ার তারগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে টুং-টাং টান দিতে ছাড়িনি। বাজনা হত না। কিন্তু হাতের টানে বেসুরো যে-শব্দগুলো বাজনা হয়ে কানে বাজত, তাতেই ভারী মজা লাগত আমার। আর মজা লাগত বলে, সুযোগ পেলেই তার ধরে টান দিতুম। একদিন এমনি করে টান দিতে গিয়ে বেমক্কা একটা তার টং করে ছিঁড়ে ছিটকে গেল। বুঝতেই পারছ, তখন আমার কী অবস্থা! বাবার বকুনির ভয়ে আমি একেবারে জুজু! আমার যদি ছেঁড়া তার জোড়া দেওয়ার সাধ্যি থাকত, তাহলে তো কোনো কথাই ছিল না। বাবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কাজটি সেরে চুপচাপ বসে থাকতুম। বাজাতে-বাজাতে বাবাকেও দেখেছি কখনো-সখনো তার ছিঁড়ে ফেলতে। আবার দেখেছি, কত সহজেই তার জোড়া দিয়ে বাজনায় নতুন করে সুর জুড়েছে বাবা। সে যেন বাবার কাছে কিছুই নয়।

তোমাদের আগেই বলেছি, আনাতিদাদার কথা। সুতরাং এখন বাবার বকুনির হাত থেকে আমায় বাঁচতে হলে, আনাতিদাদার হাতে নিজেকে ধরা দিতে হয়। তাই আমি ছুটলুম আনাতিদাদার তাঁবুতে। আমরা যে-মাঠে এখন তাঁবু ফেলেছি, ঠিক তার সামনেই আনাতিদাদার তাঁবু। একছুটে তাঁবুতে ঢুকতেই দেখি, আনাতিদাদা তামুক খাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে, হঠাৎ তার তাঁবুতে আমাকে ঢুকতে দেখে আনাতিদাদার চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় চিৎকার করেই আমার নাম ধরে ডাক দিল, "ইসতাসি!" ডাক দিয়েই একবুক হাসি ছড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করল। আমাকে দেখে কী যে খুশি, সে তোমাকে কী বলব! আমার কিন্তু হাসি পেল না। আমার মুখখানা শুকনো দেখে, তার অবাক হওয়ারই তো কথা! হাসতে-হাসতে থমকে গিয়ে কেমন সন্দেহের চোখে চাইল আমার দিকে। আমি ছুটে গেলুম আনাতিদাদার কাছে। আনাতিদাদা আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তার বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে হাঁপাতে লাগলুম।

অবাক হয়েই আনাতিদাদা আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "কী হয়েছে, ইসতাসি?"

আমি ফুঁপিয়ে উঠলুম। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বললুম, "বাজনা!"

আনাতিদাদা আমার এমন উত্তর শুনে আরও অবাক হল। জিজ্ঞেস করলে, "বাজনা? কিসের বাজনা? কার বাজনা?"

"বাবার। ব্যানডুররিয়া।"

"কী হয়েছে?" আনাতিদাদার গলায় আরও অবাকের সুর।

"বাজাতে গিয়ে তার ছিঁড়ে ফেলেছি!"

আর কোনো কথা নয়। সঙ্গে-সঙ্গে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠেছে আনাতিদাদা। আমি আনাতিদাদাকে হাসতে দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। আনাতিদাদার বুকের ভেতর থেকে মুখটা সরিয়ে এনে তার চোখের সামনে তুলে ধরলুম। আনাতিদাদা আমার মুখখানা দেখে আরও জোরে হেসে উঠেছে। হাসতে-হাসতে বললে, "আরে ছ্যাঃ-ছ্যাঃ! এর জন্যে ইসতাসি ভয় পায়!"

আমি নিজের ভয়টাকে তবুও নিজের মধ্যে লুকোতে পারলুম না। আমার চোখদুটো ভয়ে কাঠ হয়েই, আনাতিদাদার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। আনাতিদাদা আমার মাথায় একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "বুঝতে পেরেছি, ব্যানডুররিয়াটা বাজাতে ইচ্ছে যায় বুঝি?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ। বাবার মতন।"

"আমি শিখিয়ে দেব।"

এতক্ষণ আমার যে-মুখখানা ভয়ে কালো হয়ে ছিল, হঠাৎ সে-মুখে আলো ঝলসে উঠল। আনাতিদাদার এ-কথাটা আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। তাই তার হাত দুটো ধরে প্রায় লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলুম, "সত্যি?"

আনাতিদাদা বললে, "নিশ্চয়ই!"

"আমি পারব?"

"আলবত!"

আনন্দে আমি আরও লাফিয়ে উঠলুম, মাটি থেকে আকাশে। কিন্তু তারপর হঠাৎ-ই আবার ব্যানডুররিয়ার তার ছেঁড়ার কথাটা মনে পড়তেই আনন্দটা কেমন যেন চুপসে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম,

"বাবার ব্যানডুররিয়াটার কী হবে ?"

আনাতিদাদা বললে, "ওটার জন্যে ভাবনা নেই। ওটা বাবাই ঠিক করে নেবে। আমি বলে দেব। কিন্তু এক শর্তে ! আমি যে তোমাকে ব্যানডুররিয়া বাজাতে শেখাব, এ-কথাটা এখন কাউকে বলতে পারবে না !"

"কেন ?"

"একদিন হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দেব।"

কথাটা শুনে আমার খুব ভাল লাগল। হ্যাঁ, সত্যিই তো ! হঠাৎ একদিন আমি যদি ব্যানডুররিয়া শুনিয়ে বাবাকে অবাক করে দিতে পারি, বলো, সেদিন কী দারুণ মজা হবে !

আনাতিদাদাও যে ব্যানডুররিয়া বাজাতে পারে, এ-কথাটা তোমাদের বলতে একদম ভুলে গেছি। অবিশ্যি ম্যাজিক-খেলা দেখাতে আনাতিদাদার যতটা উৎসাহ দেখতে পাবে, ব্যানডুররিয়ার বেলায় তা নয়। একেবারে বাজায় না যে, তা নয়। তবে কালেভদ্রে। তাই বলে যেন মনে কোরো না, তেমন বাজাতে পারে না ! বাব্বা ! দারুণ ওস্তাদ ! যেমন ওস্তাদ ম্যাজিকে, তেমনি। আমার বেশ মনে আছে, একদিন সন্ধেবেলায়, মাঠের জমায়েতে বাবার সঙ্গে ব্যানডুররিয়ার এমন লড়াই শুরু করে দিলে যে, তাই শুনে তো সবাই একেবারে থ ! এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় ! কেউ ছাড়বার পাত্তর নয় ! যখন বাজনা শেষ হল, আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম ! কে হারল, আর কে যে জিতল কেউ-ই বলতে পারল না। সেই রাতটা আমার আরও স্পষ্ট মনে আছে এই জন্যে যে, দুজনের কাউকেই আমি হারতে দিতে রাজি ছিলুম না। কেউ একজন হারলেই আমি সাংঘাতিক দুঃখু পেতুম। কারণ, দুজনেই যে আমাকে ভীষণ ভালবাসে।

যাক বাবা ! ব্যানডুররিয়ার তার-ছেঁড়ার ব্যাপারটা নিয়ে বাবা আমায় কিচ্ছু বলেনি। বাবা যখন শুনল, উলটে বললে কী, "ছিঁড়ুক, ছিঁড়ুক। বাজাতে গেলে তো ছিঁড়বেই। এমনি ছিঁড়তে-ছিঁড়তে একদিন ইসতাসি ওস্তাদ হয়ে উঠবে। হবে একজন পাকা ব্যানডুররিয়া-বাজিয়ে !" এ-কথা শুনে, সেদিন যে আমার কী আনন্দ হয়েছিল, সে কী বলব তোমাদের !

২

হ্যাঁ, এখন আমি সত্যিই ব্যানডুররিয়া-বাজিয়ে হয়ে উঠেছি। তবে, এখনও ঠিক পাকা হইনি। আনাতিদাদা গোপনে-গোপনে তালিম দিয়ে, মোটামুটি অনেকটা বাজাতে শিখিয়ে দিয়েছে। প্রথম-প্রথম এত গোলমেলে লাগত ! তেমনি অসুবিধা। হবেই তো। আমি যে ছোট্ট। বাজনাটাকে বাগে আনতেই কদিন কেটে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে যখন সড়গড় হয়ে গেল, তখন সা-রে-গা-মা ছাড়িয়ে গানের বাজনাও বাজাতে শিখে গেলুম। আর সত্যিই, এমন লুকিয়ে-ছাপিয়ে শিখলুম যে, কেউ ঘুণাক্ষরে জানতেও পারল না। এমন-কী, বাবা, মা কেউ না। আমি বলতে পারি, আনাতিদাদা সত্যিই এক আশ্চর্য মানুষ ! নইলে, আমার মতো এক আনাড়িকে এত সহজে এমন সুন্দর ব্যানডুররিয়া বাজাতে শিখিয়ে দিতে পারে ! নিজের কথা ভেবে, আমার নিজেরই কেমন অবাক লাগে !

কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য কথা, আমার এই ব্যানডুররিয়া শেখা নিয়ে আনাতিদাদার মনের ভেতর যে-মতলবটা লুকিয়ে ছিল, সেইটা। সে-মতলবটা কিন্তু কাকপক্ষীও টের পেল না। এমন-কী, আমিও না। তোমাদের তো আগেই বলেছি, যাযাবর বলে এক জায়গায় বেশি দিন থাকি না। এক দেশ থেকে আর-এক দেশ এরই মধ্যে কতবার হয়ে গেল। আর এই দেশে-দেশে ঘুরে-ঘুরে আমারও গোপনে-গোপনে বাজনা-শেখা চলল। আনাতিদাদা আদা-জল খেয়ে এমন করে আমায় নিয়ে পড়েছে যেন ওস্তাদ না-করে কিছুতেই ছাড়বে না।

এমনি করে আমার বাজনা শেখা চলছে। আনাতিদাদা এরই মধ্যে ম্যাজিক-খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে আনছে। মায়ের গান, বাবার মজার-মজার হাতের খেলা—সবই চলছে ঠিক-ঠিক। যে-দেশেই যাই সে-দেশের সবার চোখেই আমরা যেন আশ্চর্য মানুষ। যারা এক জায়গায় থাকতে জানে না, কোনো দেশে পাকাপোক্ত ঘর বেঁধে বাস করে না, আজকের পথ কালকে কোথায় থামবে—সে নিয়ে ভাবনা করে না, তাদের তো আশ্চর্য লাগবেই !

তবু একটা কথা এই ফাঁকে না বলে পারছি না। কী জানি কেন, কেউ আমাদের বিশ্বাসও করে না। হয়তো আমাদের দেশ নেই বলে, দেশে-দেশে ঘর-বেঁধে পাকাপাকি বাস করি না বলে, সবাই কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখে আমাদের। কেউ বলে, আমরা লুঠেরা ! কেউ বলে, তস্কর ! আমাদের পেটে-পেটে শয়তানি বুদ্ধি ! আমরা মানুষ ঠকাই ! এক দেশের গোপন খবর অন্য দেশকে জানিয়ে দিই ! আমরা গুপ্তচর ! এই ভেবেই বুঝি তারা আমাদের হেনস্তাও করতে ছাড়ে না। আমরা যখন খেলা দেখাই, তারা তখন আমাদের ইট-পাটকেল ছুড়ে মারে ! পেছনে ফেউ ডাকে ! ঠাট্টা করে ! সুযোগ পেলে জিনিস-পত্তর কেড়ে নিতেও ছাড়ে না ! তবু বলি, এই নিয়েই আমরা বেঁচে আছি। এই নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। অন্যের দেশে গিয়ে, অন্যের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা তো আমাদের সাজে না ! সেটা তো ঠিক রাস্তা নয়। কেউ যদি বলে, হটো এ-দেশ থেকে, এখানে তোমরা একমুহূর্তও থাকতে পারবে না, তখন কি আর গা-জোয়ারি চলে ! তখন লোটা-কম্বল গুটিয়ে নিয়ে চলো আবার আর-এক রাজ্যে।

সে তবু ভাল। তোমার পোষাচ্ছে না, তুমি বললে, দেশ ছাড়ো ! আমরাও মানে-মানে সরে পড়লুম। কিন্তু কোনো দেশ যদি মুখে টুঁ শব্দটি না করে পেছন থেকে ছুরি মারে, তখন তাকে কী বলবে ? আর এমনিই এক ঘটনা ঘটে গেল কোনো-এক দেশে সে-দেশের রাজ-সরকারের গোপন আদেশে। সেই কথাই এখন আমি বলব।

আমি এখন ব্যানডুররিয়া বেশ ভাল বাজাতে পারি। আমি এখন আরও একটু বড় হয়েছি বলে প্রথম-প্রথম যে-অসুবিধা ছিল, এখন আর তা একদম নেই। মা গান গাইলে, আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে সেই গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে ব্যানডুররিয়ায় তুলে নিতে পারি। আমার ভাবতে মজা লাগে, আমার এই বিদ্যের বহরটা একমাত্র আনাতিদাদা ছাড়া আর কেউ জানে না। আর তাই একদিন সবাইকে হঠাৎ অবাক করে দেবার জন্যে যে-মতলবটা মনে-মনে এঁটে রেখেছিল আনাতিদাদা, সেটা আমিও একেবারে শেষমেশ জেনেছিলুম। মতলবটা আনাতিদাদার মুখে প্রথম শুনেই আমার যে কী মজা লাগল, সে তোমাদের কী বলব ! ভাবতে-ভাবতে আনন্দে গা আমার শিউরে উঠছিল ! ঘটনাটা যখন সত্যি-সত্যি ঘটবে তখন যে কী হবে, আমি ভাবতেই পারছি না।

এই মজার মতলবটা আনাতিদাদা মনে-মনে আঁটলেও, সে-দেশের রাজ-সরকার গোপনে-গোপনে যে-মতলবটা এঁটে রেখেছে, সে-খবরটা আনাতিদাদা একদম জানতেই পারেনি। তাই দলের সর্দার হিসেবে, সহজ মনেই ঘোষণা করলে, আমাদের তাঁবু-গাড়া সামনের মাঠটায় সেদিন রাত্রে এক জলসা বসবে। কিন্তু জলসায় যে কী হবে, কে গাইবে, কে নাচবে, কে বাজাবে সে-কথা কিচ্ছু বলল না।

আজকের রাতটা বেশ নরম। হালকা-নীল চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়েছে আমাদের সবুজ মাঠটার ওপর। আলোয়-আলোয় থিকথিক করছে চত্বরটা। চত্বরের মধ্যিখানে একটা মস্ত বড় ধুনুচি রাখা হয়েছে। সেই ধুনুচির আগুনের বুক থেকে গুগ্‌গুল ছড়ানো গাঢ় ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে চারিদিকে। সেই ধুনিচিটাকে ঘিরে আমাদের দলের সবাই গোল হয়ে বসেছে। আমি ছাড়া। আমি তখন ব্যানডুররিয়াটা গলায় ঝুলিয়ে লুকিয়ে আছি আনাতিদাদার তাঁবুতে। মা ওই দলের মধ্যে বসে-বসে দু-একবার আমার খোঁজে মাথা উঁচিয়ে এদিক-ওদিক চাইল বটে, কিন্তু আমায় দেখতে না পেয়ে খুব যে একটা ব্যস্ত হল, তা অবশ্য মনে হল না। মা ভাবল, নিশ্চয়ই এখানে-ওখানে কোথাও আছি আমি। আমায় কী করতে হবে সেটা আনাতিদাদা চুপি-চুপি আগেভাবেই পাখিপড়ার মতো শিখিয়ে রেখেছে। সুতরাং সেই কথাটা যতই ভাবছি, ততই আমার বুকের ভেতরটা খুশিতে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে। কিন্তু আমরা তখনও কেউ-ই জানতে পারিনি, এ-আনন্দ কিছুক্ষণের। একটা ভয়ংকর ঘটনা ওত পেতে আছে। একটু পরেই বুঝি-বা সে থাবা মারবে।

থাক সে-কথা। এখন যা হচ্ছে, তাই বলি।

আনাতিদাদা সর্দার, সে-কথা তো তোমাদের আগেই বলেছি।

নিশ্চয়ই মনে আছে। সুতরাং আনাতিদাদা ওই জলসার আসরে উঠে দাঁড়াল। তারপর হেঁকে-হেঁকে ঘোষণা করল, "এ-দেশ ছেড়ে যাবার সময় হয়েছে আমাদের। কাল ভোরের আলোয় আমাদের আবার যাত্রা শুরু হবে। এখানে আজ আমাদের শেষরাত। শেষরাতে আজ তোমাদের সকলকে চমকে দেবার মতো একটি উপহার আমি দেব। তার আগে রুশমি-বোন আমাদের গান শোনাবে।"

তোমাদের বলে রাখি, রুশমি আমার মায়ের নাম। আনাতিদাদা আমার মাকে রুশমি-বোন বলেই ডাকে। সুতরাং সর্দার আনাতিদাদার হুকুমে আমার মা গান শুরু করল। সে-গানের প্রথম দুটি লাইন আমার এত ভাল লাগে!

সুন্দর পৃথিবী আহা! তুমি সুন্দর,
তোমার বুকের নীড়ে আমাদের ঘর!

এই গানটা মায়ের গলায় যখন সুরে-সুরে ভরে যায়, আমি হলপ করে বলতে পারি, শুনলে তুমি একেবারে হতবাক হয়ে যাবে। তার ওপর এই সুরে সুর মিলিয়ে বাবার হাতের ব্যানডুররিয়া যদি বেজে ওঠে, তাহলে সে যে কী আশ্চর্য ব্যাপার হয়, সে যে না শুনেছে, তাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু আজ বাবার বাজনা বেজে উঠল না। আনাতিদাদার তাঁবুর ভেতরে এতক্ষণ আমি গলায় ব্যানডুররিয়া ঝুলিয়ে চুপটি করে বসে ছিলুম এই মুহূর্তটির জন্যে। আনাতিদাদার কথামতো, মায়ের গলায় গান শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার হাতের ব্যানডুররিয়া সেই গানের সুরে সুর মিলিয়ে বেজে উঠল। আমি বাজনা বাজাতে-বাজাতে ধীর পায়ে তাঁবুর ভেতর থেকে জলসার চত্বরে এগিয়ে এলুম। বিদ্যুৎ চমকে উঠলে আকাশে যেমন হঠাৎ আলোর ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তেমনি যেন নিমেষে সবার চোখ ঝলসে গেল আমার দিকে তাকিয়ে। তারা বিশ্বাসই করতে পারছে না, তাদের আদরের ইসতাসি তার মায়ের গাওয়া গানের সঙ্গে ব্যানডুররিয়া বাজাচ্ছে নিজের হাতে! আমার মা গাইতে-গাইতে থমকে যায়। বাবা চমকে তাকায়। আনাতিদাদার মুখে মুচকি-মুচকি হাসি। থমকে গিয়ে মা যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলল ক্ষণেকের জন্যে। হারিয়ে গেল গানও তার কণ্ঠ থেকে। আমি থামলুম না। বাজিয়েই চললুম। একটুখানি থেমে নিমেষের মধ্যেই মা যেন গান ফিরে পেল আবার। মা গেয়ে উঠল দ্বিগুণ উৎসাহে। আমি মায়ের আরও কাছে এগিয়ে গেলুম। একেবারে মুখোমুখি। তোমায় বলব কী, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে চত্বর জুড়ে আমাদের দলের যত মানুষ জমায়েত হয়েছিল, সবাই একসঙ্গে মায়ের গলায় গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠল: "সুন্দর পৃথিবী আহা! তুমি সুন্দর।" অমন যে আনাতিদাদা, যাকে কোনোদিন আমি গান গাইতে শুনিনি, সেই আনাতিদাদার গলাতেও সুর! নিমেষের মধ্যে সেই জ্যোৎস্নারাতের সবুজ চত্বরটা যেন অপরূপ এক সুরের রূপকথার মতো ঝলমলিয়ে উঠল। তুমি শুনলে বোধহয় আরও অবাক হবে, কারো-কারো পা-দুটিও যেন অস্থির খুশিতে নেচে উঠল তারা। গলায়-গলায় গান, পায়ে-পায়ে ছন্দ। সে যে কী আশ্চর্য দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না।

হয়তো এ আনন্দ চলেছিল কিছুক্ষণ। তুমি যতক্ষণ ভাবছ, হয়তো তার চেয়েও কম সময়। আনন্দের জোয়ার যখন ঢেউ তুলে ফুলে-ফুলে উঠছিল, ঠিক তখনই সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটে গেল। অদৃশ্য কোন্ আড়াল থেকে আমাদের এই আনন্দবিভোর মানুষগুলোর ওপর কারা যেন আচম্বিতে গুলি ছুড়ল, গুড়ুম-গুড়ুম! অতগুলো আনন্দ-উচ্ছল মানুষ পলকে হতচকিত। কিছু বুঝতে না-বুঝতেই আবার বুক-কাঁপানো আওয়াজ, দুম-দুম! এবার বন্দুকের গুলি নয়, বোমার বিস্ফোরণ! দেখতে-দেখতে সমস্ত চত্বরটা বারুদের গন্ধে আর নিকষ-কালো অন্ধকার ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। বিপদে সন্ত্রস্ত মানুষগুলো আর্তনাদ করে উঠল, "বাঁচাও, বাঁচাও!" গানে-গানে ভরপুর সেই সবুজ চত্বর কান্না আর চিৎকারে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল! কার গায়ে আঘাত লাগল, কেউ দেখল না। কে বাঁচল, কে মরল কেউ জানল না। নিজে বাঁচার জন্যে যে যেদিকে পারল, সেই দমবন্ধ ধোঁয়ার ভেতর ঘুরপাক খেতে-খেতে ছুটতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে আমি দেখতে পেলুম, একদল পুলিশ হম্বিতম্বি করতে-করতে এদিকেই ধেয়ে আসছে। আমি কী করব, ভেবেই পাচ্ছি না। আমি তখনও বুঝতে পারিনি, আমার মা আমারই সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে-পড়ে মাটির ওপর ছটফট করছে। মায়ের বুকে গুলি লেগেছে! দেখতে পেলুম না বাবাকেও। তার যে কী হল, তাও জানি না। আমি দেখতে পেলুম, পুলিশের হাতে বন্দুকের নলগুলো এদিকে-ওদিক ছটফট করতে-করতে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। আমার বুকের মধ্যে সাহসের আগুনটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। আমি ভাবলুম, ওরা যদি গুলি ছোড়ার আগে আমার আর একটু কাছে আসে, তবে ওই যে ধুনুচির আগুনটা এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে, ওই

আগুন ছুড়ে ওদের অন্ধ করে দেব। পুলিশের দল আমার আরও কাছাকাছি এসে পড়েছে। আর দেরি নয়। আমিও তড়িৎগতিতে ধুনুচিটার দিকে এগিয়ে যাব বলে পা বাড়ালুম। ঠিক এমন সময়ে কে যেন তারস্বরে চিৎকার করে ডেকে উঠল, "ইসতাসি, ইসতাসি !"

আমি থতমত খেয়ে থমকে গেলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম, পুলিশের দল আরও কাছে এগিয়ে এসেছে ! আমি গলা শুনে বুঝতে পেরেছি, কে আমায় ডাকছে। এ ডাক আনাতিদাদার। তাকে খুঁজে পাবার জন্যে সেই অন্ধকার ধোঁয়ার মধ্যে আমার চোখ দুটো ছটফট করে উঠল। তাকে দেখতে না-পেয়ে আমিও চিৎকার করে ডেকে উঠলুম, "আনাতিদাদা !"

অমনি সঙ্গে-সঙ্গে আবার বন্দুক গর্জে উঠল, গুড়ুম-গুড়ুম !

দেখলুম, আর দেরি করা ঠিক নয়। ওরা আমার বুকে আঘাত হানার আগে আমাকেই প্রতিশোধ নিতে হবে। তাই চোখের পলকে ছুট দিয়ে ওই মস্ত ধুনুচিটা এক হাতে তুলে নিলুম। ছুড়ে দিলুম ওদের গায়ে। ওদের গুলি আর ছোড়া হল না। আগুনের ফুলকি ছিটকে-ছড়িয়ে ওদের চোখে-মুখে জ্বালা ধরিয়ে দিল। দেখতে পেলুম, সেই আগুন ওদের মাথার টুপিতে জ্বলছে, পোশাক পুড়ছে। সারা দেহে আগুনের ঝলকানি। আমি ভাবলুম, এই সুযোগ ! এবার আমায় পালাতে হবে ! আমার হাতে তখনও সেই ব্যানডুররিয়াটা। এখন তার কোনো শব্দ নেই। একটু আগে এই ব্যানডুররিয়ার সুর থেকে যে আনন্দ উছলে উঠছিল, এখন সেই আনন্দ মরণ-কান্নার আর্তনাদে আছড়ে পড়ছে চারিদিকে। আমি ছুট দিলুম পালাবার জন্যে। ঠিক এই সময়ে ঝট করে কে যেন আমার জামার কলারটা খামচে ধরে টান দিল। আমি ঝটপট ঘুরে দেখার আগেই চিৎকার করে ডাক দিলুম, "আনাতিদাদা, আমাকে বাঁচাও।"

আমার চিৎকার শুনে, আমার জামাসুদ্ধ গলাটা পাকিয়ে একটা লোক কাঁপা গলায় ধমকে উঠল, "চোপরাও !"

আমি পিছন ফিরে দেখি, পুলিশের একজন হোমরা-চোমরা আমাকে মারবার জন্যে তার রিভলভারটা আমার দিকে তাক করে ধরে আছে। আমি এক্ষুনি নির্ঘাত মরব, এই কথাটা ভাবতে কতটুকুই বা সময় পেয়েছি, ঠিক সেই সময়ে আবার একটা রিভলভারের শব্দ, সাঁ-ই-ই ! আমি আতঙ্কে শিউরে উঠে পিছু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলুম, আমায় যে-পুলিশটা ধরেছিল, তার পিঠেই কে গুলি ছুড়েছে ! লোকটা আমায় ছেড়ে মাটির ওপর আর্তনাদ করে নেতিয়ে পড়ল। পড়ামাত্র আনাতিদাদা পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "ইসতাসি—"

ডাক শুনে মুখ ঘোরাতেই দেখি, আনাতিদাদা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভীষণ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে। তারই হাতে রিভলভার। ওই রিভলভারের গুলিতেই পুলিশের লোকটা ঘায়েল হয়েছে। আনাতিদাদার ডাক শুনে আমিও চিৎকার করে সাড়া দিলুম, "আনাতিদাদা !"

আনাতিদাদা আমায় আর কোনো কথা বলতে দিল না। মুহূর্তে রিভলভারটা নিজের পকেটে পুরে ফেলে আমাকে জাপটে ধরল। তারপর চকিতে আমাকে নিয়ে একটা তাঁবুর আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়ল। এমন চটজলদি সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল যে, আমি নিজেই হতচকিত হয়ে গেলুম। সেই হোমরা-চোমরা পুলিশটার পিঠে গুলি লাগার সঙ্গে-সঙ্গে আমি শুনতে পেলুম, পুলিশের এক বিরাট বাহিনী তর্জন-গর্জন করতে-করতে সেই চত্বরটা তোলপাড় করছে। আমি তখনও শুনছি গুলির আওয়াজ। অবিশ্যি ততক্ষণে চত্বরটাও প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। যে বাঁচল, সে পালাল। যে পারল না, হয় সে গুলির আঘাতে কাতরাচ্ছে, না-হয় মরেছে। আমি আনাতিদাদাকে জড়িয়ে ধরে চুপিসারে জিজ্ঞেস করলুম, "মা ? বাবা ?"

আনাতিদাদা আমার মুখটা চেপে ধরল, "না কথা নয়। আড়াল থেকে নিঃশব্দে উঁকি মারলে আনাতিদাদা। আমিও উঁকি দিলুম। পুলিশের দল আনাতিদাদাকে ধরার জন্যে আহত বাঘের মতো গর্জে-গর্জে খুঁজে বেড়াচ্ছে এধার-ওধার। আনাতিদাদা জানে, এমন অবস্থায় এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। তাই আমার হাত ধরে তক্কে-তক্কে এই তাঁবুর আড়াল থেকে, ঠিক পাশেই একটা ঝোপ ছিল, সেখানে লুকিয়ে পড়ল। এই ঝোপের আড়াল থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাঁবুর ভেতরে পুলিশ ঢুকে-ঢুকে খোঁজাখুঁজি করছে। শুনতে পাচ্ছি, তাঁবু ছেঁড়ার শব্দ। ওরা এক তাঁবু থেকে আর এক তাঁবুতে দুড়দাড়িয়ে ঢুকে পড়ে। সব তছনছ করে বেরিয়ে আসে। চিৎকার করে। আর সামনে যা পায় পায়ের বুট দিয়ে ছুড়ে-ছুড়ে লাথি মারে !

ঠিক এই মুহূর্তে আমাকে নিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল আনাতিদাদা। তারপর সেখান থেকে নিঃসাড়ে একটা মস্ত বাড়ির পাঁচিলের আড়ালে গা-ঢাকা দিলে। আমি প্রায় নিশ্বাস চেপে

নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। কী ভীষণ উৎকণ্ঠা। তারপর একফাঁকে সেই পাঁচিলের আড়াল থেকে ঢুকে পড়লুম একটা ঘুপচিমতো গলির ভেতরে। সেখান থেকে মার ছুট!

ছুটতে-ছুটতে আমার বুকের ভেতরটা চমকে উঠল। চিৎকার করে আনাতিদাদাকে জিজ্ঞেস করলুম, "আমার মা কোথায় গেল? আমার বাবা?"

আনাতিদাদা ছুটতে-ছুটতেই বললে, "এখন কোনো কথা নয়! তোকে বাঁচতে হবে!"

আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলুম, "কেন এ-কথা বলছ?"

"পুলিশ তাদের গুলি মেরেছে।"

আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। আমি ছুটতে-ছুটতে থমকে গেলুম। আমার বুকের ভেতরটা যেন থেমে গেছে। আমি কাঁদতে পারলুম না। কাঁপতে লাগলুম। আনাতিদাদা ব্যস্ত হয়ে আবার আমার হাত ধরে টান দিল। না, আমি যাব না। তখন আমার শরীর উত্তেজনায় গুমরে উঠছে। মন বলছে, যারা আমার মা আর বাবাকে গুলি মেরেছে, তাদের আমি দেখে নেব।

আনাতিদাদা আবার বলল, "ইসতাসি, তোকে বাঁচতে হবে! এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা দেখে ফেলবে!"

আমি বললুম, "দেখুক। আমি কাপুরুষের মতো পালাতে চাই না, আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। তোমার রিভলভারটা আমায় দাও।"

"কটা মাত্র গুলি আছে।"

একজনকেও তো মারতে পারব।"

একজনকে মারলে কী লাভ! প্রতিশোধ নিতে হলে আমাদের তৈরি হতে হবে।" বলে আনাতিদাদা আমার হাতটা তার হাতের মুঠি দিয়ে শক্ত করে ধরল। আশ্বাসে ভরপুর সেই হাতে হাত দিতেই আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। ডুকরে কেঁদে ফেললুম। আনাতিদাদা আমার মুখখানা তার চোখের কাছে সরিয়ে এনে বললে, "ভয় নেই, আমি আছি। চ, আমার সঙ্গে।"

আমি কথা বলতে পারলুম না। এক হাতে আমার ব্যানডুররিয়া আর-এক হাতে আনাতিদাদার শক্ত মুঠি শক্ত করে ধরে আমি ছুটলুম।

৩

অনেকক্ষণ ছুটতে-ছুটতে আর যখন পারছিলুম না, আনাতিদাদা তখন নিজেই বললে, "এবার একটু থামতে পারা যায়।"

আমরা দুজনেই হাঁপাচ্ছি। হাঁপাতে-হাঁপাতেই পিছু ফিরে এদিক-ওদিক দেখছি। না, কেউ টের পায়নি বোধ হয়। আমরা বোধ হয় পুলিশের চোখ এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে গেছি।

আমার এখন কথা বলার মতো মনের অবস্থা নয়। আমি যেন প্রায় বোবা। মা আর বাবার মুখ দুটি যতই মনে পড়ছে, আমি যেন নিজেকে ততই কেমন অসহায় মনে করছি। আনাতিদাদার সেই কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, পুলিশ তাদের গুলি মেরেছে। এ-কথা শুনলে কোন্ ছেলের না মনের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে! এই পৃথিবীতে যার মা নেই, বাবা নেই তার আর কী আছে। আমি তাই ভারী একা, এখন, এই মুহূর্তে।

আমাকে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনাতিদাদাই কথা বলল। আমি বুঝতে পারছি, আনাতিদাদা এতক্ষণ ছুটে এসে তার দুরন্ত নিশ্বাসটাকে এখনও বাগে আনতে পারেনি। কষ্ট হচ্ছে। তবু সেই কষ্ট অগ্রাহ্য করে আমাকে ডাকল, "ইসতাসি।"

হঠাৎ সেই ডাক শুনে চমকে উঠলুম।

"এটা স্টেশন।"

আমি হাত দিয়ে আমার চোখ মুছে নিলুম।

"আমাদের এইখানে খানিকক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে," আনাতিদাদা বলল, "এক্ষুনি ট্রেন আসবে।"

এতক্ষণ আমি ভাল করে দেখিনি এই জায়গাটা। ভাল করে দেখার কথাটা আমার মনেই আসেনি। আমার মনে শুধু একটা কথাই বার বার ধাক্কা দিয়ে বলে যাচ্ছে, প্রতিশোধ নিতে হবে, প্রতিশোধ!

সুতরাং আনাতিদাদা যখনই বলল, এখানে লুকিয়ে থাকতে হবে, তখনই আমি ঘুরে-ফিরে দেখবার চেষ্টা করলুম কেমন জায়গা এটা। হ্যাঁ, এটা রেলের স্টেশনই বটে। অনেক রাত হয়েছে বলে লোকজন কম। অবিশ্যি প্ল্যাটফর্মে আলো ঝলমল করছে। আমরা দুজনে লুকিয়ে-ছাপিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর জড়াজড়ি করে বসে রইলুম। এই যে ছুটে আসা, এই যে আলো-ঝলমল স্টেশন, বা পুলিশের ভয়, অথবা বন্দুকের আওয়াজ, সঙ্গে অতগুলো মানুষের আর্তনাদ, এসবের কোনোটাই এখন আমার কাছে কিছু নয়। এখন শুধু বার-বার আমার মা আর বাবার কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, মায়ের গান, বাবার ব্যানডুররিয়া বাজাতে-বাজাতে খুশিতে দুলে ওঠা, তার জাগলিং-এর খেলা দেখবার কসরত, কিম্বা তাদের গল্প বলা, তাদের মুখের শব্দগুলি আর প্রাণ-খোলা হাসি। মা হাসলে আমি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতুম। কেননা, হাসতে-হাসতে মায়ের মুখখানি এমন অদ্ভুত আর সুন্দর হয়ে ঝলসে উঠত যে, তুমি তা না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। আমার তখন সত্যিই মনে হত, ভাগ্যিস, আমার মা আমার না হয়ে অন্য কারো হয়ে যায়নি!

হঠাৎ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে টাঙানো ঘন্টাটা বেজে উঠল। এদিক-ওদিক দূরে-দূরে অনেকগুলো লাল আলো লাইনের ওপর মাথা উঁচিয়ে পিটপিট করে জ্বলে জানান দিচ্ছে, এদিকের লাইন বন্ধ। যেদিকের লাইনে গাড়ি আসছে, দেখি, সেদিকে সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। উঠে দাঁড়াল আনাতিদাদা। আমার হাতের দিকে তাকিয়ে অনেকটা চাপা গলায় বললে, "দে।" বলে আমার হাত থেকে ব্যানডুররিয়াটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে এবার বললে, "চ।"

আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আনাতিদাদার হাত ধরে এগিয়ে গেলুম প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি। দেখতে পেলুম, দূরে আলোর একটা বিন্দু ছুটতে-ছুটতে ধেয়ে আসছে। দেখছি, যতই সেই বিন্দু এগিয়ে আসছে, ততই বাড়তে-বাড়তে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সামনে, লাইনের ওপর। সেইসঙ্গে ট্রেনের ক্ষীণ শব্দটাও ধীরে-ধীরে যেন সেই আলোর সঙ্গে তীব্র হচ্ছে। ঝিক-ঝিক-ঝিক-ঝিক।

স্টেশনে ট্রেন এসে থামল। আনাতিদাদার হাত ধরে গাড়িতে উঠতে গিয়েই আমার বুকটা চমকে উঠল। মনে হল, আমি মা আর বাবাকে চিরদিনের মতো এখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছি। আমার পা থমকে গেল। আমি কাঁদতে গিয়েও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেলুম। আনাতিদাদা আমার হাতে টান দিল। আমার চমক ভাঙল। আমি ট্রেনে উঠে পড়লুম। গাড়ি ছেড়ে দিল।

আমরা দুজনে চুপচাপ বসে পড়লুম এক-কোণে। আনাতিদাদা ব্যানডুররিয়াটা আবার আমার হাতে এগিয়ে দিল। আমি সেটা গলায় ঝুলিয়ে নিলুম। আমাদের সঙ্গে আর তো কিছু নেই। এই ব্যানডুররিয়াটা, আর বোধ হয় আনাতিদাদার পকেটে সেই রিভলভারটা। বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই। কেননা, আমি দেখেছি, রিভলভারটা আনাতিদাদা পকেটেই পুরেছে। এক যদি তালেগোলে পকেট থেকে পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে অন্য কথা। তবে এটা ঠিক, হুড়োহুড়িতে আনাতিদাদার জামা-প্যান্ট-জ্যাকেট সবই কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে। আনাতিদাদার মুখখানাও এতক্ষণে ট্রেনের আলোয় ভাল করে দেখতে পেলুম। জানি না কেন, দুঃসহ ভাবনায় অথবা গভীর দুঃখে সেই মুখখানা চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। আমাকে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখেই বোধ হয়, আনাতিদাদা আমার দিকে ফিরে তাকাল। হঠাৎ আমার চোখে চোখ পড়তেই দেখি, যেন তার চোখে একফোঁটা জল চিকচিক করে উঠেছে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। চকিতে নিজের মুখখানা জানলার ফাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে ডুকরে-ডুকরে কেঁদে উঠলুম। আমার পিঠে হাত রাখল আনাতিদাদা। হাত দিয়ে পিঠটা আস্তে চাপ দিতেই, আমার কান্নার শব্দটাকে আমি কোনোরকমে সামলে নিলুম। আমি বুঝতে পেরেছি, এভাবে কেঁদে-ওঠাটা আমার ঠিক হয়নি। পাশের লোক কান্না শুনতে পেলে সন্দেহ তো করতেই পারে!

আমি না বললেও, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমার ঠিক পাশের লোকটি আমার কান্না শুনতে পেয়েছিল! সে আচমকা যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে বসল, "কী খোকা, মন কেমন করছে!" তখন আমার বুকটা ধক করে কেঁপে উঠেছিল।

আনাতিদাদা তো দারুণ চালাক। পাছে আমি কী বলতে কী বলে

ফেলি, তাই আমায় উত্তর দেবার সময় না দিয়েই নিজেই বলে উঠল, "হ্যাঁ, মা-বাবাকে ছেড়ে যাচ্ছে তো !"

"কোথায় যাচ্ছে ?"

"আমার কাছে। আমি কাকা।"

"ও।"

লোকটা চুপ করে গেলেই ভাল ছিল। তা না, লোকটা আমাকেই আবার বলল, "কাকার সঙ্গে যাচ্ছ, কাঁদতে আছে !"

আমার আর তখন কান্না ! কখন থেমে গেছে ! বোধ হয় লোকটার ভয়ে ! কারণ, ভাবছি, যদি লোকটা অন্য কিছু জিজ্ঞেস করে ! জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছি, তখন কী উত্তর দেব ?

অবশ্য সে-সব কথা সে জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু যে-কথা জিজ্ঞেস করল, তাতে অতি বড় সাহসী মানুষেরও বুকের রক্ত জল হয়ে যায় ! আমি না-হয় ছোট ছেলে ! কিন্তু আনাতিদাদার মতো শক্তসমর্থ লোকও যখন তার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল, তখন তুমি কী বলবে বলো ?

লোকটা প্রথমে চুপ করেই ছিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "দেখলুম, তোমরা এই স্টেশন থেকে উঠলে ?"

আনাতিদাদা মুখে কথা না-বলে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"আমিও এখান থেকেই উঠলুম।" লোকটাও বললে।

আমার বুকের ভেতরটা দুরদুর করে কেঁপে উঠেছে। আবার জিজ্ঞেস করল, "ওদিকের কোনো খবর জানো নাকি ?"

"কোন দিকের ?"

"সে কী ! জানো না ? এমন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল !"

"আমরা তো কিছুই জানি না !" যেন আকাশ থেকে পড়ল আনাতিদাদা।

লোকটা হাত নেড়ে বলল, "তাজ্জব ব্যাপার। তোমরা কি শহরে বাস কর না ? জানো না, একদল যাযাবরকে আজ পুলিশ ভীষণ ঠেঙিয়েছে ! গুলি করে কটাকে খতম করেও দিয়েছে।"

"তাই নাকি !"

লোকটা আবার বলল, "দেবেই তো। যা বাড়াবাড়ি করছিল ! একেবারে ডাকাত মশাই, ডাকাত। কদিন ধরে শহরের মানুষকে তিষ্টুতে দিচ্ছিল না। মেরেছে, বেশ করেছে ! গভর্মেন্ট তো হুকুমই দিয়েছে, যাযাবর দ্যাখো আর খতম করো। অনেকগুলো ধরা পড়েছে। কটা পালিয়ে গেছে। শুনছি নাকি এই ট্রেনেও কটা লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের খুঁজে বার করার জন্যে পুলিশও এই গাড়িতে ওত পেতে আছে। ওঃ, এই এক জাত মশাই, যাযাবর ! ব্যাটাদের না আছে ধম্ম, না আছে কম্ম ! শয়তান ! শয়তান !"

আমি বলতে পারি, অন্য সময় হলে বাছাধনের ঘাড়ে ধড় থাকত না। এতক্ষণে তিনি ধরাশায়ী হতেন। কিন্তু লোকটার মুখে এইসব আজেবাজে বদনাম শুনেও আনাতিদাদা বেমালুম হজম করে গেল। বোধ হয়, এই গাড়িতে পুলিশ যাযাবরদের ধরবার জন্যে ওত পেতে আছে, এই কথাটা শুনেই তার মাথা ঘুরে গেল ! আনাতিদাদা এমনই ঘাবড়ে গেল যে, প্রায় চমকে দাঁড়িয়ে উঠে চক্ষের নিমেষে চলন্ত ট্রেনের চেন ধরে টান মারলে ! মেরেই, আমায় টানতে-টানতে পালাবার জন্যে দরজার দিকে ধেয়ে গেল। মানুষ বিপদে পড়লে বোধ হয় এমনি করে তার বুদ্ধিটাও লোপ পেয়ে যায় ! তা নইলে আনাতিদাদার মতো বুদ্ধিমান মানুষ হুট করে এমন একটা কাঁচা কাজ করে বসবে ! এ-কথা ভাবাই যায় না ! সঙ্গে-সঙ্গে একগাড়ি লোক হা-হা করে উঠেছে। আমাদের অমন করে পালাতে দেখে প্রথমটা তারা থতমত খেয়ে গেলেও, পরেই তারা "ডাকাত, ডাকাত" বলে চিৎকার করে আমাদের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চেনের টানে ট্রেন তো এখন একেবারে স্টপ ! আমরা ধস্তাধস্তি করতে-করতে ট্রেন থেকে লাফ দেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না ! ট্রেনের কামরায় শুরু হয়ে গেল ভীষণ হৈ-হুল্লোড় ! আমি বোধ হয় আমার গলায় ঝোলানো এই ব্যানডুরিরিয়াটা আর রক্ষা করতে পারলুম না ! এক্ষুনি চুরমার হয়ে গেল বলে !

হঠাৎ শুনি, সত্যিই চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দ ! চুরমারের শব্দটা ব্যানডুরিরিয়ার নয় ! পকেটে যে রিভলভারটা ছিল, সেইটা বার করে গুলি ছুড়েছে আনাতিদাদা ! একটা লোকের গা ছুঁয়ে সেই গুলি ছিটকে লেগেছে ট্রেনের আলোর গায়ে। আলো নিবল। ঝনঝন করে আলোর কাঁচ ভেঙে পড়ল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেল সারাটা কামরা। সেই অন্ধকারে এক-কামরা মানুষ আতঙ্কে চিৎকার করে মড়াকান্না শুরু করে দিল ! দেখতে-দেখতে পুলিশও হাজির। তাদের হাতের টর্চ ঝলসে উঠেছে ! দৌড়ে এসে তারা কামরাটার মধ্যে ঢুকে পড়তেই আনাতিদাদা আমাকে নিয়ে মেরেছে লাফ ! লাফ মেরেই চোঁ-চা দৌড়, একেবারে সামনের দিকে। কামরা-ভর্তি অত লোকের মধ্যে একজনও যে আমাদের দেখতে পাবে না, এ তো হতে পারে না। সুতরাং যার নজর গেল, সে-ও অমনি সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ওই পালাচ্ছে, ওই পালাচ্ছে !"

আকাশে তখনও জ্যোৎস্না। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রেল-লাইনের ধারটা। যেখানে আমরা লাফিয়ে পড়েছি, সেখানে এবড়ো-খেবড়ো পাথর ছড়ানো। উর্ধ্বশ্বাসে'দৌড়-মারা খুব শক্ত। তবু সেই পাথরের ওপর দিয়েই ছুটতে-ছুটতে আমরা রেল-লাইনের ঠিক ধারেই একটু নিচুমতো জলা জায়গায় ঝটপট নেমে পড়লুম। নামতে না নামতে পুলিশের বন্দুক থেকে ক'রাউণ্ড গুলি গুড়ুম-গুড়ুম করে বুক কাঁপিয়ে আমাদের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ভাগ্য বলতে হবে ! ওই নিচু জায়গাটায় নামতে যদি আর এক মুহূর্ত দেরি হত, তবে আমাদের মরণের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারত না।

আনাতিদাদা কথা না বলে হাঁটু ভেঙে, গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল। আমাকে ইশারায় অনুসরণ করতে বলল। আমিও এগিয়ে চলি আনাতিদাদার পাশে-পাশে।

শুনতে পাচ্ছি, পুলিশ এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসছে ট্রেনের যাত্রীরা। আমি জানি, আর রেহাই নেই। এবার নিশ্চিত ধরা পড়ব। ঠিক তক্ষুনি জলাটার ধার ঘেঁষে বেশ একটা ঘন ঝোপঝাড়ের জঙ্গল যেন নজরে পড়ল আমাদের। মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে, কটা বড় বড় গাছ। আনাতিদাদা আর কিছু না পেয়ে আমাকে হ্যাঁচকা মেরে ওই ঝোপের মধ্যেই ধাঁ করে ঢুকে পড়ল। পুলিশের দল তো প্রায় এসেই পড়েছে। যতই জ্যোৎস্না ঝিলিক মারুক, চাঁদ তো আর সূর্যের মতো চারিদিকে স্পষ্ট আলোয় ভরিয়ে দিতে পারে না। রাত সে রাতই ! সুতরাং বলতে পারি, ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ার ফলে আমরা অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও পুলিশের হাত থেকে বাঁচলুম ! কেননা, এই ঝোপের মধ্যে, এই জ্যোৎস্না রাতে সবকিছু ঠিক ঠিক ঠাওর করা খুবই মুশকিল।

কিন্তু মুশকিল সে তো তোমার-আমার কাছে। পুলিশের কাছে মুশকিল-টুশকিল বলে কোনো কথা নেই। তার ওপর তাদের হাতে বড় বড় টর্চ। ঝোপের মধ্যে তাদের টর্চের আলো ঝলসে উঠতেই, আমি জানি, নির্ঘাত ধরা পড়ে গেছি ! এই বুঝি টর্চের আলো আমাদের গায়ের ওপর ঠিকরে পড়ল !

প্রথমে আমি ভেবেছিলুম, ঝোপটা তেমন কিছু নয়। বুঝি একটুখানি। ওই সাংঘাতিক উত্তেজনায় আর উৎকণ্ঠায় সব কেমন গোলমাল হয়ে গেছল আমার। তারও ওপর জ্যোৎস্নারাতের কুহেলি আলো ! সুতরাং ঝোপের চেহারাটা বুঝে ওঠা, আমি কেন, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। শুনলে বোধ হয় অবাক হয়ে যাবে, এটা আদপে ঝোপই নয়। যেটাকে এতক্ষণ ঝোপ বলে ভ্রম হচ্ছিল, আসলে সেটা একটা মস্ত ঘন জঙ্গলের শুরু ! এ-কথাটা আনাতিদাদাই বা জানবে কী করে ! কিন্তু পুলিশের টর্চ জ্বলে উঠতেই ব্যাপারটা বোঝা গেল। অন্য সময় হলে এই রাত-দুপুরে কে আর শখ করে এই জঙ্গলে ঢুকতে সাহস করে ! পুলিশও হয়তো সাহস করল না। কেননা, তাদের পায়ের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, জঙ্গলের বাইরে থেকেই তারা ঝোপঝাড় সরিয়ে মুড়িয়ে আমাদের খোঁজাখুঁজি করছে। আমি একেবারে স্পীকটি নট ! আনাতিদাদার গা ঘেঁষে সিঁটিয়ে রইলুম ! কিন্তু বিপদ যখন আসে, সে তো একা আসে না। হল কী, বোধ হয় একটা বড়-সড় গিরগিটি টপাস করে আমার পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়ল ! আমি তো আঁতকে উঠেছি। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে সেটাকে যেই সরিয়ে দিতে গেছি অমনি বেমক্কা হাতটা গিয়ে পড়ল আমার গলায় ঝোলানো ব্যানডুরিরিয়াটার তারে ! আচমকা ঝন করে সেটা বেজে উঠতেই পুলিশের দল ও তার
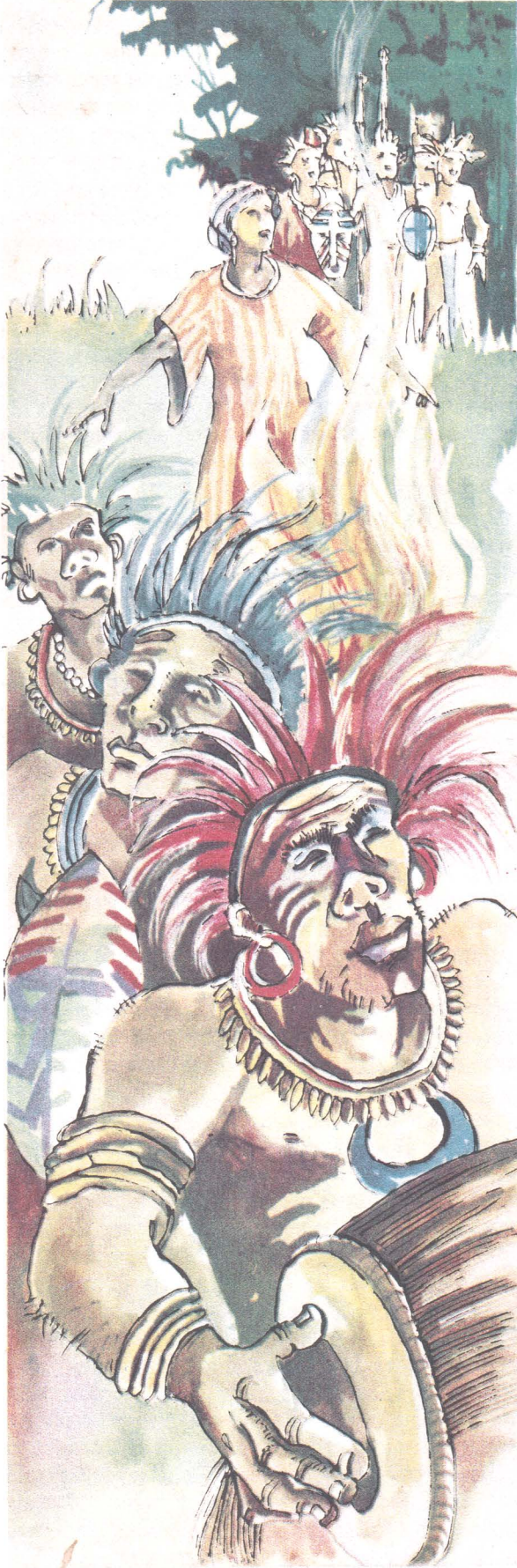
সঙ্গে জনতা চিৎকার করে উঠেছে, "ওইখানে, ওইখানে !"

আমরা এবার ধরা পড়লুম বলে ! ছিঃ ! ছিঃ ! আমার অসাবধানে এ কী বিপদ ঘটে গেল ! আনাতিদাদা সেই বিপদের কথা বুঝতে পেরেই, ঝট করে আমার জামাটা খামচে ধরে মারলে এক টান ! তারপর সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছুট !

ছুট বললেই তো আর জঙ্গলের মধ্যে ছোটা যায় না ! চারিদিকে ছোট-বড় নানান গাছ। কাঁটা-ঝোপ, ডালপালা ! গায়ে লাগছে, পায়ে ফুটছে। হয়তো রক্ত পড়ছে। কিন্তু সে-সব এখন কিছু নয় ! কারণ, আমাদের ধরবার জন্যে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে পুলিশদলও তেড়ে আসছে ! তারা আমাদের সোজাসুজি দেখতে না পেলেও, আমাদের ছোটার সঙ্গে-সঙ্গে গাছে-গাছে, ঝোপে-ঝাড়ে গায়ের ধাক্কা যতই লাগছে, ততই শব্দ হচ্ছে আর ঝোপঝাড়গুলো নড়ে উঠছে। আমরা কোন দিকে পালাচ্ছি, হদিস করে ফেলতে তাদের এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না। সুতরাং তারা চোখ-কান বুজে সেইদিকেই বন্দুক ছুড়ল গুড়ুম-ম্-ম্ ! আমার লাগেনি। আনাতিদাদার লাগল কি না বলতে পারছি না। কিন্তু আনাতিদাদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাতটা চেপে ধরল। তারপর সেই ঘুপচি জঙ্গলের মধ্যে ঝুপ করে বসে পড়ল। আমিও বসে পড়েছি। একদম নিশ্বাস চেপে, নিঃসাড়ে শুনতে লাগলুম গাছপালা টপকে ওরা এদিকেই আসছে ! ওরা বোধহয় ভেবেই নিয়েছে গুলি খেয়ে আমরা ঘায়েল হয়েছি।

ওরা যখন আমাদের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, আমাদের প্রায় ধরে-ধরে, তখনও আনাতিদাদাকে চুপটি করে বসে থাকতে দেখে, আমি ধরেই নিয়েছিলুম, আনাতিদাদার গায়ে গুলি লেগেছে ! কিন্তু তা তো নয় ! কেননা, এবার হামাগুড়ি দিয়ে আনাতিদাদা আমাকে নিয়ে আরও একটু নিরাপদ জায়গায় যাবার জন্যে খুব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলল। বুকে ভর দিয়ে চলতে হচ্ছে বলে, আমার গলায় ঝোলানো ব্যানডুররিয়াটা হাতে নিয়েছি। কী যে অসুবিধা হচ্ছে, তোমাদের বোঝাতে পারব না ! বুকের ছাল-চামড়া ছিঁড়ছে ! ওরা যেদিকটা লক্ষ করে এগোচ্ছে, আনাতিদাদা একটু পাশ কাটিয়ে ঠিক তার উলটো দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের চোখে প্রায় ধুলো দিয়ে আনাতিদাদা এমন একটা জায়গায় এসে লুকিয়ে পড়ল যে, আমার মনে হল, হয়তো বা এ-যাত্রা ওদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেলুম। আমার মনে হলে কী হবে ! ওরা তো ছাড়বার পাত্র নয় ! আমাদের খুঁজে না-পেয়ে, সেই পুলিশের দল একেবারে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু করে দিলে। সেই জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল। ওরা যেদিকে টর্চের আলো ফেলছে, ঠিক তার উলটো দিকে অন্ধকারটা মনে হচ্ছে, আরও গাঢ়। সুতরাং এই গাঢ় অন্ধকারে আমাদের আরও বেশ খানিকটা দূরে সরে আসতে সুবিধাই হল। ওরা ওদিকে চেঁচামেচি করে তল্লাশি চালাচ্ছে, এদিকে আমরাও নিঃশব্দে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে পড়ছি। তারপর যখন মনে হল, ওদের নাগালের বাইরেই চলে এসেছি, আনাতিদাদা তখন দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে প্রায় ছোঁ মেরে টেনে নিল তার কাছে। তারপর ওই অসংখ্য গাছ-গাছালি আর ভয়ংকর অন্ধকার পেরিয়ে, খানিকটা হেঁটে, অনেকটা ছুটে আর মাঝেমধ্যে ডিঙিয়ে লাফিয়ে পিটটান দিল ! আমি হলপ করে বলতে পারি, অন্য সময় হলে রাত-দুপুরে বনে-জঙ্গলে ঢোকা তো দূরের কথা, আনাতিদাদা আমাকে এর আশপাশে ঘুরঘুর করতেই দিত না। আজ সেই আনাতিদাদাই আমাকে নিয়ে জঙ্গলের জালে জড়িয়ে পড়ে এক ভয়াবহ বিপদের সঙ্গে লড়াই করছে ! এই বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে এই মুহূর্তে হঠাৎ কোনো হিংস্র জীব আমাদের যে আক্রমণ করতে পারে, সে কথা হয়তো এখন আনাতিদাদা ভাবতেই পারছে না। কিন্তু কপাল বলো আর যাই-ই বলো, আমরা এখনও বেঁচে আছি। পুলিশের গুলি অথবা জঙ্গলের জন্তু, কেউ-ই এখনও পর্যন্ত আমাদের মেরে ফেলতে পারেনি। যদিও পুলিশের হাত থেকে আপাতত আমরা বেঁচেছি, কিন্তু গভীর জঙ্গলের জন্তুর হাত থেকে আমরা নিস্তার পাব কি না, তা এখনই বলতে পারি না। আমরা চুরি করিনি, ডাকাতি করিনি, করিনি খুন-জখমের মতো কোনো অন্যায় কাজ, তবু সেই দেশের মানুষের চোখে, সরকারের চোখে আমরা শত্রু। আমাদের শেষ করতে ওদের বারুদের গুলি তাই গর্জে উঠেছে। আমরা যতই গান গাই, যতই বাজনা

বেজে উঠুক আমাদের হাতে, সে সুরে তোমার মনে দোলা লাগলেও, ওরা টলবে না। সুতরাং খুনি-দস্যু অথবা লুঠেরার মতো জঙ্গলের এই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমাদের ছুটে পালাতেই হবে!

৪

আচ্ছা, আমরা কি সত্যিই বেঁচে গেছি? বলতে পারি না। তবে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমাদের এখন। কারণ, যত ভয় পেয়েছি, তার চেয়ে দৌড়-ঝাঁপ করেছি অনেক বেশি। হাত দিয়ে ডালপালায় ঠেলা মারতে মারতে, অথবা পা দিয়ে কাঁটা মাড়াতে মাড়াতে আমাদের হাত-পা দুই-ই গেছে! শুনতে পাচ্ছি আনাতিদাদার নিশ্বাসের তীব্র শব্দ। হাঁপাচ্ছে! আমিও! আমাদের মুখে কোনো কথা নেই। দুজনেই বে-বাক। একটু আগে জঙ্গল জুড়ে ঝিঁঝির একটানা যে-শব্দ কানের ভেতর তোলপাড় করছিল, এখন তা-ও যেন কত অস্পষ্ট! এই প্রায় শব্দহীন অন্ধকার জঙ্গলের এইখানে এসে আমার পা-দুটো যেন আর চলতে চাইছিল না। আমি বুঝতে পারছি, আনাতিদাদারও কষ্ট হচ্ছে। তবু আনাতিদাদা হাঁটছে। আমি আর পারলুম না। একটা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরলুম। সেই গুঁড়ির গায়ে নিজের মাথাটা ঠেকিয়ে হাঁসফাঁস করতে লাগলুম। আমি বুঝতে পারলুম, আনাতিদাদাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ তুলে দেখি, আমার মতো আনাতিদাদাও আর একটা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে ধরে ছটফট করছে।

কষ্টটা একটু যখন থিতিয়ে এল, আমি আগুপিছু কিছু না ভেবেই বসে পড়লুম সেই গাছের নীচে। উঃ! দাঁড়াতে পারছিলুম না। গাছের নীচের এই অসমান জায়গাটা ঘিরে কত যে ঘুপচি-ঝোপে ভর্তি হয়ে আছে, তা কি আর স্পষ্ট-স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি! হয়তো এটা সাপখোপের আড্ডাখানা। সে-কথা আর তখন কে ভাবছে! এখন একটু স্থির হয়ে বসতে পারলেই বাঁচি। শরীরের কোন্ জায়গাটায় যে কেটেছে, কোথায় লেগেছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, সারা শরীরটাই যেন জ্বলে যাচ্ছে আমার। অসহ্য যন্ত্রণা।

আমার কাছে এগিয়ে এসেছিল আনাতিদাদা। জঙ্গলের গাঢ় অন্ধকারে কেউ কারোরই মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আনাতিদাদাও আমার পাশে বসে পড়তে মনে হল, আমারই মতো তারও কষ্ট হচ্ছে। এই নিস্তব্ধ অন্ধকারে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটা মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো মাঝে-মাঝে গর্জে উঠছে। আমি চমকে যাচ্ছি। এরই ফাঁকে অনেক কষ্টে আমিই প্রথম কথা বললুম। কাঁপা গলায় ডাক দিলুম, "আনাতিদাদা!"

"অ্যাঁ"? আনাতিদাদার গম্ভীর গলার স্বরটা এখন কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা ক্লান্ত সুরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

"রিভলভারটা?"

আনাতিদাদার হাত দুটো ভীষণ ছটফটিয়ে পকেটটা পরখ করে স্থির হয়ে গেল। "হ্যাঁ, আছে।"

আমি বললুম, "ওদের অনেক লোক। যদি জঙ্গলটা ঘিরে ফেলে?"

আনাতিদাদা বললে, "আমরা জঙ্গলের অনেক গভীরে চলে এসেছি। হয়তো খুঁজে পাবে না।"

"এর পর?"

"আজ রাতটা এখানেই কাটাতে হবে!"

"তারপর?"

"সকালে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব।"

"কোথায় যাবে?"

"জঙ্গলের বাইরে।"

"ওরা দেখে ফেললে?"

"রিভলভারটা যখন এখনও হারায়নি, তখন আশা করতে পারি ওটা কাজে লেগে যাবে।" আনাতিদাদার গলায় স্বরটা এখন ভারী দৃঢ়। বললে, "মরার আগে কটাকে খতম করতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে না। ভয় পাস না!"

আনাতিদাদার সেই গলার স্বর শুনে, আমার গলার স্বর স্তব্ধ হয়ে গেল।

আবার নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধ এই জঙ্গলে এখন আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে সকালের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমরা জানি না, এখন কত রাত্রি। জানি, আনাতিদাদার হাতে একটা ঘড়ি আছে। কিন্তু এই অন্ধকারে শত চেষ্টা করলেও সেই ঘড়ির মধ্যে সময়ের আঁকগুলো খুঁজে পাওয়া খুবই শক্ত। হঠাৎ এমনই সময়ে আনাতিদাদাই আবার কথা বলল, "ব্যানডুররিয়াটা?"

সেটা আমি হাত থেকে নামিয়ে পাশে রেখে দিয়েছিলুম। আনাতিদাদা জিজ্ঞেস করতেই আমি তাড়াতাড়ি সেটা হাত বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললুম, "এই তো!"

"যাক, বেঁচে গেছে।"

"ভেবেছিলুম ভেঙে যাবে।"

"আনাতিদাদা আমার কথা শুনে নিশ্বাসে বুকটা ভরে নিয়ে বললে, "কোনোদিনই ভাঙবে না।"

"কেন?"

"তুই যে ওটাকে বড্ড ভালবাসিস।"

আনাতিদাদার এই কথা শুনে আমি নিশ্চুপ হয়ে গেলুম। মনে পড়ে গেল আমার বাবার কথা। গলায় ঝুলিয়ে সেই ব্যানডুররিয়া বাজানোর দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। বড্ড ভালবাসত বাবা ব্যানডুররিয়াটা। আর ভালবাসত বলেই বুঝি অত মিষ্টি সুর তার হাতের আঙুল ছুঁয়ে ওই তারে বেজে উঠত।

"কী ভাবছিস, ইসতাসি?" আনাতিদাদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

আনাতিদাদার গলা শুনে আনমনা আমি থতমত খেয়ে গেছি। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম, "কিচ্ছু না।"

"চুপ করে আছিস কেন?"

"ভাবছি, সব দোষ আমার!"

"কিসের দোষ?"

"তখন আমার হাতটা আচমকা লেগে গেল বলেই তো ব্যানডুররিয়ার তারটা বেজে উঠল, আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঝোপের মধ্যে পুলিশও আমাদের হদিস পেয়ে গেল। তা নইলে পুলিশ হয়তো আমাদের খুঁজেই পেত না!"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই আনাতিদাদা সামনে চেয়ে আচম্বিতে আমার মুখটা চেপে ধরলে। আমি থতমত খেয়ে গেছি। ভয়-পাওয়া চোখদুটো আমার অন্ধকারে স্থির হয়ে গেল! যদিও আনাতিদাদা হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরে আছে, বুঝতে পারলুম, তার চোখ দুটো অন্যদিকে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে সামনে। আমিও তাকালুম সেইদিকে। আনাতিদাদা গলার স্বরটাকে একেবারে না শোনার মতো চেপে বললে, "দেখতে পাচ্ছিস?"

দেখতে পাওয়ার মতো তেমন কিছু তখনও দেখতে না পেয়ে আমিও আরও চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলুম, "কী?"

"দুটো চোখ!"

আমার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। স্বাভাবিক কারণেই সেই চোখদুটো দেখার জন্যে আমার চোখদুটোও ছটফটিয়ে ঝলসে উঠল। কিন্তু অন্ধকার ঘুটঘুটে বনে কোথায় যে সেই চোখ, আমি আঁতিপাতি করেও তা দেখতে পেলুম না। তাই আবার জিজ্ঞেস করলুম, "কই!"

জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, আনাতিদাদার চোখদুটো এতক্ষণ যে-দিকে স্থির হয়েছিল, সেদিকের ঝোপটা মড়মড় করে কেঁপে উঠেছে! মনে হল, দুরন্ত গতিতে কে যেন অন্যকোথাও লুকিয়ে পড়ল। আমি আঁতকে আনাতিদাদাকে জড়িয়ে ধরলুম। আনাতিদাদা চোখের পলকে রিভলভারটা পকেট থেকে বার করে ফেলল। আমরা দুজনেই ধড়ফড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। বুঝতেই পারছ, আমরা দুজনেই তখন বোবা হয়ে গেছি। উত্তেজনায় দুজনেই হাঁপাচ্ছি। আমাদের নিশ্বাসের শব্দগুলোকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। পারছি না। আমি ভেবেই নিয়েছিলুম, এ বোধ হয় পুলিশ! কারণ সেই মুহূর্তে পুলিশ ছাড়া আমার মাথায় আর কি ঠাঁই পাবে! সুতরাং আমি তখনই মনে মনে তৈরি হয়ে গেছি, এক্ষুনি মরব আমরা। এই বোধ হয় পুলিশের গুলি এসে লাগল আমাদের বুকে।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই অবস্থায় সেইখানে অনেকক্ষণ জবুথবুর মতো দাঁড়িয়ে থেকেও পুলিশের গুলির আওয়াজ অথবা অন্য কোনো শব্দ আমরা শুনতে পেলুম না। এমন-কী আর কিছু নজরেও পড়ল না।

তখনই আবার ভয়-জড়ানো গলায় আনাতিদাদাকে জিজ্ঞেস করলুম, "পুলিশ ?"

আনাতিদাদা হাতের রিভলভারটা তেমনি হাতে উঁচিয়ে বললে, "বোধ হয় না।"

আমি বললুম, "তবে ?"

"বুঝতে পারছি না।"

পুলিশ নয়, এই কথাটা শুনে আমার আরও গোলমাল হয়ে গেল সব কিছু। পুলিশ না হলে আর কী হতে পারে ? এমন ঘন জঙ্গলে, এই গভীর রাতে আর কে আমাদের লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখবে ? আমি ভেবে কূল পাচ্ছি না। এমন সময় আনাতিদাদা হঠাৎ আমার হাতটা আবার ধরল। একটু দূরে সরিয়ে আনল। অবশ্য আনাতিদাদা তার চোখের দৃষ্টিটা সেই ঝোপের দিকেই স্থির রেখে দিল। তারপর তড়িৎগতিতে আর একটা মস্ত গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। সেখান থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পরে যখন মনে হল, তেমন কিছু নয়, তখন আমার নিশ্বাসের শব্দটাও প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু তবু আনাতিদাদাকে নিশ্চিন্ত হতে দেখলুম না। তার হাবেভাবে মনে হল না, এই গাছটার আড়াল থেকে আনাতিদাদা এখনই বেরিয়ে পড়বে। সুতরাং মনে মনে ভেবে নিলুম, তাহলে বোধ হয় বিপদ এখনও কাটেনি। কাজেই আনাতিদাদার গা ঘেঁষে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম।

এমন সময় হঠাৎই আমার মনে হল, আমার পিঠের ওপর যেন একটা গরম বাতাস ধাক্কা মারছে ! আমি বুঝতে পারলুম, এ কারো নিশ্বাসের ধাক্কা ! নিশ্চয়ই আমার পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে ! ঝট করে পিছন ফিরে তাকাতেই আমি ভয়ে নিথর পাথর ! আমার পেছনে তখন কোনো পুলিশ না, কোনো মানুষ না। একটা অচেনা জন্তু ! জন্তুটা তার মাথাটাকে আমার পিঠে টিপ করে দাঁড়িয়ে আছে ! মনে হল, এই বুঝি ঢুঁ মেরে আমার পিলে ফাটিয়ে দেয় ! বুঝতেই পারছ, আমি নেহাতই ছোট। সুতরাং আমার পক্ষে সেই ভয়ংকর চেহারার জন্তুটাকে দেখে, সেই সময় চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকা কি সম্ভব ? আমি চিৎকার করে উঠলুম, "আনাতিদাদা—"

আচমকা আমার এমন চিৎকার শুনে আনাতিদাদাও বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ! সেই জন্তুটার দিকে নজর পড়তেই আঁতকে চিৎকার করে উঠল, "ইসতাসি, বাইসন !" বলেই আমার হাতটা ধরে মারলে লাফ ! তারপর দৌড় !

আমি বুঝতে পারলুম, এ-দৌড় আমাদের বাঁচার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা ! কেননা, এখানে সহজে দৌড় দেওয়া যায় না, সে-কথা তোমাদের আগেই বলেছি। আর দৌড়তে পারলেও, জঙ্গলের জন্তুর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া আমাদের কম্ম নয়। সুতরাং আনাতিদাদা আমার হাত ধরে এর ফাঁকে ওর ফাঁকে ঘুরপাক খাচ্ছে বটে কিন্তু জন্তুটাও তাড়া লাগিয়ে আমাদের প্রায় কাবু করে ফেলেছে ! আমরা দুজনেই এমন ভয় পেয়ে গেছলুম যে সেই সময়ে রিভলভারটা ছুড়লে যে বাঁচি সেকথা কারোরই মনে পড়ল না ! একবার যদি মনে পড়ত, তবে প্রাণ বাঁচাতে এত ছোটাছুটি দরকারই হত না ! তাছাড়া জন্তুটার জঙ্গলের ঘোঁতঘাঁত সবই জানা ! আমরা তার সঙ্গে পারব কেন ! চরকি খেতে-খেতে আমাদের যতই দম ছুটে যায়, বাইসনটার ততই যেন তেজ বাড়ে ! শেষমেশ আমারই পিঠের ওপর সেই বিকট চেহারার বাইসনটা টেনে মারলে এক গোঁত্তা ! আমি আর কিছু জানি না। শুধু এইটুকু মনে আছে, বাইসনের মাথার সেই প্রচণ্ড গোঁত্তা যখন আমার পিঠে এসে পড়ল, মনে হল, যেন খুব উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর থেকে একটা পাথরের চাঁই আমার ঘাড়ে পড়েছে ! আমি গুঁড়িয়ে গেছি ! আমার টুকরো-টুকরো হাড়গোড়গুলো সাত হাত দূরে-দূরে ছিটকে ছড়িয়ে গেছে। তারপরেই আমার চোখে সব অন্ধকার !

৫

ধীরে-ধীরে আমার চোখের অন্ধকার যখন কেটে গেল, তখন রাতের অন্ধকারও চলে গেছে। আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে। কিন্তু কেমন যেন একটা আচ্ছন্নভাব। আমি কিছুই ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলুম না। সবই কেমন যেন অস্পষ্ট ! সুতরাং আমি বুঝতে পারলুম না, এখন আমি কোথায় শুয়ে আছি !

একটু পরেই আমার চোখের ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতে গেছি। পারিনি। উঠতে গিয়ে পিঠের ওপর এমন একটা প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলুম যে, ওঠা তো দূরের কথা, মনে হল আমার পিঠের শিরদাঁড়াটা বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে ! অন্য সময় হলে নিশ্চয়ই ওই ব্যথার চোটে ককিয়ে উঠতুম। কিন্তু এখন এই অসহ্য যন্ত্রণাতেও আমার মুখ ফুটে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত বেরুল না। আসলে এই মুহূর্তে আমার মুখ দিয়ে কথা না ফোটারই কথা ! কারণ আমার জ্ঞান ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টি শব্দ যেন আমার কানে ভেসে এল। মনে হল, বুঝি বা আমার ব্যানডুররিয়ার তারে-তারে কার যেন আলতো হাতের ছোঁয়া লাগছে ! তারগুলো টুংটাং করে বেজে উঠছে। তুমি হয়তো ভাবতে পারো, আমি এখনও সেই জঙ্গলেই পড়ে আছি, আর আনাতিদাদা আমার পাশে বসে বসে ব্যানডুররিয়ার তারে টান দিচ্ছে ! এ তো আনাতিদাদা হতেই পারে না ! আনাতিদাদার হাতে অমন সুরে ব্যানডুররিয়া কখনই বাজতে পারে না। সুতরাং চোখদুটোকে আরও একটু ভাল করে মেলে ধরলুম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, এ জঙ্গলের ঝোপঝাড় নয়, আমি একটা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি। সেই ঘরে আমার সামনে একটা ছোট্ট মেয়ে বসে আছে। দেখে মনে হচ্ছে, সে আমার চেয়েও ছোট্ট। তারই হাতে আমার ব্যানডুররিয়া। আমি চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে দেখতেই, তার বাজনা থামল। সে হাসল। ঠোঁটের হাসির সঙ্গে তার অবাক চোখের চাউনিটি আমার চোখ এড়াল না। সে বাজনা রেখে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমি তাকে এখন আরও কাছ থেকে দেখলুম। অবাক হয়ে গেছি। কারণ পরনের এ-রকম পোশাক, এ-রকম সাজ এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। সে পরেছিল, কোমর থেকে হাঁটু অবধি লম্বা একটা ফুল-আঁকা গোল ঘাঘরা। দু হাতের নীচ দিয়ে টান-টান করে এমন একফালি রঙিন কাপড় গায়ের ওপর জড়িয়ে রেখেছে যে, দেখলেই তোমার মনে হবে পাখির ডানা। তার সেই গোল ঘাঘরাটার কোমর ঘিরে পাখির পালক সাজানো, মাথায় তার নানান রঙের বুনো ফুল। গায়ের রঙটা তার তামাটে বলে, হাসতে হাসতে তার দাঁতগুলি যখনই হঠাৎ-হঠাৎ ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, একঝলক জলের ফেনা ঝকঝক করে উঠছে ! সে আমার গায়ে হাত রাখল। তারপর সেই হাতটি আমার কপাল ছুঁয়ে মাথায় উঠে এল। আমি তাকে দেখে অথবা তার আদর-মাখা হাতের স্পর্শ পেয়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। সুতরাং এবার আমি আগের মতো ধড়ফড়িয়ে ওঠবার চেষ্টা না করে, খুব সাবধানে হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথা তোলবার চেষ্টা করলুম। মেয়েটি আমায় উঠতে দেখে এমন ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল যে, সেই চিৎকারে হয়তো-বা মেয়েটির মা-ই হবে, বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল আমার কাছে। আমায় উঠতে দিল না। আবার শুইয়ে দিল। তারপর মুখে কী-সব অদ্ভুত শব্দ করে কী যে বলল, তার ঠিক-ঠিক মানে আমি খুঁজে পেলুম না। তবে হাবেভাবে বুঝতে পারলুম, আমায় উঠতে বারণ করছে। সুতরাং আমি হতভম্বের মতো আবার শুয়ে পড়লুম, আর অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, কে এরা ? এই ছোট্ট মেয়েটি আমায় শুতে দেখে আবার খুব নিশ্চিন্তে হেসে ফেলল, আর এই ছোট্ট মেয়েটির মা চোখের পলকে কোথায় যে চলে গেল। অবশ্য বেশিক্ষণ না। নিমেষে একটা পাত্র করে কিছু নিয়ে এল। আমায় অত্যন্ত সাবধানে নিজের কোলের কাছে টেনে নিল। সেই পাত্রটা আমার মুখের কাছে ধরে আদর করে কিছু বলল। আমি বুঝতে পারলুম, পাত্রের মধ্যে যা আছে, সেটা আমায় খেতে বলছে। আমি তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। আমি এদের কাউকে চিনি না। কেমন করে এখানে এলুম জানি না। সুতরাং ওই পাত্রে মুখ ঠেকিয়ে ওই খাবারটা খেতেও আমার মন সরল না। আমি মুখ সরিয়ে নিলুম। কিন্তু আশ্চর্য ! আমি অবাধ্য হলে আমার মা যেমন একটুখানি গলার স্বর তুলে ছোট্ট করে বকে দিত, ওই মেয়েটির মা-ও আমাকে ঠিক তেমনি করে বকল ! তারপর সে হয়তো বলল, না খেলে কষ্ট হবে। আমার মুখখানা তার কোলের কাছে আর একটু টেনে নিয়ে আমার মুখে সেই পাত্রের খাবার ধীরে-ধীরে ঢেলে দিল। আমি খেয়ে

ফেললুম। কিন্তু কী খেলুম, বুঝতে পারলুম না। কেননা, এটা যে দুধ নয়, তা বুঝতে আমার দেরি হল না। আমি সেটা খেয়ে নিতেই সে আমার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে এমন স্বস্তির সঙ্গে নিশ্বাস ফেলল যে, তাই দেখে তার মেয়ের মুখখানিও খুশিতে উছলে উঠল। খুশি হয়ে তার মা আমার কপালে চুমু খেল। তাকে চুমু খেতে দেখে, মেয়েটিও আমার কপালে তার হাতটি রেখে, হাতের আঙুলগুলি আমার মাথায় নামিয়ে আনল। তারপর চুলের মধ্যে বিলি কাটতে-কাটতে কত কথা যে বলতে লাগল তার একটা অক্ষরও বোঝে কার সাধ্য! আসলে এখন আমি বুঝতে পারছি, আমি যেখানে এসেছি তাদের ভাষা আমার ভাষা নয়। সুতরাং তাদের কথার মানে বোঝার কথাই উঠতে পারে না।

এখন আমি শুয়ে-শুয়ে বেশ দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা ঘর। ওপরে গাছের পাতা বিছিয়ে ছাত হয়েছে। চারপাশে গাছের ডাল গেঁথে দেওয়াল হয়েছে। আমি শুয়ে আছি ঘরের ভেতর একটা গাছের ছালের বিছানায়। এতদিন তাঁবুতে শুয়ে-শুয়ে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, এই গাছের পাতা-ছাওয়া ঘরে শুতে আমার অস্বস্তি লাগারই কথা। কিন্তু আপাতত আমার তেমন কিছু হচ্ছে না। ঘরের মধ্যে দু'দিকে দুটো বড় জানলা। সেখান দিয়ে সকালের সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে যতটা ছড়িয়ে পড়ছে, তার চেয়েও বেশি ছড়িয়ে পড়ছে সূর্যের আলোর সঙ্গে গাছের ছায়া। হ্যাঁ, ওই জানলার দিকে চোখ রেখে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, খালি গাছ আর গাছ। সুতরাং আমি বুঝতে পারলুম, এ বোধহয় সেই জঙ্গলের মধ্যেই কোনো-এক জঙ্গলের মানুষের ঘর। আমি শুনেছি, এখনও এমন অনেক মানুষ আছে, যারা গভীর জঙ্গলে বাস করে। শহরের আলো-বাতাসের খবর তাদের জানা নেই। অন্তত এদের দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে। ছোট্ট মেয়েটির পোশাক, তার সাজগোজ, তার মায়ের পোশাক, নাকে একটা এত বড় পাথরের নাকচাবি, হাতে পোড়া-মাটির চুড়ি, পায়ে পাতাবাহারের মল, এমন-কী মাথায় চুলের বেণী দেখলেই এ-কথাটা তোমাদেরও বিশ্বাস হবে। এদের দেখে, তাই, এখনই আমার যেটা মনে হল তা হচ্ছে, বাইসনের আক্রমণে আহত অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখে এরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। শুনেছি, গভীর জঙ্গলের মানুষ ভীষণ হিংস্র হয়। অনেক জঙ্গলের মানুষের পরনে কাপড়জামা কিচ্ছু থাকে না। তীর-ধনুক তৈরি করে বনের জন্তু শিকার করে তারা খায়। এমনও শুনেছি, অনেক বন্য-মানুষ তো মানুষের মাংস পেলে আর কিছু চায় না। এই কথাটা মনে হতেই আমার বুক দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল। আর ঠিক তক্ষুনি এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে আমি আঁতকে উঠেছি! তাই তো, আনাতিদাদাকে দেখছি না তো! ঘর আর কতটুকু! ঘরের মধ্যে আনাতিদাদা থাকলে এতক্ষণে আমার চোখ ঠিক দেখতে পেত। আনাতিদাদাকে দেখতে না-পেয়েই আমি আবার ধড়ফড়িয়ে উঠতে গেছি। ঠিক সেই সময়ে সেই ছোট্ট মেয়েটি গলায় সুর টেনে-টেনে মুখ দিয়ে এমন সব অদ্ভুত শব্দ বার করে চেঁচিয়ে উঠল যে, তাই শুনে আমি একেবারে হতবাক! সেই শব্দের মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে না পারলেও, সে যে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে গান গাইছে, সেটা ধরে নিতে আমার বেশি সময় লাগল না। গানের তালে তার ঢুলু-ঢুলু চোখ দেখে, মাঝে-মাঝে মুচকি-মুচকি হাসি আর থেকে-থেকে গানের ফাঁকে আঃ! আঃ! করে ধমকে ওঠার শব্দ শুনে, আমি আরও কেমন ভয় পেয়ে গেলুম। আমার মনে হল, একটা জলজ্যান্ত মানুষ হাতে পেয়ে ছোট্ট মেয়েটা পর্যন্ত খুশি! আমাকে মেরে ভোজ বসাবে বলেই হয়তো আনন্দে গাওনা শুরু করে দিয়েছে। এই কথাটা মনে হতেই আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। আমার মাথা থেকে ছোট্ট মেয়েটার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে উঠে বসলুম। পিঠে যদিও ব্যথা প্রচণ্ড, তবু প্রাণের চেয়ে এ-ব্যথা নেহাতই তুচ্ছ! আমার হাতের ঝটকা খেয়ে মেয়েটার গলার গান থেমে যেতেই আমি চিৎকার করে হেঁকে উঠলুম, "আনাতিদাদা—"

মেয়েটা হাঁদার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি আবার ডাক দিলুম, "আনাতিদাদা—"

সাড়া পেলুম না। সুতরাং দাঁড়াবার জন্যে অতি কষ্টে পায়ে ভর দিলুম। টাল খাচ্ছি। খেতে-খেতে প্রায় যখন পড়ি-পড়ি মেয়েটা আমায় দু'হাত দিয়ে জাড়য়ে ধরল। তারপর এমন চোখ-মুখ করে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যে, আমি বুঝতে পারলুম, সে আমাকে উঠতে বারণ করছে। কিন্তু এখন তার এ-সব কাকুতি-মিনতি আমার কানে ঢুকবে না। কেন না, এখন আমার মনের ভেতরটা গুমরে-গুমরে কেঁদে উঠছে, 'আনাতিদাদা, তুমি কই?'

আমি যেন চোখে সব-কিছু শূন্য দেখছি। তবে কি আনাতিদাদা আমাকে এই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে পালাল? আনাতিদাদা কি ভাবল, বাইসনের আক্রমণে আমি মরে গেছি? না কি, বাইসনটা আনাতিদাদাকেই মেরে ফেলেছে? যতই ভাবছি, আমার বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠছে। আমার এ কী বিপদ হচ্ছে একের পর এক! আমি এখন কী করব, কোথা যাব? কে বাঁচাবে আমাকে এই জঙ্গলের মানুষের হাত থেকে?

আমি দাঁড়াতে পারলুম না। নিঃশব্দে আবার বসে পড়লুম। আমি বসে পড়তেই মেয়েটাও ক-পা পিছিয়ে গেল। তারপরই আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থ হয়ে গেছি! যে-মেয়েকে এতক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল, জঙ্গলের এক ভয়ংকর হিংস্র মানুষের মেয়ে, হঠাৎ দেখি, তার চোখ দুটি জলে টলমল করছে! সে কাঁদছে! আমার অবাক হবারই কথা। কেননা, এই তো একটু আগেই সে আমার দিকে চেয়ে হাসছিল! আমার মাথায় হাত রেখে গাইছিল! হঠাৎ সে কাঁদে কেন? আমার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল! এ তো আচ্ছা ধাঁধা! মেয়েটাকে যে কিছু জিজ্ঞেস করব, তারও তো উপায় নেই! আমার কথা বুঝতেই পারবে না। তবে কী করব এখন? আমার আর কী করার আছে? যা করার মেয়ের মা-ই করবে। মা তো আছে!

না, মা ছিল না তখন। আমাকে খাইয়ে সে যে কোথায় গেছে, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। কাছেপিঠে থাকলে কি আর ছুটে আসত না? কারণ, আমি তখন ভীষণ চিৎকার করেই আনাতিদাদাকে ডাক দিয়েছি। তবে কি ঘাতককে ডাকতে গেছে! একটু পরেই বুঝি সে আসবে। এসে আমায় মেরে ফেলবে।

হ্যাঁ, এল। একজন নয়, একদল। জানি না এরা ঘাতক কিনা! তাদের সঙ্গে এল মেয়েটার মা আর বাবাও। আমার একেবারে মুখের সামনে এসে যে দাঁড়াল, সে-ই বোধহয় আমাকে হত্যা করবে। বোধহয় দলের পাণ্ডা। কেননা, তার সাজগোজ রঙচঙ দেখলে এটাই তোমার মনে হবে। লোকটা একটা ছোট্টমতো গাছের ছালের চাটাই কোমরে জড়িয়েছে। গায়ে তার নানান রকম উল্কি আঁকা। মুখে ছাই-ছাই মাটি মেখেছে। চোখ আর নাকের পাশে মোটা কালো-কালো দাগ! মাথায় লম্বা-লম্বা পাখির পালক গাঁথা টুপি। টুপিটা এত বড় যে, একেবারে ঘাড় অবধি নেমে এসেছে। হাতে গলায় নানান রকমের গয়না। কোনোটা কাঠ কেটে-কেটে সুন্দর করে বানানো। আবার কোনোটা পাথর ঘসে-ঘসে তৈরি। লোকটার হাতে একটা কাঠের নল। অনেকটা বড় তালপাতার বাঁশির মতো দেখতে। মানুষ মারার অস্ত্রের বদলে, কেন যে লোকটা অমন একটা নল হাতে করে নিয়ে এসেছে, আমি বুঝতে পারলুম না। এরই একফাঁকে আমার হঠাৎ নজর পড়ল সেই মেয়েটার দিকে। এ কী কাণ্ড! যে-মেয়ে এতক্ষণ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল, চেয়ে দ্যাখো, তার মুখে হাসি! এমন-কী, ওই যে লোকগুলো সঙ্গে এসেছে তারাও খুশিতে চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে এমন কথাবার্তা চালাচ্ছে যে, তা শুনে কানে তালা লেগে যাবার গোত্তর! কিন্তু অত চেঁচামেচি সত্ত্বেও আমার কানে যেন শব্দ ঢুকছে না। যত শব্দ যাচ্ছে তার চেয়েও বেশি ভয়ে থিরথির করছে আমার চোখ দুটো। কারণ, পাণ্ডামতো লোকটার ষণ্ডামার্কা চেহারাটা ও সেইসঙ্গে তার কিম্ভূত সাজের বহর দেখলে, তোমার মনে হবেই, লোকটা একটা আস্ত খুনি।

এইবার লোকটা এগিয়ে এল। আমার ভয়-পাওয়া চোখ দুটোর দিকে ভয়ংকর দৃষ্টি হেনে আর প্রচণ্ড চিৎকার করে আমায় কিছু জিজ্ঞেস করল। আমি যেমন বোবা, তেমনই বোবা! লোকটা আমার কোনো উত্তর না-পেয়ে, একইভাবে, একই সুরে আবার চেঁচিয়ে উঠল। বোকার মতো তার মুখের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া, এখন আমি আর কী করতে পারি! মনে হয়, আমার এই বোকা-বোকা চাউনি দেখেই সব কটা লোক একসঙ্গে বিচ্ছিরি ঠাট্টার সুরে হেসে উঠল। যেন আমি নেহাতই কুকুর-ভেড়া। সুতরাং ভেতরে-ভেতরে ভীষণ জ্বলে গেলুম।

এখন সত্যি বলছি, মরতে আমার ভয় নেই। আমি প্রস্তুত। আমি মরে গেলে কেউ কাঁদবেও না, কেউ মনেও রাখবে না। কিন্তু তাই বলে, মারার আগে আমাকে নিয়ে কেউ ঠাট্টা-তামাশা করবে, এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। আশ্চর্য, সেই ছোট্ট মেয়েটা কিন্তু হাসল না! সে সবার মুখের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি হেনে আমার মুখের দিকে এমনভাবে চাইল, বুঝতে কষ্ট হল না, সে-ও এ-হাসি সহ্য করে না। ওর মাকেও হাসতে দেখলুম। কিন্তু লক্ষ করলুম, সে-হাসিতে কেমন যেন একটা অদ্ভুত দরদ-মাখানো।

কিন্তু সে যাই হোক, হঠাৎ ওই হাসির মধ্যেই পাণ্ডামতো লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় হেঁকেড়ে উঠল। অমনি চোখের পলকে লোকগুলো আমাকে সাঁড়াশির মতো জাপটে ধরলে। আমি সঙ্গে-সঙ্গে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে প্রাণপণে যুদ্ধ লাগিয়ে দিলুম। কিন্তু পারব কেন? ওই বন্য লোকগুলোর শক্তির কাছে আমার ক্ষমতা তো নেহাতই একটা টুনটুনি পাখির মতো! সুতরাং আমি যতই ধস্তাধস্তি করি ওরা অনায়াসে আমার হাত-পাগুলো চেপ্টে ধরে আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিল। প্রায় ঝুলিয়ে-দুলিয়ে সেই ঘরটার ভেতর থেকে বাইরে টেনে আনলে। আমার আর অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে, আমাকে খতম করবে বলেই বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব এখন আমি 'বাবা গো', 'মা গো' বলে গলা ফাটিয়ে মরাকান্না কাঁদলেও এরা আমায় নিষ্কৃতি দেবে না। এখন এদের হাত থেকে ছাড়ান পাবার জন্যে আমার ধস্তাধস্তি করে আর কী লাভ! মরতে যখন হবে, চুপচাপ মরাই ভাল।

একটা অদ্ভুত ভাবনা, ঠিক এই সময়ে আমার মাথায় যে কোত্থেকে এল! মনে হল, আচ্ছা, একটু পরে মরলে আমার কী হবে? কোথায় যাবে আমার প্রাণটা? আমি কি তখন সব দেখতে পাব? দেখতে পাব এই আলো, এই আকাশ, এই বন, এই সবুজ গাছ, পাখি—সব-কিছু? শুনতে পাব বন্দুকের আওয়াজ? বোমা? পিস্তল? বা হিংস্র মানুষের চিৎকার? আমি মরে গেলে তখন কি কেউ আমাকে বলবে, যাযাবর মানেই শয়তান, শঠ, চোর অথবা ঠগবাজ? নাকি তখন মানুষ ভাববে, যাক একটা শত্রু নিপাত হল। শত্রুর মৃত্যু কি সবাইকে নিশ্চুপ করে দেয়? না তারা আরও শত্রু খুঁজে বেড়ায়? কে জানে!

হ্যাঁ, আমাকে বাইরে নিয়ে এসে একটা গাছতলার সামনে শুইয়ে দিল। কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালা হয়েছে। গনগনে আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। ছোট্ট মেয়েটার মা প্রায় ছুটে এসেই আমার মাথার গোড়ায় বসল। বসে আমার মাথাটা তার কোলের ওপর তুলে নিল। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইতে না-চাইতে দেখি, সেই ছোট্ট মেয়েটাও এসে গেছে! সে-ও ঠিক আমারই পাশে হাঁটু-গেড়ে বসল। সে আমাকে যতটা না-দেখছে, তারচেয়ে বেশি দেখছে সেই পাণ্ডামতো লোকটার দিকে। পাণ্ডা লোকটা এরই ফাঁকে আমার কাছে এগিয়ে এসেছে। দেখি, যে-লোকগুলো আমাকে চ্যাংদোলা করে এখানে নিয়ে এসেছে, তারা একটু তফাতে পিছিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে পড়েছে সার বেঁধে। আরও দেখি কি, দুটো লোক দু-দুটো মস্ত ঢাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঢাকগুলোকে ওরা বলে থুম্বা। আমার গলায় যখন খাঁড়ার কোপ বসাবে, তখন হয়তো বিকট শব্দ করে থুম্বা দুটো বেজে উঠবে ওদের হাতের তালে। তারপর এই বনের মানুষগুলো আমার রক্ত নিয়ে আনন্দে মাখামাখি করবে। কিন্তু আমায় যে কোন্ অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হবে, তা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি। এখন, এই মুহূর্তে সেইটা দেখার জন্যেই আমার চোখ দুটো ছটফটিয়ে উঠল। সেটা কি খাঁড়া, না আর কিছু? কিন্তু কোনো ধারালো অস্ত্র তো ধারে-কাছে নজরে পড়ছে না! তবে কি আমায় ওই আগুনে ঝলসিয়ে মারা হবে? মেরে আমার দেহের ঝলসানো মাংস দিয়ে তারা ভোজ বসাবে?

এমনি নানান চিন্তা যখন আমায় পেয়ে বসেছে, তখনই হঠাৎ পাণ্ডা লোকটা একটা বিকট চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে কান-ফাটানো আওয়াজ তুলে সেই থুম্বা দুটো গুড়গুড় করে বেজে উঠেছে। বাজনার তালে-তালে সামনে দাঁড়ানো লোকগুলো হাত-পা ছুড়ে বীভৎস ভঙ্গি করে নাচতে শুরু করে দিলে! আমি ভাবলুম, বন্য-মানুষেরা বুঝি শিকার ধরে ভোজ বসাবার আগে এমনি করেই আনন্দ-উৎসব করে। তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, সেই সময়ে আমার মনের অবস্থা কী হয়েছে!

দেখলুম, সেই পাণ্ডা লোকটা তার হাতের সেই ফুটো-ফোঁপরা নলটা নিয়ে এগিয়ে গেল গনগনে আগুনটার কাছে। তারপর আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে ফুটো নলটা মুখে তুলে নিলে। তুলে নিয়ে ফুঁ দিতেই সেটা একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে বেজে উঠল। সেটা বাজাতে-বাজাতেই পাণ্ডাটা আগুনের চারপাশে চরকি খেতে লাগল। থুম্বা বাজছে, লোক নাচছে, আর পাণ্ডাটা নল ফুঁকে চরকি খাচ্ছে, সে যেন এক ভয়ংকর দৃশ্য! অন্তত এখন আমার চোখে।

হঠাৎ পাণ্ডাটা করল কী, তার সেই মুখের নলটা মুখ থেকে সরিয়ে এনে চট্ করে আগুনের মধ্যে চেপে ধরলে। নলের মুখটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। সেই জ্বলন্ত আগুন নিয়ে পাণ্ডাটা আমার কাছে এগিয়ে এল। একেবারে আমার মুখের সামনে। এবার আমার শেষ! মুখের সামনে আগুন ধরে পাণ্ডাটা হাঁকতে শুরু করে দিলে। আমি বুঝতে পেরেছি, মন্ত্র পড়ছে। আমি জানি মন্ত্র পড়া শেষ হলেই ওই আগুন আমার গায়ে ধরিয়ে দেবে। আমি পুড়ে মরব। পুড়ে মরার যে কী জ্বালা আমার জানা নেই। আর জানি না বলেই বোধহয় সেই সময় আমার মনের ভেতরে একটা অদ্ভুত সাহস ভর করল। মনে হল, এক্ষুনি যখন সব শেষই হয়ে যাবে, তখন আর মিছামিছি ভয় পেয়ে কী লাভ! ইচ্ছে করলে আমি তো আর পালাতে পারব না। সুতরাং লক্ষ্মী ছেলের মতো মরণের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আমি আর কী করতে পারি! কিন্তু মৃত্যুর জন্যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমায়? এরা এখনও কেন আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে না আমার দেহে?

আশ্চর্য ব্যাপার! হঠাৎ লোকটা আমার মুখের সামনে থেকে আগুনটা সরিয়ে নিয়ে শূন্যে বাঁই-বাঁই করে ঘোরাতে লাগল। ঘোরাতে লাগল আমার চারপাশে। ঘোরাতে-ঘোরাতে থুম্বার তালে-তালে ওই লোকগুলোর সঙ্গে নিজেও নাচতে লাগল। তারপর শুরু হয়ে গেল গান। তোমায় কী বলব, যেই গান শুরু হয়েছে, দেখি, ছোট্ট মেয়েটা আর তার সঙ্গে তার মা-ও উঠে পড়েছে। তারাও গাইতে শুরু করে দিলে। এমন-কী, দু-চারবার নেচে-নেচে পা-ও তাদের ছটফটিয়ে উঠল। আমি থ। সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। আগুন জ্বলছে গনগন করে। কাঠকুটোর পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগছে। হাওয়ায় দোলা খেয়ে ধোঁয়া লাগছে চোখে। সেই আগুন আর ধোঁয়াকে থোড়াই কেয়ার করে নাচতে-নাচতে, গাইতে-গাইতে সবাই যেন উন্মাদ। আর আমি বোকার মতো চুপটি করে পড়ে-পড়ে দেখছি, আমার মৃত্যুর আগে তাণ্ডব-নৃত্য!

কিন্তু নাচ আর গান যেন শেষ হয় না। বলতে কী, সেইসময় আমার সেইভাবে শুয়ে থাকতে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এখন বোধহয় এভাবে শুয়ে থাকার আর কোনো মানে হয় না। আমি উঠেই বসলুম। বসে-বসে ফ্যালফ্যাল করে ওদের নাচ দেখতে লাগলুম। কী জানি কেন, আমার পিঠের ব্যথাটা আর তেমন করে চাগাড় দিল না! মরণ যখন সামনে হাতছানি দিচ্ছে তখন কি আর ওই ব্যথা-ট্যাথার কথা মনে থাকে! আশ্চর্য, আমি উঠে বসলুম, অথচ এবার কেউ আমায় সামাল দিতে এল না! উলটে তারা যেন দ্বিগুণ জোরে গেয়ে উঠল! বন্য নাচে মেতে উঠল!

আমি আরও কিছুক্ষণ অমনি হাঁদার মতোই বসে রইলুম। কিন্তু এমনি করেই বা মানুষ কতক্ষণ বসে থাকতে পারে! যা থাকে বরাতে, আমি উঠে দাঁড়ালুম। এবারও আমার কষ্ট হল না। কিন্তু অন্য আর একটা কাণ্ড হল। সেই ছোট্ট মেয়েটা আমার কাছে ছুটে এল। আমার হাত ধরল। আমায় টানতে-টানতে ওই নাচের দলে নিয়ে চলল। তারপরে আমাকেও নাচার জন্যে ইশারা করল। আমি হতবাক! এই একটু আগে আমি নড়তে পারছিলুম না। পড়ে ছিলুম মাটিতে। এখন উঠে দাঁড়াতে পেরেছি। এখন ইচ্ছে করলে আমি হয়তো নাচতেও পারি! এ কেমন করে সম্ভব হল! এরা কি তবে এতক্ষণ ধরে আমার ব্যথা সারাবার জন্যে এতসব কাণ্ডকারখানা করছে! তবে কি ওই পাণ্ডামতো লোকটা ডাকিনীবিদ্যে জানে! হ্যাঁ, আমি শুনেছি এই ডাকিনীবিদ্যের জোরেই মরা-মানুষের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে এই বনের মানুষেরা! আর সেই বিদ্যের জোরেই বুঝি বাইসনের গুঁতিয়ে

দেওয়া আমার পিঠের ব্যথা এই লোকটা ভাল করে দিল ! তবে কি এরা আমায় মারবে না ! এরা আমার বন্ধু !

আমার বুকের ভেতরটা দুরন্ত আনন্দে লাফিয়ে উঠল । আমার পা দুটোও ওদের পায়ের তালে নেচে উঠল । ওই বন্য-মানুষগুলোর সঙ্গে এইমুহূর্তে আমিও বন্য হয়ে গেছি ! তাই, আমি ওদের গানের ভাষা না-বুঝলেও, ওদের সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে উঠলুম । আর মনে-মনে ভাবতে লাগলুম, শহর যখন হিংস্র মানুষের গুলির শব্দে তটস্থ, তখন বনের এই মানুষগুলো নাচ আর গানের বন্যায় সেই শহরেরই একটা ছোট্ট ছেলের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে ! আশ্রয় দিয়েছে ! আশ্চর্য মানুষ এরা !

হ্যাঁ, আমায় আশ্রয় দিল এরা । অন্তত বলতে পারি, এরা যদি আমায় বনের ভেতর থেকে উদ্ধার করে না আনত, তবে ওইখানেই বাইসনের গুঁতো খেয়ে আমি পড়ে-পড়ে মরতুম । আর না-হয়তো, বনের অন্য কোনো হিংস্র জন্তু আমার রক্ত-মাংসে পেট ভরাত !

এত বিপদে পড়েও আমার ব্যানডুর্‌রিয়াটা যে বেহাল হয়ে পড়েনি, এ-কথা শুনলে তোমরাও বোধহয় আমার মতো অবাক হবে ! সত্যিই ! ব্যানডুর্‌রিয়াটা আমার অটুট আছে ! বাইসনের গুঁতো খেয়েও যে কেমন করে সেটা রক্ষা পেয়েছে, এ-কথা ভাবলেই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই ! আমার বড্ড প্রিয় ওই ব্যানডুর্‌রিয়াটা । আমি জানি, এখন ওই ব্যানডুর্‌রিয়াটা ছাড়া আমার সবই গেছে । তাই, ব্যানডুর্‌রিয়াটা যদি হারিয়ে যেত, কিম্বা ভেঙে খানখান হয়ে এই জঙ্গলের জঞ্জাল হয়ে পড়ে থাকত, তবে আমার দুঃখের কি শেষ থাকত ! হ্যাঁ, আর একজনও নিশ্চয়ই দুঃখ পেত, সে আনাতিদাদা । মানুষটা যেন ম্যাজিকের মতো কোথায় উবে গেল । আমার মা আর বাবার কথা, সে তো আমার অজানা নয় । আমারই চোখের সামনে আমার মাকে হত্যা করেছে ওই পুলিশের গুলি । সে-দৃশ্য আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলে আমার বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে । তবু নিজেকে সামলে নিতে হয় । কেননা, প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা তো আমার এখনও হয়নি । সময় যখন আসবে আগুন হয়ে ঝলসে উঠে সেই হিংসার সামনে রুখে দাঁড়াব । ওই হত্যাকারীদের আমি জিজ্ঞেস করব, বিনা কারণে নিরীহ মানুষের প্রাণ নেবার অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে ? ধিক্ তোমাদের ! বারুদের তৈরি গুলি একদিন যে তোমাদের বুকেও আঘাত করতে পারে, সে কি তোমরা জানো না ?

আপাতত আমি এই জঙ্গলেরই বাসিন্দা । গভীর জঙ্গলের মধ্যিখানে এই বন্য মানুষগুলির সঙ্গে আমি এখন যেখানে আছি, দেখলে তুমি ভয় পাবেই । মনে হবে, এই বুঝি বাঘ-ভাল্লুক লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ের ওপর ! হ্যাঁ, বাঘ তো আছেই । মাঝে-মাঝে একটু দূরে জঙ্গলের আরও গভীরে তারা যখন গর্জে ওঠে, কী-রকম দুরুদুরু করে কেঁপে ওঠে আমার বুকের ভেতরটা ! তবু নিজের ভয়টা নিজের মধ্যেই চেপে থাকি ! কারণ, আমি জানি, এখান থেকে পালিয়ে যাবার পথ আমার জানা নেই । পালাতে গিয়ে যদি জঙ্গলের মধ্যে আমি চিরদিনের মতো হারিয়ে যাই, তখন কী হবে ? তখন হয়তো বাঘের পেটেই যেতে হবে । তাহলে কি এখানে আমায় সারা জীবনই থাকতে হবে ? কে জানে !

ওই ছোট্ট মেয়েটা আমায় যে কী ভালবাসে, সে তোমরা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না । ওর কোনো ভয় নেই । ভয় নেই বাঘ-ভাল্লুক কিছুরই । কী-রকম দুঃসাহসে একা-একা জঙ্গলের মধ্যে ছুটে যায় । অবশ্য এখন আর একা-একা যেতে হয় না । এখন আমি ওর সঙ্গী । আমায় এখন সে কলকল করে যে কত কথা বলে, কে বোঝে সে-সব কথার মানে ! ও হাসে, গান গায়, আর যখনই ওর মন চায়, আমার হাত ধরে । ছুট দেয় । আমিও যে কথা বলি না, তা নয় । আমার কথা বোঝে না একবর্ণও । নইলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে কেন আমার মুখের দিকে ! ওর চোখের দৃষ্টি দুটি ভারী মিষ্টি ! ওর চোখ দুটির দিকে তাকালে আমার মুখ যেন আপনা থেকে কথা কয়ে ওঠে !

এতদিনে শুনতে-শুনতে আমি ওর নামটা জেনে ফেলেছি, ওতিয়া । একদিন যখন 'ওতিয়া' বলে ডাক দিয়েছি আমি, কী বলব তোমায়, একঝলক হাওয়ার মতো উড়ে এসে আমার গলাটি জড়িয়ে ধরল সে । তারপর অঝোরে হাসতে-হাসতে সে আমায় বুঝিয়ে দিল, কী খুশিই না সে হয়েছে ! হাসতে-হাসতেই সে যখন আমার বুকে হাত রেখে ইশারা করল, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না, সে আমারও নাম জিজ্ঞেস করছে ! আমিও হেসে ফেললুম । তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললুম, "আমার নাম ইসতাসি ।"

"ইসতাসি !" মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে আমার নামটা যখন সে উচ্চারণ করল, তারপর ছুটতে-ছুটতে তার মায়ের কাছে গিয়ে আমার নামটা বার-বার বলতে লাগল, তখন কী মিষ্টি শোনাচ্ছিল তার গলার স্বর । এমন খুশি তাকে আমি আর কোনোদিনই দেখিনি । সে যেন ভেবেই পাচ্ছে না, কী করবে এই মুহূর্তে । শুধু একটাই শব্দ তার মুখে । সে শুধু ডাকছে, "ইসতাসি, ইসতাসি ।" সে সেই শব্দটাকে সুরের মতো গেয়ে-গেয়ে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার ব্যানডুর্‌রিয়াটা হাতে করে নিয়ে এল । আমার হাতে তুলে দিল । ইশারা করল । মুখে শব্দ করল । যার মানে, "বাজাও ।" এখন মুখে যে-শব্দটা করল হয়তো এইটাই তার আব্দারের ভাষা । সুতরাং আমি তার আবদার না-রেখে কেমন করে পারি ? বাজাতে শুরু করে দিলুম । ওতিয়া হাততালি দিল ।

এখনও ওতিয়া অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার বাজনার দিকে । আমি যখনই বাজাই, ওর চোখের দিকে তাকালে আমার মনে হয়, বুঝি বা আমার বাজনার শব্দের মধ্যে কোনো জাদুমন্ত্রের আঁচ পেয়েছে সে । তাই মাঝে-মাঝেই আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ও জঙ্গলের ভেতরে । জঙ্গলের ভেতরে এইখানে, এই যে গাছে-গাছে ছাওয়া নিরিবিলি জায়গাটা, এইখানে সে আমায় নিয়ে আসে । তারপর আমার নাম ধরে ডাকে, আমার ব্যানডুর্‌রিয়াটার ওপর হাত রাখে । আমার চোখের দিকে তাকায় । ঘাড় নাড়ে । আমার হাতের বাজনা বেজে ওঠে । এই নির্জন জঙ্গলের গভীরে সেই বাজনার সুর শুনতে-শুনতে ওতিয়ার চোখ দুটি অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমার হাতের দিকে । তারপর ছুটতে-ছুটতে নাচতে থাকে । আর নয়তো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে সুর করে গান গায় । গানের মানে না বুঝি, কী যে ভাল লাগে ! খুব ভাল !

এখন এত ভাল লাগে ওতিয়াকে । ভাল লাগে ওর মাকে, বাবাকে । ওরা যেন আমাকে ওদেরই আপনজন ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না । কেমন যেন আমারই অজান্তে আমিও ওদের একজন হয়ে গেছি । ওদেরই মতো বন্য আর আনন্দে উচ্ছল । যদিও আমার পরনে সেই লম্বা প্যান্ট আর জামাটা এখনও আছে, কদিন পরে এ-দুটোর যখন আর পরবার মতো হাল থাকবে না, তখন আমি জানি, ওদেরই মতো আমার গাছের ছালের নামমাত্র পোশাক পরতে হবে । তখন হয়তো এরা আমার গায়ে উল্কি এঁকে দেবে । আর নয়তো নানান রঙের আঁকিজুকি । কপাল জুড়ে গাছের লতা জড়িয়ে তাতে এঁটে দেবে পাখির পালক । তারপর রাতের বেলা জলন্ত আগুন ঘিরে ওদের সঙ্গে নাচতে হবে আমায় । ভয়ংকর যুদ্ধের নাচ । অথবা শত্রুকে জয় করার উল্লাসনৃত্য !

সত্যি এরা নাচে । রোজই নাচে । সারাদিন জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরবে । শিকার খুঁজে এনে রাতের বেলা এক জায়গায় সবাই জমায়েত হয়ে আগুন জ্বালায় । গুরু-গুরু শব্দে থুম্বা বাজায় । মুখে অদ্ভুত শব্দ করে নৃত্যে মেতে ওঠে । ওই আগুনে তারা শিকার ঝলসে নেয় । তারপর ভোজ বসায় । সে-ভোজে আমাকেও ভাগ বসাতে হয় । ভারী আনন্দের সে-ভোজ । ভারী তৃপ্তির ।

প্রথম-প্রথম যখন আমার কিচ্ছু ভাল লাগত না, শুধু মনে পড়ত মাকে, বাবাকে, আনাতিদাদা অথবা আমাদের সেই দলের সবাইকে, তখন কোনো খাবারই রুচত না আমার । তখন ওতিয়ার মা কতদিন আমার নিজের মায়ের মতো আমাকে আদর করে খাইয়ে দিয়েছে । মাঝে-মাঝে যখনই আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে, আমায় ভালবেসে কাছে টেনে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে । চুমু খেয়েছে । তখনই আমার মনে হয়েছে, এ মা তো শুধু ওতিয়ার মা নয়, এ যেন আমারও মা । এই বন্য মায়ের মুখখানি আমার মায়ের কথা বার-বার

মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। আমার মন বলছে, সব মায়ের বুকের মধ্যে আছে একই আদর, একই ভালবাসা। মা যদি হয় বনের, কি শহরের, তফাত কোথায়?

৭

আচ্ছা, ওতিয়া বুঝি আমাকে ছাড়া আর কিচ্ছু জানে না! আমাকে নিয়ে সারাক্ষণ এত ব্যস্ত! কী যে করবে, যেন ভেবেই পায় না। আমার মুখে হাসি না-দেখলে, তার মুখখানিও শুকিয়ে যায়। দেখে আমারই কষ্ট লাগে। তাই হাসতেই হয় আমাকে। অন্তত তার জন্যে। তার গান শুনতে হয়, নাচ দেখতে হয়, আর বার-বার হাতে তালি দিয়ে তারিফ করতে হয়। তার ওপর, যখনই সে আমার হাতে ব্যানডুর্‌রিয়াটা তুলে দেবে, তখনই বাজাতে হয়। না বাজালে কী রাগ!

ভারী মায়া লাগে মেয়েটাকে দেখলে। না আছে দামি জামা-কাপড়, না আছে খেলনা-পুতুল। ওর কানে ওই যে কাঠের দুল দুটি দুলছে, কিম্বা গলায় কাঠের তৈরি ওই যে মালাটি, ওই যেন ওতিয়ার কাছে সাত রাজার ধন। ও জানে না, সোনা কাকে বলে। ও কোনোদিনই চোখে দেখেনি। তাই ভাবতেই পারে না, সোনা পরলে তাকে আরও কত সুন্দর দেখতে লাগবে!

ওতিয়া এই জঙ্গলের সবুজ ছায়ার মতোই ঠাণ্ডা আর শান্ত। হাসিখুশিতে ভরা ওই ছোট্ট মেয়েটা সত্যিই সুন্দর। এই বনের মতোই সুন্দর। ওকে ছেড়ে যাবার কথা আমি এখন ভাবতেই পারি না। এখন আমি সত্যিই ওতিয়ার মতো বন্য হয়ে গেছি। তোমরা ওকে আমার আপনজন বলে স্বীকার না-করলেও, আমি মনে-মনে জানি, ও আমার বোন। আমি ওতিয়ার ভাই। আমাদের খেলাঘর এই বন আর জঙ্গল।

ওতিয়ার কথা এখন আমি একটু-একটু বুঝতে পারি। যত কথা বুঝতে পারি, তার চেয়েও না-বোঝার কথা অনেক বেশি। যে-কথাগুলো আমি বুঝতে পারি না, ওতিয়া বোবা মুখে হাত-পা নেড়ে এমন করে বুঝিয়ে দেবে, বা দেখিয়ে দেবে যে, তা আমার কাছে জলের মতো সোজা হয়ে যায়। ও এমনি করে একদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল, গভীর জঙ্গলে একটি গুহা আছে। গুহার পাশে একটা জলপ্রপাত পাথর ডিঙিয়ে অঝোর ধারায় ছিটকে পড়ছে নীচে, চারিদিকে। সেই জলপ্রপাতের বিন্দু-বিন্দু জলের কণা যখন রোদের আলোয় দোল খায়, তখন রঙে-রঙে ছড়িয়ে যায় চারিপাশ। সে ভারী সুন্দর, ভারী অদ্ভুত। সেই জলপ্রপাত সে আমায় একদিন দেখাতে নিয়ে যাবে।

একদিন ওতিয়া সত্যিই আমায় নিয়ে গেছল সেই জলপ্রপাত দেখতে। সেই গভীর, আরও গভীর জঙ্গলে। তারপর? সেই কথাই এখন বলতে হবে আমায়! বলতে গিয়ে আতঙ্কে বুক কেঁপে ওঠে। মনটা ভীষণ দুঃখে মুষড়ে পড়ে।

এখন আমি আর ওতিয়া সেই গভীর জঙ্গলে জলপ্রপাত দেখতে চলেছি। অবিশ্যি মা আর বাবাকে বলে এসেছে ওতিয়া। আমিও। ওরা বার-বার সাবধান করেছে আমাদের। বলেছে, গভীর জঙ্গল যত সুন্দর, তত ভয়ংকর। এ-কথাটা যে কত সত্যি, এতদিনে আমিও তা জেনে গেছি। তবে হ্যাঁ, আগে যেমন ভয়ে গা-ছমছম করত, এখন তা করে না। এখন এই জঙ্গলই আমার সব-কিছু। এই জঙ্গলের সঙ্গে আমিও এখন জংলি ইসতাসি! এখন আমি যাযাবর নই। ঘুরে-ঘুরে, দেশে-দেশে ঘর বাঁধার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে। আমার সেই স্বপ্নের দিনগুলি হারিয়ে গিয়ে আর-এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। আমি ভাবি, কোনটা ভাল, সেই পথে-পথে ঘর বেঁধে নানান মানুষের দেশে ঘুরে বেড়ানো, না, এই গভীর জঙ্গলে বনের মানুষের সঙ্গে বন্য হয়ে থাকা!

ওতিয়ার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে আমি জঙ্গলের যতই গভীরে চলেছি, ততই অবাক হয়ে ভাবছি, এই ছোট্ট মেয়েটার কাছে জঙ্গলটা যেন কিছুই নয়। এর পাতা-ঝরা পথ, সবুজ গাছের সারি, এর আলো কিম্বা বাতাস, সবই ওতিয়ার জানা। ভয় নেই মনে। আমার তবু ভয় করে। কেননা, একবার যদি এই জঙ্গলের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাই, তবে পথ আর খুঁজে পেতে হচ্ছে না। তোমাদের বলতে ভুলে গেছি, ওতিয়া সঙ্গে একটা তীর-ধনুক নিয়েছে। জঙ্গলের গভীরে যখন যেতে হয়, সঙ্গে তীর-ধনুক নিতেই হয়। আমি অবিশ্যি এখনও ঠিক-ঠিক তীর-ধনুক ছুঁড়তে পারি না। একেবারে পারি না বললেও ভুল হবে। আমিও তীর ছুঁড়ি, কিন্তু ওতিয়ার মতো অত ওস্তাদ এখনও হতে পারিনি। ওস্তাদই বলব। কারণ, এই বয়সেও এক টিপে একটা নিশানা ও ঠিক ছিটকে দেবে। ওর ওই কেরামতি দেখলে অবাক না-হয়ে উপায় আছে! আমি অবাক হলে কী হয়েছে! তীর ছোড়াটা এই বন্য মানুষগুলির কাছে জলভাত! সঙ্গে আমিও অবিশ্যি একটা তীর-ধনুক নিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওতিয়া নিতে দিল না। তার বদলে, আমার হাতে সে ব্যানডুর্‌রিয়াটাই তুলে দিল। আমি ভাবলুম, জঙ্গলের গভীরে যাচ্ছি—বাজনা কী হবে! যদি কোনো ভয়ংকর জন্তুর সামনা-সামনি পড়ি, তখন তাকে ব্যানডুর্‌রিয়া শোনালে সে কি লক্ষ্মীছেলের মতো বাজনা শুনে আমাদের বাহবা দেবে! না, আমাদের আক্রমণ করে মুণ্ডপাত করবে! এখন অবিশ্যি আমিও তেমন জঙ্গলের জন্তু দেখলে ভয় পাই না। সয়ে গেছে। এখন রাত্তিরে বাঘের গর্জন যতই শুনি, আগের মতো দুরু-দুরু করে বুক কাঁপে না।

ওতিয়া চলতে-চলতে কলকল করে কত কথা বলছে। হা ভগবান! আমি যে কত বুঝছি! তোমাদের তো আগেই বলেছি, এদের সঙ্গে থাকতে-থাকতে সব কথা না-বুঝলেও, কিছু-কিছু কথা এখন বুঝতে পারি। তাই এখন ওতিয়ার অনেক কথার ফাঁকে-ফাঁকে যে-কথাগুলির মানে আমি জানি, তাতে আমার বুঝতে অসুবিধা নেই, ওতিয়া আমায় গল্প শোনাচ্ছে। গল্প শোনাচ্ছে আগুনের। আগুনকে ওরা মনে করে সব দেবতার সেরা দেবতা। ওরা ভাবে, এই বন্য মানুষের মনে যখন পাপ বাসা বাঁধে, তখন আগুনের দেবতা রুষ্ট হন। আর তখনই তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে সব ধ্বংস করে দেন। এই রকমই একবার হয়েছিল। আর ওতিয়া এখন সেই গল্পটাই শোনাচ্ছে। শোনাতে-শোনাতে কখনও তার চোখদুটো এত বড় হয়ে যাচ্ছে! নয়তো ঠোঁটটা উলটে যাচ্ছে! মুখখানা ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে! তখন যা ভাল লাগছিল ওতিয়াকে!

হ্যাঁ, সত্যিই একবার আগুন লেগেছিল এই জঙ্গলে। শুধু জঙ্গলে কেন, এই জঙ্গলের মাঝে-মাঝে এই যে গাছপাতা-ছাওয়া ঝুপড়িগুলো, আগুন লেগেছিল তাতেও। প্রাণের ভয়ে, সেই আগুন-দেবতার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে, ওরা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েছিল এই জঙ্গলেরই মাটিতে। দেবতা ওদের কথা শোনেননি। দেবতা তাদেরও আগুনে ছাই করে দিয়েছিলেন। কেননা, তখন সারা জঙ্গলের সমস্ত মানুষই হয়ে উঠেছিল পাপী, না-হয় অত্যাচারী! শুধু বেঁচেছিল চারজন। দুই বুড়ো-বুড়ি, তাদের এক ছোট্ট নাতনি আর একটি বালক। ওই বুড়ো-বুড়ি তাদের নাতনিকে বড় করেছিল। তারপর বিয়ে দিয়েছিল ওই বালকটির সঙ্গে। ক্রমে-ক্রমে আবার জন্ম নিল নতুন জীবন। আবার গড়ে উঠেছিল, নতুন মানুষের নতুন যুগ। তাই, এখনও ওরা মনে করে, আগুনই তাদের সব দেবতার শ্রেষ্ঠ দেব। তাই এখনও ওরা পুজো করে তাঁর। বনের অপদেবতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে রাত্রিবেলা তাদের ঘরের চারপাশে জ্বেলে রাখে আগুন। আর সে-আগুনের ভয়ে অপদেবতাই শুধু নয়, ঘেঁষতে পারে না বনের বাঘ-ভাল্লুকও।

আমরা এগিয়ে এসেছি অনেকটা বনপথ। অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু জন্তু-জানোয়ার দেখতে পাইনি। মাঝে-মাঝে দু-একটা বুনো খরগোশকে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে যেতে দেখেছি। একবার একটাকে ধরবার জন্যে ওতিয়া এমন এক ছুট দিয়েছিল! পারেনি। পারবে কেমন করে? ওরা তোমার চেয়েও চালাক! ধরতে যাও, এমন ভড়কি দিয়ে ঝোপের আড়ালে সুড়ুত করে লুকিয়ে পড়বে যে, তোমার আর সাধ্যি নেই তাকে খুঁজে পাও!

হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ ওতিয়া গান ধরল। এমন হঠাৎ-হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে ওতিয়া যে আমি নিজেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই। গাইতে-গাইতে সে আমার হাত ধরল। আমাকেও গাইতে বলল। আমি অবিশ্যি এখন ওদের সঙ্গে একটু-একটু গাইতে পারি। শুনতে-শুনতে আমারও এখন গানের কলিগুলো সব মুখস্থ হয়ে গেছে। মানে-টানে সব না বুঝলেও সেই গান গাইতে আমার এত মজা লাগে! তার ওপর ওতিয়ার গলায় যদি সে-গান শুনি, তাহলে তো আর কথাই নেই। দারুণ ভাল লাগে। এমন আধো-আধো সুরে

গাইবে ! আমি হলপ করে বলতে পারি, সে-গান শুনলে তোমারও মেয়েটাকে ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে হবে।

এতক্ষণ আমরা বনের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে হাঁটলেও সে-পথ ছিল সমান। কিন্তু হঠাৎ যেন পথটা কেমন উঁচু-নিচু ঠেকছে। মনে হচ্ছে, আমরা যেন ওপরে উঠতে-উঠতে নীচে নামছি। এখানে মাটির চেয়ে পাথর বেশি। সেই পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে দেবদারু, পাইন আর ইউক্যালিপটাস গাছগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওতিয়াকে জিজ্ঞেস করলুম, "এদিকে কোথায় যাবে ?"

ওতিয়া বলল, "নীচে। নীচে গভীর খাদ। কী অন্ধকার !"

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার খাদের ভেতর যেতে হবে শুনলে কোন্ মানুষ না ভয় পায় ? আমি তো কোন্ ছার ! আশ্চর্য, আমি কিন্তু ওতিয়ার মুখে ভয়ের কোনো লক্ষণই দেখতে পেলুম না ! পাছে আমার মনের ভয়টা ওতিয়া জেনে ফেলে, তাই ওতিয়া এতক্ষণ যে-গানটা গাইছিল, আমিও এখন এই পাথর টপকাতে-টপকাতে সেই গানটাই গেয়ে উঠলুম। ওতিয়া কী খুশি ! আমার হাত ধরে আমার সঙ্গে গলা মিলাল সে। সে-গানের যা মানে দাঁড়ায়, সেটা তোমাদের শোনাবার লোভ সামলাতে পারছি না :

এই যে বন, এই যে পথ
এই যে বনের গাছ-গাছালি,
ওই যে বাঘ, কিম্বা ভালুক,
বন্ধু মোদের পাখ-পাখালি।

আর একটু নীচে নামতেই আমি জলের শব্দ শুনতে পেলুম। আমার গান থেমে গেল। আরও একটু এগিয়ে যেতেই দেখি ওই নিচু জায়গাটার মাঝ দিয়ে গাঢ় নীল রঙের জল উপচে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। দুপাশে খাড়া উঁচু পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে কত গাছ ! কোথাও নানান রঙের বুনো ফুলের গাছ ! ওই উঁচু-উঁচু পাথরের ফাঁক দিয়ে আকাশটা যখন দেখছি, কী আশ্চর্য লাগছে ! ঝরনার ওপর ওই আকাশ ছায়া ফেলে দোল খাচ্ছে ! আমি দেখতে পেলুম, ওতিয়া ওই ঝরনার ধার ঘেঁষে, পাথরের ওপর পা রেখে-রেখে ওপরে উঠছে। উঠতে-উঠতে চেঁচিয়ে আমার নাম ধরে ডাকল, "ইসতাসি—।" তাকে জোরেই ডাকতে হল। কেননা, তার চিৎকারের চেয়ে জলের ছলাতকারের শব্দ আরও তীব্র। আমি অবশ্য শুনতে পেয়েছি। এমন একটা চমৎকার দৃশ্য দেখে আমার মনটা এত খুশি যে, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও গলা ছেড়ে ওতিয়ার নাম ধরে ডেকে উঠেছি। দেখতে পেলুম, ওতিয়া পাথর ভেঙে ওপরে উঠতে-উঠতে আমার ডাক শুনে থেমে পড়ল। হাতছানি দিয়ে আমাকে ওপরে ডাকল। সত্যি বলতে কী, ওতিয়ার মতো অত সহজে আমি উঠতে পারছি না। ওতিয়া যেন একটা ছোট্ট হরিণ। তরতর করে এমন অনায়াসে পা ফেলে ওপরে উঠছে যে, দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। এদিকে আমি কোনোরকমে সামলে-সুমলে পাথর টপকাচ্ছি। ওপরে কোথায় যাচ্ছে ওতিয়া আমি জানি না। ও যতই ওপরে উঠছে, দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ! একবার যদি ফশকায়, তাহলে যে কী কাণ্ড হবে, সে আর কাউকে বলে দিতে হবে না !

আর একটু ওপরে উঠতেই আমি দেখতে পেলুম, সেই ঝরনার জল দল বেঁধে ওপর থেকে ঝর-ঝর করে নেমে আসছে। পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে যেন জলতরঙ্গের সুর তুলে নাচছে। আমি চোখ ফেরাতে পারি না। স্থির চোখে চেয়ে থাকি সেইদিকে।

"ইসতাসি—" আবার ডাক দিল ওতিয়া।

আমি এবার ওকে ধরবার জন্যে আরও চটপট পা ফেলতে লাগলুম। আর মাঝে-মাঝে যখনই টাল খাচ্ছি, সামনে যা পাচ্ছি তাই-ই ধরে ফেলছি। হাঁপিয়ে গেলুম। অবাক কথা, ওতিয়ার ওসব নেই। হাঁপাচ্ছেও না, টালও খাচ্ছে না। ওতিয়া বোধহয় বুঝতে পেরেছে, আমার কষ্ট হচ্ছে। তাই দেখি, এবার দাঁড়াল। আমার ওপরে ওঠার কসরত দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল। আমিও ওতিয়ার মতো হাসতে পারলুম না বটে, কিন্তু হাসি শুনতে-শুনতে ওর কাছে পৌঁছে গেলুম। ওতিয়া আমার হাতটা ধরে ফেলল। টানতে-টানতে যেদিকে নিয়ে চলল, সেদিকটা তত উঁচু-নিচু না। কিন্তু এদিকে পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে জলের অজস্র ধারা। সেই জলের ধারা ছলকে-ছলকে পাথর ডিঙিয়ে ওইদিকের ঢালুপথে নেমে যাচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা পাথর ভেঙে ওপরে উঠেছি। এবার উলটোদিকে নীচে নামব আমরা। আমার হাত ধরে ওতিয়া আমায় জিজ্ঞেস করলে, "খুব কষ্ট হচ্ছে তো ?"

আমি কষ্টটাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে বললুম, "না-না !"

ওতিয়া আমার হাঁসফাঁসানি দেখে আবার বললে, "তবে হাঁপাচ্ছ যে !"

আমি উত্তর দিলুম, "অনেকটা উঁচু তো !"

সত্যি, কত উঁচুতে উঠেছি। এখান থেকে নীচের দিকে চাইলে মনে হচ্ছে, জঙ্গলের মস্ত বড় গাছগুলো যেন ছোট্ট-ছোট্ট চারাগাছ। পৃথিবীর দেহটা কে যেন সবুজ মখমলে ঢেকে দিয়েছে। এখান থেকে শুনতে পাচ্ছি, জলের একটানা মৃদু শব্দ এখন দুরন্ত হয়ে উঠেছে। দেখতে পাচ্ছি, ঝরনার সব-কটা স্রোতের ধারা একই দিকে ছুটে চলেছে। একই সঙ্গে এই ওপর থেকে নীচে প্রচণ্ড বেগে ঝরে পড়ছে। অসংখ্য জলকণা ঠিক যেন কুয়াশার মতো জমাট বেঁধে সেই জলধারার মাথার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। যতই দেখছি, অবাক হয়ে থমকে যাচ্ছি। ওতিয়া আড়ে-আড়ে আমার দিকে দেখছে, আর হয়তো মনে-মনে বলছে, "কী, কেমন লাগছে ?"

এর আগে আমি তো আরও কত দেশ ঘুরেছি, না-দেখা কত কী দেখেছি ! কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমি কখনও জলপ্রপাত দেখিনি ! সুতরাং দেখতে-দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি, যে-পৃথিবী এত সুন্দর, যে-পৃথিবীর বুকে এত আনন্দ, এত জাদু, তার কোলে জন্ম নিয়ে আমরা কেন এত নিষ্ঠুর, নির্দয় আর হিংস্র !

একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল ওতিয়া। তার ওই মুখখানি জলের শব্দের মতোই উচ্ছল হয়ে উঠেছে। তারই পাশে আর-একটা বড় পাথরের ওপর বসবার জন্যে সে আমাকে ইশারা করল। বসব কী, ওই কুয়াশার মতো উড়ন্ত জলের বিন্দুগুলি গায়ে মুখে মাথায় চোখে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে। ওতিয়ার মুখের ওপর ওই বিন্দুগুলি ছড়িয়ে পড়ে কী সুন্দর দেখতে লাগছে !

আমি বসলুম। ওতিয়া ওই পাথরটার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে নীচের দিকে চেয়ে রইল। জল পড়ছে অঝোর ধারায়। একটানা তার শব্দ। আর সব নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। এমন-কী ওতিয়া। তার সঙ্গে আমিও। এখন চুপ করে থাকারই সময়। এখন শুধু দেখার সময়। এই বন, এই পাথর-ঘেরা ঝরনা অথবা জলপ্রপাত। আর সেই জলের বিন্দুভরা কুয়াশার ওপর সূর্যের আলোয় রামধনু-রঙের বাহারি ছটা। চোখ ফেরাবে কে।

আমিও ওতিয়ার মতো হেঁট হয়ে নীচের দিকে চাইলুম। উঃ, কী ভীষণ গভীর ! এই ওপর থেকে নীচের ওই গভীরে জলের ধারা লাফিয়ে পড়ে এমন তোলপাড় শুরু করেছে যে, তা দেখতে-দেখতে আমি থমকে যাই !

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ওতিয়া। আমার গায়ে হাত দিল। আমার চমক ভাঙল। আমিও উঠে পড়েছি। আমার হাত ধরল ওতিয়া। নীচের দিকে নামতে লাগল। কেমন থরে-থরে সিঁড়ির মতো পাথরের সারিগুলি সাজানো রয়েছে ! দেখলেই মনে হবে, কে যেন খুব যত্ন করে ওই পাথরে পা ফেলে নীচে যাবার পথটি পরিষ্কার করে রেখেছে। লাফিয়ে-লাফিয়ে আমরা নামতে লাগলুম। নীচে নেমে দেখি, ওই জলরাশি যেখানে পড়ছে, সেখান থেকে সামনে জঙ্গলের মধ্যে তার স্রোত বয়ে চলেছে। ওতিয়া আমাকে ওই স্রোতের দিকেই নিয়ে চলল। কী ভয়ংকর সেই স্রোতের তেজ ! আমি বলতে পারি, একবার যদি বেসামাল হয়ে সেই স্রোতে কেউ পড়ে যায়, তবে আর তাকে খুঁজে পেতে হচ্ছে না !

ওই স্রোতের তীর ধরে ওতিয়া আর আমি আরও গভীর জঙ্গলে চলেছি। আমি দেখলুম, ওই জলধারা ছুটতে-ছুটতে এখন যেন একটি নদীর রূপ নিয়েছে। আমরা আরও দেখলুম, ওই নদী সামনে অন্ধকার এক গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। হয়তো গুহার জমাট অন্ধকারে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে ওপাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। ওতিয়ার সঙ্গে আমি ওপাশেই ছুটলুম। এখন আমরা যতই দূরে চলে যাচ্ছি, ততই জলপ্রপাতের শব্দ ধীরে-ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। শুধু শোনা যাচ্ছে,

এই পাহাড়ি নদীটির জলের বাজনা। গুহার ভেতরে যেন জলের পরীরা নূপুর-পায়ে নাচছে !

আমরা যখন গুহার এপাশ থেকে ওপাশে পৌঁছুলুম, তখন সত্যি কী অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, গুহার মুখ থেকে যেন গলন্ত রুপা ঝলক-ঝলক করে বেরিয়ে আসছে। গাছের পাতায় হাওয়ার ঢেউ, জলের শব্দ, দু-একটি পাখির ডাক, আমাকে কেমন আনমনা করে দিল। আমি ব্যানডুর্‌রিয়াটা হাতে নিলুম। তারে-তারে সুর বেঁধে বাজাতে শুরু করলুম। সেই গানটা বাজাতে এখন আমার ভাল লাগছে। ভয়ংকর সেই রাতে যেদিন মা আমার শেষবারের মতো যে-গানটি গেয়েছিল। আর আমি যেদিন প্রথমবার মায়ের সুরে সুর মিলিয়ে ব্যানডুর্‌রিয়া বাজিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলুম। এই নির্জন জঙ্গলে, এই পাহাড়ি নদীর সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুর বাজাতে-বাজাতে আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। দেখে ফেলল ওতিয়া। কী ভাবল আমি জানি না। জানি না, এখন আমার এই বাজনার শব্দ তার শুনতে ভাল লাগছে কিনা ! এখন হয়তো অবাক হয়ে ওতিয়া ভাবছে, এত আনন্দেও আমি কাঁদছি কেন ! ও কি বুঝতে পারে আমার মনের কথা ? হয়তো পারে। নইলে, ধীর পায়ে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ায় কেন সে ? আমার যে-হাতটি বাজনার সুর তুলছে, সেই হাতটি ছুঁয়ে থামিয়ে দিল। তারপর নরম-সুরে জিজ্ঞেস করল, "ভাল্ লাগছে না ইসতাসি ?"

আমি তাড়াতাড়ি নিজের চোখের জল সামলে নিয়ে বললুম, "না, না। খুব ভাল লাগছে।"

"তবে কাঁদছ ?"

"কই না।"

"বুঝতে পেরেছি। মাকে আর বাবাকে মনে পড়ছে বুঝি ?"

আমি চুপ করে রইলুম।

ওতিয়া বলল, "তুমি এত সুন্দর বাজনা বাজাও।"

"তুমিও তো খুব সুন্দর গান গাও।"

ওতিয়া যেন লজ্জা পেল। লজ্জা পেয়ে ওতিয়া যখন মুখখানি নিচু করে নেয়, তখন এত ভাল লাগে দেখতে ! এখন যেন আরও ভাল লাগল। সূর্যের আকাশ থেকে ঝকঝকে আলোর মুক্তাগুলি ওর চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। কী সুন্দর দেখতে লাগছে ! আমি মনের দুঃখটা মনের ভেতর চেপে রেখে ওতিয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম, "ওতিয়া, তুমি একটা গান গাইবে ? আমি বাজনা বাজাব।"

ওতিয়া আমার মুখের দিকে চাইল।

আমি আবার বললুম, "গাও !"

ওতিয়া ছুটে পালিয়ে গেল। ওতিয়া পাথরের গায়ে লাফাতে-লাফাতে মস্ত একটা পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল। তারপর দেখতে পেলুম, পাথরের গায়ে যে সবুজ গাছটা নদীর দিকে মুখ হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে উঁকি মারল ওতিয়া। আমি না-দেখার ভান করলুম। ওতিয়া আমার নাম ধরে ডাকল, "ই-স-তা-সি।"

আমি মুখে সাড়া না-দিয়ে আমার ব্যানডুর্‌রিয়ার সুরে বাজিয়ে দিলুম, "ও-তি-য়া।"

ওতিয়া হেসে উঠল। তারপর গেয়ে উঠল। গাইতে-গাইতে ওই পাথরের আড়াল থেকে আর-এক পাথরের ওপর লাফিয়ে পড়ল। তারপর এই পাথর থেকে ওই পাথর, সেখান থেকে আর-এক পাথর, লাফিয়ে নেচে গাইতে লাগল। আমি বাজাতে লাগলুম।

তুমি যদি তখন সেই দৃশ্য দেখতে, তোমার সাধ্যি ছিল না, চোখ ফেরাও। ওতিয়া এমন মজা করে গান গাইছিল ! তেমনি মজার কথায়-ভরা সেই গান। আমার তো হাসতে-হাসতে পেটে খিল লেগে যাবার গোত্তর ! আমি জানি না, সেইসময় তুমি ওতিয়ার সামনে থাকলে কী করতে ! কে জানে, তোমার হাসি পেত কিনা ! কিন্তু এখন হাসি পাক চাই না-পাক, ওতিয়ার সেই গানের কথাগুলো শুনতে তো কোনো দোষ নেই। সেই গান অনেকটা এমনি :

এক্ষুনি যদি এক ভাল্লুক,
রেগে বলে, এই দ্যাখ হাঁচছি,
তারপর পায়ে দিয়ে বুট-শ্যু
ধিন-ধিন নেচে বলে নাচছি !
তখন কী মজা হয় বলো তো ?

এক্ষুনি যদি এক নেকড়ে
কেঁদে বলে, পেটে ব্যথা মরছি,
ওরে বাপ দে-না ডাক বদ্যির
মাথা খুঁড়ে তোকে গড় করছি।
তখন কী মজা হয় বলো তো ?

এই যে গানটা শুনলে, এটা আমি ওতিয়ার গলায় শুনে মোটামুটি একটা মানে দাঁড় করিয়েছি। দেখছ, গানের এক জায়গায় আছে, 'পায়ে দিয়ে বুট-শ্যু'। আসলে, ওতিয়ার গানে 'বুট-শ্যু' কথাটা ছিল না। ছিল অন্য আর-একটা শব্দ। সেই শব্দটার মানে করতে না-পেরে অগত্যা 'বুট-শ্যু' কথাটা আমিই জুড়ে দিয়েছি। অবিশ্যি মানের যে খুব একটা গোলমাল করে ফেলেছি, তা যেন মোটেই ভেবো না !

গানটা গাইতে-গাইতে ওতিয়া যেন কী দেখে হঠাৎ থমকে গেছল। আমিও ওর মুখের দিকে চেয়ে হকচকিয়ে গেছি। ওতিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিলুম বলে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আমার পেছনে কী দেখে, ওতিয়ার মুখখানা এমন ভয়ে কুঁচকে গেল ! আমি নিজে পেছন ফিরে দেখার আগেই ওতিয়া চিৎকার করে উঠেছে, "ইসতাসি !"

আমি চোখের পলকে পিছনে তাকিয়েছি। তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠেছি আমি ! আমার পেছনে একটা দাঁতালো শুয়োর ! কী বিচ্ছিরি আর কিম্ভূতকিমাকার দেখতে শুয়োরটাকে ! কুতকুতে চোখ দুটো পিটপিটিয়ে দেখছে আমাদের। আমি কী করব, ভাবতে না-ভাবতেই দেখি, শুয়োরটা তার বিটকেল মুখটা উঁচিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসছে। আমি পালাতে যাব, এমন সময় ওতিয়া ঝট করে এগিয়ে এসে আমায় আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ধনুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে তীর জুতলে। বুনো শুয়োরটাকে তাক করলে। আমি নিশ্চিত জানি, সেই সময় বুনো শুয়োরের সামনে পড়লে, আমার মতো তুমিও প্রাণের ভয়ে কাঁপতে। কারণ, তার চেহারাটা সত্যিই এমন বীভৎস আর ভয়ংকর যে, আচমকা দেখলে যে-কোনো মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা সব কোথায় উবে যাবে ! কিন্তু আশ্চর্য, ওতিয়া ভয় পেল না। বুনো শুয়োরটা তার নাকের পাশে বাঁকানো খড়্গ দুটো খাড়া উঁচিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে। ওতিয়া মুখে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ করল। সে আওয়াজে ছিল একটা ভীষণরকমের ধমক। কিন্তু সেই জন্তু শোনেনি ওতিয়ার ধমক। সে তেড়ে এসেছিল। ওতিয়া চেঁচিয়ে উঠে আমাকে বলেছিল, "ভয় পেও না ইসতাসি।" বলেই তীর ছুড়ে দিয়েছিল সেই বুনো শুয়োরের কপালের মাঝখানে। আমি জানতুম, ওতিয়ার তীরে ছিল বিষ মাখানো। তীর কপালে বিঁধে যেতেই সেই বুনো শুয়োর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে লাফিয়ে পড়ল আমাদের সামনে। ওতিয়া চিৎকার করে উঠল, "ইসতাসি, ছুট দাও !" বলে ওতিয়া নিজেই আমার হাত ধরে সেই পাথরের ওপর ছুটতে লাগল। আমার তো অত অভ্যেস নেই। তবু প্রাণের ভয়ে পড়ি-মরি ছুটতে লাগলুম।

বেশ খানিকটা ছুটে এসেছি। পিছন ফিরে দেখি, শুয়োরটা ছুটছে না। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে লাফাচ্ছে। যন্ত্রণায়। তার কপাল দিয়ে রক্তের বান বয়ে যাচ্ছে। আমি দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তার বুকটা হাঁসফাঁস করছে। হাঁপাচ্ছে সে। মনে হল, বিষের তেজ ওর রক্তে মিশে ওকে কাবু করে ফেলেছে।

সত্যিই তাই। সেই বুনো শুয়োরটা লাফাতে-লাফাতে কেমন ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ছে। দেখতে পেলুম, যেখানে সেটা লাফাচ্ছিল, সেইখানেই মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেল। পড়ে মুখে কীরকম একটা শব্দ করতে-করতে নির্জীব হয়ে গেল। ওতিয়া হেসে উঠল হাততালি দিয়ে। ওতিয়ার মুখে হাসি দেখে আমিও হেসে উঠলুম।

ওতিয়া বলল, "খতম হয়ে গেছে।" বলেই ছুটে গেল সেখানে। আমিও ছুটলুম। জয়ের আনন্দে ওতিয়ার মুখখানা খুশিতে যতটা উছলে উঠছে, বুকখানা গর্বে ফুলে উঠছে তারও বেশি ! আমি কাছে গিয়ে দেখলুম, সেটা তখনও ধুঁকছে। আমি জানি, এখনই ওর বুকের ধুকপুকুনি থেমে যাবে। বাছাধনের সময় হয়ে আসছে।

ওতিয়া হাতের ধনুকটা পাশে রেখে আমাকে বলল, "ইসতাসি,

এসো, এই শুকনো কাঠপাতাগুলো ওর গায়ের ওপর বিছিয়ে দিই।" বলে এ-ধার ও-ধার থেকে চটপট করে শুকনো কাঠপাতা কুড়ুতে থাকল। আমিও হাত লাগালুম। যদিও বুঝতে পারছি, এই শুকনো গাছপালা আর পাতা ছড়িয়ে ওর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেবে, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছি না ওতিয়া এখানে আগুন পাবে কোথায়! তাই জিজ্ঞেস করে ফেললুম, "শুধু-মুধু ওর গায়ে এগুলো চাপিয়ে কী করবে ওতিয়া?"

"দাহ করব।"

"আগুন?"

"দ্যাখো-না।"

দেখতে বেশিক্ষণ হল না। সামনে থেকে দুটো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে এল ওতিয়া। অবাক হয়ে দেখলুম, সেই পাথর দুটো তার ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে ঠুকতে লাগল। আগুনের চকমকি ছড়িয়ে পড়ছে। সত্যিই, হঠাৎ সেই চকমকির ফুলকি ছিটকে ঝপ করে আগুন ধরে গেল। তারপরই দাউ-দাউ করে জ্বলে ধোঁয়ায় ভরে গেল চত্বরটা। খুশিতে চিৎকার করে উঠল ওতিয়া।

আমি এখন সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওই একটা ছোট্ট মেয়ে ওতিয়ার অমন দুর্দান্ত সাহস আর বুদ্ধি দেখে! জঙ্গলের মানুষ যারা তাদের বুঝি এমনিই সাহসী হতে হয়! হ্যাঁ, সারাজীবনই তো বিপদ মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। মনে সাহস আর বুকে তেজ না থাকলে উঠতে-বসতে মরতে হবে না!

ধোঁয়া উড়ছে, আগুনও জ্বলছে। এরই মধ্যে শুয়োরের পোড়া মাংসের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি জানি, একটু পরেই মাংসটা বেশ কিছু ঝলসে গেলে, ওতিয়া ওই শুয়োরটার ঘাড় থেকে খানিকটা পোড়া মাংস ছিঁড়ে এনে আমায় দেবে। নিজেও নেবে। তারপর সেই আগুনে ঝলসানো মাংস মুখে দিয়ে আঃ, উঃ করবে। করতে-করতে কত কথাই না কইবে!

কিন্তু তা হল না। হল যা, তা আর এক ভয়ংকর কাণ্ড! একটা ভয়াবহ বিপদ যে ওই ধোঁয়ার আড়ালে এতক্ষণ ওত পেতে বসে আছে, আমরা তা একেবারেই টের পাইনি! কিন্তু আশ্চর্য মেয়ে ওতিয়া! ও যেন হাওয়ার স্পর্শ পেলে বলে দিতে পারে, কোথায় বিপদ উঁকি মারছে। কী সতর্ক দৃষ্টি ওতিয়ার চোখে! অথচ আমি? বুঝতেই পারি না কিছু! ওতিয়া যখন প্রায় লাফিয়ে উঠে ছোঁ মেরে সেই ধনুকটা আবার মাটি থেকে তুলে নিল, তখনই আমার টনক নড়ল। চোখের পলকে তার পিঠে বাঁধা তূণ থেকে একটা তীর টেনে নিল সে। ছিলায় আটকে চেঁচিয়ে উঠল, "ইসতাসি, সাবধান!"

আমার বুকটা ধক্ করে আঁতকে উঠেছে। সত্যি বলছি, আমি এতক্ষণ মরা শুয়োরটার পোড়া গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে মনে-মনে ভাবছিলুম, মাংসটা দারুণ জমবে! মিথ্যে বলব না, নোলায় দু-এক ফোঁটা জলও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু ওতিয়ার অমন চিৎকার শুনে নোলার জল নোলায় শুকিয়ে গেছে! পিছন ফিরে দেখি, ওতিয়া যেদিকে তীর উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে, সেদিকের ঘন জঙ্গলের আড়ালে কমসে-কম দশ-পনেরোটা বুনো শুয়োর দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেগে তাদের ল্যাজগুলো সব খাড়া! তাক করে আছে আমাদের দিকে। বুঝতে বাকি রইল না, এবার ওরা একসঙ্গে আমাদের আক্রমণ করবে।

ওতিয়া হেঁকে উঠল, "ইসতাসি, শিগগির আমার পেছনে চলে এসো।"

আমি দেখেশুনে এমনই ঘাবড়ে গেছি যে, ওতিয়ার কথা যেন আমার কানেই ঢুকল না। ভয়ে আমার পা নড়ছে না। তখন ওই একটা শুয়োরের বিদঘুটে মূর্তি দেখেই আমার কালঘাম ছুটে গেছল। এখন একসঙ্গে অতগুলো। একবার যদি খড়্গ দিয়ে পেটের ভেতর ঢুঁ লাগায়, তবে যে কী হবে, সে-কথা তোমাদের না-বললেও চলবে।

হয়তো ওদের ভাবগতিক দেখে ওদের যে কী মতলব ওতিয়ার বুঝে নিতে একচুল দেরি হয়নি। শুয়োরগুলো আমাদের আক্রমণ করার আগেই ওতিয়া নিজেই তেড়ে গেল! আমি থতমত খেয়ে গেছি। আর্তনাদ করে ডাক দিয়েছি, "ওতিয়া!"

ওতিয়া দৃঢ় গলায় সাড়া দিল, "ভয় নেই ইসতাসি। তুমি এসো না। ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকো! শত্রু আক্রমণ করার আগে, তাকেই ঘায়েল করতে হবে।"

ওতিয়া আরও এগিয়ে গেল। এগিয়ে গেল, একেবারে শুয়োরগুলোর মুখোমুখি। ভয়ে আমার গায়ের লোম খাড়া! কী অসীম সাহস ওতিয়ার!

কিন্তু তার চেয়েও আর এক দুঃসাহসী দৃশ্য আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দেখলুম, ওতিয়া সাঁই-ই-ই করে একটা তীর ছুড়ে দিল শুয়োরগুলোর পালে। একটার পিঠে গিয়ে প্যাঁট করে বিঁধে গেল সেই তীর। বাছাধন কাত। বলব কী, তাই দেখে শুয়োরের দল ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে মার ছুট! আশ্চর্য! ওতিয়া কিন্তু ওদের পালাতে দেখে পিছু হটে এল না। আমি দেখলুম শুয়োরগুলোকে তাড়া করতে-করতে ওতিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। শুনতে পেলুম, জঙ্গলের মধ্যে ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ আর ডালপালা ভেঙে পড়ার মড়মড়ানি! আমি বুঝতে পারলুম, ওতিয়া শুয়োরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শেষ না-করা পর্যন্ত ছাড়বে না। তোমরাই বলো, এইরকম অবস্থায় আমার কি এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা সাজে? কে বলতে পারে কোথা থেকে বিপদ আসে! আমার এখনই উচিত ওর সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। বিপদ হোক! হলে দুজনারই হবে। তবু তো কেউ বলতে পারবে না, একটা ছোট্ট মেয়েকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি এখানে লুকিয়ে বসে স্বার্থপরের মতো গা বাঁচাচ্ছি!

আর একপলকের জন্যেও অপেক্ষা করলুম না। থাক-না ব্যানডুর্‌রিয়াটা হাতে। আমি বাজনা নিয়েই চেঁচিয়ে উঠলুম, "ওতিয়া, দাঁড়াও, আমি আসছি।" বলতে-বলতে ছুট দিলুম।

কিন্তু ওতিয়ার সাড়া পেলুম না। এমন-কী, এতক্ষণ চারিদিকে ডালপালা ভাঙার যে-সব এলোমেলো শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম, সেই শব্দও আর শুনছি না। হঠাৎ কেমন যেন সব নিথর, নিশ্চুপ হয়ে গেল। তবু আমি ছুটে গেলুম। ছুটতে-ছুটতে ডাক দিলুম, "ওতিয়া!"

সাড়া পেলুম না।

এবার আমি আমার গলায় যত জোর ছিল, সব জোর এক করে চিৎকার করে উঠলুম, "ওতিয়া, তুমি কোথায়?"

এবারও সাড়া পেলুম না।

জলপ্রপাতের ক্ষীণ শব্দ, সেই শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে জঙ্গলের একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা আমাকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ করে দিল ঠিক এই মুহূর্তে। মাথায় আসছে না, কী করি! যদিও আমি এখন এই জঙ্গলেরই মানুষ, তবু তার সব রহস্য তো আমার এখনও জানা হয়নি। হয়তো জঙ্গলের সব রহস্য কেউ কোনোদিন জানতে পারেও না। হলেই-বা ওতিয়া এই জঙ্গলেরই একজন। সে-ও যে এই ছোট্ট বয়সে সব-কিছু জেনে ফেলেছে, এ আমি কেমন করে বিশ্বাস করতে পারি। কে জানে, ওই জন্তুগুলো হয়তো ওই ছোট্ট মেয়েটাকে রহস্যের জালে জড়িয়ে ফেলেছে এতক্ষণে। হয়তো ওতিয়া বাইরে বেরিয়ে আসার পথ ভুলেছে। এ-কথা ভাবতে-ভাবতে আমার মনের ভেতরটা কেমন যেন ছটফট করে উঠল। আমার মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না। কী যে হল আমিও ওতিয়াকে ডাকতে-ডাকতেই জঙ্গ গভীরে ঢুকে পড়লুম। কখনও জোরে, কখনও ধীরে ডাকতে লা লুম, 'ওতিয়া, ওতিয়া।' তার দেখা পাওয়া দূরে থাক, সাড়া পর্যন্ত পেলুম না। এ যেন ভেলকি! চোখের পলকে হারিয়ে গেল! নাকি, শুয়োরগুলো তাকে আক্রমণ করেছে! তাহলে চিহ্ন তো থাকবে! কোথায়, তেমন তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না! তবে কি সে ফিরে গেছে? হতে পারে।

এই কথা মনে হতেই আমি আবার ছুটলুম পিছনদিকে। কিন্তু আমার অজান্তেই আমি হারিয়ে গেছি! হারিয়ে ফেলেছি আমার পথ এই জঙ্গলের গোলকধাঁধায়। খেয়ালই করতে পারছি না, কোন্ পথ দিয়ে এখানে এসেছি! একবার এদিক, একবার ওদিক ছোটাছুটি করতে-করতে মাথা গোলমাল হয়ে গেল। ভীষণ ঘাবড়ে গেলুম। ঠিক-ঠিক চিন্তা করার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। অবশেষে চিৎকার শুরু করে দিলুম, "ওতিয়া, আমায় বাঁচাও, আমায় বাঁচাও।" চেঁচাতে-চেঁচাতে ঝোপ-জঙ্গল টপকাতে লাগলুম। জঙ্গলের চক্করে চরকি খেতে-খেতে দম শেষ হয়ে যাচ্ছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। আমি বোধহয় এক্ষুনি মুখ থুবড়ে পড়ে যাব! আঃ! ভারী

তেষ্টা পাচ্ছে ! গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ? আমার কি মরণের সময় ঘনিয়ে আসছে ! আমি আর থাকতে পারলুম না । ঠোক্কর খেলুম । ছিটকে পড়লুম । বুঝতে পারলুম, প্রচণ্ড লেগেছে । কিন্তু তারপর সব যেন কেমন হয়ে গেল । আমি যেন আমাকে আর ধরে রাখতে পারছি না । আমি হারিয়ে যাচ্ছি । আর সত্যিই আমার জ্ঞান হারিয়ে গেল । আমি পড়ে রইলুম এইখানে । যেখানে পড়ে থাকলে আমি মরে গেলেও কেউ কোনো দিন জানতে পারবে না ।

৮

আমার আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল হঠাৎ-ই । কতক্ষণ পড়ে ছিলুম, তা আমার খেয়াল থাকার কথা নয় । হয়তো হবে অনেকক্ষণ । অবাক লাগছে, এতক্ষণ পড়ে ছিলুম, অথচ এখনও আমি বেঁচে আছি ! বাঘে তো খেতে পারত ! কিম্বা অন্য কোনো হিংস্র জন্তু ! বলতেই হবে, এ আমার ভাগ্য !

কিন্তু ওতিয়া ! ওতিয়া কোথায় ? ওতিয়ার কথা মনে পড়তেই ছ্যাঁক করে উঠল আমার বুকটা । আমি চকিতে উঠে দাঁড়ালুম ! সত্যিই তো, কোথায় গেল মেয়েটা ! আমি ব্যস্ত-পায়ে ঘুরে দাঁড়ালুম । মুখ ফেরালুম । ওতিয়া নেই । কিন্তু আমার চোখের সামনে ওটা কী দাঁড়িয়ে আছে !

একটা ভাল্লুক !

আমি স্থির ! না-পারি বসতে, না-পারি চলতে ! পা দুটো অসাড় হয়ে কাঁপতে লাগল । বুকে সাহস এনে কাঁপুনিটাকে যতই ঠেকাবার চেষ্টা করছি, কিছুতেই পারছি না । আমি স্পষ্ট দেখছি ভাল্লুকটাকে । দেখছি, জন্তুটার গায়ের রঙ বাদামি । নাকের সামনে সাদা ছোপ । গা-ভর্তি লম্বা লোম । চোখ দুটো কুতকুত করছে । সে-চোখ দেখে বলা মুশকিল, এই মুহূর্তে সে পেটে-পেটে কী মতলব আঁটছে । কিন্তু তার পায়ের নোখগুলো দেখলে তোমার মনে হবেই, বাছাধন একবার যদি ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে আমাকে শেষ করে ফেলতে সময় তার বেশি লাগবে না ।

এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে ভাল্লুকটার দূরত্ব খুব বেশি হলে চার-পাঁচ হাত ! সুতরাং তোমরা ধরে নিতে পারো, আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে । আহা রে ! আমাকে মেরে ফেলার আগে এই গভীর জঙ্গলের জন্তুটা যদি আমার দু-চারটে কথাও বুঝতে পারে ! তবে তাকে বলি, "হে বন্ধু, এই দ্যাখো আমার গলায় ঝোলানো বাজনা । আমি তোমাকে মারতে আসিনি । আমার বন্ধু ওতিয়ার সঙ্গে আমরা আনন্দ করতে এসেছিলুম । কিন্তু আমাদের আনন্দে বাধা দিয়েছিল একদল বুনো শুয়োর । তারা আমাদের মারতে চেয়েছিল । আমার বন্ধু ওতিয়া ভয় করেনি তাদের । ওতিয়াও আক্রমণ করেছিল তীর-ধনুক নিয়ে । তারপর জঙ্গলের কোথায় যে হারিয়ে গেল, আমি খুঁজে পাচ্ছি না । তাকে খুঁজতে-খুঁজতে আমিও হারিয়ে গেছি । আমায় যদি মারতে চাও তুমি, মারো ! কিন্তু একটিবার যদি বলে দাও, কোথায় গেলে শেষবারের মতো আমি ওতিয়াকে দেখতে পাব, তবে তাকে শেষবারের মতো দেখে আমি নিজেই তোমার হাতে মরবার জন্যে এগিয়ে যাব ।"

আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল বোধহয় । খুবই স্বাভাবিক । এইরকম অবস্থায় আমার মতো তুমিও যদি পড়তে, কাঁদতে না ?

হঠাৎ আমি হকচকিয়ে গেছি ! আমার চোখ দুটো ছটফটিয়ে উঠেছে ! দেখি কী, আচমকা ভাল্লুকটা সামনের পা-দুটো তুলে খাড়া দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠল । দাঁড়াতেই, তার মুখের ঠোঁট দুটো দু-ফাঁক হয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল । তারপর অমনি দু-পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল । আমি তো জানি, এবার আমার সময় হয়ে এসেছে । আমি জানি, এবার ভাল্লুকটা তার সামনের দু-পা দিয়ে আমায় জাপটে ধরবে । জাপটে ধরে আমার হাড়গোড়গুলো সব গুঁড়িয়ে ফেলবে । আমি শেষ-নিশ্বাস ফেলার আগে হয়তো মাটির ওপরে আমাকে ছুড়ে ফেলে দু-পায়ের ওই তীক্ষ্ণ নোখগুলো দিয়ে আমার বুকটা চিরে ফেলে ভাল্লুকটা নিশ্চিন্ত হবে । কী জানি আমার কী হল, আমার বুকের মধ্যে কে যেন জাদুমন্ত্রের মতো সাহস এনে দিল । আমি ছুট দিলুম । এদিকটায় কত বড়-বড় ঘাস জন্মেছে । আমার একেবারে বুক অবধি লম্বা । আমি দু-হাত দিয়ে সেই ঘাস সরাতে-সরাতে যতটা সম্ভব জোর কদমে ছুটতে লাগলুম । তুমি তো জানো না, ঘাসের মধ্যে দিয়ে ছোটা কী দুঃসাধ্য কাজ ! পায়ের দফারফা । বুঝতে পারছি, কেটে আর কাঁটা ফুটে রক্তারক্তি হচ্ছে । হোক । আমায় বাঁচতে হবে । ওতিয়াকে আমায় খুঁজে বার করতেই হবে ।

আমি হঠাৎ-ই একবার দাঁড়ালুম । যদিও আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, হাঁপাচ্ছি, তবু ভেবো না যেন, আমার দম ফুরিয়ে গেছে । এখনও আমি আরও কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই ছুটতে পারব । ওই ভাল্লুকটার খপ্পর থেকে বাঁচার জন্যে আরও খানিকক্ষণ যুঝতে পারব । তবু দাঁড়ালুম । কারণ, ভাল্লুকটার তেড়ে আসার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলুম না । শুনতে পাচ্ছিলুম না, ঝোপঝাড় ভেঙে পড়ার কোনো আওয়াজ । আমি চকিতে একবার পিছু ফিরলুম । হ্যাঁ, তাই তো । আমার পেছনে কোনো ভাল্লুকও নেই, কিচ্ছু নেই । আমি অবাক হয়ে গেলুম । তবে কি ভাল্লুকটা আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না । এ-কথাটা আমি কেন, তোমরাও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না । সেটা নিশ্চয়ই এখানে কোনো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে । সুতরাং এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা নয় ! যেমন করে হোক এখান থেকে পালাতে হবে । এই কথা মনে হতেই আমি আবার ছুট দিলুম ।

কিন্তু চমকে গেলুম । ছুটতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম । কেননা, যেদিক দিয়ে ছুটে যাব, ঠিক সেইদিকেই ভাল্লুকটা চুপটি করে বসে আছে । আমার চোখে ধুলো দিয়ে, কোন্ ফাঁকে, কোন্ পথ ধরে যে সে ওখানে গেছে, আমি বুঝতেই পারছি না । যেন ভেলকি ! আমি এখন ভাল্লুকটার একেবারে নাগালের মধ্যে । এখান থেকে ছুটলেও আমার নিস্তার নেই ।

কিন্তু আশ্চর্য ! ভাল্লুকটার এখনই যা করা উচিত ছিল, সে তো তা করছে না ! কই, এক লাফে ছুটে এসে আমার গলাটা তো টিপে ধরছে না ! স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে খালি ! ও কি ভেবেছে, আমার এই যে ব্যানডুররিয়াটা, এটা কোনো মারাত্মক অস্ত্র ! ভেবেছে, এগিয়ে এলেই এটা দিয়ে ওর মুণ্ডুপাত করব । এ-কথা যদি ভেবে থাকে জন্তুটা আমার বাঁচোয়া ! এ-যাত্রা আমি রক্ষা পেলেও পেয়ে যেতে পারি । সুতরাং ভাল্লুকটাকে আরও বেশি করে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে আমার মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল । আমি ব্যানডুররিয়াটা চটপট বাগিয়ে ধরে ভাল্লুকটার দিকে ঠিক বন্দুকের মতো তাক করে উঁচিয়ে ধরলুম । ভাল্লুকটা কিন্তু ভয় পেয়ে পালাল না । এমন-কী, নড়েচড়ে ভয় পাবার ভাব-ভঙ্গিও করল না । আমি অবিশ্যি ঠিক অমনি করে ব্যানডুররিয়াটা উঁচিয়ে ধরে এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে লাগলুম । ভাল্লুকটা ট্যাঁও করে না, টুঁও করে না । আমার দিকে যেমন করে চেয়ে ছিল, তেমনিই চেয়ে রইল । আমি এতক্ষণ প্রায় নিঃসাড়ে পিছু হটছিলুম । যখন দেখলুম, ভাল্লুকটার সত্যিই কোনো সাড়া-শব্দ নেই, দে টেনে দৌড় ! ব্যাস, ছুটতে গিয়েই চিতপটাং । ঝোপের মধ্যে বেটপকা পায়ে কিছু জড়িয়ে গেল ! লাগল কি লাগল না সে-কথা ভাববার সময় কই ! সামনে সাক্ষাৎ যমদূত ! হাতের ব্যানডুররিয়াটা কোনোরকমে সামনে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম । এক বুক নিশ্বাস নিয়ে আবার ছুটতে গেলুম । পারলুম না । দেখলুম, যেদিক দিয়ে পালাবার ফাঁক খুঁজছি, ভাল্লুকটা এখন সেইদিকেই ঘাপটি মেরে বসে আছে ! আশ্চর্য !

ঠিক এইসময়ে আমার মনের অবস্থা যে কী, তা খুলে না-বললেও তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝে নিতে কষ্ট হবে না । আমি ভেতরে-ভেতরে এমন ভড়কে গেলুম যে, এখন কী করব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না । সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল । মনে হল, ভাল্লুকের খপ্পর থেকে রক্ষা পাওয়ার আর বোধহয় পথ নেই । আমি ভাল্লুকের ফাঁদে পড়েছি । ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়ে এমনি করে ছটফটিয়ে মরতে হবে । আর সে-মরণ যে কী কষ্টের, তা এখন কেউ না-বললেও, বুঝে নিতে কষ্ট নেই । কিন্তু সেভাবে তিলে তিলে আমি মরতে চাই না । তাহলে কী করা ? ভাল্লুকটার সঙ্গে লড়াই করব ? আমার বয়েসটা যদি ঠিক-ঠিক মনে করতে পারো, মনে করতে পারো—আমি তোমাদেরই মতো ছোট্ট, তবে নিশ্চিত জেনো, ভাল্লুকের সঙ্গে খালি হাতে লড়াই

করা আমার সাধ্যে কুলাবে না। ভাবো তো একবার ভাল্লুকের সেই দশাসই চেহারাটার কথা! উফ্! কী ভয়ংকর মূর্তি! সত্যি, যেন একটা কালো যম! এই গভীর জঙ্গলে, এমনি এক কেলেকিষ্টি যমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি ছোট্ট ছেলে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, এ-ছবিটা কল্পনা করলে, তোমার গায়ে কাঁটা দেবে না?

আপাতত আমি বন্দী। অর্থাৎ এই ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে পালাবার আমি আর কোনো উপায় দেখছি না। কেননা, ভাল্লুকটা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে স্থির নজর রেখেছে আমার ওপর। একেই বোধহয় বলে নজরবন্দী!

না, এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মানুষ! একটা কিছু করতেই হয়! এই কথা মনে হতেই, একটা দুরন্ত দুঃসাহস আমার বুকের ভেতরে নাড়া দিয়ে উঠল। আমি শেষমেশ ভাল্লুকটার দিকেই এগিয়ে গেলুম। বলে রাখা ভাল, আমার হাতের ব্যানডুর্‌রিয়াটাকে আর বন্দুক বানাতে সাহস হল না। ওটা যেমন বাজনা আছে, তেমনিই থাক। কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে, আমার শেষসময় বুঝি ঘনিয়ে এল! এই বুঝি ভাল্লুকটা লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে! শত্রুকে ঘায়েল করার এমন সহজ সুযোগ তার জীবনে বুঝি বা আর কোনোদিন আসেনি, আসবেও না।

কিন্তু ঠিক এইসময়ে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে ভাল্লুকটা কোথায় তেড়ে আসবে, তা নয়, পিছিয়ে যাচ্ছে। এ আবার কী ধরনের কৌশল! আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভাল্লুকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি পিছু হটলুম। ভাল্লুকটাও সামনে হেঁটে এল। আমি থামলুম। ভাল্লুকটাও থামল। আমি বাঁ দিকে গেলুম। ভাল্লুকটাও বাঁয়ে ফিরল। আমি ডাইনে হাঁটলুম। ভাল্লুকটাও ডাইনে হেলল। তাজ্জব ব্যাপার তো!

এখন আমার কী করা উচিত? মাথায় আসছে না কিছুই! নিস্তব্ধ চারিদিক। সেই নিস্তব্ধতারও একটা রহস্যময় শব্দ আমার কানে বাজছে। এখন জঙ্গলের সেই শব্দের সঙ্গে আমার বুকের ভেতরের ভয়ের শব্দটাও যেন একাকার হয়ে গেছে! অদ্ভুত একটা অবস্থা। সেই অবস্থায় নিশ্চুপ আর নিশ্চল হয়ে আমি ওই ভাল্লুকটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর আমার সঙ্গে তাল রেখে ভাল্লুকটাও দাঁড়িয়ে রইল অনড় হয়ে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড হয়ে গেল! হল কী, বেটপকা আমার হাত লেগে ব্যানডুর্‌রিয়ার একটা তার ঝন্ করে বেজে উঠল। চমকে গেল বোধহয় ভাল্লুকটা। সে একটু চনমন করে নড়ে-চড়ে উঠল। তার উৎসুক চোখ দুটো এখন আমার মুখের ওপর থেকে সরে ওই ব্যানডুর্‌রিয়াটার ওপর গিয়ে পড়ল। সে রেগে গিয়ে আমার হাতের এই বাজনাটা দেখছে, না, শব্দ শুনে অবাক হয়ে চেয়ে আছে, তা আমি কেমন করে বলি! কিন্তু ব্যানডুর্‌রিয়ার এই ঝন্ শব্দটা আমার এই মুহূর্তের ভয়ের ভাবনাগুলিকে কেমন যেন হালকা করে দিল নিমেষের মধ্যে। আমার তক্ষুনি মনে হল, এখন এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে না-থেকে, মরবার আগে, শেষবারের মতো ব্যানডুর্‌রিয়াটা বাজাতে তো পারি! তুমি হলে এ-অবস্থায় কী করতে জানি না। কিন্তু আমি বাজালুম। আমার সাধের এই বাজনাটা নিয়ে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার মায়ের গাওয়া সেই গানটির সুর বাজালুম। নিস্তব্ধ প্রকৃতির বুকের ওপর আমার বাজনার সুর কেমন এক অদ্ভুত শোনাচ্ছে! এ যেন আমি বাজাচ্ছি না। আমার হাত ধরে বুঝি বা অন্য কেউ বাজিয়ে দিচ্ছে। আমি চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছি আমার মাকে। দেখতে পাচ্ছি, আমার বাবাকে। মনে হচ্ছে, তাদের হাসি-হাসি মুখ দুটি আমার কপালের কাছে, একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছে। তাদের ঠোঁটগুলি এইমাত্তর যেন আমার কপাল ছুঁয়ে গেল। আমি চমকে উঠলুম। চমকে চেয়ে ফেলতেই আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। না, তারা কেউ নেই। আমার মা আমার বাবা কেউ-ই না।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলুম আর-এক দৃশ্য দেখে। দেখলুম, সেই ভাল্লুকটা আমার বাজনার তালে-তালে সামনের দু-পা ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে! নাচছে! এ কি বিশ্বাস করবার কথা? না সম্ভব? এ গভীর জঙ্গলের এক হিংস্র জীব তার শত্রুকে হাতে পেয়েও মারছে না, তারই বাজনার তালে নাচছে, এ-কথা বললে কোন্ মানুষ আমাকে

পাগল না বলে ! কিন্তু আমি যা স্পষ্ট দেখছি, তাকে মিথ্যে বলি কেমন করে ! আমি দেখছি, ভাল্লুকটা আমার বাজনার সুরে যেন বিভোর হয়ে গেছে ! এখন তাকে দেখলে মনে হয়, নাচ ছাড়া ও বুঝি জগতের আর কিছুই জানে না । আর ঠিক এই মুহূর্তে আমি ছাড়া এই বন্য-জন্তুটার বুঝি আর-কোনো বন্ধুই নেই ! আমারও এতক্ষণ ভাল্লুক নামে যে-জন্তুটাকে মনে হয়েছিল নৃশংস এক জীব, এখন তার নাচ দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছে, এই নিঃসঙ্গ, নির্জন বনে এমন চমৎকার বন্ধু বুঝি আর হয় না । কোথায় গেল আমার মরণের ভয় ! কোথায় গেল আমার বিপদের ভাবনা ! আমি এখন নিজেই নাচতে শুরু করে দিয়েছি । সে এক অদ্ভুত কাণ্ড ! এখন এই বনের ভাল্লুকের সঙ্গে ইসতাসি নামে এই ছোট্ট ছেলেটার নাচ দেখলে, তোমার মনে হতে বাধ্য, ইসতাসি নিজেই বুঝি এক বন্য প্রাণী !

কে জানত, ওই নৃশংস জীবটার সঙ্গে আমার এ আনন্দের উচ্ছ্বাস একটুক্ষণের জন্যে । কে জানত, এমন এক গভীর জঙ্গলে অমন অসতর্ক হয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে নেই । যে-কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে ! সত্যি বলতে কী, এমন আশঙ্কা আমার মনে একেবারেই আসেনি । আমি কেমন যেন সব ভুলে গেছি । ভাল্লুকটার নাচ দেখে, নিজেও নাচতে-নাচতে তার একদম কাছে চলে এসেছি । তারপরেই সব শেষ ! অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়ল আমার ঘাড়ের ওপর । চকিতে আমার দু-চোখ ভরে অন্ধকার নেমে এল । আমি পড়লুম, না, মরলুম, কিছুই জানি না ।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমি মরিনি । মরলে কি আর আমার এ-গল্প তোমরা শুনতে পেতে ! আমি আঘাত পেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম । পড়ে-পড়ে অচৈতন্য হয়ে ধুঁকছিলুম । আমার যখন চেতনা ফিরে এল, আমার চোখে তখন আলোর রোশনাইটা ভারী অসহ্য লাগছিল । ভাল করে চাইতে পারছিলুম না । সব যেন কুয়াশার মতো ঝাপসা । ভাবতে পারছি না কিছুই । যেন একটা জবুথবু জীবন্ত জঞ্জাল পড়ে আছি জঙ্গলে ।

একটু-একটু করে যখন আমার চোখের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, আমি ধীরে-ধীরে মনে করতে পারছিলুম আমার নিজের কথা, তখন যেন পর্দায় ভেসে ওঠা ছবির মতো আমার চোখে ফুটে উঠেছিল প্রথম সেই ভাল্লুকটার ছবি । আমি পরিষ্কার মনে করতে পারছি, তার সেই নাচের সেই উদ্ভট চেহারাটা ! সে নাচছিল আমার ব্যানডুর্‌রিয়ার সুরে তাল মিলিয়ে । আমি মনে করতে পারছি, এমনই সময়ে আমার ঘাড়ের ওপর কে যেন প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল । আমি কিছু খেয়াল করার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলুম । কিন্তু আমার শেষ মুহূর্তের শেষ দৃষ্টিটি ঠিক মনে করিয়ে দিচ্ছে, এ-আঘাত আমায় সেই ভাল্লুক করেনি । যে করেছে, তাকে আমার দেখতে পাওয়ার কোনো সুযোগই ছিল না । কারণ সে আমায় আক্রমণ করেছিল পিছন থেকে । আর আক্রমণ করেছিল এমনই অতর্কিতে যে, আমার তখন করার কিছুই ছিল না ।

হঠাৎ বুকটা চমকে উঠল । কে যেন আমার বুকের মধ্যে ধাক্কা মেরে ওতিয়ার মুখটা মনে পড়িয়ে দিল । আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলুম । আমার ব্যানডুর্‌রিয়াটা হাতের কাছে দেখছি না । কষ্ট হচ্ছে, তবু উঠে দাঁড়ালুম । খুঁজতে লাগলুম বাজনাটা । দেখতে পেলুম, একটু দূরে ছিটকে পড়ে আছে সেটা । আমি হন্তদন্ত হয়ে সেটা তুলে নিতে গিয়ে দেখি, ভাল্লুকটা আহত অবস্থায় শুয়ে আছে সেটার পাশে । তার সারা গায়ে ক্ষত । রক্ত । সে যেনআমারঅপেক্ষায় সেটা আগলে বেঁচে আছে । বুঝতে বাকি রইল না, সে কোনো হিংস্র জন্তুরসঙ্গে লড়াই করেছে । হয়তো আমাকে বাঁচাবার জন্যে । অথবা ব্যানডুর্‌রিয়াটা রক্ষা করতে । আমি তার কাছে ছুটে গেলুম । আমার দিকে ভারী করুণ দৃষ্টিতে চাইল সে । উঠে বসল । আমার চোখ থেকে তার চোখ সরিয়ে নিয়ে ওই সামনের ঝোপটার দিকে তাকাল । আঁতকে উঠলুম । দেখলুম, সেই ঝোপে একটা চিতা বাঘ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মরে পড়ে আছে । দেখে মনে হল, কিছুক্ষণ আগে বনের দুই জন্তুর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়ে গেছে এইখানে । গাছের ডালপালা ঝোপঝাড় ভেঙে ছড়িয়ে একেবারে ছয়লাপ ! বুঝতে পারলুম, এই চিতাটাই তখন আমায় আঘাত করেছিল । আর তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যেই ভাল্লুকটাও লাফিয়ে পড়েছিল তার ঘাড়ে । দেখে বুঝতে কষ্ট নেই, এ-লড়াইয়ে জিতেছে ভাল্লুকটা । চিতা মরেছে, আমি বেঁচেছি । সুতরাং এখন নিশ্চিত হয়ে গেছি ভাল্লুকটা আমার বন্ধু । আনন্দের উত্তেজনায় আমি ভাল্লুকটার গলা জড়িয়ে ধরলুম । তার ক্ষত জায়গাগুলিতে হাত বুলিয়ে দিলুম । সে উঠে দাঁড়াল । তাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে খুশির আনন্দে আমার বুকের ভেতরটা দুলে উঠল । সে হাঁটল । সেই মৃত চিতাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল । দেখল, বাঘটা সত্যি মরেছে কি না । ছিটকে-পড়া ব্যানডুর্‌রিয়াটা তুলে নিয়ে আমিও পৌঁছে গেলুম চিতাটার সামনে । বিশ্বাস করতে পারছি না, এখন আমি বনের এক দুর্ধর্ষ জীবন্ত প্রাণী ভাল্লুকের পাশে দাঁড়িয়ে আর-এক ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী চিতাবাঘের মৃতদেহটার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছি । চিতাটার একটা চোখ ফুটো হয়ে রক্ত গড়াচ্ছে । বুকের চামড়াটা ভাল্লুকের নোখের তীক্ষ্ণ আঁচড়ে দু-ফাঁক হয়ে ঝুলে পড়েছে । মনে হচ্ছে, কেউ যেন কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার বুকটা ফালা করে দিয়েছে । গায়ে কাঁটা দিল আমার । চিতাটাকে দেখতে-দেখতে তাচ্ছিল্যে চোখ ফেরাল ভাল্লুকটা । ঘুরে দাঁড়াল । আমায় দেখল । কী বুঝল জানি না । কিন্তু আমার মনে হল, ও যেন বলতে চাইছে, 'ভয় নেই ইসতাসি, আমি যতক্ষণ আছি তোমার গায়ে কেউ একটি আঁচড়ও কাটতে পারবে না ।'

আমার তখন বলতে ইচ্ছে করল, 'হে আমার প্রিয় ভাল্লুকবন্ধু, তোমার এই দয়ার কথা আমি কোনোদিনই ভুলব না । তুমি ছিলে বলেই আমি বেঁচেছি । তোমাকে দেখে আজ আমি ভাবতে পারছি, বনের হিংস্র প্রাণী শুধু মানুষের প্রাণ নেয় না, তাকে ভালওবাসে । দুঃখ এই, আমি তোমার এই ভালবাসার প্রতিদান তো কিছুই দিতে পারব না । এ-প্রতিদান আমি আমার মানুষবন্ধু ওতিয়াকেও যে দিতে পারিনি । হঠাৎই সে হারিয়ে গেল এই জঙ্গলে । তাকে আর খুঁজে পেলুম না । খুঁজতে-খুঁজতে আমি তোমার দেখা পেয়েছি । তুমি কি পারো না আমাকে একটু সাহায্য করতে ?'

আমার মনের এত কথা ভাল্লুক বুঝল কি না জানি না । আবার দু-পায়ে ভর দিয়ে আমার মুখের সামনে সে উঠে দাঁড়াল । চিতাকে খুন করার রক্তে তার পায়ের থাবাদুটো এখনও রাঙা হয়ে আছে । ধারালো নোখগুলো কী ভয়ংকর তীক্ষ্ণ । দু-পায়ের সেই থাবা দিয়ে আচমকা সে আমাকে জড়িয়ে ধরল । এবার বুঝি আমার পালা ! বুঝি আমার প্রাণ নেয় ! আমি আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠার আগেই, সে আমাকে নরম স্পর্শে বুকের মধ্যে টেনে নিল । সে-বুকে ভালবাসা, শুধু ভালবাসা ! আতঙ্ক নয়, আনন্দে চিৎকার করে উঠলুম আমি । তারপর তার বুকের ভেতরে হাবুডুবু খেতে-খেতে আমিও তাকে জড়িয়ে ধরার জন্যে আমার ছোট্ট দুটি হাত মেলে দিলুম । পারলুম না তাকে জড়িয়ে ধরতে । কারণ, বিরাট ওই জন্তুটাকে ধরার জন্যে আমার এই হাতদুটি নিতান্তই ছোট্ট । হেসে উঠলুম আমি । হাসতে-হাসতে ওর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি । আমার ব্যানডুর্‌রিয়ার তারে ঝংকার তুলে ভাল্লুকটাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছি । ভাল্লুকও ঘুরছে আমার সঙ্গে । হয়তো আমার ব্যানডুর্‌রিয়ার শব্দের তালে সেও দুলছে ! ভারী একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুচ্ছে এখন আমার ব্যানডুর্‌রিয়ার তারে, "জোরো—জোরো ।" বাজনার শব্দটাকে আমার মুখে লুফে-লুফে আমিও গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগলুম, "জোরো—জোরো ।" তখনই আমার মনে হল, আচ্ছা, ভাল্লুকটাকে যদি "জোরো" বলে ডাকি । মনে হতেই, ছুটতে-ছুটতে আমি ভাল্লুকটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লুম । গলা ছেড়ে ডাক দিলুম, "জোরো—"

দেখতে পেলুম, আমার ডাক শুনে ভাল্লুকটার ছোট্ট দুটো চোখ খুশিতে চকচক করছে । আমি আর একবার ডাকতেই সে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে আমার কাছে প্রায় লাফিয়ে ছুটে এল । আমি ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলুম । তারপর আমার মাথাটা ওর মাথায় ঠেকিয়ে ডাকতে লাগলুম, "জোরো, জোরো, জোরো ।"

ভাল্লুকটা হাঁপাচ্ছে । তার বুকের শব্দটা আমি শুনতে পাচ্ছি । তার নিশ্বাসে খুশির উত্তেজনা । সে-নিশ্বাস এত গরম !

৯

মনে হচ্ছে, কতদিন পরে তোমাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা

হল। এখন আমি অন্য এক ইসতাসি। ওই বনজঙ্গল পেরিয়ে আমি এখন শহরের মানুষ। ওই বন পেরিয়ে কেমন করে যে আমি শহরে এসেছি, সে আর এক গল্প। হ্যাঁ, আমার বন্ধু জোরোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। এখন সে-ই আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী। জোরোকে নিয়ে আমার আবার শুরু হয়ে গেছে পথে-পথে আর এক নতুন জীবন। ও নাচে, আমি বাজনা বাজাই। তোমরা শুনলে অবাক হবে, আমার এখন অনেক পয়সা। আর তা সব জোরোর জন্যে।

এখন যে শুধু জোরো আমার ব্যানডুর্‌রিয়ার তালে-তালে নাচে তাই নয়। খেলা দেখায়। অনেকরকম খেলার ভেলকি দেখাতে পারে সে। সামনের দু-পা উঁচিয়ে দাঁড়ানোটা তো সে টুসকি মারলেই করতে পারে। কিন্তু পেছনের পা শূন্যে তুলে, আর্চ হয়ে, মাথাটা নিচু করে সে যখন হাঁটে, দেখলে তোমার তাক লেগে যাবে। ওই অবস্থায় হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ এমন ভল্ট দেয় যে, দেখলেই হাততালি।

হ্যাঁ, এখন অনেক হাততালি আমার কপালে জুটছে। এখন যেন আমার আবার সেই যাযাবরের জীবন শুরু হয়ে গেছে। আমি এখন এক ভাল্লুক-নাচিয়ে যাযাবর। সত্যি বলছি, এই ব্যানডুর্‌রিয়া বাজিয়ে পথে-পথে আমি যে এইভাবে জোরোর নাচ দেখিয়ে বেড়াব এটা আমি কল্পনাই করতে পারিনি কোনোদিন। একদিন হঠাৎই ব্যাপারটা ঘটে গেল। সেদিন রাস্তার ধারে বসে নিজের খেয়ালেই আমি ব্যানডুর্‌রিয়াটা বাজাচ্ছিলুম। সেই বাজনার তালে-তালে এমন সব আজব কাণ্ড করছিল জোরো যে তাই দেখে আমি নিজেই তো থ। হঠাৎ দেখি, তার সেই আজব কাণ্ডকারখানা দেখতে-দেখতে একটি একটি করে অগুনতি লোক আমার সামনে এই পথের ওপর জমে গেল। জোরোকে দেখে তারা হেসে কুটোকুটি। আনন্দে লুটোপুটি। আমার বাজনার তালে তারাও নাচতে লাগল। চেঁচাতে লাগল, "বাহাবা! বাহাবা!" আর আমিও মনে-মনে জোরোকে বলতে লাগলুম, "বহুত আচ্ছা! বহুত আচ্ছা!"

হ্যাঁ, আমি এখন আর ভাবতেই পারি না, এই বন্য জন্তুটা একটা নৃশংস জানোয়ার। এখন আমার মনে হয়, বনের এই ভাল্লুকটা যেন আমার অনেক কাছের এক আপনজন। এই পৃথিবীতে ও জন্ম নিয়েছে বুঝি আমারই জন্যে। হয়তো তাই। এই জীবটা যদি না থাকত, ওই দুর্গম বনের বিপদ থেকে কে আমাকে রক্ষা করত! কিম্বা আজ আমাকে কে এত পয়সা দিত!

এখন আমার কত পোশাক হয়েছে। রঙের ছড়াছড়ি। লাল নীল হলদে সবুজ। কত রঙের পোশাক। যখন যেটা মন চায় পরি। আর পরতে-পরতে ভাবি, আমার সেই জঙ্গলের বন্ধু ওতিয়ার গাছপাতা-সাজানো সেই পোশাকের মতো আমার এই পোশাক কি অত সুন্দর!

হঠাৎ-হঠাৎই মনে পড়ে যায় আমার ওতিয়ার কথা। হঠাৎ-হঠাৎ তার সেই মুখের হাসিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার সেই গান, কিম্বা কলকল করে কথা বলার মিষ্টি শব্দগুলি আমার কানে বেজে উঠলে আমার অশ্রুর ফোঁটাগুলিকে আমি ধরে রাখতে পারি না। তখন আমায় দেখে এই বনের ভাল্লুকটা যে কী ভাবে জানি না। সে কী বুঝে যে এই সময়ে আমার হাতের ওপর তার মাথাটি এগিয়ে দেয়, তা-ও আমি জানি না। শুধু আমার চোখের জল সামলে নিয়ে আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। আর অস্পষ্ট গলার স্বরে বলি, "পারিস না তুই ওতিয়াকে খুঁজে দিতে? পারিস না আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে?"

আমার ইচ্ছে আছে একটা গাড়ি কিনব। ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। একটা-একটা করে এখন এতসব জিনিসপত্তর জমে গেছে যে, আর গাড়ি না-হলেই নয়। আমার পিঠে বাঁধা এই ব্যাগটা আর কাজে আসছে না। তাছাড়া পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে মুসাফিরের মতো ঘোরাঘুরি করতেও বেশ ঝামেলা। আমার এই তাঁবুটাই দ্যাখো কী ভারী! অবিশ্যি তাঁবুটা জোরোই পিঠে নিয়ে বয়ে চলে। দরকারমতো খাটিয়ে নিতে আমার তেমন কষ্ট হয় না।

আমি যে ঘোড়ায়-টানা গাড়ির কথা বলছি, সেই গাড়িগুলো দেখতে কিন্তু দারুণ। টায়ার-আঁটা চারটে চাকার ওপর ফ্রেমে এঁটে কে যেন একটা বাক্স বসিয়ে রেখেছে। এতে যত খুশি জিনিসপত্তর তো রাখতে পারোই, তার ওপরে বেশ গুছিয়ে বিছানা পেতে ঘুম দিতেও দিব্যি আরাম। গাড়ির দরজাটা পেছনদিকে। ওই তোমাদের পুলিশ-ভ্যানে যেমন থাকে আর কী! সামনে বসে তুমি গাড়ি চালাও গড়গড়িয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে। ছোটো এক দেশ থেকে আর-এক দেশে! তবে জোরোকে নিয়ে মুশকিল আছে। গাড়ির ভেতরে তো আর সে ঢুকতে পারবে না। যা কুঁদো! অবিশ্যি গাড়ির চালের ওপর ইচ্ছে করলেই জোরো উঠে পড়তে পারবে। চালে বসেই সে দেশে-দেশে ঘুরতে পারবে।

কদিন হল আমি এক কারনিভলে জোরোর খেলা দেখাতে এসেছি। এ যেন নানান খেলার মজার মেলা। যত পারো আনন্দ করে নাও। একটা মস্ত মাঠে কারনিভল সাজিয়ে কত খেলাই না দেখানো হয়। এখানে ম্যাজিক দ্যাখো, ভেলকি দ্যাখো, গান শোনো, নাচ দ্যাখো—যা খুশি তাই। ইচ্ছে করলে ওই জায়েন্ট হুইলে চড়ে যত খুশি চরকি খেতে পারো। মেরি-গো-রাউণ্ডে ঘুরপাক খাও। মিনি-রেলে চেপে যেখানে খুশি চলে যাও। আমিও এসেছি এখানে। আমি জানতুম, এখানে জোরোর খেলা দেখিয়ে আর আমার ব্যানডুর্‌রিয়া শুনিয়ে বেশ কিছু পয়সা হবে। গাড়িটা তো কিনতে হবে!

কিন্তু আমি যা ভাবতে পারিনি এ যে তাই হল। জোরো যে এত তাড়াতাড়ি সবার এমন প্রিয় হয়ে উঠবে, এ যে আমার কল্পনার বাইরে। কারনিভলের সব ভিড় যেন উপচে পড়ছে জোরোর খেলা দেখবার জন্যে। কারনিভল জুড়ে অত যে সব মজার কাণ্ড, সেদিকে কেউ ছোটে না। ছুটে আসে আমার দিকে। খেলা দেখাব কী, ভিড় সামলাতেই হিমশিম। আর তারপরেই হল উলটো বিপত্তি! অন্য যারা খেলা দেখাতে এসেছে, তারা আমার ওপর ভীষণ চটিতং! আমার ওপর ভীষণ হিংসে! বটেই তো! ব্যবসা করতে এসে মার খেলে, কার আর মন-মেজাজ ঠিক থাকে বলো! সুতরাং আমি যাতে পাততাড়ি গুটিয়ে মানে-মানে কেটে পড়ি তার জন্যে কুচক্রীরা ফন্দি আঁটতে বসল। কে জানে, হয়তো আমায় মেরেই বসে।

কথাটা কানে এল আমার আজ। আমার এত যে উৎসাহ, এত যে খুশি, সব যেন চুপসে গেল নিমেষে! দুঃখে মনটা মুষড়ে পড়ল। আমি যেন কেমন হতাশ হয়ে পড়লুম। কী করব এবার?

যখনই আমার মনটা এমনি দুঃখ আর হতাশায় ভেঙে পড়ে, তখনই যেন আমার কানে-কানে কে বলে যায়, "ভেঙে পড়ছ কেন ইসতাসি? ওই তো তোমার বন্ধুটি সঙ্গে রয়েছে! তোমার ব্যানডুর্‌রিয়া। ওর তারে তোমার হাতের আঙুলগুলি আলতো ছোঁয়ায় টান দাও, তোমার সব দুঃখ শেষ হবে।"

আমি তখন সত্যিই ব্যানডুর্‌রিয়াটা হাতে তুলে নিই। বাজাই। আজও তাই খেলার শেষে তাঁবুতে ফিরে, হাতে তুলে নিলুম আমার ব্যানডুর্‌রিয়া। তার একটি-একটি তারে ঝংকার টেনে ভাবতে লাগলুম, সত্যি ভারী প্রিয় আমার এই বন্ধুটি। কত গভীর সঙ্কট থেকে সে আমাকে রক্ষা করেছে। কত মৃত্যুর হাত থেকে সে আমাকে বাঁচিয়েছে। আর এই বাজনাটার জন্যেই তো আজ আমি জোরোকে পেয়েছি। জঙ্গলের অন্ধকার থেকে কুড়িয়ে পাওয়া এক আশ্চর্য ভাল্লুক! আর ওতিয়া?

এখন রাত। ব্যানডুর্‌রিয়ার তারে-তারে সুর বেজে ওঠে আমার হাতের স্পর্শে। আমার গলা গেয়ে ওঠে ওতিয়ারই সেই গান:

দুঃখ কিসের বন্ধু
আমি তো আছি,
তোমারই যে পাশে-পাশে
এত কাছাকাছি।

গাইতে-গাইতে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি এই মুহূর্তে। আমার গানের শব্দগুলি ভারী ধীরে-ধীরে এই রাতের অন্ধকারে গুনগুনিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। মনে পড়ে যায়, আমার সেই ফেলে-আসা দিনগুলির কথা। আমার মা, আমার বাবা, আমাদের সেই দল। মনে পড়ছিল, সেই ভয়ংকর রাতের কথা। সেই রাতে প্রথম মায়ের গানের সঙ্গে ব্যানডুর্‌রিয়া বাজাচ্ছিলুম আমি। তারপর সেই বন্দুকের গুলি।

বোমা, পিস্তল, পুলিশ। তারপর আনাতিদাদার সঙ্গে—
"ইসতাসি !"
"কে !" আমি চমকে উঠলুম। আমার গান স্তব্ধ হয়ে গেল।
"ইসতাসি !"
আমি তাঁবুর বাইরে ছুটে এলুম।
"ইসতাসি !"
অত্যন্ত চেনা গলা আমার ! অথচ অন্ধকার রাতে আমি তখনও ভাল করে চিনতে পারিনি। তাই ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলুম, "কে ?"
"আমি।"
হঠাৎ আমার চোখের ওপর একঝলক আলো কে যেন ছুঁড়ে দিল। আমি দেখতে পেয়েছি। আমি চিনতে পেরেছি। আমি চিৎকার করে উঠেছি, "আনাতিদাদা— ।" ছুটে গেলুম তার কাছে। জড়িয়ে ধরলুম। কেঁদে ফেললুম। তারপর দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলুম না।
আনাতিদাদাই প্রথমে কথা বলল, "এতদিন কোথায় ছিলি ইসতাসি ?"
উপছে-পড়া চোখের জল সামলাতে-সামলাতে আমিও জিজ্ঞেস করলুম, "তুমিই-বা কোথায় ছিলে আনাতিদাদা ?"
আমার মুখের দিকে চাইল আনাতিদাদা। তারপর বলল, "জেলে।"
আমি শিউরে উঠলুম।
"পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলুম। ওরা আমার পায়ে গুলি মেরে আমায় কাবু করে ফেলে। তারপর ধরে নিয়ে যায়।"
আমি বুঝতে পারলুম, আনাতিদাদার সেই গুরুগম্ভীর গলার স্বর কেমন যেন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। সেই ক্ষীণস্বরে আনাতিদাদা আবার বলল, "কদিন আগে ছাড়া পেয়েছি। পয়সা নেই। তাই কারনিভলে ম্যাজিক দেখাতে এসেছি। আর তেমন পারছি না। শরীরটা গেছে। পায়ে গুলি লেগে যে ঘা হয়েছিল, সেটা বিষিয়ে গেছে। তাই আমার ম্যাজিক দেখার লোকই নেই। তার ওপর শুনলুম, একটি ছোট্ট ছেলে ভাল্লুক-নাচ দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। এই কারনিভলে লোকে দল বেঁধে তার খেলাই দেখতে ছুটছে। অন্যের খেলা কেউ দেখছে না। আমার কৌতূহল হল, কে ছেলেটি ! কী এমন খেলা ! দেখতে গেলুম। দেখে চমকে উঠলুম। এ যে ব্যানডুর্‌রিয়া হাতে আমার ইসতাসি ! আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম। কিন্তু না, তখন আর কিছু করিনি। শুধু চুপিচুপি ইসতাসির আস্তানাটা খুঁজে বার করেছি। ইসতাসিকে অবাক করে দেব বলে এই অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে এখন এসেছি। এসে দেখছি, আমার চেয়েও এক বড় জাদুকরকে।" বলে আনাতিদাদা আমার মাথায় হাত রাখল। আমায় কাছে টেনে নিয়ে আদর করে চুমু খেল। তারপর হাঁপাতে লাগল। আমার মনে হল, আনাতিদাদার হাত-পাগুলো থরথর করে কাঁপছে। আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার কষ্ট হচ্ছে, আনাতিদাদা ?"
"কই ? না।"
আমি বুঝতে পারলুম, আনাতিদাদা দাঁড়াতে পারছে না। তার পিঠে-বাঁধা ম্যাজিকের ঝুলিটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে বললুম, "এসো, এসো, ভেতরে এসো।"
"হ্যাঁ, তাই চ। একটু বসে যাই।"
ভেতরে এল আনাতিদাদা। তাঁবুর ভেতর জ্বলন্ত আলোয় আনাতিদাদার মুখখানা ভাল করে দেখে আমি শিউরে উঠলুম। "তোমার এ কী চেহারা হয়েছে আনাতিদাদা ?"
"আর বাঁচব না বেশিদিন।"
"ও-কথা বোলো না আনাতিদাদা।"
"গুলির বিষে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে গেছে যে !"
হাঁটুর ওপরে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা জায়গাটা আনাতিদাদা দেখাল।
আমি জিজ্ঞেস করলুম, "এখন কোথায় আছ ?"
"পথে।" বলেই হেসে উঠল আনাতিদাদা। হাসি দেখে বুঝতে কষ্ট হল না, আনাতিদাদার কিছুই নেই।
আমি বললুম, "আর পথে-পথে তোমায় ঘুরতে হবে না আনাতিদাদা। আজ থেকে মনে কোরো, আমার তাঁবুই তোমার নিজের তাঁবু।"
"ইসতাসি !" বুকের ভেতর থেকে একটা চাপা আনন্দে আমার নাম ধরে ডাক দিল আনাতিদাদা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার চোখের দিকে চাইল। ভারী নিশ্চিন্ত সেই চাউনি।
আমি আবার বললুম, "তোমাকে আমি যেমন করেই হোক ভাল করে তুলব, আনাতিদাদা।"
"কী করে পারবি ?"
"যেমন করে তুমি পেরেছ আমাকে ব্যানডুর্‌রিয়া শেখাতে।"
"হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছিলুম তোর বাজনা। এখন কী চমৎকার বাজাস !" বলতে-বলতে একঝিলিক মুচকি হাসি আনাতিদাদার ঠোঁটে ঢেউ খেলে গেল। আমি দেখলুম, সে-হাসিতে জৌলুস নেই। যেন কষ্ট মেশানো।
আমি বললুম, "আনাতিদাদা, বিছানায় শুয়ে পড়ো। তোমার কষ্ট হচ্ছে।"
আনাতিদাদা বললে, "না, তেমন না। তবে শুতে আপত্তি নেই।"
আমার খাবারের কৌটোতে দুধ আর রুটি ছিল। এনে বললুম, "খেয়ে নাও।"
"তোর ?"
"আমি খেয়েছি।"
"না কি লুকোচ্ছিস ?"
"তোমাকে কখনও মিথ্যে বলিনি আনাতিদাদা।"
"তাহলে খেতে পারি, দে !"
আনাতিদাদা দুধ আর রুটি খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করলে, "গান শিখলি কোথায় ?"
"নিজে-নিজে।"
অবাক হল আনাতিদাদা, "বলিস কী ! নিজে-নিজে এত সুন্দর শিখেছিস ?"
"সব তো তোমারই জন্যে।" আমি উত্তর দিলুম।
"ভাল্লুকটা ? কিনেছিস ?"
"না।"
"তবে ?"
"জঙ্গল থেকে পেয়েছি।"
"হঠাৎ-হঠাৎ এমন সব আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যায়, ভাবাই যায় না।"
আমি বললুম, "তোমার সঙ্গেও দ্যাখো, হঠাৎ কেমন দেখা হয়ে গেল। এও তো এক আশ্চর্য ঘটনা।"
আনাতিদাদা উত্তর দিল, "আশ্চর্য তো বটেই। কেননা, আমার ঠিক মৃত্যুর আগে, আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি।"
আনাতিদাদার কথা শুনে আমার বুকটা ছ্যাঁত করে চমকে উঠল। আমি বললুম, "ও-কথা কেন বলছ আনাতিদাদা ? তুমি মরবে কেন ? কে তোমাকে মরতে দেবে ?"
আনাতিদাদা আমার মুখের দিকে চাইল। আমার একটা মস্ত বড় ছায়া তাঁবুর গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার সেই ছায়ার মতো, আনাতিদাদাও নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ !
হঠাৎ আমিই সেই নিস্তব্ধতা ভাঙলুম। বললুম, "ঘুমিয়ে পড়ো।"
আনাতিদাদা জিজ্ঞেস করলে, "তোর বাজনাটা কই ?"
"শুনবে ?"
"শুনব। বাজনার সঙ্গে তোর গান।"
আমি গাইলুম। অবাক হয়ে আমার গান শুনতে-শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ল আনাতিদাদা। তার ঘুমে-নিজঝুম মুখখানি দেখতে-দেখতে কত কথাই না মনে পড়ে যায়। মানুষটার সেই লোহার মতো শক্ত-পুরুষ্টু চেহারাটা যেন ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে। এই এতখানি চওড়া বুক, সেই শক্ত দুটি হাত, সেই জীবন্ত দুটি চোখ, সবই যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। একটা হাড়-জিরজিরে মানুষের কঙ্কাল যেন আনাতিদাদা। বড় কষ্ট হল। মনে-মনে ভাবলুম, এমন একটা নির্দোষ মানুষকে গুলি মারতে হাত কাঁপল না !
সকালে ঘুম ভাঙল যখন, আনাতিদাদাকে বললুম, "আজ থেকে তোমাকে আর কষ্ট করে ম্যাজিক দেখাতে হবে না। তুমি তাঁবুতে শুয়ে থাকো। খেলা দেখাব আমরা, আমি আর জোরো। পয়সা আনব। তোমাকে আবার আগের মতো ভাল করে তুলব। শুরু করব নতুন

জীবন। একটা গাড়ি কিনব। গাড়ি করে দেশে-দেশে ঘুরব। তুমি ম্যাজিক দেখাবে। জোরো নাচের ভেলকি দেখাবে। আমি গান গাইব, ব্যানডুর‍্রিয়া বাজাব।"

শুধুই হাসল আনাতিদাদা। কথা বলল না। উঠতেও পারল না। বোধহয় বন্দুকের গুলি খাওয়া বিষাক্ত ঘা আরও বিষিয়ে উঠেছে আজ। বোধহয় ব্যথাটা বেড়েছে।

১০

আরও সাত দিন কারনিভল এখানে থাকবে। আরও সাত দিন আমি আর জোরো কারনিভলে খেলা দেখাতে পারব। আরও সাত দিনে আরও পয়সা হবে। আজও যেমন হল।

আজ অবিশ্যি একটা ভারী মজার ব্যাপার হয়ে গেল। খেলার শেষে সব লোকজন চলে গেলে, আমিও যাব বলে গোছগাছ করছি, হঠাৎ দেখি একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। সে আমার ব্যানডুর‍্রিয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। প্রথমটা তেমন গা করিনি। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন দেখলুম, তার সেই দৃষ্টি একইভাবে অবাক হয়ে আছে, তখন কেমন সন্দেহ হল। আমি তাকে ডাকলুম। জিজ্ঞেস করলুম, "অমন অবাক হয়ে কী দেখছ?"

সে প্রস্তুত ছিল না। একটু থমকে গেল। তারপর বলল, "বাজনা।"

আমি বললুম, "ওঃ! বাজাতে ইচ্ছে করছে?"

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল।

আমি বললুম, "বেশ তো, বাজাও।"

ছেলেটি ব্যানডুর‍্রিয়ার তারে হাত দিল। বেজে উঠল টুং-টাং-টুং।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তোমার নাম কী?"

সে বলল, "জুতসু।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কোথা থাকো তুমি?"

সে বললে, "এখানে, এই কাছেই। দিদি নাচ দেখাতে এসেছে কারনিভলে।"

"তুমিও নাচতে পারো বুঝি?"

"ধ্যাত!" ছেলেটি লজ্জা পেল। বলল, "নাচি না, দিদি নাচে। আমি তালি বাজাই।"

আমি হেসে ফেললুম। একটু জোরেই হেসেছি। আর ঠিক তক্ষুনি কোথা ছিল ছেলেটির দিদি, দৌড়ে এসে গম্ভীর গলায় ডাকল তার ভাইকে, "জুতসু।"

ভাই চমকে চাইল।

দিদি ধমকে উঠল, "এখানে কী করছিস?"

"বাজনা বাজাচ্ছি।"

"শিগগির আসবি!"

"একটু পরে যাচ্ছি।"

গলাটা আরও একটু চড়িয়ে দিদি বলল, "এক্ষুনি আসবি।"

ছেলেটা যাচ্ছে না দেখে আমি বললুম, "এখন যাও, পরে এসো।"

চলে গেল জুতসু নামে ছেলেটি। আমি জানি না তারপরে কী হল। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবতে বসলুম, ছেলেটির দিদি অমন তিরিক্ষি মেজাজে কথা বলল কেন! ও তো কোনো দোষ করেনি!

দেখি, ছেলেটি পরেরদিনও এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "আবার এলে? দিদি বকবে না?"

সে বলল, "দিদিকে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

আমি বললুম, "লুকিয়ে? ঠিক করোনি।"

সে বলল, "তোমাকে আমার ভাল লাগে।"

"কেন?"

"তুমি খুব ভাল। কী সুন্দর বাজনা বাজাও তুমি। আমি রোজ শুনি। এটা কী বাজনা?"

"ব্যানডুর‍্রিয়া।"

"আমায় শিখিয়ে দেবে?"

"দিদির নাচের সঙ্গে বাজাবে বুঝি?"

"ধ্যাত! ওই আবার নাচ! কেউ দেখেই না। সক্কলে তোমারই বাজনা শোনে আর ভাল্লুকের খেলা দেখে। তোমার ওপর দিদির কী রাগ।"

ছেলেটির এই কথা শুনে আমি একটু থতমত খেয়ে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, "কেন?"

সে বলল, "দ্যাখোনি, খবরের কাগজে তোমার নাম বেরিয়েছে?"

আমি বললুম, "আমি জানি না তো।"

"দেখে দিদির গা জ্বলে গেছে। আর যারা খেলা দেখাতে এসেছে, তাদের কী হিংসে তোমার ওপর। কেউ পয়সাই পাচ্ছে না।"

আমি বললুম, "এতে আমার কী দোষ। আমিও তো পয়সা উপায় করতে এসেছি। আমাকে পয়সা উপায় করতেই হবে। আমার আনাতিদাদার খুব অসুখ। তাকে যে আমায় ভাল করতে হবে।"

ঠিক এই সময়ে ছেলেটির দিদি আচমকা এসেছিল। আমি বুঝতেই পারিনি সে এসেই আমার সঙ্গে চোটপাট শুরু করে দেবে। সে হঠাৎই এসেছিল ঝড়ের মতন। ঝড়ের মতন ঝাঁকিয়ে উঠে সে বলেছিল, "আমি পছন্দ করি না, তুমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বল। তোমার মতলবটা কী, তা আমার জানা আছে।"

আমি বললুম, "কী জানো? আমি জানতে পারলে খুশি হব।"

ছেলেটির দিদি আরও রেগে উঠল। প্রায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, "আমিও জানতে পারলে খুশি হব, ওর কানে তুমি কী মন্ত্র দিচ্ছ!"

আমি বললুম, "জুতসু আমাকে ভালবাসে।"

সে বলল, "আমি তোমাকে ঘৃণা করি।"

আমি থমকে গেলুম। আর কথা বলা যায়! এমন কথা যার মুখ দিয়ে বেরোয়, তার সঙ্গে কথা না-বলাই ভাল। দেখতে পেলুম, ছেলেটির মুখখানি ভারী করুণ হয়ে আছে আমার দিকে চেয়ে। আমার কেমন মায়া লাগল। আমি তাকে বলতে পারলুম না, তুমি আর এসো না আমার কাছে। দিদিই তার হাত ধরে টান দিল। হেঁচকা মেরে বললে, "ফের যদি এখানে আসবি, পুঁতে ফেলব!"

ছেলেটি শেষবারের মতো আমার দিকে চাইল। তারপর দিদির সঙ্গে চলে গেল।

মনটা ভারী খারাপ লাগছে আজ। তাঁবুতে ফিরে দেখি, আনাতিদাদা আরও কাহিল হয়ে পড়েছে। অন্য দিন খুশিতে উছলে আমি তাঁবুতে ফিরি। আজ ওইরকম একটা কাণ্ড ঘটে যেতে স্বাভাবিকভাবেই আমার সে-খুশি মুখ থেকে মুছে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও নিজের দুঃখটা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারলুম ন। ধরা পড়ে গেলুম আনাতিদাদার কাছে। অবাক হয়েই আনাতিদাদা জিজ্ঞেস করলে, "ইসতাসির মুখখানা আজ অমন শুকিয়ে কেন? কী হয়েছে?"

আমি বললুম, "এমনি।"

"একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে হাসি নেই কেন ইসতাসির মুখে?"

আমি বললুম, "ভাবছি, কারনিভলে আর খেলা দেখাব না। চলে যাব। আমার জন্যে সক্কলের ক্ষতি হচ্ছে।"

"কী ক্ষতি?"

"সক্কলে আমার খেলাই দেখে। ওদের খেলা দেখতে লোক হয় না।"

আনাতিদাদা রুগ্‌ণ হাতটা এগিয়ে আমার মুখটা তার চোখের কাছে টেনে নিয়ে বললে, "ছিঃ! ছিঃ! ইসতাসি হেরে গেল!"

আমি বললুম, "ওরা আমায় ঘৃণা করে।"

"না, তোকে হিংসে করে।"

আমি চুপ করে গেলুম। আমায় চুপ থাকতে দেখে আনাতিদাদা বললে, "আমার জন্যেই তোকে এমন হেনস্তা হতে হচ্ছে।"

"কে বলল তোমার জন্যে?" আমি প্রায় রেগে চিৎকার করে উঠেছিলুম। নিজেকে সামলে নিলুম। বললুম, "আনাতিদাদা, কেউ আমাকে হেনস্তা করল, কি ঘৃণা করল তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে প্রস্তুত। তোমাকে ভাল হতে হবে আনাতিদাদা। আবার সেইরকম সাহসী, শক্ত-সমর্থ মানুষের মতো হাত ধরে তুমি আমায় নিয়ে যাবে দেশে-দেশে। আমি ব্যানডুর‍্রিয়া বাজিয়ে গান শোনাব। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে সকলকে বলব, "আমার এই আনাতিদাদার কাছে আমি শিখেছি ব্যানডুর‍্রিয়া বাজাতে।"

আমি দেখতে পেলুম, আনাতিদাদার চোখের পাতাদুটি ভারী ছটফট

করে ওঠা-নামা করছে। সেই আধো-আলো, আধো-ছায়াতে আমি দেখতে পেলুম না সেই চোখের পাতায় কোনো কান্নার ফোঁটা দুলে উঠছে কি না! সত্যি বলতে কী, সেই কান্না আমি দেখতে চাই না। আমি চাই, আনাতিদাদা হেসে উঠুক। তার একবুক হাসি হা-হা-হা করে উপচে আমাকে বলুক, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ভাল হব আবার। আমার শক্ত হাতখানা তোর হাতের ওপর রাখব। তারপর দু-জনায় ছুটে যাব পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। সঙ্গে যাবে জোরো, এই ভাল্লুক আর এই ছোট্ট তাঁবুটা। আমরা সারা দুনিয়ায় আনন্দ বিলিয়ে বেড়াব। শুধু আনন্দ। যে-আনন্দ মানুষকে দুঃখ ভোলায়!

কিন্তু কিছুই বলল না আনাতিদাদা। চেয়েই রইল। ভারী শূন্য সেই চাউনি।

আজও আমি কারনিভলে এসেছি। আজও জোরোর খেলা দেখাতে হবে আমায়। কেননা, আজ এই শহরের মেয়র আসবেন কারনিভলে। তিনি কারনিভল দেখবেন। দেখবেন, হাসি-হল্লা খুশি-মজার মেলা। আজ তাই কারনিভলের এই মস্ত চত্বরটা ঝাড়পোঁছ করে ধুলো-জঞ্জাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে। নতুন করে সাজানো হয়েছে কারনিভল। কত রঙচঙে বেলুন উড়ছে। কত রঙিন পতাকা। রঙ-ঝলমল কাগজের ফুল। আর কত আলোর বাহার। আসলে কালকের ওই ঘটনার পর থেকে মনটা আমার এমন মুষড়ে আছে যে, কিছুই যেন ভাল লাগছে না। তবু ব্যানডুর্‌রিয়া বাজাতে হবে। তবু জোরো খেলা দেখাবে।

মেয়র যখন এসেছিলেন, তখন সন্ধে পার হয়েছে। তিনি এসেছিলেন একা নয়, সঙ্গে আরও কত লোক। সন্ধ্যার কারনিভল জমজমাট। বুঝতেই পারছ, মেয়রকে খুশি করবার জন্যে, সবাই তাদের সব-সেরা খেলাগুলি দেখাচ্ছে আজ। সব-সেরা মজা।

একটি-একটি মজা দেখার জন্যে তিনি এক-এক জায়গায় দাঁড়ান। একটু মাথা হেলান, একটু খুক করে কাসেন, তারপর হাঁটেন। এমনি করে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি আমার খেলার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার ব্যানডুর্‌রিয়া বেজে উঠল। আমার ভাল্লুক মেয়রকে দেখেই ভল্ট মারল। মেরেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মেয়রকে সাল্যুট করল। সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিক থেকে হাততালি। তারপর জোরো মাথায় একটি রঙিন ছাতা দিয়ে, শূন্যে তারের ওপর হাঁটতে-হাঁটতে একবার এ-পাশ থেকে ও-পাশ আবার ও-পাশ থেকে এ-পাশে এল। তারের ওপর জোরোর এ এক আশ্চর্য ব্যালেন্সিং-এর খেলা। আমার ব্যানডুর্‌রিয়া সেই ব্যালেন্সিং-এর তালে-তালে বেজে ওঠে। হাততালি, শুধু হাততালি। মেয়রসাহেব কিন্তু হাতে তালিও মারেন না, মুখে হাসিও আনেন না। গম্ভীর হয়ে দেখেন। যেন পাথর-কাটা মূর্তি।

দেখতে-দেখতে মেয়রসাহেব তাঁর পাশের লোককে ইশারায় কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে কী যেন বললেন। পাশের লোকটি আমার কাছে এল। একে মেয়রসাহেবের মুখখানা অমন গম্ভীর, তার ওপরে তাঁর একজন পার্শ্বচর যখন আমার কাছে এসে দাঁড়াল, তখন আমার ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। এবার বোধহয় সাহেব নিজেই আমাকে এখান থেকে চলে যাবার ফরমান জারি করবেন। কিন্তু না। তাঁর পার্শ্বচর গলার স্বরটা একটু উঁচিয়ে, সবাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওহে ভাল্লুক-নাচিয়ে, তোমার নাম কী?"

আমি ধরা-ধরা গলায় বললুম, "ইসতাসি।"

আবার সেই ব্যক্তিটি চিৎকার করে বললে, "ইসতাসি, তোমার ভাল্লুকের খেলা দেখে আর তোমার অদ্ভুত বাজনা শুনে মাননীয় মেয়র অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।"

আমি মেয়রকে উদ্দেশ করে মাথা নোয়ালুম।

পার্শ্বচর আবার বলল, "মাননীয় মেয়র মনে করেন, এখানে যতরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, তার মধ্যে তোমার খেলাই সব-সেরা।"

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আবার মাথা নিচু করলুম। আবার হাততালি।

"তাই মাননীয় মেয়র তোমার এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তোমাকে একটি উপহার দিতে চান।"

উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। দেখতে পেলুম মেয়রসাহেব আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তেমনি গম্ভীর তিনি। তেমনি চুপচাপ।

আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এখন তিনি আমাকে দেখে একটু মুচকি হাসলেন। তারপর আমার কাঁধে হাত রাখলেন। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "শাবাশ।" বলে তিনি পকেটে হাত পুরলেন। একটি সোনার মেডেল বার করে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন।

এতক্ষণ থমথম করছিল চারিদিক। সবার মুখে কী-হয় কী-হয় ভাব। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমার গলায় মেডেল ঝিকমিকিয়ে উঠল, সকলের মুখে সে কী খুশির হল্লা। আমি হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালুম। তিনি আমায় দু-হাত দিয়ে তুলে নিলেন। তারপর আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "এমনি করে সবাইকে আনন্দ দাও।" বলে তিনি যেমন করে এসেছিলেন, তেমনি করে চলে গেলেন। আমি হতবাক।

আমার খেলার চারিপাশে যত লোক জমায়েত হয়েছিল, তারা সবাই চিৎকার করে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমি হাত তুলে সে-অভিনন্দন গ্রহণ করছি। হঠাৎ দেখি, জুতসু। কোথা ছিল? ওই অত লোকের ভিড়ে ঠেলে, একেবারে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে। সে কী আনন্দ তার! যেন তারই কেউ আপনজন এই সোনার মেডেল জয় করেছে। আমি তাকে দেখে, এত আনন্দেও শিউরে উঠলুম। এই বুঝি তার দিদি এসে পড়ে। এই বুঝি লাগিয়ে দেয় চেঁচামেচি। রক্ষে, তার দিদি এল না।

আমি এবার জোরোকে নিয়ে প্রায় লাফাতে-লাফাতে তাঁবুর দিকে ছুটলুম। এখন আনাতিদাদা একা আছে তাঁবুতে। দেখে এসেছি তার শরীরটা আজ আরও খারাপ। কী খুশিই-না হবে আনাতিদাদা। আমার এ-জয় তো তারই জয়। তাঁবুতে ফিরেই ঐ সোনার মেডেল তারই গলায় আমি পরিয়ে দেব। তারপর আনাতিদাদার বুকের ওপর মাথা রেখে বলব, "আজ আমি জিতেছি আনাতিদাদা, আমি জিতেছি।"

কিন্তু বলতে পারলুম না। কেননা, তাঁবুতে ফিরে দেখি, আনাতিদাদা নেই! প্রথমটা ভেবেছিলুম, বুঝিবা আনাতিদাদা এদিক-ওদিক কোথাও আছে। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও নেই! সবদিক আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও যখন দেখতে পেলুম না তখন ডাক দিলুম, "আনাতিদাদা, আনাতিদাদা।" সাড়া পেলুম না। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। তবে কি আনাতিদাদা চলে গেল। হঠাৎ-ই আনাতিদাদার ম্যাজিকের ব্যাগটা আমার নজরে পড়ে গেল। কিন্তু ওটা কী! রিভলভারটা বাইরে কেন! হাতে তুলে নিলুম। এ কী! রিভলভারটার সঙ্গে একটা চিঠি! চিঠিতে লেখা:

প্রিয় ইসতাসি,

আমি চলে যাচ্ছি। আমার মৃত্যুর দিন যখন এগিয়ে আসছে, তখন তোমাকে কষ্ট দিতে আমি খুবই ব্যথা পাচ্ছি। আমার মৃত্যুর আগে এই যে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হল, এই যে তোমাকে শেষবারের মতো দেখতে পেলুম এই তো আমার জয়। আমার ব্যাগভর্তি ম্যাজিক আর রিভলভারটা দিয়ে গেলুম। রিভলভারে একটাই গুলি আছে। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করার আগে ওটা মাটির তলায় পুঁতে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তোমার কাছেই থাক। বলা যায় না, কোনোদিন কাজে লেগে যেতে পারে। সুখী হও।

ইতি

আনাতিদাদা

চিঠিটা পড়া শেষ করে থমকে গেলুম। মনে হল, এই মুহূর্তে পৃথিবীটা যেন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার চোখ ফেটে কান্নাও এল না, মুখ ফুটে কথাও বেরুল না। আমি নির্বাক। বসে পড়লুম। মুখখানাকে লুকিয়ে ফেললুম দুই হাঁটুর ফাঁকে। তারপর ফুঁপিয়ে উঠলুম।

আমি জানি না এমনি করে কতক্ষণ বসে ছিলুম। দেখিনি জোরো কখন নিঃসাড়ে আমার পাশে এসে বসেছে। হয়তো আমার মতো সে-ও দুঃখ পেয়েছে। তাই আমার মতো সে-ও এখন নিশ্চুপ, নির্বাক।

এমনই সময়ে হঠাৎ একটা শোরগোল শুনে আমার চমক ভাঙল।

দেখলুম, সেই মেয়েটি একেবারে মারমুখী হয়ে আমার তাবুর ভেতর ঢুকে পড়েছে। দেখি, তার পেছনে আরও অনেকজন। দেখে চিনতে কষ্ট হল না, এরা সবাই কারনিভলে এসেছে খেলা দেখাতে। আমি অবাক চোখে তাদের মুখের দিকে চাইলুম। আমায় কোনো কথা বলতে দিল না তারা। আচমকা চিৎকার করে তাণ্ডব শুরু করে দিল তাঁবুর ভেতরে। আমাকে জাপ্‌টে ধরলে আচম্বিতে। এমন অবস্থার জন্যে আমি একেবারেই তৈরি ছিলুম না।

আমার পাশেই জোরো। আমি জানি জোরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে আর রক্ষে নেই। তাই আমি চিৎকার করে উঠলুম, "আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।"

কে শুনছে! আমি ধস্তাধস্তি করে কোনোরকমে ওদের হাত ছাড়িয়ে জোরোকে জড়িয়ে ধরলুম। জড়িয়ে ধরে আবার চেঁচালুম, "তোমরা থামো। এক্ষুনি আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাও! জোরো খেপলে তোমাদের একজনও প্রাণে বাঁচবে না!"

কিন্তু তারা শুনল না। হিংসায় উন্মাদ হয়ে তারা আমায় শেষ করে ফেলতে চায়। তারা আমার সব-কিছু লুঠ করছে। তাঁবু তছনছ করে দিচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, রাগে ফুলছে জোরো।

তারা আমার জিনিসপত্তর ভাঙচুর করছে।

জোরোও ফুঁসছে।

তারা আমার তাঁবুটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলছে।

জোরো আমার হাত ছাড়াবার জন্যে আমায় ধাক্কা দিল।

দেখতে পেলুম সেই মেয়েটা চোখের পলকে আমার ব্যানডুর্‌রিয়া নিয়ে পালাচ্ছে।

জোরো দেখতে পেয়েছে। আমাকে সে ঝটকা মারল। আমি পড়ে গেলুম। পারলুম না তাকে ধরে রাখতে। আমি ধমকে উঠলুম, "জোরো।"

ততক্ষণে জোরো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি ছুটে এসে লাফিয়ে পড়লুম জোরোর ঘাড়ের ওপর। জোরোর সঙ্গে আমার ধস্তাধস্তি লেগে গেল! তাই দেখে যে যেদিকে পারল মার ছুট! কিন্তু জোরোর অন্য দিকে লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য ওই মেয়েটা!

আমি আর জোরোর সঙ্গে কতক্ষণ ধস্তাধস্তি করতে পারি! জোরো শেষে আমারই ওপর খেপে উঠল। আমাকেই বুঝি আক্রমণ করে! আমি ছিটকে গেলুম। সেই তক্কে জোরো ছুটল ওই মেয়েটাকে ধরবার জন্যে।

আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। আমি জানি, জোরো এক্ষুনি এক ভয়ংকর কাণ্ড করে বসবে। আমি জোরোর পেছনে ছুটলুম। আমার হাতে আনাতিদাদার রিভলভার। এই ক্ষিপ্ত বন্য জন্তুটাকে শায়েস্তা করতে এখন এই রিভলভার ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমি যদি এখনই ওকে রুখতে না পারি, তবে মেয়েটার নির্ঘাত মরণ।

আমি ছুটতে-ছুটতে দেখতে পেলুম, জোরো প্রায় ধরে ফেলেছে মেয়েটাকে। ভয়ে পিছু ফিরে চিৎকার করে উঠল মেয়েটা, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।"

আর দেরি করা যায় না। আমাকে এখনই রিভলভার ছুড়তে হয়। এই ক্ষিপ্ত একটা বন্য-জন্তুর হাত থেকে একটি অসহায় মেয়েকে যদি রক্ষা করতে না পারি, তবে এ-রিভলভারের মূল্য কী! আমি রিভলভার তাক করলুম। আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে ধমক দিয়ে শেষবারের মতো চিৎকার করে ডাক দিলুম, "জোরো—"

বোধহয় জোরো একটু থতমত খেয়ে গেছল। হয়তো চকিতে সে একবার আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ঠিক এই ফাঁকে, মেয়েটি আশ্চর্য কৌশলে জোরোকে এড়িয়ে আমারই দিকে ছুটে এল। আর্তনাদ করছে সে। আমাকে আচমকা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "বাঁচাও!" আমাকে এমনভাবে সে জাপটে ধরল যে, আমি টাল সামলাতে পারলুম না। আমার আঙুলের চাপ লেগে রিভলভারের গুলি ছুটল এলোমেলো। নিশানা ফশকে গুলি জোরোর গায়ে না-লেগে হাওয়ায় উড়ে গেল।

গুলির শব্দে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল জোরো। সে বুঝতে পেরেছে, আমি তাকে মারতে চাই। তাই সে লাফিয়ে পিছু ফিরে

আমাকেই আক্রমণ করল। আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে মেয়েটিকে বললুম, "পালাও !" মেয়েটি পালাল।

জোরো আমাকে আক্রমণ করল তার সামনের পায়ের থাবা দিয়ে। আমি সে-আঘাত সহ্য করতে পারলুম না। এত তীব্র সে-আঘাত যে, আমি মুখ থুবড়ে ক-হাত দূরে ছিটকে পড়লুম। বুঝতে পারছি, মাথায় লাগল। অসহ্য যন্ত্রণা। আমার বুকের ভেতরটা এত হাঁপিয়ে উঠল যে, আমি নিশ্বাসটাকে কিছুতেই সামলাতে পারলুম না। অসহায়ের মতো সেই রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলুম।

অনেকক্ষণ পর যখন আমার ঘোর কাটল, তখনও আমার ওঠার ক্ষমতা নেই। শুয়ে-শুয়েই অতি কষ্টে এ-পাশ ও-পাশ করছি। এ-দিক ও-দিক দেখছি। হঠাৎ বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। দেখি, জোরো ! একটু দূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ! আমার চোখে চোখ পড়তেই সে যেন একটু চনমন করে উঠল। তখনকার সেই হিংস্র চোখ দুটো তার এখন মনে হচ্ছে কত শান্ত ! বুঝি বা বন্ধুকে অমন আঘাত করে এখন অপরাধীর মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে !

একটু পরেই আমি উঠে বসতে পারলুম। আর-একটু পরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারলুম। হাঁটতে-হাঁটতে তাঁবুতে ফিরে এলুম। আমার এই ছোট্ট তাঁবুটা এখন কেবলই একটা ধ্বংসস্তূপ। সেই ধ্বংসস্তূপেরমধ্যেই আবার শুয়ে পড়লুম।

এখন কী করব আমি ! কাল এখান থেকে আমায় চলে যেতেই হবে। হয়তো কাল একটু সুস্থ হয়ে উঠব। কিন্তু কোথায় যাব আমি এই শূন্য হাতে ? শূন্যই তো ! আমার যে আপন বলতে আর কেউ রইল না। অমন যে জোরো, যাকে নিয়ে এত স্বপ্ন আমার, সেই স্বপ্নও আজ ভেঙে গেল। আমার প্রিয় আর সব-সেরা বন্ধু ব্যানডুর্‌রিয়া, সেটাও কেড়ে নিয়ে গেল ওরা ! কেন এত হিংসা ওই একটা ছোট্ট বাজনার ওপর ! আমার বাজনা তো শুধু সুরে-সুরে ছড়িয়ে দিয়েছে আনন্দ। ক্ষতি তো কারো করেনি। তবে কেন এত রাগ !

আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভেবেছিলুম, খুব সকাল-সকাল উঠব। পারিনি। ঘুমিয়েই ছিলুম। হঠাৎ একটা গরম নিশ্বাসের উত্তাপ আমার পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। ঘুম ভেঙে গেল। চমকে চেয়ে দেখি, জোরো। মনে হয় সারারাত জেগেই বসে ছিল আমার পাশে। আমি উঠে পড়লুম। বাইরে রোদ। এবার যেতে হবে। যেতে হবে আমায় এক দেশ থেকে আর-এক দেশে। এ-জগৎ থেকে আর-এক অজানা জগতে। পড়ে রইল আমার ছেঁড়া টুকরো তাঁবু। পড়ে রইল, তাঁবুর ভেতর ভাঙাচোরা আমার শখের জিনিসগুলি। ওগুলির দিকে চেয়ে দেখতে আমার মন চাইছিল না। চোখ ফেরালুম জোরোর দিকে। দেখতে কষ্ট লাগছিল। কেননা, ওর কাছ থেকে এবার আমায় বিদায় নিতে হবে। এগিয়ে গেলুম তার কাছে। তার মুখের দিকে চেয়ে থাকলুম কিছুক্ষণ। তার পিঠে হাত রাখলুম। কাঁপছে সে। তার গলাটা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললুম, "আমায় তুই মেরেছিস বলে মনে করিস না যেন, আমি তোর ওপর রাগ করেছি জোরো ! তোর আবার দোষ কোথায় ? আমিই তো রিভলভারের গুলি ছুড়ে তোকে মারতে চেয়েছিলুম। আমিই তো অপরাধী। এই জঘন্য কাজের জন্যে আমি যে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছি না জোরো ! আমার বারবার মন বলছে, আমি বিশ্বাসঘাতক ! আমার বিপদের দিনে তোর মতো বন্ধু পেয়েছিলুম বলে, আজও আমি বেঁচে আছি। সেই বন্ধুকে গুলি মারতে যার হাত ওঠে, সে বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতককে আর বিশ্বাস নয়। তুই বনে ফিরে যা জোরো। খোলা আকাশের নীচে সেই তোর ঘর। সেইখানেই তোর সুখ। তোর আনন্দ। সেখানে আর যাই থাক, বিশ্বাসঘাতক নেই।" বলতে-বলতে কেমন যেন ভার হয়ে আসছিল আমার গলার স্বর। না,আমার ভেঙে পড়লে চলবে না। আমি বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। জোরোর দিকে আর ফিরে তাকালুম না। আমার শূন্য হাতের মুঠি দুটো শক্ত করে চেপে ধরে পা ফেললুম।

"ইসতাসি ?"

আমি থতমত খেয়ে গেছি। হঠাৎ এ-সময়ে কে ডাকল ? সামনে চমকে চেয়ে দেখি, এ যে সেই মেয়েটি ! দেখি, তার হাতে আমার ব্যানডুর্‌রিয়া। তার চোখদুটিতে যেন অনেক দুঃখের কালো ছায়া জড়িয়ে আছে।

মেয়েটি ব্যানডুর্‌রিয়াটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরা-গলায় বললে, "ইসতাসি, তোমার ব্যানডুর্‌রিয়া !"

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। দেখলুম, তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তার ছোট্ট ভাই জুতসু। মুখখানা তার থমথম করছে।

মেয়েটি বলল, "কিছু মনে কোরো না ইসতাসি। আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি।"

ক্ষণেক চেয়ে, হাত বাড়ালুম। ব্যানডুর্‌রিয়াটা হাতে নিলুম। বললুম, "অনেক কষ্ট দিলুম। চলি।" পথে নামলুম।

"ইসতাসি !" সে আবার ডাকল।

আমি থামলুম।

সে বলল, "তুমি যদি না যাও ইসতাসি ?"

আমি বললুম, "আমি যাযাবর।"

মেয়েটি আমার হাতদুটি জড়িয়ে ধরল। তার মুখখানি কান্নায় ভরে গেছে।

আমি বললুম, "বোন, আমায় যেতে দাও ! হয়তো আবার দেখা হবে।"

ওর হাতদুটি আলতো সরে গেল আমার হাত থেকে। আমি এগিয়ে গেলুম জুতসুর কাছে। দু' ফোঁটা চোখের জল ওর গালের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে। আমি ওর চিবুকটি ধরে ওর চোখের ফোঁটাদুটি মুছে দিলুম। সে-কান্নার জল আমার হাতে ছড়িয়ে রইল। কথা বলতে পারল না জুতসু। হাতটা বাড়িয়ে দিল। তার হাতে একটা খেলনা-গাড়ি। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কী ?"

"তোমার।" বলে সে আমায় জড়িয়ে ধরল। তারপর আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

বোধহয় এই খেলনা-গাড়ি কারনিভল থেকে কিনেছে সে, নিজে খেলবে বলে। আমি হাতে নিলুম। আমার সব গেছে। মনে-মনে ভাবলুম, একদিন স্বপ্ন দেখেছিলুম, একটা গাড়ি কিনব আমি। ঘোড়ায় টানা গাড়ি। সেই গাড়ি চেপে এক দেশ থেকে আর-এক দেশে যাব। দেশে-দেশে ব্যানডুর্‌রিয়া বাজিয়ে গান গাইব, জোরোর খেলা দেখাব। কিন্তু সে-স্বপ্ন আমার মিথ্যে। সত্যি যেন এই খেলনা-গাড়ি। এ-গাড়ি কত সুন্দর ! এ যে একটি ছোট্ট ছেলে, জুতসুর, ভালবাসায় ভরা ! আমি এই খেলনা-গাড়িটা আমার ছেঁড়াখোঁড়া জামার পকেটে পুরে ফেললুম। তারপর ব্যানডুর্‌রিয়ার তারে সুর তুললুম। গেয়ে উঠলুম আমার হারিয়ে-যাওয়া বন্ধু ওতিয়ারই গাওয়া সেই গানটি :

আমি তো কখনও দিইনিকো ব্যথা
একটিও কোনো প্রাণীকে,
অনেক দুঃখ পেয়েও তো আমি
বন্ধু আমার জানি কে !

তারপর হাঁটা দিলুম।

অনেকক্ষণ পর, যখন ক্লান্ত পা-দুটো অবশ হয়ে আসছিল, মনে হচ্ছিল, পথের পাশে ওই গাছের নীচে বসি একটু, তখন আমি পিছু ফিরেছিলুম একটিবার। অনেক দূরে পিছনের হাঁটা-পথে চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠেছিলুম। এ কী ! জোরো ! সে আসছে ক্লান্ত পায়ে একা-একা। আমি দাঁড়ালুম। সে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ-ই সে দু-পা ওপরে তুলে আমায় জড়িয়ে ধরল। যেন সে বলতে চাইল, 'তোমাকে একা-একা আমি কোথাও যেতে দেব না। তুমি যেখানে যাবে, সেখানেই আমি যাব। আমাকে মারতে চাও মারো। তবু জেনো, আমি তোমার বন্ধু।'

আনন্দে চোখে জল এসে গেল আমার। ওর মুখখানা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আমার মুখের সামনে তুলে ধরলুম। চেয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় বলে উঠলুম, "বন্ধু।" তারপর দুজনে ওই সবুজ গাছের আড়ালে হারিয়ে গেলুম।

ধূমকেতুর গল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

সন্ধ্যার পর আকাশ যখন তার নীল রং হারিয়ে ঘন কালো হয়ে ওঠে, তখন সেই আঁধার আকাশের বুকে একটা-দুটো করে তারা ফুটতে থাকে। মনে হয় প্রকৃতিদেবী যেন ঐ ঘন মসীকৃষ্ণ অন্ধকার মুছে দিতে একটার পর একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে চলেছেন। নক্ষত্রমণ্ডলী ছাড়া আকশে আরও জ্যোতিষ্ক দেখা যায়—সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, চাঁদ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ইত্যাদি। এদের অবস্থানকে আকাশ না বলে অবশ্য মহাকাশ বলাই উচিত। এইসব জ্যোতিষ্কের অনেককে আবার সব সময় খালি চোখে দেখা যায় না। তখন দূরবিন দিয়ে দেখতে হয়। আজকাল বিজ্ঞানীরা অনেক শক্তিশালী দূরবিন আবিষ্কার করেছেন। এ ছাড়া মহাকাশে আরও একটা জিনিস দেখা যায়। সেটা হল সূর্যের রাজ্যের বিভীষিকা—ধূমকেতু। কোথাও কিছু নেই, আচমকা পুব-আকাশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড

জোড়া-লেজ ধূমকেতুর ছবি

জিনিসকে দেখলে ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাছাড়া এই ধূমকেতুর চালচলন, আদবকায়দা মহাকাশের আর পাঁচটা জ্যোতিষ্ক থেকে একেবারে আলাদা।

মহাকবি শেক্সপিয়রের লেখা 'জুলিয়াস সিজার' নামে একটি বিখ্যাত বই আছে। বড় হয়ে এই বই তোমরা নিশ্চয়ই পড়বে। জুলিয়াস সিজারের স্ত্রী ক্যালপুরনিয়া একসময় তাঁর স্বামীকে এই বলে সর্তক করে দিচ্ছেন—**'When beggars die, there are no comets seen; The Heavens themselves blaze forth the death of princes.'** যার বাংলা করলে দাঁড়ায়—'ভিখারির মৃত্যুতে ধূমকেতু দেখা যায় না—অন্তরীক্ষ জ্বলে ওঠে রাজপুত্রের মৃত্যুতে।'

ক্যালপুরনিয়া নিশ্চয়ই আকাশে ধূমকেতু দেখেছিলেন। ধূমকেতুকে শুধু শেক্সপিয়রের ক্যালপুরনিয়া কেন, এখনও পৃথিবীর অনেক লোক অমঙ্গলের চিহ্ন বলে মনে করেন।

ধূমকেতুর ইংরেজি নাম হল—কমেট (Comet), কথাটি এসেছে আবার গ্রীক শব্দ Komet থেকে। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ—এলোকেশী।

ধূমকেতু দেখে আগে লোকে ভাবত এরা আমাদের সৌরজগতের কেউ নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে কখন সবার অলক্ষ্যে এরা হয়তো আমাদের সৌরজগতের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমরা তখন অবাক বিস্ময়ে সীমাহীন আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। রাত্রির আকাশে নক্ষত্ররাজির নয়নভুলানো সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। তবু বলতে দ্বিধা নেই উজ্জ্বল ধূমকেতুর দৃশ্য যেমন নয়নাভিরাম এবং রোমাঞ্চকর তেমন আর কিছুই নয়।

আজকাল বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ধূমকেতুও আমাদের সৌরজগতেরই অধিবাসী। সৌরজগতের বাইরের কোনও আগন্তুক নয়। সূর্যের রাজ্যের ভূত বলে এদের ভয় পাবারও কোনও কারণ নেই।

ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ-কেউ মনে করেন এরা হয়তো সৌরজগতের কোনও বড় গ্রহের দেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। সূর্যের মধ্যে প্রচণ্ড ঝড় (সৌর বিক্ষোভ—ইংরেজিতে বলা হয় Solar flare)-এর সময় ধূমকেতু বেরিয়ে আসতে পারে। বিখ্যাত ডাচ বিজ্ঞানী জে, এইচ. উর্ট-এর মতে সৌরজগতের কক্ষপথের দূরে বহুদূরে কোনও-এক হিমশীতল স্থানে ধূমকেতুর এক গুদাম রয়েছে। সেখানে কত ধূমকেতু আছে জানো? তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে, এই গুদামে প্রায় ১০০,০০০,০০০,০০০ ধূমকেতু রয়েছে। কল্পনা করা যায়? এখানে এইসব ধূমকেতু একেবারে ঠাণ্ডা মেরে ভিজে-বেড়ালের মতো চুপচাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে। যখন অন্য কোনও নক্ষত্র ধূমকেতুর কাছাকাছি চলে আসে তখন সেই টানাপোড়েনের ফলে সে বৃহস্পতি বা শনির মতো বড় গ্রহের অভিকর্ষের আওতায় চলে আসে। তারপর সূর্যের চারদিকে কয়েক হাজার বার অবিরাম ঘুরপাক খেতে খেতে কোনও-এক সময় ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে ঐ ধূমকেত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
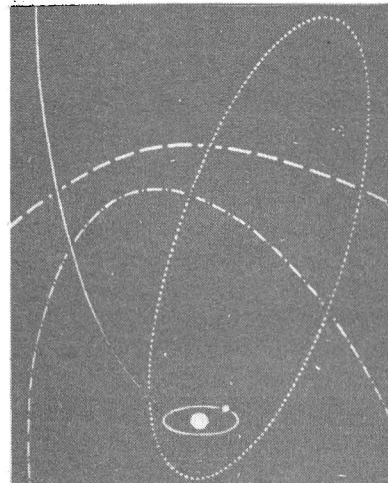
ধূমকেতুর কক্ষপথ
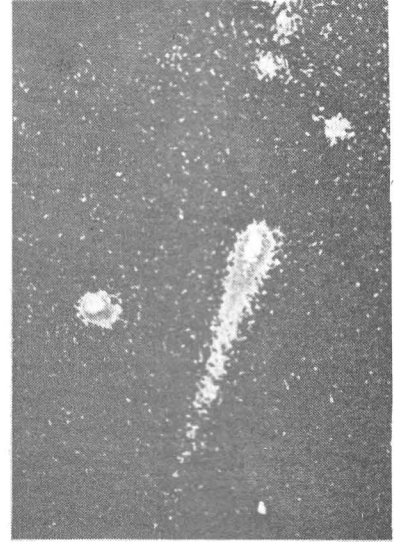
১৯৭৪ সালের কহাউটেক ধূমকেতুর ছবি

এবার শোনো ধূমকেতুর চেহারা কেমন। এদের দেহকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা চলে। মাথা, তার বাইরের আবরণ ও লেজ। অতি সামান্য ধূলিকণা থেকে শুরু করে লক্ষ লক্ষ ছোটবড় শিলাখণ্ড একসঙ্গে জুড়ে ধূমকেতুর মাথা তৈরি হয়। অবশ্য কোনও কোনও ধূমকেতুর মাথার ওজন কমও হতে পারে। মাথাকে আকাশে ছোট্ট একটা তারার মতো দেখায়। ধূমকেতুর তারার মতো অংশের নাম নিউক্লিয়াস। মাথাকে ঘিরে রয়েছে পাতলা ফিনফিনে নীহারের ওড়নার আবরণ। একে বলা হয় 'কোমা'। নিউক্লিয়াস আর কোমা এই যুগলমিলনেই তৈরি হয়েছে ধূমকেতুর মাথা।

ধূমকেতু যতই সূর্যের কাছে আসে ততই তার চেহারা বদলে যায়। সূর্যের ঠিক উলটো দিকে মুখ করে ধূমকেতুর মাথা থেকে দীর্ঘ লেজ বেরোয়। সূর্যের যত নিকটবর্তী হবে, ধূমকেতুর লেজও ততই ফুলে-ফেঁপে বাড়বে। বিড়াল রেগে গেলে যেমন তার লেজ ফুলিয়ে ভয় দেখায়, সূর্যের কাছে এলে ধূমকেতুও সূর্যকে সেইরকম ভয় দেখাতে চায়। আবার সূর্য থেকে দূরে যাবার সময় লেজও আস্তে আস্তে সে গুটিয়ে নেয়। বেড়ালের লেজ অবশ্য একটা থাকে। কিন্তু ধূমকেতুর লেজ অনেকগুলো হতে পারে। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যে অতি উজ্জ্বল ধূমকেতুটি

আকাশে দেখা গিয়েছিল তার লেজ ছিল ছয়টা।

ধূমকেতুর মাথার অসংখ্য ছোটবড় শিলাখণ্ড পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ফলে আটকে থাকে। পৃথিবীর খুব কাছে যেসব ধূমকেতু এসেছে তাদের নিউক্লিয়াসের চেহারা খুব নিখুঁতভাবে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকাশে একটা বিরাট ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। এর লেজ আকাশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সূর্যের কাছাকাছি এলে তার তাপে ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের বাইরের আবরণের বস্তুসমূহ গ্যাস হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। সূক্ষ্ম ধূলিকণা সমেত ঐ গ্যাস তখন 'কোমা'র মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর তারা সূর্যরশ্মির চাপে লেজের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। জেট প্লেন যেমন পিছন দিকে ধোঁয়া ছাড়ে ধূমকেতুর লেজও বেরোতে থাকে ঠিক সেইরকম। লেজের ধূলিকণার উপর সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে—তাই ধূমকেতুর লেজকে এত উজ্জ্বল দেখায়। অনেক সময় এদের কিছু অংশ আলট্রা-ভায়োলেট আলো শোষণ করে পরে ছেড়ে দেয়। তখন আমরা তা দেখতে পাই।

ধূমকেতুর মধ্যে কী কী পদার্থ আছে তা স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ' যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। ধূমকেতুর মধ্যে যে-সমস্ত গ্যাস রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সায়ানোজেন, কার্বন-মনো-অক্সাইড, নাইট্রোজেন। সায়ানোজেন এবং কার্বন-মনো-অক্সাইড খুবই বিষাক্ত গ্যাস। যখন ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল তখন অনেকেই দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সময় ধূমকেতুর লেজের উপর দিয়ে পৃথিবীকে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা পৃথিবীর বিন্দুমাত্র ক্ষতিও তাতে হয়নি। ধূমকেতুর লেজের ওজন এত কম যে, তুমি ঐ লেজকে গুটিয়ে অনায়াসে তোমার জামার পকেটের মধ্যে পুরে ফেলতেও পারো! আসলে পৃথিবীকে আগেও বহুবার অনেক ধূমকেতুর লেজ মাড়িয়ে যেতে হয়েছে। ধূমকেতুর লেজে খুব অল্পসংখ্যক অণু থাকে। পৃথিবীকে সামান্যতম আঁচড় দেবার ক্ষমতাও তাদের নেই। হ্যালির ধূমকেতর ভর পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটা সমগ্র পৃথিবীর ভরের ১/১,০০০,০০০,০০০ মাত্র। কিন্তু ভর কম হলে কী হবে, লেজের সাইজ বিরাট। হ্যালির ধূমকেতু একসময় প্রায় দু'কেটি মাইল লম্বা হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে ধূমকেতুর লেজ সব সময়েই সূর্যের উলটো দিকে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন গ্রহাণুপুঞ্জের কোনও-কোনওটি সম্ভবত একসময় ধূমকেতু ছিল।

সূর্যসান্নিধ্যে ধূমকেতু যতবারই আসে ততবারই অভিকর্ষের দারুণ টানাপোড়েনের ফলে ধূমকেতুর অবস্থা হয় একেবারে সঙ্গিন। এর ফলে কখনও কখনও ধূমকেতু দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছিল ১৮৪৫-৪৬ সালে। Beila নামে একটা ধূমকেতু দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এই দুটো অংশই আবার দেখা গেল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর অবশ্য কখনও আর এদের দেখা যায়নি।

হারভার্ড মানমন্দিরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেড এল. হুইপ্‌ল ধূমকেতুর গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ১৯৫০ সালে এক নতুন তত্ত্ব দিলেন। তত্ত্বের নামটা ভারী মজার—**Dirty Snow ball theory**, নোংরা বরফবল তত্ত্ব। তত্ত্বটা শুনতে খটমট হলে কী হবে, আসলে ব্যাপারটা জটিল নয় মোটেই। এখানে বলা হয়েছে শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ তুষারকণিকা দিয়েই তৈরি হয়েছে ধূমকেতু। এর মধ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন ও অপেক্ষাকৃত ভারী অন্য মৌলিকপদার্থ—যেমন কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এদের পরস্পরের মিলনে উদ্ভূত যৌগিক পদার্থগুলি মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জল হতে পারে। যখন ধূমকেতু সূর্যের দিকে এগুতে থাকে তখন তার বাইরের অংশের তুষারকণিকার দল সরাসরি কঠিন অবস্থা থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই গ্যাসীয় পদার্থসমূহ থেকেই তৈরি হয়েছে তার লেজ। ধূমকেতুর ভিতরের শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বস্তু যে-সমস্ত পদার্থ দিয়ে তৈরি তারা কিন্তু সরাসরি বাষ্প হতে পারে না। ধূমকেতুর শেষ অবস্থায় যখন ওটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তখন এই সমস্ত ভারী পদার্থ আশ্চর্যভাবে আকাশে উল্কাবৃষ্টি হয়ে খসে পড়ে।

স্যার এডমুণ্ড হ্যালি ছিলেন আইজাক নিউটনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে ধূমকেতুর গতি বার করতে গিয়ে তিনি অভিকর্ষ নিয়মের সাহায্য নিলেন। তিনি দেখলেন ধূমকেতুও মহাকাশে ভ্রমণ করছে দিব্যি অভিকর্ষের নিয়ম মেনে। তিনি আরও লক্ষ করলেন ১৬০৭, ১৫৩১ ও ১৪৫৬ সালে যে-সব ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল তারা একই ভাবে পরিভ্রমণ করে চলেছে। তিনি বললেন, বিভিন্ন শতাব্দীতে যদিও এদের দেখা গেছে তবু এরা একই ধূমকেতু। ৭৫ অথবা ৭৬ বছর অন্তর একে দেখতে পাওয়া যায়। হ্যালি ভবিষ্যৎবাণী করলেন, ঐ ধূমকেতুকে আবার ১৭৫৮ সালে দেখতে পাওয়া যাবে। সত্যিই ওটা ঐ বছরের শেষে দেখা গেল এবং ১৭৫৯ সালে চমৎকার উজ্জ্বল আভায় নভোদিগন্ত উদ্ভাসিত করে সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় হ্যালিসাহেব তার আগেই মারা গিয়েছিলেন, কাজেই তিনি এই ধূমকেতু দেখে যেতে পারেননি। ১৮৩৫ ও ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতু আবার দেখা গেল। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তোমরাও আকাশে এই ধূমকেতুকে দেখতে পাবে। চার বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে, কী বলো!

কিংকর্তব্য

বাসুদেব দেব

পাখিদের এই সমাজে
নেইকো দাঁড়ি কমা যে
ছাতের ওপর আচার-শিশির
চৌদিকে জোর কিচির মিচির
নির্ঘাত সে ভাষা গ্রীক
সঙ্গে নাচন ত্রিক ত্রিক
মিটিং-শেষে ঠুকরে শিশি
ভাঙলে ডুকরে কাঁদেন পিসি
কাক চিল আর স্পিকটি নট
পক্ষী-কুলের খুব বিপদ
এ সব দেখেই কি খুড়ো
কিংকর্তব্যবিমূঢ় ?

কান টানলে

অভীক বসু

কান কটকট প্রাণ ছটফট
বিদঘুটে এক রোগ
হাসপাতালে ছুটল হারু
সারাতে দুর্ভোগ।

কান দুটিকে কাটতে হবে—
বলল দেখে ই. এন. টি.
সঙ্গে সঙ্গে ও. টি.র ঘরে
বসল যেন ভিয়েনটি।

বলল হারু, কান হারালে
দেখব কেমন চক্ষে
কোন্‌টা ভেড়া কোন্‌টা গোরু
চিনব কেমন লোককে ?

বদ্যি ভাবেন, কী যোগাযোগ
চোখের সঙ্গে কর্ণের
অ্যানাটমি হাতড়ে শেষে
হলেন তিনি হন্যে।

খোলসা করে বলল হারু,
কানটি যদি কাটি,
কেমন করে আটকাব এই
চশমা দুটোর ডাঁটি ?
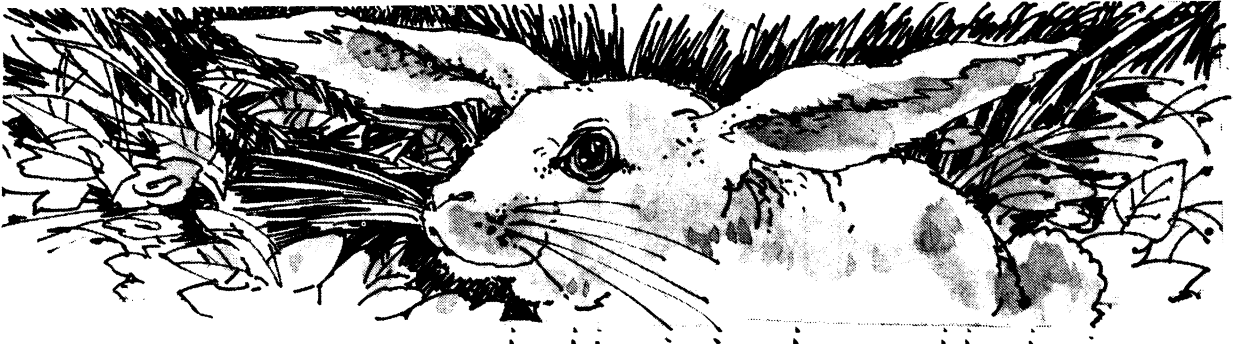
সবুজ বাগানে খরগোশ

বলরাম বসাক

একটা খরগোশ ছিল। তার দুটো লম্বা-লম্বা কান ছিল। আর দুটো ছোট্ট-ছোট্ট চোখ ছিল। আর একটা ঝাঁটা-ঝাঁটা গোঁফ ছিল।

খরগোশের এমন লম্বা-লম্বা কান, ছোট্ট-ছোট্ট চোখ, আর ঝাঁটা-ঝাঁটা গোঁফ দেখে লাল ফুল, নীল ফুল, হলদে প্রজাপতি, সবুজ ফড়িং, সাদা ইঁদুর, গোলাপি হাঁস, খাঁচার ভেতর থেকে কালো ওরাং-ওটাং সবাই খুব তারিফ করল। বলল, "বাহ্ বাহ্।"

"কী সুন্দর !"

"কী মনোহর।"

খরগোশ তখন মুখখানা অল্প-অল্প তুলে পিটপিট করে চারদিকে তাকায়, মগডালের বাসা থেকে একটা ধেড়ে কাকের ছানা পাঁচটা কাকের দিকে চোখ প্যাটপ্যাট করে তাকাল। বলে উঠল, "ও কাকু কাকু, মনোহর মানে কী ?"

তখন একটা কাক ঘাড় কাত করে আর-একটা কাককে বলল, "ছোক্কা ছোক্কা, মনোহর মানে তো সন্দেশ।"

তখন ছোট কাক মুখ গম্ভীর করল, চোখে চশমা পরল, যেন এক্ষুনি একটা 'ডিকছিনারি' দেখবে।

সেই কাকের ছানাটা আবার বলল, "ছোক্কা ছোক্কা, মনোহর কি সন্দেশ ?"

"উঁহু, মনোহরা একপ্রকার সন্দেশ বলেই তো জানি," বলল, কাকের ছানার ছোটকাকা সেই ছোট কাক, "মনোহর কী জিনিস, আমি তো ঠিক..."

তখন বড়-বড় চারটে কাক মুখ গোমড়ামতন করে বলল, "মনোহরও এক প্রকার বড় সন্দেশ, এখনও আমরা চোখে দেখিনি।"

কাকেরা যখন এইসব বলাবলি করছিল, তখন নীচে লাল ফুল নীল ফুল সবুজ ফড়িং হলদে প্রজাপতি সব্বাই হাত ধরাধরি করে খরগোশের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। আর বলছিল, "খরগোশভাই খরগোশভাই, কী সুন্দর তুমি, তুমি কী ভাল, তুমি আমাদের সবুজ বাগানের রাজা হয়ে যাও।"

খরগোশ বলল, "আচ্ছা ভেবে দেখি।" তারপর ওদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে লম্বা-লম্বা কান উঁচিয়ে ছোট্ট-ছোট্ট চোখে তাকিয়ে ঝাঁটা-ঝাঁটা গোঁফ এদিক-ওদিক নেড়ে একছুট্টে চলে গেল সবজিবাগানে।

সবজিবাগানে লম্বা-লম্বা ঝিঙে, গাঢ় সবুজ ফিকে সবুজ, নীল-নীল সবুজ—কত রকম রঙের ঝিঙে দুলছিল আর খিলখিল করে হাসছিল। খরগোশকে দেখেই আরো জোরে দুলে উঠল, "বাহ্, কী সুন্দর !"

গোল-গোল সাদা আর বেগুনি রঙের বেগুন সবুজ বোঁটায় দুলছিল, তারাও হঠাৎ বলে উঠল, "বাহ্ বাহ্, কী সুন্দর !"

উচ্ছেপাতা ঝিলমিল করে উঠল আর ঢ্যাঁড়সফুলগুলি বাসন্তী-মেরুন পাপড়ি মেলে মিষ্টি-মিষ্টি হেসে উঠল। বলল, "আরে, খরগোশভাই যে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে !"

বড়-বড় সবুজ পাতার আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে কমলা-হলদে কুমড়োফুল বলল, "দেখি দেখি কেমন দেখতে ?"

খরগোশ কান খাড়া করে লজ্জামতন মুখখানা অল্প তুলে পিটপিট করে তাকাল।

"বাহ্ বাহ্, কী খাসা তোমার কানদুটি !"

ঝাঁঝালো লঙ্কাগাছের পাশে ধুঁধুলমাচার নীচে থাকত পাঁচটা কোলাব্যাঙ আর ষোলোটা খুদে-খুদে কোলাব্যাঙের ছা। খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না। হঠাৎ একটা ছোট্ট ব্যাঙের ছানা বলল, "ক্যাঁকো ক্যাঁকো, খোগ্গোস দেখব।" তখন সবকটা ব্যাঙের ছানা 'ক্যাঁকো ক্যাঁকো' করে উঠল। সবাই 'খোগগোস' দেখবে। গোমড়ামুখো ধুমসো একটা কোলাব্যাঙ, ব্যাঙের ছানাদের কাকা, গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ গ্যাঙ করে বলল, "খোঁকারা বোঁকারা খোঁগ্গোস দেখবে তো চলো।"

তখন ওরা থপাথপ বেরিয়ে পড়ল। কিছুদূর পর্যন্ত গেল। তারপরই খরগোশের দেখা পেয়ে গেল। ব্যাঙের ষোলোটা ছানা চোখ জুলজুল করে দেখল, "বাহ্, কী সোন্দর খোগ্গোস—মাথায় দুটো কী সোন্দর আইচ্‌কিরিম !"

গোমড়ামুখো ধুমসোটা তখন তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "খোঁকারা বোঁকারা ওটা আইচ্‌কিরিম নয়, কান।" কিন্তু কে শুনছে গোমড়ামুখোর কথা, সবচে খুদে ব্যাঙের ছানাটা বলে উঠল, "ক্যাঁকো ক্যাঁকো, আমি আইচ্‌কিরিম খাব।"

তখন সবকটা ব্যাঙের ছানা একসঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে দিল, "ক্যাঁকো ক্যাঁকো আইচ্‌কিরিম খাব, ক্যাঁকো ক্যাঁকো আইচ্‌কিরিম খাব, ক্যাঁকো ক্যাঁকো ক্যাঁকো ক্যাঁকো..."

ওদিকে লাল পাতা লাল শাক, কমলা-হলদে কুমড়োফুল, ফিকে সবুজ গাঢ় সবুজ ঝিঙে, সাদা বেগুন বেগুনি বেগুন সবাই খরগোশকে তাদের বাগানের রাজা হতে বলল।

খরগোশ বলল, "আচ্ছা ভেবে দেখি।" তারপর তাদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে একছুট্টে চলে গেল ফলের বাগানে।

ফলের বাগানে লাল সবুজ হলদে আম, কালো জাম, সাদা জামরুল, সবুজ পেয়ারা, ধুমসো কাঁঠাল, কলা-নারকেল সুপুরি-টুপুরি সবাই খরগোশের খুউব তারিফ করল। বলল, "তোমার ছোট্ট-ছোট্ট চোখদুটো কী সুন্দর, তোমার ঝাঁটা-ঝাঁটা গোঁফ ক'গাছা কী সুন্দর, তোমার লম্বা-লম্বা কান দুটো—ওহ্ কী দারুণ—কী দারুণ সুন্দর। এক্ষুনি আমাদের বাগানের রাজা হয়ে যাও।"

বাগানের সবাই যখন বলছে রাজা হতে, তখন হওয়াই যাক না—ভাবতে ভাবতে খরগোশ বাড়ি এল।

বাড়ি এসে একটা তরমুজ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সক্কালবেলা ঘুম থেকে উঠে জরির জামা পরল। এত্তো বড় একটা চুড়ো পরল মাথায়। পায়ে পরল নাগরা জুতো। তারপর সোজা সবুজ বাগানে চলে গেল গুটিগুটি।

কিন্তু এ কী ! ফুলের বাগানে লাল ফুল নীল ফুল হলদে প্রজাপতি সবুজ ফড়িং—তাদের মাঝখানে বসে আছে সাদা ধবধবে লম্বা-লম্বা কান ওটা কে ? ছোট্ট-ছোট্ট

চোখ দেখছি ওরও রয়েছে। ঝাঁটা-ঝাঁটা গোঁফও দেখছি রয়েছে ওরও। সবাই ওর চোখের কানের গোঁফের তারিফ করছে। তারপর ঐ সেই অন্য খরগোশটাকেও এই সবুজ বাগানের রাজা হতে বলছে।

ওদিকে মাথার ওপর পাঁচটা কাক আর কাকের ছানারা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। জরির জামা পরা, চূড়োয় কানদুটো ঢাকা, খরগোশকে কী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল তো, তাই কাকের ছানা বলে উঠল, "ছোক্কা ছোক্কা, ঐ যে বড় সন্দেশ মনোহর—মনোহর···"

গম্ভীরমুখো ওদের ছোটকাকা সেই ছোট কাক চশমা-চোখে ঘাড় কাত করে খরগোশকে দেখল, "নাহ্, বড় সন্দেশ নয়কো, এ খরগোশ···"

খরগোশ তখন একছুট্টে সবজির বাগানের দিকে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু পায়ে নাগরাজুতো পরা রয়েছে যে। ওটা পরে সে-রকম জোরে ছোটাই যাচ্ছে না। আস্তে-আস্তে হেঁটে চলল খরগোশ।

মাথায়-চুড়ো, জরির-জামা, পায়ে-নাগরা খরগোশ যখন সবজির বাগানে এল, দেখল সেই আরেকটা খরগোশ, অনেক আগেই ছুট্টে চলে এসেছে। সাদা বেগুন বেগুনি বেগুন, কমলা-হলদে কুমড়োফুল, সবুজ ঝিঙে—সবাই ওর লম্বা-লম্বা কানদুটির তারিফ করছে, ঝাঁটা-ঝাঁটা গোঁফের তারিফ করছে, ছোট্ট-ছোট্ট চোখদুটোরও কী তারিফ করছে—বাব্বা—চোখে দেখা যায় না! তারপর সবাই মিলে ঐ খরগোশটাকেও সবুজ বাগানের রাজা হতে বলছে।

এদিকে জরির জামা চুড়ো নাগরা পরা খরগোশকে অদ্ভুতমতন দেখে ব্যাঙের ছানাগুলো চেঁচিয়ে উঠল, "ক্যাঁক্কো ক্যাঁক্কো আইচ্‌কিরিমওয়ালা এচে গেচে—।"

আর থাকতে পারল না খরগোশ, কেঁদে ফেলল। "আর আমি রাজা হতে চাই না।" কাঁদতে কাঁদতে তাড়াতাড়ি নাগরা জুতো খুলে ফেলল, চুড়ো খুলে ফেলল, জরির জামা খুলে ফেলল। তারপর অন্য খরগোশটার কাছে গিয়ে বলল, "এই নাও ভাই, এগুলো তুমিই পরো। তুমিই বরং রাজা হও, সবাই যখন চাইছে।"

ওমা, নতুন খরগোশটা জামা জুতো চুড়ো কিছু নিল না। কচুবনের বড়-বড় পাতার আড়ালে রেখে দিল। রেখে দিতে দিতে বলল, "ধুস্, এগুলো পরে কি খেলা যায়? কী হবে রাজা হয়ে? কাল যদি আরেকটা খরগোশ আসে তো সে-ই এগুলো পরবে।"

"তুমি কী করবে?"

"আমি খেলব। আমার খেলতে ভাল লাগে।"

"আমারও খেলতে খুউব ভাল লাগে।"

"এসো-না, চোর-চোর খেলি।"

"বেশ বেশ," বলেই দুই খরগোশ সবুজ বাগানে হুটোপাটি করে চোর-চোর খেলতে লাগল।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কাঠ আর কাঠ

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

কাঠের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অনেকদিনের। নানান প্রয়োজনে মানুষ কাঠ ব্যবহার করে। তাই তার ভাষার মধ্যেও কাঠ শব্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত শব্দটি কাষ্ঠ। বাংলায় কাষ্ঠ তৎসম শব্দের অন্তর্গত। সাধুভাষায় প্রচুর কাষ্ঠের সন্ধান পাওয়া যায়। কপালকুণ্ডলায় আছে: 'নৌকায় পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না।' কবিতায় কি কাষ্ঠ নেই? স্মরণ করা যাক চৌধুরীদের নায়েবমশাইকে: 'কাষ্ঠ হেসে গোঁফ পাকিয়ে বলেন শেষে নায়েবমশাই/ উই ধরেছে সামিয়ানায় বাইরে রোদে দিয়েছি তাই।' কাষ্ঠ শব্দে মূর্ধন্য-ষ কেন? কাষ্ঠ তো ষত্ব-বিধানের আওতায় পড়ে না! তবে? বলা চলে, আষাঢ়, পাষাণ প্রভৃতি শব্দের মতো কাষ্ঠ শব্দেও স্বাভাবিক মূর্ধন্য-ষ হয়েছে। বাংলা তদ্ভব শব্দ কাঠ। প্রাকৃতে কট্‌ঠ।

'আ' উপসর্গের পর কাষ্ঠ বসিয়ে পাই 'আকাট'। আকাট শব্দের একটি অর্থ কাষ্ঠে পরিণত অর্থাৎ জড়বৎ বা জড়ের মতো। অন্য অর্থ, কাঠের মতো নিরেট, যা ফাঁপা বা তরল নয়; অর্থাৎ কঠিন। ব্যঙ্গ্যার্থে মস্তিষ্কহীন বা মূর্খ। কাটরা শব্দের অর্থ কাষ্ঠময় গৃহ বা ঘর। যেমন: 'কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পুরিয়া দিল।'—বঙ্কিমচন্দ্র। এখনকার দিনে শব্দটিকে বলে কাঠগড়া। বাজারের সারবন্দি ঘরকে বলে কাটরা। যথা: রাজা কাটরা। কাট-কাট শব্দের অর্থ শুষ্ক ও লাবণ্যহীন। যেমন: 'মেয়েটির গড়ন বড় কাট-কাট।' কাঠবাঙাল শব্দের অর্থ কট্টর পূর্ববঙ্গবাসী। কাঠঝুনো নারকেলের শাঁসে রসকষ কম। ভয়ে কাঠ হওয়া মানে কাঠের মতো নিস্পন্দ ও অনড় হয়ে পড়া। রোগা শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়। হাসপাতালে বেওয়ারিশ রোগী মরে কাঠ হয়ে গেলেও তার মরদেহ কেউ নিতে আসে না।

কুড়াল দিয়ে কাঠ বা গাছ কাটা যার পেশা, তাকে বলে কাঠুরিয়া বা কাঠুরে। কাঠ সামনে জুড়ে অনেক প্রাণীর নামকরণ হয়েছে। এরা কোনও-না-কোনও ভাবে কাঠের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কাঠঠোকরা এক ধরনের পাখি ইংরেজিতে যাকে বলে Wood-pecker। গাছের শুকনো কাণ্ডে পোকা প্রভৃতি খাওয়ার জন্য ঠোকর মারে বলে এ-পাখির নাম কাঠঠোকরা হয়েছে। গাছে আরোহণকারী ছোট প্রাণিবিশেষকে বলে কাঠবেরাল। এক ধরনের পিঁপড়েকে বলে কাঠপিঁপড়ে। শুধু কি প্রাণী! কাঠের সঙ্গে ফুলের নাম জুড়ে দিয়ে পাই কাঠগোলাপ আর কাঠমল্লিকাকে। কাঠ থেকে পাই কাঠি। কাঠ, বাঁশ, ধাতু প্রভৃতির ছোট লম্বা সরু টুকরোকে বলে কাঠি। দেশলাইয়ের কাঠি, ঝাঁটার কাঠি, চাবিকাঠি ইত্যাদির মধ্যে এ-কাঠির অবস্থান। 'কাঠখড় পোড়ানো' একটি বিশিষ্টার্থক বাক্য। যেমন: 'এখনকার দিনে চাকরি যোগাড় করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।' কাঠকয়লা না হলে স্বর্ণকারের চলে না। প্রতিমা গড়তে হলে আগে চাই কাঠামো। কাঠখোলার অর্থ বালিশূন্য ভাজনা খোলা। কাষ্ঠ-শব্দের প্রতিশব্দ দারু। ফারসি ভাষা থেকে নেওয়া সুগন্ধ ও মিষ্টস্বাদের গাছের ছাল দারচিনি দারু অর্থাৎ কাঠের প্রভাবে পড়ে দারুচিনি নামেও পরিচিত। বৃক্ষবিশেষকে বলে দেবদারু। দারুব্রহ্ম মানে জগন্নাথদেবের কাষ্ঠনির্মিত মূর্তি।

খেই-হারানো গাছ

সুচেতা মিত্র

হাঁটতে হাঁটতে নদী চলল
গাছ বলল: থামো।
জল ছিটিয়ে ছড়িয়ে পাথর
এ কী এ পাগলামো!
নদী হাসল দু'চোখ জুড়ে
হাসির সাদা ফেনায়
ভরিয়ে তুলল গাছের গুঁড়ি
গাছ ভাবল: কে হায়
ওকে থামায়! পায়ের নীচে
ওর কি আছে ডানা
উড়ন-পাখির ওপচানো সুখ
জলের ঢেউয়ে আনা!
দাঁড়িয়ে-থাকা রাশভারী গাছ
নাছোড়বান্দা চালে
আটকে দিল নদীর ধারা
বাঁকানো এক ডালে।

ছুটতে-ছুটতে চলল নদী
ঝুমঝুমিয়ে বাজল নূপুর
পায়ের তালে নাচ,
বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে রইল
খেই-হারানো গাছ।

চমিবুড়ি

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমাদের আতঙ্ক ছিল চমিবুড়ি। তার চেহারা দেখে আমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের মনে আতঙ্ক জাগত। মাথার চুল শনের দড়ির মতো সাদা। একটিও দাঁত নেই। তোবড়ানো মুখে আর কপালে অনেকগুলি ভাঁজ। তার নীচে বেড়ালের চোখের মতো ছোট-ছোট দুটি চোখ যেন সব সময় জ্বলছে। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। একটা লাঠি হাতে করে কুঁজো হয়ে থপথপ করে চলত চমিবুড়ি। কেউ বলত, বয়স ওর একশোরও বেশি। একহাতে দুধের বালতি নিয়ে বাড়ি-বাড়ি দুধ দিয়ে আসত।

গ্রামের সবাই বলত, চমিবুড়ি অনেক তুকতাক জানে। একা ছেলেপুলে পেলে সে নাকি মন্তর পড়ে ভেড়া ছাগল বানিয়ে দিতে পারে। দূর থেকে চমিবুড়িকে আসতে দেখলে ছেলের দল দুড়দাড় করে পালাত। বলত, ওই চমিবুড়ি আসছে, পালা পালা। মায়েরা বাচ্চার কান্না থামাবার দরকার হলে বা ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াতে হলে বলতেন, শিগ্গি ঘুমো বলছি, নইলে চমিবুড়িকে ধরিয়ে দেব।

এহেন চমিবুড়ির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছিল। তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। চমিবুড়ির তিন কুলে থাকার মধ্যে ছিল এক বোনপো। ডাকনাম মেধো। ভাল নাম মাধব। মেধো আমার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছরের বড়। কিন্তু ফেল করতে করতে ক্লাস সেভেনেই তাকে ধরে ফেলেছিলাম আমি। তার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। মাধবের সঙ্গে আমি চমিবুড়ির বাড়িও ক'দিন ঘুরে এসেছি।

প্রথম প্রথম যে ভয় পাইনি, তা নয়, কিন্তু আলাপ হবার পর দেখলাম, আরে, চমিবুড়ি তো আমাদেরই ঠাকুমা-দিদিমার মতো মানুষ। দু'দিনেই আমাকে বেশ ভালবেসে ফেলল চমিবুড়ি। গেলেই মুড়ি-নারকেল খাওয়াত। গ্রামে বামুনদের সবাই বলত ঠাকুর। চমিবুড়ি আমায় বলত, "ও ঠাকুর, গাছে কলা পেকেছে, কলা দিয়ে বাতাসা আর মুড়ি খাতি বেশ ভাল লাগবানে। খাবা?" চমিবুড়ির সংসারে ছিল দুটো গাই, আর দুটো বেড়াল। বেড়াল দুটো আমি এলেই মিউ মিউ করে ঘরে আসত।

একদিন মাধবের খোঁজে চমিবুড়ির বাড়ি গিয়ে শুনলাম দু'জনে খুব ঝগড়া হচ্ছে। মেধো বলছে, "আমায় টাকা দেবে কিনা বলো?" চমিবুড়ি বলছে, "বলছি তো, দেব না। তোকে নষ্ট করার জন্য টাকা দিতি পারব না। টাকাডা কি গাছে ফলে?" মেধো বলল, "বেশ, দেখা যাবে। আমি তোমার সব কীর্তি ফাঁস করে দেব।" তাতে চমিবুড়ি বলল, "ওরে, আমি মধু গুণিনের মেয়ে। তুই আমার কী ফাঁস করবি? যারা ফাঁস করতে চেয়েছিল, তাদের পরিণাম তো দেখছিস। বুঝে-শুনে চলবি।"

এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম। মেধো একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

সেদিনই মেধো আমাকে বলল, "আমি আর এ-বাড়িতে থাকব না রে কালী।"

"কেন বুড়ি মাসির সঙ্গে ঝগড়া করিস বল তো?"

"তোকে একদিন সব বলব, কালী। বললে তুই পেত্যয় যাবি না। এতদিন আমি সব সহ্য করেছি, আমার চোখের সামনে যে সব ঘটনা ঘটেছে..."

"কী ঘটনা?"

"সে-কথা আর একদিন বলব।"

কিন্তু সেই আর একদিন আসার আগেই শুনলাম মেধো ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছে। চমিবুড়ির বাড়ি থেকে সে পালিয়েছে। যাবার সময় বুড়ির কিছু টাকাপয়সাও নাকি হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

মেধো নাকি আজকাল বনগাঁ লোক্যালে লজেন্স ফিরি করে। আমাদের পাড়ার দু'তিনজন তাকে দেখেছে। কাচের বোয়েম হাতে নিয়ে সে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়ায়। থাকে নাকি হাবড়ায়।

আমাকে চমিবুড়ি একদিন রাস্তায় ধরল। "শুনেছ তোমার বন্ধুর কাণ্ড?"

"শুনলাম।"

"যাই করুক না কেন, আমার চোখ এড়িয়ে যাবে কনে? আমি সবই জানতি পারি। অমন ছেলের মুখে আগুন। যাবার সময় আমার তিন কুড়ি টাকা নিয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা হলি বলে দিও ওই টাকা ফেরত না দিলি ফলডা কিন্তু ভাল হবে না।"

বছরখানেক পরে মেধোর সঙ্গে দেখা হল

অপ্রত্যাশিত ভাবে। গোবরডাঙা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখছি। এমন সময় দেখি মেধো আমার সামনে। পরনে ময়লা জামা-পাজামা। মাথার চুল রুক্ষ। চেহারা অর্ধেক হয়ে গেছে। কাঁধে সাইড ব্যাগ।

"মেধো, তুই ?"

মেধো বলল, "যাক, তোর সঙ্গে দেখা হল, ভালই হল। চল্ কোথাও গিয়ে বসি।" আমরা স্টেশনের ওপারে গুডস শেডের সামনে মালগাড়ির প্ল্যাটফরমে এসে বসলাম। মেধো বলল, "কালী, আমার মাসি চমিবুড়ি যে তুকতাক জানে, তা তুই জানিস ?"

আমি বললাম, "লোকে তো বলে।"

"লোকে আর কতটুকু জানে। আমার দাদামশায় মধুগুনিন ডাকিনী-মন্ত্র শিখেছিলেন, তাঁরই দুই মেয়ে মাসি আর আমার মা। মাসি ছোটবেলা থেকেই খুব চালাক-চতুর। আর আমার মা নেহাতই ভালমানুষ। তাই বাবা বড় মেয়েকেই তাঁর সমস্ত বিদ্যে শেখান। আমার মামার বাড়ি দেওড়ায়। এটা হল মাসির শ্বশুরবাড়ি। মাসির কোনো ছেলেমেয়ে হয়নি। তার স্বামীর সম্পত্তিও কম ছিল না। বাড়িঘর, গোরুবাছুর, বাগান। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে মাসি বিধবা হয়। আমার মা'র বিয়ে হয়েছিল বয়সে অনেক বড় এক লোকের সঙ্গে। বাবার স্বভাব ভাল ছিল না। অবস্থাও ভাল নয়। আমি হবার পর আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়। বাবা তখন মা'কে পরামর্শ দেয় আমাকে নিয়ে মাসির বাড়ি থাকতে। বাবা ভেবেছিল, মাসি মারা যাবার পর আমিই তার সব সম্পত্তি পাব। মাসি আমাদের থাকতে দিতে রাজি হল। কিন্তু বাবার মতলবটা সে ধরতে পারেনি।

"বাবা তারপর থেকে প্রায়ই আসত। মা'র সঙ্গে বাবার কী সব কথা হত। আমাকে ঘর থেকে সরিয়ে দিত। আমি বুঝতাম না। মাসি নানারকম তুকতাক শিখলেও তা কোনোদিন কাজে লাগায়নি। শুধু প্রতি অমাবস্যার রাতে ঘরে দরজা বন্ধ করে কী সব করত। ওইদিন সারারাত আমাদের ঘর থেকে বেরুবার হুকুম ছিল না। মা বলত মাসি ওইদিন তার দেহে থাকে না। সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে সারা দেশ ঘুরে বেড়ায়। তারপর শেষ রাতে আবার ঘরে ফিরে আসে।

"আমার বয়স তখন দশ। সেই সময় একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল।

"বাবা একদিন এসে হাজির হল। তারপর শুনি মা'র সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছে। আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলাম।

"বাবা বলছে, যে করে হোক টাকা আমার চাই। মা তার উত্তরে বলল, 'আমি কী করব। আমি পারব না।' বাবা বলল, 'পারতেই হবে। নইলে আমায় জেল খাটতে হবে। টাকা না দিতে পারলে তোমায় এখানে রেখেছি কেন ? বাক্স থেকে সরাতে হবে।' মা বলল, 'বাক্সর চাবি দিদির আঁচলে সব সময় বাঁধা থাকে।' বাবা তাতে হেসে বলল, 'এই ওষুধটা রাতে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিও। বুড়ি ঘুমিয়ে পড়বে। তখন আঁচল থেকে চাবি খুলে নেওয়া শক্ত হবে না। মনে রেখো, এই পাঁচশো টাকার ওপর আমার জীবন নির্ভর করছে। টাকা না নিয়ে আমি নড়ব না। আমি আজ রাতে এখানেই থাকছি।'"

মেধো একটু চুপ করল। তারপর বলল, "সেদিন রাতে যে একটা অঘটন কিছু ঘটবে, তা বুঝতে পেরে সারা রাত আমার চোখে ঘুম এল না। হঠাৎ একটু ঝিমুনি এসেছিল। মাঝরাতে চেচাঁমেচি শুনে উঠে দেখি পাশের ঘরে মা ও বাবা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। মাসি চেঁচাচ্ছে, 'দুধকলা দিয়ি কালসর্প পুষছি আমি। তলে-তলে এত বড় ষড়যন্তর। ভেবেছ আমি ধরতি পারব না ? আমার চোখরে এড়াবি কে ?'

"মা আর বাবা চোরের মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে। মাঝরাতে মা নাকি বাক্স খুলছিল। বাবা দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের বাইরে। একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে মাসি।

"মাসী বলল, 'একবার যখন বিশ্বেস ভেঙেছিস, তখন তোদের আর বিশ্বাস করব না। এই মন্তর পড়ে তোদের মনুষ্যজন্ম ঘুচিয়ে দেলাম। এখন সারা জীবন তোরা বিড়েল হয়ে থাক।'

"এই বলে মাসি মন্তর পড়তে লাগল আর একটা ঘট থেকে জল নিয়ে বাবা-মা'র গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল। দেখতে দেখতে বাবা আর মা দুটো বেড়াল হয়ে গেল। আমি তাই দেখে ভয়ে কেঁদে উঠলাম। মাসি আমার দিকে তাকিয়েও মন্তর পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাকে কাঁদতে দেখে বোধ হয় মায়া হল। বলল, 'তোকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু খবরদার, বেআইনি করবি তো তোকেও অমন অবস্থা করে ছাড়ব।'

"আমি সেই থেকে কোনো কথা বলতে পারিনি। মাসির বাড়ি আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। শুধু বাবা-মা'র দিকে চেয়ে ওখানে পড়ে ছিলাম। তাদের বেড়াল হয়ে কী কষ্ট পেতে হচ্ছে, তুই জানিস ! এতদিন সাহস পাইনি। কিন্তু আমিও মধু গুণিনের নাতি। আমিও সুযোগ খুঁজছিলাম। বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম একদিন। ট্রেনে লজেন্স বেচে নিজের খরচ চালাতাম। কিন্তু আমার মন পড়ে ছিল অন্যদিকে। গুণিনের সন্ধান করতাম সুযোগ পেলেই।

"আমার দাদুর যেসব শিষ্য ছিল, খুঁজতে খুঁজতে তাদেরই একজনের সন্ধান পেলাম গাইঘাটায় গিয়ে। সুনীল মণ্ডল তার নাম। আমার কাছে সব শুনল। তারপর বহু হাঁটাহাঁটির পর রাজি হল আমাকে শিখিয়ে দিতে। কোনো মানুষকে জানোয়ার হয়ে যাবার পর তাকে আবার মানুষে পরিণত করার মন্তর।

"আজ রাতেই আমি মাসির বাড়ি যাচ্ছি। হয় এসপার, নাহয় ওসপার। যাবার আগে তোকে জানিয়ে রেখে গেলাম।"

মেধো চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, "যদি বেঁচে থাকি, তাহলে আবার তোর সঙ্গে দেখা হবে কালী।"

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। মেধোর কথা আমি এক বর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনি।

পরের দিন সকালবেলা উঠে পাড়ায় হইচই শুনলাম। সবাই বলছে, "শুনেছ, কী হয়েছে ?"

মা বললেন, "কী ব্যাপার ?"

কে যেন বলল, "চমিবুড়ি মারা গিয়েছে। লোকে বলছে কারা তাকে মেরে ফেলেছে। কাল রাতে নাকি তার বোনঝি মেধো এসেছিল। তারপরেই এই কাণ্ড।"

চমিবুড়ির বাড়ি গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। ততক্ষণে ফাঁড়ি থেকে হাওলাদারও এসে গিয়েছে। চমিবুড়ির মৃতদেহ পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। তার মুখে বীভৎস আঁচড়ের চিহ্ন। মনে হচ্ছে ধারালো নখ দিয়ে যেন কেউ তাকে আঁচড়ে দিয়েছে।

চমিবুড়ির প্রতিবেশী তারক পুলিশকে বলছিল, "গতকাল রাতে মেধোকে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল ও-বাড়িতে। তারপর ঝগড়া ঝাটির শব্দ কানে আসছিল। কিছুক্ষণ পরেই আর্তনাদ শুনে ওরা গিয়ে দেখে চমিবুড়ি এই রকম ভাবে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। মেধো নেই।

এটা যে মাধবের কাজ, তা বুঝে নিতে কারও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু মাধবকে পুলিশ অনেক খুঁজেও কোথাও পায়নি। তবে সেদিন চমিবুড়ির বাড়িতে সেই ভিড়ের মধ্যে আমি দেখেছিলাম যে, তিনটি বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুটি বড় বেড়ালকে আমি চিনি। কিন্তু ওদের সঙ্গে আর একটি ছোট বেড়াল কোথা থেকে এল ?

ছোট বেড়ালটা আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তারপর একটি লোক তাড়া দিতেই এক লাফে তিনটে বেড়াল গিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ছবি : অনুপ রায়

শব্দসন্ধানের সমাধান

গা	ল	ব		টি	লা		গো	গো	ল
	ণ্ঠ		উ	প	মা	ন		লা	
হ	ন	লু	লু			থ	ত	ম	ত
র্য		চি		না	সা		ট		র
ক্ষ	ত্র		কু	র	ঙ্গ	ম		রো	জা
		বা	হু			ঘা	স		
অ	ন	ঘ		গা	ধা		দা	মি	নী
ক্ষ		ন	ক	ল	ন	বি	শ		প
	ল	খ	নৌ			হ	য়	তো	
ভ	য়		জ	ল	যো	গ		ফা	ল

কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

বাংলার হেড-এগজামিনার বলছেন

পরীক্ষার মাস চারেক বাকি। তোমাদের জ্ঞান বাড়াবার জন্য কোনো বক্তৃতা দেব না ; কীভাবে পড়বে তার রীতিনীতি নিয়েও কিছু বলব না। এখন তোমরা অনেকে বেশ তৈরি, কেউ আরও ভাল করার জন্য লড়ে যাচ্ছ, অনেকে পাস করার চেষ্টায় হাবুডুবু খাচ্ছ। আমি মানি, প্রতিটি ছাত্রের—মানুষের—যুদ্ধটা তার নিজের। বইপত্র কোচিং টিউটর— এই সব অস্ত্র কারুর বেশি, কারুর কম— ধারালো ভোঁতা চলনসই। হাজার লক্ষ ছেলেমেয়ের সে-সব বিবিধ সমস্যা সমাধানের কোনো গুপ্তমন্ত্র আমার জানা নেই, কারুর জানা নেই। আমি তোমাদের বানান শেখাতে বসব না, শ্রেষ্ঠ পুস্তকের তালিকা দেব না। শুধু কিছু কলাকৌশল বাতলাব ; তাতে ২৫ বেড়ে ৩৫ এবং ৬০ এগিয়ে ৭২-য়ে পৌঁছে যেতে পারে, কিছু চোরা বিপদ ঘোচাতে পারে, পারে কিছু অপ্রত্যাশিত ফল হাতে তুলে দিতে।

॥ দুই ॥

প্রশ্নপত্রের মাথায় ইংরেজি আর বাংলায় গুটিকয়েক নির্দেশ থাকে। সেটা অলঙ্কার বলে অবহেলা করা ঠিক নয়। ওই সব লেখা অনেককাল ধরে চলে আসছে, অথচ শতকরা ৭০টি খাতায় তার চিহ্ন মেলে না। ব্যাপারটা যে জরুরি তা বুঝে দেখা দরকার। মোট ছয়টি সূত্র ওই নির্দেশনামা থেকে বেরিয়ে আসে—

১। উত্তর চাই সংক্ষিপ্ত আর লক্ষ্যভেদী। অর্থাৎ যা চাওয়া হয়েছে তা-ই শুধু, বাড়তি ফেনানো কথার মালা নয়।

২। প্রায় প্রতিটি প্রশ্ন কয়েকটি অংশে ভেঙে দেওয়া আর প্রতি অংশের জন্য আলাদা নম্বর। এমনভাবে লিখতে হবে, পরীক্ষক যেন স্পষ্ট দেখতে পান প্রতিটি অংশের উত্তর দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদে ভাগ করে, দুটি অংশের মধ্যে ফাঁক রেখে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। তোমার নিজেরও জানা সহজ হবে, কোনো অংশ বাদ পড়ল কি না।

৩। খাতাটি যেন ঝকঝকে হয়। যদি কিছু কাটতে হয় তাও পরিষ্কার করে, সুন্দর করে, চওড়া মার্জিন, উপরে জায়গা ছেড়ে, প্রয়োজনমতো প্যারাগ্রাফ রেখে, শব্দে শব্দে লাইনে লাইনে না জড়িয়ে লিখতে হবে। একটা উত্তর শেষ হলে খানিক দূরে পরেরটা শুরু করা ভাল।

৪। সুন্দর অক্ষরের ছাঁদ যাদের, বাড়তি কিছু সুযোগ তাদের জুটবে। না হলেও হাতের লেখা ভাল করা কোনো অসম্ভবের সাধনা নয়। ধরে ধরে অভ্যাস করলে মোটামুটি সুশ্রী লেখা আয়ত্তে আসে, তারপরে গতি বাড়ানো। কিন্তু আরও বড় কথা হল স্পষ্ট করে লেখা।

৫। বানান-ভুলে নম্বর কাটা তো যাবেই। কিন্তু যদি রবীঠাকুর লেখ, পরীক্ষককে বেদম চটিয়ে দেওয়া হবে। বাংলা খাতায় যেন বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের নাম ঠিকঠাক লেখা হয়।

৬। সাধু-চলিতে মেশানো বারণ। চলিতে লেখাই ভাল, কিন্তু যাদের যেমন অভ্যাস তাতেই সতর্ক থাকা নিরাপদ।

॥ তিন ॥

সমান মানের দুজন ছাত্র। একজন প্রবন্ধ লিখতে এক ঘন্টা লাগিয়ে দিল— ভীষণ ভাল তৈরি ছিল, লোভ সামলাতে পারেনি। নম্বর পেল ২০-তে ১৪। ফলে তাড়াহুড়োয় অনুবাদ করতে হল, ১০-য়ে ৪-এর বেশি জুটল না। আর ভাবসম্প্রসারণ শেষ করতেই পারল না। ১০-য়ে মাত্র ২ পেল। একুনে ৪০-য়ে ২০। আর সময় মেপে যে তিনটেই ঠিকঠাক শেষ করল, সে প্রবন্ধে ১২-র বেশি পেল না ঠিকই, কিন্তু অনুবাদে ৮ এবং ভাবসম্প্রসারণে ৬ পেয়ে মোট ২৬-য়ে উঠে গেল।

এই সমস্যাকে জিততে হলে সময়কে কলমে বাঁধা চাই। নম্বর আর বিষয় বুঝে একটা সময়-চার্ট এখন থেকে ঠিক করা ভাল। আর দরকার ঘড়ি ধরে লেখার অভ্যাস, যাতে হল থেকে বেরিয়ে বলতে না হয়, 'সময় না-পাওয়ায় জানা প্রশ্নটা শেষ হল না', বা 'রিভাইস করতে পারলে কিছু ভুল শোধরানো যেত।'

আমি একটা খসড়া সময়-ভাগ করে দিচ্ছি। তোমাদের নিজেদের মতো করে কিছুটা বদলে নিয়ে এখন থেকে যদি সামনে ঘড়ি রেখে লিখে অভ্যাস কর, নম্বর বাড়বেই।

প্রথম পত্র

	নম্বর	মিনিট
পাঠ-সংকলন/কবিতা		
২ বড় প্রশ্ন	২×১২	২×২০
২ ছোট প্রশ্ন	২×৪	২×৫
১ মাঝারি প্রশ্ন	৮	১৫
দ্রুতপঠন/কবিতা		
১ প্রশ্ন	১০	১৫
প্রবন্ধ ১টি	২০	৩০
বঙ্গানুবাদ ১টি	১০	২৫
ভাবসম্প্রসারণ ইত্যাদি ১টি	১০	১৫
	মোট	১৫০ মিঃ
	ফিরে দেখা	৩০ মিঃ
		১৮০ মিঃ

দ্বিতীয় পত্র

	নম্বর	মিনিট
পাঠসংকলন/গদ্য		
৩ বড় প্রশ্ন	৩×১২	৩×২৫
১ ব্যাখ্যা	৯	১৫
দ্রুতপঠন/গদ্য		
১ প্রশ্ন	১০	২০
ব্যাকরণ	৩৫	৩০
	মোট	১৪০ মিঃ
	ফিরে দেখা	
	ব্যাকরণ	১৫ মিঃ
	অন্যান্য	২৫ মিঃ
		১৮০ মিঃ

একটু ব্যাখ্যা করা যাক—

১। প্রবন্ধ লিখতে ভাবার জন্য একটু সময় লাগতে পারে, সময় চিন্তা গুছিয়ে নেবার জন্য। তাছাড়া লেখার মধ্যে স্বাধীনভাবে ভাষা ও প্রকাশরীতি দেখাবার কিছু সুযোগ পেলে ভাল, তাই অনেকটা সময় তার জন্য বরাদ্দ।

২। বঙ্গানুবাদের জন্যও একটু বেশি সময় চাই। প্রথমে সরাসরি ইংরেজির বাংলা করতে হবে, যাতে বাক্যের কোনো অংশ বাদ না পড়ে। তারপর তাকে ঠিকমতো সাজাতে হবে যাতে ইংরেজির গন্ধটা গিয়ে বাংলার নিজের চেহারা ফুটে ওঠে। অনুবাদে প্রতি বাক্যের জন্য পৃথক নম্বর। ইংরেজি বাক্যটির দৈর্ঘ্য এবং জটিলতার উপরে নির্ভর করেই এই ভাগ। মূল বাক্যটি যদি প্রশ্নবোধক বা বিস্ময়সূচক হয়, অনুবাদেও তা-ই হওয়া চাই। মূলের কিছুই বাদ যাবে না। কিন্তু বাংলাটা খাঁটি বাংলা না হলে নয়। অনুবাদ একটা বড় আর্ট। তাই একটা 'রাফ' আর একটা 'ফেয়ার' হলেই ভাল। ফেয়ার করার পরে রাফটা সোজা × দিয়ে কেটে দিতে হবে।

৩। বড় প্রশ্নের জন্য তুলনায় বেশি সময়, কারণ এর একটি বা দুটি অংশ একটু বিস্তৃতভাবে লিখতে হতে পারে। সেখানে ভাল ছেলেমেয়ে চাইবে লেখার ভাষার আর মৌলিক চিন্তার বাহাদুরি

দেখাতে। অন্তত কবিতার বড় প্রশ্নের উত্তরে মূল থেকে উদ্ধৃতি বা সদৃশ অন্য কবিতার উদ্ধৃতির মূল্য আছে। কবির ভাষায়ই কবিকে চেনা সহজ বলেই। তবে তা করা চাই সংযতভাবে।

গদ্যের বেলায় আরও একটু বেশি সময় রইল, কারণ উত্তর আরও একটু ভারী হওয়ার সম্ভাবনা।

৪। ছোট প্রশ্ন একান্ত বস্তুনিষ্ঠ। বেশি বলাটা সেখানে নিষিদ্ধ।

৫। দ্রুতপঠনে কবিতার চেয়ে গদ্যে একটু বেশি সময় স্বাভাবিকভাবেই লাগবে।

৬। ব্যাকরণে কম সময়, বেশি লাগবার কোনো সুযোগই নেই। কিন্তু রিভিসন করা চাই বেশ খানিকক্ষণ ধরে। একটু ভুল হলেই সবটা বরবাদ। তাই লিখতে যদি লাগে ৩০ মিনিট তো দেখতে ১৫।

॥ চার ॥

মনের ভাণ্ডারে কত জ্ঞান জমা তা পরীক্ষক জানবেন না। তিনি চেনেন তোমার নাম-রোল মার্কা খাতাকে। খাতার পাতায় তোমার জ্ঞানের পরিবেশন ঠিকঠাক না হলে অনেক পড়াশুনা জানা-বোঝা সত্ত্বেও প্রত্যাশার পেছনে পড়ে থাকবে।

তাই তোমার খাতাকে বানিয়ে তোলো তোমার জ্ঞান আর সাধনার আয়না।

ইংরেজির হেড-এগজামিনার বলছেন

নতুন পাঠক্রম অনুসারে মাধ্যমিক স্তরে প্রশ্নপত্রের ধরন যখন পালটানো হল তখন থেকেই আনন্দমেলায় (পূজাবার্ষিকী) 'পরীক্ষার্থীদের জন্য' বিভাগটিতে আলোচিত হচ্ছে : কীভাবে উত্তর লিখতে হয়, কী করে নম্বর বাড়াতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিভাগটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রধান পরীক্ষকরা এই বিভাগে তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে যে-কথা বলেন সেই কথা শুনলে এবং সেইভাবে লেখাপড়া করলে যে ভাল ফল পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আসল কথা এবং অতি পুরনো কথা : নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনো করতে হবে এবং এর কোনো বিকল্প নেই।

ইংরেজির প্রসঙ্গে বলি : সব চেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতে ফেল করে। তারা কি পড়ে না ? নিশ্চয়ই পড়ে। তবু ফেল করে। আর যারা পাশ করে তাদের মধ্যে অনেকেই বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করছে না। অথচ এখন যা প্রশ্নের ধরন তাতে পরীক্ষার্থী তার জানাটুকু যত্ন করে গুছিয়ে ঠিকমতো যদি লিখতে পারে, তাহলে সে অনেক নম্বর পাবে, যা আগের দিনের প্রধানত রচনাত্মক উত্তর চাওয়ার দরুন সম্ভব ছিল না।

এখন ১০০ নম্বরের ইংরেজি প্রশ্নপত্রে ৪০ নম্বর (২৫+১৫) থাকে পাঠ্যগ্রন্থ অর্থাৎ গদ্য ও কবিতার জন্য। বাকি ৬০ নম্বর গ্রামার ও কম্‌পোজিশনে। গ্রামারে ১৫ নম্বরের পুরোটাই সাধারণ ছাত্রছাত্রীও অনায়াসে পেতে পারে। কারণ এটা প্রায় ছকে বাঁধা। এর মধ্যে ৯ নম্বর [তিন নম্বর করে তিনটি অংশ : আরটিক্‌ল্‌ প্রিপোজিশন সহযোগে শূন্যস্থান পূরণ, পাংচুয়েশন (যতিচিহ্ন) ও ন্যারেশন চেঞ্জ] প্রায়ই গদ্য টেক্‌স্‌ট থেকে আসে। সুতরাং অপরিচিত বাক্য বড় একটা থাকছে না। গ্রামারের বাকি দুটি প্রশ্ন (তিন নম্বর করে) মামুলি। একটি, বাক্যের রূপান্তর ; অন্যটি ফ্রেজ ইডিয়মের প্রয়োগ। প্রদত্ত বাক্যগুলিতে ইডিয়ম ঠিকভাবে বসাতে হয়। কঠিন ব্যাপার কিছু নয়।

কিন্তু কম্‌পোজিশনে [ট্রানস্লেশন (১৫ নম্বর), প্যারাগ্রাফ (১০ নম্বর), লেটার (৮ নম্বর) ও সামারিতে (৭ নম্বর)] সাফল্য বিশেষ অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। বাক্যগঠনপ্রণালী ভালভাবে জানতে হবে এবং সবটুকু লিখে লিখে অভ্যাস করতে হবে। ভাল ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভাল নম্বর তোলার সুযোগ এখানে এবং ভাল জানার প্রমাণও এই চারটি প্রশ্নে।

টেস্ট পেপার ও কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র থেকে *ট্রানস্লেশন* করা ভাল। বিভিন্ন ধরনের প্যাসেজের সঙ্গে তাহলে পরিচয় ঘটবে। টেন্‌সের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অনুবাদ সব সময়ে কিন্তু আক্ষরিক হবে না। কথোপকথনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে প্রকৃত অর্থ অনুসারে অনুবাদ (ভাবানুবাদ বা ফ্রি ট্রানস্লেশন) করতে হয়। একটু অভ্যাস করলে নিজেই বুঝতে পারবে। কাজেই ভয় পাওয়ারকোনো কারণ নেই। *প্যারাগ্রাফ* লেখা মানে একটি বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্ত রচনা লেখা। কতটুকু লিখবে, প্রশ্নপত্রে নির্দেশ দেওয়া থাকে। বাড়িতে আগে থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট শব্দ-সীমার মধ্যে লেখার অভ্যাস করবে। যখন যে-বিষয়ে লিখবে, সেটিকে কেন্দ্র করে বাক্যগুলি পরপর গুছিয়ে লিখবে, যাতে চিন্তা ও যুক্তির মিল থাকে। দেখবে কিছুদিনের চর্চার ফলে তোমার নিজস্ব একটা রচনা-রীতি গড়ে উঠেছে। *লেটার* লেখার সময়ে মনে রাখবে ফর্ম ও বিষয়বস্তু দুয়ে মিলে লেটার। বিষয়বস্তু কিছু না লিখে শুধু ফর্মটুকু ঠিক লিখলেও কোনো নম্বর পাবে না। কিন্তু ফর্ম নির্ভুল না হলে নম্বর কাটা যাবে। সাধারণত দুই ধরনের লেটার থাকে। এক : ব্যক্তিগত (মা-বাবা/ভাই বোন/ বন্ধু ইত্যাদিকে লেখা) ; দুই : সরকারি/আধা সরকারি (মন্ত্রী/ প্রধান শিক্ষক/ খবরের কাগজের সম্পাদক প্রভৃতিকে লেখা)। দুটোতেই সম্পর্ক অনুসারে সম্বোধন, উপসংহার ও স্বাক্ষরের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেগুলি মনে রেখে ফর্ম ঠিকমতো লিখবে এবং যতিচিহ্ন যেখানে যেমনটি, ঠিকমতো দিতে ভুলবে না। *সামারি* নিশ্চয়ই সংক্ষেপে লিখতে হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ছোট করার জন্য মূল প্যাসেজটির অংশবিশেষ খেয়ালখুশিমতো বেছে নিয়ে পরীক্ষার খাতায় তুলে দেওয়া। প্যাসেজটি বেশ কয়েকবার মন দিয়ে পড়বে ; অর্থ পরিষ্কার হলে মূল বক্তব্যগুলি পরপর সাজিয়ে নিজের কথায় সংক্ষেপে লিখবে। শেষ প্রশ্নটি কম্‌প্রিহেনশন টেস্ট। ৫ নম্বরের। সব চেয়ে সহজ। প্রদত্ত কয়েকটি বিকল্প উত্তর থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যে লিখতে হবে এবং নির্ভুল হলে অঙ্কের মতো পুরো পাঁচ নম্বরই পাবে। প্যাসেজটি ভাল করে পড়লে সঠিক উত্তর সহজেই বেছে নিতে পারবে।

এবার শেষের থেকে শুরুতে আসি। অর্থাৎ টেক্‌স্‌ট সংক্রান্ত ৪০ (২৫+১৫) নম্বরের প্রশ্নের আলোচনা করি। *প্রথম* (গদ্য থেকে এক নম্বর করে চারটি) ও *তৃতীয়* (কবিতা থেকে এক নম্বর করে তিনটি) *প্রশ্ন অবজেক্টিভ টাইপের।* উত্তর একটি শব্দে কিন্তু সেই শব্দটি পুরো বাক্যে লিখবে। ১৯৮২ সনের প্রথম প্রশ্নটাই ধরো। সেখানে একটি বাক্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে : Give the word opposite in meaning to 'liked'. তুমি উত্তরে লিখবে : The word opposite in meaning to 'liked' is '*disliked*'. বাকিগুলির উত্তর এইভাবে দেবে। পুরো ৭ নম্বরই তাহলে পাবে। *দ্বিতীয়* (গদ্য থেকে ৭ নম্বর করে তিনটি) ও *চতুর্থ* (কবিতা থেকে ৬ নম্বর করে দুটি) *প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক।* প্রত্যেকটি প্রশ্নের আবার তিনটি অংশ। প্রশ্নগুলি পাঠ্যাংশ থেকে উদ্ধৃত কোনো বাক্যকে কেন্দ্র করে। প্রথম অংশে ' কে বলেছে' 'কাকে বলেছে' কিংবা 'কার সম্পর্কে বলা হয়েছে' ইত্যাদি ধরনের। দ্বিতীয় অংশে 'কোন্ অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে' ইত্যাদি এবং শেষ অংশে ঐ উদ্ধৃতি থেকে বক্তা বা যার সম্পর্কে বলা হয়েছে তার সম্পর্কে তোমার মনে 'কী ধারণা হয়েছে' কিংবা এখান থেকে 'তুমি কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো' ইত্যাদি রকমের প্রশ্ন। এখানে তোমার বিচারবুদ্ধি অনুসারে মতামত দিতে হতে পারে। কেননা প্রশ্নগুলির মধ্যে সহজ থেকে ক্রমশ কঠিনের দিকে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে।

গদ্যাংশে দেখো গল্প প্রবন্ধ সব মিলিয়ে সাতটি। '৮২ সনের দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখো। পাঁচটি পিস থেকে প্রশ্ন এসেছে। সাতটির মধ্যে দুটি বাদ পড়েছে : (১) জেনার (Jenner...) (২) আউয়্যার হেরিটেজ। কিন্তু প্রথম প্রশ্নে এ দুটিও আছে। সমগ্র পাঠক্রম জুড়েই প্রশ্ন থাকছে। সুতরাং কোনো পিস একেবারে বাদ দিলে মারাত্মক ভুল হবে। অবশ্য যে দুটি পিস থেকে সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন আসেনি, সে দুটির উপর এবার বেশি জোর দিতে পারো। কিন্তু তোমাকে তো তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতেই হবে। স্বভাবতই অন্যগুলি থেকেও প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। আচ্ছা, তোমরা কি লক্ষ করেছ যে, The Bishop's Candlesticks থেকে প্রতি বছরই প্রশ্ন আসছে ? অনেক বড় বলে তোমরা নাকি এটা বাদ দিতে চাও শুনতে পাই। হ্যাঁ, অন্যগুলির তুলনায় বড়। কিন্তু নাটিকাটি মানবিক আবেদনে ভরা। একবার পড়লেই বিশপ ও দণ্ডিত অপরাধীকে কেউ ভুলতে পারবে না।

বিশপের বিধবা বোনকেও ভোলা যায় না। স্বার্থপর (?) দৈত্য এবং দেবশিশুটিকেও কি ভোলা যায় ? কিংবা ধরো গুড সামারিটানকে ? আর প্রতিদিনের নাটক (A Daily Drama) কী মজার ! পরিবেশ ভিন্ন হলেও চরিত্র ও ঘটনা তো চেনা, তাই না ? সুতরাং কোন্‌টাকে বাদ দেবে ?

কবিতায় সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন দুটি (৬ নম্বর করে ১২ নম্বর)। এ বছরে তিনটি কবিতা থেকে এই প্রশ্ন ছিল। বাকি থাকছে আটটি কবিতা। শেক্‌সপিয়ার, শেলি, ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্কট, ডেভিস, রবীন্দ্রনাথ ও সরোজিনী নাইডুর কবিতা। ছোট ছোট কবিতা। পড়বে সবগুলোই। গদ্যের ক্ষেত্রে যেমন বলেছি। তবে রোমান্টিক কবিদের কবিতাগুলির উপর বেশি গুরুত্ব দিতে পারো।

মোট কথা, সমগ্র পাঠ্যগ্রন্থটি ভাল করে পড়বে। তাহলে শুধু ৪০ নম্বরের অবজেক্‌টিভ টাইপ ও সংক্ষিপ্ত-উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর নয়, গ্রামার ক কম্পোজিশনের ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে। বলা বাহুল্য প্রশ্নোত্তর লেখার অভ্যাস নিয়মিত করতে হবে। বানান ভুল সম্পর্কে নতুন করে বলার দরকার বোধহয় হবে না। কারণ স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকা ও বাড়িতে অভিভাবক সব সময়েই এ ব্যাপারে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। তবু তো প্রচণ্ড রকমের ভুল করে বসো। কবি, কবিতার নাম, গদ্যের পিসগুলোর নাম লিখতে গিয়ে প্রায়ই বানান ভুল করে ফেলো, তাই না ? তাহলে যে সাধারণ বানানগুলো লিখতে ভুল হয় এবং যার জন্য মাস্টারমশায়দের কাছে পরপর বকুনি খাও, সেগুলোর একটা লিস্ট করো এবং প্রত্যেকটি বানান পাঁচবার করে লেখো। দেখবে, লিখতে আর ভুল হবে না।

শেষ করার আগে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি প্রশ্নপত্রের গোড়াতেই বাঁকা হরফে লেখা কথাগুলোর দিকে। সেই কথার সূত্র ধরে বলি : উত্তরপত্রটির প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন টেনে পরিচ্ছন্নভাবে উত্তর লিখবে। উত্তর সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া চাই। অযাচিতভাবে অপ্রাসঙ্গিক কিছু লিখবে না। সময়মতো লেখা শেষ করে উত্তরপত্রটি আবার পড়ে দেখবে অর্থাৎ 'রিভাইজ' করবে। তাড়াতাড়িতে লেখার সময় যা বাদ পড়েছে বা যা ভুল হয়েছে সেগুলো তখন সংশোধন করে নিতে পারবে।

অঙ্কের হেড-এগজামিনার বলছেন

অঙ্কের মতো পুরনো শাস্ত্র আর কী আছে ? আবার (কারো-কারো কাছে) অঙ্কের মতো 'ভয়ঙ্কর' শাস্ত্র আর কী আছে ? এবং অঙ্ককে যারা ভয়ঙ্কর মনে করে তাদের মতো বোকা আর কে আছে ! যে-জিনিসটা আদৌ ভয়ের নয়, আর যে-জিনিসটাকে ভয় করলে আমাদের একেবারেই চলবে না, সেটাকে ভয় করে কী লাভ বলো। এমন যদি হত যে অঙ্ক বিষয়টাই আবিষ্কৃত হয়নি, তাহলে না-হয় দিব্যি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোনো যেত। কিন্তু অঙ্কের আবিষ্কার হয়নি—সে-অবস্থাটা কী-রকম ? সে-অবস্থাটা একেবারে বর্বর যুগের অবস্থা, হয়তো আমরা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন অবস্থা। অঙ্কের উপর এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে মনে রেখো। অঙ্ক শুধু একটা পাঠ্য বিষয় নয়, অঙ্ক একটা কাজের জিনিস, একটা প্রয়োগমূলক শাস্ত্র। বাড়িঘর তৈরি করতে হবে, অঙ্ক চাই; সুর রচনা করতে হবে, অঙ্ক চাই ; রাস্তাঘাট কল-কারখানা, জাহাজ এরোপ্লেন রকেট বানাতে হবে, অঙ্ক চাই। বিজ্ঞান বা এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আজকাল সবাই চাইছে, কারণ তাতে চাকরির সুযোগ বেশি। স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানের শাখায় যাবার জন্য দরখাস্তের পাহাড় জমে, অনেককেই হতাশ হতে হয়, অন্যদিকে কলাশাখার ক্লাসগুলি খাঁ-খাঁ করে। কিন্তু ভবিষ্যৎ যারা ভাল করতে চায়, অঙ্কে তাদের ভয় পেলে চলবে কেন ? অনেকে অন্য কোনো দিকে কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জন করে 'অঙ্ক জানি না' বা 'অঙ্ক বুঝি না' বলে বাহাদুরি করেন। এই বাহাদুরির কানাকড়ি দাম নেই। তাঁদের বোঝা উচিত যে, এতে অঙ্ক সম্বন্ধে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্রয় দেওয়া হয় যেটা তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়। তাদেরও মনে হতে পারে, আমাদের বাবা-মা'দের যখন অঙ্ক না-জেনে না-বুঝেই দিব্যি চলে গেছে তখন আমাদেরও অঙ্কে তেমন যত্ন নেবার দরকার নেই। কোনোরকমে ঠেকা দিয়ে গেলেই হবে—মাধ্যমিকে পাশ করে গেলেই হল। এটা যে কী বিপজ্জনক ধারণা তা কি বুঝিয়ে বলতে হবে ?

জানি, অঙ্কে কাঁচা থাকলেই ভয়টা জন্মায়, আর যে যে-বিষয়ে দুর্বল সে-বিষয়ে তার আগ্রহও থাকে না। আগ্রহ না থাকলে অঙ্কে 'কাঁচা' অবস্থাটাকে 'পাকা' করার চেষ্টাও তেমন আন্তরিক হয় না। এই কাঁচা থাকা এবং ভয় করার কারণও অনেক সময় বড়রা। স্কুলে অঙ্কের বেশির ভাগ শিক্ষকই হয়তো অঙ্কে রস পান, আর ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কটা সরস করে বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু, বলতে দ্বিধা নেই, অনেক অঙ্কের মাস্টারমশাইও অঙ্কটাকে ভালবাসেন না, ফলে মেজাজটা বিচ্ছিরি করে ছাত্রছাত্রীদের শেখান। সে-শেখানোতে না থাকে রস, না থাকে আন্তরিকতা, ফলে ছাত্রছাত্রীরা আকর্ষণ বোধ করে না বিষয়টার প্রতি।

গোড়া থেকে কী করে শিখবে

নিচু ক্লাসের অঙ্ক দিয়েই শুরু করি। নিচু ক্লাসে আমরা যে-সব অঙ্ক শিখি সেগুলো হল যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। একটু পরে সরল। একদম যোগ থেকে শুরু করে সমস্ত অঙ্কই সোজা সোজা দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করো, অনেকগুলো করে করো— তা থেকে ক্রমশ কঠিনের দিকে যাও। এখানে তোমাদের দুটো স্লোগান দিচ্ছি—একটা হল 'সহজ থেকে কঠিনে যাও', আরেকটা হল 'দুটোর জায়গায় দশটা কষো।' যে-অঙ্কটা পারছ না তার সহজ উদাহরণে ফিরে গিয়ে আবার ধাপে-ধাপে এগিয়ে এসো। বাবা-মাকে নতুন অঙ্ক তৈরি করে দিতে বলো—দেখবে তাঁরাও এই খেলার চ্যালেঞ্জে মেতে উঠবেন। বিদেশে অঙ্কভীরু বড়দের অঙ্ক শেখানোর জন্য 'Mathematics for the Millions' জাতীয় অনেক বই আছে। এদেশে সে-জাতীয় বইয়ের মুখ দেখি না— কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের অঙ্ক করাতে গিয়ে বাবা-মায়েরা আবার একবার বিষয়টা ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারেন।

শিক্ষকরাও বেশি-বেশি করে সহজ উদাহরণ দিয়ে শেখাবেন। রামবাবু বাজারে নিয়ে গেলেন 5.00 টাকা, আর জিনিস কিনলেন 2.00 টাকার, কত টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন—এর উত্তরে ছেলেমেয়েরা মুখে-মুখেই বলবে 3.00 টাকা। প্রথমেই 850.00 টাকা, 560.00 টাকা দিয়ে শুরু না করে ঐ সহজ উদাহরণগুলো দিয়ে মূল প্রক্রিয়াটা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। একটা সারিতে 4টে গাছ থাকলে 5টা সারিতে $4 \times 5 = 20$টা গাছ থাকবে—এটাও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। নামতাটা সকলকে জলবৎ মুখস্থ করিয়ে দেওয়া দরকার, আর 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-এর ঘরের নামতা ছাত্রদের মনে আছে কি না তা হঠাৎ-হঠাৎ ধরে পরীক্ষা করা দরকার। আর সরলের সাধারণ নিয়মটা যে 'ব-এ-ভা-গু-যো-বি' অর্থাৎ 'বন্ধনী-এর-ভাগ-গুণ-যোগ-বিয়োগ' (ইংরেজিতে BODMAS, অর্থাৎ Bracketing, Order, Division, Multiplication, Addition, Subtraction)—এ ফর্মুলা অজস্র উদাহরণ দিয়ে মাথায় বসিয়ে দিতে হবে। অঙ্ক শেখাটার একটা বড় অংশ হল অঙ্ক 'লিখতে' শেখা। তোমরা অনেক সময় $a={}^{b}/_{c}$ লিখতে গিয়ে = -এর পর ${}^{b}/_{c}$-এর যে ভগ্নাংশের টানটা — তা হয় উপরে উঠিয়ে দাও, না-হয় নীচে নামিয়ে দাও। এ-রকম লেখা দেখতে খারাপ, বুঝতে অসুবিধে হয়, এবং পরে এর জন্য নম্বর কাটা যাওয়াও আশ্চর্য নয়। ভগ্নাংশের টানটা = চিহ্নের মাঝামাঝি, খানিকটা = - এইভাবে, থাকা উচিত।

পাটীগণিত একটু সড়গড় হলে বীজগণিত শেখার পালা। প্রথম প্রথম বীজগণিত কঠিন লাগে না, কিন্তু অনেকের একটু এগোলেই হাঁপ ধরে। ধরো Value point-এর অঙ্ক। প্রথম প্রথম সোজা লাগে, কিন্তু যখন উৎপাদক শেখার সময় আসে, তখন অনেকের কাছে উৎপাদক উৎপাত হয়ে দাঁড়ায়। তারা উৎপাদক বিশ্লেষণ করাকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু এ-অঙ্কটা এখন না শিখলে উপরের ক্লাসে গিয়ে খুব বিপদে

পড়তে হয়। এসব অঙ্ক বারবার কষতে হবে, অভ্যাস করতে হবে, পুরো সিরিজটাকে দুরস্ত করে নিতে হবে।

জ্যামিতি শিখতে গিয়ে অনেকেই মূল উপপাদ্যটা ভাল করে বোঝে না। কোনো রকমে দায়সারাভাবে একটা উপপাদ্য কষে ফেলাটা বড় কথা নয়, একই উপপাদ্য বারবার করে করে তার নাড়ীনক্ষত্র বুঝে নিলে extra-গুলোতে গিয়ে আর থমকে যেতে হয় না। Extra না করলে নম্বর উঠতে কী করে ? উপপাদ্যের বিবরণ বা enunciation-টা মুখস্থ কণ্ঠস্থ ঠোঁটস্থ রাখতেই হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, খুব কম ছাত্রই এ-বিষয়ে উৎসাহ দেখায়। উপপাদ্যটা ঠিক-ঠিক বুঝলে rider-গুলো করে ফেলাও আর কঠিন থাকে না তখন, জ্যামিতি বিষয়টাও বেশ আকর্ষক হয়ে ওঠে। বারবার করে অভ্যাস করতেই হবে। স্কুলের শিক্ষক বা গৃহশিক্ষক কষে দেবেন উপপাদ্য, আর আমি নিজে-নিজে একলা হয়ে তা বোঝবার বা কষবার চেষ্টা করব না, এ তো মারাত্মক ধারণা। বীজগণিতে Harder factors-এ পোক্ত হতে গেলে easy factor-গুলোকে আগে আয়ত্তে আনতেই হবে। গোড়ায় গলদ থাকলে সর্বনাশ।

যখন লক্ষ করি নবম ও দশম শ্রেণীর কিছু ছাত্রের ষষ্ঠ শ্রেণীর অঙ্কের বিদ্যেটাও নেই, তখন এই সর্বনাশের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের নিশ্চয়ই গোড়া থেকেই ভয় দেখানো হয়েছিল, ফলে অঙ্কের সঙ্গে তেমন করে বোঝাপড়ার চেষ্টাই করেনি এরা। অনেক উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাও দেখেছি বীজগণিতের সমীকরণের transpose করতে পারে না ; অর্থাৎ $a+b=0$ হলে $a=-b$ এটাও জানে না। অথচ এ তো ক্লাস সেভেনের শিক্ষা। এরা মুখস্থ করেছে, কিন্তু অভ্যাস করেনি, বিষয়টার সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে, কিন্তু বিষয়টাকে জাপটে ধরবার চেষ্টা করেনি।

পরীক্ষার কথা

এবার পরীক্ষার বিষয়ে দু-চার কথা বলি। প্রায় প্রত্যেক বছর সরল সুদকষার একটা অঙ্ক থাকে তা নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ করেছ। এ অঙ্ক করতে গিয়ে কিছু ছাত্র আসল কথাটার বদলে লেখে সুদাসল, আর সুদাসল কথাটার বদলে লেখে সুদ। এ তো খুব মারাত্মক—এ তো পুরো অঙ্কটাকেই গুলিয়ে দেয়। কথা হল তিনটে—আসল, সুদ, সুদাসল। এগুলির ঠিক-ঠিক অর্থ জেনে ঠিক-ঠিক জায়গায় বসাতে হবে, নইলে অঙ্ক হবে কী করে। এই অঙ্ক কষতে গিয়ে অনেকে আবার ঐকিক নিয়মের ব্যবহারও জানে না যখন দেখি, তখন খুব দুঃখ হয়। নিচু ক্লাসে ঐকিক নিয়মটা একদম জলের মতো তৈরি করে নিতে হবে।

সরল করার সময় কতকগুলো সাধারণ কথা অনেকের খেয়াল থাকে না। অনেকে অন্যমনস্ক থাকে বা ঘাবড়ে যায়। ফলে কেউ হয়তো $14\div2/3$ লিখতে গিয়ে $14/2\div3$ লিখে বসে। এমন লিখলে কি কেউ ক্ষমা করবে ? Objective অংশে প্রায় প্রত্যেক বছরেই একটা সরল থাকে। ঠিক-ঠিক নিয়ম মেনে ঠিক-ঠিক লিখলে পুরো নম্বর কাটবে কে ?

এবার বীজগণিতের কথায় আসছি। ধরো দ্বিঘাত expression, যেমন ax^2+bx+c সম্বন্ধে কোনো অঙ্ক কষতে বলা হয়েছে ; কিন্তু পরীক্ষার্থী করল কী—সে লিখল দ্বিঘাত 'সমীকরণ' অর্থাৎ $ax^2+bx+c=0$। এইভাবে শুরু করল সে। ঐ 0 বসানোর ফলে তার নিজের কপালেও যে (zero) বসে গেল তা কি সে মনে রাখে ? দ্বিঘাত expression আর দ্বিঘাত সমীকরণ এক জিনিস তো নয়। বেশির ভাগ ছাত্রকে ভুল করতে দেখি অসমীকরণ লেখ বা graph-এ। আমার মতে এর একটাই কারণ, 'লেখ' সম্বন্ধে তাদের ধারণাটাই অস্পষ্ট থেকে গেছে। অনেক পরীক্ষার্থী জানেই না যে shading-টা স্পষ্ট করতে হয়। তা না করে উল্টোপাল্টা করে দিয়ে চলে আসে। সরলরেখার লেখ অঙ্কনে অন্তত তিনটে করে বিন্দু স্থাপনের কথা লেখা থাকে প্রশ্নপত্রে। মানছি দুটো বিন্দু দিলেই সরলরেখা আঁকা যায়, কিন্তু পরীক্ষায় যখন
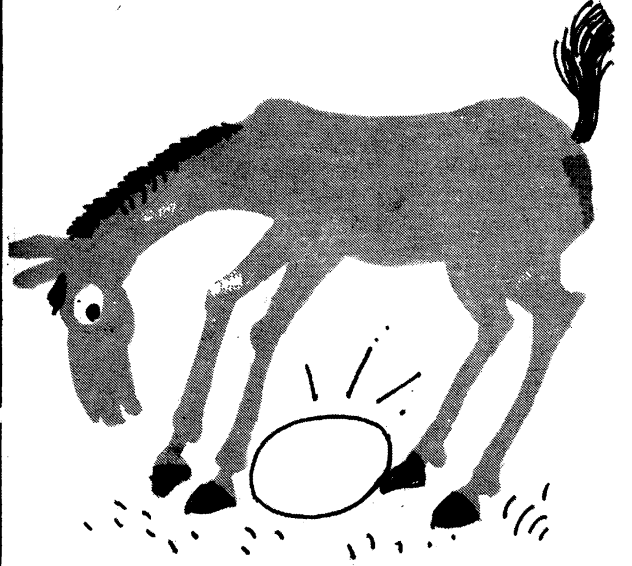
ভোজ-ভেলকি

শ্যামলকান্তি দাশ

হাট্টিমা টিম হাটিম টিম,
ঘোড়াটাকে পাড়ান ডিম
সেই ডিমটা ফুটুক আজ,
বেরিয়ে পড়ুক পক্ষিরাজ।
পক্ষিরাজের দশটা পা,
থেঁতলে মারুক দানোর ছা।
দানোর ছায়ের তিনটে চর,
আগলে আছে তেপান্তর।
তাদের হাতে চাঁদের বাটি,
নিদমহলের চাবিকাঠি !
আনুন দেখি কেড়েকুড়ে—
নাম ছড়াবে রাজ্যি জুড়ে।
পারবেন না, আচ্ছা থাক—
স্যাঙাতটাকে দিচ্ছি ডাক।

জাদু জানেন ? কেমন জাদু ?
ছিঁচকেটাকে করুন সাধু।
মেঘকে করুন ফর্দাফাঁই,
ভ্যাপসা গরম, বৃষ্টি চাই।
আকাশটা হোক হালকা নীল,
ওড়ান দুটো শঙ্খচিল।
ফোটান গাছে টগর-জুঁই,
লাফাক জলে মৃগেল-রুই।
পারবেন না, আচ্ছা থাক—
ভোজ-ভেলকি চুলোয় যাক।

ছবি :- দেবাশিস দেব

ছুটির সুর

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মাথায় ছিল মেঘের বোঝা,
আকাশ ছিল নিচু,
জানলাতে মুখ রেখে তখন
বৃষ্টি ছাড়া কিছু
কেউ দেখিনি ; আকাশ, তুমি
মেঘের বোঝা ফেলে
ওই উঁচুতে বলো আবার
কখন ফিরে গেলে ?

কালকে রাতেও টিনের চালে
বৃষ্টি পড়ার সুর
শুনতে-শুনতে ভেবেছিলাম
আর বুঝি রোদ্দুর
গাছের মাথায়, সবুজ পাতায়,
নদীর জলে হাসি
ছড়িয়ে দিয়ে শোনাবে না
ছুটির দিনের বাঁশি।

কিন্তু আজকে সাত-সকালে
ঘুম ভাঙতেই, এ কী,
আকাশ জুড়ে সোনালি রোদ
ছড়িয়ে আছে দেখি।
কাল রাতে যে আকাশ ছিল
কান্নাতে ভরপুর,
আজকে দেখি সে-ই বাজাচ্ছে
ছুটির দিনের সুর।

ছবি : দেবাশিস দেব

তিনটে চাইছে তিনটেই দিতে হবে তো। এবং সেই সঙ্গে সমীকরণটা ঠিক-ঠিক transpose করতে হবে। শুধু তাই নয়, tabulation এবং plotting একেবারে নির্ভুল হতে হবে এবং axis-গুলোর directions-ও ঠিক করে দিতে হবে।

আরেকটা কথা। হয়তো x ও y সম্পর্কে দুটো সমীকরণ দেওয়া হয়েছে ; এক্ষেত্রে শুধু y বা শুধু x-এর মান বার করে ছেড়ে দিলে চলবে না, দুয়েরই মান বার করতে হবে। অনেক ছাত্রছাত্রীকে দেখেছি যে গ.সা.গু ও ল.সা.গু কষার সময় প্রায়ই ভুল করছে। এর মূল কারণ—ক্লাস সেভেন-এইটে তারা উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে শেখেনি ভাল করে। অনেকে হয়তো Middle term rule-টা জানে, কিন্তু vanishing method দিয়েও যে উৎপাদক বার করা সম্ভব তা শিখে নেয়নি বা খেয়াল রাখেনি। যেমন $x=a$ বসালে যদি কোনো expression-এর মান শূন্য হয় তাহলে $x=a$ নিশ্চয়ই সেই expression-এর উৎপাদক হবে। নীচের উদাহরণ লক্ষ করো :

$x=2$ বসানোতে (x^2-3x+2)-এর মান শূন্য হয় ; সেহেতু $x-2$ তার একটি উৎপাদক হবে। সুতরাং আমরা লিখি যে

$$x^2-3x+2=x^2-2x-x+2=x(x-2)-(x-2)$$
$$=(x-2)(x-1)$$

এটা অবশ্য Middle term method-এও করা চলে। ইচ্ছে করলে x^2-3x+2-কে $x-2$ দিয়ে ভাগ করলেও আমরা অন্য উৎপাদকটা অর্থাৎ $x-1$ পেতে পারি।

এবার জ্যামিতি। জ্যামিতির সম্পাদ্যতে tracing ও construction খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার। অথচ এটাতেই বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীর মাথাব্যথা। কেউ কেউ উপপাদ্য প্রমাণ করার সময় যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটাকেই আগে লিখে বসে—যাকে ইংরেজিতে বলে Begging the question। ধরো এই শর্ত দেওয়া হয়েছে যে, দেখাতে হবে 'চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক'। ছাত্রটি প্রথমেই লিখে বসল—'চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক' ; তারপর হয়তো প্রমাণটা ঠিকই দিল সে। কিন্তু এ-রকম লিখলে নম্বর ক্ষয় অবধারিত। ঐ 'লেখা'-র বিষয়েই আরেকটা কথা যত্ন করে মনে রেখো। হয়তো দেওয়া হয়েছে XYZ এটা ত্রিভুজ ; কিন্তু প্রমাণে তোমরা কেউ কেউ হয়তো XYZ না লিখে ছোট হাতের xyz ব্যবহার করলে। কিংবা XYZ-কে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে লিখলে PQR। এভাবে প্রশ্নের অক্ষর বদলে দেওয়ার কোনো অধিকার তোমাদের নেই মনে রাখবে, এতে নম্বর কাটা গেলে নিজেকেই দায়ী করতে হবে।

'পরিমিতি'তে প্রায়ই চোখে পড়ে এ-ধরনের ভুল। ধরো, প্রশ্ন আছে—'কোনো cylinder-এ কিয়দংশ জলে ভরা হইল ; কতগুলি মার্বেল ফেলিলে সিলিণ্ডারটি কানায় কানায় ভরিয়া যাইবে ?' এটার উত্তর করার সময় প্রচুর ছাত্র সিলিণ্ডারের ব্যাসার্ধ ও মার্বেলের ব্যাসার্ধ বোঝাতে গিয়ে একই 'r' ব্যবহার করে। এটা সাংঘাতিক ভুল।

অঙ্কের পাশাপাশিই rough-work লিখবে। অনেক সময় উত্তর মিলেছে, কিন্তু rough-work পাশে নেই বলে নম্বর কাটা যায়। জ্যামিতির জন্য তো instrument box সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছ। প্রতিটি অঙ্ক কষে তার নীচে স্কেল বসিয়ে পেন্সিল দিয়ে একটা দাগ টেনে দাও, দেখতে ভাল হবে। খাতার উপরে ও পাশে প্রচুর margin রাখো। লেখা শেষ করে সময় অনুযায়ী একবার দুবার তিনবার revise করো, দ্যাখো কোথাও + লিখতে -, বা - লিখতে + লিখেছ কি না ; কোথাও কোনো চিহ্ন বা term বাদ পড়ে গেছে কি না ; লেখা ওলোট-পালোট হয়েছে কি না। মনে রাখবে, একটা প্রশ্নের উত্তর বাদ যায় সেও ভাল কিন্তু খাতা revise করতেই হবে। যেটুকু উত্তর করবে সেটুকু নির্ভুল হলে একটা অঙ্ক বাদ গেলে কোনো বিশেষ ক্ষতি হবে না। এমন প্রায়ই দেখা গেছে যে, কেউ হয়তো 100 উত্তর করে revise করেনি বলে 70 পেল ; আবার একজন হয়তো 80 উত্তর করে মন দিয়ে revise করার ফলে 78 পেল। যে-কোনো মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, সকলেই আমার কথায় সায় দেবেন।

ANANDAMELA PUJA NUMBER 1982
REGD NO WB/CC-264 MH-BY-SOUTH 683